ইতিহাস

দ্বি-বার্ষিক সেমেস্টার ভিত্তিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম. এ. তৃতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পাঠ - ৯

নবম পত্র

Ancient Indian Society, Economy and Polity

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন
শ্রী সুকৃত মুখার্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

মার্চ, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ৩/২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ-সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

DISCLAIMER

This Self Learning Material (SLM) has been compiled using material from authoritative books, journal articles, e-journals and web sources.

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia, West Bengal

SYLLABUS

SEMESTER III

EC-10	4 CREDITS	100 MARKS	100 HOURS

EC-9 ANCIENT INDIAN SOCIETY ECONOMY AND POLITY

BLOCK 1 IDEOLOGY OF STATE IN ANCIENT INDIA

Unit-1 : Lineage Society

Unit-2 : From chiefdoms to kingdoms,

Unit-3 : States and cities in Indo-Gangetic plain.

BLOCK 2 SECOND URBANIZATION

Unit-4 : Concept of Second Urbanization

Unit-5 : Concept of Ganarajya with special reference of Licchavi and Vajji

Unit-6 : Rise of Magadha as a kingdom.

BLOCK 3 CONCEPT OF STATE POLITY, AUTHORITY, MORAL DILEMMA

Unit-7 : Legal and ethical sanctions in the light of Arthasastra, Jatakas and Mahabharata

Unit-8 : Concepts of Saptangarastra and Rajadharma.

BLOCK 4 ORIGIN AND DEVELOPMENT OF CASTE SYSTEM

Unit-9 : Origin of Caste System

Unit-10 : Casteism reflected in Buddhist Literature

Unit-11 : Caste in Brahmanical Literature and Philosophy.

BLOCK 5 FOREIGN ELEMENTS IN INDIAN SOCIETY

Unit-12 : Indo-Greek

Unit-13 : Sakas

Unit-14 : Kusanas

BLOCK 6 CHANGING STATUS OF WOMEN IN ANCIENT INDIA

Unit-15 : Women in household.

Unit-16 : Women outside household.

CONTAINS

Block	Title	Page
1	প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের গঠন সংক্রান্ত আদর্শ Ideology of state in ancient India	1 - 13
2	দ্বিতীয় নগরায়ণ Second Urbanization	14 - 28
3	রাজ্যশাসন পদ্ধতি, কর্তৃত্ব ও নৈতিকতা Concept of state polity, authority, moral dilemma	29 - 39
4	জাতিবর্ণ প্রথার উদ্ভব এবং বিকাশ Origin and development of caste system	40 - 48
5	ভারতীয় সমাজে বিদেশী উপাদান সমূহের উপস্থিতি Foreign elements in Indian society	49 - 63
6	প্রাচীন ভারতে নারীদের পরিবর্তনশীল অবস্থান Changing status of women in ancient India	64 - 74

পর্যায়-১
প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রের গঠন সংত্র(ান্ত আদর্শ
Ideology of State in ancient India

একক-১,২,৩

৯.১.১.০ — উদ্দেশ্য
৯.১.১.১ — কৌমভিত্তিক সমাজ (একক-১)
৯.১.১.১.১— বৈদিক উপজাতি সমাজ
৯.১.১.১.২ — বৈদিক সমাজ চিত্র

৯.১.২.২ — গোষ্ঠীতন্দ্র থেকে রাজতন্ত্র (একক-২)
৯.১.২.২.১ — মহাকাব্যের সমাজ ব্যবস্থা
৯.১.২.২.১ — গোষ্ঠিতান্ত্রিক ব্যবস্থার বির্বতন।

৯.১.৩.৩ — গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগর ও রাষ্ট্রগঠন (একক-৩)
৯.১.৩.৩.১ — ষোড়শ মহাজনপদ সংত্র(ান্ত ধারণা
৯.১.৩.৩.২ — উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে আলেকজান্ডারের সময়ের পরিস্থিতি

৯.১.৩.৪ — উপসংহার
৯.১.৩.৫ — সহায়ক গ্রন্থাবলী
৯.১.৩.৬ — সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৯.১.১.০ - উদ্দেশ্য ঃ— বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল ছাত্রছাত্রীদর প্রাচীনভারতের রাষ্ট্রগঠন পদ্ধতি সম্পর্কে অবগত করা। কৌমভিত্তিক সমাজ থেক বির্বতনে মাধ্যমে বিভাবে প্রাথমিক রাষ্ট্র এবং নগর গড়ে ওঠে তার আলোচনা এই পর্যায়ের উদ্দেশ্য। কিভাবে ভারতীয় ইতিহাসে গোষ্ঠী থেকে রাজতন্ত্র গড়ে ওঠে তার আলোচনা এই অংশে পাওয়া যাবে।

৯.১.১.১ — কৌমভিত্তিক সমাজ

৯.১.১.১১ — বৈদিক উপজাতি সমাজ ঃ

আর্যসভ্যতার সম্পর্কে ইতিহাসিক জ্ঞান লাভের গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসমূহ হল ঋকবেদও অন্যন্য বৈদিক সাহিত্য, এই সমস্ত সাহিত্য মূলত ধর্মবিষয়ক হলে ও আর্য সমাজসংস্কৃতি সম্পর্ক উল্লেখযোগ্য তথ্য সরবরাহ করে। ঋকবেদের কিছু (ে ত্রে বিভিন্ন গোষ্ঠীর বা জাতির উল্লেখ করে, সেই সবজাতিগুলি একধরণের সাধারণ রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কে আবদ্ধছিল। তাই ঋকবৈদিক যুগের বাস্তব পরিস্থিতি জানার জন্য জাতিগোষ্ঠীগুলি সম্পর্কে জানা একান্ত জরুরী।

ঋকবৈদিকযুগের কেন্দ্রীয় অঞ্চলছিল সিন্ধু তারপাঁচটি উপনদী ও সরস্বতী নদী বিধৌত সপ্তসিন্ধু অঞ্চল। এই অঞ্চলেই আর্যরা প্রথম বসতি স্থাপন করে। আর্যসভ্যতা বিভিন্ জাতিগোষ্ঠীতে বিভক্ত(ছিল এবং তাদের অবস্থান এই সিন্ধু অববাহিকার বিভিন্ন অংশে ছিল। জাতি গোষ্ঠী বলতে পুরুদের নেতৃত্বধীন, পঞ্চজন, পঞ্চমানুষ, পঞ্চকৃষ্ঠ প্রভৃতি নামে পরিচিত পাঁচটি গোষ্ঠীর । ঋকবেদে উল্লিখিত করা যে ইন্দ্র পঞ্চ(তির উপর শাসন করেন পঞ্চ(তি বলতে এই পাঁচটি জাতিকে বোঝানো হয়েছে। (স একশচর্যনীনাং সূনামিরজ্যতি। ইন্দ্র পঞ্চ(তীনাম।১/৭/৯) ঋকবেদে অঞ্চলের ধারনা

দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত না হলেও অনেক ৎে্রেই জাতিগুলির অবস্থান বর্ণনা করে। যেমন সরস্বতীও সাতলেজের মাঝের অংশে থাকতেন পুরু ও অপর একটি জাতি ভরতগণ, পূর্বে সরস্বতী ও দৃষদ্বতী নদীর মাঝে অবস্থান করতেন তৃৎযুগণ। তাদের সঙ্গে ইন্দ্র ও অগ্নিকে যুত্ত(করে প্রার্থনা করেছে, যেন তারা অন্ততঃ প্রদ্বত্ত সোমগ্রহণের জন্য এদের সঙ্গ ছেড়ে যজ্ঞস্থলে আসেন।

যদিন্দ্রাগ্নী যদুযু তুর্বশেষু যদ্দ্রুহ্যুষ্বনুষু পুরুযুস্থঃ।

অতঃপরি বৃষাণাবাহি যাতমথা সোমস্য পিবতংসুতস্য।।

১/০৮/৮

অণু, দ্রুহ্যু, তুর্বষ জাতি রাভী ও সাতলেজ নদীর মাঝে অবস্থিত ছিলেন। যদুজাতির আবাসস্থল ছিল ছিল সিন্ধু ও বিতস্তা দোয়াবের দ(ণাংশে। এই উপত্যকার মধ্যাঞ্চলে থাকতেন বৃষি(বন্ত ও উচ্চঅংশে অবস্থিত ছিলেন শিব উপজাতি যাদের মহাভারতের শিবজাতির সঙ্গে তুলনা করা হয়। খ্রীঃপূর্ব তৃতীয়শতকে আলেকজান্ডারের সমসাময়িক উপজাতিদের সঙ্গে এদের সম্পর্ক ছিল।

ঋকবেদের বিভিন্ন স্তোত্রে ইন্দ্রের নিকট কেবল অনার্যদের বিরুদ্ধে নয় বরং বিভিন্ন শত্রু(ভাবাপন্ন আর্যগোষ্ঠীদের পর্যুদস্ত করার প্রার্থনা আর্যদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ইতিহাসকেই বিবৃত করে। ঋকবেদের সপ্তমমন্ডলের অষ্টাদশ সূক্তে(বর্ণিত দশরাজ্ঞ যুদ্ধ ঋকবৈদিক যুগের অল্প কিছুজ্ঞাত রাজনৈতিক ঘটনার মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ। এই যুদ্ধ দিবোদাসের পৌত্র অর্থাৎ পিজবন পুত্র সুদাস (পৈজবন) ভরতগোষ্ঠী বিরোধী দশটি গোষ্ঠীর যৌথবাহিনী কর্তৃক আত্র(ান্ত হন। ভরতদের পূর্ববর্তী মিত্রশত্তি(পুরুদের, উত্ত(যৌথবাহিনীর অংশ রূপে বর্ণিত হওয়ার মাধ্যমে রাজনৈতিক মৈত্রীর স্থায়িত্বহীনতা ও পরিবর্তন বোঝা যায়। যুদ্ধের পূর্বে কিছুটা পর্দার আড়ালের রাজনীতি চোখে পড়ার মত, যেখানে সুদাস তার পুরোহিত বি(ামিত্রকে বিতাড়িত করে বশিষ্ঠকে সেই স্থানে নিযুত্ত(করলে বি(ামিত্র যৌথবাহিনীর পুরোহিত হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করে পুরুষ্ণি(নদীতীরের এই যুদ্ধে ভরতরাজের মিত্রশত্তি(রূপে তৃৎযুদের উল্লেখ পাওয়া যায়, এবং শত্রু(গোষ্ঠী ছিল অনু, যদু, পুরু, তুর্বশ ও দ্রুহ্য, অলীন, পক, ভালনাস, শিব ও বিশানিন। সুদাস নদীর একটি বাঁধের ধ্বংস সাধন করে যুদ্ধে জয়লাভ করেছিলেন। এই ৎে্রে ইন্দ্র তাকে সহায়তা করেন। অনু ও দ্রুহ্য রাজার সলিল সমাধি হয়। যদু-তুর্বষরা রণ(ে ত্র থেকে পলায়ন করে আত্মর(া করেন। যুদ্ধে জয়লাভ করে সুদাস প্রভূত ধন প্রাপ্ত হন। যমুনাভি মুখে অগ্রসর হয়ে ভেদকে পরাস্ত করেন, অতঃপর সুদাস সরস্বতী নদী তীরে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। অ(ামেধ যজ্ঞের মাধ্যমে নিজের বিজয় ও রাজনৈতিক একাধিপত্য লাভের উৎসব পালন করেন। যৌথবাহিনীর ব্যর্থতা ভরতগোষ্ঠীর উত্থান নিশ্চিত করে।

জাতিগোষ্ঠী বা Tribe হল একটি কঠিন ও বিতর্কিত শব্দ। ইহা প্রায়শঃই অনুন্নত ও দুর্বল অর্থনৈতিক এলাকার নির(র মানুষদের চিহি(ত করতে নৃতত্ত্ববিদরা ব্যবহার করতেন। তবে বর্তমানে সমাজতাত্ত্বিকরা 'অনুন্নত' প্রভৃতি মূল্যবহনকারী শব্দ ব্যবহারে দূর্বলতা ও সমস্যা সম্বন্ধে অবগত। এর মতে জাতিগোষ্ঠী একটি সমাজব্যবস্থাকে চিহি(ত করে এরমধ্যে রাজনৈতিক, ভাষাতাত্ত্বিক, কিছু অষ্পষ্ট এবং পরিবর্তনশীল সাংস্কৃতিক সীমারেখা ও জ্ঞাতিতত্ত্বের উপস্থিতি ও সামাজিক স্তরায়ণের অভাব ল(্যনীয়।

ঋগ্বেদ বর্ণিত বিভিন্ন গোষ্ঠীর মর্যাদা, সমাজচিত্র ও নামকরণ সময়ের সঙ্গে বদলে গিয়েছিল। কিছু গোষ্ঠী লু প্ত, কিছু নতুন গোষ্ঠীর উদ্ভব ও কিছু গোষ্ঠী মিশ্রিত হয়ে যায়। পুরু ও ভরতগোষ্ঠীর মিলনে কুরুবংশের উদ্ভব হয় যারা পূর্বোত্ত(দুটি গোষ্ঠীর সম্মিলিত ভুখন্ড অধিকার করে এদের সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে পাঞ্চাল গোষ্ঠী। মহাকাব্য ও বেদ বিভিন্ন কুরুরাজার উল্লেখ করে যথা—কুরু, পুরু, বিচিত্রবীর্য, ধৃতরাষ্ট্র। ঋগ্বেদে শান্তনুরাজার যজ্ঞে তার গৃহত্যাগী অগ্রজ

দেবাপিঋষি পৌরাহিত্য করেন। উত্তর পশ্চিমের অপর একটি উপজাতি বিশানিনরা শিং যুক্ত শিরস্ত্রাণ পরতেন। তাদের নামের অর্থ হল শিংযুক্ত। পূর্ব কাকুলি স্থানে থাকেন ভালনাসগণ।

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমে, বর্তমান গান্ধার অঞ্চলে গান্ধার সমাধি সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই সমগ্র অঞ্চলটি পরবর্তী হরপ্পীয় সংস্কৃতির মানুষজন দ্বারা অধিকৃত ছিল। এই সমস্ত অঞ্চলে সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নজরে পড়ে, যেমন- বসতি বিন্যাস, বাড়ির প্রকৃতি, মৃৎপাত্রাদি, বস্তুগত সংস্কৃতির অন্যান্য চিহ্ন সমূহ। এই সংস্কৃতির সঙ্গে পঞ্চজনকে চিহ্নিত করা যায়। কিন্তু পশ্চিম সিন্ধু উপত্যকা অঞ্চলের বাসিন্দারা তাদের নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে স্বতন্ত্র ছিল। তবে সরস্বতী-দৃষদ্বতী দোয়াবে মৃৎপাত্র যেমন — হরপ্পীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের প্রতিফলন ঘটায়। রাভীনদী উপত্যকায় ‘H’ আকৃতির কবরের সংস্কৃতির প্রাধান্য ছিল। যা নিম্নসরস্বতী অববাহিকাতেও দেখা যায়।

পুরু এবং ভরতরা ঋগ্বেদের দুটি প্রধান উপজাতি। তাদের সম্পর্কে রচিত ঋগ্বৈদিক স্তোত্র থেকে জানা যায়, প্রথমদিকে তাদের মধ্যে মৈত্রী ছিল, পরে শত্রুতা তৈরী হয়। ঋগ্বেদের বর্ণিত পুরুদের নেতা হলন ত্রসদস্যু। ঋগ্বেদের চতুর্থ মন্ডলের ৪২তম সূক্ত তিনি স্বয়ং আত্ম ও বংশপরিচয় দিয়েছেন তিনি দুর্গহ রাজার পুত্র পুরুকুৎসের যজ্ঞজাত পুত্র। পুরুকুৎস বন্দী হলে তার স্ত্রী যজ্ঞের মাধ্যমে ত্রসদস্যুর জন্মদান করেন। এই স্তোত্রে পুরুকুৎসের শক্তি ও প্রভাবের প্রমাণ মেলে, তাকে ইন্দ্র ও বরুণের সমকক্ষ ও অর্ধদেব ঘোষণার মাধ্যমে। এই স্তোত্রে তিনি একই সঙ্গে রাজা-ঋষি ও দেবতা।

‘ত আয়জন্ত ত্রসদস্যুমস্যা ইন্দ্রনং ন বৃত্রতুরমর্ধদেবম্।।

৪/৪২/৮

ভরতগোষ্ঠীর প্রাচীনতম জ্ঞাত রাজা হলেন বধ্র্যশ্ব (ঋক-৬/৬১/১), তারপুত্র হলেন দিবোদাস। ঋকবেদ দাস শাসক শম্বরের বিরুদ্ধে তার জয় বর্ণনা করেছে। শম্বরের ১০০টি পাহাড়ি দুর্গ ছিল, যার ৭৭টি ইন্দ্রকর্তৃক ধ্বংস হয় ও ১টি দিবোদাসের বসবাসের জন্য ইন্দ্র তাকে দেন। এই দাস ও দস্যুরা অনার্যগোষ্ঠী যাদের সঙ্গে আর্যদের প্রায়শই যুদ্ধ হত। ঋগ্বেদ প্রায় ৩০০টি অনার্য, বিশেষত দ্রাবিড় ও মুন্ডারি শব্দ আছে যাদের ‘Loan Words’ বলা হয়। এগুলি অনার্যদের সঙ্গে আর্যগোষ্ঠীর যোগাযোগ প্রমাণ বহন করে। ঋগ্বেদ বিভিন্ন অনার্য গোষ্ঠী যথা-চুমুরি, ধুনি, পিপরু, শম্বর, প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। আবার অনার্য নামধারী আর্যগোষ্ঠী প্রধান যথা বলবুথা এবং বৃবু এর উল্লেখ আর্য ও অনার্যদের মধ্যে সংস্কৃতিগত মিশ্রণও আদানপ্রদান এর ইঙ্গিত বহন করে। যদু ও তুর্বশ একত্রে ব্যবহৃত হয়েছে। বলা হয়েছে তরুন ইন্দ্র, যদু ও তুর্বশকে দূর দেশ থকে আনয়ন করেছে। যা আর্য অভিপ্রয়াণের ইঙ্গিতবাহী।

‘য আনয়ৎ পরাবতঃ সুনীতী তুর্বশংযদুম্। ইন্দ্রঃস নো যুবা সখা।।

৬/৪৫/১

ঋগ্বেদের ভরতরাজ দ্যৌশান্তি এবং সত্রাজিৎ কে অশ্বমেধযজ্ঞ করতে দেখা যায়। ভরতরাজা কালী ও শতবন্তদের পরাস্ত করে গঙ্গাযমুনা দোয়াবে যজ্ঞ করেছিলেন। এছাড়া দেবশ্রবা ও দেবব্রত নামক ভরতরাজা ও বিখ্যাত ছিলেন। কুরু, পাঞ্চাল, বাস, উশীনর প্রভৃতি উপজাতিরা মধ্যদেশ অধিকার করেছিলেন। ঋগ্বেদের প্রথমদিকে কুরু নেই কিন্তু কুরুশ্রবণ আছেন। অথর্ববেদের ২০তম অধ্যায়ের ১২৭তম শ্লোকের ৭-১০ ঋক, পুরুরাজা পরীক্ষিৎ এর নাম উল্লেখ করে, যার আমলে কুরুরাজত্ব উন্নতি করেছিল। অর্থববেদ পরীক্ষিতের ‘দেব’ ও ‘রাজা বিশ্বজনীন’ উপাধি গ্রহণের উল্লেখ করে। বৈদিক সাহিত্য জনমেজয় নামক কুরুরাজারও উল্লেখ করেছে যিনি পরীক্ষিত পুত্র এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেছেন। তাদের রাজধানী ছিল আসন্দিবৎ বা প্রাচীন হস্তিনাপুর। কুরুরাজত্ব মোটামুটি ভাবে আধুনিক থানেশ্বর, দিল্লি এবং উচ্চ গঙ্গা অববাহিকাতে বিস্তৃত ছিল। ঐতিহাসিক হেমন্দ্রে রায়চৌধুরী বৈদিক বংশতালিকা ও বিবরণকে প্রাচীন ভারতে রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য উপাদান হিসাবে গ্রহণ করেছেন।

পঞ্চালদের উল্লেখ ঋগ্বেদে না থাকলে ও শতপথ ব্রাহ্মণ উল্লেখ করেছে যে পাঞ্চালদের আদি নাম ছিল কৃভি। ঋগ্বেদে কৃভিদের উল্লেখ আছে। পাঞ্চালরাজ ত্রে(ব্য, শোণস্যত্রাসহ অ(্বমেধ যজ্ঞ করেন। দূর্মুখ নামে এক রাজা পৃথিবী জয় করেন। উপনিষদে বর্ণিত জাবালি, পাঞ্চালদের দার্শনিকরাজা। পুরাণ ও মহাভারত পাঞ্চালকে উত্তর ও দ(িণভাগে বিভত্ত(করেছে। পরবর্তীবৈদিক যুগে পাঞ্চালদের উপনিষদে কুরুপাঞ্চালদের একত্রে উচ্চারিত করা হয়। তাদের সংস্কৃতি উন্নতমানের ভাষা খুবই উন্নত। সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ এদের সময়েই রচিত হয়।

বৈদিক উপজাতিদের মধ্যে অন্যতম ছিল সৃঞ্জয়গোষ্ঠী, এদের সঙ্গে তৃৎষুদের যোগাযোগ ছিল। শতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী কুরু ও সৃঞ্জয় গোষ্ঠীরই একজনই পুরোহিত ছিলেন। যজুর্বেদসংহিতা অনুসারে যজ্ঞের ত্র(টির কারণে সৃঞ্জয়ের একরাজা বীতহব্যকে ঋগ্বেদের ষষ্ঠমন্ডলে ভরদ্বাজ ও সুদাসের সমসাময়িক বলা হয়েছে। অর্থববেদের ষষ্ঠ মন্ডলে তিনি জামদগ্নি ও অসিতের সঙ্গে সংযুত্ত(হয়েছেন।

বাশ ও উশীনররা মধ্যদেশে থাকতেন, কু রুপাঞ্চালদের সমসাময়িক রূপে। এরাই পরে ষোড়শমহাজনপদে কাশী বিদেহর পূর্ব সীমা রূপে পরিগণিত হয়। কৌশিতকী উপনিষদ Basas দের মৎস্য মহাজনদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। রাজ্য ছিল এখনকার কৌশাম্বী।

শিবি উপজাতিদের সঙ্গে উশীনরদের যোগ ছিল তারা পাঞ্জাবে চন্দ্রভাগা নদী তীরে অবস্থিত ছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ শিবি রাজাকে অমিত্র তাপন বলছেন। বাশদের সঙ্গে মৎস্য ও মৎস্যদের সঙ্গে শাল্বদের যোগসুত্র পাওয়া যায়। মনুস্মৃতি অনুযায়ী মৎসরা ব্রহ্মর্ষিদেশে বাস করত, শাল্বরা যমুনা তীরে ছিলেন, মহাভারতে কুরু পাঞ্চালেদের সঙ্গে এদের যোগাযোগ ছিল।

ভেদের নেতৃত্বাধীন তিনটিগোষ্ঠী ছিল অজ, শিগ্রু ও য(ু। যমুনা ধীরে সুদাসের সম্মুখীন হয়েছিলেন। এই গোষ্ঠীগুলি সম্ভবত ছিল অনার্য গোষ্ঠী, শিম্যুরা ছিলেন অনার্যগোষ্ঠী যারা সুদাসের নিকট পরাস্ত হন।

ঋগ্বেদের দশম মন্ডলের ৬০তম সূত্তে(র ৪তম ঋকে 'ই(াকু' নামের উল্লেখ পাওয়া যায়, তাকে রাজপুত্র বলা হচ্ছে। পরবর্তী শতপথ ব্রাহ্মণে পুরুকুৎসকে একজন ওকো বলা হয়েছে। এছাড়া বঙ্গীয় উপজাতিগোষ্ঠীদের প্রাচীনতম 'পুন্ড্র' দের উল্লেখ পাওয়া যায় ঐতরেয়ব্রাহ্মণে, যারা পরবর্তীকালে উত্তরবঙ্গে পুন্ড্রনগর (বর্তমান মহাস্থান) অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল।

ঋগ্বৈদিক যুগে যে উপজাতিগোষ্ঠীর বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে একধরনের পশুচারন ভিত্তিক, জ্ঞাতিত্বের প্রাধান্য যুত্ত(প্রাক্রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়, যা ত্র(মশ পরিপূর্ণ রাজতন্ত্রে বিকাশ লাভ করছিল। বৈদিক, ব্রাহ্মণ্য ও মহাকাব্যিয় সাহিত্যে রাজনৈতিক ব্যববস্থার ত্র(মবিকাশ দেখা যায়। তাই বৈদিক উপজাতিগোষ্ঠী আলোচনায় বংশতালিকা সম্পূর্ণ নির্ভুল বা নিরবিচ্ছিন্ন না হলেও তা থেকে যে চিত্র ফুটে ওঠে তা ভারতীয় রাজনৈতিক ইতিহাস রচনায় এক উল্লেখযাগ্য উপদান।

৯.১.১.১.২ বৈদিক সমাজ চিত্র ঃ—

বৈদিক সমাজ জীবন সম্পর্কিত তথ্য অনুসন্ধানের জন্য অনেকাংশে আমাদের বৈদিক আমাদের বৈদিক সাহিত্যভান্ডারের ওপর নির্ভর করতে হয়। বৈদিক সমাজের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল পরিবার বা কুল। এই পরিবার ব্যবস্থা নিঃসন্দেহে ছিল পিতৃতান্ত্রিক, পরিবারের প্রবীণতম পুরুষ পারিবারিক জীবন পরিচালনা করতেন। বৈদিক পরিবার চরিত্রে যৌথ বা একান্নবর্তী ছিল। পিতা ছিলেন পরিবারের প্রধান, এছাড়া তার যৌথ তার সন্তান সন্ততি এবং পরবর্তী প্রজন্মে সন্তান সন্ততিরাও পরিবারের অঙ্গীভূত ছিলেন।

বৈদিক সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য ছিল চর্তুবর্ন ব্যবস্থা যার প্রাচীনতম উল্লেখ পাওয়া যায় ঋগ্বেদে। পুরুষ সূত্ত(অনুসারে চারবর্নের উৎপত্তি আদি পুরুষের বিভিন্ন অঙ্গ থেকে হয়েছিল। মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে রাজন্য, উরুযুগল থেকে বৈশ্য এবং পা থেকে শূদ্রের উদ্ভব হয়। এর থেকে মনে হয় যে চর্তুবর্ণ প্রথা বৈদিক আমলেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তবে সম্ভবত এই বিভাজন জন্মভিত্তিক না হয়ে কর্ম ভিত্তিক ছিল। একটি কথা এই প্রসঙ্গে অত্যন্ত প্রনিধানযোগ্য যে দশম মন্ডল ছিল অনেক পরবর্তীকালের রচনা। পুরুষ সূত্ত(ব্যাতীত অন্যত্র চর্তুবর্ণের উল্লেখ অত্যন্ত বিরল। ঋগ্বেদে বর্ণ দুটি আর্যবর্ণ ও দাসবর্ণ দাসবর্ণের যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, যেখানে তাদের বলা হয়েছে "কৃষ(ত্বাচ" বা কৃষ(গাত্র বর্ণের। ফলে অনুমেয় যে ঋগ্বেদে বর্ণ ভিত্তিক ব্যবস্থা চর্তুবর্ণকে নির্দেশ করেনি। ঋগ্বেদের অপর একটি সূত্তে(উল্লেখ করা হয়েছে যে এক ব্যত্তি(র পরিচয় হল তিনি কবি তার পিতা চিকিৎসক (ভিষক), মাতা শস্যপেষিকা (উপল প্রে(নী)। অর্থাৎ বংশানুত্র(মিক বৃত্তি অনুসরণের নিয়ম সম্ভবত ঋকবেদে ছিল না । তাই কেবলমাত্র পুরুষ সুত্তে(র ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ যথা নয় যে, ঋকবৈদিক যুগে বর্ণব্যবস্থা মূলক বহুল প্রচলিত ছিল।

অন্যদিকে সামাজিক সংগঠন হিসাবে বর্ণ অপে(া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল জন, গণ, বিশ প্রভৃতি শব্দগুলি। এই শব্দগুলি কৌম সংগঠনের আভাস দেয়, কৌমের জীবন ছিল অপে(াকৃত সহজসরল। সম্ভবত পশুচারণ ভিত্তিক সমাজ, খাদ্য সম্ভার সকলের মধ্যে বন্টিত হত। কৃষিজীবী সমাজ জমির অধিকারকে কেন্দ্র করে যে সামাজিক বৈষম্য থাকে, ঋগ্বেদের যুগেতা অনেক কম ছিল বলে রামশরণ শর্মার অভিমত। অন্যদিকে সুবীরা জয়সওয়াল মনে করেন, বর্ণভিত্তিক না হলেও ঋগ্বেদের সমাজে সামাজিক ব্যবধান ছিল। মঘবন শব্দের মাধ্যমে সমৃদ্ধ ব্যত্তি(দের অস্তিত্বও অপে(াকৃত দরিদ্রশ্রেণীর অস্তিত্ব প্রমাণ করে। রোমিলা থাপার একসঙ্গে মনে করেন ঋগ্বেদিক সমাজে রত্ত(সম্পর্কের বর্হিভূত শ্রমের ব্যবহার করা হত না। বয়স্করা অনুজ প্রজন্মের ওপর নির্ভরশীল হতেন। তিনি এটিকে Lincage system বলে মনে করেছেন। কোন কোন মার্কসীয় ঐতিহাসিক ঋগ্বেদে শ্রেনী সুলভ বিভাজন উপস্থিতির কথা বললেও সম্ভবত বর্ণব্যবস্থা এই সমাজে সেভাবে বিকশিত ছিল না।

ট্রাইব (Tribe) বা ক্ল্যান (Clan) জাতীয় কৌমের উপস্থিতি ঋগ্বেদে পাওয়া যায়, তার উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এই জাতীয় সমাজ গবাদি পশু লুন্ঠনকে কেন্দ্রকরে যুদ্ধ বিগ্রহের প্রায়শঃই বর্ণনা পাওয়া যায়। পাশাপাশি আর্যবর্ণ ও দস্যুবর্ণের মধ্যেও লড়াই ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। ঋগ্বৈদিক রাজনৈতিক ব্যবস্থায় 'রাজা' শব্দের বহুল প্রয়োগ করা হলেও যেটি পূর্ণ রাজতান্ত্রিক অর্থে সেভাবে ব্যবহৃত হত না ঋগ্বৈদিক রাজা হলে 'বিশপতি' তিনি বিশ বা কৌমের প্রধান বা দলপতি, এছাড়া তাকে বলা হয়েছে 'গোপতি' কৌম বা গোষ্ঠীর প্রধান হিসাবে তাঁর ভূমিকা স্বীকৃত হলেও জন বা বিশ কখনও প্রজা নয়। নৃতাত্ত্বিক গবেষণা অনুসারে কৌমের দলপতি যুদ্ধে নেতৃত্ব দেন এবং লুন্ঠিত দ্রব্যের বন্টন করেন। সেখানে তিনি 'বলি' নামক নিজস্ব লুন্ঠিত দ্রব্যের অংশ গ্রহণ করলেও তা কখনই করব্যবস্থার সমতুল নয়। পাশাপাশি, ঋগ্বেদের রাজাকে কখনই ভূপতি, নরপতি প্রভৃতি উপধিতে ভূষিত করা হয়নি। এছাড়া বিদথ নামক প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। রামশারন শর্মার মতে বিদথে উপস্থিত থাকতেন রাজা ও বিশ এর সদস্যবৃন্দ। বিদথএ যুদ্ধ এবং রাজনৈতিক বিষয় আলোচিত হত, এমনকি লুন্ঠিত দ্রব্য এখানেই বন্টিত হত। ঋগ্বেদিক রাজনৈতিক ত্রি(য়া কলাপের মধ্যে সুদাসের বিরুদ্ধে দশরাজ্ঞ যুদ্ধ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

পরবর্তীবৈদিকযুগে সামাজিক ব্যবস্থায় উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ল(করা যায়। স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজের প্রকাশের সাথে সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। বর্ণব্যবস্থা ত্র(মশ চর্তুবর্ণ ব্যবস্থার সমতুল হয়ে ওঠে ব্রাহ্মণ, (ত্রিয় ও বৈশ্যের বর্ণগত মর্যাদা শূদ্রের তুলানায় অনেক বেশি প্রতিপন্ন হয়। এই তিন বর্ণ দ্বিজনামে পরিচিত এরা, উপনয়নের অধিকারী শূদ্রের কাজ এই তিনবর্ণের সেবা করা। পরবর্তী বৈদিক যুগে যজ্ঞভিত্তিক ধর্ম গুরুত্বলাভ করায় ব্রাহ্মণদের মর্যাদা ও প্রতিপত্তি প্রবলভাবে বৃদ্ধি পায়। ব্রাহ্মণরাই অ-ব্রাহ্মণ ও দেবতাদের মধ্যে সংগের র(াকারীর ভূমিকা পালন করতেন পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য সমূহ এই ব্রাহ্মণদের দ্বারাই রচিত।

(ত্রিয়দের স্থান ব্রাহ্মণদের ঠিক পরেই ছিল। এই সময় রাজকীয় শত্তি(র বিন্যাসের ব্যপক পরিবর্তন ল(্য করা যায়। ‘রাজা’-র উপাধি সম্রাট ও একরাট হিসেবে পরিচিত হয়। পরবর্তী বৈদিক শাস্ত্রে দেখা যায় রাজসূয়, বাজপেয়, অ(েমেধ যজ্ঞ করে শাসক (ত্রিয় রাজা ব্রাহ্মণদের ভূমি দান করন। ‘(ত্র’ শব্দটির অর্থ শত্তি(। (ত্রশত্তি(অধিকারী হবার সুবাদে রাজা (ত্রিয় বলে সুবিদিত। শাসকের উপাধিগুলি তার (মতা বৃদ্ধির ইঙ্গিতবাহী বলে মনে হয়। পাশাপাশি শাসকের সহায়ক হিসেবে ‘রত্নিন’ দের উপস্থিতি ল(্য করা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন সেনানী (সেনাবাহিনী চালক), ভাগদুঘ (রাজকীয় অংশ যিনি ভাগ করেন), অ(বাপ (রাজকীয় পাশা যার হেফাজতে থাকে)। কেউ কেউ এই রত্নিনগোষ্ঠী মধ্যে মন্ত্রী পরিষদ ব্যবস্থার উপস্থিতি দেখেছেন। বৈশ্যরা তৃতীয় শ্রেণী ছিল যারা ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বলিকৃৎ (শাসকের জন্য বলি জাতীয় আদায় উৎপাদনকারী) (ত্রিয়ের সঙ্গে বৈশ্যের সম্পর্ক হল হরিণের সঙ্গে যবের মত, খাদক ও খাদ্যের সম্পর্ক। অর্থাৎ বৈশ্যের প্রধান কাজ শাসকের জন্য বলি উৎপন্ন করা। তাকে শাসক ইচ্ছামত উৎখাত বা শোষণ করার অধিকারী ছিলেন। তবে সমাজের সবচেয়ে নিম্নস্তরে অবস্থান ছিল শূদ্রদের অবস্থান। তাদের একমাত্র কাজ হল উর্দ্ধতন তিন বর্ণের সেবা করা। রামশরণ শর্মার মতে, বৈশ্য হল ধনোৎপাদক শ্রেণী তাকে বলিকৃৎের পর্যায়ে অবদমনকরলে এবং শ্রমের উৎস শূদ্রদের হীনতম দেখানো সম্ভব হলে উচ্চতর দুইবর্ণের প(সমাজর নিয়ন্ত্রণ রাখা সহজতর হবে। ফলে তাদের হীনতর দেখানোর প্রয়াস পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয় উৎপাদন প্রত্রি(য়ায় সরাসরি যুত্ত(না থেকে ও উৎপাদক ব্যবস্থাকে এই ভাবে নিয়ন্ত্রণ করেছেন।

অন্য দিকে রাজকীয় (মতা যাতে মাত্রাছাড়া পর্যায়ে না চলে যায়, সেই কারণে পরবর্তী বৈদিকযুগে সভা সমিতি নামক দুটি প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ পাওয়া যায়। অথর্ববেদে সভা ও সমিতিকে প্রজাপতির দুই কন্যা বলে অভিহিত করা হয়েছে। কাশীপ্রসাদ জয়সলওয়াল এগুলিকে দ্বিক(বিশিষ্ট ব্যবস্থার সঙ্গে তুলনা করেছেন। তবে তথ্য অনুসারে সভা ছিল মঘবন বা সম্পন্ন মানুষদের প্রতিষ্ঠান এবং সমিতিতে কৌমের সকলেই যোগদিতেন। এখানে কৌমের যাবতীয় সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। এমনকি দলপতিকে (মতাচ্যুত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া যেত।

এইভাবে দেখা যায় বৈদিকযুগে ত্র(মশ একটি কৌমভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থার দিকে পরিবর্তন বৈদিক সাহিত্য থেকে প্রতিফলিত হয়, যা পরবর্তীকালে শত্তি(শালী রাষ্ট্র গঠনের উল্লেখযোগ্য পদ(েপ ছিল।

৯.১.২.২ — গোষ্ঠীতন্দ্র থেকে রাজতন্ত্র ঃ—

বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় আমরা একটি কৌমভিত্তিক সমাজচিত্র দেখেতে পেলাম যা ত্র(মশ একটি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জটিল সমাজ ব্যবস্থার রূপ পরিগ্রহ করছিল। মহাকাব্যগুলির বিশ্লেষণ করলে আমরা একটি কৌমভিত্তিক সমাজের ত্র(মশ রাজতান্ত্রিক দিকে পরিবর্তন ল(্য করতে পারি।

৯.১.২২.১ — মহাকাব্যের সমাজচিত্র ঃ—

ভারতীয় ঐতিহ্যে প্রধান দুই মহাকাব্য মহাভারত ও রামায়ণ। এগুলি মূলত মহাকাব্য হলেও এই মহাকাব্যগুলি থেকেও ভারতীয় সমাজ ও তার পরিবর্তনশীল চিত্র আমাদের চোখে ফুটে ওঠে। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে, মহাকাব্যের তথ্যসূত্র

মৌর্য বা গুপ্ত রাজবংশের ইতিহাসের মত না হলেও এই কাব্যগুলির ঐতিহাসিক ঐতিহ্য অস্বীকার করার মত নয়। ঐতিহাসিক রায় চৌধুরী তাঁর 'Political Hitory of Ancient India' গ্রন্থে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসের সূত্রপাত করেছিলেন পরী(্ৎ এর রাজত্বকাল থেকে। তিনি দেখিয়েছিলেন পরী(্ৎ গাঙ্গেয় উপত্যকার একটি বৃহৎ অঞ্চলে আধিপত্য স্থাপন করতে পেরেছিলেন। তাই এই কারণে মহাকাব্যের বর্ণিত সমাজের আলোচনা করা বাঞ্ছনীয়।

চিরাচরিত রীতিতে রামায়ণকে প্রাচীনতর মহাকাব্য মনে করা হলেও ঐতিহাসিকগণ ভাষাশৈলী ও সমাজব্যবস্থার চিত্র বিশ্লেষণ করে মহাভারতকেই প্রাচীনতর মহাকাব্য বলে চিহ্নি(ত করেছেন। ঐতিহাসিক E. W. Hopkins মহাভারতের বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছিলেন যে মহাভারত কোন একটি নির্দিষ্ট সময়ের রচনা নয়, বরং একটি bardic tradition অর্থাৎ চারণকবি দের দ্বারা গীত বীরগাথামূলক কাহিনী, ত্র(মশ সময়ের সঙ্গে বিভিন্ন উপকাহিনীর সংমিশ্রণে একটি বিশাল মহাকাব্যের রূপ পরিগ্রহ করেছিল। সেই কারণে ঐতিহাসিক Hopkins, Romila Thapar প্রমুখ সঠিকভাবেই বিশ্লেষণ করেছেন যে মহাকাব্য কোন একজন রচিয়তার দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সময়ের রচনা নয়, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে তার মধ্যে সংযোজন বিয়োজন চলেছে, যদিও মূলকাহিনী (Core Story) অপরিবর্তিত রেখে। ঐতিহাসিকরা মহাভারতের কাব্যকে Core epic (মূলমহাকাব্য) এবং Pseudo epic এই দুই ভাগেভাগ করেছেন। Core epic এর আলোচনা করতেন দেখা যায় সেখানে একটি প্রাচীনতর সমাজচিত্র ফুটে উঠেছে।

মূল মহাকাব্যের আলোচনা করলে আমারা একটি কৌমভিত্তিক প্রাচীন সমাজ দেখতে পাব। মূলকাব্য ছিল হস্তিনাপুর এর শাসককূল কুরুবংশের দুই বিবাদমান গোষ্ঠী কৌরব এবং পান্ডবদের দ্বন্ধ ফুটে ওঠে। মহাভারতর পরিস্থিতি একটি clan-based society চিত্র বহন করে। কুরুবংশের অভ্যন্তরীণ বিবাদ হলেও আমরা কিন্তু কুরুদের দূরসম্পর্কর আত্মীয় যদুবংশের বীর কৃষ(কে মহাভারতের চালিকাশক্তি(রূপে দেখি। পাশাপাশি, ল()্য করল দেখা যাবে, মহাভারতের বিবদমান যুদ্ধরতগোষ্ঠীগুলি কিন্তু কোন না কোন ভাবে পরস্পর রক্তে(র বা পারিবারিক সম্পর্কে আবদ্ধ এবং যুদ্ধের কারণ কিন্তু পারিবারিক সম্পত্তির উত্তরাধিকার। এ(্ত্রে ল()্যনীয় রাজনৈতিক উত্তরাধিকার বা বংশানুত্র(মিক জ্যেষ্ঠপুত্রের সিংহাসন পাবার অধিকার মহাভারতে থাকলেও তা কিন্তু দৃঢ় নয়। পাশাপাশি শাসক রাজা কিন্তু কুরুবৃদ্ধদের অর্থাৎ জ্যেষ্ঠদের সম্পূর্ণ অমান্যে করতে পারে না।

প্রকৃতপ(্ মহাভারত ছিল একটি স্থানীয় গোষ্ঠীভিত্তিক বিবাদ। যার প্রকৃত যুদ্ধটি একটি ছোট অঞ্চলে সংগঠিত হয়। কিন্তু পরবর্তীকালে সেটি সর্বভারতীয় রূপ পরিগ্রহ করে। পূর্বে বর্ণিত এর মধ্যে ও বিভিন্ন স্তর ল()্য করা যায়। মহাভারতের প্রাচীনতর অংশের কার্যকলাপের মধ্যে বর্ণিত রাজসূয় যজ্ঞের বিবরণের অংশের কার্যকলাপের মধ্যে বর্ণিত রাজসূয় যজ্ঞের বিবরণের মধ্যে কৌমসমাজের পট্‌লাজ ব্যবস্থার পরিস্থিতি ঐতিহাসিকরা বর্ণনা করেছেন। যেখানে গোষ্ঠীপতিরা নিজেদের জমকালো অনুষ্ঠানের মাধ্যমে নিজেদের শক্তি(জাহির করতে চাইতেন। আবার, পাশাখেলা এবং সেখানে বাজি ধরার প্রবণতা একটি প্রাচীনতর সমাজের সমাজচিত্র বহন করে। পাশাপাশি পাশা খেলায় স্ত্রী বা ভ্রাতাদের বাজি ধরা, দৌপদীর বস্ত্রহরণের মত ঘটনা একটি আদিম সমাজের প্রতিভূ ছিল বলে মনে হয়।

মহাভারতের সমাজচিত্র পর্যালোচনা করতে গিয়ে বিভিন্ন স্তরায়ণের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এপ্রসঙ্গে গিয়ে বিভিন্ন স্তরায়ণের কথা আমরা আগেই উল্লেখ করেছি। এপ্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে যুদ্ধরত পরিবারের পূর্বসূরী শান্তনুর উল্লেখ ঋকবেদে দশমমন্ডল পাই, অন্য দিকে যর্জুবেদে কুরু-পাঞ্চালের মধ্যে যুদ্ধ এবং সন্ধির বিবরণ ও মেলে। এই যুদ্ধই মহাভারতের যুদ্ধ কিনা, তা বলা কঠিন। তবে, একথা বলাই যায় যে পান্ডবরা পাঞ্চালদের সমর্থন ছাড়া শক্তি(হীন ছিল। মহাভারতের যে সমাজব্যবস্থা তাতে জমির ওপর কৌমের অধিকার ছিল। তবে পরবর্তী পর্যায়ে অর্থাৎ Pseudo-epic অর্থাৎ নবীনতর অংশে রাজতান্ত্রিক আদর্শের বিবরণ মেলে। শান্তিও অনুশাসন পর্বে যে শাসন ব্যবস্থার চিত্র পাই তাতে একটি সুগঠিত রাজতান্ত্রিক আদর্শ ফুটে ওঠে। ঐতিহাসিকদের মতে মহাভারতের রচনা ছিল C.4th

Century BCE-C.4th Century CE। ঐতিহাসিক B.B. Lal প্রমুখ মনে করন, মহাভারত যুদ্ধের সময়কাল C.900 BCE, চারণকবিদের দ্বারা গীত হয়ে, বীরগাথামূলক কাব্য হিসাবে পরিচিতি পেয়ে পরে মহাকাব্যের রূপ নেয় উত্ত(সময়ে। সেখানে সময়ের সঙ্গে মহাকাব্য পরিবর্তিত সমাজকে সঙ্গে বহন করে। সমাজের পরিবর্তনশীল রূপ এখানে ফুটে ওঠে।

পাশাপাশি রামায়ণের ভাষাশৈলীর দিকে নজর করলে ল(্য করা যায়, অপে(াকৃত সংগঠিত সমাজ রামায়ণে ফুটে ওঠে। পাশাপাশি মহাভারতের কেন্দ্রস্থল যেখানে কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চল, সেখানে রামায়ণে কেন্দ্রস্থল যেখানে কুরু-পাঞ্চাল অঞ্চল, সেখানে রামায়ণে কেন্দ্রভূমি অনেকটাই পূর্বদিকে মিথিলা এবং কোশল। ল(্যনীয় হল এখানে শাসকদের শক্তি(বহুগুণে বৃদ্ধি পেয়েছে এবং রাজতন্ত্র শক্তি(শালী তাই মহাভারতের তুলনায় রামায়ণে গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থা রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হতে দেখি আমরা। ঐতিহাসিকরা এই কারণে রামায়ণের সমাজকে আধুনিকতর এবং উন্নততর বলে বর্ণনা করেন। যদিও এটিও দীর্ঘকাল ধরে রচিত হয়েছিল। এর রচনা কাল ছিল C.2nd Century BCE to C.2nd Century CE। এখানে আমরা জনককে বাজপেয় যজ্ঞ করতে দেখি যা তে মহারাজধিরাজ হওয়া যায়। সেইদিক দিয়ে বলা যায়, মহাকাব্যে সমাজ অধ্যয়ন করলে Chiefdom থেকে Kingdom এর দিকে যাত্রা চোখে পড়া সম্ভব।

৯.১.২.২.২ — গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থার বির্বতন ঃ—

ঋকবৈদিক যুগের যে সমাজও অর্থনীতির কথা আমরা জানি তা ছিল মূলত পশুচারণ ভিত্তিক এবং কৌমকেন্দ্রিক সমাজ। পাশাপাশি রাজা সেখানে গোষ্ঠী প্রধান এবং মূলত গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিলেও তিনি সর্বেসবা নন। কিন্তু পরবর্তী বৈদিকযুগ থেকে সেই ধারনার পরিবর্তন হয়। পাশাপাশি আর্যবর্ণ এবং দাসবর্ণের পরিবর্তে চর্তুবর্ণ প্রথার উদ্ভব দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ভৌগোলিক ব্যপ্তি(র নিরিখে বৈদিক সভ্যতার কেন্দ্র যেখানে ছিল পাঞ্জাব এলাকা ও উত্তর পশ্চিম সীমান্ত সেখান মহাভারত মহাকাব্যের মূলভূখন্ড হল Western Ganga Valley আবার শতপথ ব্রাহ্মণের কাহিনীতে মাঠব বিদেহা, গন্ডক নদীর পশ্চিমপাড় অবধি অগ্রসর হয়েছিলেন। অন্যদিকে রামায়ণের মূলভূখন্ড হিসাবে আমরা দেখি কোশল এবং মিথিলাকে যা আরো পূর্ববর্তী ভুখন্ড অর্থাৎ গোষ্ঠী তান্ত্রিক ব্যবহার বির্বতনের আলোকে ভৌগোলিক পরিবর্তনের দিকটি মাথায় রাখা জরুরী।

পূর্ববর্তী সময়ে গোসম্পদকে কেন্দ্রকরে যুদ্ধের প্রবণতা দেখা যায়। ‘গবিষ্টি’ যার অর্থ গো অন্বেষণ সেটি যুদ্ধের সমার্থক ভাবে ব্যবহৃত হত কিন্তু গাঙ্গেয় উপত্যকায় বসতি বিস্তারের সঙ্গে কৃষিকার্যের বিকাশ ঘটতে দেখি আমরা। গাঙ্গেয় ভূমিতে ত্র(মশ গমচাষের থেকে ধান এবং মোষ পালনের প্রবণতা দেখা যায়। পাশাপাশি, কৃষির ব্যাপক বিস্তারের ফলে খাদ্য সমস্যা নিরসন হলে বিবিধ শিল্প, মৃৎশিল্প প্রভৃতিতে ত্র(মশ দ(শিল্পী তৈরী হয়। বৈদিক এবং পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষিভিত্তিক সমাজগুলি বিভিন্ন সুনিদিষ্ট সংস্কৃতি দ্বারা নির্নীত হত। পশ্চিম গাঙ্গেয় ভূমিতে PGW (Paint Grey Ware) মৃৎপাত্র সংস্কৃতিক এবং মধ্য ও পূর্বাংশে BRW (Black and Red Ware) সংস্কৃতি থাকতে দেখা যায়। এইভাবে সংস্কৃতিগত দিক দিয়ে একটি পশুচারণের অর্থনীতি কৃষি অর্থনীতি রূপ গ্রহণ করে সঙ্গে বিভিন্ন তৈজসপত্র ও অন্য শিল্পদ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে।

প্রাথমিক কৌমভিত্তিক গোষ্ঠীগুলি পিতৃতান্ত্রিক গোষ্ঠী ছিল রাজা প্রথমদিকে কেবলমাত্র একজন নেতা (Leader) ছিলেন সামাজিক প্রথা এবং যুদ্ধে নেতৃত্ব দানের জন্য যোগ্যতমকেই হিসেবে নির্বাচিত করা হত। ‘বিদথে’ লুন্ঠিত দ্রব্যের ভাগের সময় চারণকবিরা Chief এর স্তুতি করতেন এবং বিনিময়ে তারা দানগ্রহণ করতেন। প্রাথমিকভাবে মহাভারত ও ছিল চারণকবিদের দ্বারা গীত বীর গাথা। এর প্রাথমিক নাম ‘জয়’ বা ‘জয়গাথা’। এই চারণকবিদের যে প্রধান যত বেশি দান প্রদান করতেন, তিনি তত শক্তি(শালী বলে বিবেচিত হতেন। সঙ্গে ছিল দ(িণার ধারণা।

ত্র(মশ সময়ের সঙ্গে রাজতন্ত্রের শক্তি(বৃদ্ধি পেতে থাকে কিংবদন্তীর আশ্রয় করে বলা হয় দৈত্যদের পরাস্ত করে দেবতারা রাজারূপে ইন্দ্রকে মেনে নেন। প্রাথমিক ভাবে নেতা রূপে চিহি(ত 'রাজা' থেকে ত্র(মশ পরবর্তী Sacrificial ritual এর যুগে 'King' বা (মতাশালী রাজারূপে আত্মপ্রকাশ করছেন দুটি পর্যায়ের মধ্য দিয়ে।

প্রথমত ঃ— পুরোহিতরা যজ্ঞের আচারের মাধ্যমে তাঁকে কেবল সাধারণের উর্ধ্বেস্থান দিচ্ছেন তাই নয়, বরং তাকে দৈব অধিকার প্রদান করা হচ্ছে।

দ্বিতীয়ত ঃ— এই পর্যায়ে রাষ্ট্রগঠনের প্রত্রি(য়ার মাধ্যমে গোষ্ঠীভিত্তিক ব্যবস্থার পরিবর্তন হয় নির্দিষ্ট ভূমি ভিত্তিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে।

প্রাথমিকভাবে রাজা যুদ্ধে বা লুণ্ঠনে নেতৃত্বদিতেন এবং লুন্ঠিত সামগ্রীর একাংশ 'ভাগ'/হিসাবে গ্রহণ করতেন, তাছাড়া কোন করদেবার বিষয় ছিলনা। পুরোহিত তন্ত্র প্রভাব বিস্তার করে বৃহৎ যজ্ঞনুষ্ঠানের প্রভাব বৃদ্ধি পেলে রাজা যজ্ঞের পৃষ্ঠপোষক রূপে আত্ম প্রকাশ করছেন। সে(ত্রে রাজা এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে সম্পর্ক এবং শ্রেষ্ঠত্বের দ্বন্ধ দেখা যাচ্ছে। বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ মূখ্য ভূমিকা নিচ্ছেন। তবে মহাভারতে রাজা বা (ত্রিয় বর্ণশ্রেষ্ঠ বলা হচ্ছে। সেখানে ত্র(মশ Chief দের বংশানুত্র(মের পরিবর্তে বৃহৎ এবং প্রভাবশালী বংশের ধারণা এই রাজতন্ত্রের সঙ্গে যুক্ত(করা হচ্ছে।

এবার Chiefship কোন একটি নিদিষ্ট ভৌগলিক অঞ্চলক কেন্দ্র করে বসতি স্থাপন করছে। রাজার শাসন একটি নিদিষ্ট ভুখন্ডের সঙ্গে জাতির হবার ফলে রাজার উপাধি হয়ে যাচ্ছে ভুপতি (Bhupati) গোষ্ঠীভুক্ত(অন্যপরিবারগুলি গ্রামে বসতি স্থাপন করে। এই গ্রাম এবং রাজধানীর সমন্বয়ে জনপদ গড়ে ওঠে যার অর্থ হল Jana (জন) বা tribe যেখানে পদ বা পা রেখেছে। এই জনপদগুলি নামকরন হয় তার শাসক গোষ্ঠীর নামে। একটি Clan বা গোষ্ঠী যেমন মদ্র, আছে। পরবর্তীতে কুরুপাঞ্চালের জোটের কথা জানত পারা যায়। পাশাপাশি রাজাকে সহায়তা করতে প্রধান পুরোহিত এবং সেনানীর মত পদ গড়ে উঠতে দেখা যায়। এর সঙ্গে রত্নিনদের ধারণাও পাওয়া যায়।

কিন্তু অনুষ্ঠান গোষ্ঠীপতিদের অবস্থানকে হিসাবে স্থাপিত করতে ব্যবহৃত হত। গোষ্ঠী প্রধান অভিষিক্ত(হলে, তিনি একবৎসর ব্যাপী রাজসূয় যজ্ঞ আয়োজন করতে পারতেন। এখানে রাজা আনুষ্ঠানিকভাবে পুর্নজীবিত হতেন। পাশাপাশি ১২ জন রত্নিন (Ratin) দের রাজার আনুগত্যের জন্য উপহার দিতে হত। পাশাপাশি প্রাচীন সাধারন অ(্বমেধ যজ্ঞ রাজার (মতা প্রদর্শনের প্রধান মাধ্যমে পরিণত হয়। পাশাপাশি বর্ণব্যবস্থা কঠোর করা হয়, বৈশ্য ও শূদ্রদের অবস্থান অবনতি হয়। বংশানুত্র(মিক রাজতন্ত্রের সঙ্গে বর্ণ ব্যবস্থা বংশানুত্র(মিক রূপ পরিগ্রহ করে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই, প্রাক 6th century BCE সময়কালের মধ্য গাঙ্গেয় অঞ্চল গোষ্ঠী তান্ত্রিক ব্যবস্থা ত্র(মশ পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। অর্থনৈতিক অবস্থার বিবর্তন, রাজনৈতিক পরিকাঠামোয় বদলে আনে। ধর্মীয় ((ত্রে জটিল যাগযজ্ঞ কেন্দ্রিক ধর্মের উত্থান ব্রাহ্মণধর্মের মূলভিত্তি হয় ওঠে এবং এই ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষক হিসাবে গোষ্ঠী পতিরা প্রাধান্য পায়, ফলে তারা বিভিন্ন , যজ্ঞানুষ্ঠান ব্রাহ্মণদের সহায়তা লাভকরেন। নির্দিষ্ট ভুখন্ড ভিত্তিক জনপদের শাসক হিসাবে রাজাতন্ত্রের উত্থান আমাদের দৃষ্টি গোচর হয়। এই প্রাথমিক রাজতন্ত্র দ্বিতীয় নগরায়ণের সময়ে শক্তি(শালী রাষ্ট্রব্যবস্থা রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৯.১.৩.৩. গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগর ও রাষ্ট্রগঠন ঃ—

ভারত ইতিহাসের খ্রিষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্ঠপূর্ব চতুর্থ শতক গাঙ্গেয় উপত্যকায় ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসে। বাস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তন, কৃষি সভ্যতার বিস্তার এবং গোষ্ঠীতান্ত্রিক ব্যবস্থা ত্র(মশঃ রাজতন্ত্রে রূপান্তর এবং সুগঠিত শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠা প্রভৃতির থেকে মধ্যগাঙ্গেয় অঞ্চলে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে উঠতে থাকে। পাশাপাশি, প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক তথ্য সূত্র এই অঞ্চলগুলিতে নগরের উত্থাণের সা(্য বহন করে। মূলত বাণিজ্য ক্লিপ্লবকে সঙ্গী করে গাঙ্গেয়

উপত্যকায় অঙ্গুওর নিকায় এবং জৈনগ্রন্থ ভগবতীসূত্র থেকে উত্তর ভারতে ষোলটি রাজনৈতিক শত্তি(র উত্থান দেখা যায়। অঙ্গুওরনিকায় (Anguttaranikaya) ষোড়শ মহাজন পদের উল্লেখ পাওয়া যায়। যেকোন এলাকাই জনপদনয়, জনবসতি অধ্যুষিত, অর্থাৎ জন বসতির প(অনুকূল অঞ্চলই জনপদ। পাশাপাশি সেটি একটি ভৌগোলিক এলাকা যা রাজনৈতিক শত্তি(র অধীন।

৯.১.৩.৩.১ — ষোড়শ মহাজনপদ সংত্র(ান্ত ধারণা ঃ—

মধ্যগঙ্গেয় উপত্যকায় যে সমস্ত জনপদ গড়ে উঠছিল, সেই সমস্ত জনপদগুলি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। এই জনপদ বা মহাজনপদগুলির অনেকগুলি ছিল উত্তরপ্রদেশ এবং বিহার সন্নিহিত অঞ্চল, এছাড়া অন্যত্রও এই জনপদগুলির বিস্তার হয়েছিল। এই জনপদগুলি ছিল

(১) কাশী ঃ— এই মহাজনপদের রাজধানী বারানসী, এটি বারন এবং অসি নদীর সঙ্গম স্থলে অবস্থিত। এটি বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বারানসী ও সন্নিহিত এলাকা। এটি একটি Continous site.

(২) কোশল ঃ— উত্তরপ্রদেশের ল(্নৗ, গোন্ডা, ফৈজাবাদ প্রভৃতি এলাকা জুড়ে এই মহাজনপদের বিস্তার, এর রাজধানী শ্রাবস্তী। রামায়নের কেন্দ্রস্থল ছিল এই কোশল রাজ্য, সমৃদ্ধরাজ্য রূপে এটি আত্মপ্রকাশ করেছিল। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে, শ্রাবস্তী বর্তমানে সাহেত-মাহেত অঞ্চল ছিল এর কেন্দ্র।

(৩) অঙ্গ ঃ— অঙ্গরাজ্যের অবস্থান বর্তমান বিহারের পূর্বাংশে এর রাজধানী ছিল চম্পা, বর্তমান ভাগলপুরের নিকট ছিল এর অবস্থান।

(৪) মগধ ঃ— ষোড়শ মহাজনদের মধ্যে অন্যতম প্রধান মহাজনপদ হল মগধ। এর অবস্থান ছিল দ(িণ বিহারে। এর প্রথম রাজধানী রাজগৃহ গিরিব্রজ। পরে তা স্থানান্তরিত হয় পাটলিপুত্রে। এই পাটলি পুত্রে। এই পাটলিপুত্রই পরবর্তীকালে ভারতে শত্তি(কেন্দ্রে পরিণত হয়। বর্তমান পাটনা হল অতীতে পাটলিপুত্র।

(৫) বৃজি ঃ— বৃজি ছিল অন্যতম অরাজনৈতিক জনপদ। যেগুলি গণরাজ্য নামে পরিচিত। এর অবস্থান ছিল উত্তর বিহার থেকে নেপালের তরাই অঞ্চল অবধি বিস্তৃত। এর রাজধানী ছিল বর্তমান মুজফ্‌ফরপুরের নিকট অবস্থিত বৈশালী। বৃজিসংঘ অনেকগুলি গোষ্ঠী গড়ে তোলে লিচ্ছবিরা তাদের অন্যতম।

(৬) মল্লঃ— অন্য একটি অরাজনৈতিক জনপদ ছিল মল্ল। এর রাজধানী প্রাচীন পাবা। বুদ্ধ এই মল্লরাজ্যেরই কুশীনগরে পরিনির্বান লাভ করেন। পাবা হল বর্তমান বিহারে পাওয়া পুরী। নয়টি মল্লগোষ্ঠী একগোষ্ঠী একজোট হয়ে এই জনপদ গঠন করেছিল।

(৭) চেদী ঃ— বর্তমান মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর ও সন্নিহিত এলাকাতে প্রাচীন চেদীরাজ্যের অবস্থান। এর রাজধানী ছিল সুত্তি(মতী।

(৮) বৎস ঃ— বৎস মহাজনপদটি গড়ে ওঠে, বর্তমান এলাহাবাদ ও সংগ্লন অঞ্চল জুড়ে। এর রাজধানী ছিল কৌশাম্বী।

(৯) মৎস্য ঃ— রাজস্থানের পূর্বাংশে অবস্থিত মহাভারতে উল্লিখিত জনপদ মৎস্য, এর রাজধানী বিরাট যা বর্তমান রাজস্থান।

(১০) শূরসেন ঃ— শূরসেন হল যমুনা নদীর তীরে অবস্থিত মথুরানগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা জনপদ। গঙ্গা যুমনা দোয়াবে এর অবস্থান।

(১১) কুরু ঃ— দিল্লি ও হরিয়ানা সন্নিহিত অঞ্চল এই জনপদের এলাকা মহাভারতে সময়ে রাজনীতির মূল কেন্দ্র এই অঞ্চল। এর রাজধানী হস্তিনাপুর।

(১২) পাঞ্চাল ঃ— মহাভারতের অপর কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছিল পাঞ্চাল। এই মহাজনপদের ছিল দুটি রাজধানী অহিচ্ছত্র (Ahichhatra) যা উত্তরপ্রদেশের বেরেলিতে অবস্থিত এবং কাম্পিল্য (Kampilya) যা বর্তমান রোহিলখন্ড এলাকা।

(১৩) অ(্রক ঃ— দা(িণাত্যের একমাত্র মহাজনপদ হল অ(্রক। এটি গোদাবরী উপত্যকায় অবস্থিত। মহারাষ্ট্রের নান্দের অঞ্চলে অবস্থিত প্রাচীন গোবর্ধন ছিল এর রাজধানী (Govardhana)।

(১৪) অবন্তী ঃ— বর্তমান মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ জনপদ অবন্তী এর যুগ্ম রাজধানী যথা উজ্জয়িনী এবং নর্মদার ওপর ওঙ্কার মান্ধাতায় অবস্থিত মাহিষ্মতী নগরী। উজ্জয়িনী পরবতী সময়েও যথেষ্ট বিখ্যাত ছিল। বুদ্ধের সময় এর শাসক ছিলেন চন্ড প্রদ্যোৎ।

(১৫) গান্ধার ঃ— উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম প্রান্তে এই জনপদের অবস্থান। সিন্ধুর তীরবর্তী বর্তমান পাকিস্থানের পেশোয়ার রাওয়ালপিন্ডি এর কেন্দ্র। রাজধানী প্রাচীন কালে বিখ্যাত ত(শিলানগর। এই অঞ্চলই সর্বপ্রথম আলেকজান্ডারের অধীনতা স্বীকার করেছিল।

(১৬) কম্বোজ ঃ— উত্তরপশ্চিম সীমান্তের এই মহাজনপদের রাজধানী ছিল পাকিস্থানের Hazara অঞ্চল।

উপরোক্ত(মহাজনপদের তালিকাটি মহাভারতের জৈনভগবতীসূত্রে কিছুটা পৃথক হলেও ঐতিহাসিকরা অঙ্গুত্তর নিকায়কে অধিক গুরুত্ব দেন। এখানে ল(্যনীয় যে কেবল নগর নয়, নগরকে কেন্দ্র করে নির্দিষ্ট ভূখন্ডভিত্তিক রাজ্যের ধারণা এখানে পাওয়া যায়। তবে গুজরাট, দ(িণভারত, বাংলা ও কলিঙ্গের কোন স্থান এখানে স্থান পায়নি। অ(্রক একমাত্র দ(িণ ভারতীয় মহাজনপদ যেটি তাৎপর্যপূর্ন। তব আলেকজান্ডারর সমসাময়িক সূত্রে C.4th Century BCE নাগাদ গাঙ্গারিড়াইদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়, ফলে চন্দ্রকেতুগড় অঞ্চলে জনপদ নিশ্চয় গড়ে উঠেছিল, কিন্তু তারা স্বাধীন না কোন মহাজনপদের অধীন ছিল বলা কষ্টকর।

৯.১.৩.৩.২ — আলেকজান্ডরের সময়ে উত্তর পশ্চিমভারতের পরিস্থিতি ঃ—

গ্রীকবীর আলেকজান্ডার পারস্যসাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত অবস্থায় C.330BCE সময়কালে পারস্য সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট Darius-III কে পরাজিত করেন। অতঃপর তিনি পারস্যসামাজ্যের বাকিঅংশ করায়ত্ত করতে অগ্রসর হয়ে, উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম প্রদেশে এসে উপস্থিত হন। বিভিন্ন গ্রীক ঐতিহাসিক প্রমুখের রচনায় খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের ম্যাসিডেনিয়ান অভিপ্রয়াণ সম্পর্কে জানা যায়। এই ম্যাসিডোনিয়ান অভিপ্রয়াণের সময়ে ভারতের উত্তর পশ্চিম অঞ্চলে বেশ কিছু (ুদ্ররাজ্যের অস্তিত্ব ল(্য করা যায়। এই বিবরনগুলি প্রায় ৩০টির মত (ুদ্র থেকে বৃহৎ রাজ্যের অস্তিত্ব ল(্য করা যায়। তবে মগধের মত বৃহৎরাজ্য এই (েত্রে দেখা যায় না। ষোড়শ মহাজনপদের তালিকায় আমরা গান্ধার এবং কম্বোজের নাম পাই। কিন্তু গ্রিক বিবরণ এই এলাকা বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। এই শক্তি(গুলি কিছু বিবরণ আমরা দেওয়ার চেষ্টা করব। ঐতিহাসিক রণবীর চত্র(বর্তী নিম্নোক্ত(তালিকা প্রদানকরেছেন।

(১) আস্মাকেনয় (Assakenoi) ঃ সোয়াট এবং বুনের অঞ্চলের সাথে চিহ্নি(ত হয়েছে। গ্রীক বর্ণনা অনুসারে প্রায় ২০০০০ অ(্বারোহী বাহিনী ৩০০০০ পদাতিক, এবং ৩০টি রনহস্তী নিয়ে এরা আলেকজান্ডারকে বাধাদানের ব্যর্থ প্রচেষ্টা করেছিল।

(২) ন্যাসা (Nysa) ঃ কাবুল এবং সিন্ধুঅঞ্চলের মধ্যবর্তী কোন স্থানে এর অবস্থান। এটি একটি অরাজনৈতিক জনগোষ্ঠী ছিল।

(৩) পিউ ক্যলাওটিস্ (Peucalaotis) ঃ এটি গান্ধার জনপদের অর্ন্তগত পুষ্কলাবতী নগর, যা বর্তমান Charsadda র সহিত চিহি(ত হয়েছে। ইহা সিন্ধুদের পশ্চিমে অবস্থিত। গ্রীকমতে, এখানের শাসক ছিলেন Astes ঐতিহাসিকদের মতে, এই শাসকেরনাম হস্ত বা অষ্টক ছিল।

(৪) ট্যাক্সিলা (Taxila) ঃ বলতে দ্বিমত নেই, বিখ্যাত ত(শিলা নগর, যা সিন্ধুপূর্বতীরে অবস্থিত, তথা গান্ধার জনপদের রাজধানী। (Omphis) (অম্ভি) ছিলেন এখানের শাসক। ম্যাসিভানিয়ান আত্র(মন থেকে বাঁচতে তিনি আলেকজান্ডারের শরণাগত হন। প্রচুর উপঢৌকন সহ আত্মসর্মপন করেন।

(৫) আরসেকস্ (Arsakes) ঃ এই গোষ্ঠীর অবস্থান ছিল পাকিস্থানের হাজরা (Hazara) জেলায়। অর্থাৎ এটি কম্বোজ জনপদের অর্ন্তগত ছিল।

(৬) অ্যাবিসারেস (Abisares) ঃ এই রাজ্যের শাসক ভারতীয় সূত্রে 'অভিসার' বলে চিহি(ত হয়েছেন।

(৭) এল্ডারপোরুস (Elder Porus) ঃ Elder Porus বা জ্যেষ্ঠ পুরু হলেন ভারতীয় তথ্যসূত্রের বিখ্যাত রাজা পুরু। তার রাজ্য চেনাব এবং ঝিলাম নদীর মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত। এটি একটি শত্তি(শালী রাজ্য ছিল এবং এরা প্রবল সেনাবল নিয়ে ম্যাসিডোনিয়ান সেনার সম্মুখীন হন। গ্রীকতথ্যসূত্র অনুসারে, পুরু ৫০০০০ পদাতিক, ৩০০০ অ(ারোহী, ১০০০ রথবাহিনী এবং ১৩০ রণহস্তী নিয়ে আলেকজান্ডারের বিরুদ্ধে Hydespas এর যুদ্ধে (Battle of Hydespas) এ মুখোমুখি হয়। প্রবলযুদ্ধে পর পরাস্ত হন পুরু। তবে গ্রীক সাহিত্যে তার বীরত্বের প্রশংসা করেছে। পরে আলেকজান্ডার, পুরুর বীরত্ব এবং নির্ভীকতায় মুগ্ধ হয়ে তার রাজ্য তাকে ফিরিয়ে দিয়ে তার সাথে মিত্রতা করেন।

(৮) গ্লৌগানিকোই (Glauganikoi) ঃ চেনাব নদীর পশ্চিম এই গোষ্ঠী বা শত্তি(টির অবস্থান।

(৯) গান্ধারী (Gandaris) ঃ Rechna দোয়াব অঞ্চলে এই রাজ্যটিকে ঐতিহাসিকরা চিহি(ত করেছেন।

(১০) আদ্রাসটাই (Adrastai) ঃ Bari দোয়াবে এই রাজ্যটিকে ঐতিহাসিকরা চিহি(ত করেছেন।

(১১) কাথাইওই (Kathaioi) ঃ Saharanpur এর Bari দোয়াবে এই রাজ্যটি চিহি(ত করা হয়েছে।

(১২) সোফিস্টিস্ (Sophytes) ঃ ঝিলমের পূর্বে অবস্থিত রাজা সৌভূতির রাজ্য হিসাবে শনাত্ত(করা হয়ে থাকে।

(১৩) ফেগেলাস (Phegelus) ঃ রাভী এবং বিয়াস নদীর মধ্যবতী অংশে এই রাজ্যের অবস্থান।

(১৪) শিবোয় (Siboi) ঃ ইহা শিবি উপজাতিদের থেকে অভিন্ন। ঝিলাম ও চেনাবের সঙ্গমস্থলের দ(ণে ছিল এর অবস্থান।

(১৫) আগালস্সোই (Agalassoi) ঃ ৪০০০০ পদাতিক এবং ৩০০০ অ(ারোহী সমৃদ্ধ এই রাজ্যটি Siboi দের নিকটেই অবস্থিত ছিল।

(১৬)/(১৭) আস্পসিয়ান ও জুরিয়ান ঃ সম্ভবত অ(েকদেশ।

(১৮)/(১৯) অক্সিড ার্কি ও মল্লই (Oxdraki Malloi) ঃ এরাভারতীয় তথ্যসূত্র (দ্রক এবং মালবনাথে পরিচিত। তাদের শস্ত্রবিদ্যার প্রশংসা গ্রীকলেখকরা করেছেন। পাশাপাশি, বিখ্যাত ব্যকরণকার পানিনি, মালবদের শস্ত্রপোজীবী (sastropajiv) বলেছেন। তারা প্রবলভাবে আলেকজান্ডারকে বাধাদানের চেষ্টা করেন।

(২০) অ্যাবাসটেনয় (Abastenoi) ঃ এরা অম্বষ্ঠগোষ্টীর সঙ্গে সম্পৃত্ত(এরা একটি প্রাচীন উপজাতি যারা চেনাব উপত্যকার দ(নভাগে থাকতেন। এরা অরাজনৈতিক গোষ্ঠী ছিলেন এবং ৬০০০০ পদাতিক, ৬০০০ অ(ারোহী ও ৫০০ রথবাহিনী নিয়ে যুদ্ধ করেন। এরা পরবর্তী সময় অম্বষ্ঠ জাতি হিসাবে ব্রাহ্মণ পিতা ও বৈশ্যমাতার সন্তান এই পরিচয়ে জাতিবর্ণ কাঠামোর অঙ্গীভূত হয়েছিলেন।

(২১)/(২২) (া‍র্থই ও ওস্সাডোই (Xathroi and Osadoi) ঃ প্রথম গোষ্ঠীটি (ত্রি উপজাতি এবং পরেরটি বসতি গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পৃত্ত(। উভয়েই নিম্নসিন্ধু অঞ্চলের সঙ্গে যুত্ত(।

(২৩)/(২৪) সোড্রাই ও মাস্সানোই (Sodrai and Masanoi) ঃ সম্ভবত এটি শূদ্র উপজাতি, যাদের ভারতীয় সূত্রে আভীরদের সঙ্গে একসাথে দেখানো হয়েছে। এদের পরাস্ত করে আলেকজান্দ্রিয়া নগরীর প্রতিষ্ঠা করেন।

(২৫) মুসিকানোস (Musikanos) ঃ বর্তমান পাকিস্থানের সুক্কুর অঞ্চল।

(২৬) অ(কানোস (Oxukanos) ঃ ইহা বর্তমান পাকিস্থানের লারকানা এলাকাতে চিহি(ত করা হয়েছে।

(২৭) সাম্বোস (Sambos) ঃ মুসিকানোসদের সন্নিহিত অঞ্চলে পার্বত্য ((ত্রে এই রাজ্যের অবস্থান।

(২৮) প্যাটালেনে (Palalene) ঃ ইহা সিন্ধু উপত্যকায় অবস্থিত।

উপরিউক্ত(বর্ণনায় যে বিবিধ রাজ্যের বিবরণ পাওয়া গেল, তা আলেকজান্ডারের সমসাময়িক উত্তর পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের রাজনৈতিক পরিস্থিতির অনেক বাস্তব সম্মত বিবরণ দেয়। ষোড়শ মহাজনদের তালিকাতে মাত্র দুটি মহাজনপদ গান্ধার এবং কম্বোজের তালিকা পাওয়া গেলেও গ্রীক বিবরণ থেকে বাস্তবে এই অঞ্চলের Regional Study করা যায়। ম্যাসিডোনিয়ান আত্র(মণের পূর্বে বি(প্ত এবং (দ্রতর অনেক জনপদ এখানে গড়ে উঠতে দেখা যায়, এর মধ্যে কিছু রাজ্য আবার অপে(া বৃহৎ এবং শক্তি(শালী হলেও ষোলটি মহাজনপদের মধ্যে স্থান পায়নি।

ভারতবর্ষের বাকি অঞ্চলের জনপদের থেকে এই অঞ্চলগুলি আলাদা কারণ ত্র(মাগত বিদেশী অভিপ্রয়াণে এখানে মিশ্রসংস্কৃতির সৃষ্টি হয়েছিল। পাশাপাশি গ্রীক বিবরণ থাকায় এদের সম্পর্কে জানাও সুবিধাজনক হয়েছে বলে ঐতিহাসিক রা অনুমান করেছেন।

৯.১.৩.৮ - উপসংহার ঃ

বর্তমান পর্যায় থেকে দেখা গেল কিভাবে উপজাতিয় কৌমভিত্তিক শাসন ধীরে ধীরে শক্তি(শালী রাজতন্ত্রও সুগঠিত ব্যবস্থায় পরিণত হয়। কৌমভিত্তিক ব্যবস্থা ত্র(মে ভূখন্ডকেন্দ্রিক রাজতন্ত্রে পরিণত হয়েছিল।

৯.১.৩.৫ - সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ—

(1) Early India-Romila Thapar

(2) From Lineage to State-Romila Thapar.

(3) Exploring Early India-Ranabir Chakraborty.

(4) The City in Early Hitorical India-Amalananda Ghosh.

(5) Political Hisorty of Ancient India-Hemchandra Roychowdhury.

(6) Cultural Past - Romila Thapar.

৯.১.৩.৬ - সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ঃ—

(1) Give an Overview of different vedic tribes.

(2) How was Social condition of the vedic Society?

(3) What do you know about the political Situation of North India during 6th Century BCE?

(4) Can you use the epics as historical document?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব - রণবীর চত্র(বর্তী

Cultural Past -Romila Thapar

Early India - Romila Thapar

পর্যায়-২

Second Urbanization

দ্বিতীয় নগরায়ণ

একক — ৪, ৫, ৬

৯.২.৪.০ — সূচনা
৯.২.৪.১— দ্বিতীয় নগরায়ণের ধারণা (Unit -4)
৯.২.৪.২— বস্তুগত সংস্কৃতিতে দ্বিতীয় নগরায়ণ (Unit -4)
৯.২.৫.২—গণরাজ্য সমূহ (Unit -5)

৯.২.৬.৪— শক্তি(শালী রাজ্য রূপে মগধের উত্থান (Unit -6)
৯.২.৬.৪.১ — মগধের উত্থানের কারণ
৯.২.৬.৪.২ — প্রাথমিক মগধ রাজবংশ
৯.২.৬.৪.৩ — মৌর্যবংশের উত্থান
৯.২.৬.৪.৪ — গুপ্তরাজবংশের সময়কাল

৯.২.৬.৬ — সহায়ক গ্রন্থাবলী
৯.২.৬.৭ — সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৯.২.৪.০ — সূচনা ঃ খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে গাঙ্গেয় অববাহিকা অঞ্চলে জনপদ এবং মহাজনপদ গড়ে ওঠে। যার পরিপ্রে(তে গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগর সভ্যতা দেখা দেয়। ভারত ইতিহাসে ইহা দ্বিতীয় নগরায়ন, ভারত ইতিহাসে প্রথম নগরায়ণ হরপ্পা সভ্যতায়। বৈদিক সাহিত্যে নগরের উল্লেখ সামান্য। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ খ্রীঃ পূর্ব উত্তর ভারতে নগরের অস্তিত্বের প্রমাণ মেলে না। হরপ্পা সভ্যতার অবসানের পর 600BCE নাগাদ গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরের আবির্ভাব হয় যা ভারত ইতিহাসে Second Urbanization নামে পরিচিত।

৯.২.৪.১ দ্বিতীয় নগরায়ণের ধারণা (Concept of Second Urbanization) ঃ—

আমারা পূর্বে যোড়শ মহাজনপদর উল্লেখ পেয়েছি। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গাঙ্গেয় উপত্যকা অঞ্চলে কৃষি এবং বসতি বিস্তারের ফলে অঞ্চলে গগরায়ণের সূচনা হয়। বৈদিক সাহিত্য নগর সম্পর্কে নীরব। প্রায় এক সহস্রাব্দের নীরবতার পর ভারতীয় জীবনে পুনরায় নগর জীবণের আর্বিভাব ঘটে। এই Second Urbanization এর নগর সমূহ মূলত গাঙ্গেয় অঞ্চলে বিকশিত হয়, যা পূর্ববর্তী সময়ে নগর সংস্কৃতির বাইরে ছিল।

নগর ও নাগরিক জীবন সংত্র(ান্ত আলোচনা সাহিত্যিক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসূত্রে পাওয়া যায়। সাহিত্য সূত্রে 'নগর' এবং 'পুর' শব্দ দুটি নগর অর্থে ব্যবহৃত হতে থাকে। সর্বপ্রথম বৃহদারণ্যক উপনিষদে (Brihadaranyakopanishad) নগর (Nagar) শব্দটি ব্যবহৃত হয়। পানিনির অষ্টাধ্যায়ীতে দুটি প্রধান বসতির কথা পাওয়া যায় যথা গ্রাম ও নগর। অর্থাৎ নগর যে গ্রামের চেয়ে আলাদা তার ধারণা পানিনির ছিল। তিনি শালাতুরা (Satature) অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন, যা হল বর্তমান পাকিস্থান (Sialkot)। তিনি আরো উল্লেখ করেন অধিকাংশ নগর 'পূর্বদিকে' অর্থাৎ গাঙ্গেয় অঞ্চলে অবস্থিত। দীর্ঘনিকায়ের 'মহাপরিনির্বাণ সূত্ত(' বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময়ে অন্তত

৬০টি নগরের উল্লেখ করেন। এর মধ্য ছটি নগর যথা — চম্পা, রাজগৃহ, বারানসী, কৌশাম্বী, শ্রাবস্তী এবং কুশীনগর মহানগর রূপে চিহ্(ত। এবং অপে(াকৃত ছোটনগরগুলি শাখানগরী রূপে চিহ্(ত। হিমাংশুপ্রভা রায়ের আলোচনা মহানগরকে কেন্দ্র করে আর্বতিত হচ্ছিল। এই সব নগরে বুদ্ধ স্বয়ং ভ্রমণ করেছিলেন। সাহিত্যিক তথ্যসূত্র নগরের বিবরণে একটি সাধারণ বর্ণনা দিয়েছে। সমস্ত নগরের ৎ(ত্রেই নগর প্রাকার, চওড়া রাজপথ, উন্নত বাসগৃহ, প্রাসাদ, বণিকের কার্যকলাপ পাওয়া যায়। কিন্তু বিভিন্ন নগরের আলাদা আলাদা বর্ণনা পাওয়া যায় না। তার জন্য প্রত্নতত্ত্বের ওপর নির্ভর করতে হবে।

একটি বিষয় এ(ত্রে মনে রাখা দরকার, পূর্বেবর্ণিত মহাজনপদ গুলি কিন্তু নগরের সঙ্গে অভিন্ন নয়। মহাজন-পদের মধ্যে গ্রামীণ এবং নগর উভয় জনপদ বিদ্যমান। গঙ্গা-যমুনা-দোয়াবে অন্যতম প্রাচীন নগর ছিল কুরু জনপদের রাজনৈতিক কেন্দ্র তথা মহাভারত খ্যাত 'হস্তিনাপুর'। এছাড়া দোয়াবের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল অত্রঞ্জিখেরা (Atranjikhera)। এখানে যদি ও কোন নগর ছিল তার চিহ্(তকরণ হয়নি, তা সত্ত্বে নগরের অস্তিত্ব চিহ্(ত করা গেছে এখানে বিভিন্ন স্তরায়ণে সাংস্কৃতিক চিহ্(পাওয়া যায়। বৈদিক সময়ের সঙ্গে সম্পর্কিত যে PGW (Painted Grey Ware) মৃৎপাত্র স্তর পাওয়া যায়, তার আয়তন ৬৫০ বর্গমিটার। পরবর্তী, বুদ্ধের সমসাময়িক NBPW (Northern Black Palished Ware) আয়তন ৫৫০মি X ৮৫০মি. যা এলাকার বসতি বৃদ্ধির পরিচায়ক এবং নিঃসন্দেহে একটি নগরকেন্দ্রের বৈশিষ্ট্য। এই স্তরেই পাওয়া গেছে অত্রঞ্জিখেরার প্রাচীনতম নগর প্রাকার। আবার বৎস (Vatsa) মহাজনপদের অন্যতম প্রধাননগর-তথা রাজধানী কৌশম্বীতে পাওয়া গেছে ৬.৫ কিমি পরিসীমার একটি নগর প্রাকার কৌ(াম্বী নগরের পরিসীমা ৫০ হক্টের এবং বৎস রাজ্যের বৃহত্তম নগর এটি। এই ৎ(ত্রটি 1000 BCE নাগাদ নির্মিত হয়। তবে অধিকাংশ ঐতিহাসিক মনে করেন NBPW স্তরে কিছু আগে কিন্তু C.600 BCE র সামান্য পূর্ব নাগাদ কৌশাম্বী নগরায়ণের সূত্রপাত হয়।

কাশী জনপদের প্রধাননগরী তথা ভারতের নিরবিচ্ছন্ন নগর বারানসীর প্রাচীনতম স্তরের সন্ধান পাওয়া যায় বারানসীর রাজঘাট থেকে। এখানেও NBPW প্রাক স্তরে নগর প্রাকারের সন্ধান পাওয়া যায় মগধ জনপদের প্রাথমিক নগরী রাজগৃহ ছিল প্রাকার দ্বারা সুর(ত। পর্বতবেষ্টিত এই নগরে প্রাকার ছিল প্রায় ৪০ কিমি। অন্যান্য নগর প্রাকারগুলি কাদামাটির ইঁটে তৈরী হলেও রাজগৃহের নগর প্রাকার ছিল পাথরের তৈরী (Stone made)। আবার, বুদ্ধের বর্ণনায় স্থান পাওয়া শ্রাবস্তী ও কিন্তু একটি সমৃদ্ধ শিল্প (Craft) কেন্দ্র। জাপানী প্রত্নবিশারদ Aboshi Takahasi মনে করেন শ্রাবস্তীর প্রাচীনত্ব খ্রীঃ পূর্ব অষ্টম-সপ্তম শতকের হতে পারে। যদি নগরের সুস্পষ্টতা 6th Century BCE থেকে মেলে। এছাড়া প্রাকার পাওয়া না গেলেও অহিচ্ছত্র (বেরেলি/Bereilly) এবং চম্পা (ভাগলপুর) নগর জীবণের চিহ্(বহন করে।

আবার এই নগর জীবন কেবলমাত্র যে গাঙ্গেয়ভুমিতে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়। মধ্যভারত প্রাচীন Airikina বা বর্তমান Eran এবং উজ্জয়িনীতে C.750-700 BCE র মধ্যে নগর প্রাকারের চিহ্(মেলে। উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ত(শীলা (Taxila) নগরের সন্ধান মেলে 'Bhir' ঢিবি উৎখননে। এখানে প্রাক্‌মৌর্য সময়ের গৃহ এবং রাজপথের নিদর্শন পাওয়া যায়। পেশোয়ারের নিকটবর্তী চারসাদ্দা (Charsadda) তে C.4th Century BCE নাগাদ নগর আবির্ভাবের চিহ্(পাওয়া যায়।

তবে উল্লেখ্য বিষয় হল এই যে পরবর্তীকালে মুখ্য রাজনৈতিক কেন্দ্র পাটলিপুত্র এই পাথমিক তালিকায় অনুচ্চারিত। স্থানটির বৌদ্ধসাহিত্যে নাম ছিল পাটলিগাম্‌ (Pataligama) যেটি প্রাথমিকভাবে নাম মাহাত্ম্যে গ্রাম এবং মহাপরিনির্বাণ সূত্তে(পুটভেদন (Putabhedana) নামে পরিচিত। পুটভেদন অর্থে যেখানে বাণিজ্যদ্রব্যের Seal খোলা হত। অর্থাৎ এটি বাণিজ্যদ্রব্যর গুদামরূপে এটি গড়ে ওঠে। শেষবার মগধ ত্যাগের সময় পাটলিগামে বুদ্ধ দেখেন

বৃজিদের মোকাবিলার জন্য অজাতশত্রুর দুই মন্ত্রী সুনীধ ও বস্‌স্কার সেখানে নগর প্রাকার নির্মাণ কাজে তদারকি করছেন। বুদ্ধ ভবিষ্যবানী করছিলন, এই পাটলিগাম একদিন গৌরবময় নগর হবে। অর্থাৎ এখানে পাটলিগাম থেকে পাটলিপুত্র গড়ে ওঠার ইতিহাস পাওয়া যায়।

এইভাবে দেখা যায় খ্রীষ্টঃ পূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাষ্ট্রগঠনের প্রত্রি(য়ার সাথে নগররায়ণ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে পড়ে। কৃষির বিকাশ ত্র(মেশ শিল্পসমাগ্রীর বিকাশে সহায়ক হয়। নগরে বাসকারী মানুষরা কৃষিকাজে নিযুত্ত(নন। মূলত, বণিক, কর্মকার, প্রশাসকরা এই কাজের সঙ্গে যুত্ত(ছিলেন। তারা খাদ্যের জন্য গ্রামাঞ্চলের ওপর নির্ভরশীল। তাই নগরায়ন কেবলমাত্র বাণিজ্য বা শিল্পের সঙ্গে যুত্ত(ছিল না, বরং কৃষি উৎপাদনর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। তাই নগরজীবনকে কখনোই তার পারিপার্শ্বিক গ্রাম্যজীবনের থেকে বিযুত্ত(করা সম্ভব নয়। এই ভাবে দেখা যায় দ্বিতীয় নগরায়ণের (Second Urbanization) প্রত্রি(য়া ভারতীয় জীবনে উল্লেখযোগ্য ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

৯.২.৮.২ বস্তুগত সংস্কৃতিতে দ্বিতীয় নগরায়ণ ঃ—

নগরায়ণের সঙ্গে কৃষির বিস্তারের ওতপ্রোত সম্পর্কে আমাদের অজানা নয়। এপ্রসঙ্গে জানা দরকার নগরায়ণের ফলে বস্তুগত সংস্কৃতির মধ্যে কি রূপ বদল ল(নীয় হয়েছিল। কিংবা কি কি বিষয় এই নগরায়ণের জন্য অন্যতম অনুঘটক রূপে কাজ করেছিল। এই প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন যে মধ্যগাঙ্গেয় অঞ্চল নগরায়ণের জন্য এই অঞ্চলে বসতি বিস্তারের প্রয়োজন হয়েছিল। পাশাপাশি দরকার হয়েছিল কৃষির বিস্তার ঘটানোর।

স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন থেকে যায়, হরপ্পা সভ্যতা যখন গাঙ্গেয় অঞ্চলে বসতি বিস্তার করতে স(ম হয়নি, তখন কোন নতুন অনুঘটক 6th Century BCE নাগাদ মধ্যগাঙ্গেয় অঞ্চলে বসতি বিস্তারে স(ম হল? ঐতিহাসিকদের ধারণা বসতি বিস্তারের আগে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকা সম্ভবত গ্রহণ অরণ্য ছিল। বৃষ্টিপাত এবং নদী কেন্দ্রিকতা এই গহন অরণ্যের কারণ ছিল। হরপ্পীয়দের প(ে এই ঘন অরন্য ছেদন করে বসতি বিস্তার সম্ভবপর হয়নি। শতপথ ব্রাহ্মণে মাঠব বিদেঘার কাহিনীতে আগুন দিয়ে জঙ্গল পোড়ানোর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে ঐতিহাসিকরা মনে করেন এতঘন অরণ্য কেবলমনে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে সাফ করা সম্ভব ছিল না।

এই প্রসঙ্গে D.D. Kosambi এবং R.S. Sharma জঙ্গল পরিষ্কার করতে 'Slash and Burn' Method এর উল্লেখ করেছিলেন। তাঁরা মনে করেন পরবর্তী বৈদিক যুগে লৌহ প্রযুত্তি(র ব্যবহার বস্তুগত সংস্কৃতিতে ব্যপক বদল এনেছিল। লৌহ প্রযুত্তি(র ব্যবহার বস্তুগত সংস্কৃতিতে ব্যপক বদল এনেছিল। লৌহ নির্মিত কুঠার এবং কাস্তের ব্যবহার ঘন অরণ্য সাফ করে বসতি বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। পাশাপাশি শর্মা আরো মনে করেন গাঙ্গেয় আঠ াালো এঁটেলমাটি কাঠে র লাঙল দ্বারা কর্ষন করা সম্ভব পর নয়। সে(ে ত্রে লৌহনির্মিত এঁটেল মাটি চাষ করতে লৌহ নির্মিত লাঙ্গলের ফলা অনেক বেশি কার্যকরী ছিল। আমার তৈরী লাঙ্গলের চেয়ে ইহা অনেক শত্তি(শালী। বৌধায়ন ধর্মসূত্র 'কুদ্দাল', 'কুদ্দালিকা'র উল্লেখ আছে। বিহারের সোনপুরে, কৌশাম্বীতে, উৎখননে লোহার সূত্তনিপাত গ্রন্থে লোহার তৈরী লাঙ্গলের ফলাটিকে রৌদ্রে তপ্ত করে ঠান্ডা জলে ডোবানো হত লোহার দৃঢ়তা আনার জন্য। এই সমস্ত উপকারণের ফলে ঐতিহাসিক কোশাম্বী এবং শর্মা মনে করেন মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষির সাফল্য ও প্রসারের পিছনে লৌহপ্রযুত্তি(বিশেষ কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করে।

তবে এই প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকরা একমত নন। এই মতবিরোধ যে বিতর্কের জন্ম দিয়েছে, তা 'Iron debate' নামে পরিচিত। লৌহপ্রযুত্তি(ব্যবহার যে অতিরিত্ত(উৎপাদনের সূচনা করেছিল তাই এই নগরায়ণের কে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগররায়ণের অন্যতম অনুঘটক বলে মনে করেন। তবে এই মতের বিরোধিতা করেছিলেন অমলনন্দ ঘোষ। নগরায়নের কারণ হিসাবে অতিরিত্ত(উৎপাদনের গুরুত্বকে অস্বীকার না করা হলেও উৎপাদনের কারণ হিসাবে লৌহ প্রযু ত্তি(র গুরুত্বকে তারা স্বীকার করতে রাজী নন। ঘোষ মনে করেন প্রাপ্ত লৌহ উপকরণ খুবই অপর্যাপ্ত যা দিয়ে যা দিয়ে

লৌহ প্রযুক্তি(র দ্বারা কৃষিবিপ্লব আনার তত্বটিকে প্রতিষ্ঠিত করা যায় না। কেবলমাত্র রোপার, জাখেদা, কৌশাম্বী, এবং বৈশালী থেকে লৌহদ্রব্য পাওয়া যায়। তাই অমলানন্দ ঘোষ মনে করেন লোহা অরণ্য সাফাই এবং কৃষিকার্য বিস্তারের অপরিহার্য বিষয় ছিল না। তিনি মনে করেন তাম্র ও ব্রোঞ্জ প্রযুক্তি(কৃষি বিস্তারের (ে ত্রে যথেষ্ট ছিল এছাড়া তিনি মনে করেন অরণ্য পুড়িয়ে সফলভাবে বসতি বিস্তার সম্ভব ছিল। তিনি মহাভারতের খান্ডবদহনের কাহিনী উল্লেখ করেন। পাশাপাশি, ঘোষ আরো উল্লেখ করেন উদ্বৃত্ত কখনোই প্রযুক্তি(গত উৎকর্ষের ফসল নয়, বরং প্রযুক্তি(র জ্ঞান থাকলেও উদ্বৃত্তকে নিয়ন্ত্রণের জন্য সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামা গড়ে না উঠলে এবং সমাজের চাহিদা দেখা না দিলে উৎপাদন বৃদ্ধি হতে পারেনা। তিনি দেখিয়েছেন, সুদুর দ(িণে মেগালিথিক সমাধি (Megalithic burial) সংস্কৃতিকে লোহার ব্যবহার অজ্ঞাত না হলেও তা কিছু তে 6th-5th Century BCE উত্তরভারতের ন্যায় নগর সংস্কৃতির জন্ম দেয়নি।

অমলানন্দ ঘোষের বক্ত(ব্যের প্রতিত্রি(য়ায় রামশরণ শর্মা উল্লেখ করেন যে, উৎপাদন বৃদ্ধির (ে ত্রে উৎপাদনের উপকরণ এবং প্রযুক্তি(র ব্যবহার একমাত্র না হলেও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ। সেই সঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন আর্দ্র মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় লৌহ উপকরণ মরচে ধরে নষ্ট হয়ে যায়। তাই প্রত্নতাত্ত্বিকভাবে বিপুল লৌহউপকরণ পাওয়া সম্ভবপর হয়নি।

বৈদিকযুগের মৃৎপাত্র সংস্কৃতি Paint Greyware (PGW) 6th Century BCE তে ছিল Northern Black Polished Ware (NBPW) । এগুলি Time bound Pottery এই সময়কালের পর পাওয়া যায় না

দিলীপকুমার চত্র(বর্তী, নীহার রঞ্জন রায়, George Erdosy প্রমুখ মনে করেন territorial State এর উদ্ভব যে রাজনৈতিক প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তুলেছিল, তা দিয়ে কৃষি উদ্বৃত্ত নিয়ন্ত্রণে গতি আসে। F. R. Allchin মনে করেন নগরায়ণের সাথে রাষ্ট্র গঠন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। নগরায়নের মত জটিল পদ্ধতিকে কখনোই কেবলমাত্র প্রযুক্তি(গত উন্নতির দ্বারা ব্যাখা করা যায় না। মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজনৈতিক ও বস্তুগাত পরিস্থিতি নগর গড়ে ওঠার অনুকূল ছিল। যেখানে রাষ্ট্র গঠন হয়নি, সেখানে নগরজীবন আর্বিভাব হতে দেখা যায় না।

তাই লোহার ব্যবহার প্রযুক্তি(গত (ে ত্রে একটি অন্যতম একটি কারন হলেও এটিকেই নগরায়ণের একমাত্র কারণ বলা ঠিক নয়। তবে লৌহ প্রযুক্তি(বস্তুগত সংস্কৃতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে ছিল।

এর পাশাপাশি মৃৎপাত্র গত সংস্কৃতি বস্তুগত সংস্কৃতির অন্যতম উপদান। মঝঝিমনিকায় গ্রন্থে মৃৎপাত্র নির্মাণ কৌশল জানা যায়। কারিগরী কলাকৌশলের দিকে থেকে মৃৎপাত্রে তুলনায় PGW মৃৎপাত্র তুলানায় NBPW মৃৎপাত্র অনেক উন্নতমানের ছিল। R. Allchin এর মতে উৎকৃষ্টমাটি ছাড়া এই মৃৎপাত্র গড়া যেত না কুমোরের চাকার ব্যাপক ব্যবহারের সাথেই অলচিন দেখিয়েছেন মাটির পাত্রগুলিকে নিয়ন্ত্রিত আঁচে পুড়িয়ে তার ওপর অতি উজ্জ্বল মসৃন পালিশ করা হত। উজ্জ্বল মসৃণ গাত্রবর্ণ এই পাত্রকে চিহ্নি(ত করতে সাহায্য করে। এই ধরণে মৃৎপাত্র সারা গাঙ্গেয় 4th Century BCE অঞ্চলে র পর ছড়িয়ে পড়ে। পাশাপাশি BRW বা Black and Red ware মৃৎপাত্রের নিদর্শন ও পাওয়া যায়। লোহার উপকরণ ও এই দুই ধরণের মৃৎপাত্র একই বস্তুগত সাংস্কৃতিক ফসল ছিল।

৯.২.৫.৩ - গণরাজ্য সমূহ ঃ—

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ন দেখা যায়। এর ফলে বিভিন্ন জনপদ গড় ওঠে। অঙ্গুওর নিকায় তে উল্লিখিত ১৬টির মহাজনপদ এই (ে ত্রে উল্লেখযাগ্য, তবে এই সমস্ত জনপদগুলিতে দুটি পৃথক ধরণের রাজনৈতিক ব্যবহার জন্ম হয়। যথা (১) রাজতন্ত্র এবং (২) গণ সংঘ ব্যবস্থা। এই দুই পরস্পর বিরোধী রাষ্ট্র ব্যবস্থার সংঘাত এই সময়ের রাজনৈতিক ত্রি(য়া কলাপের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। এই সংঘাতের মূল রূপ পরিস্ফুট হয় দুই ব্যবস্থার শক্তি(শালী দুই জনপদ, রাজতান্ত্রিক মগধ ও বৃজি গনসংঘের লিচ্ছবিদের সংঘাতের মধ্য দিয়ে।

মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার গণ সংঘর প্রকৃতি নিয়ে দীর্ঘ দিন ধরে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন মতের সমাবেশ দেখা গেছে। ঐতিহাসিক Rhys Davids এগুলিকে Clan বা গোষ্ঠী বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু সেটি গ্রহণযোগ্য নয়, কারন এগুলির একটি নির্দিষ্ঠ, স্বতন্ত্র রাজনৈতিক ব্যবস্থার ছিল । আবার শাসন ব্যবস্থায় জনগণের অংশগ্রহণ দেখে ঐতিহাসিক কে.পি. জয়সওয়াল এগুলিকে প্রজাতন্ত্র বলছেন। তবে প্রজাতন্ত্রের মতো সকল শ্রেণীর জনসাধারণের রাজনৈতিক ব্যবস্থায় অধিকার ছিল না। বি.সি.ল এই ব্যবস্থাকে বংশনুত্র(মিক অভিজাত তন্ত্র বলেছেন তবে প্রাচীন গ্রন্থে উল্লিখিত 'গণসংঘ' কথাটি এ(ত্রে ব্যবহার করা যুক্তি(, যুক্ত(হবে কারণ আধুনিক অর্থে পূর্বোক্ত(ব্যবস্থা গুলি বলতে বোঝায় তার কোনটিই সম্পূর্ণভাবে এই ব্যবস্থার ছিল না।

বৈদিক সাহিত্যে এমনকি ঋগ্বেদেও 'গণ' কথাটি পাওয়া যায়। বেদে দেব অসুর ও মরুৎদের গণের উল্লেখ পাওয়া যায়, এদের মধ্যে যোদ্ধাশ্রেণীর সমাবেশ ল(্যনীয়। কে.পি. জয়সওয়াল, বি.সি.ল প্রমুখ মধ্য গঙ্গার গণসংঘ গুলিকে বৈদিকগণ ব্যবস্থার সরাসরি উত্তরসূরী বলেছেন। রোমিলা থাপার ও রামশরণ শর্মা মনে করেন বৈদিক গণসংঘগুলিতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ফলে সম্পদর ওপর অধিকার নিয়ে সমস্যা দেখা যায়। এই ধরণের গণসংঘের জ্যেষ্ঠপুত্রের বংশ অধিক গুরুত্ব লাভ করে এবং সেই বংশটি ধীরে ধীরে রাজতন্ত্র রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় তখন কনিষ্ঠপুত্রের বংশ অন্যত্র সরে গিয়ে সেখানে অন্য ধরনের একটি ব্যবস্থা গড়ে তোলে। এই ব্যবস্থায় পূর্ববর্তী বৈদিক গণ ব্যবস্থার প্রভাব থাকলেও আঞ্চলিকতার ধারণা অনাত্মীয়শ্রম (দাসভৃতক) পূর্ণ বিকশিত নাগরিক জীবন, বাণিজ্যিক লেনদেন, শিল্পের বিকাশ প্রভৃতি দেখা যান। তাই এইসব মধ্যগাঙ্গয় গণসংঘগুলি কখনাই পূর্ববর্তী কুরুপাঞ্চাল গন সংঘগুলির মতো ছিল না।

মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার গণসংখ্যা ব্যবস্থা পরিচয় পাওয়া যায় বৌদ্ধসাহিত্য গুলিতে, যেখানে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে তৃতীয় শতকে রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবরণ পাওয়া যায়। যেখানে উত্তরের ও পূর্বের শাক্য লিচ্ছবি, মল্লদের গণসংঘের কথা পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে তৃতীয় শতকের বৌদ্ধগ্রন্থ গুলিকে গণ ও সংঘগুলির যে বিবরণ পাওয়া যায় তাতে সেগুলি রাজতন্ত্র অপে(া স্বতন্ত্র এবং (ুদ্র উপজাতি স্তর থেকে বৃহৎ নগররাষ্ট্র পর্যন্ত বিভিন্ন আয়তনে ছড়িয়ে ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম থেকে চতুর্থ শতকে পানিনির রচনাতে গণসংঘগুলিকে রাজতন্ত্র থেকে আলাদা করা হয়েছে। তিনি এই সংঘগুলির সামরিক ত্রি(য়াকলাপের দিকে ল(্য রেখে এদের আয়ুধজীবী বলেছেন। অর্থশাস্ত্র গণসংঘগুলির স্বাধীন অস্তিত্ব রাজতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক মনে করতেন। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যগুলিতে গণসংঘগুলিকে অরাজক রাজ্য বলা হয়েছে, যেখানে মাৎস্যন্যায় বিরাজ করে কিন্তু বৌদ্ধগ্রন্থ গুলি আবার এগুলিকে সমৃদ্ধনগর রাষ্ট্র বলে উল্লেখ করেছে।

বিভিন্ন ঐতিহাসিক উপদান জনসংঘ ও রাজতন্ত্রগুলিকে পৃথকীকৃত করেছে। গণসংঘের বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার মাধ্যমে রাজতন্ত্র ও গণসংঘের পৃথকীকরণ চিহ্নি(ত করা সম্ভব। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা বংশানুত্র(মিকভাবে রাজা সর্ব্বোচ্চ শাসকরূপে শাসনকার্য পরিচালনা করেন। গণসংঘ ব্যবস্থায় (মতারে সর্ব্বোচ্চ কাঠামো নিহিত ছিল 'গণ' বা সর্ব্বেচ্চ প্রশাসনিক সংগঠনের ওপর। গণসংঘের জন্য আইন, শাসন ও বিচারের সমস্ত (মতা এর ওপরই ন্যস্ত থাকত। গণের প্রধান নির্বাচিত হতেন এই সংগঠনের মনোনয়ণের ভিত্তিতে। লিচ্ছবিপ্রধান খন্ড মারা পেলে এই সংঘ তাঁর কনিষ্ঠ পুত্র সিংহকে নেতা বা প্রধান নির্বাচিত করেন। সিংহ এই পদ তার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দিতে চাইলে সংগঠন ঘোষণা করে যে প্রধান পদ যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হয় বংশপরম্পরায় নয়। 'চিরবস্তুর' এই কাহিনী গণসংঘের রাজনৈতিক কাঠামোকে অনেকাংশে প্রকাশ করে। গণের প্রধান তাদের সর্ব্বোচ্চ প্রশাসনিক সংঘ পরিচালনাও তাদের সিদ্ধান্তকে কার্যকরী করতেন। রাজাতান্ত্রিক প্রশাসনের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাদের স্থায়ী বেতনভুক সেনাবাহিনী, সুষ্ঠ কর ব্যবস্থা কিন্তু গণসংঘ গুলিতে এর কোন অস্তিত্ব ছিল না। অস্ত্রধারন করতেন কেবল (ত্রিয় রাজকুল রা কারণ এখানে তারাই অস্ত্রধারণের অধিকারী। নীতির দিকদিয়েও এই দুই ব্যবস্থার মধ্যে পার্থক্য ছিল কোশল, মগধে মতো রাজতন্ত্র যেখানে সর্বদা সাম্রাজ্য বিস্তার করতে আগ্রহী ছিল যেখানে গনসংঘগুলি নিজেদের অঞ্চলে কৌম ব্যবস্থা মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকতে চাইতো বৃদ্ধির কোন প্রচেষ্টা ছিল না।

সমাজিক সংগঠনের দিক দিয়েও গণসংঘগুলি রাজতন্ত্রের থেকে আলাদা। ব্রাহ্মণ্য প্রাধাণ্য যুক্ত(রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিপরীতে গণসংঘগুলিতে (ত্তিয় ((ত্রিয়)দের প্রাধান্য ল(ও করা যায়। ব্রাহ্মণ এবং বণিকরা ও এখানে উপস্থিত। তবে শূদ্র এই বিভাগের স্পষ্ট অস্তিত্ব পাওয়া যায় না। জাতিবর্ণ ব্যবস্থা এখানে বিশেষভাবে দেখা যায় না, যদিও বৈশালী নগর উচ্চ মধ্য ও নিম্ন তিনভাগ বিভত্ত(করা হয়েছিল। গণসংঘের মূলত (ত্রিয়রাই রাজকূল হিসাবে পরিচিত ছিল এবং গণসংঘের প্রশসানিক সংস্থার এরাই সদস্য হতে পারত। তবে ব্রাহ্মণ বা বৈশ্যরাও কোন কোন (ত্রে এর সদস্য হয়েছিলেন। যেমন - পানির অষ্টধ্যায়ী ওপর কোশিকোর ভাষ্য পাওয়া যায় যে বাহিকো সংঘের ব্রাহ্মণরা উপস্থিত থাকতেন আবার দীর্ঘনিকায় শাক্যদের সভাতে ব্রাহ্মণ অম্বষ্ঠের উপস্থিতির উল্লেখ করে, তবে ব্রাহ্মণরা যে গণসংঘের বিশেষ সম্মানিত ছিলেন না তা বোঝা যায়, অম্বষ্ঠকে অন্য সদস্যগণ কর্তৃক অভিবাদন না করার মাধ্যমে। তবে (ত্রিয় রাজকূলদের মধ্যে একধরণের সাম্য ল(্য করা যায়। এইরূপ ভেদ ছাড়াও গণগুলিতে অভ্যন্তরীন বাসিন্দা ও প্রান্তিক বাসিন্দাদের মধ্যে বিভাজন ছিল। বৈশালীর অভ্যন্তরীন বাসিন্দা (অন্তর বাসিকা) রাই সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেতেন, মূলত এরাই (ত্রিয় ছিলেন। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানের দিক দিয়ে গণসংঘ বৈদিক আচার অনুষ্ঠানের প্রতি বিশেষ আস্থাশীল ছিলেন না, বরং জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি ধর্মের প্রতি তাদের আর্কষণ ছিল।

অর্থনৈতিক দিক দিয়ে গণসংঘ গুলিতে পূর্ণ বিকশিত নগরিকজীবন, বাণিজ্যক লেনদেন এবং শিল্পের বিকাশ ঘটেছে। মহাবগ্গ বর্ণিত বৈশালী এবং মহাবস্তু বর্ণিত কপিলাবস্তু জনসমৃদ্ধ, ধনী নগরের চিত্র উপস্থাপন করে। জাতক বৈশালীনগরের বাসিন্দাদের সামাজিক ও আর্থিক দিক দিয়ে ধনী, মধ্যবিত্ত ও দরিদ্রে ভাগ করা হয়েছে, সর্ব্বোর্চ্চ পর্যায় ৭০০০টি গৃহ, মধ্যবর্তীতে ১৪০০০ এবং নিম্নে ২১০০০ গৃহ ছিল। সর্ব্বোচ্চ পর্যায় বাসিন্দারা যে রাজকূল ছিলেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৈশালীর প্রশাসনিক সংঘের ৭৭০৭ সদস্য সংখ্যা থেকে। জমির একটি বড় অংশকে গণের সম্পত্তি মনে করা হত এবং সেই জমির চরিত্র গণসংঘই নির্ধারিণ করত। শাক্য ও কোলিওদের দাসভৃতকদের মধ্যে রোহিনী নদীর জল বন্টন নিয়ে বিবাদ দেখা যায়, পরে এই বিবাদে গণসংঘ গুলির রাজকূল জড়িয়ে পড়ে। এই কাহিনী জমিতে অজ্ঞাতিশ্রমের বিবরণ পাওয়া যায়। এই গণের মালিকানা ভুত্ত(জমি মূলত পরিচালনা করতেন (ত্রিয়রা তবে পাশাপাশি ব্যাত্তি(মালিকানাও ছিল। (ত্রিয় ও ধনী বৈশ্যদের নিজস্ব ব্যত্তি(গত জমি থাকতো। এইরূপ ভূমি ব্যবস্থা রাজতন্ত্রের চেয়ে পৃথক ছিল যেখানে রাজার নির্দিষ্ট জমি ছাড়াও ব্রাহ্মণ ও রাজকর্মচারীদের ভূমি প্রদান করা হত। জনসংঘ গুলিতে (ত্রিয়দের ব্যত্তি(গত জমি থাকার ফলে তারা আর্থিকভাবে মূলপ্রশানিক কাঠামোর বাইরে স্বাধীন সত্ত্বালাভ করেছিল। গণসংঘের অর্থনৈতিক কার্যকলাপে হস্তশিল্প ও বাণিজ্য বিশেষভূমিকা নিয়েছিল। মহাবস্তু কপিলাবস্তুতে মনিকার, সুবর্নকার, তাম্রকার প্রভৃতি বিশেষজ্ঞদের কথা বলছেন, আবার বুদ্ধঘোষের বর্ণনায় শুধু বৈশ্যরা নয়, (ত্রিয়রাও বানিজ্যের সঙ্গে যুক্ত(থাকতেন যা আর্থিকভাবে ছিল খুবই সমৃদ্ধি দায়ক। বিভিন্ন গণসংঘের মধ্য গো-শকটে বানিজ্যিক যোগযোগ চলত। আবার কিছু কিছু জনসংঘে মুদ্রা ব্যবস্থাও পাওয়া যায়।

এইভাবে গণসংঘ সম্পর্কে একটি সাধারণ ধারণা পাওয়া যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে সবচেয়ে শত্তি(শালী গণসংঘে ছিল বৃজি(বজ্জি) এবং এই গণসংঘের নেতৃত্বে ছিল লিচ্ছাবিরা। এদের রাজধানী ছিল বৈশালীতে। সাম্রাজ্যবাদী মগধের উত্থানের আদিপর্বে অত্যন্ত গুরুত্ব পূর্ণশত্তি(হিসাবে বিরাজ করছিল, তাই এদের শাসনব্যবস্থা সেই যুগের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বোঝার জন্য খবু গুরুত্বপূর্ণ।

লিচ্ছবিদের জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশ (মতার বলয়ে ছিলেন, এরা মূলত (ত্রিয় পুরুষ ছিলেন। একপন্ন জাতক এবং চুল্লকলিঙ্গ জাতক লিচ্ছবিদের ৭৭০৭ জন রাজার উল্লেখ করে বলেছেন প্রত্যেক রাজার অধীনে একজন করে উপরাজা, সেনাপতি ও ভাণ্ডারায়ক (কোযাধ্য( ) থাকতেন। মহাবস্তু ৮৪০০০ জন রাজার কথা বলেছেন তবে এটিকে অতিশয়েত্তি(মনে করা হয়। বুদ্ধ বৈশালীর এই বহুরাজিকতার কারণে সেখানে মহাপরিনির্বাণ লাভে সম্মত হননি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার এবং ডি. আর ভান্ডারকর মনে করেন এই ৭৭০৭ সংখ্যা অঞ্চলকে চিহি(ত করে,

লিচ্ছবিদের এলাকা এতগুলি অংশে বিভক্ত(ছিল। একটি আমলাতান্ত্রিক কাঠামো নিয়ে এখানে রাজা শাসন করতেন। আলতেকর মনেকরেন লিচ্ছবিদের সর্বোচ্চ সংস্থার সদস্যদর রাজা বলা হত। তারা (ত্রিয় পরিবারগুলি প্রধান ছিলেন এবং সরাসরি নির্বাচিত হয়ে যেতেন। তাই B. C. Law এই ব্যবস্থাকে বংশানুত্র(মিক অভিজাততন্ত্র বলে মনে করেছেন।

লিচ্ছবিরা দৈনন্দিন শাসনকার্যের সুবিধাথে এই সংস্থা থেকে আট বা নয়জন সদস্যকে মনোনীত করতেন শাসন কার্য পর্যবে(ণ করার জন্য। মূলত মগধ লিচ্ছবি সংঘাতের সময় দ্রুত সিদ্ধান্তে নেবার জন্য মন্ডলীগড়ে ওঠে। জৈন মূত্রে অর্যপরিষদ ও বৌদ্ধ সূত্রে নবপরিষদের উল্লেখ এই প্রথমেই করা হয়েছে। জৈনএ বৈশালী শাসক হলেন চেদগ। আটজনের সংস্থা একজন ব্যক্তি(কে রাষ্ট্রপ্রধান ও প্রধান বিচারপতি পদে নির্বাচিত করেন। বৌদ্ধরা ঐ ব্যক্তি(কে মন্ডলীর সদস্য ধরায় তাদের সংখ্যা নয় জন হয়েছে।

লিচ্ছবিদের শাসন ব্যবস্থায় বংশানুত্র(মিক শাসন থাকায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি(দের রাজা হবার সম্ভাবনা থাকে না। সর্বোচ্চ সংস্থার সদস্য হতে গেলে রাজকূল পবিবারেরর প্রধান হতে হত। অতঃপর বর্তমান শাসকের মৃত্যুর অপে(া করতে হত। তারপর পরিষদ সিদ্ধান্ত নিত শাসককে হবে। তাই কোন প্রধান শাসক পরিণত বয়স্কনা হয়ে সেই পদে যেতে পারতেন না। আবার বেশিদিন (মতা ভোগ করতে পারতেন না, তাই (মতা কু(গত করে তাকে বংশনুত্র(মিক কর তোলার তেমন সুযোগ ছিল না। মহাপরিনির্বাণ সূত্ত থেকে জানা যায় ঘন ঘন লিচ্ছবিদের সর্বোচ্চ সংস্থার অধিবেশন ডাকা হত। সেগুলি বহুদিন ধরে চলত এবং সদস্যদের, পদ গ্রহণে আগে পবিত্র পো(রিনী (পুকুর) তে স্নান করে অভিষিক্ত(হতে হত।

লিচ্ছবিদের সঙ্গে অন্যান্য গণসংঘের ভাল সম্পর্ক ছিল তবে ছোট খাট সংঘাত হয়েছিল বুদ্ধের চিতা ভস্ম নিয়ে, তবে তারা বজ্জিশক্তি(সংঘর সদস্য ছিল, (যেটি মূল কেন্দ্র ছিল বৈশালী। সাম্রাজ্যবাদী মগধের সঙ্গে তাদের সম্পর্ক খারাপ ছিল না বিম্বিসার লিচ্ছবি কন্যা চেল্লনাকে বিবাহ করলে বৃজিলিচ্ছবি ও মগধের মধ্যে সুসম্পর্ক ও মৈত্রী প্রতিষ্ঠিত হয় যা পরবর্তী শাসক অজাতশত্রু আগ্রাসী নাতির ফলে বিনষ্ট হয়েছিল। কেন এই যুদ্ধ হয়েছিল তার কারণ জানা যায় বৌদ্ধ জৈনসূত্রের কাহিনী থেকে।

(১) জৈন নিরয়বলিক সূত্র অনুসারে বিম্বিসার তার লিচ্ছবি পত্নী চেল্লনার দুই পুত্র হল্ল ও বেহল্লকে একটি মূল্যবান কন্টহার ও একটি দৈবী (মতা সম্পন্ন হাতী প্রদান করেছিলেন। (মতায় এসে অজাতশত্রু(সেগুলি ফেরৎ চাইলে হল্ল ও বেহল্ল লিচ্ছবিদের কাছে আশ্রয় নেয়, ফলে সংঘাতের সূত্রপাত হয়।

(২) মহাপরিনির্বাণ সূত্ত ও সুমঙ্গল বিলাসিনী গ্রন্থ অনুসারে বুদ্ধের মৃত্যুর পর মগধ ও লিচ্ছবির যুদ্ধ হয় গঙ্গার ওপর নাম না জানা বন্দরের দখলকে কেন্দ্র করে । এই বন্দরের নিকট অবস্থিত পাহাড়ের পাদদেশে সুগন্ধি দ্রব্যের খনিকে কেন্দ্র করে দুই শক্তি(র সম্পর্কর অবনতি হয়।

বৃজিদের পরাস্ত করতে অজাতশত্র(র মন্ত্রী বাস্‌সকার বুদ্ধের শরণাপন্ন হন এবং বুদ্ধ বৃজিদের ঐক্যকেই তাদের মূল শক্তি(হিসাবে বর্ণনা করেন। ১৬ বছর ধরে দুই দফায় যুদ্ধ হয়। বৌদ্ধ ও জৈনসূত্র অনুসারে প্রথম যুদ্ধে মগধের সেনাবাহিনী (তি গ্রস্থ হওয়ায় পশ্চাৎ অপসারন করে। এই যুদ্ধ ঘোরতর হয়েছিল। অতঃপর বাসস্‌কার বৃজিদের সর্ব্বোচ্চ পরিষদ এ ভেদনীতি (মিথুভেদ) ও কূটনীতি (উলাপন) র যুগপৎ প্রয়োগ করে গনসংঘে বিভেদ নীতিতে স(ম হন।

দ্বিতীয় যুদ্ধটি ছিল মূলত খন্ডযুদ্ধ, এখানে বন্দর ও সুগন্ধীদ্রব্যের দখল নিয়ে যুদ্ধ হয়, কিন্তু এই সময়ে বৃজি-লিচ্ছবি রা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিল। মগধের মতো অত্যন্ত (মতাধর এক রাজতান্ত্রিক মহাজনপদের সঙ্গে দীর্ঘদিন লড়াই করতে করতে গণরাজ্য গুলি ত্র(মেশ দুর্বল ও (য়িষ্ণু হয়ে গিয়েছিল বলে কোশাম্বী মত প্রকাশ করেছেন। মহাজনপদগুলির অস্তিত্ব বজায় রাখার জন্য প্রয়োজন ছিল বিরাট সংখ্যক সৈন্যের এবং সৈন্য প্রতিপালনের জন্য যে

সুপ্রতিষ্ঠিত কৃষি অর্থনীতির প্রয়োজন ছিল তা রাজতান্ত্রিক কাঠামোতই সুলভ ছিল। এরপাশাপাশি মগধর ছিল সুদৃঢ় প্রতির(া ব্যবস্থা। মহাপরিনির্বাণসূত্তে বুদ্ধ শেষবার রাজগৃহ থেকে গঙ্গা অতিত্র(ম করে বৈশালী অভিমুখে যাবার সময় গঙ্গাতীরস্থ (ুদ্র পাটলীগ্রামে সুর(া প্রাচীর নির্মীত হতে দেখেছিলেন। এছাড়া অজাত শত্রুর সৃষ্টি অভিনব অস্ত্র প্রথম যুদ্ধে রথমুষল এবং দ্বিতীয় যুদ্ধে মহাশিলা কন্টক প্রয়োগ করে বৃজি-লিচ্ছবিদের পরাস্ত করেন।

বাসস্কারের কূটনীতি বজ্জিদের ঐক্য ভেবে দিলে সমর কুশল মগধেরর প(ে তাদের পরাস্ত করা কঠিন হয়নি। বজ্জিশক্তি(সংঘ ভেঙ্গে গিয়ে মগধের অধীনস্থ হয়ে পড়ে এরপর সাম্রাজ্যবাদী মগধের দ্রুত অভুৎথান শুরু হয় কিন্তু লিচ্ছবিরা একটি-পৃথক গোষ্ঠী হিসাবে অস্তিত্বটি টিকিয়ে রাখে গুপ্ত আমলেও তারা বেশ গুরুত্ব পূর্ণ ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের লিচ্ছবী কন্যাকুমারদেবীকে বিবাহ এবং তাদের পুত্র সমুদ্রগুপ্তের 'লিচ্ছবিদৌহিত্র উপাধিধারন লিচ্ছবিদের রাজনৈতিক অস্তিত্বের ইঙ্গিত বহন করে।

৯.২.৬.৪ — শক্তি(শালী রাজ্যরূপে মগধের উত্থান (Unit-6)

ইতিপূর্বে আমরা ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ পেয়েছি। ত্র(মশ দেখা যায় যে মধ্য গাঙ্গেয় তথা পারিপার্শ্বিক অঞ্চলের এই ষোলটি মহাজনপদ বা সেই অর্থে রাজ্যের মধ্যে শক্তি(শালী হিসাবে উদ্ভুত হয় কোশল, বৃজি, অবন্তী এবং মগধ। এদের মধ্যে বৃজির আলোচনা আমরা পূর্বেই করেছি। বাকীরাজ্য সমূহের মধ্যে মগধ ত্র(মশ শক্তি(শালী রাজতান্ত্রিক শক্তি(রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৯.২.৬.৪.১ — মগধের উত্থান কারণ ঃ—

শক্তি(শালী রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রহিসাবে মগধ কেন আত্মপ্রকাশ করল এবং তার সাফল্যের কারণ নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে বিভিন্ন চিন্তাভাবনা ও আলোচনার অবকাশ রয়েছে। ভৌগোলিক অবস্থান গত সুবিধা মগধ লাভ করেছিলো । মগধের রাজধানী রাজগৃহ ছিল পর্বত বেষ্টিত সেই কারণে শত্রুদের থেকে সুর(িত ছিল। পাশাপাশি, সেই অঞ্চলে রাজধানীকে র(া করতে নির্মীত হয়েছিল পাথরের তৈরী প্রাচীর। পাশাপাশি এই অঞ্চলের নিকটে প্রাপ্ত খনিজদ্রব্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ছিল। রাজধানী অঞ্চল থাকার জন্য মগধে একটি উন্নত শাসনব্যবস্থা গড়ে উঠতে পেরেছিল। পূর্বপ্রান্তে অবস্থানের কারণে বৈদেশিক শত্রুদের আত্র(মণের হাত থেকে মগধকে সুর(িত রাখা যেত। ঠিক এই কারণে মগধ আলেকজান্ডারের আত্র(মণের হাতে পড়েনি।

মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার পূর্বাংশর ছোটনাগপুর মালভূমি উচ্চমানের খনিজদ্রব্য দ্বারা সমৃদ্ধ। আকরিক লোহার ভান্ডার যে মগধের লৌহনিমিত অস্ত্র নির্মানের প্রধান উপাদান হয়েছিল। এই অস্ত্রশস্ত্রের ওপর নিয়ন্ত্রণ মগধের রাজশক্তি(র শক্তি(বৃদ্ধির সহায়ক হয়। পাশাপাশি স্থানীয় অরণ্যের হস্তীবাহিনীকে মগধ শাসকরা কৌশলে নিয়ন্ত্রন করেন।

মগধে বর্ণব্যবস্থা ছিল অনেকাংশে শিথিল। এখানে যে শাসকরা শাসন করেন তারা কিন্তু অধিকাংশ সময় (ত্রিয় বর্ণভূক্ত(ছিলেন না। র(ণশীল ব্রাহ্মণ্য ব্যবস্থার কেন্দ্র থেকে অনেক দূরে অবস্থিত হবার জন্য মগধে আপাত সামাজিক শৈথিল্য ছিল। বর্ন অবস্থান যাই হোক, যোগ্য রাজবংশ মগধে শাসক হয়েছে। আবার শাসক যোগ্যতা হারালে তাকে পদচ্যুত করে নতুন শাসক (মতায় এসেছে। পাশাপাশি, সাম্রাজ্যবাদী নীতির মাধ্যমে মগধ বিভিন্ন জনপদ অধিকার করেছে।

অধ্যপক হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মত, এই রকম ভৌগোলিক, বস্তুগত, ও সমাজ সাংস্কৃতিক উপাদান সমূহ মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার মহাজনপদগুলিত বিস্তারে সহায়ক হয়েছিল। হিমালয়ের পার্বত্য অঞ্চলের জনপদগুলি তুলনায় নিজেদের স্বতন্ত্রতা বজায় রাখতে বেশি আগ্রহী ছিল।

৯.২.৬.৪.২ — প্রাথমিক মগধ রাজবংশ ঃ—

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের পূর্বে মগধ জনপদ সম্পর্কে ধারণা সেই অর্থে নেই। দক্ষিণে বিহারের এই স্থানটি 6th Century BCE এর পূর্বে কার্যত নগণ্য ছিল। এই অবস্থা দ্রুত পরিবর্তন হয় বিম্বিসারের সময়কাল থেকে।

C.545/544 BCE-C493BCE সময় কালে বিম্বিসার মগধে রাজত্ব করেন। সুত্তনিপাত অনুসারে তিনি বুদ্ধের অনুগামী ছিলন। সমকালীন তথ্য সূত্রে বিম্বিসারের বংশ মর্যাদা সম্পর্কে কিছু না পাওয়া গেলেও পরবর্তীকালে অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিতে বলা হয়েছ তিনি হর্যঙ্ককুলের শাসক । মগধের শক্তি বৃদ্ধি করাই ছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য। বিভিন্ন জনপদে সঙ্গে যুগপৎ রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে তোলেন। কিন্তু শুরুতেই তিনি জঙ্গীনীতি গ্রহণ করেননি। তিনি কোশল, বৃজি ও মদ্ররাজ্যের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করেন। কোশলদেবীকে বিবাহে র ফলে কাশীগ্রাম যেমন যৌতুক লাভ করেন, তেমনি মগধের এলাকার বাইরে মগধের পদচিহ্ন পড়ল। এরপর তিনি পূর্বদিকে অঙ্গজনপদের দিকে অভিযান করে রাজধানী চম্পা অধিকার করেন। অন্যদিকে লিচ্ছবিকন্যা চেল্লনাকে বিবাহ করে তিনি গণরাজ্যগুলির সঙ্গে সুসম্পর্ক তৈরী করেন। এই ভাবে মগধকে কোশল, অবন্তীর মতোই একটি শক্তিধর মহাজনপদে পরিণত করেন।

বৌদ্ধসূত্র অনুসারে বিম্বিসার বুদ্ধের অনুগামী ছিলেন। বুদ্ধবিদ্বেষী দেবদত্তের কুপারমর্শে অজ্জাত শত্রু পিতাকে হত্যা করে সিংহাসনে বসেন। বিম্বিসারের মৃত্যুশোকে কোশল দেবী প্রাণত্যাগ করলে, তৎকালীন কোশল রাজ প্রসেনজিৎ (পসেন্দি) কাশীগ্রাম ফিরিয়ে নেন। পরিণতিতে অজাতশত্রু ও প্রসেনজিৎের সংঘাত হয়। অজাতশত্রু জয় লাভ করে প্রসেনজিৎের কন্যাকে বিবাহ করে কাশীগ্রাম পুনরায় যৌতুক রূপে গ্রহণ করেন। এরপর প্রসেনজিৎের পুত্র বিড়ুদভ বিদ্রোহী হলে তিনি রাজ্য ছেড়ে মগধে পালায়ন করেন। কিন্তু রাজগৃহের দ্বারপ্রান্তে তার দেহান্ত হয়। বিড়ুদভ শাক্যকূল নির্মূল করার পর বন্যায় নিহত হন। তারপর কোশলরাজবংশ সম্পর্কে কিছু জানা যায় না। স্বভাবতই দৌহিত্রকূল বা জামাতা-হিসাবে অজাতশত্রুর কোশল অধিকার করা কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

বৃজিজনপদের সঙ্গে তার দীর্ঘবিবাদ পূর্বেই আলোচিত হয়েছে, ষোলবৎসর যুদ্ধ করে অজাত শত্রু নয়টি লিচ্ছবি, নয়টি মল্ল, কাশী কোশলের আঠারোটি গণরাজ্যক পরাস্ত করেন। দীর্ঘ যুদ্ধের পর গণরাজগুলিকে পরাস্ত করা হল রাজতন্ত্র দৃঢ়তর হয়।

অজাতশত্রুর সময় থেকে রাজগৃহর বদলে পাটলিপুত্রকে গুরুত্বপূর্ণ নগর রূপে গড়ে তোলার প্রক্রিয়া চলতে থাকে। উদায়িনের সময়কালে রাজধানী রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত হয়। গঙ্গা, শোন ও গন্ডকের সঙ্গমস্থল হওয়ায় নদী পথে যাতায়াত ও বানিজ্য উভয়েরই সুবিধা হয়।

হর্যঙ্কবংশের পরবর্তী শাসকদের তালিকা পুরান ও সিংহলী সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে এরপর হর্যঙ্কবংশীয় শাসকদের জায়গা নেন শিশুনাগ। সম্ভবত তিনি প্রথমে বারানসীর স্থানীয় শাসক ছিলেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বংশটির নাম Shaishunag dynasty (শৈশুনাগ বংশ)। এই বংশের কয়েকজন রাজার নাম পাওয়া যায় কালাশোক, কাকবর্ণ, নন্দীবর্ধন, পঞ্চমক প্রভৃতি। সময়কালীন তথ্যসূত্রে এদের সম্পর্কে আলাচনা কম।

শৈশুনাগ বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে নতুন যে বংশ ক্ষমতায় আসে তা হল নন্দ বংশ। নন্দরাজারা যে ক্ষত্রিয় বংশীয় বা উচ্চকুলোদ্ভব ছিলেন না, সেই বিষয়ে সব তথ্য সূত্র একমত। প্রথম নন্দরাজা মহাপদ্মনন্দ পুরাণে বর্ণিত হয়েছেন 'শূদ্রা গর্ভোদ্ভব' হিসাবে। জৈন পরিশিষ্ট পর্ব মতে তিনি নাপিতপুত্র। শৈশুনাগ বংশীয় কাকবর্ণকে হত্যা করে ক্ষমতায় আসেন বল হর্ষচরিতের অভিমত। নিম্নকুলে জন্ম হলেও মহাপদ্মের ক্ষমতা দখলে তা কিন্তু বাধা হয়নি। পুরাণ তাকে 'সর্বক্ষত্রান্তক' এবং 'একরাট' বলা হয়েছে। ইক্ষাকু, পাঞ্চাল, কাশী,হৈহয় কলিঙ্গ, অশ্মক, কুরু, মৈথিল শূরসেন অঞ্চলে তার আধিপত্য ছিল। নন্দবংশর শেষ রাজা ধননন্দ ও ঔগ্রসৈন্য। যিনি গ্রীক বিবরনীতে অ্যাগ্রম্মেস এর সঙ্গে অভিন্ন। তার রাজ্যকে যুগ্মভাবে প্রাসিওয় (Prasioi) ও গঙ্গারিডাই (Gangaridai) বলা হয়েছে। সম্ভবত Prasioi অর্থে প্রাচ্যদেশ

এবং গঙ্গারিডাই বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের চন্দ্রকেতুগড় হিসাবে চিহ্নি(ত। গ্রিক বর্ণনায় মগধের বিপুল সেনাবাহিনীর বিবরণ পাওয়া যায়। উত্তর ভারতের বড় অংশে ও ওড়িষ্যার অনেকাংশে মগধের (মতা বিস্তার কৃতিত্ব নন্দরাজাদের প্রাপ্ত। এই কারণে কঠোর রাজস্ব ব্যবস্থার মাধ্যমে বহুসম্পদ তারা আহরণ করেছিলেন। এই ভাবে দেখা যায় বিভিন্ন রাজবংশ মগধে একটি শক্তি(শালী রাজ্য গড়ে তুলতে সহায়ক হয়েছিল।

৯.২.৬.৪.৩ — মৌর্যবংশের উত্থান ঃ—

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের প্রথমভাগে মগধের (মতা উত্তরভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়েছিল। নন্দবংশীয় শাসনের অবসান ঘটিয়ে মগধে (মতায় আসেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য। মৌর্যবংশ সম্পর্কপ্রয়োজনীয় তথ্য হিসাবে পাওয়া যায় মেগাস্থিনিসের ইন্ডিকা, এছাড়া অন্যান্য সাহিত্য সূত্র সমূহ যথা বিভিন্ন গ্রীক লেখকদের বিবরণ, পুরাণ সমূহ, অর্থশাস্ত্রের অধ্য(প্রচার অংশটি, সেটির সময়কাল 3rd Century BCE এছাড়া সিংহলী অবদান সাহিত্য দিব্যবদান ও অশোকাবদান গ্রন্থ মৌর্য আমলের পরবর্তীকালে। পুরাতাত্ত্বিক সা(্যপ্রমাণের মধ্যে উল্লেখযোগ্য অশোকর অনুশাসন সমূহ।

যেগুলিরকে নিম্নোক্ত(ভাগে চিহ্নি(ত করা যায়।

(1) 14 major rock edict (2) 7 major Pillar edicts (3) 2 minor rock edicts (4) 2 Separate rock-edict (Kalinga edict) (5) Minor Pillar edicts (6) 2 pillar inscriptions (7) Barabar Cave edict (donative).

এছাড়া মৌর্য্য আমলে রৌপ্যমুদ্রা Silver Coin ব্যবহৃত হত। সেগুলি অঙ্কচিহ্নি(ত (Punched marked Coin) মুদ্রা এই সমস্ত উপাদান ব্যবহার করে মৌর্য সময় কাল সম্পর্কে তথ্য অর্জন করা সম্ভবপর হবে।

মৌর্যবংশের প্রথম শাসক চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের বংশপরিচয় নিয়ে সুনির্দিষ্ট তথ্যের অভাব রয়েছে। জৈনসূত্রে পরিশিষ্টপর্বন (Parishistaparvan) চন্দ্রগুপ্তকে ময়ূরপোষক বলেই তার নাম মৌর্য এমন আভাস দেওয়া হয়েছে। সেখানে কিন্তু এই উক্ত(র সহায়ক কোন সা(্য না থাকায় পরিশিষ্টপর্বনের ব্যাখাকে নির্বিচারে মনে কঠিন। তবে মনে রাখত হবে। ময়ূর কিন্তু এদের প্রিয় খাদ্য ছিল। অশোকের লেখঅনুসারে প্রাণীহত্যা নিয়ন্ত্রণ করেও প্রাথমিকভাবে তিনি রাজপ্রাসাদে দুটি ময়ূর ও একটি হরিণ হত্যার অনুমতি দিয়েছিলেন। সম্ভবত রাজকুলের ঐতিহ্যগত খাদ্য এতসহজে বন্ধ করে দেওয়া কষ্টকর ছিল। সিংহলী মহাবংশ তাঁকে খত্তিয় ((ত্রিয়) বংশভূত বলেছে, আবার মুদ্রারা(স তাঁকে 'নন্দান্বয়' বা নন্দবংশীয় বলেছেন। তবে এই তথ্যগুলি পরবর্তীকালের। সমকালীন অতি প্রাচীন পালি বৌদ্ধগ্রন্থ 'মহাপারিনিব্বান সূত্ত'র সা(্য অনুসারে, মোরিয় (Moriyas) গোষ্ঠী পিপফলীবন (Pipphalivana) অঞ্চলের একটি অরাজনৈতিক গোষ্ঠী। এদের অবস্থান ছিল নেপালের তরাই অঞ্চল ও উত্তরপ্রদেশের গোর(পুরের মধ্যবর্তী অঞ্চলে সম্ভব এই স্থানটি কোন অরণ্যক অঞ্চলে অবস্থিত ছিল। Justin এর বিবরণে Sandrocottos এর বংশগরিমা ছিল না। তিনি পশুদের মধ্যেই বড় হয়েছিলেন। চন্দ্রগুপ্ত আলেকজান্ডারকে নন্দদের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করতে চেয়েছিলেন। আলেকজান্ডার ভারত ত্যাগের পর তিনি বিরাট সাম্রাজ্য স্থাপন করে ম্যাসিডোনীয় শাসন উচ্ছেদ করেন।

অধ্যাপক B.N. Mukherjee মনে করেন C325-24 BCE নাগাদ চন্দ্রগুপ্ত ধননন্দদের উচ্ছেদ করেন। তবে তার বিবরণ পাওয়া যায় পরবর্তী সূত্রে এর বিবরণে আলেকজান্ডার দেশত্যাগের পরেই ভারতবর্ষ তার দাসত্ব পাশ থেকে মুক্তি(লাভ করে। চন্দ্রগুপ্তের সঙ্গে সেলুকাসের যুদ্ধ এবং মৈত্রীর কাহিনী আমাদের অজানা নয়। তবে সেলুকাসের কন্যাকে চন্দ্রগুপ্ত বিবাহ করেছিলেন বলে যে প্রচলিত মত রয়েছে তা কতটা বাস্তব সেই বিষয়ে ঐতিহাসিক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জ্জী এবং রোমিলা থাপার সন্দিহান। তারা মনে করে বা অর্ন্তবিবাহ, অর্থাৎ গ্রিক ও ভারতীয়দের বিবাহ স্বীকৃত হয়েছিল। সেলুকাসের কাছ থেকে চন্দ্রগুপ্ত লাভ করেন Paropanisadai (হিন্দুকুশের দঃ পূর্ব এলাকা), Arachosia (কান্দাহার), Gedrosia (বালুচিস্থান) অঞ্চল বিনিময়ে Selucus লাভ করেন ৫০০ রণহস্তী।

চন্দ্রগুপ্তের সময়কালে মৌর্য সাম্রাজ্য উত্তরপশ্চিম ভারত থেকে পূর্বভারত এমনকি দ(ি ণভারতে বিস্তৃত হয়। বহুল প্রচলিত মত অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের গুরু তথা প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য মৌর্য্যসাম্রাজ্য বিস্তারে সহায়তা করেন। তবে এই বিষয়ের কোন সমসাময়িক তথ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না। জৈন সূত্র Rajavali Kathe অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের শাসনের শেষ সময়ে ভয়ানক দুর্ভি(হয়েছিল, তখন তিনি জৈনধর্মগুরু ভদ্রবাহুর সাথে দ(ি ণভারতে কর্ণাটকের শ্রবণবেলগোলা (sravana belagola) অঞ্চলে সাল্লেখানা (Sallekhana) করে অনশনে দেহত্যাগ করেন।

তার পরবর্তী শাসক বিন্দুসার ২৭ বৎসর (আনুঃ 300-273BCE) শাসন করেন। তাঁর উপধি ছিল অমিত্রঘাত, গ্রিক মতে Alitrokhate বা Amitraghata । দিব্যবদান অনুসার তাঁর আমনে ত(শীলাতে বিদ্রোহ দেখা দিলে বিন্দুসারের পুত্র অশোক সেই বিদ্রোহ দমন করেন। তিনি সিরিয়ার গ্রিক শাসন Antiochus I এর সঙ্গে সুসম্পর্কে লিপ্ত ছিলেন। বিন্দুসারে সিরিয়ার রাজার কাছে উন্নতমদ্য, ডুমুর এবং একজন সিরিয়ান দার্শনিক প্রেরণের অনুরোধ করেন।

অশোক ও ধম্ম ঃ—

অশোকের আমলে মৌর্য সাম্রাজ্যের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সময়। C.273BCE র সময়কালে সিংহাসন আরোহণ করলেও তিনি C.269BCE তে রাজ্য অভিষেক করেন। পরবর্তী বৌদ্ধসাহিত্য অনুসারে অশোক তার ভাইদের হত্যা করে সিংহাসন আরোহণ করেন এবং অভিষেকে পর অষ্টমবর্ষে অর্থাৎ রাজত্বের ত্রয়োদশবর্ষে তিনি বর্তমান ওড়িশার অর্ন্তগত কলিঙ্গ জয় করেন। এই যুদ্ধের কারণ ছিল দুটি, প্রথমতঃ রাজধানীর সম্মুখে এত শক্তি(শালী রাজ্যের উপস্থিতি মগধের জন্য শুভ ছিল না। দ্বিতীয়ত ঃ— স্থলবেষ্টিত মগধের উপকূলের বাণিজ্য দখল করতে কলিঙ্গ জয় গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

কিন্তু রক্ত((য়ীযুদ্ধে পর অশোক যুদ্ধনীতি পরিত্যাগ করে, ধর্ম্মনীতি গ্রহণ করন। তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন। মাস্কি (Maski) লেখতে নিজকে 'বুদ্ধপাসক' বলেছন। প্রথম গৌণগিরিশাসনে তিনি উল্লেখ করন যে অভিষেকের দশম বছর অতিত্র(ম হলে অশোক সত্রি(য় বৌদ্ধ হিসাবে "সম্বোধি" (বোধগয়া) যান। বুদ্ধের জন্মস্থান লুম্বিনী গ্রাম গমন করেন। যার বিবরণ রুম্মিনদেই লেখতে আছে। তিনি ধর্ম যাত্রায় ২৫৬ রজনী পরিভ্রমণরত ছিলন। বৈরাট লেখতে অশোক ভি(ভি(ণীদের আদর্শ শাস্ত্রগ্রন্থ সমূহের তালিকা দিয়েছেন।

কিন্তু ধম্মসংত্র(ান্ত আলোচনায় আর্যসত্য বা অষ্টাঙ্গিকমার্গের আলোচনা অশোকের লেখতে নেই। গ্রীক ও আরামীয় লেখতে ধম্মর প্রতিশব্দ যথাত্র(মে ইউসেবিয়া এবং দাত/কসিৎ। যার অর্থ ন্যায় বা সততা। একাদশ গিরিশাসনে তিনি শ্রমণ এবং ব্রাহ্মণদের প্রতি সম্যক শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে বলেছেন। পাশাপাশি ধম্মের আলোচনায় আশোক যে আচরণ বিধির ওপর জোর দিয়েছেন তার প্রধান স্তম্ভ হল হিংসা পরিহার করা। তাই পঞ্চম গিরিশাসন (Rockedict V)তে তিনি ভেরীঘোষের বদলে ধম্মঘোষের কথা বলে আবার প্রানীহত্যাকারীদের বিতাড়নের কথাও বলেন। Rock edict -I এ তিনি রাজকীয় পাকশালায় দৈনিক মাত্র দুটি ময়ূর ও একটি হরিণ হত্যার কথা বলন। ষোড়শবর্ষ অতিত্র(ান্ত হবার পর দেখা গেছে শিকারী ও মৎস্য জীবীদের বিতাড়ন করেছেন তিনি। পঞ্চম স্তম্ভ অনুশাসনে তিনি ঘোষনা করেন এক প্রাণীর আহার্য অন্যপ্রাণী হতে পারে না।

ধম্ম অনুশীলনের জন্য কয়েকটি সদভ্যাসের চর্চা করতে বলেন তিনি। যথা পাপকর্ম থেকে বিরত থাকা (অপাসিনবে) সত্য নিষ্ঠা (সচে), শুচিতা (সোচয়ে), বহুকল্যান কর্ম (বহুকয়াণে) এছাড়া পিতা-মাতা ও শি(ককে সম্মান দেওয়া, বয়স্কদের প্রতি সমীহীন আচরণ, কৃপণ অশক্ত(, দাস-ভৃত্য, ব্রাহ্মণ শ্রমণদের প্রতি যথা বিহিত আচরণ করতে তিনি বলেনা এছাড়া চন্ডতা (চন্ডিয়ে), নিষ্ঠুরতা (নির্চুলেয়ে), ত্রে(াধ (কোধে), গর্ব (মানে), ঈর্ষা (ইস্যা) পরিত্যাগ করতেও উপদেশ করেন।

এইভাবে দেখা যায় আশোক ধম্ম প্রবর্তনের মাধ্যমে ভারতের শাসন ব্যবস্থায় এক আমূল পরিবর্তন এনেছিলেন। ধর্ম্মের দ্বারা প্রজাদের ইহলৌকিক ও পারলৌকিক কল্যাণে প্রতিবদ্ধ হন তিনি। এইভাবে মৌর্য সাম্রাজ্য একটি উন্নত

সাম্রাজ্য গড়ে তুলেছিল।

অশোকের ধম্মনীতিতে তিনি গুরুজনের প্রতিব্যবহারকে গুরুত্ব দিয়েছেন। পিতামাতা, গুরুর প্রতি সশ্রদ্ধ ও বিনীত আচরণ করা, বয়োবৃদ্ধের প্রতিসমীচীন আচরণ করা, ব্রাহ্মণ-শ্রমণ, কৃপণ-অসত্ত(, দাস-ভৃত্য প্রত্যেকের প্রতি যথাবিহিত আচরণ করা ধম্ম আচরণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুত্ত((সপ্তমস্তম্ভ অনুশাসন)। প্রথম ও নবম গিরিশাসনে তিনি আচার অনুষ্ঠানের পরির্তের ধর্ম্ম মঙ্গল করার প(পাতী। সমাজজাতীয় অনুষ্ঠান যেখানে অর্থশাস্ত্র অনুযায়ী মদ্যপান সহ উচ্ছৃঙ্খল উৎসব চলত, তা অশোকের দৃষ্টিতে পরিহার্য।

ধর্ম্মের প্রকৃতি সংত্র(ান্ত আলোচনায় এটুকু বোঝা যায় যে অশোক 'বুদ্ধপাসক' হলেও তার প্রর্বতিত ধম্ম কিন্তু বৌদ্ধধর্ম ছিল না। তিনি প্রচলিত প্রথার ওপর জোর দেবার সাথে নৈতিক জীবন চর্চার দিকেও গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তবে রাধাগোবিন্দ বসাক অশোকের এই সার্বজনীন ধম্মনীতির ওপর ধর্ম্মপদের প্রভাব ছিল বলে মনে করন। হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী মনে করেন সকল ধর্মের মূল উপজীব্য ছিল সুনীতি(তাই অশোক সকল ধর্মীয় সম্প্রদায়ের কাছে সুনীতির বত্ত(ব্যই উপস্থাপিত করেছিলেন। নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী দেখান যে সুনীতিবাচক — সামাজিক আচরণের (ে ত্রে অশোক পুরো জীবজগৎকেই অর্ন্তভূত্ত(করে নিয়েছেন। রোমিলা থাপার মনে করেন, সমগ্র সমাজের পটভূমিতে ব্যত্তি(র ন্যায় সঙ্গত আচারণের বিষয়টি ধম্মনীতির আদর্শ হিসাবে উপস্থাপিত হয়েছে। ধম্মনীতির মাধ্যমে অশোক সংকীর্ণ ধর্ম সাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গি ও গোষ্ঠী বদ্ধতার উর্ধ্বে উঠতে চাইছিলেন। তার ধম্মনীতি পরিসর এতটাই বিস্তৃত ছিল যে বিভিন্ন গোষ্ঠীর কাছে তা আপত্তিকর হয়ে ওঠেনি। আবার গবেষণার আলোকে ধর্ম্মনীতির আরেকটি যাত্রা ফুটে ওঠে। কান্দাহারের প্রান্ত অশোকের গ্রিক অনুশাসনে ধর্ম্মে (ইউসেবিয়া) মূল আচরণীয় অভ্যাসের তালিকায় অন্যতম ছিল প্রজার তরফে রাজার প্রতি আনুগত্য। এত প্রকট ভাবে এই রূপ বত্ত(ব্য অন্যত্রনেই। B. N. Mukherjee অন্যদিকে সপ্তম এবং ত্রয়োদশ গিরিশাসনে দৃঢ়ভতিতা (দৃঢ়ভত্তি(র) উল্লেখ পেয়েছেন। তিনি পানিনি উল্লেখ করে বলেন ভত্তি(মানেই রাজার প্রতি প্রজার ভত্তি(তথা আনুগত্য। অর্থাৎ প্রজার সুখ বিধান যেমন তিনি করবেন, তেমনি প্রজার কর্তব্য হল তারপ্রতি আনুগত্য। অতএব ধম্ম কেবল ধর্মীয় সংকীর্ণতা উর্ধ্বে ওঠা সামাজিক আচরন নয়, বরং এটি একটি বিশেষ শাসননীতি রূপেও ব্যবহৃত হয়েছিল।

এইভাবে দেখা যায় খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠশতকে যে নগরায়ণ দেখা যায় তার ফলে মগধ একটি শত্তি(শালী রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করে, এবং তে বৃহদ্রথের পতন পর্যন্ত মৌর্য সাম্রাজ্যে মাধ্যমে একটি বৃহত্তর সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রন কর। এমনকি তার পরেও মগধ গুপ্তযুগের শত্তি(র কেন্দ্রবিন্দু ছিল।

৯.২.৬.৪.৪ গুপ্তরাজবংশর সময়কাল ঃ—

ভারতীয় ইতিহাসে ৩০০ থেকে ৬০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়কালে উত্তরভারতে গুপ্তবংশীয় শাসকদের উত্থান ঘটে। মূলত তাদের শাসনের প্রমাণ পর্যন্ত 570AD নিশ্চিতভাবে পাওয়া যায়। মৌর্যবংশের পতনের পর (C.185BCE) মগধে শুঙ্গ ও কান্ব শাসকদের পাওয়া যায়। এই সময়ে উত্তর পশ্চিম সীমান্তে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের উত্থান, ত্র(মশ উত্তরভারতে কুষাণদের শাসন এই সমস্ত পেরিয়ে পুণরায় ৩০০ নাগাদ মগধে একটি নতুন রাজবংশ স্থাপিত হয়, যারা প্রায় তিনশ বছরের একটি নতুন রাজবংশ স্থাপিত হয়, যারা প্রায় তিনশ বছরের একটি স্থিতিশীল শাসন প্রর্বতন করেন। এই সময়কালে শিল্প, সাহিত্য সংস্কৃতির (ে ত্রে একটি সৃজনশীল বাতাবরণ তৈরী হয়। উপনিবেশিক যুগে জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকরা দেশের উজ্জ্বল অতীতকে তুলে ধরতে গুপ্ত আমলকে সুবর্ণ যুগ ((Golden Age) বলে ব্যাখা করলেও আজ সেটা সেভাবে গ্রহণযোগ্য নয়। আবার অনেকে মনে করেন গুপ্তদের রাজনৈতিক অধিপত্য থাকলেও তারা কিন্তু মৌর্যদের মত সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেননি। তাই R. C. Majumder এবং A. S. Altekar এই সময়কে গুপ্ত বাখাটক পর্ব বলে আখ্যায়িত

করেন। আবার দ(িণভারত চালুক্য ও পল্লব শক্তি(র উত্থান এবং দ্বন্দ্ব এই সময়ে দ(িণভারতের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। গুপ্তশাসকরা দ(িণভারতে অভিযান করলে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ রাখার পরিকাঠামো গড়ে তুলতে পারেননি।

বিভিন্ন তথ্যসূত্র বিশ্লেষন করতে জানা যায় গুপ্তরাজবংশের কথা। বিষ্(ুপুরাণ অনুসারে প্রথম তিন গুপ্তশাসক হলেন। শ্রীগুপ্ত, ঘটোৎকচগুপ্ত এবং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত। গুপ্তদের বংশানুচরিত অনুরূপ সা(্য প্রদান করে, যেখানে প্রাচীনতম শাসক 'গুপ্ত' নামধারী শাসক এবং তারপর ঘটোৎকচগুপ্ত এবং প্রথম চন্দ্রগুপ্ত, ল(্যনীয়, প্রথম দুই শাসক কেবলমাত্র 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত কিন্তু প্রথমচন্দ্রগুপ্ত এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা 'মহারাজধিরাজ' নামে অভিহিত। এই উপধির জমকালো পরিবর্তন রাজবংশের (মতা ও মর্যাদা বৃদ্ধির সঙ্গে সম্পর্কিত, সে বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই। শ্রীগুপ্তের উল্লেখ ই-জিং এর বিবরণে পাওয়া যায় Ijing তাকে উল্লেখ করে Che-li-ki-to নামে যিনি 'Mi-li-kia-si-kia-po-no' বিহারে ভূমিদান করেন। এই বিহার সম্ভবত মৃগস্থাপন বা মৃগশিখাবনের সঙ্গে অভিন্ন। রমেশচন্দ্র মজুমদার ও সুধাকর চট্টোপাধ্যায় মতে করেন। এই স্তুপ বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) বা মুর্শিদাবাদে অবস্থিত ছিল। তবে অনেকের মতে, মৃগস্থাপন আসলে মৃগদাব বা বারানসীর নিকট বুদ্ধের প্রথম উপদেশস্থল সারনাথ। তাছাড়া গুপ্তদের আদিতম লেখগুলি মধ্যগাঙ্গেয় এলাকার, বাংলার লেখগুলি পরবর্তী কালের।

তবে একথা স্বীকৃত যে এই বংশের তৃতীয় শাসক প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই বংশের প্রথম সার্বভৌম শাসক স্বাধীন ও স্বতন্ত্ররাজা হিসাবে সিংহাসন আরোহণকে স্মরণীয় 319-320 AD রাখতে নাগাদ নতুন অব্দ আরম্ভ করেন, যা গুপ্তাব্দ (Gupta era) নাম পরিচিত। গুপ্তদের লেখমালায় এই গুপ্তাব্দের বহুল ব্যবহার ল(্যনীয়। মধ্যগঙ্গা এলাকা মূলত, প্রয়াগ (এলাহাবাদ), সাকেত (অযোধ্যা এলাকা), এবং মগধ তার শাসনাধীন ছিল। তিনি তার রাজনৈতিক প্রভাবকে দৃঢ়তর করতে লিচ্ছবিগোষ্ঠীর রাজকন্যা কুমারদেবীকে বিবাহ করেন। লিচ্ছবিদের একটি প্রাচীন রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল, যেটা তিনি ব্যবহার করেন। তার আমলে গুপ্তদের স্বর্ণমুদ্রা চালু হয়। সেই মুদ্রায় মহিষীর প্রতি মর্যাদা প্রদর্শন করে প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ও কুমারদেবীর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ, সঙ্গে লিপি 'শ্রীচন্দ্রগুপ্ত শ্রীকুমারদেবী' এবং গৌণ দিকে লক্ষ্মীর প্রতিকৃতির সঙ্গে লিচ্ছবয়ঃ শব্দটি পাওয়া যাবে। এই থেকে মনে করা হয়, লিচ্ছবিরা গণরাজ্যহিসাবে নিজেদের অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেয়েছিল। চন্দ্রগুপ্তের এই (মতা বৃদ্ধি লিচ্ছবিদের সাহায্যে হয়েছিল কিনা সেটা একটি গুরত্বপূর্ণ বিষয়। তাঁর পুত্র সমুদ্রগুপ্তের 'লিচ্ছবি দৌহিত্র' উপধি গ্রহণ থেকে প্রমাণিত হয়, যে প্রাথমিক গুপ্তসাম্রাজ্যের শক্তি(র একটি উৎস হয়তো ছিল এই লিচ্ছবিরা, তাই শাসনের শুরুরকালে এদের যথোপযুক্ত(মর্যাদা প্রদান করতে হয় গুপ্তদের। তাছাড়া শ্রীগুপ্তের সেরকম রাজনৈতিক ঐতিহ্য ছিল না, সেটা ছিল লিচ্ছবিদের, তাই সমুদ্রগুপ্ত পর্যন্ত মাতৃকুলকে বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করেন।

আনুমানিক 335AD নাগাদ সমুদ্রগুপ্ত সিংহাসনে আরোহণ করেন। তার রাজ্যকালের বিবরণ পাওয়া যায় তাঁর সভাকবি হরিষেণের বর্ণিত এলাহাবাদ প্রশস্তিতে। এই লেখ অনুসারে, পিতার জীবিতাবস্থাতে অন্যরাজকুমারদের ম্লান করে দিয়ে সমুদ্রগুপ্ত উত্তরাধিকারী নির্বাচিত হন। সমুদ্রগুপ্তের সাম্রাজ্য বিজয়ের ইতিহাস বিবৃত আছে এলাহাবাদ প্রশান্তির মধ্যে। উত্তরভারতে নয় জন রাজাকে তিনি উৎখাত করেন। সেই সব আর্যাবর্তরাজ হলেন (১) রুদ্রদেব, (২) মতিল, (৩)নাগদত্ত, (৪) চন্দ্রবর্ম্মা (৫) গণপতিনাগ (৬) নাগসেন (৭) অচ্যুত (৮) নন্দি (৯) বলবর্ম্মন। এর পাশাপাশি কোত বংশীয় একরাজাকে (কোতকুলজ) পরাস্ত করেন। আবার সকল আটবিকরাজ্য (অরণ্য অঞ্চল) তার পরিচারকে পরিণত হয়। (পরিচারককৃত সর্বাটবিকরাজ)। এই আগ্রাসী সামরিক নীতির প্রয়োগে গুপ্ত শাসন ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করে। এর পাশাপাশি দ(িণাপথে উল্লেখযোগ্য সামরিক সাফল্যের মাধ্যম এগারোজন শাসককে পরাস্ত করেন, তাঁরা হলেন (১) কোশলের মহেন্দ্র (২) মহাকান্তারের ব্যাঘ্ররাজ (৩) কৌরালের মন্টরাজ (৪) পিষ্টপুরের মহেন্দ্রগিরি (৫) কোট্টুরের স্বামিদত্ত (৬) এরন্ড পল্লীর দমন (৭) কাঞ্চীর বিষ্(ুগোপ (৮) অবিমুক্তে(র নীলরাজ (৯) বেঙ্গীর হস্তিবর্মন (১০) পালক্কের উগ্রসেন (১১) কুস্থলপুরের ধনঞ্জয়।

উত্তর ও দ(ণভারতে এই সামরিক অভিযান হলে নীতিগত ভিন্নতা ঐতিহাসিকদের চোখ এড়ায় না। উত্তরভারতের রাজ্যগুলি গ্রাসকরলেও দ(ণভারতের রাজ্যগুলিকে গ্রাস করে, শাসকদের অনুগ্রহ করে সেই রাজ্যে পুণঃ স্থাপিত করেন। যা গ্রহণ মো(অনুগ্রহ নামে পরিচিত। এই কারণে হরিষেণ উত্তরভরতের রাজাদের নাম উল্লেখ করেন কিন্তু দ(ণভারতের (ে ত্রে তিনি নামও এলাকা স্পষ্ট করে দেন। এ(ে ত্রে এই রূপ আচরণের কারণ হল দ(ণ ভারতের রাজ্যগুলি সমুদ্রগুপ্ত সাম্রাজ্যভুক্ত(না করে পরাজিত শাসকদের ফিরিয়ে দেন। এই ঘটনার কারণ প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য আছে, কোন কোন ঐতিহাসিকদের মতে, কাঞ্চীর বিষ(ুগোপের প্রবল প্রতিরোধের মুখে সমুদ্রগুপ্ত দ(নভারতে সম্পূর্ণ সফল হতে পারেননি। আবার অন্য একটি মতে এলাহাবাদ প্রশস্তিতে তিনজন উত্তরভারতের শাসক অতঃপর এগারোজন দ(ণভারতের শাসক এবং ফের নয় জন উত্তরভারতের শাসকের নামে থেকে মনে করেন দা(নাত্য অভিযানকালে উত্তরভারতে শাসকরা বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন তখন সমুদ্রগুপ্ত দ্রুত দা(ণাত্য অভিযান শেষ করে উত্তরভারতের শাসকদের উচ্ছেদ করেন। আরো গুরুত্বপূর্ণ হল, উত্তর ভারতের রাজ্যগুলো তাঁর রাজধানী পাটলিপুত্রের সন্নিকটে ছিল তাই তাদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সেটি সাম্রাজ্যের জন্য ভয়ংকর কিন্তু দ(ণভারতে তার অভিযান কিন্তু অনেকটাই অর্থনৈতিক কারণের দ্বারা পরিচালিত হয়েছিল। মূলত পূর্ব উপকূল অঞ্চলের বন্দর এলাকাগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপণের জন্য সমুদ্রগুপ্ত দা(ণাত্য অঞ্চলর ওপর অভিযান সংগঠিত করেন। এছাড়া তিনি তার লেখতে বেশ কিছু প্রত্যন্ত অঞ্চলের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন, সেগুলি হল কামরূপ, দাবাক, কর্তৃপুর, সমতট এবং নেপাল। এরা প্রত্য(না হলেও পরো(ভাবে সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা মেনে নিয়েছিল। এছাড়া নয়টি অরাজতান্ত্রিক গোষ্ঠী যথা — মালব, যৌধেয়, আর্জুনায়ন, মদ্রক, আভীর, প্রার্জুন, সনকানীন, কাক, খরপরিক, এঁরা গুপ্ত সম্রাটের প্রতি প্রণাম জানিয়ে, তাঁর সভায় আগমন করে, কর দিয়ে, আজ্ঞাবাহী হয়ে সমুদ্রগুপ্তকে পরিতুষ্ট রাখতেন। সামরিক-রাজনৈতিক সাফল্যের স্মারক হিসেব সমুদ্রগুপ্ত অ(েমেধ যজ্ঞের আয়োজন করেছিলেন। তাঁর একপ্রকার স্বর্ণমুদ্রার অ(েমেধ যজ্ঞকারী হিসেবে চিত্রিত হয়েছিলেন।

সমুদ্রগুপ্তের উত্তরাধিকারী রূপে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত (মতায় আসেন। তিনি বিত্র(মাদিত্য নামে সমধিক পরিচিত তিনি 376AD নাগাদ সিংহাসন আসীন হন। মথুরায় প্রাপ্ত একটি স্তম্ভলেখতে তাঁর শাসনের সর্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায়। সপ্তম শতকে 'দেবী চন্দ্রগুপ্তম' নাটকে গুপ্তরাজা রামগুপ্ত শকরাজাকে পরাস্তকরে এবং রামগুপ্তের বিধবাপত্নী ধ্রুবদেবীকে বিবাহ করেন। তবে ধ্রুবদেবী চন্দ্রগুপ্তের পত্নী হলেও এই কাহিনীকে অধিকাংশ ঐতিহাসিক অস্বীকার করেন। তবে এ বিষয়ে দ্বিমত নেই যে দ্বিতীয় চন্দ্র গুপ্ত পশ্চিমভারতে শকশাসন উচ্ছেদ করে উজ্জয়িনী থেকে রৌপ্যমুদ্রা জারি করেন শকশাসকর অনুকরণে। শকদের বিরুদ্ধে অভিযানে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত নাগবংশীয়া কুবেরনাগার সাথে বিবাহ করেন। এবং তার কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার সঙ্গে বাকাটক রাজা রুদ্রসেনের বিবাহ দেন। রুদ্রসেনের অকালমৃত্যুতে প্রভাবতী গুপ্তা নাবালক পুত্রদের অভিভাবিকারূপে বাকাটক রাজ্য শাসন করেছিলেন মধ্যে ও পশ্চিম ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল।

দিল্লির নিকট কুতুবমিনারের কাছে লৌহস্তম্ভে খোদিত একটি লেখতে চন্দ্রনামক বৈষ(ব ধর্মালম্বী রাজার দিগ্বিজয়ের কথা পাওয়া যাবে। পুরা লেখা বিদ্যার সা(্য অনুসারে, লেখটির সম্ভাব্যকাল খ্রিষ্টীয় পঞ্চম শতকে নির্দেশ করা হয়েছে। চন্দ্র একাধারে বঙ্গের শত্রুগোষ্ঠীকে পযুদস্ত করেন, অন্যদিকে সিন্ধুনদের সপ্তমুখ অতিত্র(ম করে বা(ীকদেশ পর্যন্ত জয় করেন। তাঁর দ্বিগ্বিজয় দ(ণ সমুদ্র পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। অধিকাংশ ঐতিহাসিক Meherauli Piller বর্ণিত চন্দ্রকে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তরূপে চিহি(ত করেছেন। তাঁর পরবর্তী শাসক ছিলেন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত-ধ্রুবদেবীর পুত্র কুমার গুপ্ত মহেন্দ্রাদিত্য। তিনি বহুপ্রকারের স্বর্ণমুদ্রা জারি করেছিলেন। বিলসড় (96GE), কর্মদান্ডা (117GE), মানকুয়ার (129GE) থেকে পাওয়া লেখ থেকে এবং পুন্ড্রবর্ধনের তাম্রশাসন থেকে গুপ্ত সম্বৎ চিহি(ত ছয়টি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে।

কুমার গুপ্তের পুত্র স্কন্দগুপ্তের ভিত্তারী লেখ থেকে স্কন্দগুপ্তের বীরত্বের বর্ণনা পাওয়া যায়। তিনি কুমারগুপ্তের শাসন কালে পুষ্যমিত্র, ম্লেচ্ছ এবং হুণদের পরাস্ত করেন। সম্ভবত ভ্রাতৃবিরোধে জয়ী হয়ে স্কন্দগুপ্ত শাসক হন এবং মধ্য এলিয় দুর্দ্ধর্ষ যাযাবর হুণদের পরাজিত করেন। তিনি গুপ্ত সাম্রাজ্যের আয়তন হ্রাস পেতে দেননি। পরবর্তীকালে স্কন্দগুপ্তের ভ্রাতাপুরুগুপ্ত, তার পুত্র দ্বিতীয় কুমারগুপ্ত অতঃপর বুধগুপ্ত শাসন করেন। তিনি শেষ শক্তি(শালী গুপ্ত সম্রাট, তার সময় থেকে গুপ্ত সাম্রাজ্য (য়িষ(হতে থাকে। এছাড়া পশ্চিম মালব, গুজরাট, কাথিয়াবাড় তাঁর হস্তচ্যুত হয়। বুধগুপ্তের সময়কাল হল 475-500CE এরসঙ্গে বৈন্যগুপ্ত ভানুগুপ্ত, নরসিংহগুপ্ত প্রাদেশিকভাবে শাসন করেন। এরপর তৃতীয় কুমার গুপ্ত, বিষ(ুগুপ্ত শাসন করেন। এরপরে তৃতীয় কুমার গুপ্ত বিষ(ুগুপ্ত শাসন করেন। জিনসেনের মতে, গুপ্ত শাসন 231বছর অর্থাৎ (320+231 =551 CE) বিদ্যামান ছিল। তবে কলিঙ্গে 570CE তে গুপ্ত অব্দ শেষবার পাওয়া যায়। তবে দেখা যায়, গুপ্ত সাম্রাজ্য পরবর্তী পর্যায়ে ত্র(মশ হ্রাসমান হারে (য় প্রাপ্ত হয়ে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছেল তবে গুপ্তআমলে সাহিত্য, সংস্কৃতির, স্থাপত্য, বিজ্ঞানচর্চার যে ব্যাপক উন্নতি হয় তাতে এই যুগকে ধ্রুপদীযুগ (Clasical Age) বলে অভিহিত করা হয়।

৯.২.৬.৫ — সহায়ক গ্রন্থাবলী

(1) Asoka and the decline the Mauryas-Romila Thapura

(2) Exploring Early India-Ranabir Chakraborty

(3) প্রাচীনভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে-রণবীর চত্র(বর্তী

(4) মৌর্যযুগের ভারতবর্ষ-ইরফান হবিব, বিবেকানন্দ ঝা।

(5) Early India-Romila Thapar

৯.২.৬.৭ — সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(1) Discussthe nature of Second Urbanization

(2) Was Iron technology an imporfant factor in growth of Urban Centers in Midganga Valley?

(3) Describe the administration of Licchavis and their relation with Magadha.

(4) Discuss about the Political Situation of Magadha in it Early Kingdom.

(5) Describe the political History of Gupta Kingship.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

ভারত ইতিহাসর আদিপর্ব Exploring Early India — রণবীর চত্র(বর্তী

পর্যায়-৩

Concept of State Polity authority, Moral dilemma

রাজ্যশাসন পদ্ধতি, কর্তৃত্ব ও নৈতিকতা

একক — ৭ ও ৮

৯.৩.৭.০ — সূচনা
৯.৩.৭.১— বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সাহিত্য আইন ও নৈতিকতার ধারণা (Unit -7)
৯.৩.৮.২— সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্র ও রাজধর্মের ধারণা (Unit -8)
৯.৩.৮.২.১— রাজধর্মের ধারণা
৯.৩.৮.২.২— আদর্শ গৃহস্বামী রূপে রাজা
৯.৩.৮.২.৩— সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের তত্ত্ব
৯.৩.৮.২.৩ — গুপ্তযুগের শাসন ব্যবস্থা
৯.৩.৮.৪ — সহায়ক গ্রন্থাবলী
৯.৩.৮.৫— সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৯.৩.৭.০ — সূচনা ঃ—

মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় রাষ্ট্রগঠন প্রত্রি(য়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যশাসনজনিত (ে ত্রে বিভিন্ন বিষয়ের উদ্ভব হয়। এর সাথে সাথে আইন এবং নৈতিকতার ধারণার বিকাশ হতে দেখা যায়। এই সময় থেকে পরিচিতি পাওয়া বিভিন্ন গ্রন্থে এবং নীতি শাস্ত্রে সেই কারণে রাজ্যশাসন পদ্ধতি, রাজকর্তৃত্ব, কর্তব্য ও নৈতিকতার ধারণা পাওয়া যায়। এই সমস্ত গ্রন্থ সমূহের মধ্যে অর্থশাস্ত্র, মহাভারত, জাতক প্রভৃতি গ্রন্থ এ(ে ত্রে আমাদের সহায়তা করে। এই গ্রন্থগুলির অধ্যয়নের ফলে আমরা ত্র(মবিকাশিত রাষ্ট্রপরিচালনা নীতি সম্পর্কে অবগত হব।

৯.৩.৭.১ — বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সাহিত্যে আইন ও নৈতিকতায় ধারণা (Unit - 7) ঃ—

অর্থশাস্ত্র, মহাভারত এবং জাতক গ্রন্থগুলিতে বিভিন্ন আইন এবং নৈতিক চিন্তা সংত্র(ান্ত ধারণা সংত্র(ান্ত ধারণা লিপিবদ্ধ আছে যদিও মহাভারত এবং জাতক কাহিনীমূলক, কিন্তু সেই কাহিনী সমূহের মধ্যে তৎকালীন সময়ের আইন ও শাসন ব্যবস্থার যেমন বিবরণ আছে, তেমন ই নৈতিক চিন্তার পরিচয় ও পাওয়া যায় এই সমস্ত গ্রন্থসমূহ থেকে।

জাতক সমূহ হল বুদ্ধের পূর্ববতী জন্মের কাহিনী এই সমস্ত কাহিনীতে বুদ্ধ বিভিন্ন পশু, পাখি বা মানব রূপে জন্মনেন, এই জন্মগুলিতে বুদ্ধ বিভিন্ন মানুষের সঙ্গে কার্যকলাপে লিপ্ত হন। এই কাহিনীকে অবলম্বন করেই বিভিন্ন নীতি শি(ার অবতারণা করা হয়। সুকর্মকারীগণ সুফল লাভ করে আবার দুষ্কর্মকারীরা পাপভাগী হয়। জাতক হল সুত্তপিটকের অর্ন্তগত খুদ্দক নিকায়ের দশম গ্রন্থ। এই কাহিনী গুলি হিতপোদেশমূলক প্রাণী হত্যা, মিথ্যাবলা, চুরি করা, মাদক দ্রব্য গ্রহণ প্রভৃতি পরিহার করা জাতকের অন্যতম নৈতিক শি(া।

পাশাপাশি পশুপাখি মধ্যে যে জীবন আছে, তাদের বেঁচে থাকার অধিকার রয়েছে সেই বিষয়ে বর্ণনা রয়েছে জাতকে। মৃগজাতক (Migo-Jataka) বর্ণিত হয়েছে, মৃগয়াপ্রিয় রাজাকে স্বর্ণমৃগরূপী বোধিসত্ব উপদেশ দিয়েছেন পশু হত্যা, প্রাণী হত্যা থেকে বিরত থাকতে। বুদ্ধস্বয়ং যে পূর্বতন জন্মে পশুরূপে জন্ম নিয়েছেন তার ফলশ্রুতিতে এটা বলাই যায় যে সকল প্রাণীর বুদ্ধত্বে অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। আবার, মহাকপি জাতকে একটি বানর মানুষের হিংসার শিকার হলেও মানুষকে উপকার করতে বিরত হতেন না। এর প্রসঙ্গে বলাই যায় যে মহাভারতেও একই রকম নৈতিকতার ধারণা

পাওয়া যায়, যেখানে পশু হত্যা করে জীবন অতিবাহিত করা বনবাসী পান্ডবরাজ যুধিষ্ঠিরকে মৃগরাজ স্বপ্নে অনুরোধ করেছেন, তাদের আর হত্যা না করতে, কারণ তাদের হত্যা করা হলে তাদের বংশ লুপ্ত হবে। জাতকের কাহিনীতে বোধিসত্ত্বের বিভিন্ন সদগুণের আভাস পাওয়া যায়। যে সমস্ত আচার অবশ্য পালনীয় বলে চিহি(ত করা হয়েছিল। আবার মহাভারতের অনুশাসন পর্ব এবং শান্তিপর্বে মানুষের পালনীয় নৈতিক ধর্মের কথা পাওয়া যায়। পাশাপাশি পরিবেশের প্রতিনজর দেওয়ার কথা জাতক ও মহাভারতে পাওয়া যায়। এই দুটি গ্রন্থ ত্র(মশ গোষ্ঠীতন্ত্র থেকে রাজতন্ত্র গড়ে ওঠার transition point এ রচিত হয়েছিল। এই গ্রন্থ সমূহে এইরকম একটি সময়ের চিত্র পাওয়া যায়।

তবে রাজ্যশাসন ও আইনসংত্র(ান্ত আলোচনায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তথ্যসূত্র হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। চিরাচরিতরীতি অনুসারে চন্দ্রগুপ্তের গুরু তথা প্রধানমন্ত্রী কৌটিল্য অর্থশাস্ত্রের রচিয়তা, তবে বর্তমানে ঐতিহাসিকদের মতে এটি একজন লেখকের দ্বারা একসময়ে রচিত হয়নি। তবে এর অধ্য(প্রচার অংশটি মৌর্যআমলের সমসাময়িক। অর্থশাস্ত্রের মধ্যে আইন ও নৈতিক তাসংত্র(ান্ত বিস্তারিত। আলোচনা পাওয়া যায়। R. Trautmann মনে করেছেন অর্থশাস্ত্রের বিভিন্ন অংশের পরিমার্জন বিভিন্ন সময়ে করা হয়েছে। এর বাস্তবাচিত সময়কাল হল 4th Century BCE থেকে 2nd Century AD পর্যন্ত।

আইন সংত্র(ান্ত আলোচনার (ে ত্রে আমরা দেখতে পাই যে কৌটিল্য আইনব্যবস্থাকে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আইন বিধিতে ভাগ করেছেন। Civil দেওয়ানী আইন বিধি সংত্র(ান্ত আলোচনা নাম করেছেন ধর্মস্থানীয় এবং বা ফৌজদারী আইন বিধি যে প্রকরণে আলোচনা করা হয়েছে, তার নাম 'কন্টকশোধন' অর্থাৎ রাষ্ট্রনিয়ন্ত্রিত ব্যবস্থায় Criminal বা রাষ্ট্রের নিকট কন্টক স্বরূপ তাদের শোধন করা আবশ্যিক।

রাজা নিঃসন্দেহে বিচার ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন পাশাপাশি, বিচারকার্য পরিচালনার জন্য বিচার পতিদের কথাও অর্থশাস্ত্র উল্লেখ করে। প্রথমতঃ- দেওয়ানী বিচার ব্যবস্থা পরিচালনার জন্য তিনজন ধর্মস্থ নামক বিচারক। দ্বিতীয়তঃ- ফৌজদারী বিচার পরিচালনার জন্য প্রদেষ্ট নামক মহামাত্র। (Pradeshtra) পাশাপাশি কৌটিল্যের ব্যবহার বিধিতে দ্বাদশবর্ষীয়া স্ত্রী এবং ষোড়শ বর্ষীয় পুরুষ প্রাপ্তবয়স্ক। ধর্মস্থরা ছল প্রয়োগ না করেই বিচার করবেন। দেওয়ানী আইনের (ে ত্রে অংশীদারী, সম্পত্তি ঘটিত সমস্যা, ত্রে(তা-বিত্রে(তার বিবাদ মীমাংসা করা হত। অর্থশাস্ত্র অপরাধীর গ্রেপ্তারীর বিষয়ে রাজার সর্বজ্ঞতার ধারণা জ্ঞাপণ করেন। চৌর্যাদি দোষীদের রাজপ্রভাবেই গ্রেপ্তার করা হয়ে বলেই উপস্থাপনা করা হয়। ফৌজদারী দন্ডবিধির (ে ত্রে সামজিক বিধি ও স্তরায়নের কিছুটা প্রভাব পড়ে। কৌটিল্যের মতে ব্রাহ্মণদের জন্য উৎপীড়ন ও বধ দন্ড বিধেয় হবে না। উৎকট অপরাধ করলে তাকে রাজ্য থেকে বিতাড়িত করা যেতে পারে। কৌটিল্যের মতে, দন্ডবিধানে রাজার দোষ হলে তিনিও দন্ডার্হ হইবে। রাজাকে জরিমানার ধন জলমধ্যে প্রদান করবেন। ফৌজদারী দোযে সন্ন্যাসীরা দুষ্ট হলে তাদেরও শাস্তি বিধান করতে হব। কারণ কৌটিল্য মনে করেন, ধর্ম যদি অধর্ম দ্বারা উপহত বা প্রভাবিত হয় এবং রাজা তাকে উ পে(া করেন। তাহলে তা কিন্তু শাসনকারী রাজার জন্য (তিকারক।

তদন্ত করার বিষয়ে অর্থশাস্ত্র আশচর্যজনকভাবে আধুনিক কোন রহস্যজনক পরিস্থিতিতে অস্বাভাবিক মৃত্যুর (ে ত্রে বর্তমান কালে যেমন মৃতদেহকে ময়নাতদন্ত করা হয়, তেমনভাবেই অর্থশাস্ত্র মৃতদেহ পরী(ণের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছে। কিভাবে মৃতব্যত্তি(র মৃত্যু হয়েছে তা মৃতদেহের ওপর বিভিন্ন ল(ণ দ্বারা চিহি(ত করা যায়। রাসায়নিক পরী(ণের কথা বলা হয়। অতঃপর মৃতব্যাত্তি(র হত্যার যথোপযুত্ত(তদন্তের বিষয় অর্থশাস্ত্র বর্ণনা করে। আত্মঘাতী ব্যাত্তি(র কোনরূপ (্মশানবিধিত ও প্রেতকার্য্য অর্থশাস্ত্র নিষিদ্ধ ঘোযনা করে।

মৃত্যুদন্ডের (ে ত্রে দুধধরণের প্রকারভেদ আমরা দেখতে পাই। যথা - চিত্রবধ (Chitrabadh) এবং (Suddhabadh) শুদ্ধবধ। চিত্রবধ হল পীড়নের মাধ্যমে অপরাধীকে হত্যা করা, এবং শুদ্ধবধ হল কষ্টনা দিয়ে হত্যা। অপরাধের তীব্রতা অনুসারে ইহা নির্নীত হত। আবার অঙ্গচ্ছেদ, প্রহার এবং জরিমানার মত দন্ড বিহিত ছিল। নাগরিকদের

কর্তব্য পালন না করলেও দন্ড প্রযুক্ত(হত। অপরাধীকে আশ্রয় প্রদান করলে সেটি অপরাধ রূপে স্বীকৃত ছিল, আবার গৃহে অগ্নিসংযোগকারীকে সেই আগুনে পুড়িয়ে মারার বিধান ছিল। শুধুযে অপরাধীদের শাস্তিবিধান ছিল তাই নয়। কর্তব্যে গাফিলতি করলে ধর্মস্থ, প্রদেষ্টৃ প্রতিহার প্রহরী কাউকেই (মা করা হত না। রাজদ্রোহ অপরাধী আমাত্য বা রাজপুদের হত্যা করা হত। গর্ভবতী স্ত্রীলোক যদি মৃত্যুদন্ডের মত অপরাধী হত্যা করা হত। গর্ভবর্তী স্ত্রীলোক যদি মৃত্যুদন্ডের মত অপরাধী হতেন তবে প্রসবের একমাস পর্যন্ত তাকে হত্যা করা হত না, তারপর সেই মৃত্যুদন্ড কার্য কর হত।

এইভাবে দেখা যায় অর্থশাস্ত্র একটি সুন্দর আইনের শাসন (Rule of Law) গড়ে তোলে।

৯.৩.৮২. — সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্র ও রাজধর্মের ধারণা (Unit - 8)

ভারতীয় রাষ্ট্রব্যবস্থার ইতিহাসে বিভিন্ন ধারণার কথা জানতে পারা যায়। রাষ্ট্রব্যবস্থা উন্নত হবার সাথে সাথে রাষ্ট্রব্যবস্থার গঠন এবং সুনির্দিষ্ট প্রশাসনের গড়ে ওঠার যে পরিস্থিতি দেখাযায় তার পরিপ্রে(তে বিভিন্ন ধরণা গড়ে ওঠার। সেই রকম ধারণা হল ঃ— রাজধর্ম (Rajdharma) এবং সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রের (Saptanga Rastra)। বিভিন্ন তথ্য সূত্র থেকে এই ধরণের ধারণা পাওয়া যায়। মহাভারতের শান্তিপর্ব, যা কিনা মহা ভারতের একটি পরবর্তীকালের রচনা বা Pseudo-epic নামে স্বীকৃত, সেখানে শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে উপদেশ প্রদান করেছিলেন। যে সবের মধ্যে কুরুপিতামহ রাজধর্মের কথা গুরুত্ব দিয়ে বলেন। তিনি বলেছিলেন, স্বগৃহের সন্তানেরা যেমন নিরুদ্বেগে এবং শান্তিতে বসবাস করেন, প্রজারাও যদি কোনও রাজত্বে সেই রকম, নিশ্চিন্তে এবং শান্তিতে বাস করেন, তাহলে সেই শাসনই আদর্শ। বস্তুত ভীষ্মের মাধ্যমে রাজধর্মের যে আদর্শ চিহ্নি(ত হয়ছে তা একটি উন্নত ও উচ্চ শাসনাদর্শর কথা বলেন, আবার (Eastern Epic) তথা তুলনায় আধুনিকতর মহাকাব্য রামায়ণের অযোধ্যাকান্ড (Ayodhya Kanda) রাজধর্মের আলোচনা করেছে। বনবাসরত রাম, তাঁর কনিষ্ঠ ভরতকে রাজ্যভার নির্বাহ করতে নির্দেশ দেবার সময় রাজধর্মের আলোচনা করেন। এখানে রাজ্যের প্রজাদের প্রতি রাজার কর্তব্য বর্ণিত আছে।

মনুসংহিতা অনুসারে, অরাজকতা ও মাৎস্যন্যায় থেকে প্রজাদের র(ার্থে স্বয়ং ঈ(্বর রাজার সৃষ্টি করেন। তাই রাজার কর্তব্য হল আইনভঙ্গকারী শক্তি(শালীদের হাত থেকে দূর্বলদের র(া করা। যদি রাজার প্রদত্ত রায় অন্যায় হয় তাহলে তা পাপ হিসাবে গণ্য হবে। তাই রাজকার্য পরিচালনার সময় রাজার উচিত ধর্ম অনুসারে, এবং যথেষ্ঠ সাবধানতার সঙ্গে কাজ করা। রাজধর্মের ধারণাটি নীতি এবং আদর্শের ধারণার সঙ্গে সম্পর্কিত। নীতিগতভাবে মনে করা হয় রাজা হবেন এমন ব্যক্তি(যিনি সর্বদা সত্য কথা বলেন এবং নিজের দায়িত্ব এবং কর্তব্য অবিচলভাবে পালন করেন।

যদি কোন রাজা আইনের অপপ্রয়োগ করেন অথবা আইন লঙঘন করে কাজ করেন তাহলে তিনিও দন্ডনীয় ধর্মশাস্ত্র অনুসারে, শাসন পরিচালনা করতে তিনি কর্তব্যবদ্ধ। মনু আরো বলেছেন, রাজা প্রজার নিকট পিতৃতুল্য, পিতা যেমন সন্তানকে সুখী করার প্রয়াসী তেমনই রাজার কর্তব্য হল প্রজাকে সুখী রাখা। প্রজাদর ওপর নিজের ইচ্ছা চাপিয়ে দিয়ে অন্যায় অত্যাচার করার প্রবণতা মনুর দ্বারা ধিক্কৃত হয়েছে। রামায়ণে সীতার বনবাসের কাহিনীতেও প্রজাদের অহাদের কারণে রাম তার পত্নীকে ত্যাগ করেন। শম্বুকতপস্বীকে বধ করার কাহিনীতে প্রজাকল্যাণের কথা উঠে আসে। মহাভারতে রাজধর্ম সংক্র(ান্ত সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কাহিনীটি — জানা যায় রাজা রন্তিদেবের কাহিনীতে। এখানে রাজার কাছে যেকোন সমস্য ক্লিষ্ট মানুষ সাহায্য চাইলে, তিনি সানন্দে সেই কাজে সহায়তা করতেন। তিনি মনে করতেন তার প্রজাদের সাহায্য করার মাধ্যমে তিনি বিষ(ুর সেবা করছেন। কিংবদন্তী অনুসারে, প্রজাপালনের সাফল্য তাকে ঈ(্বরের প্রীতিভাজন করে তোলে। প্রাচীন ভারতবর্ষে রাজধর্ম ছিল প্রজাপালনের উপায়। এই নৈতিক কর্তব্য প্রজাদর শান্তি, শৃঙ্খলা ও ন্যায়বিচার প্রদান সঙ্গে সংযুক্ত(ছিল।

সুতরাং বলা যায়, রাজধর্ম সংত্র(ান্ত ধারণা রাজতন্ত্রের শক্তি(শালী হবার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। রাজধর্ম বলতে বোঝানো হত 'Duty of the ruler' অর্থাৎ রাজা যাতে অনৈতিক কাজে লিপ্ত না হয় তার জন্য এই ধারণা ভারতীয় শাস্ত্রে করা হয়েছিল।

৯.৩.৮.২.২ — আদর্শ গৃহস্বামী রূপে রাজা ঃ—

পরবর্তী বৈদিকসাহিত্যের সময়কাল (800 BC) থেকে ত্র(মশ উত্তরভারতের বিশেষত গাঙ্গেয় উপত্যকার রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে ব্যপক পরিবর্তন ল(্য করা যায়। পূর্ববর্তী গোষ্ঠীতন্ত্রের পরিবর্তে নির্দিষ্ট ভূখন্ড ভিত্তিক রাজতন্ত্রের ধারণা এই সময় থেকে ত্র(মশ বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। এই নতুন ধরনের শাসন ব্যবস্থায় স্বেচ্ছাদানর পরিবর্তে নিয়মিত কর আদায়ের ব্যবস্থা এবং বেতনভোগী স্থায়ী সেনাবাহিনীর অবস্থান ল(্য করা যায়। রাজনৈতিক ব্যবস্থার ত্র(মশ বিকাশ লাভ করতে শুরু করে। রাজনৈতিক ব্যবস্থা ত্র(মশ জটিলতার কারণে এবং সম্পদের ওপর রাজার নিয়ন্ত্রণ কায়েমের প্রয়োজনীয়তার কারণে বিভিন্ন সামাজিক এককের ওপর রাজার আধিপত্য বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। তিনি যেমন বর্ণব্যবস্থার বিভিন্ন স্তরের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখছেন, তেমনি বিভিন্ন পারিবারিক সম্পর্কের ওপরও তাঁর প্রভাব প্রতিফলিত করার প্রয়াস ল(্য করা যায়। এই রূপ প্রত্রি(য়ার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হল বিভিন্ন সাহিত্য সূত্রে রাজাকে শ্রেষ্ঠ গৃহপতি রূপ চিত্রায়িত করার প্রবণতা। যার মাধ্যমে গৃহস্থালীর ওপর রাজার নিয়ন্ত্রণ বিস্তৃত হয়।

ঋকবৈদিক সাহিত্যে Household অর্থে বিভিন্ন শব্দের অবতারণা ল(্য করা যায়, যা বিভিন্ন ও বহুমুখী সামাজিক ধারার অবতারণা ল(্য করা যায়, যা বিভিন্ন ও বহুমুখী সামাজিক ধারার প্রতিভূ ছিল। যে(ত্রে গৃহছাড়াও দম, নিবেশ, অস্ত, গয় প্রভৃতি শব্দের উপস্থিতি ল(্য করা যায়। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক গ্রুপে Household বোঝাতে গৃহশব্দটি বহুল ব্যবহৃত হতে শুরু করে, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল একটি নির্দিষ্ট ধাঁচে Household ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা। গৃহব্যবস্থার মূল ভিত্তি ছিল স্বামী-স্ত্রী এবং পিতা-পুত্রের সম্পর্কে। অন্যান্য জ্ঞাতিমূলক সর্ম্পক যথা - মাতা, পুত্র, ভাইবোন বা ভাই ভাই এর সম্পর্কের গুরুত্ব হ্রাস পায়। গৃহ যেহেতু রাষ্ট্রের করের মূল উৎস, তাই উৎপাদন ও পুনরুৎপাদনের ৫(ত্রে প্রাসঙ্গিক সম্পর্কগুলিই সর্বাধিক গুরুত্ব লাভ করে। গৃহপতির মর্যদা বহুগুণে বর্ধিত হয় এবং অনুরূপে রাজাকে বিভিন্ন সাহিত্য সূত্র আদর্শ গৃহপতি রূপ চিত্রায়িত করে গৃহের ওপর রাজার প্রভাব প্রসারে সচেষ্ট হয়।

এই ব্যবস্থায় রাজা ও গৃহপতির মধ্যে তুলনা করে, উভয়ের মধ্যে সর্ম্পক স্থাপন করার চেষ্টা করা হয়। গৃহ সামাজিক ব্যবস্থার (ুদ্রাতি(ুদ্র অংশ এবং যার সর্ব্বোচ্চ স্থানে রয়েছেন গৃহপতি। অন্যদিকে সমস্ত গৃহনিয়ে তৈরী সামাজিক ব্যবস্থার শীর্ষে অবস্থান করেন রাজা। সেই কারণে Royal household কে একটি সামাজিক মডেল হিসাব উপস্থাপিত করার প্রয়াস বিভিন্ন সাহিত্য সূত্র গুলিতে পাওয়া যায়। পাশাপাশি, সমাজের ওপর রাজার বিভিন্ন বিধিনিষেধ আরোপ করার বৈধতা অর্জন করার জন্য রাজাকে একজন আর্দশ গৃহপতি রূপে চিত্রায়িত করা হয়। তবে একথাও বিবেচ্য যে অনেক সময় রাজকীয় গৃহের দ্বন্ধ উপস্থাপিত হয়েছে। মূলত তিনধরণের সাহিত্যে-রাজকীয় গৃহের চিত্র পাওয়া যায়, যথা - (১) জাতক (২) সংস্কৃত কাব্য সাহিত্য (৩) বিভিন্নশাস্ত্রীয় গ্রন্থ।

বিভিন্ন ধরনের সাহিত্য সূত্রে রাজকীয় গৃহের অনেক সমধর্মী ও ভিন্নধর্মী চিত্র পাওয়া যায়। সর্বত্রই সাধারণ গৃহের থেকে বেশ কিছু পার্থক্য চিত্রায়িত হয়েছে রাজকীয় গৃহের। এই ধরণের গৃহগুলি সাধারণ গৃহের মতো কোন প্রকার উৎপাদনমূলক কার্যকলাপর সঙ্গে জড়িত নয়। সাহিত্যিক উপাদানে রাজকীয় উদ্যানের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়, এই উদ্যান সম্পূর্ণরূপে বিলাস ব্যসনের স্থান। আবার অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এবং অন্য বিভিন্ন কাব্যে, জাতকে রাজকীয় শিকারের বিবরণ আছে। সাধারণ মানুষের খাদ্য সংগ্রহের সঙ্গে শিকারের সংযোগ থাকলেও রাজার কাছে শিকার কেবল মাত্র প্রমোদ এর সঙ্গে সম্পর্কিত। আবার সাহিত্যে বর্ণিত রাজকীয় পশুশালা হাতি, ঘোড়ার মত যুদ্ধের সঙ্গে জড়িত পশু দ্বারা পরিপূর্ণ, এই পশুরা উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত — পশু দ্বারা পরিপূর্ণ, এই পশুরা উৎপাদনের সঙ্গে যুক্ত(নয়। মহাকাব্যে

জনক রাজার স্বহস্তে কৃষিকর্মে লিপ্ত হওয়া বা বিরাট রাজার গোশালার বিবরণ সম্ভবত পূর্ববর্তী সময়ের চিত্র বহন করে। আবার জাতকে পশুদের প্রতি রাজার দয়াও বর্ণিত হয়েছে। মৃগজাতকে বোধিসত্ত্বের সংস্পর্শে এসে রাজা প্রাণী হত্যা বর্জন করছেন। যা থেকে স্পষ্ট যে রাজপরিবারর প্রাণী হত্যা জীবনধারণের সঙ্গে সংযুক্ত(ছিল না।

রাজপ্রসাদের বর্ণনা সকল প্রকার সাহিত্যে পাওয়া যায়। জাতকে রাজপ্রাসাদের আতিশয্যমূলক বিবরণ নেই। তবে অধিকাংশ (ে ত্রে সিংহদুয়ারের বর্ণনা করা হয় যা প্রাসাদের বিশেষত্বকে চিহি(ত করে। এছাড়া রাজদরবার এবং বিভিন্ন উৎসব প্রাঙ্গণের বিবরণ পাওয়া যায় । এছাড়া প্রাসাদের ভেতরের অংশকে অন্তনিবেশন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। এই অংশকে গর্ভ বা শ্রীগর্ভ বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। অন্যদিকে শাস্ত্রীয় ও কাব্যসাহিত্যে রাজপ্রাসাদের বিপুল বর্ণনা পাওয়া যায় অর্থশাস্ত্রে প্রাসাদের কেন্দ্রীয় অঞ্চলে পুরোহিত, দার্শনিক, মন্ত্রীপরিষদ, বণিক ও চিকিৎসকদের আবাস চিহি(ত হয়েছে। এছাড়া কর্মী আসাব, যজ্ঞস্থান, পাকশালা, পশুশালা শস্যাগার, কোষাগার, অস্ত্রাগার, তথ্যাগার, যানবাহন রাখার স্থান, বনসম্পদ রাখার স্থান উল্লিখিত হয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন পেশার মানুষদের বাসস্থান এবং মন্দির প্রভৃতির জন্য নগরের নির্দিষ্ট স্থান চিহি(ত হয়েছে। এছাড়া রাজরমনীদের জন্য শ্রীনিবেশ এবং রাজশিশুদের বাসস্থান চিহি(ত হয়েছে। এবং সশস্ত্র বাহিনী দ্বারা প্রাসাদ ও নগর নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। অন্যদিকে মনুস্মৃতি রাজকীয় আবাসকে বিভিন্ন দুর্গম প্রাকৃতিক পরিবেশ বেষ্টিত দুর্গ বলে অভিহিত করেছে এবং এ(ে ত্রে পর্বতবেষ্টিত প্রসাদকে নিরাপত্তার দিক থেকে উৎকৃষ্টতম বলে বর্ণনা করেছে। এই দুই বিবরণর আপাত পার্থক্য সত্ত্বেও উভয়(ে ত্রেই রাজকীয় আবাসকে সাধারণ মানুষের কাছে আপাত বিচ্ছিন্ন অথচ শক্তি(র ভরকেন্দ্র রূপে চিহি(ত করা হয়েছে। কাব্যসাহিত্যে ত্ত রাজধানী শহরের বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। সেখানে রাজাকে অনেকসময় তার রাজধানীর অধিপতির হিসাবেও অ্যাখ্যা করা হয়েছে।

সকলপ্রকার সাহিত্যসূত্রে রাজাকে বিভিন্ন উৎসব আয়োজক রূপে চিত্রিত করা হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে এগুলি বিভিন্ন যজ্ঞরূপে বার্ণিত হয়েছে। সাধারণ গৃহপতি কর্তৃক আয়োজিত গার্হস্থ্য যজ্ঞ ত্রি(য়ার গৌরবোজ্জ্বল সংস্করণ রূপে অ(েমেধ, রাজসূয়, বাজপেয় প্রভৃতির বর্ণনা রাজাকে শ্রেষ্ঠ গৃহপতি রূপে চিহি(ত করে। অন্যদিকে কাব্য ও জাতকে উৎসব-অনুষ্ঠানে প্রাধান্য পায়। হর্ষচরিত, বুদ্ধচরিত, মালতীমাধব এবং মহাভারতে রাজপরিবারের সদস্যদের জন্ম বা বিবাহ উপল(বিশাল উৎসবের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। যা নাগরিক উৎসবের রূপ পরিগ্রহ করেছে। আবার জাতকে অনেক(ে ত্রে এই সব উৎসবে নাগরিকদের অংশ গ্রহণের বিবরণ পাওয়া যায়। এই উৎসবে রাজা অতিথি ও অভ্যাগতদের উপহার প্রদান করছেন। এইরূপ চিত্রায়নের মাধ্যমে আদর্শ গৃহপতির ধারণা বা মডেল উপস্থাপিত করা হয়েছে।

এই সমস্ত উৎসবের দুই ধরণের পরিস্থিতি পাওয়া যায়। মূলত প্রজার আমোদ প্রমোদ এ রাজার নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য এবং শাসনযোগ্য প্রজা তৈরীর জন্য এই উৎসব গুলির প্রয়োজন ছিল। যার উল্লেখ কলিঙ্গ রাজ খারবেলের হাতিগুম্ফা লেখ ও সাতবাহন রাজ বাশিষ্ঠিপুত্র পুলুমায়ির নাসিক লেখতে পাওয়া যায়। আবার অন্যদিকে উৎসবের ফলে কঠোর নিয়মনীতি শিথিল হলে উপপ্লব বা রাজদ্রোহ মূলক কার্যকলাপ হবার সম্ভাবনা পাওয়া যায়। যার ফলশ্রুতিতে অশোক 'সমাজ' বা 'Popular Gathering' নিষিদ্ধ করে ছিলেন।

বংশর(া বা উত্তরাধিকার উৎপাদন গৃহপতির মূল কর্তব্য। রাজার (ে ত্রে তা রাজ্যের ভবিষ্যৎ এর সঙ্গে সম্পর্কিত হয়ে পড়ে। শ্রেষ্ঠ গৃহপতি রূপে রাজার কর্তব্য নিজের ও রাজ্যের জন্য পুত্রসন্তানের জন্মদান করা। মহাকাব্য ও কাব্যসাহিত্যে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। তাছাড়া মনুসংহিতা, অর্থশাস্ত্র ও জাতকে এই বিষয়ে বিবরণ পাওয়া যায়। সেই কারণে রাজা একাধিক বিবাহ করতে পারেন। আবার সন্তান উৎপাদনের জন্যে যাবতীয় আচার অনুষ্ঠান, চিকিৎসা করা যেতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ মহাভারত দ্রুপদের যজ্ঞ বা রামায়ণে দশরথের যজ্ঞের কথা জানা যায়। আবার কামসূত্রের মতে রাজা যে কোন নারীর সঙ্গে সম্পর্কে লিপ্ত হতে পারেন এই বিষয়ের উল্লেখ করলেও জনসম(পরস্ত্রীর নিকট গমন

নিষেধ করেছেন। কারণ তাতে সাধারণ মানুষের আচরণে বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। একদিকে কাদম্বরী, বাসবদত্তা প্রভৃতি কাব্য সাহিত্যে রাজার সঙ্গে নারীদের সম্পর্কের কাব্যিক বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তেমনি রামায়ণ মহাভারত, অর্থশাস্ত্রে রাজাকে ষড়রিপুর বন্ধন মুক্ত(বা কামনা বাসনা রহিত বলে স্তুতি করা হয়েছে। অর্থাৎ বাস্তবিকদিকে রাজার বিভিন্ন সম্পর্কের বিষয়টি যেমন স্বীকার করা হয়েছে তেমনি শ্রেষ্ঠগৃহপতি রূপে রাজা যাতে কাম Eplore করার সময় সকল সীমা লঙ্ঘন না করেন যে বিষয়েও সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। এই রূপ ঘটনা হলে সাধারণ মানুষ (ি প্ত হতে পারে যার উল্লেখ মণিচোর জাতকের কাহিনীত পাওয়া যায়।

রাজাকে রাজ্যের জন্য দৃষ্টান্ত স্থাপণের কথা বলা হয়েছে। কিন্তু সব(ত্রে রাজপরিবারের যে চিত্র উপস্থাপিত হয় তাতে রাজার গৃহকে সর্বদা আর্দশ পরিবার বলে চিহি(ত করা যায় না। ঐতিহাসিক উমা চত্র(বর্তী রাজপরিবারের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের স্বার্থের সংঘাতের উপস্থিতি ল(্য করেছেন। জাতক কাব্য সাহিত্য এবং শাস্ত্রীয় গ্রন্থে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছে। রাজপরিবারে বহুবিবাহের ফলে উত্তরাধিকার প্রথা নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি হচ্ছে। রাজকীয় নারীদের নানা ভাব মূর্তি জাতকে প্রতিফলিত হয়েছে। অনেক সময় রানীরা রাজার অনুগামিনী, অনেক(ত্রে তারা সাধারণ পরিবার থেকে রাজপরিবারের সদস্য হচ্ছেন। অন্যদিকে অনেক জাতকে রানীরা লোভী এবং বস্তুগত বিষয় আকাঙ্খী। ছদন্তজাতকে রানীর প্রতিহিংসা পরায়ণতা এবং অভ্যন্তরজাতকে পুত্রপ্রাপ্তির জন্য রানী কর্তৃক বিবিধ উপায় অবলম্বণের চিত্র পাওয়া যায়। আবার অনেক সময় স্বামীদের হাতে অত্যাচারিত হতেও দেখা যায়। রাজকুমারীরা অনেক(ত্রে জ্ঞানী যারা মো(প্রচার করেছেন। মুক্ত(চিন্তার পরিচায়ক হিসাবে তাদের উপস্থাপনা করা হয়েছে। আবার রাজপরিবারের বৈবাহিক সম্পর্কগুলিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক সমঝোতা হিসাবে দেখানো হয়েছে। যে(ত্রে সেই রাণীরা বিভিন্ন রাজনৈতিক ষড়যন্ত্রের মাধ্যম নিজেদের পিতৃকূলের স্বার্থর(ার চেষ্টা করছেন। যা আদর্শ গৃহের পরিপন্থী।

শাস্ত্রগ্রন্থগুলিতে রাজ অন্তঃপুর নিবাসী নারীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাঁরা রাজপ্রাসাদর অভ্যন্তরভাগে থাকবেন এবং ভবঘুরে সন্ন্যাসী এবং দাসরমনীদের সঙ্গে তাদের সা(াৎ নিষিদ্ধ। এখানে রাজাদের বিবাহ ব্যবস্থার উল্লেখ রয়েছে, আদর্শ বিবাহগুলি যথা আর্য, ব্রাহ্ম, প্রাজাপত্য-প্রভৃতি বিবাহ ব্যাতিরেকে অন্য ধরণের বিবাহ ব্যবস্থা অনুসরণ করছেন রাজপরিবারের সদস্যগন, কন্যাপণ যুক্ত(আসুর বিবাহ, গান্ধর্ব, রা(সবিবাহ, পৈশাচ বিবাহ—রাজাদের ((ত্রে প্রযুক্ত(হয়েছে। ব্রাহ্মণ্য মতে আদর্শ না হলেও এই সমস্ত বিবাহকে (ত্রিয়ের প(আদর্শ বলা হয়েছে। এই ধরণের বিবাহে সাধারণ গৃহপতির প(আদর্শ বলা হয়েছে। এই ধরণের বিবাহ সাধারণ গৃহপতির প(আদর্শ না হলেও রাজার ((ত্রে এই নিয়ম শিথিল করা হয়েছে।

আবার রাজ পরিবারে উত্তরাধিকার নিয়ে বিভিন্ন সমস্যার বিবরণ পাওয়া যায়। জাতক এবং অর্থশাস্ত্রে রাজাকে জ্ঞাতিদের থেকে সাবধনতা-অবলম্বন করতে বলা হয়েছে। আবার নাগরিকরা অনেক সময় রাজপরিবারের বিষয়ে আলোচনা ও সমালোচনা করছে। উত্তরাধিকার সমস্যা নিয়ে আলোচনা করছে। যেমন-মহাভারতে পান্ডবরা বনে গমন করল হস্তিনা পুরের জনতা কুরুবৃদ্ধদের দায়ী করছে। আবার রাজার প(থেকে জনমত নিজের প(আনার প্রবণতাও ল(্য করা যায় মুদ্রারা(স নাটকে, যেখানে চাণক্য জনমতকে প্রভাবিত করেন চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের প(। আবার সুজাতা জাতকে রাজার অধস্তন মন্ত্রী বোধিসত্ত্ব রাজার ভুল শুধরে দেওয়ার (মতা রাখেন। তাই তাকে সমালেচিত হতে হত এবং সে(ত্রে জনমতের বিশেষ একটা গুরুত্ব ছিল বলে মনে করা হয়।

বিভিন্ন সাহিত্যেসূত্রে রাজা আদর্শ গৃহপতি ও পরিবারকে আদর্শ পরিবার রূপে চিহি(ত করার প্রবণতা ল(্য করা যায়। যার মাধ্যমে বৃহত্তর সমাজের কাছে পরিবারিক ও সামাজিক আচরণ বিধির দৃষ্টান্ত স্থাপন করা যায়। আবার বেশ কিছু(ত্রে রাজপরিবারকে তাদের সামাজিক দায়িত্ব থেকে বিচ্যুত হতে দেখা যায়। সে(ত্রে জনসাধারণের সমালোচনার সম্মুখীন হওয়ার দৃষ্টান্ত ও পাওয়া যায়। তাই বলা যায় রাজা যেমন একাধারে আদর্শ গৃহপতি রূপে সামাজিক বিধি নিষেধের নিয়ন্ত্রক রূপে সাহিত্য সমূহে বর্ণিত হয়েছেন তেমনি নিজে সেই নিয়ম অগ্রাহ্য করলে নিন্দিত হয়েছেন।

৯.৩.৮.২.৩ সপ্তাঙ্গরাষ্ট্র সম্পর্কিত ধারণা ঃ—

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রব্যবস্থার সুন্দর বর্ণনা প্রদান করেন। এই ধারণায় রাষ্ট্রকে মানবদেহের সঙ্গে তুলনা করে, মানবদেহের যেমন অনেক অঙ্গবিদ্যামান তেমনি রাষ্ট্রের মধ্যে সাতটি অঙ্গ হিসাবে রাষ্ট্রব্যবস্থার সাতটি অঙ্গ (Seven aspects) কে তুলে ধরেছেন এই চিন্তায় রাজা রাষ্ট্রের প্রধান তথা সর্বাপে(া শক্তি(শালী ব্যক্তি(ত্ব হলেও তিনি কিন্তু একমাত্র সত্ত্বা নন। রাজা চাইলেই ইচ্ছামত রাষ্ট্রপরিচালনা করতে পারেন না, এই তত্ত্বটি রাষ্ট্রের সপ্তাঙ্গ তত্ত্ব বা সপ্তাঙ্গ রাষ্ট্রতত্ত্ব নামে পরিচিত। এইরূপ ধারণা মনুস্মৃতিতেও পাওয়া যায়। সেখানেও রাষ্ট্রকে বিভিন্নভাগে ভাগ করার প্রবণতা দেখা যায় অর্থশাস্ত্রে রাষ্ট্রকে (১) স্বামী (২) আমাত্য (৩) জনপদ (৪) দূর্গ (৫) কোষ (৬) বল এবং (৭) মিত্র এই রূপভাগে ভাগ করেন।

(১) স্বামী (Swami) ঃ— রাজতন্ত্র বা রাজা রাজ্যের সর্বপ্রধান সত্ত্বা। তিনি সপ্তঅঙ্গের প্রধানতম। রাজাকে তাই তিনি বিভিন্নশাস্ত্রের পারদর্শী হতে নির্দেশ করেন। যেমন — আন্বী(কী (Anviksiki), ত্রয়ী (Trayi), বার্ত্তা (Vartta), দন্ডনীতি (Dandaniti) অর্থাৎ, দার্শনিক চিন্তা, বৈদিক স্তোত্র, অর্থনীতি ও রাজনীতি। রাজাকে তার ইন্দ্রিয় সমূহ জয় করতে হবে। কাম, ত্রে(াধ, ব্যসন, গর্বের উর্দ্ধে থাকতে হবে। এছাড়া রাজার দৈনিক কার্যকলাপের বিবরণ তিনি সুন্দরভাবে বর্ণনা করেছেন। রাষ্ট্র প্রধান হিসাব প্রজাদের সুখ এবং মঙ্গলের জন্য তিনি সচেষ্ট থাকবেন। কৌটিল্য রাজার দৈনিক কার্যকলাপের আচরণ বিধি স্থিরীকৃত করেছেন অর্থশাস্ত্রে। বস্তুত পে(রাষ্ট্রের সর্বপ্রধান সত্ত্বা হলেও তার স্বেচ্ছাচারী হবার অবকাশ নেই। অশোকের লেখতে উল্লিখিত পোরাণ-পকিতি (Poran-Pokiti) এই বিষয়র সমর্থন করে। এর অর্থ ছিল প্রচলিত আইন। যা সহজে রাজাও লঙঘন করতেন না।

(২) অমাত্য (Amatya) ঃ— অমাত্যগণ হলেন রাজার অধীনস্থ রাজকর্মচারী। এদের সম্পর্ক বিস্তারিত আলোচনা পাওয়া যায়। রাজপুরুষের সহায়তাতেই রাজা রাজত্ব করতে পারেন (সহায়সাধ্যংরাজত্বম্) অধিকাংশ অমাত্যই — ‘অধ্য(’ উপাধিতে ভূষিত। অর্থশাস্ত্রের মতে বিভিন্ন ছলনাভিত্তিক পরী(ার মাধ্যমে যাচাই করতে হবে রাজপুরুষ কাম, অর্থ, ভয় এবং ধর্মের বিষয় বিশুদ্ধ (Fair) কিনা। অর্থাৎ তাঁকে নিয়োগের আগে দৃঢ়তা ও সততা যুগপৎ যাচাইয়ের প্রয়োজন। এই পরী(া-‘উপধা’ (Upodha) নামে পরিচিত। যিনি এই চারটি পরী(াতেই বিশুদ্ধ হবেন তিনি উর্দ্ধতর মন্ত্রী হবার যোগ্য। মেগাস্থিনিস Counsellor এবং Assessor বলেছেন যাদের, তারা উচ্চপদস্থ ছিলেন। তবে মৌর্যরা মন্ত্রী নিয়োগ করেছিলেন কিনা এবিষয়ে স্পষ্ট প্রমান পাওয়া যায় না। তবে অশোকের লেখতে উল্লিখিত ‘পরিখা’ শব্দটি অনেকে মন্ত্রী পরিষদের অনুরূপ মনে করেন। তবে তাদের (মতা রাজপুরুষদের পেয়ে অনেক কমই ছিল। মৌর্য শাসনের রাজপুরুষ বা পুলিসা ছিলেন তিন প্রকারের উচ্চ, নিম্ন, এবং মধ্য পর্যায়ের (উকসা, জেবয়া, মাঝিমা)। রাজপুরুষদের স্তর বিভাজনও অর্থশাস্ত্রে অনুমোদিত। সর্ব্বোচ পদাধিকারীর বেতন বার্ষিক ৪৮০০০ পণ এবং সর্বনিম্ন পদের বেতন বছরে ৭২০ পণ। তবে অশোকের লেখতে আবার অমাত্য বা অধ্য(নয় বরং মহামাত্র নামক রাজপুরুষদের পাওয়া যাবে। তবে একথা স্পষ্ট যে রাজাকে পরামর্শ দেবার জন্য একদল কর্মচারীর অবস্থান অবশ্যই ছিল।

(৩) জনপদ (Janapada) ঃ— জনপদ সমূহ ছিল রাষ্ট্রের অন্যতম অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রাজধানী বাদ অন্য অংশ যেখানে মানুষের বাস সেই সমস্ত অঞ্চল জনপদ নামে পরিচিত। এই জনপদের শাসনভার ন্যস্ত থাকত প্রাদেশিক শাসকদের ওপর। এই জনপদ অনক (ে ত্রে ছিল গ্রামের সমার্থক। কৃষিনির্ভর অর্থনীতির উন্নতির জন্য কৌটিল্য রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের কথা বলেছেন। পাশাপাশি জনহীন পরিত্যক্ত(স্থানে জনপদ গড়ে তোলার কথাও বলেছেন। তিনি জনবহুল স্থান থেকে মানুষকে তুলে এনে বসতি স্থাপনের কথা বলেছেন। এই প্রক্রি(য়াকে তিনি বলেছেন ‘জনপদনিবেশ’ (Janapadanivesh)। কলিঙ্গযুদ্ধের পর অশোক বহু কলিঙ্গবাসীকে তুলে এনে অন্যস্থানে জনপদ স্থাপন করেন। কৌটিল্য ব্যক্তি(গত উদ্যোগ পছন্দ না করলেও অনুর্বর জমিকে নিজচেষ্টায় ফলন করলে তার মালিকানা রাষ্ট্র মেনে নেবে। আবার সেচব্যবস্থার উন্নতিতে রাষ্ট্র ব্যবস্থা নিলে, সেচের জলের জন্য ‘উদকভাগ’ নামক কর দিতে হত। মৌর্যরাষ্ট্রের তিনটি প্রাদেশিক শাসনকেন্দ্র

ছিল তোসালি, উজ্জ্বয়িনী এবং ত(শিলা (Taxila) ।এই তিন কেন্দ্রের শাসনকর্তা ছিলেন সম্রাট নিযুক্ত('কুমার' (Kumara) চতুর্থ কেন্দ্রটি ছিল সুবর্ণগিরি (Suvarnagiri) , এটিকে D. C. Sircar অন্ধ্রের Janagiri র সঙ্গে তুলনীয় করেছেন। Survarnagiri শাসনকার্য চালাতেন একজন 'আর্যপুত্র' বা Crown Prince।

(৪) দুর্গ ঃ— দুর্গ বলতে মূলত রাজধানী নগরকে বোঝানো হয়েছে। বলাবাহুল্য পাটলিপুত্রনগর নগর প্রাকার দ্বারা পরিবেষ্ঠিত থাকবে। এর সঙ্গে সঙ্গে রাজধানী নগরের পরিকল্পনা কিরূপ হবে তাও কৌটিল্য বর্ণনা করেছেন। এছাড়া অন্যত্র দুর্গ করা যেতে পারে। দুর্গ পরিখা ও প্রাকার বেষ্ঠিত হবে। মূল রাজধানী ও প্রাদশিক রাজধানী এবং সামরিক গুরুত্বের স্থানে দুর্গনিবেশ করা যাবে। দুর্গের মধ্যে অনেকগুলি রাজপথ থাকবে। এছাড়া উপযুক্ত(গুপ্তপথ, সেনা চলাচলের পথ, বাণিজ্য স্থানে যাবার পথ প্রভৃতি থাকবে। মূল নগর দ্বারা হবে চারটি যেগুলি হল North — ব্রাহ্মদ্বার (Brahmadwar), East ইন্দ্রদ্বার (Aindradwar), South — যমদ্বার (Yamyadwar), West সেনাপত্যদ্বার (Senapatyadwar)।পুরমধ্যে সেনাবহিনীকে অনেক সেনাপতির অধীনে রাখতে হবে, কারণ একজন সেনাধ্য(্যের অধীন থাকলে তিনি শত্রুর সঙ্গে মিলিত হয়ে ঘাতকতা করলে দুর্গের পতন সুনিশ্চিত।

(৫) কোষ ঃ—

কোষ হল অর্থভান্ডার। অর্থভান্ডারই সব রাষ্ট্রের যাবতীয় কার্যত্র(ম পরিচালনা করে, অস্বীকার করতে কৌটিল্য দ্বিধাকরেননি। বিশাল সাম্রাজের বহুসংখ্যক রাজপুরুষ নিয়োগ, সেনাবাহিনী পরিচালনা এবং ভরণপোষণের জন্য আবশ্যিক বিপুল পরিমাণ সম্পদ আহরনের ব্যবস্থা। সে(্ত্রে অর্থশাস্ত্র তার একটি সুনির্দিষ্ট কাঠামোর কথা উল্লেখ করেছেন। মৌর্য্য করব্যবস্থার চিত্র কিন্তু গ্রিক বিবরণেও পাওয়া যায়। তাদের মতে মৌর্য কর কৃষকদের উৎপন্ন ফসলের এক থেকে তিন চতুর্থাংশ পর্যন্ত হতে পারত। ভারতীয় শাস্ত্র অনুসারে রাজা ফসলের একষষ্ঠ্যাংশ 'ভাগ' হিসাব পান। মৌর্য আমলে 'ভাগ' এবং বলি নামক কর গুলি যে প্রচলিত ছিল, তার প্রমাণ মেলে অশোকের রুম্মিনদেই লেখতে (Rumindeyi) যেখান অশোক লুম্বিনী গ্রামের ভাগ কমিয়ে 1/8 অংশ করেন এবং বলি মুক্ত(করেদেন। অর্থশাস্ত্র অনুসারে রাজস্ব আদায়ের ভারপ্রাপ্ত ছিলেন সমাহর্তা। তিনি দুর্গ (Township), রাষ্ট্র (Agrarianarea), খনি (Mine), সেতু (Irigation Project), বন (Forest), ব্রজ (Grazing Land), এবং বণিকাপথ (Trade route) থেকে কর আদায় করতেন। কৌটিল্য কৃষি বর্হিভূত খাত থেকে রাজস্ব সংগ্রহ আগ্রহ দেখিয়েছেন। রাজকোষে অর্থর অভাব কৌটিল্যের কাছে ভয়াবহ। সে(্ত্রে আপৎকালীন কর আদায়ের নিদান রয়েছে, যার নাম 'প্রণয়ত্রি(য়া' (Pranayakriya)। সকলে এই উচ্চহারে কর দিতে বাধ্য কিন্তু এই চড়া কর একজন রাজার রাজত্বকালে মাত্র একবারই প্রযোজ্য।

(৬) বল ঃ

মৌর্যদের (মতা ধরে রাখার অন্যতম মাধ্যম ছিল বল। বল বা সৈন্যবল রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ। কৌটিল্য সৈন্যবাহীকে অবশ্যই রাষ্ট্রের অপরিহার্য অঙ্গ। কৌটিল্য সেনাবাহিনীকে অবশ্যই রাষ্ট্রের অধীন বলে উল্লেখ করেছেন। গ্রিক বিবরণী ছয় ল(মৌর্যসেনার উ্ল্লেখ করেছেন। পাশাপাশি সামরিক বাহিনীতে ছটি বিভাগের উল্লেখ করেছেন। সামরিক বাহিনীতে এই রূপ ভাগ অর্থশাস্ত্রেত্ত বর্ণিত। গ্রিক বিবরণে পাঁচসদস্যের একটি করে সমিতি একেকটি বিভাগ পরিচালনা করতেন। যেমন — নৌবাহিনীর (Navy) দায়িত্বে ছিল নাবাধ্য((Navadhyaksha) গোশকট (Bullock Cart) এর দায়িত্বে গোঅধ্য((go'adhyaksha) পদাতিক বাহিনী (Infantry) র দায়িত্বে ছিল পত্যুধ্য((Patyadhyaksha) অশ্বারোহী (Cavalry) র দায়িত্বে ছিল অশ্বাধ্য((asvadhyaksha) রথাবাহিনী (Rathdhyaksha) র দায়িত্বে ছিল রথাধ্য(হস্তীবাহিনী (Elephant Crop) র দায়িত্বে ছিল হস্ত্যাধ্য((hastyadhyaksha), এর সঙ্গে গুপ্তচররাও রাষ্ট্রের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। কৌটিল্যের সঞ্চর (ভ্রাম্যমাণ বা (Roving) এবং সংস্থা (স্থায়ী বা Stationary) আবার শত্রু(র গুপ্তচরকে নিজের অনুগত করে নিতে পারলে সেই গুপ্তচর হন উভয়ভেদন (Ubhayaveda) বা বর্তমান পরিভাষায় double agent ।

গুপ্তচরদের মাধ্যমে রাজপুরুষ, সন্দেহভাজন ব্যক্তি(, বিদেশী শক্তি(র ওপর নজরদারী এমনকি গুপ্তহত্যার জন্যও কৌটিল্য গুপ্তচরদের ব্যবহার করতে বলেছেন।

(৭) মিত্র ঃ

প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সঙ্গে সম্পর্ক রাষ্ট্রনীতির একটি উল্লেখযাগ্য ধাপ। নিজ রাষ্ট্র সীমা ও পররাষ্ট্র সম্পর্কে জ্ঞান রাজ্য শাসনের (ে ত্রে বাঞ্ছনীয়। অশোকের অনুশাসনেও অন্ত অবিজিত কথাটির উল্লেখ পাই। কৌটিল্য মিত্রভাবাপন্ন রাষ্ট্রদের সঙ্গে সদ্ভবে স্থাপনর কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেছেন পার্শ্ববতী শত্রুরাষ্ট্রকে নিয়ন্ত্রণ বা দমন করতে হলে সেই শত্রুরাষ্ট্রের প্রতিবেশীদের সাথে মিত্রতা করতে হবে, যাতে সেই রাষ্ট্রকে বেষ্টন করা যায়। ইহা 'মন্ডলতত্ত্ব' নামে পরিচিত। এছাড়া সন্ধি, বিগ্রহ, যান আসন, বৈরীভাব, সমাশ্রয় এই ছটি নীতি প্রয়োগের কথা কৌটিল্য উল্লেখ করেছন। তাছাড়া পররাষ্ট্রনীতির (ে ত্রে শত্রু(র শত্রুকে মিত্র করে নেওয়া, মিত্রের মিত্রকে সাথে নেওয়ার কথা বলেছেন। 'বিগ্রহ' বা যুদ্ধ অপে(া' শান্তি বা সন্ধি অধিক কাম্য। কিন্তু যুদ্ধ অনিবার্য হলে সম্মুখ যুদ্ধই অধিক কাম্য। তবে সে(ত্রে শত্রুর বলাবল পরী(ণ বাঞ্ছনীয়।

এইভাবে দেখা যায়, সপ্তাঙ্গরাষ্ট্রেরতত্ত্বে সাতটি বিভাগের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে, রাষ্ট্রের বিভিন্ন আঙ্গিক তুলে ধরা হল। এই চিন্তাভাবনার মধ্যে অভিনব চিন্তাভাবনার ধারা স্পষ্ট।

৯.৩.৮.২.৩ - গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থা ঃ—

গুপ্তযুগের শাসনব্যবস্থার জন্য আমাদের প্রধানত প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর নির্ভর করত হয়। গুপ্ত যুগের কিছু সংখ্যক লেখ প্রথম সঙ্কলন ও প্র কাশ করেন ক্লিট এবং পরবর্তীকালে ডঃ দীনেশচন্দ্র সরকার। এযুগের বিভিন্ন মুদ্রা এবং সীল সংকলন ও প্রকাশ করেন এলান। স্মৃতি শাস্ত্র, বিশেষত মনুস্মৃতি, নারদস্মৃতি ইত্যাদি ও আমাদের সাহায্য করে। তবে স্মৃতিশাস্ত্রে তত্ত্বেরদিক প্রাধান্য পেয়েছে, বাস্তব দিক পায়নি। ফা হিয়েনর রচনার মূল্য তুলনায় বেশি। তাঁকে স্মৃতিশাস্ত্রের পরিপূরক বলা যায়।

গুপ্ত যুগের প্রথম দিকে রাজতন্ত্র ও প্রজাতন্ত্র উভয় প্রকার শাসনব্যবস্থাই প্রচলিত ছিল। এই প্রজাতন্ত্রগুলি, যেমন মদ্রকগণ, যৌধেয়গণ, অর্জুনায়নগণ, মালবগণ, প্রার্জুনগণ, কাকগণ, সোনাকানিগণ, আভিরগণ ইত্যাদি ছিল উত্তরভারতে। এলাহাবাদ স্তম্ভলোখরতে এই গণরাজ্যগুলি অনেকে সঙ্গে কোন রাজার নাম যুক্ত(করা হয়নি। সেখানে বলা হয়েছে যে, মালবগণ যৌধেয় গণ প্রভৃতি সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করেছিলেন। এই গণরাজ্যগুলিতে সমগ্র জনসমষ্টি সার্বভৌম অধিকার ভোগ করত না। এগুলিতে কেন্দ্রীয় পরিষদ প্রায়ই — ভূমধ্যধিকারী (ত্রিয় শ্রেনীর অভিজাত ব্যক্তি(দের দ্বারা গঠিত হত। কেন্দ্রীয় কার্যনিবহিকের পদ বংশানুত্র(মিক হওয়ার প্রবণতা দেখা গিয়েছিল। অনেক সময় এই পদের সঙ্গে রাজকীয় অভিযুক্ত(করা হত। সোনাকানিকগণের যিনি প্রধান, তিনি এই অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। তাঁর পদটিও বংশানুত্র(মিক হয়েছিল। যৌধেয় গণের যিনি প্রধান, তাঁকে মহারাজা বলা হত।

রাজা মৌর্য যুগের মত গুপ্তযুগেও শাসনব্যবস্থার শীর্যে ছিলেন। রাজ পদ বংশানুত্র(মিক ছিল, তবে মৌর্যদের মত গুপ্ত রাজারাও অনেক সময় তাদের উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায় যে গুপ্ত বংশের শ্রেষ্ঠ সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত, প্রথম চন্দ্রগুপ্ত কর্তৃক মনোনীত হয়েছিলেন। সমসাময়িক লেখতে রাজাকে 'অচিন্ত্যপুরুষ', লোকধামদেব', 'পরম দৈবত ইত্যাদি আখ্যা দেওয়া হয়েছে। প্রথম চন্দ্রগুপ্তের সময় থেকে সব গুপ্তসম্রাটই 'মহারাজটিরাজ' অভিধা গ্রহণ করেছিলেন। এলাহাবাদ প্রশস্তিতে সমুদ্রগুপ্তকে, ধনহ (কুবের), ইন্দ্র, বরুণ এবং অন্তকের (যমের) সমক(বলা হয়েছে। এই আড়ম্বর পূর্ণ অভিধাগুলি গুপ্ত সম্রাটের মর্যাদা বৃদ্ধির ইঙ্গিত বহন করে। এই অঙ্গিগুলি মাধ্যমে গুপ্ত যুগে রাজতন্ত্রের পুণবার্সন ঘটানোর প্রয়াস ল(করা যায়।

রাজা শুধু শাসনব্যবস্থার শীর্ষে ছিলেন না, তিনি ছিলেন এই ব্যবস্থার কেন্দ্রে। রাজনৈতিক শাসন বিষয়ক এবং বিচার সংত্র(ান্ত সব অধিকারের কেন্দ্রে ছিলেন রাজা। তাঁকে সাহায্য করার জন্য মন্ত্রীরা থাকতেন, কিন্তু সর্ব বিষয়ে সিদ্ধান্তে গ্রহণের দায়িত্ব ছিল তাঁর। তিনি ছিলেন সেনাবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং প্রধান বিচারক। প্রদেশ পাল এবং অন্যান্য বেসামরিক ও সামরিক উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের, রাজা নিযুত্ত(করতেন এবং তাঁর একমাত্র তাঁর কাছেই দায়ী থাকতেন। কেন্দ্রীয় সচিবালয় তাঁর নির্দেশে পরিচালিত হত। আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় যে তিনি নিরঙ্কুশ (মতার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু প্রকৃতপ(তাঁর (মতা সীমাবদ্ধ ছিল। মন্ত্রীরা এবং অন্যান্য উচ্চপদস্থ কর্মচারীরা রাজার সঙ্গে (মতা ভাগ করে নিতেন। রাজা আইন প্রণয়ন করতে পারতেন না। তাঁকে ধর্মশাস্ত্রের বিধান মেনে চলতে হত। সেনা বাহিনী এবং বৈদেশিক নীতি ভিন্ন অন্য সব বিষয়ই স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলির মাধ্যমে পরিচালিত হত। সর্বোপরি রাজার বিরুদ্ধে জনসাধারণের বিরুদ্ধে ন্যায় সঙ্গত অধিকার ছিল। রাজার পরেই স্থান ছিল যুবরাজের। বৈদিক যুগের মত, গুপ্ত যুগে রাজপদ বংশানুত্র(মিক ছিল, অবশ্য রাজা তাঁর উত্তরাধিকারী মনোনয়ন করতে পারতেন, সে কথা পূর্বে বলা হয়েছে।

রাজার (মতা বিভিন্ন মন্ত্রী এবং উচ্চপদস্থ কর্মচারী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত। মন্ত্রীর পদ বংশানুত্র(মিক হয়ে উঠেছিল। উচ্চপদস্থ মন্ত্রীদের মধ্যে বৈদেশিক মন্ত্রী, শান্তি ও যুদ্ধের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী, সরকারী নথিপত্রের ভার প্রাপ্ত মন্ত্রী ছিল উল্লেখ্য কিন্তু মন্ত্রীগণ ব্যত্তি(গতভাবে তাদের সাময়িক এবং রাজনৈতিক নৈপুনের পরিচয় দিতেন। গুপ্তযুগে কুমারামাত্য এবং আয়ুত্ত(গণ নামক রাজকর্মচারীর উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে কুমারামাত্য বলতে কাদের বোঝানো হত তা নিয়ে নানারকম মত পার্থক্য বললেও মনে করা হয় কুমারমাত্যরা ছিলেন যুবরাজের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী। এরা প্রাদেশিক শাসনকার্য বিশেষভাবে নিযুত্ত(ছিলেন।

গুপ্ত সাম্রাজ্য কয়েকটি অঞ্চলে বিভত্ত(ছিল। এই অঞ্চলগুলিকে দেশ এবং ভুত্তি(কখনও বা রাষ্ট্র বলা হত। এগুলি আবার বিভিন্ন জেলায় কখনও বা রাষ্ট্র বলা হত। এগুলি আবার বিভিন্ন জেলায় অর্থাৎ প্রদেশে অথবা বিষয়ে বিভত্ত(হত। ভুত্তি(শাসন করতেন উপরিক অথবা উপরিক মহারাজাগণ, মাঝে মাঝে রাজপরিবারের ব্যত্তি(রা এই পদে নিযুত্ত(হতেন। কুমারমাত্য, আয়ুত্ত(এবং বিষয় প্রতিগণ বিষয়গুলি শাসন করতেন। কখনও সামন্ত নৃপতিগণত বিষয় শাসনের ভার পেতেন। গুপ্তযুগে বিষয় শাসনের বিকেন্দ্রীকরণের নীতি বিশেষভাব অনুসরণ করা হয়েছিল। উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন লেখতে তার পরিচয় পাওয়া যায়। এখানকার বিষয়পতিগণ সধারণত প্রাদেশিক শাসকগণ কর্তৃক মনোনীত হতেন সম্রাটদের দ্বারা হতেন না। উত্তরবঙ্গে লেখগুলি থেকে জানা যায় যে কুমারামাত্য, আয়ুত্ত(অথবা বিষয়পতি গণ, অধিষ্ঠানাধিকরণের (নগর পরিষদের) সাহায্যে রাষ্ট্রীয় জমি বিত্র(য় করতেন। কখনও বা কুমারামাত্যগণ বিষয়ধি করণের (জেলা অপিসের) সাহায্যে এ কাজ করতেন। অন্য সময় অর্থকুলাধি করণ গ্রামিক (গ্রাম প্রধান) এবং গৃহস্থদের (কুটুম্বিনগণ সাহয্য নিতেন।)

গুপ্তযুগে বিষয়গুলির পরেই ছিল গ্রাম ও নগর। গ্রামীক মহত্তর ও ভোজকদের সাহায্যে গ্রামের শাসনকার্য পরিচালিত হত। পুরপালের উপর সাধারণত নগর শাসনের ভার থাকত। তাঁকে অনেক সময় কুমারামাত্যের মর্যাদা দেওয়া হত। তাঁকে সাহায্যে করবার জন্য জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত নগর পরিষদ ছিল। নগরাশ্রয়ী, সার্থবাহ, প্রথম কুলিক এবং প্রথম কায়স্থ, নগর পরিষদের সদস্য হতন। আধিকারিক পদাধিকারী — রাজকীয় কর্মচারী স্থানীয় স্বায়ও শাসনমূলক প্রতিষ্ঠানগুলির কার্যের তত্ত্বাবধান করতেন। এইভাবে গ্রাম, নগর ও বিষয় শাসনের সঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের যুত্ত(করে গুপ্ত সম্রাটগণ সবচেয়ে বেশি সাহসের পরিচয় হয়েছিলেন।

গুপ্তযুগের শাসন সম্পর্কে কর ও রাজস্ব ব্যবস্থা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। এযুগের কর ব্যবস্থা বিষয়ে বিশদ বিবরণ আমদের জানা নেই, কেননা তৎপলীন লোখগুলি এ সম্পর্কে নীরব। মোটামুটিভাবে গুপ্ত যুগে যে করগুলি প্রচলিত ছিল বলে মনে হয়, সেগুলি হলঃ (১) ভাগকর অথবা ভূমিকর। এর পরিমাপ ছিল উৎপন্ন ফসলের এক ষষ্ঠাংশ, অথবা এক

চতুর্থঅংশ। (২) ভোগকর অথবা চুঙ্গি কর। এই কর গ্রাম এবং বাহরের কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের অংশ হিসাবে বরাদ্দ করা হত। এই দুটি করই দ্রব্যের মাধ্যমে আদায় করা হত। (৩) ভূতপ্রত্যয় বা আবগারি শুল্ক। সাম্রাজ্যের ঃ অভ্যন্তরে শিল্পজাত দ্রব্যের উপর এই কর ধার্য করা হত। এছাড়া বন্দর, ফে রিঘাট এবং সুর(ত নগরের উপর কর ধার্য করা হত। বিধি অথবা বাধ্যতামূলক শ্রম একেবারের অজানা ছিল না। পতিত জমি, বন এবং লবণ খনির উপর রাষ্ট্রের মালিকানা ছিল। সেগুলিকে ভাড়া দিয়ে অথবা তাদের উৎপন্ন দ্রব্য বিত্র(য় করে অর্থ সংগ্রহ করা হত। রাজস্বমন্ত্রী কর এবং রাজস্ব আদায়ের তত্ত্ববধান করতেন। এগুলি বেশীরভাগই দ্রব্যের মাধ্যমে এবং অংশত, অর্থের মাধ্যমে আদায় করা হত। পতিত জমির রাষ্ট্রের সম্পত্তি হলেও, তার পরিচালনার ভার স্থানীয় প্রতিষ্ঠানের উপর থাকত।

গুপ্তশাসন ব্যবস্থায় বিচারকার্যে সর্বোচ্চ ছিলেন — স্বয়ং রাজা। তবে তাঁর অনুপস্থিতিতে প্রধান বিচারপতি বিচারকার্য সম্পন্ন করতেন। শহরের ও গ্রামে পঞ্চায়েত ছিল। ফা-হিয়েন গুপ্তযুগের ফৌজদারী আইনের কোমলতার কথা বলেছেন। বেশীর ভাগ অপরাধের শাস্তি ছিল জরিমানা। মৃত্যুদন্ড বা অঙ্গচ্ছেদের ব্যবস্থা ছিল না। তবে এ ধরনের বত্ত(ব্যের সাহিত্য থেকে বিশেষ সমর্থন পাওয়া যায় না। সামরিক বাহিনীর শীর্ষে ছিলেন রাজা। পদাতিক অ(রোহী এবং হস্তীবাহিনী নিয়ে সৈন্যদল গঠিত হত। এছাড়া উষ্ট্রবাহিনী ছিল। ফা-হিয়েন লিখেছেন সৈন্যরা রাজার দেহর(ী ও পরিচালক গণ নিয়মিত বেতন পেতেন।

৯.৩.৮.৩ উপসংহার ঃ—

এইভাবে দেখা যায় বিভিন্ন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ক গ্রন্থ বিভিন্ন নৈতিক ও তাত্ত্বিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করে। আবার বিভিন্ন সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনা করে দেখা যায়। সেই সমস্ত শাসন কার্য এই সমস্ত শাস্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে তুলনীয়। পাশাপাশি অন্যতুলনামূলক উপাদান ল(্য করলে রাজতান্ত্রিক আদর্শ এবং শাসনাদর্শ সম্পর্কে অনেকটা জ্ঞান লাভ করা যাবে।

৯.৩.৮.৩ সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ—

(1) Romila Thapar – ‘Early India’

(2) Romila Thapar – ‘Cultural Past’

(3) Ranabir Chakraborti – ‘Exploring Early India’.

৯.৩.৮.২ সম্ভাব্য নমুনা প্রশ্নবলী ঃ—

(1) What do you know about the Concept of Rajadharma in Ancient Indian text?

(2) How did the Sourees depicted the king as householder per excellence?

(3) What do you think about ‘Saptangarastra’?

(4) Describe your views about Gupta administration.

কৃতজ্ঞতা ঃ—

কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র - রাধাগোবিন্দ বসাক।

ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব — রণবীর চত্র(বর্তী।

পর্যায়-৪

জাতিবর্ণ প্রথার উদ্ভব এবং বিকাশ

Origin and Development of Caste System

একক — ৯,১০ এবং ১১

৯.৪.৯.০ — উদ্দেশ্য
৯.৩.৭.১— বিভিন্ন গ্রন্থ এবং সাহিত্য আইন ও নৈতিকতার ধারণা (Unit -9)
৯.৪.১০.১ — বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণব্যবস্থার প্রকৃতি (Unit -10)
৯.৪.১১.৩ — জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিকাশ (Unit -11)
৯.৪.১১.৩.১ — মেগাস্থিনিস বর্ণিত সমাজ
৯.৪.১১.৩.২— ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যে বর্ণ ব্যবস্থার বিকাশ
৯.৪.১১.৪ — উপসংহার
৯.৪.১১.৬ — সহায়ক গ্রন্থাবলী
৯.৪.১১.৬ — সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৯.৪.৯.০ — উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান পর্যায়টিতে ছাত্রছাত্রীরা প্রাচীনভারতীয় সমাজের একটি গুরুত্ব অঙ্গরূপে জাতিবর্ণ প্রথার বিকাশ অধ্যয়ন করবে। বস্তুতপ(ে কিভাবে বৃত্তি অনুসারে বিভক্ত(সমাজ ধীরে ধীরে জন্ম দ্বারা নির্ধারিত বৃত্তিতে এবং সেই বৃত্তি অনুসারে উচ্চ ও নীচ ভেদ পরিস্ফুট হয়। তা এই পর্যায়ের মাধ্যমে অবগত হবে তারা। পাশাপাশি চর্তুবর্ণ ব্যবস্থা কিভাবে বহু জাতিতে পরিণত হয় এবং উপজাতি কাঠামোকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোর অর্ন্তভূক্ত(করার (ে ত্রে ভূমিকা পালন করে তা এই রচনার মাধ্যমে পরিষ্ফুট হবে।

৯.৪.৯.১ — জাতিবর্ণ প্রথার উদ্ভব

ভারতীয় সামাজিক সংগঠনের একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল জাতি বর্ণ প্রথা। প্রাচীন সরল সমাজ ব্যবস্থায় গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষদের পেশা বা বৃত্তিগতভাবে যে বিভাজন করা হত পরবর্তীকালে সামাজিক ব্যবস্থার জটিলতর রূপ গ্রহণের ফলে সেই বিভাজন কঠোরতর রূপ পরিগ্রহণ করার প্রবণতা দেখা যায়। ভারতবর্ষে এই প্রবণতা জাতি-বর্ণ-প্রথা রূপে প্রকাশিত হয়েছিল। সাধারণভাবে বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজকে চারটি শ্রেণী যথা - ব্রাহ্মণ, (ত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যেভাগ করা হয়। অন্যদিকে 'জাতি' শব্দটি প্রথমে নির্দিষ্ট-জনগোষ্ঠী রূপে ব্যবহৃত হলেও পরবর্তীকালে সেগুলিকে অসবর্ণ বিবাহের ফলে সৃষ্ট বলে চিহ্নি(ত করা হল। জাতি-বর্ণ ব্যবস্থার মাধ্যমে সমাজের উচ্চনীচ ভেদ বা স্তরায়ণ এবং সেই ব্যবস্থার বিবর্তন ভারতীয় সামাজিক ইতিহাসের অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক।

ভারতীয় ইতিহাসের প্রাচীনতম সাহিত্যিক উপাদান ঋগ্বেদে বর্ণ শব্দটি প্রাথমিকভাবে সুনির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীকে নির্দেশ করে। মূলত আর্যবর্ণ ও দাসবর্ণর মধ্যে পার্থক্য বোঝাতে এটির ব্যবহার হয়। একমাত্র দশম মন্ডলের পুরুষ সূক্ত((১০/৯০) অনুসারে আদি পুরুষের মস্তক, বাহু, উরু ও পদ যুগল থেকে ব্রাহ্মণ (ত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রের আর্বিভাবের কথা বলা হয়েছে। তবে এই সূক্ত(টি প্র(িপ্ত ও অপে(াকৃত পরবর্তী কালের রচনা বলে ঐতিহাসিকরা অনুমান করেছেন। আবার প্রাথমিকভাবে বৈদিক সাহিত্যের মধ্য জাতির ধারণা পাওয়া যায় না।

বর্ণব্যবস্থার বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে বলা যায় যে এই ব্যবস্থা মূলত জন্ম দ্বারা নিয়ন্ত্রিত, পুরুষানুত্র(মিক বৃত্তিধারণ আবশ্যিক এবং বৃত্তি পরিবর্তন নিষিদ্ধ, এছাড়া এই ব্যবস্থায় কেবলমাত্র সবর্ণ বিবাহ সিদ্ধ এবং বর্ণান্তরে খাদ্যপানীয় গ্রহণে

বিধিনিষেধ প্রযোজ্য। এই মূলবৈশিষ্ট্যগুলি কোন সমাজ কতটা প্রকট তা বিচার করে, সেই সময় কালে বর্ণাশ্রম ব্যবস্থার প্রকটতা সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায়। সাধারণত চর্তুবণে ব্রাহ্মণগণ (পুরোহিত শ্রেণী) এই সমাজের শীর্ষে অবস্থান করে। তাদের পরেই (ত্রিয়গণ (যোদ্ধা) ও বৈশ্য (বণিক) গণের স্থান এবং সবার শেষে শূদ্র, কাজ তিন বর্ণের সেবা করা। কোন কোন স্থানে নিষাদকে পঞ্চম বর্ণ বলা হয়ছে।

ঋগ্বেদে চর্তুবর্ণের উল্লেখ অত্যন্তবিরল হলেও কর্মবিভাজিত সমাজব্যবস্থা অনেক পূর্ব থেকে শুরু হয়েছিল। George Dumezil ইন্দো-ইউরোপীয় সমাজে কর্মের নিরিখে পুরোহিত, যোদ্ধাও উৎপাদক এই তিন শ্রেণীর অবস্থান ল(্য করেছেন। ভারতীয় আর্যদের মধ্যেও তার প্রভাব ল(্য করা যায়। বৈদিক দেবতা নিচয়ে অনুরূপ বিভাজন দেখা যায় যেখানে পুরোহিতদের দেবতা-অগ্নি। যোদ্ধাদের দেবতা ইন্দ্র ও উৎপাদকদের দেবতা-নাসত্যদ্বয়কে চিহ্নি(ত করা হয়। এই তিনশ্রেণী পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ, (ত্রিয় ও বৈশ্যতে রূপান্তরিত হয়। চতুর্থবর্ণ রূপে শূদ্রদের অর্ন্তভূক্তি(র প্রসঙ্গে অনেকের অভিমত হল যে অনার্য ভারতীয় অধিবাসীদের শূদ্র বা নিম্নতম বর্ণে স্থান দেওয়া হয়েছে। তবে শূদ্র শব্দটি ঋগ্বেদে বহুল প্রচলিত ছিল না।

ঋগ্বেদে চর্তুবর্ণ ব্যবস্থা কোন স্তরীকৃত সমাজব্যবস্থাকে নির্দেশ করেনি। সবর্ণ বিবাহের বাধ্যবাধকতা ঋগ্বেদের যুগে ছিল না ঋগ্বেদের একটি সূক্তে(একজন শস্যপেষণকারিনী বলেছেন। যা থেকে মনে হয় বৃত্তিঅনুসরণের প্রথাও বংশাত্র(মিক ছিল না। এমনকি মহাকাব্যের প্রাচীনতর অংশেও এই রূপ সামাজিক কঠোরতা ছিল না। ব্রাহ্মণ পরশুরাম বা দ্রোণ যুদ্ধবিদ্যাকে পেশা রূপে গ্রহণ করেন অন্যদিকে অসবর্ণ বিবাহের ফলে জাত ব্যাসদেব বা বিচিত্রবীর্য কে সামাজিক মর্যাদা লাভের (ে ত্রে সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়নি।

পরবর্তী বৈদিকযুগ থেকে বর্ণব্যবস্থা কঠোরতর রূপ পরিগ্রহ করে ব্রাহ্মণ, (ত্রিয় ও বৈশ্য গণ দ্বিজ নামে অভিহিত হন এবং শূদ্রের অবস্থার অবনতি হয়। পরবর্তী বৈদিক যুগে যাগযজ্ঞের প্রত্রি(য়া জটিলতর হবার সাথে সাথে যজ্ঞকারী ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি পেতে শুরু করে। বৈদিক সাহিত্য ব্রাহ্মণদের দ্বারাই প্রণীত হয় সে(ে ত্রে বৈদিকজ্ঞানের ধারক রূপে তারা শ্রেষ্ঠবর্ণ রূপে চিহ্নি(ত হয়। ব্রাহ্মণদের পর (ত্রিয়দের স্থান। ঋগ্বেদের রাজন্য পরবর্তীতে (ত্রিয়তে পরিণত হয়েছেন, কোন কোন (ে ত্রে ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয় উভয়ই সমমর্যাদা দাবি করছেন। অভিষেক কার্যের জন্য যেমন (ত্রিয়দের ব্রাহ্মণগণের ওপর নির্ভর করতে হয়। তেমনিই ব্রাহ্মণরাও দান-দ(ণার জন্য (ত্রিয়ের ওপর নির্ভয়শীল শতপথ ব্রাহ্মণরাও ঐতরেয় ব্রাহ্মণে রাজা বা (ত্রিয়কে পুরোহিতের সাহায্যের ওপর নিভরশীল বলা হয়েছে। আবার শতপথ ব্রাহ্মণ রাজসূয় যজ্ঞে (ত্রিয়ের স্থান ব্রাহ্মণদের উপরে নির্দেশা করেছেন। রামশরণ শর্মা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে দেখিয়েছেন যে (ত্রিয় রাজা এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সরিয়ে অনুগত ব্রাহ্মণকে পুরোহিত হিসেবে নিয়োগ করতে পারতেন। এইভাবে বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয়দের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দিতা ও সহযোগিতা ল(্য করা যায়।

বৈশ্যবর্ণ দ্বিজ পর্যায়ভূক্ত(হলেও বৈদিক সাহিত্য থেকে তাদের প্রতি হেয় মনোভাব প্রকট হয়। ঐতরেয় ব্রাহ্মন অনুসারে বৈশ্য হল বলিকৃৎ (উৎপাদক) এবং তাকে উৎখাত বা অত্যাচার করা যায় অন্যদিকে শূদ্রদের অবস্থান ছিল শোচনীয়। তাদের একমাত্র কাজ উচ্চতর তিনবর্ণের সেবা করা (দ্বিজাতি শুশ্রূষা), ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুযায়ী তাদের যথেচ্ছভাবে উৎখাত বা হত্যা করা যায়। রামশরণ শর্মার মতে, সমাজের ধনোৎপাদক শ্রেণী বৈশ্যদের অবদমিত করে উচ্চতর ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয় বর্ণ সামাজিক ধণ সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রেণ করে এবং শ্রমদানকারী শূদ্রদের কাছ থেকে অতিরিক্ত(শ্রম আদায় করে উৎপাদন ব্যবস্থায় যাবতীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করেন।

বর্ণব্যবস্থার সঙ্গে বিবাহ সংত্র(ান্ত বিধি নিষেধ বিশেষভাবে বিচার্য। সবর্ণে কিন্তু গোত্রন্তরে বিবাহ এই আমলে প্রকট হতে শুরু করে। এই ব্যবস্থাকে বিশুদ্ধ বিবাহ ব্যবস্থা বলা যায়। তবে বৈদিকযুগের অন্তিম পর্ব থেকে অসবর্ণ

বিবাহের কথা জানা যায়। উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের স্ত্রী বিবাহ প্রতিলোম। অসবর্ণবিবাহ মধ্যে অনুলোম শাস্ত্রের অনুমোদন পেলেও প্রতিলোম বিবাহ শাস্ত্র দ্বারা নিন্দিত হয়েছে। অসবর্ণ বিবাহের ফলে জাতি বা মিশ্রজাতির ধারণা তৈরী হতে দেখা গিয়েছিল।

বাজসনেয়ী সংহিতা (vajasneyi) কর্মভিত্তিক বিভিন্ন কারিগরেরর বিবরণ দেয়। পেশাভিত্তিক ১৯ রকমের কারিগরের উল্লেখ পাওয়া যায়। সেই পেশাগুলি হল (১) কর্মার (কামার) (২) মণিকার (গহণা-নির্মাতা) (৩) ইষুকার (তীর-নির্মাতা) (৪) ধনুকার (ধনুকনির্মাতা), (৫) জ্যাকার (ধনুকের ছিলা প্রস্ততকারী) (৬) রজ্জুসর্জ (দড়ি নির্মাতা) (৭) সুরাকার (সুরা প্রস্তুতকারক (৮) বাসঙ্গল্পুলী (রজক) (৯) রঞ্জয়িত্রী (কাপত রংকারর কারিগর) (১০) চর্মম্ন (চর্মকার) (১১) হি রণ্যকার (স্বর্ণকার) (১২) ধীবর (জেলে) (১৩) হস্তিপ (হস্তীপালক (১৪) অ(্বপ (অ(্বপালক) (১৫) গোপালক (রাখাল) (১৬) সূত (নেট) (১৭) শৈলুষ (গায়ক) (১৮) মৃগায়ুমন্তক (ব্যাধ) (১৯) কুম্ভকার (কুমোর) এছাড়া এই সময় ভৈষক বা চিকিৎসক, কুসীদিন বা সুদখোর ব্যবসায়ীদের কথা পাওয়া যায়। এই রকম পেশ ভিত্তিক নামকরণ তখনও কিন্তু জাতি হিসাবে চিহি(ত হয়নি। কিন্তু পেশা জন্মদ্বারা নির্দিষ্ট হয়েগেলে, এই গুলি ই জাতিতে পর্যবসিত হয়।

ঋকবৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজ বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই প্রাথমিকভাবে ঋকবেদে বর্ণঅপে(া জন(Jana), গণ(gana), বিশ (Vis), প্রভৃতি গোষ্ঠী (Clan) বা 'Tribe like Social Groups' এর প্রাধান্য দেখতে পাই, যা বর্ণ সমাজের চেয়ে সরলতর এবং গোষ্ঠী জীবনের প্রতিআকৃষ্ট। রামশরণ শর্মা মনে করেন, ঋকবেদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনে খাদ্যের বন্টন একটি গুরুত্ব পূর্ণ বিষয় ছিল। কৌমভূক্ত(ব্যক্তি(রাই উৎপাদনের জন্যে শ্রমদান করতেন এবং 'Non-Kin labour' সেভাবে পাওয়া যায় না। 'মঘবন' বা সমৃদ্ধতর ব্যক্তি(র পরিচয় পাওয়া গেলেও তা কখনো বর্ণব্যবস্থার মতো বংশগত বা জন্মগত যেমন ছিল না, তেমনই সমাজের বিভাজন ততটা কঠোর ছিল না। পরবর্তী বৈদিক পর্যায়ে বর্ণব্যবস্থা কঠোরিতর হতে দেখি আমরা। এই পরিবর্তনকে অবশ্যই কৃষি(ে ত্রে ত্র(মশ উন্নতির ফলে অর্থনৈতিক পরির্তনের পরিপে(িতে চিন্তা করা প্রয়োজন। কৃষি অর্থনৈতিক ব্যবহায় উৎপাদনের উপকরণ রূপে ভূমিকা ওপর নিয়ন্ত্রণকে কেন্দ্রকরে সামাজিক বিভেদের উদ্ভব দেখা দেয়। পাশাপাশি, যজ্ঞানুষ্ঠানে জটিলতা বৃদ্ধি পেল এবং ব্রাহ্মণরা অতিজাগতিক (মতার একমাত্র মাধ্যমরূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে (ত্রিয়দের (মতা দখলে পথকে সুগম করতে সচেষ্ট হল। '(ত্রিয় বা রাজন্য'দের (মতার প্রতীক 'রাজসূয়' (Rajasuya) বা বাজপেয় (Vajapeya) যজ্ঞের নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় থাকতেন ব্রাহ্মণরা। তাই রাজন্যদের থেকে যথাযথ পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করতেন তারা। এই দুইবর্ণ অত্যন্ত প্রভাবশালী হয়ে ওঠে। এবং বৈশ্যরা যেহেতু বাণিজ্যের মাধ্যমে এবং কৃষির মাধ্যমে নিজেরা স্বনির্ভর হয়ে উঠেছিল এই অর্থনৈতিক স্বতন্ত্রতা উচ্চবর্ণের অস্বস্তির কারণ হয়েছিল। তাই আমরা পূর্বোক্ত(আচরণ দেখি বৈশ্যদের প্রতি আর শূদ্রের অবস্থান আমাদের সকলের জানা। মূলত শ্রমদানই ছিল তাদের কাজে। সামাজিক পরিপ্রে(িতে বৈদিকও ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোয় ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয়দের অধিপত্য এবং নিম্নতর বর্ণদের উপে(াও অবদমন বৌদ্ধধর্মের (ে ত্রে সহায়ক হয়। ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান ও সমাজ কাঠামোর লাভ করেছিল। এবং সমাজের নিম্নতর বর্ণদের উপে(াও অবদমন বৌদ্ধধর্মের (ে ত্রে সহায়ক হয়। ব্রাহ্মণ্য আচার অনুষ্ঠান ও সমাজ কাঠামোর বিরোধী বৌদ্ধধর্ম বৈশ্যদের দ্বারা পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল এবং সমাজের নিম্নবর্ণের মানুষজন বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন।

এইভাবে আমরা দেখি ভারতীয় সমাজের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ঠ্যরূপে বৈদিক যুগ থেকে বর্ণব্যবস্থা ত্র(মশ উদ্ভূত হতে শুরু করে, যা পরবর্তীতে জাতিকাঠামোয় পরিণত হয়েছিল।

৯.৪.১০.২ — বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণব্যবস্থার প্রকৃতি (Unit - 10)

বৈদিক বর্ণব্যবস্থার বিপরীতে বৌদ্ধ সাহিত্য চিরাচরিত বর্ণকাঠামাকে নস্যাৎকরে সমাজকে জন্মের ভিত্তিতে, বংশপরম্পরার ভিত্তিতে বিভাজনের বিরোধিতা করেন। সমাজকে সর্বস্তরের মানুষকে সাদরে গ্রহণ করার প্রবণতা আমরা দেখতে পাই।

পালি সাহিত্যে সামাজিকগোষ্ঠী সম্পর্কে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রায়শই স্থান পেয়েছে ‘কুল’ (Kula) বা পরিবার কথাটি, তুলনায় ‘বন্ন’ (Banna) অর্থাৎ বর্ণ’ শব্দের প্রয়োগ অল্পতর। সংঘে বর্ণভেদ স্বীকৃত ছিল না। বুদ্ধের উক্তি(হিসাবে পালি সাহিত্যে বলা হয়েছে, গঙ্গা, যমুনা, সিন্ধু প্রভৃতি নদী সমুদ্রে মিশে গেলে পৃথক অস্তিত্ব যেমন থাকেনা, তেমনি সংঘে যোগদিলে বর্ণগত অবস্থান লুপ্ত হয়।

অপর একটি কাহিনী অনুসারে, চারটি বিভিন্ন বর্ণের পাখি উড়তে উড়তে বুদ্ধচরণে শরণ নেওয়া মনে তাদের বর্ণ লুপ্ত হয়ে তারা বি-বর্ণ হয়ে গেল (বেবন্নিয়ন্তি)। বর্ণ শব্দ টি এখানে রূপক ধর্মী, একাধারে এটি রং বোঝাছে অন্যদিকে এটি চর্তুবর্ণকে ইঙ্গিত করছে। অর্থাৎ বুদ্ধ বলেছিলেন — কেবলমাত্র জন্মদিয়েই ব্রাহ্মণ হওয়া যায় না, তা স্থির হয় আচরণ (শীল) দিয়ে। অর্থাৎ এর মাধ্যম বুদ্ধ মর্যাদার মাপকাঠি হিসাবে জন্মের তুলনায় বা আচরণকে অধিকতর গুরুত্ব দিয়েছেন। বর্ণশ্রেষ্ঠরূপে ব্রাহ্মণের একাধিকপত্যকে তিনি কার্যত নস্যাৎ করে দিয়েছেন। যেমন সংঘে যোগদেবার জন্য জন্মসূত্রে প্রাপ্ত বর্ণগত অবস্থান বিশেষ বিচার্য ছিল না, তেমনই সংসার ত্যাগ করে ধর্মীয় আচরণে লিপ্ত হবার জন্য চতুরাশ্রম অনুযায়ী বাণপ্রস্থ বা সন্ন্যাস স্তরের জন্য অপে(া করার ও কোন প্রয়োজন নেই। এই চিন্তার মাধ্যমে বৈদিক বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থার গুরুত্ব হ্রাস পাবার প্রবণতা ল(্য করা যায়। চর্তুবর্ণ ব্যবস্থার উল্লেখ প্রসঙ্গে বুদ্ধ চারটি বন্ন (বর্ণ) কে সাজিয়েছেন এইভাবে যথা — খত্তিয় ((ত্রিয়/Khastriya), বম্ভন (ব্রাহ্মর্ণ/Brahmana) (বস্‌স (বৈশ্য/Vaisya), এবং সুদ্দো (শূদ্র/Sudra) এই চারের মধ্যে খত্তিয় শ্রেষ্ঠ তাও খত্তিয় শাক্যকুলোদ্ভূত বুদ্ধতা স্পষ্ট বলেছেন। অনেক ব্রাহ্মণ যদিও তার শিষ্য হন তবুও ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের একটা বড় অংশ বৌদ্ধবাদের কটা(করতেন। অন্যদিকে বুদ্ধ স্বয়ং ব্রাহ্মণদের শ্রেষ্ঠত্ব মানতে নারাজ ছিলেন।

যদিও সংঘের ভিতর ভেদাভেদ স্বীকার করা হয়নি, কিন্তু সংঘের বাইরে সামাজিক তারতম্য অস্বীকৃত হয়নি। কিন্তু পালি সাহিত্যের বর্ণ জাতি ব্যবস্থার স্বীকৃত নয়, বদলে কুল/ (পারিবারিক মর্যাদা), কম্ম (পেশা), সিপ্প (শিল্প/বৃত্তি) এই তিনের নিরিখে দুটি প্রধান বিভাগ উক্কট্‌ঠ (উৎকৃষ্ট) এবং হীন। উৎকৃষ্ট ব্যক্তি(রা উৎকৃষ্ট কর্ম ও শিল্প অবলম্বন করেন। হীনকূলে জাতরা হীন সিপ্প গ্রহণ করে। উৎকৃষ্ট কূল হল খত্তিয়া, বম্ভণ, গহপতি। অন্যদিকে হীনকূল হল চন্ডাল নিষাদ বেণ, পুক্কুস প্রভৃতি।

উৎকৃষ্ট কুলে জাত ব্যক্তি(রা বিভিন্ন স্বনিয়োজিত পেশায় রত। কৃষি, পশুপালন, বানিজ্যকর্ম যা কারো অধীনে থেকে করতে হয় না সেগুলি এরা করেন। হীন কম্ম হল অধীন থেকে কাজ করা। তার অবস্থান কর্মচারী সদৃশ। উক্কট্‌ঠ কুলের ব্যক্তি(দের কাজে কায়িক পারিশ্রম অল্প তুলনায় যে ব্যক্তি(দের শারীরিক মেহনত বেশি তাদের হীন বৃত্তি রূপে চিহ্নি(ত করা হয়েছে। বর্ণ ও জাতিব্যবস্থায় সামাজিক মর্যাদা নির্দ্ধারিত হয় জন্মগত পরিচয় দ্বারা কিন্তু পালি সাহিত্যে এই স্তরভেদ নির্নীত হয় কেউ স্বাধীন পেশায় যুক্ত(কিনা অথবা কায়িক শ্রম নির্ভর বৃত্তিভোগী কিনা তার ওপর।

পাশাপাশি পালি সাহিত্যে একটি নতুন ধরনর উক্কট্‌ঠ শ্রেণীর উদ্ভব ল(্য করা যায়। পালি সাহিত্যে এরা ‘Gahapati’ ‘গহপতি’ নামে আখ্যায়িত। এরা ব্যতিত্র(মবিহীনভাবে, বিপুল অর্থের মালিক রূপে বর্ণিত হয়েছেন। ‘গহপতি’ শব্দটিকে সংস্কৃত ‘গৃহপতি’ শব্দ থেকে নিষ্পন্ন বলে অনুমান করে T. W. Rysdavis গহপতিকে ‘agriculturist householder’ হিসাবে বিচার কৃষ্টিজীবী পরিবারের প্রধান মনে করেছেন। কিন্তু গৃহী বা গৃহস্থকে (Householder) পালি সাহিত্য গিহী বা গহট্‌ঠ শব্দ দ্বারা চিহ্নি(ত করেছে। তাই গৃহপতি কোন সাধারণ পরিবারের কর্তা নন। গহপতিবগ্গ বলতে সংযুক্ত(নিকায় রাজা উদয়ন, চিকিৎসক জীবক, লৌহিত্য নামক ব্রাহ্মণ, ধনী অনাথপিন্ডিক প্রমুখকে উল্লেখ করা হয়েছে। তাই ঐশ্বর্যশালী ও (মতাবান ব্যক্তি(গহপতি হিসাবে বিবেচ্য হতেন। তাই ঐশ্বর্যশালী ও (মতাবান ব্যক্তি(গহপতি হিসাবে বিবেচ্য হতে পারেন। উমা চত্র(বর্তীর মতে, এটি সম্ভ্রম সূচক সামাজিক পরিচয়। সংযুক্ত(নিকায়ের বর্ণনা অনুসারে, বর্ণভেদ নির্বিশেষে বিভিন্নশ্রেণীর মানুষ এই শ্রেণীর অর্ন্তভূক্ত(হবার সুযোগ পেলেন। এই সুযোগের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল তার বিপুল বৈভব।

অনেকেই গহপতিকে সেটঠি বা শ্রেষ্ঠীর সমতুল্য মনে করেছেন। তাই তার বিপুল বিত্ত এই ব্যবসায়িক সাফল্যের নমুনা বলে অনুমেয়। কিন্তু পালি সাহিত্যে সেট্ঠি আর গহপতি কিন্তু অভিন্ন নয়। 'গহপতি' কে অনেক সময় বর্ণনা করা হয়েছে কস্সক বা কৃষক বলে, নিসন্দেহে তিনি ধনী ও সমৃদ্ধ কৃষক। সম্ভবত বিশালভূসম্পদের অধিকারী তিনি। দীর্ঘনিকায়ের মেন্ডক গহপতি তার ঐন্দ্রজালিক (মতায় চাষ করতেন। এই জমিতে আমরা জ্ঞাতিশ্রম (Kin labour) ব্যাতিরেকে Hired Labour এর ধারণা দেখি। এখানে দাস কর্মকর বা কৃষি শ্রমিকদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি কৃষিজমির-মালিক হলেও ভদ্দিয়নগরে তার বাস। রাজসৈন্যকে পৃষ্ঠপোষকতা যেমন তিনি করেন, তেমনভাবে তার গোপালকেরা বৌদ্ধসংঘে দুগ্ধ সরবরাহ করতেন। আরেকগহপতি অনাথপিন্ডক বুদ্ধকে জেতবন দান করে বিখ্যাত হয়েছিলেন। রাজকুমার জেতর কাছ থেকে জেতবন ত্র(ম করতে তিনি সমগ্র জেতবনকে কার্যাপন মুদ্রা (Silver Coin Karsapana) দ্বারা আবৃত করে, সেই মুদ্রা দিয়ে, উত্ত(উদ্যানটি ত্র(য় করেন। প্রাসঙ্গিক হল এই যে, বুদ্ধের মঝঝিম পন্থার দিশা দেখিয়ে, যে সুজাতা উপবাসী বোধিসত্ত্বকে পায়েস প্রদান করেন, তিনি এই অনাথপিন্ডকের পুত্রবধূ। অনেক সময় আমরা গহপতি পুত্ত শব্দটিও দেখি। অর্থাৎ বিপুল সম্পদের উত্তরাধিকারের কারণে 'গহপতির'-র মর্যাদা বংশানুত্র(মিক হয়ে যায়।

পরবর্তী বৈদিকযুগে ত্র(মশ কৃষি ও বানিজ্যের উন্নতির ফলে বৈশ্যশ্রেনীর আর্থিক সমৃদ্ধি হয়েছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ সমাজাদর্শে তাদের অবস্থান ছিল নিম্নগামী। তারা যেমন ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয়ের তুলনায় হীনতর, তেমনই তার আনুষ্ঠানিক মর্যাদা ছিল অধোগামী। ফলে তারা সামাজিক প্রতিপত্তি লাভের আশায় সংঘের পৃষ্টপোষক হয়ে ওঠে। সেই কারণে বুদ্ধও স্বয়ং ব্যবসা-বাণিজ্যকে উৎকৃষ্ট কর্মের মধ্যে চিহ্নি(ত করার মাধ্যমে তাকে ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয়ের সমমর্যাদায় স্থাপন করতেন সচেষ্ট হয়েছেন।

উত্ত(বর্ণনায় চর্তুবর্ণ প্রথার ব্যতিত্র(মী একটি সমাজাদর্শ আমাদের সামনে উপস্থাপিত করা হল। যেখানে বৃত্তি বা পেশাকে কেন্দ্র করে। সামাজিক বিভাজনকে চিহ্নি(ত করা হয়েছে। পাশাপাশি ধনবানের প্রতিপত্তিকে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে। আবার পেশাগতভাবে হীন ব্যত্তি(দের চিহ্নি(ত করা হয়েছে। তবে একথা সত্যিযে, বৌদ্ধসংঘে কিন্তু কোনরূপভেদ ছিল না। সেই দিক থেকে বুদ্ধ এক ভিন্নধরণে সমাজাদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

৯.৪.১১.৩ — জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিকাশ (Unit - 11)

বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান থেকে আমারা বর্ণব্যবস্থা এবং ত্র(মশ বৃত্তি দ্বারা পরিচালিত বিভিন্ন জাতির উদ্ভব হতে দেখি। সমাজের মধ্যে অর্ন্তভূত্ত(হতে থাকা উপজাতিদের মূলব্রাহ্মণ্য কাঠামোয় অর্ন্তভূত্ত(করা হয় বিভিন্ন জাতি হিসাবে। এছাড়া গ্রিকবিবরণেও ভারতীয় সমাজের চিত্র উঠে আসে। এই বিবরণে বৈদেশিক বিবরণ কিভাবে ভারতীয় সমাজকে বর্ণনা করে তা পাওয়া যায়।

৯.৪.১১.৩.১—মেগাস্থিনিস বর্ণিত সমাজ ঃ—

মৌর্য সাম্রাজ্যের সময়কালে গ্রীকশাসক সেলুকাসের দূত রূপে মেগাস্থিনিস ভারতবর্ষে আগমন করেন। চন্দ্রগুপ্তের শাসনের বিবরণের পাশাপাশি তিনি সমাজের চিত্র তুলে ধরেছেন। মেগাস্থিনিস (Megasthenes) এর রচিত ইন্ডিকা (Indika) তৎকালীন ভারতের একটি উল্লেখযোগ্য দলিল। তবে দুভার্গ্যজনক ভাবে এই গ্রন্থটি বর্তমানে পাওয়া যায়নি। তবে পরবর্তী গ্রীক লেখকদের বিবরণী থেকে এই গ্রন্থের কিছুটা পুনঃ নির্মাণ করা হয়েছে। যেমন - Diodorus Siculus এর রচিত 'Bibliothekes Historikes', Strabo র রচিত 'Geographikon', Arrian এর 'Indika' প্রভৃতি গ্রন্থে মেগাস্থিনিসের বিবরণের অংশ উদ্বৃত রয়েছে। তাঁর ও গ্রীকবিবরণী অনুসারে, মৌর্যভারতে দাসব্যবস্থা নেই এবং সমাজ সাতটি ভাগে বিভত্ত(। এই সাতটি ভাগ হল —

(১) দার্শনিক (Sophist or Philosopher) ঃ— সমাজের এই শ্রেণী সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ের অবস্থান করত। এদের দুটিভাগ Sarmanes (শ্রমণ) এবং Garmanes (ব্রাহ্মন)। তাদের জনগণের ভবিষ্যৎ বক্ত(ারূপে দেখা হত। সেই কারণে তারা করভার থেকে অব্যাহতি পেতেন। বছরের শুরুতে তারা সেই বছর সংক্র(ান্ত ভবিষ্যৎবানী করতেন। তিনবছর পরপর সেই বাণী ব্যর্থ হলে তাকে আজীবন মৌনতা অবলম্বন করতে হত। এরা জ্ঞানী হিসাবে পরিগণিত হতেন। পন্ডিত, দার্শনিক ও অতীন্দ্রিয় শক্তি(র অধিকারী হিসাবে এদের শ্রদ্ধা করা হত।

(২) কৃষক (Cultivators) ঃ— জনসংখ্যার অধিকাংশ কৃষিজীবী। মেগাস্থিনিসের মত অনুসারে, জমির মালিকানা রাজার। তাই কৃষকরা খাজনা ছাড়াও ফসলে এক চতুর্থাংশ ভাগ রাজাকে দিতে বাধ্য থাকতেন। অন্য একটি বিবরণে তিনচতুর্থাংশ কর রাজাকে দিতে হত। বর্ণবিভক্ত(সমাজে কৃষকদের বৈশ্য হিসাবে বিচার করা হয়। তবে এটি তাত্ত্বিক বক্ত(ব্য। কৌটিল্য এদের শূদ্র বলে অভিহিত করেছেন।

(৩) পশুপালক ও শিকারী (Shepherds and Hunters) ঃ— গ্রিক বিবরণ অনুসারে, তৃতীয় এই গোষ্ঠী স্থান স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজের বাইরে। গ্রিক লেখকদের বর্ণনায় পালিত পশু ও শিকারলব্ধ পশুর একাংশ তারা কর হিসাবে রাষ্ট্রকে দেন। এঁরা ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগ্রন্থের ব্যাধ, নিষাদ প্রভৃতি গোষ্ঠীর সমার্থক হতে পারেন। মৎস্যজীবী কৈর্বতরা ও এই গোষ্ঠীভূক্ত(হতে পারেন। কৌটিল্যের রচনায় এদের উল্লেখ আছে। অশোক এদের আর্টবিক বলেছেন।

(৪) কারিগর ও ব্যবসায়ী (Artisans and Dealers) ঃ— গ্রিক বিবরণী অনুযায়ী এই ব্যক্তি(রা অনেকেই রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে জড়িত। তারা কর দিতেন না। কোন একটি মতে, কেবলমাত্র Armour Maker(কর্মকার) এবং Shipbuilders (নৌনির্মাতা) রা রাষ্ট্রের দ্বারা নিযুক্ত(ছিলেন। বাকিরা রাষ্ট্রকে কর দিতেন।

(৫) সৈন্য (Soilders) ঃ— কৃষকদের বাদ দিয়ে সেনারাই সমাজের বৃহত্তম অংশ বলে মেগাস্থিনিস মনে করেছেন। যুদ্ধ যেহেতু (ত্রিয়ের বৃত্তি তাই এই শ্রেণীকে (ত্রিয়দের সথে তুলনা করা হয়েছে। তবে (ত্রিয় বলতে মহাকাব্য বা বৌদ্ধগ্রন্থে কোথাও সাধারণ সৈনিককে বোঝায় না। তাদের পরিচিতি যোদ্ধা বা সেনা হিসাবে। সৈন্যরা যেহেতু রাষ্ট্রের জন্য নিযুক্ত(তাই তারা কর মুক্ত(। উপররোক্ত(তারা রাষ্ট্রের কাছ থেকে বেতন পান এমন বর্ণনা গ্রিক রচনায় দেখা যাবে।

(৬) গুপ্তচর (Spies/Inspectors/Overseers) ঃ—

এরা রাজশক্তি(র সবচেয়ে বিশ্বাসভাজন ব্যক্তি(বর্গ, মেগাস্থিনিস অতিরঞ্জিতভাবে উল্লেখ যে ভারতীয়রা কখনোই মিথ্যাভাষণ দেন না। এই বক্ত(ব্য তিনি গুপ্তচরদের বিশ্বাস যোগ্যতার বর্ণনা দিতে গিয়ে বর্ণিত করেছেন। অর্থশাস্ত্রেও সুদৃঢ় গুপ্তচর ব্যবস্থার প্রতিফলন পাওয়া যায়। কৌটিল্য বলেছেন গুপ্তচরের বার্তাকে তিনটি অন্য সূত্রের সঙ্গে যাচাই করে নিতে। যা মেগাস্থিনিসের চরম বিশ্বাসভাজনতার পরিপন্থী।

(৭) প্রশাসক ও মন্ত্রণাদাতা (Counseltors and Assessors) ঃ

সপ্তম এই গোষ্ঠী সংখ্যায় অল্প হলেও সম্মান ও মর্যাদার দিকে অনেক উচ্চ অবস্থান ভোগ করতেন। এই গোষ্ঠী থেকেই শাসনব্যবস্থার সর্ব্বোচ্চ পদাধিকারীদের নিযুক্ত(করা হত। সেনাধ্য(কোষাধ্য(প্রভৃতি পদে এই শ্রেণীর নিযুক্ত(করা হত। সেনাধ্য(, কোষাধ্য(প্রভৃতি পদে এই শ্রেণীর মানুষেরা থাকতেন। এরাই অর্থশাস্ত্রে অমাত্য (যাদের মধ্যে মন্ত্রীরাও) পদবাচ্য। এরাই একটি পৃথক সামাজিক গোষ্ঠী গঠন করেছিল, যা পালিসাহিত্যে আমাত্যকূল (Aamachchakula) নামে পরিচিত।

মেগাস্থিনিস ও অন্যগ্রীক লেখকরা বর্ণজাতি ব্যবস্থার বিবরণ দিতে আগ্রহী ছিলেন না। সমাজের বৃত্তি নির্ভর বিভাজনকে বিশেষভাবে তারা উপস্থাপিত করেন। মেগাস্থিনিস আবার এও মন্তব্য করেন যে এক গোষ্ঠীর সাথে অন্যগোষ্ঠীর বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের অনুমতি নেই। প্রত্যেক গোষ্ঠীর নিজস্ব বৃত্তি আছে এবং বৃত্তি বদলও অনুমোদিত। এই দুটি সামাজিক নিষেধ কিন্তু বর্ণজাতির (েত্রেও প্রযোজ্য। তবে গ্রিক বিবরণ সমাজের সঙ্গে রাষ্ট্রর সম্পর্কের পরিপ্রে(িতে এই

বিভাজন অঙ্কন করেছেন। তবে গ্রিক বিবরণে ভারতীয় সমাজ উপর থেকে নীচে বিস্তৃত নয়, বরং বিপরীতে সাতটি স্তর পরস্পর সমানভাবে সাজানো সেটা গ্রীক বিবরণের সীমাবদ্ধতা। কারণ ভারতীয় সমাজ স্তর বিন্যস্ত ছিল।

৯.৪.১১.৩.২ — ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে বর্ণব্যবস্থার বিকাশ ঃ—

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকের সময়কাল থেকে সূত্র সমূহ রচনা শুরু হয়। ধর্ম সূত্র সমূহের চর্তুবর্ন সংত্র(ান্ত ধারণা আরো কঠোর রূপ পরিগ্রহ করে। ধর্ম সূত্রও ধর্ম শাস্ত্রে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের অধিকার ও কর্তব্যের বিষয়ে আলোচনা করা হয়। ব্রাহ্মণদের সামাজিক শ্রেষ্ঠত্ব এখানে প্রাধান্য পেয়েছে, অন্যদিকে শূদ্রদের সম্পূর্ণভাবে বেদপাঠ বা শ্রবণের অধিকার ও অন্য সামাজিক অধিকারে থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। বর্ণ ব্যবস্থা ছাড়াও জাতিসমূহের উল্লেখ প্রথম সূত্রসাহিত্য থেকেই পাওয়া যায়। প্রকৃতপ(ে সমাজ মাত্রচারটি বর্ণে বিভত্ত(ছিল না। বাস্তবে সমাজে ছিল অসংখ্য জাতি। সাধাণত জাতি বলতে জন্ম দ্বারা নির্ধারিত নির্দিষ্ট গোষ্ঠীভূত্ত(মানুষকে বোঝায় তারা নির্দিষ্ট পেশা বা বৃত্তি অবলম্বন করেন এবং পেশা তাদের সামাজিক মর্যাদার পরিচায়ক হয়।

ধর্মশাস্ত্র কারগণ সমাজের অসংখ্য পেশা ভিত্তিক জাতিকে চর্তুবর্ণ কাঠামোর অর্ন্তভূত্ত(করনের প্রচেষ্টা করেছেন। পাশাপাশি ব্রাহ্মণ্যধর্ম বিস্তার লাভ করার সাথে সাথে বিভিন্ন উপজাতিদের সংস্পর্শে এসেছে এবং সেই উপজাতিদের জাতিকাঠামোয় অর্ন্তভূত্ত(করার প্রবণতা দেখা যায়। এই উদ্দেশ্য সাধানের জন্য বর্ণসংকর তত্ত্বের অবতারণা করা হয়। এই তত্ত্বের ভিত্তিতে অসংখ্য জাতিকে অনুলোম প্রতিলোম বিবাহের ফল বলে চিহ্নি(ত করা হয়। এই বর্ণসংকর জাত সন্তান তার পিতা বা মাতার বৃত্তিগ্রহণ অপারগ এবং তাদের জন্য পৃথক পৃথক বৃত্তি নির্দিষ্ট হয়েছে। আবার মিশ্রজাতির সঙ্গে বর্ণভূত্ত(বা অন্য জাতির বিবাহে নতুন বর্ণ উৎপত্তি হয়। এইভাবে বর্ণসংখ্যা চার থাকলেও জাতির সংখ্যা কার্যত অসংখ্য। জাতি তত্ত্বের সূচনা ধর্মসূত্রে প্রথমদেখন গেলেও মনুও যাজ্ঞবল্ক্যের ধর্মশাস্ত্রে এর তত্ত্বগত ভিত্তি দৃঢ়তর হয়। শাস্ত্রে বৈদিক চর্তুবর্ণ প্রথার অলঙ্ঘনীয়তার কথা বলা হলেও সেখানেই বহুজাতিকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

আবার মনুসংহিতাতেই বলা হয় যে সমাজ কেবলমাত্র চারভাগে বিভত্ত(, পঞ্চম বর্ণ বলে কিছু নেই। এই রূপ মত প্রকাশের কারণ এই যে, যেহেতু মিশ্রজাতিগুলি চর্তুবর্ণের সংমিশ্রণে সৃষ্ট তাই এর মধ্যে চর্তুবর্ণের সংশ্লেষ থাকতে বাধ্য। মিশ্রজাতির উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, ব্রাহ্মণপিতা ও বিশ্যমাতার সন্তান হল অম্বষ্ঠ যার শাস্ত্র নির্ধারিত বৃত্তি হল বৈদ্যের কাজ করা। আবার (ত্রিয় পুরুষ ও ব্রাহ্মণ নারীর সন্তান সূত নামে পরিচিত তাদের কাজ রথ চালানো। কৃষিজীবী মহিষ্যদের (ত্রিয়পিতা ও বৈশ্যমাতার সন্তান বলা হয়েছে। তবে জাতি কাঠামোয় সবচেয়ে নিম্নস্তরীয় স্থান পেয়েছে। চন্ডালরা, তারা শূদ্র পিতা ও ব্রাহ্মণ মাতার প্রতিলোম সংকর বলে বর্ণিত হয়েছে। তার বৃত্তি হল শবদাহ বা ঘাতকের কাজ করা।

গুপ্তযুগের বর্ণজাতি ব্যবস্থা সুপ্রচলিত ছিল। শূদ্রের স্থান ছিল সর্বনিম্নে। একই অপরাধে ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের শাস্তির তারতম্য ল(্য করা যায়। যে অপরাধে শূদ্রের মৃত্যুদন্ড হতে পারত, সেখানে ব্রাহ্মণদের জন্য বরাদ্দ ছিল নির্বাসিন ও সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করন। বর্ণজাতি ব্যবস্থার নিকৃষ্টতম স্বরূপ অস্পৃশ্যতার বিষয়টি এই সময় থেকে ত্র(মশ প্রকট হচ্ছিল। অস্পৃশ্যতার শিকার ছিলেন অন্ত্যজ গোষ্টী। পূর্বোত্ত(চন্ডালরাও অন্ত্যজশ্রেণীভূত্ত(ছিলেন। তারা নগরের বাইরে থাকতন এবং নগর প্রবেশের (েত্রেও বিধিনিষেধ পালন করতে হত।

তবে শাস্ত্র বর্ণিত নিয়ম সর্বদা মেনে চলা হত তা নয়। মৌর্যোত্তর যুগে গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীকে একঅদ্বিতীয় ব্রাহ্মণ (এক বম্ভণ) বলা হলেও এবং তিনি চর্তুবর্ণের সাংকর্য রোধ করেছিলেন বলা হলেও সাতবাহণ রাজাদের মধ্য শক পরিবারের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের নজির পাওয়া যায়। গুপ্তযুগে ও এরূপ ব্যতিত্র(মের নিদর্শন পাওয়া যায় দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতীগুপ্তের সঙ্গে ব্রাহ্মণ বাকাটক বংশীয় রুদ্রসেনের বিবাহ এবং কদম্ব বংশীয় ব্রাহ্মণ কন্যাদর সঙ্গে গুপ্ত রাজাদের বিবাহের নজির পাওয়া যায়। আবার বিভিন্ন বিবরণে (ত্রিয় ব্যাতীত ব্রাহ্মণ, বৈশ্য ও শূদ্র রাজাদের উল্লেখ পাওয়া যায়।

গুপ্তোত্তর যুগের জাতিবর্ণ কাঠামোতেও ব্রাহ্মণদের প্রাধান্য ল(্য করা যায়। কিন্তু আবার ব্রাহ্মণদের মধ্যেও গুণাগুণের ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাগের প্রবণতা দেখা যায়। এই যুগের বর্ণ ব্যবস্থায় দুটি বর্ণের উপস্থিতি দেখা যায়, ব্রাহ্মণ ও শূদ্র। ব্রাহ্মণ ব্যাতীত সকল বর্ণই শূদ্র পর্যায়ভূক্ত(। শূদ্রের অন্নগ্রহণ, একাসনে উপবেশন, সম্পর্ক স্থাপন নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু আবার মেধাতিথির ভাষ্য থেকে শূদ্রকে স্বাধীন, এবং অর্থও সম্পত্তির মালিক হবার অধিকারী বলা হয়েছে যজ্ঞে তার অধিকার না থাকলেও অন্য ধর্মাচরণে তার অধিকার স্বীকার করা হয়েছে। বৃহদ্ধর্ম পুরাণে সংকর বর্ণগুলি সংখ্যা ৪১টি এর মধ্যে উত্তম সংকর ২০টি, মধ্যম সংকর ১২টি এবং অধম সংকর ৯টি। এই পর্যায়ের অনেক সময় রদবদল ল(্য করা যেত। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই সময় উপজাতি রা কৃষিবৃত্তি গ্রহণ করছিল ফলে নিম্নতর বর্ণের মানুষ উচ্চতর বর্ণে আরোহণের সুযোগ পেয়েছিল। রামশরণ শর্মা এই সময় বৈশ্যদের অবস্থার অবনতিও শূদ্রের উন্নতির কথা উল্লেখ করেছেন।

ব্রাহ্মণ্য ধারা ব্যাতীতও প্রতিবাদীধর্মের মধ্যে জাতিবর্ণ প্রথার আভাস ল(ও করা যায়। এখানে চিরাচরিত বৌদ্ধসংঘে বর্ণের তারতম্য থাকত না। বুদ্ধের মতে কেবল জন্ম দিয়ে ব্রাহ্মণ হয়না, তা হয় শীল (আচরণ) দিয়ে। সামাজিক চর্তুবর্ণের অস্তিত্ব স্বীকার করলেও বুদ্ধ সেখানে (ত্রিয় (খত্তিয়)দের সর্বাগ্রে স্থান দিয়েছেন। পালিসাহিত্যে সামাজিক স্তর ভেদকে কুল (পারিবারিক মর্যাদা), কম্ম (পেশা), সিপ্প (শিল্প বা বৃত্তি) অনুসারে উক্কট্‌ঠ (উৎকৃষ্ট) ও হীন এই দুভাগে ভাগা করা হয়েছে। পালি সাহিত্যে গহপতি ও সেট্‌ঠি নামক শ্রেণী বিশেষ গুরুত্ব পেয়েছেন, যারা মূলত কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যে রত এবং ধনীশ্রেণী। ব্রাহ্মণ্য সমাজাদর্শে এরা বৈশ্য শ্রেণীভূক্ত(হলেও বৌদ্ধসমাজে এরা ব্রাহ্মণ ও (ত্রিয়দের সমমর্যাদাভূক্ত(। আবার মৌর্যত্তর যুগে বিভিন্ন বৌদ্ধও জৈন দান লেখতে অসংখ্য বনিক, কৃষক, ও বৃত্তিধারী ব্যক্তি(দের দানের কথা উৎকীর্ণ আছে।

বর্ণসংকরের মাধ্যমে জাতি সমূহের যে উৎপত্তির কাহিনী ব্রাহ্মণ্য গ্রন্থাবলীতে পাওয়া যায়, তার সঙ্গে বাস্তবতার সম্পর্ক নিতান্তই অল্প। প্রকৃতপ(ব্রাহ্মণ্য সমাজ বর্হিভূত উপজাতি ও ভারতবর্ষের বাইরে থেকে আজও জনগোষ্ঠীকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ কাঠামোয় স্থান দেওয়ার জন্যই তারা এই তত্ত্বের অবতারণা করেন। তবে পিতৃতান্ত্রিক ভারতীয় সমাজে সাধারণত পুত্রেরজাতি, পিতার জাতি দ্বারাই নির্ধারিত হয়। রির্চাড ফিকের মতে, বর্ণসংকর বলে চিহ্নি(ত যে সকল জাতির সম্পর্কে বিভিন্ন কাল্পনিক কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে, সেই সকল অধিকাংশ জাতি নামই স্থান বাচক বা উপজাতি বাচক।

ঐতিহাসিক দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় দেখিয়েছেন যে জাতিপ্রথা আসলে উপজাতিয় সমাজের অসমাপ্ত বিলোপের পরিনাম। ভারতবর্ষে সর্বত্র উৎপাদন কৌশলের উপর নির্ভর করে উপজাতি সমাজের পরিবর্তন হয়নি। এখানে স্থানে স্থানে রাষ্ট্রশক্তি(র উদ্ভব হয়েছিল এবং তাকে পরিবেষ্টিত করে থাকা উপজাতি সমাজগুলিকে ধ্বংস করে এই রাষ্ট্রশক্তি(গ্রামনিবেশ করেছিল। ফলে সেই গ্রামজীবনে উপজাতিয় সমাজে অনেক চিহ(যথা - জাতিভেদ, গ্রাম সমবায়, লোকায়তিক ধর্ম প্রভৃতির বিলোপ ঘটেনি। ভারতীয় সমাজের উচ্চবর্ণের মানুষদের বাদ দিলে এবং অবশিষ্ট উপজাতি সমাজকে বাদদিলে যে বিপুল জনসমাজ পাওয়া যায় তারা প্রকৃত প(-উপজাতীয় পরিবেশ থেকে বিযুক্ত(হয়ে কোন বিশেষ বৃত্তি অবলম্বন করে এবং সেই বৃত্তি গুরুত্ব অনুযায়ী হিন্দুসমাজ স্থান পেয়েছে। স্মৃতি ও পুরাণ গ্রন্থগুলি এই সংমিশ্রণকে বৈধতা প্রদান করতে গিয়ে বর্ণসাংকর্যের তত্ত্ব উপস্থাপনা করেছিল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, পূর্বোক্ত(অম্বষ্ঠ জাতি আসলে পাঞ্জাব অঞ্চলের উপজাতি যারা আলোকজান্ডারের বিরুদ্ধে অস্ত্রাধারণ করেছিল। মূলঅঞ্চল থেকে সরে আসার পরে তারা নির্দিষ্ট বৃত্তি অবলম্বণ করে এবং ধর্মশাস্ত্রকারগণ তাদের অনুলোম সংকরজাতি রূপে চিহ্নি(ত করেন। এই ধরণের উৎস অন্য জাতিদের (ত্রে প্রযোজ্য।

কেবলমাত্র উপজাতিগোষ্ঠীই নয় ভারতে আগত বহিরাগত জনগোষ্ঠী ও জাতিকাঠামো গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছে। আলেকজান্ডারের আত্র(মণের সময়কাল থেকে গ্রীক বা যবনদের আগমন শুরু হয়। পরবর্তীকালে

উত্তর পশ্চিমভারতে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের রাজত্বের কথাও জানা যায়, এমনকি ভারতের অভ্যন্তরে যবণ আত্র(মণের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই যবণদের গৌতম ধর্মসূত্র সূত্র পিতা ও (ত্রিয়মাতার প্রতিলোম সংকররূপে জাতি কাঠামোর স্থানদেয়। মনুর মতে যবনরা পূর্বে (ত্রিয় ছিল, পরে শূদ্রত্বে পর্যবসিত হয়।

পাশাপাশি শক, প(ব, কুষাণগণ ভারতে আগমন ও রাজ্যস্থাপন করেন। ব্রাহ্মণ সমাজের বর্হিভূত হলেও শাসকগোষ্ঠী রূপে অবতীর্ণ হলে তাদের সমাজকাঠামোতে স্থান দেবার প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। শক, প(ব, কুষাণদের অধঃপতিত (ত্রিয় বলে স্থান দেওয়া হয়। আভীরদের ব্রাহ্মণও অম্বষ্ঠদের অনুলোম সংকর আখ্যা দেওয়া হয়েছে। আবার হূণজাতির ভারতীয়করণ একদশকের মধ্যে সম্পূর্ণ হয়েছিল তারা (ত্রিয়রূপে স্বীকৃতি লাভ করে। এই ধরণের প্রত্রি(য়া পৌরাণিক আত্তীকরণ (Puranic Acculturation) এর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

উপরোত্ত(বিভিন্ন আলোচনা থেকে জাতিবর্ণ ব্যবস্থার বিভিন্ন দিক পরিস্ফূট হয়। প্রাচীনযুগ থেকে বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্য দিয়ে জাতি প্রথার বির্বতন হয়েছে। বিদেশী পর্যটক যথা-ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ প্রমুখের বিবরণেও তার ইঙ্গিত পাওয়া যায়। আবার অনেক \(ত্রে জাতিবর্ণ প্রথার ভিন্ন ভিন্ন সংজ্ঞা পাওয়া যায়। বিভিন্ন সম্প্রদায় উপসম্প্রদায় বিভত্ত(হয়ে ভারতীয় সমাজ ত্র(মশ জটিল থেকে জটিলতর রূপধারণ করেছে এবং বর্ণ জাতি ব্যবস্থা ভারতীয় সমাজের একটি প্রধানতম গঠনগত উপাদান হিসাবে আজও বর্তমান আছে।

৯.৪.১১.৪ উপসংহার ঃ—

এইভাবে দেখা যাচ্ছে ভারতীয় সমাজও বিভিন্ন ভাগে বিভত্ত(ছিল।ব্রাহ্মণ্য ধারায় যেমন বর্ণজাতিপ্রথা তেমনই বৌদ্ধসাহিত্যে পৃথক রকমের সামাজিক বিভাজন ল(্য করা যায়। আবার গ্রিক বিবরণ পেশাভিত্তিক বিভাজন আলোচনা করা হয়েছে। মূলত এ থেকে ভারতীয় সমাজে স্তরায়ন এবং উচ্চনীচ বিভাজন স্পষ্ট হয়।

৯.৪.১১.৫. — সহায়ক গ্রন্থাবলী ঃ—

(1) Eploring Early India-Ranabir Chakraborty

(2) ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব-রণবীর চত্র(বর্তী

(3) Early India-Romila Thapar

(4) Cultural Past-Romila Thapar

(5) Sudras in Ancient India - R. S. Sharma

৯.৪.১১.৬ — সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ঃ—

(1) How did Buddha defined the Social Division of ancient India?

(2) Evaluate the Greek authors version about Indian Society?

(3) Define Varna and Jati System of Indian tradition?

পর্যায়-৫

ভারতীয় সমাজে বিদেশী উপাদান সমূহের উপস্থিতি

Foreign elements in India Society

একক — ১২, ১৩,১৪

৯.৫.১২.০ — উদ্দেশ্য
৯.৫.১২.১— ইন্দোগ্রীকদের কার্যকলাপ (Unit -12)
৯.৫.১২.১.১ — ইন্দোগ্রীক কারা?
৯.৫.১২.১.২ —ভারতীয়দের ইন্দোগ্রীক সম্পকে চিন্তাধারা
৯.৫.১২.১৩— ইন্দো-গ্রীক শাসক মেনান্দার

৯.৫.১৩.১ — শক শাসক (Unit -13)
৯.৫.১৩.২.১ — শকদের উৎস
৯.৫.১৩.২.২ — শকদের সঙ্গে সাতবাহনদের দ্বন্ধ
৯.৫.১৩.২.৩ — শকদের বিভিন্ন কার্যকলাপ

৯.৫.১৪.৩ — কুষাণ সাম্রাজ্য (Unit -14)
৯.৫.১৪.৩.১ — কুষাণদের সম্পকে ধারণা
৯.৫.১৪.৩.২—কুষাণ শাসনে শাসক উপাসনার ধারা

৯.৫.১৪.৪ — উপসংহার
৯.৫.১৪.৫ — সহায়ক গ্রন্থাবলী
৯.৫.১৪.৬ — সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

৯.৫.১২.০ - উদ্দেশ্য ঃ— বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল ভারতীয় ইতিহাস সংমিশ্রণ ও সমন্বয়ের দিকটি উল্লেখ করা। বিভিন্ন সময়ে প্রাচীন ভারতবর্ষে যে সমস্ত গোষ্ঠী ভারতীয় উপমহাদেশে সাম্রাজ্যে স্থাপন করে এবং নিজেদের সংস্কৃতি স্থাপন করে তাদের সম্পর্কে ধারণা লাভ করা। এই রকম গোষ্ঠীদের মধ্যে অন্যতম ছিল ইন্দো-গ্রীক, শক এবং কুষাণগণ।

৯.৫.১২.১ — ইন্দো-গ্রীকদের কার্যকলাপ ঃ—

খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার পাশাপাশি উত্তরপশ্চিম ভারতের রাজনৈতিক প্রে(াপট ত্র(মশ পরিবর্তন হচ্ছিল। আমরা জানিযে হিন্দুকুশ পর্বতমালা অতিত্র(ম করে উত্তরপশ্চিম সীমান্তে ধরে ভারতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন গোষ্ঠী প্রবেশ করেছে। এমনকি পারসীক ও ম্যাসিডোনীয় অভিযান ও এই পথ ধরে হয়েছিল। উপমহাদেশে প্রবেশের পথ বলে এবং বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর সমন্বয়ে গঠিত অঞ্চলে হবার দরুণ এখানে একটি মিশ্র সংস্কৃতির উপস্থিতি ল(্য করা যায়। বিভিন্ন গোষ্ঠীর ভারত আগমনের পথরূপে চিহ্নি(ত এই অঞ্চলটিকে Crossroads of Asia ও বলা যেতে পারে। এই

অঞ্চলগুলির মধ্য ছিল কৃষি সমৃদ্ধ ব্যাকট্রিয়া (Bactria) যার সঙ্গে ছিল হিন্দুকুশের দ(ণ অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ। আবার মধ্য এশিয় স্তেপি অঞ্চলের মানুষরা সহজে ব্যকট্রিয়াতে পৌছাতে পারতেন। অন্যদিকে তুখারিস্থানের মাধ্যমে হিন্দুকুশের গিরিপথগুলি ব্যাকট্রিয়ার সঙ্গে উত্তর হিন্দুকুশের কাবুল উপত্যকার যাযাবর ও পশুপালকদের যোগাযোগ করাতে স(ম হয়। ফলে হিন্দুকুশের দ(ণ ও উত্তরদিকের সীমান্ত খুবই অস্পষ্ট এবং সেখান থেকে সহজে পেশোয়োর অবধি চলে আসা যেত। বিভিন্ন অভিযান, এমনকি আলেকজান্ডার এই সব গিরিপথ ব্যবহার করেছিলেন। এই রূপ ভৌগলিক পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে আলেকজান্ডারের অভিযানের সময় গ্রীকদের আগমন হয়। এই গ্রীকরা পরবর্তীকালে ইন্দো-গ্রীক নামে পরিচিত হয়ে নিজ রাজ্যস্থাপন করেন।

৯.৫.১২.১.১ ইন্দো-গ্রীক কারা?

আলেকজান্ডারের মৃত্যুর পর তাঁর পশ্চিম এশিয় সাম্রাজ্যের আধিপত্য ছিল তার অন্যতম সেনাপতি সেলিউকাসের। সেলিউকাসের ভূখন্ডর একাংশ মৌর্যআমলে মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত(হয়। যেগুলি ছিল 'বর্তমান' কাবুল, কান্দাহার এবং বালুচিস্থান। পূর্বে বর্ণিত 'ব্যাকট্রিয়া ছিল সেলিউকিয়া সাম্রাজ্যর একটি প্রদেশ বা স্যাট্রাপি। হিন্দুকুশের উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত ব্যাকট্রিয়ার অবস্থান উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিমের সঙ্গে যোগাযোগের অনুকূল ছিল। ব্যাকিট্রিয়ার রাজধানী ছিল ব্যাক্ট্রা (Bactra) যা বর্তমানে Balkh বা Majr-i-shariff নামে খ্যাত 3rd Century BCE এর সময় থেকে ব্যাকট্রিয়ায় প্রাদেশিক শাসক Diodotus-I, সেলিউকিয়দের আধিপত্য অস্বীকার করেন স্বাধীন গ্রীকরাজ্য স্থাপনের মাধ্যমে। এই ঘটনা ঘটে আনুমাণিক 246 BCE-237BCE এর মধ্যবর্তী সময়ে। ব্যাকট্রিয়ায় স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে এই গ্রীকরা পরিচিত হন, ব্যাকট্রিয় গ্রীক (Bactrian Greeks) নামে।

ব্যাকট্রিয়া গ্রীকদের ইতিহাস রচনার ((ত্রে অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য উপাদান ছিল বিভিন্ন গ্রীক বিবরণী, তাছাড়া পুরাণের বিভিন্ন বিবরণ বিশেষত, 'যুগপুরাণে' (Yuga Purana) মধ্যদেশে যবন (Greek) আত্র(মণের উল্লেখ মেলে তবে বর্তমানে ঐতিহাসিক A. K. Narain এর গবেষণায় মুদ্রা সমূহের সম্যক গবেষণার প্রায় ৩০ জন গ্রীক শাসকের নাম পাওয়া যায়। একথা উল্লেখ্য যে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের সময়ে উপমহাদেশে প্রথম শাসকের নাম ও প্রতিকৃতি খোদাই করা (engraved) মুদ্রা পাওয়া যায়। আবার অনেক মুদ্রায় উৎকীর্ণ লেখগুলি দ্বিভাষিক (bilingual), সেখানে গ্রীক এবং প্রাকৃতভাষা এবং লিপির ((ত্রে গ্রীকও খরোষ্ঠী লিপি ব্যবহৃত হয়েছে। এই বিবরণ থেকে বোঝাযায় যে এই ব্যাকট্রিয় শাসকরা এমন স্থান নিজেদের অধিকার আনেন, সেখানে খরোষ্ঠী লিপি ও প্রকৃত ভাষা স্থানীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এই লিপি এবং মুদ্রাতত্ত্ব নিয়ে অনেক উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। ঐতিহাসিকদের মতে, আনুঃ 2nd Century BCE নাগাদ ব্যাকট্রিয়ার গ্রীক শাসকরা উপমহাদেশের অভ্যন্তরে আত্র(মণ করতে আগ্রহী হয়।

Diodotus-II কে (মতাচ্যুত করে সিংহাসনে বসা Euthydemus অথবা তার পুত্র Demetrius (ডেমট্রিয়াস) সম্ভবত উপমহাদেশে অভিযানের জন্যদায়ী। যা পুরাণে যবণ আত্র(মণ নামে খ্যাত। এই অভিযান অব্যাহত থাকে Apollodutus, Pantaleon এবং Agathocles এর আমলে। বি.এন.মুখাৰ্জ্জী মনে করে অ্যাগাথোক্লসের মুদ্রার সা(্য প্রমাণ করে, তিনি উত্তরপশ্চিম সীমান্ত ও ত(শীলায়ে নিজের আধিপত্য কায়েম করেছিলেন। এই Agathocles এর রৌপ্যমুদ্রায় (Ai Khanoum, Afganisthan এ প্রাপ্ত) বাসুদেব ও সঙ্কর্ষণ (কৃষ(ও বলরামের) প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। ভারতীয় দেবতাদের উপস্থিতি এই রাজাদের আত্তীকরণের ইঙ্গিতবাহী। পতঞ্জলীর মহাভাষ্য অনুসারে, রাজস্থানের মাধ্যমিকা, গাঙ্গেয় উপত্যকার সাকেত এবং পাঞ্চালে গ্রীকরা সফল অভিযান করেছিলন। ঐতিহাসিক Mitchirer দেখিয়েছেন, 'যুগপুরাণে'র', গার্গীসংহিতা অংশ একটি Pseudo-Prophecy (নকল ভবিৎবাণী) র মোড়কে ঘটে যাওয়া গ্রীক (যবণ) আত্র(মণের বিবরণ দেয়। তবে আরো জানা যায় পাটলিপুত্র (কুসুমধ্বজ) অভিযান কালে গ্রীকদের মধ্যে

অর্ন্তবিরোধ দেখা যায় এবং স্বদেশে বিদ্রোহের ফলে গাঙ্গেয় অঞ্চলে অধিকার দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। পৌরাণিক সূত্র এখানে গ্রীক ঐতিহাসিক জাষ্টিন (Justin) এর বিবরণের সঙ্গে মিলে যায়। Demetrius এর পাটলিপুত্র অভিযানের সময় ব্যাকট্রিয়াতে Eucratides বিদ্রোহী হয়ে ওঠেন। Eucratides কেবল ব্যাকট্রিয়ার অধিপতি হলেন তাই নয়, বরং সিন্ধুনদের পশ্চিমে কপিশ এলাকা তার রাজ্যভূক্ত(হয়েছিল। কারণ তাঁর একধরণের তাম্রমুদ্রার 'কবিসিয়ে নগরদেবতা' অর্থাৎ কপিশ ার নগর দেবতার কথা পাওয়া যায়।

গ্রীকদের (মতা দখলের লড়াইয়ের ফলে কিছু গ্রিকরাজারা ব্যকট্রিয়ার অধিকার হারালেও উপমহাদেশের কিছু অংশের ওপর শাসন করতে থাকেন। এরা ব্যাকট্রিয়ার সঙ্গে সংযোগহীন, বংশগতভাবে গ্রিক, কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশের শাসক তাই Bactrian Greek দের থেকে আলাদাভাবে এদের Indo-Greek (ইন্দো-গ্রীক) বলা হয়। অ্যানটিয়ালকিডাস (Antialkidas) তাঁর দূত Heliodorus কে বিদিশার স্থানীয় শাসক কাশীপুত্র ভাগভদ্রের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। হেলিডোরাস একটি গরুড়স্তম্ভে বাসুদেবের প্রতিশ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। যেটি বিদিশাতে অবস্থিত এবং স্থানীয় স্তরে 'খাম্বাবাবা' নামে পরিচিত। এছাড়া দ(শাসক হিসাবে মিনান্দার সোটার (Minander Soter) পরিচিত। মিলিন্দপএ(হো গ্রন্থে তার বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁর রাজধানী ছিল সাকল বা বর্তমান সংকিস্থানের শিয়ালকোটে (Sagala or Sialkot) আনুমানিক 130BCE নাগাদ মধ্য এশিয় যাযাবর শক ও ইউয়েঝি (Yue-Zhi) গোষ্ঠীর হানায় ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের শাসনের অবসান হয়। শকগণ এবং পরবর্তী কুষাণরা ব্যাকটিয়াকে ভিত্তিভূমি করে উপমহাদেশে রাজ্যস্থাপন করেছিল। তার পরিপ্রে(তে ইন্দো-গ্রীকদের প্রভাব ীণ হয়ে শকদের প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল।

৯.৫.১২.১.২ ভারতীদের মধ্যে ইন্দো-গ্রীকদের সম্পর্কে চিন্তাধারা ঃ—

একথা বলার অবকাশ রাখে না যে গ্রীকরা ভারতীয় সমাজে ছিল প্রাথমিকভাবে বহিরাগত, চিরাচরিত ধর্মশাস্ত্রে এবং সাহিত্যেসূত্রে তাদের যবন (Yavana) এবং পালিভাষায় Yona বলে অভিহিত করা হয়েছে। এই শব্দটি পারসীক 'Yaunna' শব্দ থেকে সংস্কৃতে স্থান পেয়েছে, যেই আইওনীয় গ্রীকদের উদ্দেশ্যে পারসীকরা ব্যবহার করত। পরবর্তী সময়ে 'যবন' শব্দটি রোমান, শক, কুষাণ এবং পরে মুসলমান আত্র(মণকারীদের উদ্দেশ্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু প্রাথমিকভাবে যবন বলতে গ্রীকদের বোঝানো হত। অন্যবিভিন্ন বিদেশী গোষ্ঠীদের ভিন্ন নাথে পৃথকভাবে চিহি(ত করা হয়েছে।

গ্রীকদের সঙ্গে ভারতীয়দের প্রথম সংযোগ স্থাপিত হয় পারসীকদের মাধ্যমে। পারসীক সাম্রাজের প্রজারূপে Ionia র গ্রীকরা এবং সিন্ধুদেশের ভারতীয়দের ল(্য করা যায়। ভারতের সমৃদ্ধির বিবরণ হেরোডোটাসের বিবরণে পাওয়া যায়। পারস্য সাম্রাজের বিংশতম স্যাট্র্যাপি হিসাবে ভারত সর্ব্বোচ কর দিত। এছাড়া ভারতে স্বর্ণ অনুসন্ধানকারী পিঁপড়েদের কাহিনী হেরোডোটাসের বর্ণনায় ছিল। আলেকজান্ডার ও সেলুউকিয় শাসন এবং তৎপরবর্তী সময়ে Demetrius এর দ্বারা কুসুমধ্বজ আত্র(মণের বিবরণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। গার্গী সংহিতা, পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, কালিদাসের মালবিকাগ্নমিত্রম যখন অভিযানের বর্ণনা দিয়েছে।

এখন আলোচ্য পর্বে প্রশ্ন হল এই নবগতদের সম্পর্কে ভারতীয় সমাজ কিরূপ ধারণা পোষণ করেছিল। পানিনির অষ্ট্যাধায়ী যবনদের সম্পর্কে সর্বপ্রথম ধারণা পোষণ করেছিল। তিনি যবনদের সম্পর্কে নিরপে(ছিলেন। আলকজান্ডারের পর সেলুকাসের সঙ্গে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের চুক্তি(অনুসারে, অর্ন্তবিবাহ (Epigamia) স্বীকৃত হয়। বিন্দুসার, সিরিয়ার গ্রীকরাজা Antiochos এর কাছে মদ্য, ডুমুর এবং গ্রীক দার্শনিক পাঠানোর আবেদন করেছিলেন। সিরিয়ারাজ দার্শনিক প্রেরণ করতে অস্বীকার করেন কারণ সেটি তাঁদের নিয়মবিরুদ্ধ ছিল। অর্থাৎ রাজনৈতিক সদ্ভাব ল(্যনীয় ছিল। অশোক লেখতেও Yona rajas দের কথা পাওয়া যায়, যেখানে এই অঞ্চলে অশোকের লেখগুলি দ্বিভাষিত, গ্রীক এবং আরামীয় ভাষা এবং খরোষ্ঠী লিপির ব্যবহার ল(্যনীয়। অর্থাৎ গ্রীকরাজ্যের অবস্থান সম্পর্কে অশোক যথেষ্ট ওয়াকিবহাল।

গ্রীকদের সঙ্গে পরবতী যে পর্যায় আসে, যেখানে ইন্দো-গ্রীকদের অভিযান সর্বপ্রথম মধ্যদেশ অবধি পৌছায় তাই নয়, বরং উত্তরভারতের সমাজজীবনের ওপর বিরাট প্রভাব ফেলে। সামাজিক সুস্থিরতা নষ্ট হবার ফলে। স্বাভাবিকভাবে গ্রীক বা যবনদের প্রতি ভারতীয় শাস্ত্রকারগণ বিরূপ চিন্তাধারা প্রকাশ করেনা যেহেতু এই প্রথম মধ্যদেশে কোন বিদেশী শত্রু আত্র(মণ করতে সফল হয়, তাই বিভিন্ন পুরাণ ও মহাকাব্যে এর বিবরণ দেখা যাবে। মহাভারতে যবনদের মত ‘দস্যু’দের আত্র(মণ রাজাদের কাছে বড় বিপদ রূপে প্রতিভাত হয়েছে। ‘Madhyadesh’ কেবল একটি-ভৌগোলিক (ত্রে নয়, বরং সেটি সামাজিক-সংস্কৃতিক ও ধর্মীয় (ত্রের মূলকেন্দ্র ছিল। তাই জন্য মহাভারত, যবনদের প্রতি দুষ্ট বিত্র(ান্ত, যুদ্ধদুর্মদ ম্লেচ্ছ প্রভৃতি বিশেষণ ব্যবহার করেছে। পতঞ্জলীর মহাভাষ্য, কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম, যুগপুরাণ ছাড়াও বায়ুপুরাণ, হরিবংশ, বিষ(ুপুরাণ যবনদের সমস্যার বর্ণনা করেছে। ভারতীয়দের চোখে যবনদের প্রতি অসহিষ(ুতা এবং নেতিবাচক ভাবমূতি ফুটে উঠেছিল।

তবে ধীরে ধীরে মথুরা ও আশেপাশে যবনদের অবস্থান থাকায় এবং ভাতীয় উপমহাদেশে তাদের শক্তি(বৃদ্ধি হবার ফলে তাদের প্রতি ভারতীয়দের চিন্তাধারার পরিবর্তন পরিলা(ত হয়। ম্লেচ্ছ বা বর্বর হলেও জ্ঞাণ পিপাসু হিসাবে সর্বজ্ঞ বলা হয়েছে তাদের, আবার রামায়ণে বশিষ্ঠের গাভীথেকে যবনদের উৎপত্তি বলা হয়েছে। বৃহৎসংহিতাতে বরাহ মিহির যবনদের জ্যোর্তিবিজ্ঞান এর প্রশংসা করা হয়েছে। এইভাবে সমাজের মধ্যে ইন্দো-গ্রীকদের একটা স্থান দেখা যায়। ইন্দো-গ্রীকদের শক্তি(শালী রাজনৈতিক অবস্থার কারণে ব্রাহ্মণ্য সম্প্রদায় তাদের চর্তুবর্ণের মধ্যে নিয়ে আসার প্রচেষ্টা করেছিল। শাসকদের পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া ব্রাহ্মণদের প(সামাজিক মর্যাদা বজায় রাখা সম্ভব ছিল না। তাই পুরাণে কটূ মন্তব্য সত্বেও ব্রাহ্মণরা উদ্যোগী হন যবনদের কিছুটা সামজিক মর্যাদা প্রদান করতে। তাঁরা যবনদের পতিত(ত্রিয়রূপে চিহ্নি(ত করে। আরো মনুস্মৃতি উল্লেখ করে যে ত্রি(য়াদি লোপের কারণ কিছু (ত্রিয় শূদ্র পর্যায়ভূক্ত(হয়, তাদের মধ্যে যবনরা অন্যতম। আবার একই গ্রন্থে অনাত্র বলা হয় যে পুরুষ সূক্ত(উল্লিখিত বর্ণব্যতীত অন্যরা দস্যু। তাই প্রাথমিক পর্বে যবনদের অবস্থান নিয়ে মনু নিজেই সন্দিহান। পতঞ্জলী তাদের ‘সৎশূদ্র’ হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তারা অস্পৃশ্যদের থেকে উন্নত। আবার, মহাভারতে ইন্দ্রের মুখ দিয়ে বলানো হয়েছে যে যবনরা আচার আচরণ পালন করলে তারা সমাজে গ্রহণযোগ্য। এমনকি তাদের কুরুবংশের পূর্বসূরীর যযাতির একপুত্র তুর্বশের বংশধর বলা হয়েছে।

তাই এইভাবে আমরা বলতে পারি, ইন্দো-গ্রীকরা ত্র(মশ ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সমাজে গ্রহণযাগ্য হয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষে আসেন, ভারতবর্ষকে দেখেন কিন্তু ভারতীয় সমাজ তাদের জয় করে নেয়। তারা ত্র(মশ ভারতীয় সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে পড়েন।

৯.৫.১২.১৩ — ইন্দো-গ্রীক শাসক মেনান্দার ঃ—

আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৫ অব্দে (C.155BCE) ইন্দো-গ্রীক শাসক মেনান্দার সিংহাসনে বসেন। তাঁর পুরোনাম । ঐতিহাসিকরা Menander I Soter বলে অভিহিত করেন। মেনান্দার সোটারকে গ্রেকোব্যাকট্রিয়ান এবং ইন্দো-গ্রীকদের মধ্যে প্রধানতম শাসক বলা হয়। তাঁর কারণ মূলত তিনটি। প্রথমতঃ — তিনি যে পরিমাণ মুদ্রা প্রচলন করেন তাতে রূপা এবং ব্রোঞ্জ উভয় ধাতুর ও বিভিন্ন ছাঁচের মুদ্রা ছিল, যা সমস্ত পূর্ব ও পরবর্তী রাজার থেকে অধিক।

দ্বিতীয়তঃ— Coinohard বা মুদ্রাভান্ডারে সঞ্চিত অর্থরাজির নিরিখে তার যে কোন সময়সাময়িক গ্রীক শাসকের তুলনা বহুগুণ ছিল তার সম্পদ।

তৃতীয়ত ঃ— তিনি একমাত্র শাসক যিনি ভারতীয় সাহিত্যে স্থান পেয়েছেন এবং তার কার্যকলাপ তাঁকে কেন্দ্র করে কিংবদন্তীর সৃষ্টি করেছে। গ্রীক ঐতিহাসিকদের মধ্যে Pompeius Trogus এবং Strabo র রচনার তার উল্লেখ আমরা পাই। Trogus এর মতে তিনি ব্যাকট্রিয় রাজা এবং ভারতীয় অঞ্চলে কার্যকলাপের জন্য বিখ্যাত Strabo, Apollodorus of Artemiaকে উদ্বৃত করে বলেছেন, ব্যাকট্রিয় গ্রিকগণ মূলত মেনান্দার যত সংখ্যক ভারতীয় উপজাতিদের পদানত

করেন, তা আলেকজান্ডারের তুলনায় অধিক। মেনান্দার Patalena অঞ্চল এবং আরবসাগরের তীর অবধি অগ্রসর হয়ে, সিন্ধু উপত্যকা ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। পেরিপ্লাস থেকে জানা যায় মেনান্দারের মুদ্রা বারুগাজা (ভৃগুকচ্ছে) সচল ছিল।

মেনান্দারের ঐতিহাসিক পটভূমিকা বৌদ্ধসাহিত্য 'মিলিন্দপএ(হো' (Milindapanda) এবং তাঁর প্রচলিত মুদ্রা থেকে পাওয়া যায়। উক্ত(গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তিনি কপিশা অঞ্চলের বেগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর প্রথম পর্যায়ের মুদ্রাগুলি ইন্দো-গ্রীক রাজ্যের পশ্চিমাংশে পাওয়া যায়, তাই মনে করা হয় পূর্বসূরী Antimachus II এবং Apolldotus I এর মত তিনি ককেসাসের আলোকজান্দ্রিয়া নগরে সিংহাসনে বসেন। অনেকে মনে করেন যেহেতু পতঞ্জলীর সময়কাল C.150BCE তাই মহাভাষ্য বর্ণিত মধ্যদেশে যবন আত্র(মণ মেনান্দারের কৃতিত্ব হতে পারে। তবে কথা স্বীকার্য যে তিনি সমগ্র উত্তর-পশ্চিমভারতকে ঐক্যবদ্ধ করার কৃতিত্ব অর্জন করেন। তাঁর জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক হল বৌদ্ধভি(নাগসেনের সঙ্গে তার কথোপকথন। যা 'মিলিন্দপএ(হো' নামে লিপিবদ্ধ করা আছে। এই গ্রন্থের অর্থ হল মিলিন্দের প্রশ্ন এবং যার উত্তর দিয়েছেন নাগসেন। তবে এটা প্রমান করেনা যে তিনি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন, সম্ভবত বৌদ্ধধর্মের প্রতি তিনি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করেন। মেনান্দর যে 2.45 গ্রাম দ্রাকমা মুদ্রা প্রচলন করেন তা ইন্দোগ্রীকদের নতুন তৌলমানে পরিণত হয়।

প্লুটার্কের বর্ণনায় মেনান্দরের মৃত্যু যে বর্ণনা আছে, তাতে, বলা হয়, সুশাসক মেনান্দর শিবিরে প্রাণত্যাগ করলে চিরাচরিত রীতিতে তাঁর শেষকৃত্য পালিত হয়। তাকে যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান করলেও যে বিষয়টি সামনে আসে, তা হল অনেকেই তাঁর চিতা ভস্মের অধিকার দাবী করে, তখন সেই চিতা ভস্ম দাবিদারদের মধ্যে ভাগ করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। এই গল্পটি বৌদ্ধ কিংবদন্তীর পরিচায়ক। বুদ্ধের শেষকৃত্যের কাহিনী এখানে মেনান্দারের কাহিনীতে মিশে গেছে। মেনান্দার খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকের উল্লেখযোগ্য শাসন কর্তা রূপে পরিগণিত হন।

মেনান্দারের উত্তরসূরীদের সন্ধান মুদ্রাভাণ্ডারের চর্চা করা হয়। ঐতিহাসিক Bopearachchi মনে করেন। Zoilus - I (C.130-120 BCE) মেনান্দারের Paropamisadae এলাকার উত্তরসূরী মেনান্দারের রানী অ্যাগাথোক্লিয়া (Agathoclcia) এবং তার পুত্র Strato-I (C.135-125BCF গান্ধার শাসন করেন। অ্যাগাথোক্লিয়া তার সন্তানের অভিভাবিক রূপে শাসন করেন। মুদ্রা পর্যবে(ণে দেখা যায় প্রথমপর্যায়ে মুদ্রার মুখ্যদিকে রানী অ্যাগাথেক্লিয়ার প্রতিকৃতি ধোদিত, দ্বিতীয়পর্বে রানী ও তারপুত্রের যুগ্ম প্রতিকৃতি এবং তৃতীয় পর্বে Strato-I এর প্রতিকৃতি, কিন্তু মাতার প্রতিকৃতি নেই। এই তৃতীয় পর্বে স্বাধীন রাজত্বে শুরু করেন (e.125-110BCE)। তিনি বয়স অনুসারে তিনরকম মুদ্রা প্রচলন করেন।

হিন্দুকুশের দ(ণে মেনান্দার উত্তর সময়ে Lysias (C120-110BCE) Antialcidas (C.115-95BCE) এবং Heliocles II (C. 110 -100 BCE)। Antialciadasকে ত(শিলার শাসক বলে বেসনগর স্তম্ভ বর্ণনা করেছে। Strato-I এর টাকশাল তিনি দখল করেন, সম্ভবত কে (মতাচ্যুত করতে স(ম হন। অতঃপর অতিঅল্প সময়ে অনেক ইন্দোগ্রীক শাসকের উপস্থিতি দেখা যায়। ত(শিলার শেষ ইন্দো-গ্রীক শাসক ছিলেন Archebius (C.90-80BCE)। অতঃপর Maues নামক শক শাসকের আর্বিতার হয়, কিছুকাল Apollodotus-II শকদের প্রতিরোধ করেন, পুনরায় অজ (Azes-I) গ্রীকদের পরাস্ত করেন (C.55BCE)। Apollodotus-II (C.85-65BCE) এর উত্তরসূরী, Hippostratos শকদের কাছে পরাস্ত হন। এইভাবে পশ্চিম পাঞ্জাব গ্রীকদের হস্তচ্যুত হয়। Paropamisadai এবং গান্ধার অঞ্চলে Hermaeus (C.90-70BCE) অবধি শাসন করেন। পূর্বপাঞ্জাবে বেশ কিছু দুর্বল ইন্দো-গ্রীক শাসকরা শাসন করেন। পরিশেষে শক শাসক রাজুভূলা (Rajuvula) পূর্বপাঞ্জাবে Strato-II এবং III কে পরাস্ত করলে ইন্দো-

গ্রীক শাসনের অবসান হয়। ইন্দো-গ্রীকদের থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি লাভ করে 'গান্ধার শিল্প' যা গ্রীক ও ভারতীয় শিল্পের সমন্বয়ে গড়ে উঠেছিল। কুষাণযুগে বিকাশ লাভ করে গান্ধার শিল্প।

৯.৫.১৩.২ — শকশাসন ঃ—

ইন্দো-গ্রীকদের আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা বুঝতে পেরেছি যে উত্তর পশ্চিমভারতে ইন্দো-গ্রীকদের উত্তরসূরী রূপে শকদের আর্বিভাব ঘটেছিল। শকজাতিও উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত দিয়ে উপমহাদেশে প্রবেশ করে ভারতে নিজস্ব সাম্রাজ্যের স্থাপন করে।

৯.৫.১৩.২.১ — শকদের উৎস ঃ—

Strabo র বর্ণনা ও চীনের আদি হান বংশের ইতিহাস Chien Han Shu পাঠ করলে দেখা যায় ব্যকট্রিয়ার গ্রীক শাসন C.130BCE নাগাদ মধ্য এশিয় যাবাবরদের আত্র(মণে ধ্বংস হয়। সেই রকম যাযাবর গোষ্ঠ ছিল 'Sai/'Sek' অথবা স্কাইথীয়গণ (Scythians) যারা ভারতীয় বর্ণনায় শক্ নামে পরিচিত। এই গোষ্ঠীগুলি মধ্যে এশিয়ার তৃণভূমি থেকে পশ্চিমে অগ্রসর হয়ে ব্যাকট্রিয়া জয় করে। চীনা বিবরণ অনুসারে শকদের একটি শাখা ইস্সিক্কুল (Issyk-Kol) হ্রদ থেকে বেরিয়ে কাশগড় ও পামির অঞ্চল হয়ে প্রাচীন Chi-Pirr (Jibin) অঞ্চলে পৌছায়। এই জিবিন হল বর্তমান কাশ্মীর। অতঃপর কাশ্মীর সহ সিন্ধুনদের পশ্চিমতীরস্থ সোয়াট শক অধিকৃত হয় 158 BCE নাগাদ। ত(শিলায় মহারায় মোগ এর শাসনকালে তার (ত্রপ পতিক ৭৮তম রাজ্য পর্বে দানধ্যান করেছিলেন। হেমন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী এই সময়কে খ্রীষ্টপূর্ব-৫১ অব্দ মনে করলেও অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মতে, লেখটি প্রাচীনতর শকাব্দ, তাই এর সময়কাল C.92 BCE। প্রাচীনতর শকাব্দ ছিল C.170BCE। মোগ পুষ্কলাবতীর গ্রিকশাসক আর্স্টেমিডোরাসের অনুকরণে রৌপ্যমুদ্রা প্রচলন করেন। মার্শালের মতে, কান্দাহারেও মোগের মুদ্রা পাওয়া যায় শকরাজার রৌপ্যমুদ্রায় দ্বিভাষিক গ্রিক ও প্রকৃিত লেখ পাওয়া যায়। মোগ (Maues) ভারতীয় উপাধি যথা 'Rajatiraja' (রাজতিকাজ) উপাধিগ্রহণ করেছিলেন।

অপর একটি শকগোষ্ঠী সম্ভবত কান্দাহার অঞ্চলে নিজেদের শক্তি(কেন্দ্র তৈরী করে। মুদ্রার গবেষণা থেকে জানা যায় এই শাখা আদি শাসক ভনোনেস (Vonones), তিনি তার যুগ্মশাসক স্পলহোরা (Spalahora) র সাথে আসন করতেন। স্পলহোলার উত্তরসূরী স্পলগোদামা (Spalagadama)। নামগুলির ধরণ থেকে বোঝা যায় যে এগুলি শক-পার্থিয় ধারা থেকে আগত। পরবর্তী-তিনজন শক্তি(শালী শক-পার্থিয় শাসক ছিলেন প্রথম অজ (Azes-I), অ্যাজিলিয়েস (Azilises), দ্বিতীয় অজ (Azes-II) দুইজন অজের অস্তিত্ব প্রমান হয় বাজারে লেখতে যেটি অজের অধীনস্থ স্থানীয় শাসক বিজয়মিত্রের সময় জারি হয় এবং সেটি অতীত মহারাজ অজের ৬৩তম রাজ্যবর্ষে খোদিত হয়েছিল। অর্থাৎ অতীত এবং বর্তমানে দুই অজ বিদ্যমান। সেই প্রথম অজ যে একটি রাজ্যবর্ষ প্রচলন করেন ও তাও বোঝা যায়। G.Fussman এবং B. N. Mukherjee গবেষণায় দেখিয়েছেন যে অজের প্রচলিত অব্দ চালু হয় C.57BCE নাগাদ, সেটি বিত্র(মাব্দ বলে জনপ্রিয়। তাই কিংবদন্তী অনুসারে যে বিত্র(মাদিত্য এই অব্দর প্রচলন করেন বলা হয়, আসলে তা শকরাজ অজের কৃতিত্ব। তাঁর পরবর্তী শাসকরা যে গান্ধার ও সন্নিহিত অঞ্চল তাদের দখলে রেখেছিলেন তাও স্পষ্টভাবে বোঝা যায়। উল্লেখযোগ্য ভাবে। দ্বিতীয় অজের লেখটির সময়কাল B. N. Mukherjee নির্ধারণ করেছে 5/6 খিষ্ট্রাব্দ। ল(্যনীয় বিষয়ে এই যে পরবর্তীতে ত্র(মশ শক-পার্থিয়দের (মতা ত্র(মশ পূর্বদিকে প্রসারিত হতে থাকে। ৭২ বর্ষ অর্থাৎ 15CE নাগাদ মথুরায় প্রাপ্ত চারটি লেখতে শক মহা(ত্রপ রাজুবুল (Rajuvula) এবং তার পুত্র শোডাস (Sodasa) এর কথা পাওয়া যায়। এরা নিঃসন্দেহে প্রাদেশিক শাসক ছিলেন এবং কেন্দ্রীয় শাসক সম্ভবত ছিলেন দ্বিতীয় অজ বা অয়। তিনি শক মহারাজ, রাজরাজ মহৎ অয়িলিষ এবং অয়, অতএব, উত্তর পশ্চিম এলাকা থেকে শুরু হয়ে, সিন্ধু এলাকা, পাঞ্জাব, গাঙ্গেয় উপত্যকার উপরিভাগ সহ গঙ্গা যমুনাদোয়াবের মথুরা পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে। এইভাবে শক

অধিকার উত্তরভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আধিপত্য খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকের প্রথমঅংশ পর্যন্ত অব্যাহত থাকলেও তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি।

মোগ এবং ভনোনেস গোষ্ঠীদ্বয়ভুক্ত(শকশাসকরা যে উল্লেখযোগ্য রাজ্যবিস্তার করেছিলেন, তাতে ছেদ পড়ে প(ব রাজা গন্ডোফারস এর উত্থানের ফলে। পেশোয়ারেরর তখত্ -ই-বাহিতে প্রাপ্ত শিলালেখ, সেটি অজ প্রচলিত অব্দের ১০৩ তম বর্ষে। অর্থাৎ লেখটি (103-57) = 46 খ্রীষ্ঠাব্দে। খরোষ্ঠীলিপি ও প্রাকৃতভাষায় লিখিত এই শিলালেখতে উল্লিখিত শাসক হলে গুদুবর (Guduhvara) তিনিই পল্লবরাজ, গন্ডোফারেস (Gondophares)। ৪৬ খ্রীষ্টাব্দ ছিল গন্ডোফারেসের শাসিত রাজত্বের ২৬তম বর্ষ। তক্ত-ই-বাহিতএবং পা(্বর্তী গান্ধার এলাকা শকদের পরাস্ত করেই তার অধীনস্থ হয়। তাঁর একপ্রকার বিলনমুদ্রা (Copper/tin and Silver alloy) তে তাঁর সহকারী শাসক অস্পবর্মন (Aspavarman) এর সাথে অ(্বারোহী রূপে উপস্থাপিত। অস্পবর্মনের উত্তরসূরীরা বাজাউর এলাকায় শকদের অধীন ছিলেন। আবার নিম্ন সিন্ধু এলাকায় তার বেশকিছু মুদ্রা পাওয়া যায়। তাই নিম্নসিন্ধু তার অধীনে এসেছিল বলেই মনে হয় তাই নিম্ন সিন্ধু, উত্তর পশ্চিমভারত, পাঞ্জাব, মথুরা অঞ্চল তার অধীনে ছিল। গন্ডোফারেস তাই প্রাকৃতে রাজতিরাজ (Rajatiraj) এবং গ্রীকভাষায় বাসিলেওস বাসিলেওন (basileos basileon) উপাধি গ্রহণ করেন। এবং শক শাসন ধ্বংস হবার পর শকদের কিছু প্রাদেশিক শক্তি(রূপে অস্তিত্ব দেখা যায়। মূলত কাথিয়াবাড় অঞ্চলে কার্দমক ও (হরত শক হিসাবে তাদের দেখা যায়।

বারুগাজার দ(িণে কোঙ্কন উপকূলে তিনটি বন্দরের উল্লেখ পাওয়া যায় পেরিপ্লাসে। তিনটি বন্দর হল সুপ্পারা, ক্যালিয়েনা ও সিমুল্লা। সু প্পারা হল বর্তমান সোপারা (Sopara), সিমুল্লা হল বম্বের ২৩ মাইল দ(িণে চৌল। এবে এ(েত্রে ক্যলিয়েনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এটি কল্যান (Kalyan) বন্দরের সঙ্গে চিহ্নি(ত হয়েছে। পেরিপ্লাসের লেখক জানিয়েছেন প্রথম সাতকর্ণির আমলে ক্যালিয়েনা ছিল একটি সমৃদ্ধ বন্দর, তবে সান্ডানেস বা সুন্দর সাতকর্ণির আমলে ম্যামবানুস (ন্যামবানুস) শক (প নহপানের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু হওয়ায় এইবন্দরের সমৃদ্ধি নষ্ট হয়। নহপান কল্যান বন্দরের ওপর নৌ-অবরোধ জারিত করেন। ফলে গ্রীক জাহাজ এই বন্দরের ভেড়ানো বন্ধ হয়ে যায়। কোন গ্রীক জাহাজ অবরুদ্ধ এলাকায় আটকে গেলে, নহপানের নৌবহর তাকে বারুগাজায় নিয়ে যেত। এ থেকে স্পষ্ট যে শক ও সাতবাহন রাজারা বাণিজ্যিক সমৃদ্ধির প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন। সেই জন্য একে অপরের প্রতি বলপ্রয়োগে পিছপা হতেন না। কল্যান বন্দরের নিকটবর্তী সহ্যদ্রি পর্বতের গিরিখাত থলঘাট, ভোরঘাট ও নানঘাট দিয়ে বন্দরের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। অর্থাৎ এর থেকে বোঝা যায়, শক রাজত্ব অর্থনৈতিক কার্যকলাপের দিক দিয়ে অগ্রণী ছিল।

এছাড়া শকমহা(ত্রপ রুদ্রদামন তার জুনাগড় প্রশস্তিতে নিজস্ব বিজয় কৃতিত্বে পাশাপাশি 'জনকল্যান মূলক প্রকল্পের উল্লেখ করেন। তিনি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য এবং অশোকের সময়কালের সুদর্শন হ্রদ সংস্কার ও পুর্ণনির্মান করেন। এই হ্রদের সংস্কারের মাধ্যমে সেচ ব্যববস্থায় উন্নতিতে উল্লেখযোগ্য পদ(প করেন। এই ভাবে দেখা যায় শক শাসকরা পশ্চিমভারতে একটি উল্লেখযোগ্য শক্তি(রূপে আত্মপ্রকাশ করে।

৬.১৩.২.২. পশ্চিমভারতের শকদের সংগে সাতবাহনদের সংঘর্ষের বিবরণ দাও।

খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে উত্তর ভারতে যখন কুষাণশক্তি(ত্র(মশঃ বিস্তার লাভ করছিল তখন পশ্চিম রাজপুতানা, গুজরাট এবং কাথিয়াবাড় অঞ্চলে (হরত শক (ত্রপগণ তাদের রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপন করেছিল। উত্তরকোঙ্কন, উত্তর ও দ(িণ মহারাষ্ট্র এবং বেরারের কিছু অংশ সাতবাহনদের কাছ থেকে দখল করেছিল। মহা(ত্রপ নহপান এবং তার জামাতা ঋষভ দত্ত (উযভ দত্ত) সাতবাহন শক্তি(কে পর্যুদস্ত করে দা(িণাত্যের পশ্চিমাঞ্চলে আধিপত্য বিস্তার করেছিলেন।

জাতিতে অন্ধ্র, অন্ধ্রজাতীয়, অন্ধ্রভৃত্য প্রভৃতি বিভিন্ন নামে অভিহিত, কৃষ(া গোদাবরীর পশ্চিম অববাহিকা অঞ্চলের অধিবাসী গণ সপ্তবাহন (সূর্য) বংশউদ্ভূত সাতবাহন নামে পরিচিত হয়। খ্রীঃ পূঃ ২৩৫ অব্দ থেকে খ্রীষ্টীয় ২২৫ অব্দ পর্যন্ত দ(ণ পশ্চিম ভারতে বিশেষ প্রতিপত্তি, মর্যাদা এবং গৌরবের সংগেই রাজত্ব করেছিলেন , মৌর্য সাম্রাজের পতনের পর সমগ্র উত্তর ভারত যখন উপর্যুপরি যবন আত্র(মণে বিপর্যস্ত হচ্ছিল তখন দ(ণ পশ্চিম ভারতে সাতবাহন রাজাগণ সিমুক, কৃষ((কহ্ন), প্রথম সাতকর্ণী, বেদশ্রী, শত্তি(শ্রী, দ্বিতীয় সাতকর্ণী লম্বোদর, অপিলকা, কুন্তল সাতকর্ণী এবং হলের রাজত্বকাল ২৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত। যথেষ্ঠ প্রতিপত্তি ও যোগ্যতার সংগে দ(ণ পশ্চিম ভারত শাসন করেছিলন। কিন্তু তার পরবর্তীযুগে পশ্চিম ভারতে (হরত শকদের উত্থানে সাতবাহন প্রতি পত্তি বিশেষভাবে (ুন্ন হয়।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী (হরত শকদের হাত থেকে সাতবাহনদের হাত মর্যাদা সাময়িভাবে পুনরুদ্ধার করলেও এবং (হরত শকদের সম্পূর্ণভাবে উচ্ছেদ করলে পরবর্তীকালে কার্দমক শকগণ সাতবহনদের সাথে একটি দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষে অবতীর্ণ হয়। কার্দমক শকদের ত্র(মাগত আত্র(মণে এবং শতাব্দীকাল অধিকস্থায়ী শক সাতবাহন শত্তি(সম্পূর্ণ দুর্বল হওয়ায় উদীয়মান আভীর, ই(াকু এবং পল্লব গণ সাতবাহন সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশ অধিকার করে। অনুরূপভাবে কার্দমক শকদের রাজ্যও উত্ত(শত্তি(গুলির দ্বারা অধিকৃত হয়।

পশ্চিম ভারতে (হরত (ত্রপদের মধ্যে প্রথম যার নাম পাওয়া যায় তিনি ছিলেন (ত্রপ ভূমক। ব্রাহ্মী এবং খারোষ্ঠী ভাষায় মুদ্রিত তাঁর মুদ্রাগুলির প্রাপ্তি স্থান থেকে তিনি মালব, কাথিয়াবড়ি, গুজরাট, পশ্চিমরাজপুতানা এবং সিন্ধুর বিস্তীর্ণ অঞ্চল শাসন করতেন তবে বি. এন. মুখার্জ্জীর মতে, যেহেতু পেরিপ্লাসে আছে, নহপানের রাজত্বকালে পার্থীয়গণ সিন্ধু অঞ্চলে যুদ্ধ করছিল, সেহেতু মনে করা সঙ্গত যে, সিন্ধু ভূমকের রাজ্য সীমার অর্ন্তভূত্ত(ছিল না। ভূমক প্রথম কনিষ্কের অধিপত্য স্বীকার করেছিলেন।

ভূমকের পরবর্তী শাসক নহপান (ত্রপ থেকে মহা(ত্রপ এবং পরবর্তীকালে রাজা উপাধি গ্রহণ করে কুষাণদের অধীনতা পাশ থেকে মুত্ত(হয়েছিলেন, নাসিক জেলার অর্ন্তগত জোপালথাম্বীতে নহপানের অসংখ্য মুদ্রা পাওয়া গেছে। যার দুই তৃতীয়াংশ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী পুনমুর্দ্রিত করিয়েছিলেন। এ থেকে দুটি বিষয়ে পরিস্ফুট হয়। যথা — নহপান গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সমসাময়িক ছিলেন তার কাছে পরাজিত হয়েছিলেন।

নহপানর জামাতা ঋষভ দত্তের বিভিন্ন লেখতে যে ভৌগোলিক বিবরণ পাওয়া যায় তা থেকে মনে করা হয় যে, নহপানের আধিপত্য রাজপুতানার আজমীর, পশ্চিমে কাথিয়াবাড়, দ(ণে গুজরটি পশ্চিম মালব উত্তর কোঙ্কন, নাসিক ও পুণা অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। নিজে কোন রাজ্য জয় করে ছিলেন বলে জানা যায় না। উত্ত(অঞ্চলগুলি প্রথম সাতকর্ণী থেকে গৌতমীপুত্র সাতকর্নীর রাজত্বকালের মধ্যবর্তী সময়ে (হরত শকদের দ্বারা অধিকৃত হয়েছিল। নহপালের মন্ত্রী অয়নের লেখ থেকে জানা যায় যে, ঋষভ দত্ত মলয়দের পরাজিত করেছিলেন। জুন্নার লেখতে নহপানকে “রাজা মহা(ত্রপ স্বামী” বলে অভিহিত হয়েছে।

গৌতমী বলশ্রী রচিত নাসিক প্রশস্তি থেকে জানা যায়, তার পুত্র সাতকর্ণী (হরত উচ্ছেদ সাধন করেছিলেন। গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী তার রাজত্বের অষ্টাদশ বছরে ফের প্রধানতম শত্রু মহা(ত্রপ শক নহপান এবং তার জামাতা ঋষভ দত্তকে পরাজিত ও নিহত করে দ(ণ পশ্চিম ভারতে শক পহলব অধিপত্য সম্পূর্ণ নির্মূল করেছিলেন। এরপর তিনি নহপানের দ্বারা মুদ্রিত মুদ্রাগুলির ২/৩ অশে পুর্ণমুদ্রিত করিয়েছিলেন। এবং সুরাট, অপরান্ত কুকুর, আকর ও অবন্তী প্রভৃতি অঞ্চল জয় করেছিলেন। এর ফলে উত্তর দা(ণাত্য পশ্চিম ও মধ্য ভারতর বিস্তীর্ণ অঞ্চল বিদেশী শাসনমুত্ত(হয়েচ্ছিল। এই জয়কে চিরস্মরনীয় করে রাখার জন্য গৌতমীপুত্র গোবর্ধন জেলার (নাসিক) বেলাকটক নগর নির্মাণ করিয়েছিলেন। শকদের অনুকরণে তিনি আড়ম্বর পূর্ণ রাজরাজ এবং মহারাজ উপাধি ও গ্রহণ করছিলেন।

গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর এই জয়লাভ স্থায়িত্ব অর্জন করেনি। কুষাণরা শকদের অপর একটি শাখা কার্দমক গোষ্ঠীর চস্টনকে যিনি উজ্জ্বয়িনীর (ত্রপ ছিলেন পশ্চিম দ(ি ণ ভারতে শকদের হৃতরাজ্য ও গৌরব পুনরুদ্ধারের দায়িত্ব দেন। চষ্টন এবং তার পুত্র রুদ্রদামন পরসুর সহকারী শাসকরূপে বর্তমান ছিলেন। রুদ্রদামন গৌতমী পুত্র সাতকর্ণীকে পরাজিত করেছিলেন। গিরনার (জুনাগর) লেখ থেকে জানা যায় রুদ্রদামন গৌতমী পুত্র সাতকর্নীকে পরাজিত করে নহপানের হৃতরাজ্যের সমস্ত অঞ্চলসমূহ পুনরদ্ধার করে শক সাম্রাজ্যভুক্ত(করেছিলেন। রুদ্রদামনের এই সাফল্য প্রমাণিত হয় টলেমীর বর্ণনা অনুযায়ী যেখানে উজ্জ্বয়িনী ছিল রুদ্রদামনের - রাজধানী। বাস্তব বুদ্ধি সম্পন্ন রাজনীতিজ্ঞ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী চষ্টন এবং রুদ্রদামনের পারিকল্পনা আগেই বুঝতে পেরে সমূহ বিপদ থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এবং তার সাম্রাজ্যের অন্যান্য অঞ্চলগুলি র(া করার জন্য তার অন্যতম পুত্র বশিষ্ঠী পুত্র সাতকর্ণীর (সম্ভবতঃ পু লুমায়ির সৎভাই) সংগে রুদ্রদামনের কন্যার বিবাহ দিয়ে ছিলেন। কাহেরী (অপরান্ত) লেখতে এই বৈবাহিক সম্পর্কের আভাষ পাওয়া যায়।

জুনাগড় লেখতে উল্লিখিত আছে, রুদ্রদামন দা(িণাত্যের অধিপতি সাতকর্ণীকে দুবার রাজি করেছিলেন। কিন্তু কুটুম্ব বলে তাঁর রাজ্য জয় করেননি। এই সাতকর্ণীকে ছিলেন তা নিয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতানৈক্য অছে। ডঃ ডি. আর ভান্ডার করের মত, ঐ সাতকর্ণী নিশ্চয়ই ছিলেন গৌতমীপুত্র সাতকর্ণী। যিনি ছিলেন রুদ্রদামনের জামাতা। অন্যমতে তিনি জামাতার ভাই ও হতে পারেন। অধ্যাপক র‍্যাপসন মনে করেন এই পরাজিত সাতবাহন রাজা ছিলেন পুলুমায়ি। ডঃ বি. এন মুখার্জ্জীর মতে, রুদ্রদামন এবং চটনের লেখ অঙ্গালেখেরে রচনা কাল ১৩০ খ্রীষ্টাব্দে অর্থ্যাৎ যখন শকপণ সাতবাহন রাজ্যের বৃহৎ অংশ জয় করেছিল। রুদ্রদামন যে সাতকর্ণীকে দ্বিতীয়বার পরাজিত করেছিলেন, তিনি ছিলেন বশিষ্টপুত্র সাতকর্ণী — (রুদ্রদামনের জামাতা) কারণ গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর রাজত্ব কাল তার আগেই শেষ হয়েছিল।

অমরাবতীতে প্রাপ্ত লেখ থেকে জানা যায় বশিষ্ঠী পুত্র পু লুময়ি কৃষ(ানদীর মোহনা পর্যন্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিলেন। তিনি গৌতমীপুত্র সাতকর্ণীর সময়ে কার্দমক শকদের দ্বারা অধিকৃত সাতবাহন রাজ্যের আংশিক পুনরুদ্ধার করতে সম্ভব হয়েছিল।

ডঃ গোপালচারীর মতে, বশিষ্ঠী পুত্র কুলুমায়ির পর শিবশ্রী পু লুমায়ির রাজত্বকালে শক সাতবাহন সংঘর্ষ পুনরায় আরম্ভ হয়। এর ফলে সাতবাহনগণ অনুপ এবং অপরান্ত অঞ্চলে তাদের অধিপত্য হারান।

সাতবাহনবংশের শেষ উল্লেখযোগ্য রাজা ছিলেন যজ্ঞ শ্রী সাতকর্ণী তিনি ১৬৫ থেকে ১৯৪ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত শাসন করেছিলেন। শকরীতির দ্বারা প্রভাবিত রাজার মস্তকযুক্ত(তাঁর মুদ্রাগুলি পাওয়া গেছে মাদ্রাজ কৃষ(া গোদাবরী অঞ্চলে, মধ্যেপ্রদেশের চন্দজেলায়, বেরার, উত্তর কোঙ্কন, বরদা, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্র এবং সোপারায়। তিনি শকদের কাছ থেকে অপরান্ত পুনঃ অধিকার করেছিলেন। এছাড়াও তিনি পশ্চিম ভারতের কিছু অংশ এবং নর্মদা উপত্যকা থেকেও শকদের বিতাড়িত করেছিলেন। সাতবাহন বংশের তিনিই ছিলেন শেষ উল্লেখযোগ্য শাসক যিনি একই সংগে পূর্ব এবং পশ্চিমাঞ্চল শাসন করে ছিলেন। তার পরেই সাতবহন শক্তি(র দ্রুত অবনতি এবং শেযে পতনের কোলে ঢলে পড়ে।

যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর রাজত্বের শেষের দিকে সাতবাহনদের দুর্বলতা প্রকট হয়ে ওঠে। আভীর গণ তখন নাসিক অঞ্চল তাঁর কাছ থেক ছিনিয়ে নেয়। যজ্ঞশ্রী সাতকর্ণীর পর বিজয়, চন্দশ্রী, চতুর্থ পুলুমায়ি, রাজা হয়েছিলেন। এরা সকলেই দুর্বল হওয়ায় সাতবাহনদের হাত গৌ রব পুণরুদ্ধার করতে ব্যর্থ হন। সাতবাহন রাজ্য পাঁচটি অংশে বিভক্ত(হয়ে যায়।

৯.৫.১৩.২.৩ — শকদের বিভিন্ন কার্যকলাপ ঃ—

গুজরাট অঞ্চল কার্দমক ও (হরত শকরা মহা(ত্রপ উপাধিধারণ করে কুষাণদের আনুগত্য স্বীকার করে নিয়েছিলেন কিন্তু সেই আনুগত্য সত্ত্বেও পশ্চিমভারতের শকদের ব্যাপক আধিপত্য ছিল। শকদের সঙ্গে এই অঞ্চলের অপর গুরুত্বপূর্ণ শক্তি(সাতবাহনদের লড়াইয়ের বিবরণ আমরা পেলাম। এর পাশাপাশি গুজরাট অঞ্চলের বাণিজ্য এবং অর্থনৈতিক কার্যকলাপে শকদের প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। ঐতিহাসিকদের একাংশের মতে, সাতবাহনদের সাথে শকদের যুদ্ধের কারন হিসাবে এই অঞ্চলে সমুদ্রবাণিজ্য নিয়ন্ত্রণের প্রচেষ্টাকে চিহ্নি(ত করেছেন।

পেরিপ্লাস অনুসারে পশ্চিম উপকূলের শ্রেষ্ঠতম বন্দরগুলির একটি ছিল বারুগাজা। বারুগাজার বিবরণ সম্পর্কে টলেমিও সচেতন। বারুগাজা ভারতীয় লেখমালার বর্ণিত ভৃগুকচ্ছ। নর্মদার মোহনায় ছিল এই বন্দর, তাই পেরিপ্লাসের লেখকের বিবরণে এই বন্দরের নিকটবতী অঞ্চলে জল ছিল অগভীর, তাই এখানে জাহাজ চলাচলে সহায়তা করতে স্থানীয় শাসক ন্যামগনুস/ম্যামবানুস (শক(ত্রপ নহপাত্র), মাঝি মাল্লাদের নিয়োগ করতেন। এই মাঝি মাল্লারা এপ্পগ ও কৌট্টুম্ব নামক (ুদ্রতর জলযান চালিয়ে বিদেশী জাহাজগুলি বন্দরে আনতে বা বের করতে সাহায্য করতেন। এই তথ্যটি বারুগাজা বন্দরের গুরুত্ব এবং খ্রীঃপূর্ব প্রথম শতকে শকরাজাদের গভীর আগ্রহের পরিচয় বহন করে। সাতবাহন রাজারাও একই রকমভাবে কাহ্নেরীতে সাগরপাল গণদের কথা বলা আছে। তবে বারুগাজা বন্দরের উন্নত পশ্চাৎভূমির সঙ্গে বানিজ্যিক সংযোগ ছিল। টগর ও প্রতিষ্ঠান নগরীর থেকে তিরিশ ও কুড়ি দিনে বারুগাজাতে আসা যেত। আবার, বারুগাজার পূর্বদিকে মালবের উজ্জয়িনীর সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ ছিল। আবার চীনের সামগ্রী বাহলীকদেশ থেকে কাবুল, পুষ্কলাবলী হয়ে স্থলপথে নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলের মধ্যে দিয়ে বারুগাজায় পৌছাত। এতবড় পশ্চাৎভূমিন সমকালী ভারতের অন্য কোনও বন্দরের ছিল না।

৯.৫.১৪.৩ — কুষাণ সাম্রাজ্য

৯.৫.১৪.৩.১ — কুষাণদের সম্পর্কে ধারণা ঃ—

মধ্য এশিয়া থেকে বেরিয়ে যেসব যাযাবর গোষ্ঠী পশ্চিমে অভিপ্রয়ান করে আফগানিস্থান ও উত্তর পশ্চিম সীমান্তে উপনীত হল, তাদের মধ্যে ইউয়েঝি গোষ্ঠী (Yueh-Zhi) অন্যতম। ভারতীয় ইতিহাসে তাদের রাজনৈতিক ইতিহাস দীর্ঘতর সময়জুড়ে দেখা যায়। এরা তোখারীয় ভাষা ব্যবহার করতেন। ইউয়ে-ঝি, শক, হিউয়ুং নু (Hsiung-nu) /হুণদের মধ্যে লড়াইয়ের ফলে হউয়ে-ঝিরা তাদের আদিবাসস্থান থেকে চ্যুত হয়ে পশ্চিমে অভিপ্রয়াণ করে আফগানিস্থনের উত্তর পূর্বাংশে ব্যাকট্রিয়াতে উপনীত হয়। গ্রীক শাসনের অবসানে শকদের সঙ্গে এদেরও অবদান ছিল। B. N. Mukherjee ব্যাকট্রিয়া অঞ্চলে ইউয়েঝিদের সত্রি(য় উপস্থিতি ল(্য করেন C.2nd Century BCE এর দ্বিতীয় পর্বে। কালত্র(মে ইউয়ে-ঝি গোষ্ঠীরা পাঁচটি Clan এ বিভত্ত(হয়েপড়ে। এদের মধ্যে অধিকরতর শক্তি(শালী হয়ে ওঠে Guei-Shuang (কু-এইযুয়াং) গোষ্ঠী। এরাই পরে কুষাণ নামে পরিচিত হয়। ব্যাকট্রিয়া যেহেতু সমৃদ্ধ এলাকা, তাই ব্যাকট্রিয়ার ওপর নিয়ন্ত্রণ এই গোষ্ঠীর (মতা বহুগুণে বাড়িয়ে দেয়। রাই পরবর্তী সময়ে বিরাট কুষাণ সাম্রাজ্য নির্মাণ করেন। কুষাণ ইতিহাসে G. Fussman, R. Gobls, R. N. Frye, A. D. H Bivar, J. Harmatta, B. Litvinsky, G. Pugochenkova, J. M. Rosenfields, B. N. Mukherjee, Ranabir Chakraborty প্রমুখ ঐতিহাসিকদের বিশেষ অবদান আছে।

মুদ্রার ভিত্তিতে প্রথম কুষাণ শাসক ছিলেন মিয়াওস (Miaos), ব্যাকট্রিয়া থেকে অক্সায় নদী অঞ্চল তার রাজ্যভূত্ত(ছিল। ভারতে রাজ্যবিস্তার করলেও কুষাণদের শক্তি(র মূল ঘাঁটি প্রাথমিকভাবে ছিল ভারতের বাইরে। কুষাণদের সাম্রাজ্যে উত্থান থেকে পতন পর্যন্ত ব্যাকট্রিয়া তাদের অন্যতমকেন্দ্র রূপে ছিল। প্রথমে কদফিসেস ও কনিষ্ককে আলাদা শাখা মনে করা হলেও বর্তমানে রাবাতক লেখ আবিষ্কার এদের একই পরিবারভূত্ত(হওয়ার বিষয়টি প্রমাণ করেছে।

কুজুল কদফিসেস (Kujula Kadphises) এর আমলে কুষাণ (মতার বিস্তার শুরু হয়। চৈনিক বিবরণ অনুসারে তার অধিকার Gao-Fu (কাবুল) এবং Jibin (কা(মীর) এ বিস্তৃত হয়। তিনি তাম্রমুদ্রা প্রচলন করেন। তারপর তার উত্তরসূরী, সম্ভবত পৌত্র বিমকদফিসেস সিংহাসনে বসেন। বিমকদফিসেসকে প্রথমে তার পুত্র মনে করা হলেও রাবাতক লেখ এই ভুলের অবসান ঘটায়, তবে কুজুলের পুত্র বিম তাক্ত(Vima-Taktu সম্ভবত সিংহাসন অল্পসময় ছিলেন। বিম কদফিসেস নিম্ন সিন্ধুজয় করে সিন্ধু বা দ্বীপে কর্তৃত্ব স্থাপন করেন। কান্দাহারে প(বশাসকদের তাম্রমুদ্রার ওপর বিম-কদফিসেস এর যজ্ঞরত নকশা পাওয়া যেতে থাকে। তাঁর সময়কাল সম্ভবত ছিলে খ্রীষ্টিয় প্রথম শতকের ষষ্ঠ বা সপ্তম শতক। মথুরার মাঠ অঞ্চলে পাওয়া তাঁর সিংহাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটি মথুরায় রাজত্বের অবিসংবাদী প্রমাণ। এছাড়া সাকেত তার সময়ে কুষাণ অধিকারে ছিল। Dasht-e-Nabur ত্রিভাষিক লেখ থেকে প্রমাণিত হয় পার্থীয় 279 অব্দ, অর্থাৎ পার্থীয় অব্দের সূচনাকাল তাই লেখর সময়কাল (279-247) = 32CE। আনুমানিক 32CE তে ব্যাকট্রিয়া ও আফগানিস্থানে কুষান আধিপত্য ছিল। তিনি মহারাজ রাজতিরাজ, সর্বলোকে(রের ও মহী(রের অভিধা গ্রহণ করেন। ভারতবর্ষে তিনি প্রথম স্বর্ণমুদ্রা চালু করেন।

কুষাণ সাম্রাজ্য তার সর্ব্বোচ্চ পর্যায়ে গিয়েছিল প্রথম কনিষ্কের শাসণকালে। তার রাজত্বকালে সূচনা সম্ভবত 78CE অব্দে হয় বলে অনেকে ঐক্যমত্য। তার সিংহাসন লাভকে স্মরণীয় করত তিনি যে অব্দ প্রচলন করেন তা শকাব্দ নামে সমাধিক পরিচিত। রাবাতক লেখটি কণিষ্কের আমলেই উৎকীর্ণ হয়। এই লেখ থেকে জানা যায় যে, কনিষ্কের আদেশ পালিত হত যথাত্র(মে Ozono (উজ্জয়িনী), Zagido (সাকেত), Kozombo (কৌশাম্বী), Palivothro (পাটলিপুত্র) এবং Sri-tchompo (শ্রীচম্পা বা ভাগলপুরে নিকট চম্পানগরী) কৌশাম্বী এবং সারনাথে পাওয়া তার দুটি লেখ, যেগুলি তাঁর তৃতীয় রাজবর্ষে উৎকীর্ণ, এই অঞ্চলে অর্থাৎ মথুরা থেকে আরো পূর্বদিকে কুষানশক্তি(প্রসারের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। চৈনিক সূত্রে কনিষ্কের সফল পাটলিপুত্র অভিযান প্রমানিত হয়, রাবাতক লেখর বর্ণনার ফলে। তাঁর ২২ তম রাজ্যবর্ষ একটি লেখ পাওয়া যায় সাঁচী থেকে এবং সর্বশেষ লেখটি উৎকীর্ণ ছিল ২৩তম রাজ্যবর্ষে মথুরা থেকে। শ্রাবস্তীর প্রাপ্ত লেখ প্রাচীন কোসলের ওপর তার অধিকারের প্রমাণ। বিভিন্ন লেখ থেকে জানা সমগ্র পাকিস্থান তাঁর অধীনস্থছিল। আগেই বলা হয়েছে যে পশ্চিমভারতে শক শক্তি(কুষাণদের প্রাদেশিক শাসকে পর্যবসিত হয়েছিল। তাই মনে করা হয় শক(ত্রপ চষ্টন এবং রুদ্রদামন কণিষ্কের আনুগত্য মেনে শাসন করছিলেন। যদিও স্থানীয়স্তরে তারা স্বাধীনতাভোগ করতেন বলেই অনুমেয়। ব্যাকট্রিয়া কুষাণ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি। কনিষ্কের সময় থেকে ব্যাকট্রিয় ভাষায় লেখজারি ও মুদ্রা জারি শুরু হল গ্রীকভাষার বদলে। চীনাপরিব্রাজক এর (হিউয়েন সাঙ/সোয়ান সাঙ) বিবরণে পামির এলাকার পূর্বভাগ তার রাজ্য ভুক্ত(ছিল। আমুদরিয়ার উত্তরস্থ ভূভাগ তখনো কুষাণদের অধীন ছিল, কণিষ্কের শাসনে খোটান, কাশগড়, সোগদিয়ানা, তাশখন্দ তাঁর সাম্রাজ্যভূক্ত(হয়েছিল। C.90CE নাগাদ কনিষ্ক চীণের বিরুদ্ধে ও সামরিক অভিযান করেছিলেন, কিন্তু, চীনা হান সম্রাট Wu-ti এর সেনাধ্য(Pan-Chao সেই বাহিনীকে পর্যুদস্ত করন।

কনিষ্কের পরবর্তী শাসকরা অন্তত মথুরা পর্যন্ত তাদের সাম্রাজ্য অটুট রাখতে পেরেছিল, যা লেখমালার ভিত্তিতে প্রমানিত। কনিষ্কের পরবর্তী শাসক বাসিষ্ক (২০-২৪ কনিষ্কাব্দ রাজত্বকাল) অর্থাৎ কনিষ্কের সঙ্গেই যুগ্মভাবে শাসক ছিলেন, তার পরবর্তী শাসক হুবিষ্ক (২৪-৬০ কনিষ্কাব্দ/শকাব্দ) মথুরা থেকে লেখ জারি করতেন। পূর্ব আফগানিস্থানের ওয়ার্দক থেকে আবিষ্কৃত লেখ (129CE) আফগানিস্থানে সুরকোটালে প্রাপ্ত বা(িক লেখ (109CE), প্রমাণ করে আফগানিস্থান এবং ব্যাকট্রিয়ার ওপর তার কর্তৃত্ব বজায় ছিল। B. N. Mukherjee প্রমাণ করেন হুবিষ্কের (Hubishka) আমলে চীনের সিনকিয়াংয়ের অর্ন্তগত তাশকুরগান ও তুর্কমেনিস্থানের মার্ভ এলাকা তার অধীনে ছিল। হুবিষ্কের সঙ্গে যুগ্মশাসক রূপে দ্বিতীয় কনিষ্কের উল্লেখ পাওয়া যায়। তিনি লেখতে বাসিষ্কের পুত্র রূপে বর্ণিত হয়েছেন। বাসিষ্কের কামরা লেখতে 20 কনিষ্কাব্দ/শকাব্দ, অর্থাৎ 98CE তে কনিষ্কের জন্মের কথা জানা যায়। বলাবাহুল্য তার নাম তৎকালীন সম্রাট তথা তার পিতামহ প্রথম কনিষ্কের নামানুসারে রাখা হয়। 119CE তে আরা লেখতে দ্বিতীয় কনিষ্কের উল্লেখ

পাওয়া যায়। তবে পূর্ণাঙ্গ সম্রাট তিনি হয়েছিলেন কিনা বলা কষ্টকর। হুবিষ্কের পর প্রথম বাসুদেব 145-176CE রাজত্ব করেন। মহা(ত্রপ রুদ্রদামন গুজরাটে স্বতন্ত্র শাসক হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে। তাই উজ্জয়িনী, পশ্চিমভারতে এবং মথুরার পূর্বস্থ এলাকাতে কুষাণ অধিকার সঙ্কুচিত হয়। তবে, মথুরা এবং ব্যাকট্রিয়ার ওপর কুষাণ সাম্রাজ্য শাসন সুদৃঢ় ছিল। এর পরবর্তী সময়ে তৃতীয় কনিষ্ক এবং দ্বিতীয় বাসুদেবের শাসনের প্র মাণ মেলে। 248CE নাগাদ দ্বিতীয় বাসুদের মথুরা শাসন করতেন।

ইরাণের শাসানীয় শক্তি(র উত্থান কুষান সাম্রাজ্যে অবসানের পথ প্রশস্ত করে। পূর্ববর্তী আর্সাকীয় ওপার্থিয়দের সঙ্গে কুষাণদের যুদ্ধবিগ্রহ লেগেই থাকত । নকশ্-ই-রুস্তম (262CE) থেকে জানা যায় যে সাসনীয় সম্রাট প্রথম শাহপুর, কুষাণশহর বা কুষাণ রাজ্য জয় করেছিলেন। এই লেখ থেকে জানা যায় যে অন্তিমলগ্নেও কুষাণরা পেশোয়ার, কাশগড় , তাশখন্ডে তাদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। সাসানীয় সম্রাট প্রথম আর্দাশির এবং তার পুত্র প্রথম শাহপুরের . আমলে ব্যাকট্রিয়া তাদের হস্তচ্যুত হয় এবং ভারতবর্ষে আর্জুনায়ন, যৌধেয়, মালব প্রভৃতি অরাজনৈতিক গোষ্ঠীদের আত্র(মণে স্থানীয় স্তরে সীমাবদ্ধ কুষাণ শক্তি(র পতন ঘটে।

কুষাণদের সমৃদ্ধির উৎস ছিল ব্যাকট্রিয়া ও নিম্নসিন্ধু এলাকা। এই অঞ্চলে ভিত্তিভূমি তৈরী করেই তারা ভারতে অগ্রসর হয়। পরে মথুরাও অন্যতম কেন্দ্র পরিণত হয়। পাশাপাশি বাণিজ্যের (ত্রেও সাংস্কৃতিক বিকাশ কুষাণদের বিরাট অবদান ছিল। স্বর্ণমুদ্রা প্রচলনের কৃতিত্বও তাদেরই প্রাপ্য। পাশাপাশি এই সময়ে মহাযান ধর্ম সম্প্রদায় বিকশিত হয়। কনিষ্কের উদ্যোগে কাশ্মীরের কুন্ডনলবনে, (মতান্তরে জলন্ধরে চতুর্থ বৌদ্ধ সংগীতি (4th Buddhist Council) অনুষ্ঠিত হয়। সেই দিক থেকে কুষাণরা একটি শক্তি(শালী সাম্রাজ্যের সৃষ্টি করেছিল।

৯.৫.১৪.৩.২ — কুষান শাসনে সম্রাট উপসনার ধারা ঃ—

মৌর্য সাম্রাজের পতনের পর উত্তরভারতে কুষাণবংশীয় সম্রাটগণ পরবর্তী বৃহৎ সাম্রাজ্যে গড়ে তোলেন। এই বৃহৎ কুষাণ সাম্রাজ্য তার উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে মধ্য এশিয়ার বেশ কিছু অঞ্চল যেমন উত্তর তুর্কমেনিস্থান, তাসখন্দ, সগদিয়া এবং পূর্বদিকে কাশগড় এবং শি-সিং, সিস্তান সহ আফগানিস্থানের বিস্তৃত অংশ প্রায় পুরো পাকিস্থান এবং দঃবিহারকে পূর্বসীমান্ত ধরে উত্তর ভারতে বিশাল অংশ, মধ্যপ্রদেশের সাঁচী এবং দা(ণাত্যের কিয়দংশ জুড়ে রাজত্ব করত। বৃহৎ ও বৈচিত্র্যময় অঞ্চল একটি শক্তি(র অধীনে থাকায় এটি সাম্রাজ্য রূপে পরিচিত হয়। তবে কেবল সাময়িক শক্তি(জোরে নয়, জনমানসে সম্রাটের ও সাম্রাজ্যের প্রতি আস্থা তৈরীর প্রবণতার মধ্য দিয়েই কুষাণ সম্রাটদের সম্রাট ও সাম্রাজ্য উপাসনার বিধি প্রচলিত হয়।

এইরূপ উপাসনা পদ্ধতি ধারণা পাওয়া যায় কুষাণ সম্রাটদের তিনটি পারিবারিক মন্দিরের সন্ধানের মাধ্যমে। যথাত্র(মে মথুরার মাট এবং আফগানিস্থানর সুরকোটালে উৎখননের মাধ্যমে যে মন্দিরগুলি পাওয়া যায় তাতে বিভিন্ন দেবদেবীর সাথে কুষাণ শাসকদের মস্তকহীন মূর্তি পাওয়া যায়। তবে এই মূর্তিগুলি দেবতা জ্ঞানে পুজিতে হতোকিনা সেই নিয়ে বির্তক ছিল। ঐতিহাসিক Fussman এই মন্দির দুটিকে কুষাণদের পরিবারিক মন্দির বলে মনে করলেও, এগুলিকে দেবত্ব প্রাপ্ত সম্রাটদের মন্দির না মনে করে কুষাণ রাজবংশের ইষ্টদেবতার মন্দির বলে মনে করতেন। তবে বর্তমানে 1993 খ্রীষ্টাব্দে Nicolos-sims-willams এবং Joe Cribb কর্তৃক রাবাতকলেখ আবিষ্কার এই (ত্রে নতুন তথ্যের উন্মোচন ঘটিয়েছে।

উত্তর আফগানিস্থাণের বাঘলান প্রদেশে প্রাপ্ত এই লেখতে কনিষ্কের রাজত্বের প্রথমবর্ষে উত্ত(প্রদেশের করলাঙ্গ (সেনাপতি) সফর এবং তার সহকারী নকুনসক bago-laggo কে একটি (অর্থাৎ দেবগৃহ) নির্মাণের নির্দেশ দিয়েছেন। যেখানে সিংহবাহিনী ননাদেবী ও অন্যদেবতাগণের সঙ্গে পূর্বপুরুষ যথা কণিষ্কের প্রপিতামহ কুজুল কদ

ফিসেস, পিতামহ বিম-তাত্তু((নিকোলাস সিমস্ উইলিয়ামসের মতে) / সদ(ণ (বি.এন. মুখার্জ্জীর মতে), পিতা বিম-কদফিসেস এর পূর্ণাবয়ব মূর্তি এবং নিজের মূর্তি নির্মাণের কথা বলেছেন। পাশাপাশি কনিষ্ক, স্বয়ং দেবী ননার কাছ থেকে রাজ্যপ্রাপ্তির দাবী করে নিজের সিংহাসনের বৈধতাকে দৃঢ়তর করেছেন এবং স্বয়ংবাগো (অর্থাৎ দেব) উপাধি গ্রহণ করেছেন। কনিষ্কের নিজেকে দেবতা ঘোষণার মাধ্যমে সম্রাট উপাসনার ধারণা প্রামণিত হয়।

দূভার্গ্যবশত জনবসতিপূর্ণ অঞ্চল হওয়ার রাবাতকে বিশেষ উৎখনন না হওয়ায় মন্দিরটি উদ্ধার হয়নি তবে অন্য যে দুটি পারিবারিক মন্দির পাওয়া গেছে। যথাত্র(মে মাঠ ও সুরকোটালে তার আলোকে সম্রাটোপাসনার ধারায় আলোকপাত করা সম্ভব হতে পারে।

মথুরার নিকটবর্তী মার্ট অঞ্চলে নাগাদ কুষাণদের প্রথম পারিবারিক মন্দিরটি আবিষ্কৃত হলেও এবং তার ওপর অনেকের গবেষনা করলেও, ১৯৪৮ সালে প্রথম Ugo Monneret de villard সম্রাট উপসানার তত্ত্বটি উপস্থাপন করেন। কুষাণদের বিভিন্ন লেখতে এই মন্দিরটিকে 'দেবকূল' বলা হয়েছে। সম্রাট হুবিষ্কের ২৪তম রাজ্যকালে প্রাপ্তএকটি লেখতে তিনি নিজেকে 'দেবপুত্র' শাহী হুবিষ্ক বলে বর্ণনা করেছেন। সম্রাটের পিতামহের অমলে নির্মীত বাগান, কুপ, ও জলাধার সংস্কারের কথা বলা হয়েছে। এখানে সিংহাসনে উপবিষ্ট একটি মস্তকহীন মূর্তি পাওয়া গেছে, সিংহাসনের দুপাশে দুটি সিংহ রয়েছে এবং অসমাপ্ত লেখ 'মহারাজ রাজতিরাজ দেবপুত্র কুষাণপুত্র' রয়েছে। গবেষকরা একে বিম-কদফিসেস মনে করেন। অপর একটি দন্ডায়মান মূর্তির লেখ থেকে তাকে কনিষ্ক বলে চিহ্নি(ত করা হয়েছে। এখানে কনিষ্কের পোশাক মধ্যএশিয় ধরণের। তৃতীয় মূর্তিটি-সম্ভবত চষ্টনের। এই মন্দির নির্মানকার্য তত্ত্বাবধান করছিলেন মহাদন্ডনায়ক বা সেনাপতি।

অন্যদিকে আফগানিস্থানের সুরকোটালে ১৯৫২ সালে যে কুষান পারিবারিক মন্দির পাওয়া যায় তার মধ্যে গ্রীক প্রভাবে সৃষ্ট মথুরার কণিষ্ক মূর্তির আদলে একটি মূর্তি এখানে পাওয়া গেছে তবে সুরকোটালের কনিষ্কের পোশাক মথুরার মধ্যে বিদেশী আদলে নয়। একটি লেখ থেকে জানা যায় হুবিষ্কের ৩১তম রাজবর্ষে এই মন্দিরে জল সঙ্কট দেখা দেয় এবং দেবতাদের এই স্থান থেকে সরিয়ে নিতে হয়। তখন করলাঙ্গ (সেনাপতি) নকুনষক এটি মেরামত করে একটি কূপ খনন করেন। এই মন্দিরটির ও নাম Bagolaggo (দেবালয়) সম্রাট গণের উপাধি হল Bogopouro বা দেবপুত্র।

তিনটি মন্দিরের সাধারণ সাদৃশ্য বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় মন্দির গুলি দেবকুল বা Bagolango নামে পরিচিত এবং সম্রাটগণ নিজেদের দেবপুত্র, দেবমনুষ এবং কণিষ্ক একধাপ এগিয়ে বাগো (দেব) উপাধি গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক মন্দিরে স্থানীয়দের দেবদেবীদের স্থান ছিল। এছাড়া মন্দির নির্মাণের প্রধান কাজ করতেন সেনাপতি বা করলাঙ্গ । সফরা ও নকুনসকের নাম এপ্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

এই মন্দিরগুলির চরিত্র বিশ্লেষণ করলে সম্রাট উপাসনার রীতির প্রমাণ পাওয়া যায়। কুষাণ সম্রাটগণ দেবপুত্র উপধি গ্রহণ করতেন। কনিষ্ক কর্তৃক দেব উপধি গ্রহণ তাঁর পূজনীয় চরিত্রের প্রমানদেয়, সে(ত্রে তিনি ও তাঁর পারিবারের সদস্যগণ পূজিত হওয়া স্বাভাবিক বিষয় । Roenfield দেখিয়েছে মাঠ মন্দিরে দেবগণ ও রাজাগন একত্রে থাকলেও রাজাগণ বিশেষ প্রাধাণ্য লাভ করেছেন। মূলত, নিজেদের দেবতা বা দেবপুত্র হবার যে দাবী সম্রাটরা করেছেন, তারই বৈধতা দিতে এই মন্দির ও মূর্তি নির্মান হয়েছিল। অধ্যাপক বি.এন. মুখার্জ্জী মনেকরেন এই মন্দির গুলিতে কুষাণ সম্রাটগন তাদের জীবৎকালে এবং মৃত্যুর পর ও উপাসিত হতেন।

কেউ কেউ তাসের 'প্রতিমা' নটকের উদাহরণ দিয়ে এই মন্দিরগুলিকে প্রতিমাগৃহ বলেছেন। তবে ভাসের বর্ণনা বা সাতবাহনদের প্রতিমাঘরের সঙ্গে কুষাণ পারিবারিক মন্দিরগুলি এক করা ঠিক নয়। কারণ ভাসের নাটকে যে প্রতিমাগৃহের বিবরণ পাওয়া যায় তাতে কেবল পরলোকস্থ সম্রাটগণেরই মূর্তি বিরাজিত হত, কিন্তু কুষাণ রাজাদের এই

মন্দিরে মৃত পূর্বপুরুষদের পাশাপাশি তৎকালীন শাসকের মূর্তিও থাকত। ইহা রাবাতক লেখতে স্পষ্ট হয়েছে। সাতবাহনদের প্রতিমাঘরে কোন দেবদেবী মূর্তি থাকত না কিন্তু কুষাণদের (ে ত্রে দেবগণ ও রাজাগণ একসঙ্গে থাকতেন যা তাদের সমতা নির্দেশ করে। বি.এন.মুখার্জ্জী মনে করেন সম্ভবত রোম, চীন ও আর্মানিয় সাম্রাজ্যের রীতি এ(ে ত্রে কুষাণদের প্রভাবিত করেছিল।

সম্রাট উপাসনার রীতিযে জনগণের মধ্যে সম্রাটের বৈধতাপ্রদানের রীতি ছিল তা বোঝা যায় দুটি ভিন্ন অঞ্চল প্রাপ্ত কনিষ্কমূর্তি পোশাক দেখে। মথুরার মূর্তিটি যেখানে মধ্য এশিয় ধরণের পোশাক পরিহিত সেখানে সুরকোটালে কনিষ্কের পরণে স্থানীয় আফগানদের মতো সালোয়ার। কারণ মথুরায় কুষাণদের কর্তৃত্বে প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন ছিল। অন্যদিকে কনিষ্কের আমলের বহুপূর্বেই আফগানিস্থান কুষানদের হস্তাগত হয়, তাই সেই অঞ্চলের মানুষদের সঙ্গে তারা একাত্ম হয়ে গিয়েছিল, তাদের ওপর আলাদা করে কর্তৃত্ব বা উপস্থিতি জাহির করার প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। পাশাপাশি স্থানীয় দেবদেবীদের উত্ত(মন্দির স্থান দিয়ে তারা স্থানীয় জনগণের কাছে বি(াসভাজন হবার চেষ্টা করেছিল। পাশাপাশি উত্তরপশ্চিম থেকে পূর্বপ্রান্ত সব স্থানে পারিবারিক মন্দির স্থাপন মাধ্যমে সাম্রাজের মধ্যে একধরণের একতা গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন।

পাশাপাশি কুষাণ মুদ্রাতেও রাজাকে দেবতুল্য করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কুষাণ আমলে রোমান মুদ্রার প্রভাবে কুষাণরা স্বর্ণমুদ্রা প্রচলন করেন, সেই সময় রোমে অগাষ্ঠাস জীবন্তদেবতা রূপে পূজিত হতেন, কুষানরা এই বৈষয়ে অবগত ছিলেন। বিম-কদফিসেসের বিভিন্ন মুদ্রায় তিনি মেঘের মধ্যে থেকে উদিত হচ্ছেন বা তার মুখের পশ্চাত্তে আগুন বা মেঘের উপস্থিতি কুষাণ শাসকদের অতিমানবীয় সত্ত্বার পরিচয় বহন করে।

কুষাণ শাসকরা কেবল দেব তুল্য সম্রাটদের বন্দনা করেই (া ন্ত হয়নি। তারা তাদের সাম্রাজ্যকেও তুলে ধরতে চেয়েছেন। কনিষ্কও হুবিষ্কের মুদ্রায় 'ফারো' ইরানীয়দের গৌরবময় (glorykhvaraeno) সাম্রাজ্য এর সঙ্গে তুলনীয় এবং তা রাজাদের বৈধতার প্রতীক। হুবিষ্কের মুদ্রায় অঙ্কিত 'শাওরেরো' কে পরবর্তী প(বী 'শারেবার' এর সঙ্গে তুলনা করা যায়। যার অর্থ হল আকাঙ্খিত সাম্রাজ্য। কুষাণ মুদ্রায় রোমান সেনাদের মতো পোশাক পরিহিত এবং বর্শাও ঢাল সমন্বিত অবস্থায় শাওরেরোর যে প্রতিকৃতি পাওয়া যায় ঐতিহাসিকরা তাকে কুষাণ সাম্রাজ্যের মানবীকরণ বলেছেন। আবার রাবাতক লেখতে আজরমাজদার পরে উল্লিখিত মোজডোয়ানো কে কুষাণ মুদ্রায় দেখানো হয়েছে কুষাণ বস্ত্র পরিহিত, দাড়িও মাথায় রাজকীয় ফিতে যুত্ত(অবস্থায়। তিনি একটি দুমুখো ঘোড়ায় আরোহন করে আছেন। এইরূপ অতিপ্রকৃত ঘোড়ায় আরোহন করা কুষাণ প্রতিকৃতির প্রকৃত অর্থ ছিল, 'মহান বিজেতা'। ইহা কুষাণ সাম্রাজ্যের সামরিক শত্তি(র মানবীকরণ ছিল।

রাজাদের মূর্তি স্থাপন, ও সেই মূতি উপাসনার মাধ্যমে সম্রাট উপাসনার প্রচলনের সাথে সাথে, জনমানসে রাজার প্রতি এই সহানুভূতি, ধার্মিক ও দেশ প্রেমমূলক ধারণার সৃষ্টি করে। সাম্রাজ্যের সদস্যদের মধ্যে একধরণের ঐক্যের বাতাবরণ তৈরী করা যায়। এই সময়ে প্রজাদের দান লেখ পাওয়া যায়, রাজার পুণ্যের জন্য। এইভাবে সাম্রাজ্য শাসক শাসিত উভয়ের কাছেই সমান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। প্রাপ্ত প্রমাণাদি থেকে মনেকরা হয় কুষাণ সম্রাটগণ তাদের নিজেদের উপাসনার পাশাপাশি সাম্রাজ্য কেও দেবতা জ্ঞানে উ পাসনা করার রীতিকে পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। কুষাণ সম্রাটের একটি বিশাল সাম্রাজ্যে বিস্তার করেনও সামরিকশত্তি(বলে সাম্রাজ্যকে টিকিয়ে রেখেছিলেন। তাই কুষাণ সম্রাটদের শাসননীতির অন্যতম ছিল একাধারে যেমন তাদের প্রজাবর্গকে সাম্রাজের বিপুল সামরিক শত্তি(র কাছে ভীত করা তেমনি রাজার দৈব (মতার ওপর আস্থা রেখে সম্রাটদের দেবতাজ্ঞানে উপাসনা করে সম্রাট ও সাম্রাজ্যের সঙ্গে একাত্মবোধ করাতে চেয়েছিলেন। কুষাণ সাম্রাজ্যে ছিল বিস্তীর্ণ এলাকাজুড়ে, বিভিন্ন জাতি, ধর্ম বর্ণের মানুষের সমাবেশ এত বড়সাম্রাজ্য শুধু মাত্র সামরিক শত্তি(র জোরে ধরে রাখা সম্ভবপর নয় বলে কুষাণরা তাদের সাম্রাজ্যকে এভাবে বৈধতা দানের চেষ্টা করেন।

কুষাণ সাম্রাজ্যের সঙ্গে রোম, মিশর, চীন প্রভৃতি দেশের যোগাযোগছিল, সেই সূত্রে এই সূত্রে সমস্ত অঞ্চলের সম্রাট উপাসনার ধারার সঙ্গে তারা পরিচিত হয়েছিল। কুষাণদের পশ্চিম সাম্রাজ্যেও ওইরূপ পারিবারিক মন্দিরের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে ভারতবর্ষের ে(ত্রে প্রজাবর্গের চিন্তায় ও চেতনায় দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ও বৈধতা অর্জনের জন্য কুষাণদের প্রবর্তিত এইরূপ সম্রাট ও সাম্রাজ্য উপাসনার রীতি উপমহাদেশের সাপে(অভিনব। এইভাবে কুষাণদের রাজতান্ত্রিক আদর্শ বা রাজতন্ত্রের প্রকৃতি সম্পর্কে ও সম্যক ধারণা করা যায়।

৯.৫.১৪.৪ উপসংহার ঃ—

বর্তমান পর্যায়ে আমরা বিদেশী উপাদান রূপে শক, পার্থীয়, ইন্দোগ্রীক কুষান শক্তি(দের বিস্তার নিয়ে আলোচনা করলে ও আমরা দেখতে পাই এই সমস্ত উপাদানগুলি কিন্তু ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত(হয়ে পড়েছিল এদের বিভিন্ন আচার-সংস্কৃতি যেমন ভারতীয় সংস্কৃতির অংশ হয়ে পড়ে, তেমনি এদের উপস্থিতি ল(্য করা যেতে পারে ভারতীয় সমাজের গুরুত্বপূর্ণ অংশরূপে। বিদেশী উপাদানকে গ্রহণে ভারতীয়দের ভূমিকা এবং এই শক্তি(দের ভারতবর্ষে একাত্ম হবার প্রবণতা এ(ত্রে ল(্যনীয়।

৯.৫.১৪.৫ সহায়ক গ্রন্থবলী ঃ—

(1) Exploring Early India - Ranabir Chakraborty.

(2) Early India - Romila Thapar

(3) Rise and Fall of the Kushana Empire - B. N. Mukherjee

(4) The Indo-Greeks - A. K. Narain

(5) India and the Hellenistic World - K. Karturen

(6) Political History of Ancient India - H. C. Roychowdhuri

৯.৫.১৪.৬ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ঃ—

(1) Who are the Indo-Greeks? Describe the political activities of Indo-Greek rulers?

(2) What was the India attitude towards the Indo-Greeks?

(3) Describe the saka-satvahana battle.

(4) How far the Emperor Worship defined the polity of Kushana empire?

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ—

Exploring Early India-Ranabir Chakraborty

পর্যায়-৬
প্রাচীন ভারতে নারীদের পরিবর্তনশীল অবস্থান
Changing status of Women in ancient India
একক — ১৫ ও ১৬

৯.৫.১২.০ — উদ্দেশ্য
৯.৫.১২.১— গৃহস্থ নারীদের অবস্থান (Unit -15)
৯.৬.১৫.১.১ — কন্যাদের অবস্থান
৯.৬.১৫.১.২ —বিবাহ সংত্র(াস্ত বিধি নিয়ম
৯.৬.১৫.১.৩— স্ত্রীদের সামাজিক অবস্থান

৯.৬.১৬.২ — গৃহস্থালি বর্হিভূত (্ত্রে নারীদের অবস্থান (Unit -16)
৯.৬.১৬.২.১ — বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনে নারী
৯.৬.১৬.২.২ —আধ্যাত্মিক জগতে নারীর অধিকার
৯.৬.১৬.১.৩— দেবী রূপে নারী

৯.৬.১৬.৩ — সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

৯.৬.১৬.৪ — সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ঃ

৯.৬.১৫.০ — উদ্দেশ্য ঃ বর্তমান পর্যায়টি পাঠের মাধ্যমে ছাত্রছাত্রীরা প্রাচীন ভারতীয় সমাজের মধ্যে নারীদের ত্র(ম পরিবর্তনশীল অবস্থান সম্পর্কে অবহিত হবে। প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে ধারণা করতে মূলত ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্র এবং লেখমালা ব্যবহৃত হয়। ধর্মীয়শাস্ত্রের সঙ্গে কাব্য সাহিত্যের সম্যক ব্যবহার কিন্তু আমাদের সমাজ সম্পর্কে সম্যকধারণা দিতে এবং নিরপে(দৃষ্টিভঙ্গি তৈরী করতে সহায়ক হয়। এই প্রসঙ্গে একটা ধারণা স্মরণে রাখা উচিত যে, শাস্ত্রীয় বিধানগুলি একটি আদর্শ সমাজের কাম্যরূপ প্রতিফলিত করে তাই নারীদের আদর্শ আচরণ বা অবস্থান এই শাস্ত্রবচনে নির্নীত হয়। তবে এই আদেশ মূলত উচ্চশ্রেণীর মধ্যে প্রযোজ্য তাই সমাজের সর্বস্তরের নারীদের মধ্যে তার কি প্রভাবে সেটাও আমাদের আলোচ্য হবে এই পর্যায়ে।

৯.৬.১৫.১ — গৃহস্থ নারীদের অবস্থান ঃ—

যে কোন সমাজের ইতিহাস চর্চার (্ত্রে সেই সমাজের চরিত্র নির্ণয় তখনই সম্ভব পর হয় যখন সেই সমাজের নারীদের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। ভারতীয় সমাজের (্ত্রে বলা যায়, বি্বের অন্যান্য অধিকাংশ প্রাচীন সভ্যতার ন্যায় এই সমাজও ছিল পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal)। তা সত্ত্বেও এই সমাজের নারীদের উল্লেখযোগ্য অবস্থান ল(্যনীয়। যেহেতু সমাজের নিম্নতম তথা (ু্দ্রতম একক হল পরিবার (Family), যেখানে অপরিহার্য রূপে নারীদের তথা কন্যাদের একটি নির্দিষ্ট স্থান ছিল। পাশাপাশি, সামাজিক পরিস্থিতি যেহেতু পরিবর্তনশীল, তাই পরিবর্তনের সঙ্গে পরিবার তথা

সমাজে নারীর অবস্থাণের পরিবর্তন ল(্যনীয়। এই প্রসঙ্গে বিভিন্ন সাহিত্যিক সূত্রে নারীদের পরিবর্তনশীল অবস্থান আমরা ল(্য করতে পারি। এই প্রসঙ্গে কন্যাদের এবং স্ত্রীদের অবস্থান আলোচ্য।

৯.৬.১৫.১.১. — কন্যাদের অবস্থান ঃ—

হরপ্পীয় সভ্যতার নির্ভরযোগ্য পাঠোদ্ধার না হওয়ায় আমরা হরপ্পীয় সমাজ সম্পর্কে নিশ্চিতভাবে কিছু সিদ্ধান্ত গ্রহণে অ(ম, তবে বিভিন্ন হরপ্পীয় প্রত্ন(ত্র থেকে প্রাপ্ত ভাস্কর্য্য এবং সীল, এ সমাজের উর্বরতা তথা নারীশক্তি(গুরুত্বের ইঙ্গিত দেয়। তবে, সমাজে কন্যাদের অবস্থান সর্বপ্রথম স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় বৈদিক সাহিত্য থেকে।

বৈদিক সাহিত্যে সাধারণভাবে পুত্রসন্তানের জন্য কামনা করা হয়েছে। কন্যাসন্তানকে অবহেলা না করলেও কন্যা কামনায় প্রার্থনার নিদর্শন মেলে না। সম্ভবত যুদ্ধরত বৈদিক উপজাতিদের যুদ্ধে সহায়তা লাভে জন্যই তারা পুত্রসন্তানের প্রতি আগ্রহী ছিল। ঋগ্বেদে যদিও পুত্র ও কন্যা পাশাপাশি বেড়ে ওঠার কথা বলা হয়েছে, যেখানে পুত্র পায় পিতার পেশা ও ধর্ম এবং কন্যা পায় মাতার গৌরব ও মর্যাদা। সম্ভবত, মাতৃত্বের জন্যই কন্যাকে এই মর্যাদা দেওয়া হয়। বৃহদারণ্যক উপনিষদে জ্ঞানী কন্যা লাভের জন্য বিশেষ অনুষ্ঠানের কথা বলা হয়েছে। আবার অন্যদিক অথর্ববেদ মনে করে আসুরিক শক্তি(রা পুত্রগর্ভকে কন্যাগর্ভে রূপান্তর করে, এবং তাদের দূর করার মন্ত্র প্রয়োগের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

মহাকাব্যিক সাহিত্যেও ভারতীয় সমাজ বিশেষত কন্যাদের অবস্থান সংত্র(ান্ত চিত্র পাওয়া যায়। যদিও মহাকাব্যগুলি কোন নির্দিষ্ট সময়ে, একজন ব্যক্তি(দ্বারা রচিত হয়নি। মহাভারত (আনুঃ 4th Century BCE - 4th Century CE) এবং রামায়ণ আনুঃ 2nd Century BCE - 2nd Century CE এর মধ্যে রচিত। তাসত্ত্বেও এই মহাকাব্যগুলি নারী চরিত্রকে যথেষ্ট গুরুত্ব প্রদান করে। মহাকাব্যের মধ্যে কন্যাদের অবস্থানকে কেন্দ্র করে ভিন্ন মতের অবতারণা আমরা দেখতে পাই। একটি অংশে মহাভারত এবং ঐতরেয় ব্রাহ্মণ একসুর কন্যাদের সকল কষ্টের কারণ বল উল্লেখ করেছে। এখানে পুত্রদের সংসারে আশার আলো বলা হয়েছে। কন্যাভ্রূণ হত্যার প্রত্য(প্রমাণ মহাকাব্যে পাওয়া না গেলেও সীতা বা শকুন্তলার কাহিনীতে কন্যাসন্তান পরিত্যাগের নিদর্শন মেলে। আবার, গান্ধারীকে দেখা যায়, শতপুত্রের পরও কন্যাপ্রাপ্তির প্রার্থনা করতে। এইভাবে আমরা মহাকাব্যে ভিন্নমতের মেলবন্ধন দেখতে পাই।

সময়ের সঙ্গে কন্যাসন্তানের জন্মই অশুভরূপে চিহ্নি(ত হয়। যদিও যাজ্ঞবল্ক্য 'সন্ততি' শব্দটি ব্যবহার করেছেন, যা উভয়লিঙ্গের শিশুর (ে ত্রে প্রযোগ্য। তাসত্ত্বেও মনুস্মৃতি এবং যাজ্ঞবল্ক্য স্মৃতি 'পুংসবন' (Pumsavana Samskar) করার করা বলে, যাতে পুত্র সন্তান কামনা করা হয়। তবে, মনু কখনোই কন্যা সন্তানকে হেয় করতে নির্দেশ দেননি। বরং পুত্রদের মতই গুরুত্ব দিয়ে লালন পালনের নির্দেশ দিয়েছিলেন। কন্যাদের মানসিক গঠন যে অপে(াকৃত কোমল। তা তিনি এবং মেধা তিথি সমর্থন করেছেন। পৌরানিকযুগে কন্যা সন্তানকে আরও হেয় প্রতিপন্ন করা হল। মার্কন্ডেয় পুরাণ যা কিনা দেবী উপাসনার জন্য জনপ্রিয়, কন্যাসন্তানকে দুঃখ ও দুদর্শার অগ্রদূত বলে অভিহিত করেছেন। ব্রহ্মান্ড পুরাণের মতে পরাজিত রাজার কন্যা থাকলে, সেই কন্যাকে জয়ী রাজা বা রাজপুত্রের সাথে বিবাহ দিতে বাধ্য করা হয়। তাই কন্যা অনেকটাই পিছুটান ও বিপদের কারণ বলে তাদের অভিমত। এ A. S. Altekar মনে করে পরিবর্তিত পরিস্থিতি পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে কন্যাদের মর্যাদার অবনতি হয়েছিল।

কন্যাদের শি(া ঃ—

প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়শতক সময়কাল পর্যন্ত ভারতীয় সমাজে কন্যারা বিভিন্ন বৈদিক শি(ায় আত্মনিযোগ করতেন। অথর্ববেদের মতে, কন্যা বিবাহিত জীবনে সাফল্য তার ব্রহ্মচর্য্য অবস্থায় জ্ঞান অর্জণের সঙ্গে সম্পর্কিত। কন্যারা বা ছাত্রীরা বৈদিকযুগে দুটি ভাগে বিভক্ত(থাকতেন। যথা - ব্রহ্মবাদিনী এবং সদ্যবধূ। (Brahmavadini and Sadyovadhus) ব্রহ্মবাদিনীরা আজীবন অবিবাহিত থেকে বেদ অধ্যায়ন করতেন। এবং সদ্যবধূরা বিবাহের পূর্বপর্যন্ত বেদ অধ্যয়ণ করতেন। ঋগ্বেদ ও

উপনিষদে উভয়প্রকার বিদুষীদের উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের মতে, পরবর্তী ব্রাহ্মণ্যসাহিত্যের কালে ব্রহ্মচারিণীদের সংখ্যা নগণ্য। এছাড়া বলা যায় খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়শতক অবধি কন্যারাও উপনয়ন গ্রহণের অধিকারিনী ছিলেন। অবিবাহিত কন্যারা বৈদিক যজ্ঞে আহুতি দিতেও পারতেন। বিশ্ববারা এবং অপালার মতো নারীরা একা যজ্ঞ সম্পাদন করেছিলন। এদের মধ্যে অপালা নিজের চর্মরোগ, পিতার কেশজনিত সমস্যা (Hair disease) এবং পিতার সার্বিক উন্নতির প্রার্থনা করেছেন। অর্থাৎ কন্যা শি(তা হয়ে পিতার অবলম্বন হয়ে উঠতে পারতেন। বৃহদারণ্যক উপনিষদ বিদুষী গার্গী বাচ্‌কুবীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়েছেন। ঋষি যাজ্ঞবল্ক্য কৌষীতকী ব্রাহ্মণ (Kausitaki Brahmana) অনুরূপভাবে জ্ঞানী নারীদের কথা উল্লেখ করেন।

পাশাপাশি বলা যায় কেবল উচ্চশ্রেনীর নারীরা জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তা কিন্তু নয়। বাল্মিকী রামায়ণে ঋষি মাতঙ্গের শিষ্যারূপে নিম্নবর্ণীয়া শবরীর (Sabari) উল্লেখ করা যেতে পারে। মহাভারতে সুলভা, শিবা, সিদ্ধা প্রমুখ কুমারী তপস্বিনীর কথা জানা যায়। অন্যদিকে মহাকাব্যের নায়িকা রূপে কৈকেয়ী, কৌশল্যা, সুমিত্রা, সীতা, দ্রৌপদী, সুভদ্রা প্রমুখ নারী চরিত্র কিন্তু যথেষ্ট বিদুষী এবং জ্ঞানী রূপেই উপস্থাপিতা হয়েছেন। তাদের স্বামীদের ছাপিয়ে গেছেন গুরুত্বে। যা নারীদের শি(ার অধিকার থাকারই প্রমাণ।

ত্র(মশ ব্রাহ্মণ্য ও পৌরাণিক সাহিত্য রচনার সময়কালে নারীদের অবস্থার ভয়ানক অবনতি হয়। খ্রী পূর্ব ২০০ থেকে খ্রীষ্টীয় ২০০ অব্দ অবধি সময়কালে কন্যাদের শি(ার অধিকার সংকুচিত হয়। আনুমানিক 200AD নাগাদ যাজ্ঞবল্ক্য (Yajnavalkya) স্ত্রীলোকের উপনয়ন নিষিদ্ধ করেন। পুরাণ সমূহ ইহা সমর্থন করেন। পাশাপাশি নারীদের বাধ্যতামূলক বিবাহের বিধান দেওয়া হয়। মনু বিবাহকেই নারীর উপনয়নের সমতুল মনে করেন। আবার ধর্মশাস্ত্রে এরূপ বিধান থাকলেও জনপ্রিয় মহাকাব্য যেমন — কালিদাসের মালবিকাগ্নিমিত্রম্, অভিজ্ঞান শকুন্তলম্ এর নায়িকা কিন্তু গুপ্তযুগেও যথেষ্ট শি(তা।

এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভাল যে বৌদ্ধ এবং জৈন দর্শনে ও নারী শি(ার প্রতিগুরুত্ব আরোপিত হয়। থেরীগাথার রচয়িতাদের মধ্যে দশজন বিবাহিতা ও বত্রিশজন অবিবাহিতা থেরীর উল্লেখ মেলে। ব্রহ্মবাদিনীদের বৌদ্ধ পালিভাষায় মোল্লীবদ্ধপরিব্রাজিকা (Molibaddha Paribbajika) বলা হত। জৈনদের মধ্যেও এই রূপ শি(তা নারীদের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এইভাবে সময়ের সাথে প্রাচীন ভারতে নারী শি(ার সংকোচন হয়।

৯.৬.১৫.১.২. — বিবাহ সংত্র(ান্ত বিধি নিয়ম

বৈদিক যুগ থেকে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটি সামাজিকভাবে স্বীকৃত। বৈদিক স্তোত্রে সুখী দাম্পত্য জীবন কামনা করা হয়েছে। বিবাহকে একটি সামাজিক এবং ধর্মীয় জ্ঞান করা হত। বিবাহিতদের, অবিবাহিতদের তুলনায় বেশি গুরুত্ব দেওয়া হলেও বিবাহ বাধ্যতামূলক ছিল না। বৈদিকসাহিত্যে অবিবাহিত নারীদের উল্লেখ পূর্বেই করা হয়েছে। এখানে বলা ভাল যে, এই বাধ্যতামূলক বিবাহের ব্যবস্থা নারীদের ওপরই কঠোরভাবে লাগু হয়। মহাভারতের মধ্যে বিভিন্ন কাহিনীর মাধ্যমে নারীদের বিবাহের বাধ্যতামূলকতা আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়। মহাভারতের কাহিনী অনুসারে ঋষি দীর্ঘতমা (Dirghatama) আদেশ দেন যে নারীদের কখনোই ভবিষ্যতে অবিবাহিত থাকা চলবে না। পাশাপাশি, দেখা যায় বিভিন্ন ব্রহ্মবাদিনী নারীদের কাহিনী, যেখানে বিবাহ না করার অপরাধে তাদের স্বর্গে প্রবেশ অধিকার দেওয়া হয়নি। সুভ্রু (Subhru), যিনি কুণীগর্গ (Kunigarg) ঋষিরকন্যা ছিলেন, তাকে মৃত্যুর পূর্বে বিবাহ করতে হয়, স্বর্গলাভের জন্য, আবার অনেক সুত্র অনুসারে অবিবাহিত নারীর মৃতদেহকে ও সৎকারের পূর্বে বিবাহদান করণীয়। রামায়ণে একজন জ্ঞানী রাজা হওয়া সত্ত্বেও সীতার বয়ঃবৃদ্ধির সাথে, কন্যার বিবাহ নিয়ে জনকের উদ্বেগ দেখা যায়। সেখানে রাজা অপে(া একজন কন্যার পিতারূপে তার ভূমিকা পরিস্ফূট হতে দেখি।

ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে যদিও পুরুষদের বিবাহের কথাও গুরুত্ব দিয়ে বলা হয়েছে। এবং এও বলা হয়েছে স্ত্রীকে ছাড়া পুরুষ আধ্যাত্মিকভাবে সম্পূর্ণ নয়, তাও আমরা বিভিন্ন ৎে্রে অবিবাহিত সন্তদের দেখতে পাই। কিন্তু নারীদের ৎে্রে ইহা কঠোরভাবে বলবৎ করার প্রচেষ্টা হয়। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য দেখিয়েছেন, পুরুষদের জন্য বিবাহ কেবল বংশর(া কিন্তু পারলৌকিক সুখ-শান্তির বাধা নয়। কিন্তু নারীর ৎে্রে বিবাহ ইহলৌকিক ও পারলৌকিক মুক্তি(র একমাত্র পথ।

বাধ্যতামূলক বিবাহের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রাসঙ্গিক হয়ে দাঁড়ায় বিবাহের বয়স সংত্র(ান্ত বিধি নিয়ম। মহাভারত অনুসারে বিবাহের সময় কন্যার ন্যূনতম ষোড়শ (১৬) বছর বয়স হওয়া বাঞ্ছনীয়। রামায়ণ এই প্রসঙ্গে দুটি ভিন্ন মত পোষণ করে। অরণ্যকান্ড অনুসারে, সীতার বাল্যাবস্থায় রামের সঙ্গে তার বিবাহ হয়। আবার বালকান্ড অনুসারে, সীতা বিবাহের সময় পূর্ণ বয়স্কা ছিলেন। ধর্মসূত্র অনুসারে, নারীদের দ্রুতবিবাহ দান করা বাঞ্ছনীয়। মনুস্মৃতি (C.200 BCE) অনুসারে যোগ্য পাত্র পাওয়া গেলে উপযুক্ত(বয়স না হলেও কন্যার বিবাহ প্রদান করা উচিত, অন্যদিকে যদি যোগ্যপাত্র না পাওয়া যায়, তাহলে কেবল বয়ঃ বৃদ্ধি কারণে কখনোই যেন অযোগ্য পাত্রের সাথে বিবাহ না দেওয়া হয়। পরিণত বয়স্ক হবার তিন বৎসরের মধ্যে পিতা কন্যার বিবাহ দিতে অসমর্থ হলে কন্যা নিজের পছন্দমত বিবাহ করলে কোন শাস্ত্রীয় দোষ হবে না। মনুর মতে নারী কেবল সন্তান ধারনের জন্যই সৃষ্টি হয়েছেন। বৌধায়ণের মতে অপরিণত অবস্থায় কন্যাকে সুপাত্র পাত্রস্থ করার চেষ্টা করা যেতে পারে, কিন্তু পরিণত বয়স প্রাপ্ত হলে গুণাগুন বিচার না করে, দ্রুত বিবাহ সম্পন্ন করাই বিধেয়। বশিষ্ঠ, পরাশর প্রমুখ শাস্ত্রকারদের মতে, পরিণত বয়স্কা কন্যার বিবাহ না হলে তার পিতা, মাতাও জ্যেষ্ঠভ্রাতৃবর্গ প্রতিমাসে ভ্রূণ হত্যা জনিত পাপে দুষ্ট হন। তাই কন্যার বিবাহ দান তাঁর পাত্রের যোগ্যত্য অপে(া অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ।

স্মৃতিশাস্ত্র (Smrti) রচনার সময় (500-1000CE) বিভিন্ন বয়সের কন্যাদের তালিকা প্রদান করা হয়। অষ্টম বর্ষীয়া কন্যার নাম গৌরী (Gouri), নয়বর্ষীয়া কন্যা রোহিনী (Rohini), দশম বর্ষীয়া কন্যার নাম Kanya রূপে চিহ্নি(ত হয়। দশমবর্ষের অধিক যেন কন্যাদের অবিবাহিত না রাখা হয়, সেই নির্দেশ দেওয়া হয়। এই অবস্থায় নারী তার জীবনের সবচেয়ে বড় সিদ্ধান্ত নেবার সময় মানসিকভাবে পরিণত হতেন না, এবং তাদের পিতার সিদ্ধান্ত অনুসারে বিবাহ করতে হত। খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকের পরবর্তী সংস্কৃত সাহিত্য কন্যাদের নিজপছন্দের জীবনসঙ্গী সন্ধানে নিষেধ করছে।

তবে একথা স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে ধর্মশাস্ত্রের বিধান মূলত উচ্চশ্রেণীর মানুষের জন্য প্রয়োজন ছিল। পাশাপাশি শাস্ত্রীয় বিধান একটি আদর্শ আচরণ বিধির মতো (Model code of conduct) যাতে আদর্শ সমাজের প্রতিফলন চিত্রিত আছে। কিন্তু সেটি পালিত না হলে কোন শাস্তির বিধান সেইভাবে পাওয়া যায় না। সে(ত্রে পরলোকের ভয় দেখানোই হয়েছে। তাই এই বিধানগুলি যে পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পালিত হয়েছে তা কিন্তু নাও হতে পারে। কালিদাসের মালবিকা, বা শকুন্তলা প্রত্যেকেই পরিণত বয়সে স্বীয় ইচ্ছায় স্বামী চয়ন করেছে। সে(ত্রে তাদের কোনরূপ বাধার সম্মুখীন হতে হয়নি। গান্ধর্ব বিবাহ ধর্মশাস্ত্রে নিন্দিত হলেও কালদাসের ধ্রুপদী কাব্যে তার ব্যবহার আমরা দেখতে পাই, তাই বলা যায় নারীদের বিবাহ সংত্র(ান্ত ধর্মীয় বিধি নিষেধ সময়ের সাথে কার্যকর হলেও তা কিছু সর্বত্র সমান ভাবে প্রচলিত ছিল না, আমরা এই প্রসঙ্গে আদিমধ্যযুগীয় বাংলা উপপুরাণ সমূহে কুমারী পূজার কথা উল্লেখ করতে পাই। যেখানে সর্ব্বোচ্চ ষোড়শ (১৬) বর্ষীয়া কন্যার পূজা করা যায়। অর্থাৎ ষোড়শ বর্ষ পর্যন্ত কন্যাকে অবিবাহিত রাখা সম্ভব ছিল। এইভাবে আমরা প্রাচীন ভারতে কন্যাদের পরিবর্তনশীল অবস্থান প্রত্য(করতে পারি।

৯.৬.১৫.১.৩ স্ত্রীদের অবস্থান ঃ—

ভারতীয় সমাজের পিতৃতান্ত্রিক স্বরূপ নিয়ে কোন দ্বিমত নেই, সেই সমাজে কন্যাদের অবস্থানের সঙ্গেই তাৎপর্য পূর্ণ হয়ে দাঁড়ায় বিবাহ পরবর্তী জীবনে তাদের অবস্থান। কন্যাদের বিবাহের বয়সের বিষয়টি পূর্বে অলোচিত হয়েছে। ঋগ্বৈদিক সময়ে কন্যারা নিজের পছন্দের স্বামী নির্বাচন করতে পারতেন। সবর্ণ-বিবাহের কঠোরতা ঋগ্বেদে ছিল না, কেবল আর্যবর্ণ

এবং দাসবর্ণের মধ্যে বিবাহের বাধা ছিল। ঋগৈদিক স্তোত্রে প্রার্থনা করা হয়েছে যে বিবাহিত স্ত্রী যেন পতিকূলে (ঞশুর, (ঞশ্রূমাতা, ননদ এবং দেবর সকলের কাছে সম্রাজ্ঞীর মতো সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন। স্ত্রীর মর্যাদা এই আর্শীবচনে পরিস্ফূট হয়। 'দম্পতি' শব্দে জায়া ও পতি এই দুই শব্দে সমাহার ল(্য করা যায়। তিনি স্বামীর সঙ্গে যজ্ঞে অংশ নিতে পারতেন। যেহেতু ধর্মীয় অনুষ্ঠানে স্বামীর সহকারিনী, তাই তাকে সহধর্মিনী বলা হয়েছে। আবার, স্বামীর মৃত্যু পর স্ত্রী স্বামীর আনুষ্ঠানিক চিতাশয্যায় শায়িত থাকতেন, তাকে দেবর সেখান থেকে নিয়ে আসতেন। এটি একটি আনুষ্ঠানিক আচার, যেখানে সতীপ্রথার বিপরীতে এবং সহমরণ নিবারণের কথাই বলা হয়েছে। আবার অপুত্রক বিধবার পুত্রলাভার্থে দেবরের সঙ্গে সহবাসের বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রত্রি(য়া 'নিয়োগ' নামে পরিচিত। মহাভারতে এই প্রত্রি(য়ার বিবরণ পাওয়া যায়। পাশাপাশি পুত্র সন্তানের মাতা হিসাবে স্ত্রীর প্রভূত মর্যাদা ছিল।

পরবর্তী বৈদিক যুগে নারী ত্র(মহ্রাসমান মর্যাদার সাথে স্ত্রীদের অবস্থান নিম্নমুখী হয়, স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনই স্ত্রীর আদর্শ হয়ে দাঁড়ায়। যজ্ঞে তার উপস্থিতি পরিলা(িত হলেও তার প্রত্য(ভূমিকা দেখা যায় না। যেহেতু বৈদিক শি(া থেকে তিনি বঞ্চিত তাই বেদপাঠে অসমর্থ। স্বামীর যাবতীয় জৈবিক ও বৈষয়িক চাহিদা পূরণই তার মুখ্যধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। স্বামীর আধিপত্য বিনাপ্রশ্নে মেনে নেওয়ার আদর্শ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে। পাশাপাশি পুরুষের বহুবিবাহ স্ত্রীর অধিকারের ওপর আঘাত হেনেছে। ঋগ্বেদে সম্রাজ্ঞী তুল্য স্ত্রী, এই যুগে (ঞশুরকে দেখে পলায়ন করেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে মাতার প্রতি গৌরব জনক উক্তি(রয়েছে, তবে সেগুলি সম্ভবত পুত্র সন্তানের জননী রূপেই। ঐতিহাসিক রণবীর চত্র(বর্তী দেখিয়েছেন, যে সমাজ কন্যার জন্ম দূর্দশার কারণ, সেখানে কন্যা সন্তানের মাতা-কখনোই-মর্যাদা পেতে পারেন না। বৈদিক শাস্ত্র মতে, যে স্ত্রী কেবল কন্যার জন্ম দেন তিনি দশবছরের মধ্যে পরিত্যাজ্য, যে মৃতবৎসার জন্ম দেন তিনি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে পরিত্যাজ্য, আর যিনি স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর দেন, তিনি তৎ(ণাৎ পরিত্যাজ্য, এই বিবরণ থেকে বোঝা যাচ্ছে, নারী বিশেষত, স্ত্রী ত্র(মশ পিতৃতান্ত্রিক সমাজের ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হচ্ছেন এবং তাকে পুত্র সন্তান উৎপাদক রূপেই চিহ্নি(ত করা হচ্ছে। বৌদ্ধ সংঘে প্রাথমিক পর্বে পর্বে না হলেও পরবর্তীকালে নারীকে সংঘে যোগদানের অনুমতি দেন। বিবাহ ব্যবস্থায় কন্যার পিতা তাঁর হবু জামাতা ও পরিবারকে বিবাহের জন্য নিয়ে আসতেন। একে আবাহ বিবাহ বলা হত। আবার সুত্র সাহিত্যে বিবাহই নারীর সর্বপ্রধান গতি। বিবাহিতা নারীর প্রধান কর্তব্য গৃহস্থালীর পরিচর্যা ও সন্তান ধারণ নারী শ্রদ্ধার স্থান নির্ধারিত হচ্ছে পুত্রবর্তী হবার শর্তে। অর্থাৎ ষোড়শ মহাজনপদের সময়ে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের দৃঢ় শৃঙ্খলা দেখতে পাই আমরা। মৌর্য সময়ে বিভিন্ন উপদান থেকে নারী সমাজের চিত্র ফুটে ওঠে। এলাহাবাদ - কোসাম (Allahabaad Kosam) থেকে প্রাপ্ত Queen Edict এ অশোকের দ্বিতীয় স্ত্রী কারুবাকী (Karuvaki) প্রদত্ত আম্রকাননের উল্লেখ আছে। যেখানে রানীকে তিবরমাতু (Tivara Matu) অর্থাৎ 'Mother of Tivara' বলে উল্লেখ করা হয়েছে, অর্থাৎ নারীর সামাজিক পরিচয় স্বামী বা পুত্রের নিরিখে দেওয়া হচ্ছে।

পরবর্তী কুষাণ-সাতবাহণ প্রভৃতি সময়কালে স্ত্রীদের অনেকটাই পুরুষ নিয়ন্ত্রেণে থাকতে দেখা যায়। যদিও সাতবাহনদের মধ্যে মাতৃপরিচয় এবং নারী শাসিকার অস্তিত্ব দৃশ্যমান। নারীর ত্র(মহ্রাসমান বিবাহের বয়স আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি। তবে ধর্মশাস্ত্রের আদর্শ কিন্তু মহাকাব্য বা সৃজনশীল সাহিত্যের সঙ্গে সাদৃশ্য পূর্ণ নয়। বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য পুত্রের জন্মদান এবং যাতে বংশ র(া হয় তা সুনিশ্চিত করা। মহাকাব্যের প্রাচীনতর অংশে দ্রৌপদীর চরিত্রে যে দৃঢ়তা ও মর্যাদা পরিলা(িত হয়, তা অন্যত্র অর্ন্তহিত। সুকুমারী ভট্টাচার্য্য দেখিয়েছেন, মাতার মতোই শ্রদ্ধেয়া জ্যেষ্ঠা ভগিনীর মতো পরিপালনীয়া দ্রৌপদীকে যুধিষ্ঠির পণ রাখছেন। আবার অনত্র আদর্শ স্ত্রী হিসাবে দ্রৌপদী পঞ্চস্বামীর চেয়ে অল্প আহার এবং বিশ্রাম করেন। (ঞশ্রূমাতার সঙ্গে বিবাদ করেন না, সর্বদা যন্ত্রবৎ পরিচালিত হয়ে সকলের অনুগত থাকেন। আসলে এই বিবরণের মাধ্যমে মহাভারতে প্র(িপ্ত অংশ একটি আর্দশ স্ত্রীর চরিত্র গড়ে তুলতে চেষ্টা করে দ্রৌপদীর মাধ্যমে। আবার অধ্যাপিকা ভট্টাচার্য্য দেখিয়েছেন, রামায়ণে সীতার অগ্নিপরী(ার প্রাক্কালে বন্দীদশাগ্রস্ত সীতা

রামের কাছে কুকুরে চাটা হবির মত অপবিত্র। এছাড়াও এই পরী(ার মূলকারণ, রামের সন্দেহ নয়, বরং জনশ্রুতি ও লোকপবাদ। অর্থাৎ আদর্শ পুরুষ রামের কাছে স্ত্রীকে পরিত্যাগের জন্য লোকাপবাদ যথেষ্ট কারণ ছিল।

এই প্রসঙ্গে বিবাহ ব্যবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিৎ অবগতি বাঞ্ছনীয়া। মনুসংহিতা সহ ধর্মশাস্ত্রে বিভিন্ন ধরণে বিবাহের বিবরণ পাওয়া যায় মুলত ব্রাহ্মণ বিবাহ পদ্ধতিতে ধর্মশাস্ত্রে আটধরণের বিবাহ তালিকা দেওয়া হয়েছে। যথা (১) ব্রাহ্ম (২) দৈব (৩) প্রাজাপত্য (৪) আর্য (৫) গান্ধর্ব (৬) আসুর (৭) রা(স ও (৮) পৈশাচ । এর মধ্যে প্রথম চারটি ব্রাহ্মণ্য মতে শ্রেষ্ঠা। এখানে পিতা কন্যার যজ্ঞাগ্নি সা(ী রেখে পাত্রের হাতে সম্প্রদান করে। এখানে 'সম্প্রদান' বা 'কন্যাদান' শব্দটির মধ্যে দিয়ে কন্যা দান সামগ্রী বা বস্তুতে পর্যবসিত। শব্দটির মধ্যে দিয়ে কন্যাকে দান সামগ্রী বা বস্তুতে পর্যবসিত করা হয়েছে। গান্ধর্ব বিবাহে পাত্র-পাত্রী নিজ পছন্দে বিবাহ করেন। এই বিবাহে অভিভাবকদের নিয়ন্ত্রণ গৌন, তাই স্বীকৃত হলেও আদর্শ নয়। আসুর বিবাহে অর্থের বিনিময়ে বিবাহ হয়, যেখানে পণপ্রথা স্বীকৃত। বলপূর্বক যুদ্ধ(েত্র থেকে নারীকে হরণ করে বিবাহ করলে তা রা(স বিবাহ, কিন্তু অনেক(েত্রেই এইহরণ পাত্রীর অনুমোদন সাপে(। সর্বাপে(া নিকৃষ্টতম বিবাহ হল পৈশাচ বিবাহ। সুপ্ত, মত্ত, চেতনাহীন নারীকে ভোগ করাই এই বিবাহের উদ্দেশ্য।

গুপ্তযুগে পত্নী ও মাতা হিসাবে নারীর প্রতি সম্মান ও নিন্দা উভয়ই পরিল(িত হয়। বাৎসায়ণের কামসূত্রে নাগরক এর জীবনের বিলাসবাসন এবং আমোদ প্রমোদ বিষয়ে যে বর্ণনা রয়েছে। নাগরকদের স্ত্রীর জীবন ততটাই সাদামাটা। ব্রাহ্মণ আদর্শ অনুযায়ী তিনি অন্তঃপুর চারিনী এবং অবগুণ্ঠনবতী। স্বামীর অনুপস্থিতিতে বসনভূষণে অতিশয্য না করে, স্বামীর কল্যাণে ব্রতাদি পালন করাই তার কর্তব্য। রোমিলা থাপার মহাভারতের শকুন্তলা ও কালিদাসের মধ্যে তুলনা করে দেখিয়েছেন মহাভারতের শকুন্তলা অনেক দৃপ্ত ও তেজস্বী নারী যিনি প্রকাশ্য রাজসভায় দুষ্মন্ত কর্তৃক প্রত্যাখাত হয়ে কেবলমাত্র স্বামীর প্রতি মিনতি জানাতে পারেন। বীরগাথামূলক মহাকাব্যের নারী হিসাবে শকুন্তলার চিত্রায়ণ, তার থেকে অতি পরিশীলিত রাজতান্ত্রিক পরিমন্ডলে একটি জটিল সমাজব্যবস্থার মধ্যে রচিত 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' এর শকুন্তলার ভিন্নতা ল(্যনীয় এবং এতে সময়ের সঙ্গে স্ত্রীর অধিকারে যে বিপুল বদল 'চলে , তা বোঝা যায়। 'অমরকোশ' (Amarkosh) এ বিধবাবিবাহের উল্লেখ পাওয়া যায়। এখানে তাঁরা পুনর্ভূ অর্থাৎ যিনি আবার বধূ হলেন। তবে তাঁদের কখনোই কূলবধূর মত মর্যাদা প্রদান করা হয়নি।

বস্তুতপ(স্ত্রী হিসাবে সম্মান ও মর্যাদা ত্র(মশ হ্রাসমান। বৈদিক উপজাতীয় সমাজ অপে(াকৃত সরল সমাজ ব্যবস্থায় নারীর মর্যাদা উচ্চতর ছিল। ত্র(মশ জটিলতর ব্যবস্থা সমমর্যাদা সম্পন্ন জায়া ও পতির, অধিকার ও মর্যাদার বৈষম্য দেখা গেল। স্ত্রীদের এই মর্যাদার হ্রাস কেবলমাত্র আদর্শভাব ছিল না। প্রকৃতপ(সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের মতে জটিলতর ব্যবস্থা কৌমভিত্তিক সম্পদের ধারণা ত্র(মশ ব্যক্তি(গত সম্পত্তিতে পরিণত হয়। এর ফলে সম্পত্তির উত্তরাধিকার গত বিষয়টিতে বিভিন্ন জটিল ধারণার উদ্ভব হয়। অর্জিত সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রাপ্তির জন্য পত্নীর ওপর নিয়ন্ত্রণ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। উৎপাদন ও পুণরুৎপাদন (Production and Reproduction System) ব্যবস্থা কে পিতৃতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণ আনা হয়। যাতে নিজের বংশকে র(া করা সম্ভব হয়। সেই পরিস্থিতিকে নারীকে উত্তরাধিকারীর জন্মদানকারিনীকে পর্যবসিত করার প্রবণতা ত্র(মশ ল(্য করা যেতে থাকে। যার জন্য শি(া থেকে সামজিক অধিকার সব (েত্রে নারীর অধিকার সংকুচিত হয়ে পড়ে, তবে ধর্মশাস্ত্রীয় বিধান যে সর্বত্র পালিত হয়েছিল তা নয়, আমরা গৃহস্থলী বর্হিভূত (েত্রেও বিভিন্ন নারীর সত্রি(য় ভূমিকা দেখতে পাই।

৯.৬.১৬.২ — গৃহস্থালী বর্হিভূত (েত্রে নারীদের অবস্থান (Unit -16)

ধর্মশাস্ত্রে গৃহস্থ নারীদের অবস্থান সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনা ও নির্দেশ দেওয়া হলেও আমরা পূর্বেই আলোচনা করেছি যে শাস্ত্রীয় ব্যাখা অনুসারে দেওয়া বিধান একটি আদর্শ সমাজের প্রতিভূ কিন্তু তা আ(রিক ভাবে মেনে চলা হত, এমন

মনে করার কোন কারণ নেই। তাই আমরা গৃহস্থালীর বাইরেও বেশ কিছু নিদর্শন পাই যেখানে নারীরা নিজেদের মত দায়িত্ব পালন করতেন। এর পাশাপাশি পৌরাণিক সময় থেকে আমরা দেখতে পাই, দেবীর উপাসনা গুরুত্বপূর্ণভাবে বৃদ্ধি পায়। তাই আমরা গৃহস্থালী বর্হিভূত ((ত্রে নারীদের অবস্থান আলোচনা করার সময় তিনটি প্রধান দিক নিয়ে আলোচনা করব। যথা — (১) বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বণে নারী (২) আধ্যাত্মিক জগতে নারীর অধিকার (৩) দেবী রূপে নারী।

৯.৬.১৬.২.১ — বিভিন্ন বৃত্তি বা পেশা অবলম্বনে নারী ঃ—

ঋগ্বৈদিক সময় কালে নারীর কেবলমাত্র গৃহে আবদ্ধ থাকতেন না। পূর্বেই ব্রহ্মবাদিনী ও সদ্যবধূরূপে বৈদিক শি(ায় তাদের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। এছাড়া দেখা যায়, অপালা, ঘোষা বি(বারা, সূর্য্যা প্রমুখ নারীরা বৈদিক সূক্ত(রচয়িতা রূপে সমাদৃত হয়েছেন। পাশাপাশি দেখা যায় ঋগ্বেদের নারীরা সভা ও সমিতির অধিবেশনে অংশ নেবার অধিকারী। এর সাথে সাথে যোদ্ধানারী হিসাবে বিশপলা, শশিয়সী, বধ্রিয়সী প্রমুখ নারীকে আমরা দেখতে পাই। কন্যাদের প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহৃত 'দুহিতা' শব্দটির অর্থ হল যিনি গোদোহন করেন। অর্থাৎ পশুপালন ভিত্তিক যাযাবর সমাজে গুরুত্বপূর্ণ গোসম্পদের সঙ্গে নারীদের একটা ওতপ্রোত যোগ ছিল। গৃহস্থালী বিভিন্ন কর্মে নিপুণ করে তোলার পাশাপাশি সঙ্গীত এবং নৃত্যকলাতেও তাদের পারদর্শী করে তোলার ব্যবস্থা করা হত। মহাভারতে ও বিভিন্ন শিল্পকর্মে নারীদের কুশলতা বর্ণিত হয়েছে। বৈদিক দেবী উষা (Usha) কে নর্তকী (Dancer) রূপে অভিহিত করা হয়েছে।

আমরা শাসিকা হিসাবে অনেক সময় নারীদের অংশগ্রহণ করতে দেখি। সাধারণত স্বামীর মৃত্যু হলে যদি পুত্র অর্থাৎ সিংহাসনের উত্তরাধিকারী নাবালক হতেন তবে 'রাজমাতা' হিসাবে নারীরা শাসনকার্য পরিচালনা করতেন। দা(ি ণাত্যে মহারাষ্ট্র অঞ্চলে এই প্রথা দীর্ঘসময় অনুসৃত হতে দেখি। সাতবাহন রাজাদের ((ত্রে মাতৃপরিচয়ে পরিচিতি পাবার নিদর্শন আমরা দেখতে পাই। সাতবাহনদের শ্রেষ্ঠরাজা গৌতমীপুত্র সাতকর্ণির মাতা গৌতমী বলশ্রীর নাসিক প্রশস্তি শাসিকা হিসাবে তাঁর কার্যকলাপ এবং তাঁর পুত্রের গৌরব বর্ণনা করে। এখানে মনে রাখতে হবে 'গৌতমী' (Goutami) তাঁর নাম নয়, বরং তার পিতৃবংশের গোত্র, অর্থাৎ তিনি গৌতম গোত্র জাত হয়েছিলেন, এমনকি নাসিক অঞ্চলে এক ব্রাহ্মণের নাম বারাহীপুত্র অ(ভূতি। আবার, শাসিকা হিসাবে গুপ্তযুগে আমরা নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা দেখতে পাই। যেখানে দেখা যায় লিচ্ছবিকন্যা কুমারদেবীর সাথে বিবাহের পর প্রথম চন্দ্রগুপ্ত তাঁর স্বর্ণমুদ্রায় সস্ত্রীক চিত্র উৎকীর্ণ করে, 'শ্রীচন্দ্রগুপ্ত শ্রী কুমারদেবী' এই লিপি উৎকীণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে বাকাটক বংশীয় শাসক দ্বিতীয় রুদ্রসেনের সঙ্গে গুপ্তসম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের কন্যা প্রভাবতী গুপ্তার বিবাহ হয়। রুদ্রসেন অকাল প্রয়াত হলে, তিনি নাবালক পুত্র দিবাকর সেন, দামোদর সেন ও প্রবর সেনের অভিভাবিকা রূপে প্রভাবতী বাকাটক শাসন ব্যবস্থায় প্রভাব বিস্তার করেন। আনুমানিক ৪০১/৪০২ খ্রীষ্টাব্দ থেকে অন্তত ৪১৪/৪১৫ খ্রীষ্টাব্দ অবধি প্রায় তেরোবছর শাসনের দায়িত্বে ছিলেন। প্রভাবতীগুপ্তার জারি করা তাম্র শাসনে গুপ্তদের বংশানুচরিত মর্যাদার সহিত বর্ণিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য ভাবে বাকটক লেখতে স্বয়ং দ্বিতীয় প্রবরসেনে উপাধি যখন 'মহারাজ' (Maharaj) তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত মহারাজধিরাজ অভিধা লাভ করেছেন। এই ঘটনাবলীকে অনেক ঐতিহাসিক রাজনৈতিক ঘটনারূপে চিহ্(ত করলেও এর সামাজিকে তাৎপর্য আমরা অস্বীকার করতে পারি না। বিশেষত একটি বিষয় খেয়াল রাখা দরকার, যেদি হল প্রভাবতী গুপ্তার গুপ্তপদবী (Gupta) ব্যবহারের বিষয়টি। বাকাটক শাসনের শীর্ষে অবস্থান করেও প্রভাবতী তাঁর পৈতৃক পদবী ব্যবহারের অভূত পূর্ব নিদর্শন রেখেছিলেন। পাশাপাশি, বাকাটক সাম্রাজ্যের অ(ুন্নতাকে তিনি (ুন্ন হতে দেননি। এইভাবে আমরা গৃহস্থালী ব্যতিরেকে শাসিকারূপে নারীদের অবস্থান জানা যায়।

এর পাশাপাশি আর একশ্রেণীর নারীদের উল্লেখ না করলে নারীদের সম্পর্কে আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, তারা হলেন গণিকা। গৌতম বুদ্ধের সময়ে আমরা বৈশালীর নগরনটী আম্রপালীর কথা জানতে পারি। বুদ্ধ কিন্তু সাদরে তাকে শিষ্যা হিসাবে স্বীকৃতি দেন এবং তাঁর প্রদত্ত দান গ্রহণ করেন। পরবর্তীকালেও গণিকারা সামাজিক গন্ডিতে

আবদ্ধ না থাকার কারণে জীবন চর্চায় অধিকতর স্বাতন্ত্র্য ভোগ করতেন। গণিকা কেবলমান দেহোপজীবিনী নন, তিনি ছিলেন শি(তা এবং ৬৪ কলায় পারদর্শিনী। গণিকাদের সামাজিক মর্যাদার সা(্যবহন করছে মথুরা থেকে প্রাপ্ত একটি লেখ। সেই লেখতে জৈন ধর্ম প্রতিষ্ঠানে উদ্দেশ্যে এক গণিকার দেওয়া বিবিধ দানের উল্লেখ পাওয়া যায় জৈন প্রতিষ্ঠানে তা কখনোই বাধা হয়ে দাড়ায়নি। শূদ্রকের 'মৃচ্ছকটিকম' নাটকে গণিকা বসন্ত সেনের সঙ্গে চারু দত্তের বিবাহ বর্ণিত হয়েছে।

এইভাবে আমরা দেখতে পাই কিভাবে বিভিন্ন (ে ত্রে গৃহস্থালী ব্যতিরেকে নারীরা বিভিন্ন (ে ত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, যা প্রাচীণ ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থানকে নির্দেশ করে।

৯.৬.১৬.২.২ — আধ্যাত্মিক জগতে নারীর অধিকার ঃ—

আমরা পূর্বেই বিভিন্ন নামী জ্ঞানী নারীদের কথা উল্লেখ করেছি। তারা অনেকেই ব্রহ্মচর্য পালন করতেন, অনেক শি(ত নারী অধ্যাপনার কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিলেন। শি(কারা পরিচিত ছিলেন উপাধ্যায়া (Upadhyaya) নামে এরা কিন্তু উপাধ্যায়দের স্ত্রী নয়। ববং স্বীয় প্রতিভায় অধ্যাপনার বৃত্তি অবলম্বন করেছিলেন। বিভিন্ন সাহিত্যসূত্রে সুলভা, গার্গী প্রমুখ উপাধ্যায়াদের উল্লেখ আমরা পাই। গার্গী বাচক্নবী, জনকরাজার সভায় পন্ডিতদের মধ্যে অন্যতমা এবং যাজ্ঞবল্ক্যকে সর্বাধিক বেগ দিয়েছিলেন শাস্ত্রচর্চায়। মালবিকামিত্রম্ (Malarikagnimitram) নাটকে মালবিকার শি(কা হিসাবে পন্ডিতা কৌশিকী নামক (Pandita Kausiki) একজন নারীর নাম পাওয়া যায়। এছাড়া বিভিন্ন কবি সাহিত্যিক, চিকিৎসক পাই। অনন্ত সদাশিব আলতেকর (A.S.Altekar) এর মতে সম্ভবত বিত্তশালী পরিবারের নারীরাই এই সব পেশা গ্রহণ করতে স(ম ছিলেন।

বৌদ্ধ ও জৈনধর্মে নারীদের সংঘে যোগদানের অধিকার ছিল। শাক্যকূলের বহুপুরুষ বৌদ্ধসংঘে যোগদিলে, শাক্যরমনীরা ও সিদ্ধার্থের নিকট সংঘে প্রবেশের অনুমতি প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তা অনুমোদন করলে তার পালিত মা গৌতমী প্রথম ভি(ুনী রূপে সংঘে প্রবেশ করেন। বৌদ্ধসন্ন্যাসিনীদের রচিত 'থেরীগাথা' (Therigatha) বৌদ্ধসমাজও সাহিত্যের এক অনন্য নিদর্শন। 'থেরীগাথা'র ৪২ জন রচয়িতা বোধিলাভ করেছিলেন বলে বর্ণিত আছে, তাদের ১০জন বিবাহিত জীবন ছেড়ে সন্ন্যাস গ্রহণ করেন। বৌদ্ধকাহিনী অনুসারে, সুমেধা নামক একজন সংসারে অনাসক্ত(কন্যাকে সংসারী করার উদ্দেশ্যে তাঁর পিতা একজন রাজপুরুষ পাত্রকে দিয়ে এলে সুমেধা বিনীতভাবে বৈষয়িক বাসনার অসারতার বর্ণনা দিয়ে তরবারি দ্বারা নিজের কেশরাশি ছিন্ন করে, ভি(ুনীর জীবন গ্রহণ করেন। তবে একথা অবশ্য মনে রাখা প্রয়োজন যে বৌদ্ধসংঘ নারীদের প্রবেশাধিকার দিলেও ভি(ুদের সম্মান ছিল সর্ব্বোচ্চ। বয়ঃজ্যৈষ্ঠ ভি(ুনীও যুবা ভি(ুকে সম্মান প্রদর্শন করতেন, অন্যদিকে মহাবীরের পথ অনুসরন করে ৩৬০০০ জন নারীরা ধ্বেতাম্বর জৈন সংঘে প্রবেশের নিদর্শন পাওয়া যায়। যেখানে বিবাহকে নারীকে জন্য আবশ্যিক বলা হয়নি। এই বিবরণ থেকে মনে করা হয় যে জনপ্রিয় ধর্মগুলি বিভিন্ন বিদূষী নারীদের আর্কষিত করেছিল, কারণ ব্রাহ্মণ্য পিতৃতন্ত্রের চাপে তারা কোথাও না কোথাও অবদমিত হয়েছিলেন। পাশাপাশি অধ্যাপিকা Kumkum Roy তার, 'The Power of the Gender and the Gender of Power' গ্রন্থে দেখিয়েছেন, যে সাঁচী ভারতহুতের স্তূপে যেসব দানলেখ পাওয়া গেছে, তার প্রায় অর্ধেকের কাছাকাছি লেখ নারীদের দান। এই সাঁচী বা ভারতের দানলিপি থেকে বোঝা যায় নারীরা তাদের সঞ্চিত সম্পদ স্বেচ্ছায় ব্যয়ের অধিকারিনী ছিলেন। বিভিন্ন (ে ত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানে নারীদের সক্রি(য় অংশগ্রহন ও প্রত্য(করা যায়।

এছাড়া ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যে আমরা বিভিন্ন নারী তপস্বিনীর কথা উল্লেখ করেছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে স্বাধীন এবং অবিবাহিত তপস্বিনী (ব্রহ্মবাদিনী) দের উল্লেখ থাকলেও পরবর্তী জটিল ব্রাহ্মণ্য সামাজিক আদর্শে বিবাহ আধ্যাত্মিক স্বাধীনতাকে খর্ব করেছিল। তাঁর যা কিছু পুণ্য তা স্বামীর সেবায় এই রূপ ধারণা পোষণ করা হয়। এছাড়া অবিবাহিত কন্যার স্বর্গলাভের অধিকার নেই, প্রয়োজনে শেষকৃত্যের পূর্বে তার মৃতদেহের বিবাহদান কর্তব্য। পরবর্তী বৈদিক যুগে

যাগযজ্ঞে স্ত্রী উপস্থিতি থাকলেও সক্রি(য় ভূমিকা নেই। তবে এসব সত্ত্বেও অনেক (্ে ত্রে স্বামী-স্ত্রীকে একত্রে যজ্ঞ করতে বা নাবালক পুত্রের হয়ে যজ্ঞ সম্পাদন করতে দেখা যায়। উদাহরণ স্বরূপ সাতবাহন রানী গৌতমী বলশ্রীর কথা বলা যায়। এইভাবে বলা যায় আধ্যত্মিক জগতে নারীর অধিকার ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রগতভাবে স্বামীর অনুসারী হলেও কিছু(্ে ত্রে ব্যতিত্র(ম দেখা যায়। এই প্রসঙ্গে আদি মধ্যযুগীয় উপপুরাণ যথা ব্রহ্মবৈবত পুরাণ কালিকা পুরাণ কুমারী পূজার উল্লেখ আছে। তবে একথা নিসন্দেহে স্বীকার্য যে বৌদ্ধ জৈন ধর্মে নারীরা আধ্যাত্মক (্ে ত্রে অধিক স্বাধীনতা ভোগ করত।

৯.৬.১৬.২.৩ — দেবীরূপে নারী ঃ—

ভারতীয় সমাজে নারীর অবস্থানের পরিপ্রে(্িতে অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ ও আলোচ্য বিষয় হল দেবী উপাসনার ধারা। পঞ্চায়তন ব্রাহ্মণ্যধারা (Panchayetan Brahmanical Order) অনুসারে, শৈব, বৈষ(ব, সৌর ও গাণপত্য উপাসনার সঙ্গে সঙ্গে শাক্ত(উপাসনাও সসম্মান স্থান পেয়েছে। বৈদিকধর্ম নিঃসন্দেহে ছিল পুরুষ বা দেবতা প্রধান, কিন্তু পূর্ববতী হরপ্পীয় ধর্মে কিন্তু আমরা মাতৃদেবী উপাসনার অনেক নিদর্শন পেয়েছি। দেবী রূপে নারীকে পর্যালোচনা করতে হলে শাক্ত(উপাসনাকে দুভাবে দেখা যেতে পারে, একটি হল, ঈ(্বরকে দেবীরূপে কল্পনা করে দেবী আরাধনা এবং দ্বিতীয়টি হল নারীদের দেবীজ্ঞানে উপসনা করা। প্রথমটি বৈদিক সময় থেকেই প্রচলিত। ঋগ্বেদে আদিত্য গণের মাতা হিসাবে দেবমাতা অদিতি (Mother of Gods) ভোরেরদেবী (Goddess of Dawn) হিসাবে উষা, রাতের দেবী রাত্রির অবস্থান আমরা দেখতে পাই। কিন্তু এই দেবীদের অবস্থান ছিল গৌণ। মূলত দেবপত্নীরূপে আমরা দেখতে পাই -ইন্দ্রানী, বরুনানী, রুদ্রানী প্রমুখ দেবীদের।

ঐতিহাসিকদের অনুমান, দেবী উপাসনা মূলত উর্বরতামূলক যাদুবি(্বাস সমন্বিত সমাজে গড়ে ওঠে। মূলত নারীর উৎপাদন (মতার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে সেই শক্তি(তে দেবত্ব আরোপ করা হয়। যেহেতু পৃথিবী থেকে উদ্ভিদ উৎপন্ন হয়, তাই ভূমিকে মাতৃদেবী রূপে কল্পনার ধারণা যেকোন প্রাচীন কৃষিকেন্দ্রিক সভ্যতায় পাওয়া যায়। হরপ্পা সভ্যতাও তার ব্যতিত্র(ম ছিল না। হরপ্পায় প্রাপ্ত বিভিন্ন পোড়ামাটির নারীমূর্তি, সীলে মাতৃপূজা, প্রভৃতি নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু অপে(্াকৃত পশুপালক সমাজের ইন্দো-বৈদিক গোষ্ঠীর অভিপ্রয়াণের সাথে সাথ দেবী উপাসনার প্রত্য(প্রমাণ লোপ পায়। যুদ্ধকেন্দ্রিক ইন্দো-বৈদিক গোষ্ঠীদের মধ্যে স্বভাবতই — যোদ্ধদেবতা ইন্দ্রের প্রাধাণ্য ল(করা যায়। অতঃএব প্রাক বৈদিক যুগে দেবী পূজার ঐতিহ্য থাকলেও ঋগ্বৈদিক যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মের প্রবল্যে তাদের গুরুত্ব হ্রাস পায় এবং তাদের উপসনা প্রায় ২০০০ বছর স্তব্ধ হয়ে যায়। কিন্তু ঐতিহাসিক Daniel Ingells এর মতে দেবীপূজার ঐতিহ্য ভারতবর্ষে কখনোই বন্ধ হয়নি। ঐতিহাসিক ব্রজদুলাল চট্টাপাধ্যায়, তাঁর ‘Reappearence of the Goddess’ প্রবন্ধে এই বিষয়টিকে সমর্থন করেছেন। তারা মনে করেন এই ঐতিহ্য স্থানীয় উপজাতিয় ধর্মে বজায় ছিল। পৌরাণিকযুগে ব্রাহ্মণ্য সমাজ যখন স্থানীয় ধর্মীয় ঐতিহ্য থেকে উপাদান সংগ্রহ করছিল, তখন দেবীরাও মূল ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান করে নেন। ব্রজদুলাল চট্টোপাধ্যায় আদি মধ্যযুগের প্রকৃতি নির্ধারণ করতে গিয়ে (600-1200 AD) তাঁর বিখ্যাত ‘Theory of Integration’ প্রদান করেছেন, যেখানে তিনি দেখিয়েছেন কিভাবে মূল ব্রাহ্মণ্য ধর্ম, উপজাতিয় ধর্মের উপাদান সংগ্রহ করে, একটি সংমিশ্রিত রূপ ধারণ করে। এর সঙ্গে তিনি আদিম মধ্যযুগীয় মধ্যপ্রদেশকে উদাহরণ রূপে ব্যবহার করেন। ঐতিহাসিকদের মতে উপজাতীয় ধর্মের যেহেতু ঐতিহাসিক তথ্যপ্রমাণ রাখা সম্ভব ছিল না, তাই বৈদিক ধর্ম সম্পর্কে তথ্য সুপ্রচুর কিন্তু একথা নিশ্চিত যে যজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্ম সাধারণ জনসমষ্টির জনপ্রিয় ধর্ম ছিল না। ত্র(মশ জনপ্রিয় বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের বিকাশে ব্রাহ্মণরা উপলব্ধি করেন যে সমাজের সংখ্যাগরিষ্ঠ মনুষের ধর্মীয় ত্রি(য়া ব্রাহ্মণ্য ধর্মে স্থান না পেলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তার অস্তিত্ব হারাবে পাশাপাশি, আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রয়োজনে মূল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সংস্কৃতির বাইরে উপজাতি অঞ্চলে (মতা কায়েমের দরকার ছিল। সে(্ে ত্রে একধারে বর্ণব্যবস্থার সম্প্রসারণ করে যেমন একাধারে

বহুজাতির সৃষ্টি করা হয়, তেমনই উপজাতীয় দেবদেবীকে নিজ ব্রাহ্মণ্য কাঠামোয় অর্ন্তভূক্ত(করার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন ব্রাহ্মণরা। ফলে উপজাতীয় দেবীরা ব্রাহ্মণ্য কাঠামোয় স্থান পেতে শুরু করে। বৈষ(ব ও শৈবধর্মে দেবীরা মূল দেবতার সঙ্গিনী হিসাবে পূজিতা হতেন। কিন্তু শাক্ত(ধর্মে স্বয়ংসম্পূর্ণরূপে দেবীর আর্বিভাব হয়। তিনি স্বয়ং মহাজাগতিক শক্তি(র আধার এবং দেবতারা তাঁর আজ্ঞাবহ। আনুমানিক 5th-6th Century AD সময়কালে মার্কন্ডেয় পুরাণেয় (Markandeya Purana) দেবীমাহাত্ম্য (Devi Mahatmya) অংশ সংযুক্ত(হবার সময় ভারতীয় ধর্মে দেবীগুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠেন। ইতিপূর্বে মহাভারতে যুধিষ্ঠির ও অর্জুনের দুর্গা স্তবে দেবীকে উপজাতিদের দ্বারা পূজিতা, পশুপরিবৃতা ও কৌমার্য্য ব্রতধারিনী রূপে উপস্থাপিত করা হয়েছে। পৌরাণিক সময়ে দেবীকে Supremepower রূপে চিহ্নি(ত করা হয়েছে। মহাদেবের পত্নী পার্বতী বা উমা ত্র(মশ দুর্গা ও কালীর সঙ্গে একাত্ম হয়ে গেছেন। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা প্রয়োজন যে দুর্গা ও কালীর উৎস উপজাতিয় হলেও তাঁরা বহুকাল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির সমন্বয়ে একটু অধিক ব্রাহ্মণায়িত হয়েছেন। অন্যদিকে দেবী ভাগবৎপুরান, বিভিন্ন উপজাতিয় দেবীকে মহাদেবীর অংশ বা রূপ হিসাবে উপস্থাপিত করেছে। দেবীভাগ-বৎপুরাণে যেমন দুর্গা গুরুত্বপূর্ণ দেবীরূপে আত্মপ্রকাশ করেছেন। অন্যদিকে অরণ্যবাসিনী নামক একদেবীকে মহাদেবীর অংশরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পুরাণগুলিতে দেবীর নমনীয় রূপ হিসাবে উপনিষদীয় উমার কথা যেমন উল্লেখ করা হয়েছে, তেমনি দেবীর অব্রাহ্মণ্য অতীতটি প্রকাশ পেয়েছে চামুন্ডার মাধ্যমে। অসংখ্য উপজাতিয় দেবীকে মহাদেবীর রূপ হিসাবে উপস্থাপনা করা হয়েছে। চিরাচরিত ব্রাহ্মণ্য ধারণায় পরিবর্তন করে। বি. ডি. চট্টোপাধ্যায় মধ্যপ্রদেশের Bagh Copperplate থেকে রাজা ভূরুন্দ (Bhurunda) এর উল্লেখ করেছেন। তিনি দেবীর উদ্দেশ্যে মন্দির নির্মান ও ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করছেন। পাশাপাশি সমগ্র বাসিন্দা ও রাজকর্মচারীদের এই দান স্বীকার করতে বলা হচ্ছে। রাজশক্তি(হিসাবে উপজাতিদের উথান এবং ব্রাহ্মণদের পৃষ্ঠপোষকতা ধর্মীয় আত্তীকরণেরই নিদর্শন। ফলশ্রুতিতে ব্রাহ্মণ্য রীতিতে দেবীর গুরুত্ব ত্র(মশ বৃদ্ধি পাচ্ছে।

একই রকম ভাবে আদিমধ্যযুগীয় বাংলায় দেবীপূজার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হবার সাথে সাথে আমরা কুমারী কন্যাদের দেবী রূপে আরাধনার প্রবণতা দেখতে পাই। দেবীভাগবৎ পুরাণও কালিকাপুরাণে এই বিবরণ পাওয়া যায়। এই প্রবণতার মধ্যে একধরণের ধর্মীয় মানবতাদের চেতনা ত্রি(য়াশীল ছিল। একাধারে যখন কন্যাদের বালিকা অবস্থায় বিবাহের সামাজিক বিধান ছিল, তখন প্রায় যোল বৎসর পর্যন্ত কন্যাদের উপসনার বিধান নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক। হয়তো এর মধ্যে কোন সুপ্ত সংস্কারক দৃষ্টিভঙ্গি ত্রি(য়াশীল ছিল। পাশাপাশি, চারবর্ণের কুমারীদেরই পূজার যোগ্য মনে করা হত, কিন্তু বর্ণাশ্রম কাঠামোকে অবহেলা না করে ব্রাহ্মণ কেবল ব্রাহ্মণকন্যা, (ত্রিয় উচ্চতর দুই বর্ণ, বৈশ্য তিনবর্ণের এবং শূদ্র চারবর্ণের কুমারী পূজা করতেন।

এই আলোচনা থেকে দেখা গেল যে সামাজিক অবস্থানের পাশাপাশি ধর্মীয় (ে(ত্রেও দেবীদের একটি সম্মানীয় স্থান ছিল। তাদের বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হত।

৯.৬.১৬.৩ — সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

(১) A. S. Altekar – The Position of Women in Hindu Civilization

(২) Kumkum Roy – The Power of Gender and the Gender of Power

(৩) রণবীর চত্র(বর্তী — ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব

(৪) সুকুমারী ভট্টাচার্য্য — প্রাচীনভারত ঃ সমাজ ও সাহিত্য

৯.৬.১৬.৪ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী ঃ—

(1) Write about the changing notion of women education in ancient Indian Society?

(2) Estimate the Significance of women as rulers in different ancient Indian Dynasties.

(3) Describe the positions of wives in early Indian Societies.

তথ্যসূত্রকৃতজ্ঞতা ঃ—

(১) রণবীর চত্র(বর্তী — ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব

(২) সুকৃত মুখার্জ্জী — 'Maiden as Divine : Exploring the Brahmanical Social and Religion Structure (Early Indian Perspective) [Unpublished M.Phil desertation]

ইতিহাস

দ্বি-বার্ষিক সেমেস্টার ভিত্তিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম এ তৃতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পাঠ - ১০

দশম পত্র

History of Environment and Ecology

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

KALYANI UNIVERSITY

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্‌ট্যান্স লার্নিং
কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়
কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫
পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-পুর্নগঠক

বর্তমান গ্রন্থ পুর্নগঠনে মুখ্য ভূমিকা নিয়েছেন শ্রী সুকৃত মুখার্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি.ও.ডি.এল., কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

DISCLAIMER

This Self Learning Material (SLM) has been compiled using material from authoritative books, journal articles, e-journals and web sources.

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.03.2018

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia, West Bengal

Two-Year

Post Graduate Degree Progarmme

Syllabus

HISTORY

SEMESTER III

PAPER - 10

History of Environment and Ecology

EC-10	4 CREDITS	100 MARKS	100 HOURS

BLOCK 1

Environment in Indian Philosophy & Settlement Archaeology

Unit-1 : Environment and Ecology in Indian ethos and Philosophy

Unit-2 : Settlement archaeology

BLOCK 2

Expansion of Agriculture and Geographical zones

Unit-3 : Expansion of Agriculture.

Unit-4 : Geographical zones

BLOCK 3

Climate factors in the Evolution of Societies and Nature based activities

Unit-5 : Climate factors in the Evolution of Societies.

Unit-6 : Impact of Climate Change

Unit-7 : Nature based activities and Social formations.

BLOCK 4

Indigenous knowledge system, Nature and societies and Environment Management in History

Unit-8 : Indigenous knowledge system, Nature and societies.

Unit-9 : History of Environmental concern

Unit-10 : Management of environment in history

BLOCK 5

Colonial intervention and environment and Tribalization of Communities.

Unit-11 : Colonial intervention and Environment.

Unit-12 : Indigenous knowledge

Unit-13 : Tribalization of communities.

BLOCK 6

Impact of Industry on Ecology and Oriental Systems and Development Alternatives.

Unit-14 : Impact of modern industry on ecology.

Unit-15 : Development and Pollution

Unit-16 : Oriental system and development alternatives

CONTENTS

Paper-X	Unit	Author	Title	Page
1.	1	Sri Alok Kumar Ghosh	Environment and Ecology in Indian Ethos and Philosophy	1-13
	2.	Sri Alok Kumar Ghosh	Settlement and Archaeology	14-22
2.	3	Dr. Dilip Kumar Khan	Expansion of Agriculture	23-27
	4	Dr. Dilip Kumar Khan	Geographical zones (forests, mountains, river systems, oceans, deserts)	28-33
3.	5	Dr. Dilip Kumar Khan	Climatic factors in the evolution of societies and Nauture Based Activities	34-40
	6	Dr. Dilip Kumar Khan	Impact of Climate Change	41-54
	7	Dr. Subhasis Biswas	Nature based activities and social formation	55-60
4.	8	Prof. Ranjan Chakraborty	Indigenous Knowledge Systems, Nature and Societies	61-66
	9	Prof. Ranjan Chakraborty	Hitory of Envirnmental Concern	67-72
	10	Prof. Balai Chandra Barui	Management of Environment in History	73-76
5.	11	Prof. Ranjan Chakraborty	Colonial Intervention and Environment	76-91
	12	Indegeneous Knowlege	Colonial Intervention and Environment	92-100
	13	Dr. Rup Kumar Barman	Tribalisation of Communities	101-109
6.	14	Prof. Balai Chandra Barui	Impact of Modern Industry on Ecology	110-113
	15	Dr. Rup Kumar Barman	Oriental Systems and development alternatives	114-119
	16	Dr. Rup Kumar Barman	Development and Pollution	120-127

দশম পত্র

পর্যায় গ্রন্থ - ১

ENVIRONMENT IN INDIAN PHILOSOPHY & SETTLEMENT ARCHAEOLOGY

একক - ১

Environment and Ecology in Indian Ethos and Philosophy

বিন্যাসক্রম :

১০.১.১ : উদ্দেশ্য

১০.১.২ : প্রস্তাবনা

১০.১.৩ : রামায়ণ-মহাভারত-প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এবং পরিবেশ-চেতনা

১০.১.৪ : প্রাচীন ভারতের পরিবেশ দর্শন

১০.১.৫ : মার্কসীয় দৃষ্টিতে পরিবেশ-চিন্তা ও ভারত

১০.১.৬ : সারসংক্ষেপ

১০.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১০.১.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.১.১ : উদ্দেশ্য

প্রাচীন ভারতের পরিবেশ-চেতনার কতকগুলো গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আলোচনা করা এই এককের উদ্দেশ্য। সেই সময়ের মানুষ প্রকৃতি-পরিবেশকে কী চোখে দেখেছিল, জীবনের সঙ্গে কীভাবে তাকে মিলিয়ে নিয়েছিল, প্রকৃতিকে কেন্দ্র করে তাদের কেমন জীবন-দর্শন গড়ে উঠেছিল, তার সঙ্গে পাশ্চাত্য পরিবেশ-দর্শনের পার্থক্য ছিল কিনা — এই সব বিষয়ে জানা যাবে এই এককটি পাঠ করলে।

১০.১.২ : প্রস্তাবনা

জীবন-ধারণের জন্য প্রাচীন ভারতের মানুষ প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করেছিল। সেই সূত্রে প্রকৃতির সঙ্গে তার এবং তার পোষিত পশুশ্রেণীর পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক তৈরি হয়। অর্থাৎ প্রকৃতির মানবিক ব্যবহার থেকে জৈবিক উৎপাদন — এই প্রক্রিয়ার সূত্রপাত ভারতীয় সভ্যতার শুরুতেই। এই প্রক্রিয়ায় বাস্তু পরিবেশের ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে। ফলে মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে ধীরে ধীরে যে নিয়ামক বৈশিষ্ট্য ফুটে ওঠে, দৈনন্দিন জীবনের যে প্রকৃতিভিত্তিক অবস্থা দেখা দেয়, সাধারণভাবে তাকেই বলা হয় পরিবেশ। আর এই পরিবেশ সম্পর্কে গড়ে ওঠা দৃষ্টিভঙ্গি কে বলা যেতে পারে পরিবেশ দর্শন। এটাই বর্তমান এককের প্রধান আলোচ্য বিষয়। বিষয়টিকে তিনভাগে ভাগ করে নেওয়া ভালো :

(ক) প্রাচীন ভারতের সাহিত্যে, বিশেষত রামায়ণ বা মহাভারতে আভাসিত পরিবেশ-চেতনা;

(খ) প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ দর্শন ও পাশ্চাত্যের দর্শনের সঙ্গে তার তুলনা; এবং

(গ) মার্কসীয় পরিবেশ দর্শনের নিরিখে ভারতীয় পরিবেশ-দর্শনের বিচার।

১০.১.৩ : রামায়ণ-মহাভারত-প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য এবং পরিবেশ-চেতনা

পরিবেশ, পরিবেশ-চেতনা, পরিবেশ-দর্শন — এসব কথা সে আমলে চালু ছিল না, কিন্তু কথাগুলোর যে তাৎপর্য, সেই তাৎপর্য সম্পর্কে মানুষের সচেতনতা ছিল যথেষ্ট। মানুষ যে তার পরিবেশ সম্পর্কে সচেতন ছিল, তার বহু প্রমাণ সাহিত্যে পাওয়া যায়। আদি বৈদিক সাহিত্যে দেবতাকে প্রকৃতির প্রকাশ হিসেবে কল্পনা করা হয়েছে। প্রকৃতিকে বলা হয়েছে জীবনের উৎস। প্রকৃতি ও প্রাকৃতিক পরিবেশকে জীবনের পক্ষে অপরিহার্য মনে করা হয়েছে। গাছপালা, পশু-পাখি, নদী-ঝরণা-পর্বত — সবই তার বন্ধু। ঋগ্বেদ সংহিতায় বলা হয়েছে —

মধু বাতা }তায়তে

মধু ক্ষরন্তি সিন্ধবঃ।

মাধ্বীর্ণঃ সন্তোষধীঃ।।

মধু নক্তোমুতোষসো

মধুমৎপার্থিবং রজঃ।

মধু দৌরস্তু নঃ পিতা।।

মধুমান্নো বনস্পতি —

মধু মাঁ অস্তু সূর্যঃ।

মাধ্বীর্গাবো ভবন্তু নঃ।।

এ হল প্রাকৃতিক আনুকূল্যের প্রার্থনা। মানুষ কামনা করছে, বায়ু মধুময় হোক, নদীগুলো মধুময় হোক, ওষধি মধুময় হোক, দিন-রাত, আকাশ-সূর্য, গাছ-পাতা, পশু-পাখি, ধূলিকণা - সব মধুময় হোক।

বৈদিক যুগে কৃষির বিস্তার বনাঞ্চলে আঘাত হেনেছিল। 'অগ্নি বৈশ্বানরের' সাহায্যে জঙ্গল পুড়িয়ে জমি হাসিল করতে গিয়ে 'পৃথু বৈন্য' পরিবেশের ওপর চাপ তৈরি করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গেই মানুষ বন রক্ষা করা যে কত দরকার, তাও বুঝতে পেরেছিল। সেই কারণেই বন কেটে ফেলা, যথেচ্ছভাবে পশু-পাখি হত্যা করা — এসব নিষিদ্ধ হয়েছিল। এরকম আরও বহু নিয়মের খবর পাওয়া যায় ভারতের প্রাচীনতম সাহিত্যে, রামায়ণে বা মহাভারতে, যার সময়কাল আনুমানিক ৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীষ্টাব্দ।

প্রাচীন যুগে রাষ্ট্রনির্মাণের স্বার্থে বনাঞ্চলে রাজকীয় অনুপ্রবেশ একটি আবশ্যক কাজ বলে মনে করা হত। দু'ভাবে এটা ঘটত। একটা হল কৃষির বিস্তার, অন্যটি হল শিকার বা মৃগয়া। কিন্তু অতিরিক্ত মৃগয়া বনাঞ্চলে জীববৈচিত্র্যের ক্ষতি করতে পারে, এই আশঙ্কায় অতি-মৃগয়া নিষিদ্ধ হয়েছিল, তাকে নিন্দা করা হত 'ব্যসন' বলে। একটা সীমারেখার পর মৃগয়া চলত না। তাছাড়া কোন্ কোন্ পশু বা পাখি শিকার করা যেতে পারে, তারও একটা নিয়ম ছিল। বনবাসী বা আরণ্যক জাতি-উপজাতির লোকেরা বংশপরম্পরায় নিয়ম মেনে চলত। আর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-র জন্য রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে বলা হয়েছে যে, কেবল পাঁচটি পঞ্চনখা প্রানী 'ভাগ্য', বাকি সব 'অভাগ্য'। অর্থাৎ স্বীকৃত পাঁচটি পঞ্চনখা প্রাণী ছাড়া আর কোন পঞ্চনখা প্রাণী বধ করা চলত না। স্বীকৃত ঐ পঞ্চনখা প্রাণীগুলো হল সজারু, গণ্ডার, গোসাপ, খরগোশ ও কচ্ছপ।

"পঞ্চ পঞ্চনখা ভাগ্যা ব্রাহ্মত্রেণ রাঘব।

শল্লকঃ শ্বাবিধো গোধা শশঃ কুর্মশ্চ পঞ্চমঃ।।"

সমাজে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ প্রসঙ্গেও নানা রকমের নিয়ম তখন চালু ছিল। যেমন,

(ক) বনে ঢুকে বাঘ-সিংহ শিকার করা যাবে না ;

(খ) যে বনে বাঘ-সিংহ আছে, সেই বন নষ্ট করা যাবে না বা তার কোন গাছ কাটা যাবে না। একমাত্র বড় বা হিংস্র প্রাণী বাস করে না, এমন বনের গাছ মানুষের ব্যবহারের জন্য কাটা যাবে কিংবা এমন বন পরিষ্কার করে চাষের জমি বার করা যাবে। এখানে এই ব্যাপারটি অত্যন্ত স্পষ্ট যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের মানসিকতায় বন্যপ্রাণী সংরক্ষণকে যেমন বন বাঁচানোর উপায়, তেমনি জঙ্গল সংরক্ষণকেও বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের উপায় হিসেবে ভাবা হত। মহাভারতের উদ্যোগপর্বে লেখা হয়েছে,

"সিংহাভিগুপ্তং ন বনং বিনশ্যেৎ।

সিংহো ন নস্যেত বনাভিগুপ্তঃ।।

নির্বনো বধ্যতে ব্যাঘ্রো নির্ব্যাঘ্রং ছিদ্যত্ বনম্।

তামাদ্ ব্যাঘ্রো বনং রক্ষেদ্ বনং ব্যাঘ্রং চ পালয়েৎ।।

সিংদৈবিহীনং হি বনং বিনশ্যেৎ।

সিংহা বিন ন্যেয়ুর্ঋতে বনেন।।"

সেকালে সমাজে এই ধারণা ছিল যে, গাছপালা জীবন্ত - তারা মানুষ বা অন্য প্রাণীর মতোই। বৈদিক সাহিত্যে 'বৃক্ষচৈতন্যে'র উল্লেখ আছে, অথর্ববেদের একটি অন্যতম শাখা ছিল বৃক্ষায়ুর্বেদ। মহাভারতের শান্তিপর্বে বলা হয়েছে, গাছপালার স্পর্শানুভূতি আছে, তাই উষ্ণস্পর্শে গাছের পাতা, বাকল, ফল বা ফুল শুকিয়ে যায়।

"উষ্মতো স্নায়তে পর্ণং ত্ববং ফলং পুষ্পমেব চ।

স্নায়তে শীর্যতে চাপি স্পর্শস্তেনাত্র বিদ্যতে।।"

ঝড়-বজ্রপাতে তারা আহত হয়, গর্জনে তারা আতঙ্কিত হয়, অর্থাৎ গাছেরা শুনতেও পায়।

"বাভগ্ন্য শনিনির্ঘোষৈঃ ফলং পুষ্পং বিশীর্যতে।

শ্রোত্রেণ গৃহ্যতে শব্দস্তস্মাচ্ছৃণ্বন্তি পাদপাঃ।।

ফুলের মাধ্যমে গাছ গন্ধ ছড়ায়, আবার সুগন্ধে গাছ ভাল থাকে, অর্থাৎ গাছের ঘ্রাণশক্তি আছে। লতা পথ খুঁজে খুঁজে ঠিক কোন শক্ত আশ্রয় দেখে নেয়। অর্থাৎ তার দৃষ্টিশক্তি আছে।

"বল্লী বেষ্ট্যতে বৃক্ষং সর্বতশ্চৈব গচ্ছতি।

ন হ্যদৃষ্টৈবচ মার্গোদস্তি তস্মাৎ পদ্য নে পাদপাঃ।।"

গাছ শিকড় বা পা দিয়ে মাটি থেকে জলপান করে, তাই সে 'পাদপ'। তার আরামবোধ বা বেদনাবোধ আছে, জীবনলক্ষণে সমৃদ্ধ সে।

বৈদিক যুগে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা হয়নি। রামায়ণ-মহাভারতের যুগেও তাই। রামায়ণে বলা হয়েছে, বিশ্বামিত্র মুনির বোন সত্যবতীই আসলে কৌশিকী নদী। সুচরিত্রের কারণে তিনি পবিত্র নদীর রূপ পেয়েছিলেন। রামায়ণের বর্ষাবর্ণনায় আবর্তমান ঋতুচক্রে প্রকৃতির সৃজনী শক্তি'র পরিচয় আছে। কবির ভাষায় বলা হয়েছে।

"নবমাসধৃতং গর্ভং ভাস্করস্য গভস্তিভিঃ।

পীত্বা রসং সমুদ্রাণাং দ্যৌঃ প্রসূতে রসায়নম্।।"

অর্থাৎ সূর্যরশ্মি দিয়ে আকাশ সমুদ্রের জল পান করে। ন'মাস সেই গর্ভ বহন করে বর্ষায় অমৃতময় ধারার জন্ম দেয়। বর্ষা যেমন পশু-পাখির মিলনের ঋতু, পৃথিবীরও তেমনি শস্যফলনের সময়, এই সময়েই সে হয়ে ওঠে 'শস্যবনাভিরামা'। দেবরাজ ইন্দ্র বজ্র ও বর্ষণের দেবতা, তিনি 'পর্জন্য'। বৈদিক সাহিত্যে সীতা হলেন হলকর্ষণের দেবী। তাকে 'সুভগা' ও 'সুফলা' হতে প্রার্থনা করা হয়েছে। রামায়ণেও সীতা প্রকৃতির সন্তান। যজ্ঞক্ষেত্র কর্ষণ করবার সময়ে লাঙলের ফলার মুখে তাকে পেয়েছিলেন রাজর্ষি জনক। অহল্যা-কাহিনীর মধ্যে রামের স্পর্শ, অর্থাৎ বর্ষণের মধ্যে দিয়ে অ-হল্যা অর্থাৎ কর্ষণের অনুপযুক্ত বা অনুর্বর জমিকে কর্ষণযোগ্য বা উর্বর করে তোলার ইঙ্গিত।

মানুষ আর তার পরিবেশ যে কতটা একে অন্যের পরিপূরক বিবেচিত হত, প্রাচীন সাহিত্যের ভৌগোলিক বর্ণনায় তার আভাস আছে। বেদে বলা আছে, ইন্দ্র অহিকে আঘাত করে সপ্তসিন্ধু বইয়ে দিয়েছিলেন। হয়তো কোন এক সময়ে ভূকম্প বা প্রাকৃতিক কোন কারণেই মরুভূমি অঞ্চলে সাত-নদীর ধারা বইতে শুরু করেছিল। কিন্তু মানুষের কল্পনায় তা অতি-প্রাকৃতিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উদাহরণ রামায়ণ-মহাভারতের গঙ্গা-আনয়নের কাহিনী। কপিল মুনির অভিশাপে সগর রাজার ষাট হাজার পুত্র ভস্ম হয়ে যান। এটা মরুভূমায়নের প্রতীক। এদেরই বংশধর ভগীরথ পূর্বপুরুষদের উদ্ধার করবার জন্য স্বর্গ থেকে গঙ্গাকে পৃথিবীতে নিয়ে আসেন। 'মহাদেবের জটা' বা বিন্দু সরোবর থেকে নেমে গঙ্গা সাতটি ধারায় ভাগ হয়ে যায়। তিনটি যায় পূর্বে, হ্লাদিনী, পবনী ও নলিনী; তিনটি যায় পশ্চিমে, সুচক্ষু, সীতা ও সিন্ধু; এবং সপ্তমটি ভগীরথের সঙ্গে পৃথিবীতে বয়ে যায়।

মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক যে কতটা নিবিড়, পুরনো সাহিত্যে তা বারেবারেই আলোচিত হয়েছে। নগরের বিকাশ সত্ত্বেও ভারতীয় ঐতিহ্যে এই ঘনিষ্ঠতার গুরুত্ব কখনোই কমেনি। রামায়ণ ও মহাভারতের কেন্দ্রীয় চরিত্রগুলো জীবনের বেশী সময়টাই বনে কাটিয়েছে এবং

কখনোই বনবাসকে তাদের কাছে কষ্টদায়ক মনে হয়নি। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড তার প্রমাণ। রাম সেখানে বনকেই অযোধ্যা নগরীর মতো মনে করেছেন।

পরবর্তী সময়ে কালিদাস ও ভবভূতিও তাঁদের কাব্য-নাটকে প্রাকৃতিক পরিবেশকে শুধু জীবন-নাট্যের পশ্চাৎপট হিসেবে দেখেননি, দেখেছিলেন জীবনযাত্রার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে।

প্রাচীন ভারতে রাষ্ট্রনির্মাণের পাশাপাশি যে যাযাবর শিকারী বা বনবাসী আরণ্যকদের কৌমসংগঠন ছিল, সেখানেও মানুষ ও পরিবেশের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক মেনে নেওয়া হয়েছিল। তাদের ধর্ম বা যাদুবিশ্বাস, দেবতার উদ্দেশ্যে বনকে উৎসর্গ করা, 'মানা' বা 'জীবন-সার' তত্ত্বে বিশ্বাস করা, 'উর্বরতা-তত্ত্বে'র (Fertility Cult) প্রয়োগে বৃক্ষ-পুজো বা শিলা-পুজো চালু করা — এ সবই তার পরিচায়ক। এ আসলে ছিল প্রকৃতি-সংরক্ষণের জন্য এক যৌথ প্রচেষ্টা, ইরফান হাবিব যাকে বলেছেন 'corporate body for collective action'। আরণ্যকদের অন্যতম গোষ্ঠী ভিলদের সম্পর্কে ডেভিড হার্ডিম্যান তাই লিখেছেন, "(they) had a strong affinity with these words and hills — their home as well as place of refuge — and any destruction which they carried out was so small a scale as to make very little difference to the environment as a whole."

১০.১.৪ : প্রাচীন ভারতের পরিবেশ দর্শন

পরিবেশবিদ্যা সম্প্রতি একটি ইউরোপীয় বিদ্যাচর্চা হিসেবে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে, কিন্তু মৌলিকভাবনার দিক থেকে কি ইউরোপে কি এশিয়ায় এটা সম্পূর্ণ নতুন কোন বিষয় নয়। প্রাচীন ও মধ্যযুগের ইউরোপের মতো এশিয়াতেও পরিবেশ ও প্রতিবেশ সম্পর্কে নানা ভাবনা-চিন্তা ও গবেষণার পরিচয় পাওয়া যায়। যখন থেকে বিভিন্ন সমাজ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সচেষ্ট হয়েছে তখন থেকেই পরিবেশ বিদ্যার উদ্ভব হয়েছে।

তবে পরিবেশ দর্শনের মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গির ক্ষেত্রে পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের উচ্চবর্গীয় মনোভাবের মধ্যে পার্থক্য আছে। ইউরোপীয় পরিবেশ দর্শন খ্রীস্টের আবির্ভাবের আগে গ্রীক ও রোমান লোকধর্মের সঙ্গে যুক্ত ছিল। সেখানে প্রকৃতির সংগে মানুষের সম্পর্ক কল্পিত হয়েছিল একটি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রেক্ষিতে। ধরে নেওয়া হয়েছিল যে বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদ বিকশিত হয়েছে মানব গোষ্ঠীর জন্য। কেননা ঈশ্বর-সৃষ্ট বিভিন্ন অস্তিত্বের মধ্যে মানবগোষ্ঠীর অস্তিত্বই ছিল সব থেকে অর্থবহুল। এই মনোভাবেরই প্রতিফলন ঘটেছিল বাইবেলের 'Genesis' অধ্যায়ে। বাইবেলের এই পর্বে বলা হয়েছে যে, ঈশ্বর মানুষকে সৃষ্টি করেছেন প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করবার জন্য এবং প্রকৃতিকে নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবহার করার মধ্যেই মানুষের জৈবিক সার্থকতা। শুধু খ্রীস্টীয় প্রকৃতিই নয়, অ-খ্রীস্টীয় সমাজের প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনকে বিরোধী বা বিযুক্ত ধর্মের ওপর খ্রীস্টীয় ধর্মের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা হিসেবেই গণ্য করা হয়েছে। পরবর্তীকালে

ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় নদীপথ ও বনাঞ্চলের ওপর ইউরোপীয় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার যৌক্তিকতা প্রমাণের চেষ্টা করা হয়েছে বাইবেলের ঐ ‘Genesis’ অধ্যায়ের উল্লেখ করে।

প্রাচ্যের বিশেষত ভারতের পরিবেশ সম্পর্কে দার্শনিক ভাবনা ছিল এর ঠিক বিপরীত মেরুতে। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে সৃষ্টিকে যেভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে তাতে প্রাথমিকভাবে প্রকৃতিকে স্রষ্টার অংশ হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং তারপর প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পর্ককে আশ্রয় ও আশ্রিতের পারষ্পরিক লেনদেনের নিরিখে বিচার করা হয়েছে। ঋক্‌বৈদিক যুগে দুটি মন্ত্রপর্ব অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল, তার একটি হল ‘ভূমিসূক্ত’। ঋক্‌বৈদিক যুগে প্রকৃতির বিভিন্ন অংশকে দেবতা হিসেবে কল্পনা করা হত এবং সেইদিক থেকে প্রকৃতিকে ভাবা হত সৃষ্টির অপরিহার্য অংশ হিসেবে। সেই কারণে প্রাকৃতিক সম্পদকে নির্বিচারে ব্যবহার করার বদলে প্রাকৃতিক সম্পদকে পরিপুষ্ট ও তুষ্ট করবার প্রবণতাই ঋকবৈদিক যুগে দেখা গিয়েছিল। ঐ সময়ে বিভিন্ন দেবদেবীর ধারণা বিশ্লেষণ করলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়। উপনিষদের সময়েই এই দার্শনিক ভাবনার বিস্তার ঘটেছিল যার অন্যতম প্রমাণ ‘মহানারায়ণ’ - উপনিষদ।

‘‘মহানারায়ণ’ উপনিষদে জলকে দেবতার ক্ষমতা সম্পন্ন প্রাণসৃষ্টিকারী উপাদান হিসেবে দেখানো হয়েছে এবং এও বলা বলা হয়েছে যে এই জলের ওপর কোন অবস্থাতেই মানুষের প্রভুত্ব কাম্য নয়। সেই কারণে মৌর্যযুগে যখন সুদর্শন খাল খনন করা হয়েছিল, সেই সময়ে সেই হ্রদ সংলগ্ন সেচব্যবস্থায় রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ্য প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়েছিল। ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতিতে সৃজনমূলক প্রায় প্রতিটি আচার অনুষ্ঠানেই সেই জলের একটি পবিত্র ভূমিকা থাকে তার কারণও এই উপনিষদিক দর্শন।

আগেই বলা হয়েছে যে, ৪০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ থেকে ৫০০ খ্রীঃ পর্যন্ত ভারতীয় সমাজ যে পরিবেশবিধি মেনে চলত এবং প্রকৃতিকে যে চোখে দেখত তার একটি আভাস পাওয়া যায় বিভিন্ন সাহিত্যে। এই সাহিত্যের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ্য ‘রামায়ণ ও মহাভারত এবং তারপর কালিদাস ও ভবভূতির সাহিত্য। রামায়ণের কিস্কিন্ধাকাণ্ডে বনবাসী জীবজগতের সংরক্ষণের স্বার্থে কয়েকটি বিধানের উল্লেখ করা হয়েছে। স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে ‘পঞ্চনখা’ প্রাণী সমূহের মধ্যে কেবল পাঁচটি প্রাণী হননযোগ্য। অন্য, কোন প্রাণী শিকারের যোগ্য নয়। হননযোগ্য প্রাণীগুলোকে বলা হয়েছে ‘ভাগ্য জীব’ আর অন্য ‘পঞ্চনখা’ প্রাণীগুলোকে বলা হয়েছে ‘অভাগ্য’। তাছাড়া রামায়ণ ও মহাভারত দুটি মহাকাব্যেই ‘অতিমৃগয়ার’ কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

মহাভারতের উদ্যোগপর্বে শিকারের ওপর কয়েকটি অবশ্যমান্য বিধির উল্লেখ করা হয়েছে। প্রথমত কোন ঘন জঙ্গলের ভিতরে ঢুকে হিংস্র অথবা অহিংস্র যেকোন প্রাণী বধ করা ধর্ম বিরোধী। দ্বিতীয়ত, লোকালয়ে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী কেবল হিংস্রপ্রাণী শিকারযোগ্য। তৃতীয়ত, যেসব বনাঞ্চলে শক্তিশালী পশুর বাস সেই সব বনাঞ্চল পরিষ্কার করা বা গাছ কাটা নিষিদ্ধ। চতুর্থত, কেবল সেইসব বনাঞ্চল

পরিষ্কার করে কৃষিকাজ করা সম্ভব যেসব বনাঞ্চলে হিংস্র বা শক্তিশালী পশুর বাস নেই। কেননা প্রাচীন সাহিত্যে বনাঞ্চলকে বলা হয়েছে প্রকৃতির 'মধ্যভাগ', আর পশুকূলকে বলা হয়েছে 'মধ্যভাগ রক্ষক'। মহাভারতের শান্তি পর্বে এই বনাঞ্চল সম্পর্কে বিস্তৃত বর্ণনা আছে। এবং একাধিকবার বৃক্ষ চৈতন্যের কথাও বলা হয়েছে।

'রামায়ণ' এবং 'মহাভারত' এই দুটি কাব্যেই প্রকৃতি ও মানুষকে একই মঞ্চের শরিক হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সমাজ এবং মানবিক সমাজের মধ্যে কোন ভেদরেখা টানা হয়নি। ঐতিহাসিকদের মতে, এই দুটি মহাকাব্য তাই প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ দর্শনের অন্যতম আকরগ্রন্থ। বেশ কয়েকটি কাহিনী পর্বের মাধ্যমে এই পরিবেশ দর্শনের প্রতীকী প্রকাশ ঘটেছে। যার মধ্যে অন্যতম সীতার আবির্ভাবের কাহিনী এবং রামায়ণের অহল্যা কাহিনী। রামকে এক্ষেত্রে ইন্দ্র বা পর্জন্যের প্রতীক হিসেবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ডে বনবাস পর্বে সীতার উদ্দেশ্যে রাম যেসব কথা বলেছিলেন তার সংগে পরিবেশবিদ্‌দের দৃষ্টিভঙ্গির সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। 'অহি'কে আঘাত করে মরুভূমিতে সপ্তসিন্ধু আনয়ন বা ভগীরথের গঙ্গা আনয়নের কাহিনীও আসলে পরিবেশ দর্শনেরই পরিচয় দেয়।

বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও পরিবেশ সম্পর্কে একই ধরনের চিন্তাভাবনার পরিচয় পাওয়া যায়। জৈন দর্শনে গোটা পৃথিবীকে 'জীব' এবং 'অজীব' - এই দুইভাগে ভাগ করা হয়েছে। সেক্ষেত্রে বৃক্ষকে জীব পর্যায়ভুক্ত করা হয়েছে এবং কল্পবৃক্ষের ধারণায় এটা অত্যন্ত স্পষ্ট যে মানবজীবনের পক্ষে বৃক্ষ আশ্রয়দাতা প্রতিবেশী হিসেবেই কল্পিত। এই কল্পবৃক্ষের ধারণা বৌদ্ধদর্শনেও আছে। এছাড়া বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনের আবির্ভাবের পটভূমিতে পরিবেশ চেতনার ইঙ্গিত লক্ষণীয়। খ্রীঃ পূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ শতকের মধ্যে যে মগধের উত্থান তার ব্যাখ্যায় এবং মগধ সাম্রাজ্যে বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতার বিশ্লেষণে পরিবেশ-দর্শনের ইঙ্গিত আছে। বৌদ্ধ সূত্রে বলা হয়েছে যে বৃক্ষ এবং জল এই দুইয়ের উপাসনার মধ্য দিয়েই মগধের শাসকগোষ্ঠী সাফল্য লাভ করেছিল। রোমিলা থাপার এর ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে যে মগধ সাম্রাজ্যের কৃষির সংগঠন এমনভাবে করা হয়েছিল যাতে কোন বনাঞ্চল নষ্ট না হয়। কিংবা নদীপথ ব্যাহত না হয়। বৈদিক আমলের শেষদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্ম যখন অতিমাত্রায় যাগযজ্ঞ কেন্দ্রিক হয়ে গিয়েছিল, সেই সময়ে নির্বিচারে পশুবলি হত বলে সাধারণ কৃষিজীবী সমাজ ব্রাহ্মণ্যধর্মের ওপর বিরক্তি বোধ করেছিল এবং সেই কারণেই শাসিত জনগোষ্ঠীর মধ্যেও বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল। অর্থাৎ শাসকগোষ্ঠীর কাছে বৌদ্ধ দর্শনের গুরুত্ব ছিল এই যে, তা উৎপাদনমুখী পরিবেশ রক্ষার কথা বলে এবং [illegible]জন্য প্রয়োজনীয় উদ্বৃত্ত নিশ্চিত করে। আর শাসিতের কাছে বৌদ্ধ দর্শনের জনপ্রিয়তার কারণ ছিল ন্যূনতম উৎপাদনের স্বার্থে পরিবেশের প্রতি তার তাত্ত্বিক সমর্থন। পশুবলি রোধ করে বৌদ্ধধর্ম জীবমণ্ডলের পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার পক্ষে কাজ করেছিল। এবং তাতে উৎপাদন প্রক্রিয়া আরও বেশি সমৃদ্ধ হয়েছিল বলে রামশরণ শর্মা মনে করেন।

তবে ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ কিংবা জৈন দর্শন প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রাচীন ভারতীয় পরিবেশ চিন্তা লোকায়ত দর্শনের কাছে ঋণী। বিভিন্ন উপজাতিদের মধ্যে দেবতার প্রতি উৎসর্গ করা বনাঞ্চল রক্ষা করার যে রীতি প্রচলিত ছিল তার আসল উদ্দেশ্য ছিল পরিবেশকে রক্ষা করা। গুপ্তযুগে জমির ওপর ব্যক্তিসমূহের সামন্ত অধিকার স্বীকার করে নেওয়ার সময় দেবোত্তর সম্পদের ধারণারও বিকাশ ঘটেছিল। আসলে দেবতার অজুহাতে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করবার উপজাতীয় পদ্ধতিরই এটা ছিল ব্রাহ্মণ্যতান্ত্রিক বা উচ্চবর্গীয় সংস্করণ। ভারতের পার্বত্য অঞ্চলে উপজাতিদের মধ্যে 'জীবনসার' বা 'মানা' সংরক্ষণের স্বার্থে যে শিলা পূজার রীতি প্রচলিত ছিল, কিংবা ভারতের বনাঞ্চলে বনবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে বৃক্ষপূজার যে রীতি চালুছিল তারই উচ্চবর্গীয় সংস্করণ হিসেবে বিকশিত হয়েছিল 'পর্জন্যপূজা', 'নদীপূজা, বা 'মূর্তিপূজার ধরন। অর্থাৎ যে সাংস্কৃতিক চর্চাগুলি ভারতের মধ্যযুগে শুধুই একটি যুক্তিহীন ধর্মীয় আচারে পরিণত হয়, প্রাচীন ভারতে তার একটি নির্দিষ্ট বাস্তব ও দার্শনিক কারণ ছিল। সেই কারণে কৃষির প্রভূত বিস্তার সত্ত্বেও এবং বহু বনাঞ্চল বনবাসী সম্প্রদায় অধ্যুষিত হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন ভারতে পরিবেশের ভারসাম্যের অভাব তেমনভাবে ঘটেনি। প্রাক্‌বৈদিক আমলে ভারতের একটি সংকীর্ণ অংশে নগর সভ্যতার বিকাশ এক সময়ে কোন বহির্দেশীয় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার চাপে উৎপাদনের সংকট ডেকে এনেছিল এবং সেই কারণেই সেই সভ্যতার পতনও ঘটেছিল। কিন্তু তারপর অন্তত পরিবেশের কারণে উৎপাদনের সংকট দেখা দেয়নি বা সেই কারণে কোনও সভ্যতার পতনও ঘটেনি। সুলতানী ও মোগল আমলে প্রকৃতি সম্পর্কে শাসকগোষ্ঠীর মনোভাব পরিবর্তিত হয়েছিল বটে কিন্তু তখনও ভারতীয় ঐতিহ্যকে সম্পূর্ণ নষ্ট করে প্রকৃতির ওপর নির্বিচারে আধিপত্য স্থাপন রাষ্ট্রের উদ্দেশ্য ছিল না। একমাত্র মোগল আমলের শেষদিকে ভ্রান্ত জায়গিরদারী নীতির ফলে সংকট দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেই সংকটও ঔপনিবেশিক আমলের সংকটের তুলনায় ছিল তুচ্ছ। ঔপনিবেশিক শাসকরা প্রকৃতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র দর্শন দ্বারা প্রভাবিত ছিল বলেই ভারতীয় প্রকৃতির আসল সংকট এসেছিল মোগল শাসনের পতনের পর।

১০.১.৫ : মার্কসীয় দৃষ্টিতে পরিবেশ-চিন্তা ও ভারত

মার্কসবাদী পরিবেশ দর্শনের বিকাশ পাশ্চাত্য-দর্শন, আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন এবং পরিবেশ সম্পর্কে ক্রমবর্ধমান গণ-সচেতনতার ফল। পাশ্চাত্য খ্রীষ্টীয় দর্শনের বিপরীতে এবং প্রকৃতিকেন্দ্রিক (Nature centric) ব্যাখ্যার সমালোচনার সূত্রে মার্কসবাদী দর্শনের অবস্থান গড়ে উঠেছিল। খ্রীস্টীয় দর্শনে প্রকৃতির ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছিল। মার্কসীয় দর্শনে মানুষের ওপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ এবং সেই সূত্রে প্রকৃতির ওপর অধিকারের ভাগাভাগিকে বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করা হয়েছে।

ইউরোপে প্রকৃতিবাদী পরিবেশবিদরা প্রাক্‌-খ্রীষ্টীয় যুগের প্রকৃতিমুখী লোকায়ত দর্শনের গুণগান করেছেন। লুই মানফর্ড তার "The pentagon of power" বইতে অস্ট্রেলিয় উপজাতিদের মধ্যে প্রচলিত কয়েকটি সংস্কারের উল্লেখ করে দেখিয়েছেন যে সেই উপজাতিগুলো প্রকৃতির সংগে সহাবস্থানের কথাই

ভেবেছিল এবং প্রাচ্যের মতো সংস্কারের মাধ্যমে প্রকৃতিকে রক্ষা করতে চেয়েছিল। মানফর্ড-এর বক্তব্যের সমর্থন পাওয়া যায় লীন হোয়াইট (Linwhite) এর "The Historic Roots of Ecological Crisis) বইতে। লীন হোয়াইট বলেন। যতদিন পর্যন্ত উপজাতীয় সংস্কৃতি অবিকৃত অবস্থায় ছিল ততদিন পর্যন্ত পরিবেশের কোন সংকট দেখা দেয়নি। কিন্তু খ্রীষ্টধর্মকে আশ্রয় করে উৎপাদন ভিত্তিক সমাজ কাঠামো তৈরি হওয়ার পর মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সেই কারণে ধর্মীয় দর্শনে ঐ নিয়ন্ত্রণের ওপর যুক্তি রাখার প্রয়োজন দেখা দেয়। এবং বাইবেলের "Genesis" অধ্যায়টি যুক্ত হয়।

স্টেফানি লেল্যাণ্ড (Stefani Leyland) এই ব্যাখ্যায় ভিন্নমাত্রা যোগ করেছেন প্রকৃতির একটি নারীবাদী ব্যাখ্যার মাধ্যমে। লেল্যাণ্ড তাঁর 'Feminism and Ecology' তে বলেছেন, প্রকৃতির ওপর খ্রীষ্টীয় নিয়ন্ত্রণমূলক দর্শনের উৎপত্তির প্রধান কারণ প্রাকৃতিক বিরূপতা এবং সেই বিরূপতার সময়ে সৃষ্ট প্রকৃতির সংগে মানুষের বিযুক্ততা। তার মতে, এই সময়ে মানুষ প্রকৃতির ওপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করতে বাধ্য হয় এবং প্রাকৃতিক বিরোধিতার পর্বে গড়ে ওঠা শ্রমবিভাজনের সূত্রে সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার প্রতিষ্ঠা করে। লেল্যাণ্ড এর মতে, ..[illegible]দর্শনও প্রায় সর্বাংশে পুরুষতান্ত্রিক দর্শন।

ইউরোপে খ্রীস্টীয় দর্শনের এই বিরূপ সমালোচনার উত্তরও দেবার চেষ্টা হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রেই পরিবেশের অবক্ষয়ের দায় চাপানো হয়েছে অর্থনৈতিক প্রগতির ঘাড়ে। এবং পরিবেশ রক্ষার অজুহাতে খ্রীষ্টীয় দর্শনকে অর্থনৈতিক প্রগতির বিরুদ্ধে দাঁড় করানো হয়েছে। এই বিষয়টিকে আরও বেশি প্রচার সর্বস্ব করতে ফ্রান্সে সেন্ট ফ্রান্সিসকে রোমের পোপ স্বয়ং "Saint of Ecology" আখ্যা দিয়েছিলেন। Fukuoka তার - "One Straw Revolution" বইতে লিখেছিলেন যে ধর্মের সংগে পরিবেশের কোন বিরোধ নেই, আসল বিরোধ শিল্পায়নের সংগে।

মার্কস তার পরিবেশ চিন্তায় এই দুই ধারণাকেই আক্রমণ করেছিলেন। প্রকৃতিবাদীদের চূড়ান্ত প্রকৃতিকেন্দ্রিকতা যেভাবে আবার বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় ধর্ম দর্শনের প্রভাবকে ফিরিয়ে এনেছিল মার্কস তার বিরোধিতা করেছেন, আবার শিল্পায়নকে একপেশে ভঙ্গিতে পরিবেশের অবক্ষয়ের জন্য দায়ী করার- ও তিনি বিপক্ষে ছিলেন। তিনি প্রগতিকে উৎপাদনের প্রক্রিয়া এবং উৎপাদনের উপকরণের ওপর মালিকানার নিরিখে বিচার করতে চেয়েছেন। সেই কারণেই মার্কসীয় পরিবেশ দর্শন ছিল প্রধানত আর্থ রাজনৈতিক এবং সমাজতাত্ত্বিক।

উনিশ শতকের ইউরোপে উৎপাদন ভিত্তিক অর্থনৈতিক সম্পর্কের ভিত্তিতে যে পরিবেশ দর্শন গড়ে ওঠে, তা মার্কসবাদী সমাজতান্ত্রিক পরিবেশ চেতনা নামে পরিচিত। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় - 'post-Materialist Environmental Philosophy'। অবশ্য ভারতে কুড়ি শতকে একটি ভিন্নধরনের আধুনিক পরিবেশ দর্শন গড়ে ওঠে, যার ভিত্তি ছিল গান্ধীবাদ। ইংরেজিতে যাকে বলা হয় - "Non-materialist Environmental Philosophy.

মার্কসের মতে, প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে উৎপাদন করা এবং সেই উৎপাদনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা শ্রেণী কাঠামোই পরিবেশের অন্যতম নিয়ন্ত্রক। পরিবেশের দর্শন এবং শ্রেণীগত দর্শন একটি অভিন্ন তত্ত্বের অংশবিশেষ। পরিবেশের ইতিহাস আলোচনায় মার্কসের রচনা থেকে কয়েকটি প্রধান সূত্র পাওয়া যায়। মার্কস ঐতিহাসিক বস্তুবাদে মানবসমাজের ইতিহাসকে প্রধান চারটি স্তরে ভাগ করেছেন - আদিম সাম্যবাদী সমাজ, দাস সমাজ, সামন্ততন্ত্র এবং পুঁজিবাদ। পুঁজিবাদের পরবর্তী স্তর হিসেবে তিনি সমাজতান্ত্রিক কাঠামোর কথা ভেবেছিলেন। মার্কস এর মতে, আদিম সাম্যবাদ থেকে সামন্ততন্ত্র পর্যন্ত সময়ে পরিবেশ দর্শন প্রকৃতি-বিরোধী ছিল না। পরিবেশ দর্শন সামাজিকভাবে প্রকৃতি বিরোধী হয়ে পড়ে পুঁজিবাদী কাঠামো প্রতিষ্ঠার ফলে। অবশ্য এক্ষেত্রে মার্কস ইউরোপ বা ইউরোপ বহির্ভূত ভৌগোলিক অংশের মধ্যে কোন পার্থক্য নির্দেশ করেননি।

আদিম সাম্যবাদ থেকে সামন্ততন্ত্রের পর্যায় পর্যন্ত উৎপাদনের ক্রমবৃদ্ধি ঘটলেও যেহেতু তার ভিত্তি ছিল কৃষি, সেহেতু কৃষির সংগে প্রাকৃতিক বিভিন্ন বিষয়গুলির নিবিড় যোগ ছিল। প্রকৃতির সংগে উৎপাদক সমাজের একটি তাত্ত্বিক যোগ ছিল। যার ফলে পরিবেশের ন্যূনতম ভারসাম্য রক্ষিত হয়েছিল। কিন্তু পুঁজিবাদের উৎপাদন ব্যবস্থায় সামাজিক ভোগের লক্ষ্যের বাইরে উদ্বৃত্ত অর্জনের লক্ষ্য নির্দেশিত হয়। সেই কারণে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারকারী শ্রমের ‘পণ্যায়ন’ (Commoditisation) ঘটে এবং প্রকৃতির সঙ্গে স্বাভাবিক সমাজের বিযুক্তি দেখা দেয়। মার্কসের মতে — পুঁজিবাদী কাঠামোয় প্রকৃতি, বিরোধী পরিবেশ দর্শনের এটাই মুল কারণ।

পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় সামাজিক কাঠামোর প্রধান ভিত্তি হল জৈব অস্তিত্ব। আর সামাজিক কাঠামোর অগ্রগতির ভিত্তি হল উৎপাদনের ওপর শ্রেণীর নিয়ন্ত্রণ। মার্কসের মতে, একমাত্র মানুষই প্রাকৃতিক উৎপাদনকে উৎপাদনের উপকরণে পরিণত করে এবং সেই উপকরণের ওপর মালিকানার অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শ্রেণীস্বার্থ সৃষ্টি করে। ফলে ঐতিহাসিক বস্তুবাদের নিয়ম অনুসারে শ্রেণীদ্বন্দ্ব প্রাকৃতিক উপাদানের মালিকানার দ্বন্দ্বে পরিণত হয়। প্রকৃতিকে তখন আর জীবনের প্রয়োজনীয় একটি সামগ্রিক অস্তিত্ব হিসেবে দেখা হয় না। পরিবেশের স্বার্থকে ছাপিয়ে বড় হয়ে ওঠে উৎপাদনের স্বার্থ। এই কারণেই মার্কস বলেন মানব সমাজের ইতিহাসে পরিবেশের পক্ষে সবচাইতে বিপর্যয়ের পর্যায় হল পুঁজিবাদের পর্যায়।

এই মার্কসীয় দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত বামপন্থী গবেষকরা শিল্পায়িত রাষ্ট্রে উচ্চবর্গের হাতে গড়ে ওঠা পরিবেশ আন্দোলনকে নিছক সৌখিন প্রকৃতিচর্চা বলে ব্যঙ্গ করে থাকেন। অন্যদিকে এখনও ভারত সম্পূর্ণভাবে শিল্পভিত্তিক পুঁজিবাদের পরিণতিতে পৌঁছায়নি বলে এখানে পুরানো প্রকৃতি-কেন্দ্রিক পরিবেশ দর্শনের প্রভাব থেকে গেছে। এমনকি পশ্চিমী দুনিয়ার বহু পরিবেশ আন্দোলনকারীও অশিল্পায়িত সমাজের দর্শনটিকেই গ্রহণ করেছে। এর অন্যতম দৃষ্টান্ত হল পরিবেশ সম্পর্কে গান্ধীজীর

দর্শন। গান্ধীজীর Non-Materialist Environmental Philosophy' প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ দর্শনের ওপর প্রতিষ্ঠিত। মধ্যযুগের ভারতের পরিবেশ দর্শন গান্ধীজী গ্রহণ করেননি। যদিও সে সময় ভারতীয় রাষ্ট্র শিল্পায়িত নয় এবং তার পরিবেশ চিন্তাও প্রকৃতি-বিরোধী ছিল না। রক্ষণশীল ভারতীয় ঐতিহ্যই ছিল গান্ধীজীর কাছে গ্রহণীয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী ও ফ্রান্সের পরিবেশবিদরা গান্ধীজীর দর্শনকেই প্রচার করেন। বর্তমান রাশিয়াতেও 'post-materialist' বা 'Materialist' দর্শনের চাইতে 'Non-materialist philosophy'র গুরুত্ব অনেক বেড়েছে।

১০.১.৬ : সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতে মানুষ যে তার পরিবেশ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল, তার পরিচয় প্রায় সব সাহিত্য বা দর্শনগ্রন্থেই আছে। যেমন ব্রাহ্মণ্য, তেমনি বৌদ্ধ ও জৈন দর্শনেও পরিবেশ-আনুকূল্যের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতিকে ভারতীয়রা প্রতিপক্ষ হিসেবে দেখেনি, দেখেছিল আত্মপক্ষ হিসেবে। পাশ্চাত্যের পরিবেশ দর্শনের সঙ্গে ভারতীয় পরিবেশ দর্শনের পার্থক্য এখানেই। মার্কসীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলেও এই স্বাতন্ত্র্যের ব্যাপারটি ধরা পড়ে।

১০.১.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

Romila Thapar	:	A History of India
Ramchandra Guha	:	Environmentalism
Geeti Sen সম্পাদিত	:	Indigenous Vision : Peoples of India — Attitudes to Environment
গোপীনাথ কবিরাজ	:	ভারতীয় সাধনার ধারা

কৃতজ্ঞতা স্বীকার ঃ

রামায়ন ও মহাভারত সম্পর্কিত আলোচনার জন্য লেখক 'নন্দন (শারদীয়, ২০০৫)' পত্রিকায় প্রকাশিত বিজয়া গোস্বামী-র একটি প্রবন্ধের সাহায্য নিয়েছেন।

১০.১.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(ক) ‘পরিবেশ’ বলতে কী বোঝায় ?

(খ) ‘পরিবেশ’ দর্শন কী ?

(গ) প্রাচীন ভারতে অতি-মৃগয়া নিষিদ্ধ ছিল কেন ?

(ঘ) ‘ভাগ্য’ প্রাণী - কোনগুলো ?

(ঙ) ‘বৃক্ষচৈতন্যে’র অর্থ কি ?

(চ) ‘মান’ কাকে বলে ?

(ছ) মহানারায়ণ উপনিষদে জলকে কীভাবে দেখানো হয়েছে ?

(জ) ইউরোপে কে প্রকৃতির নারীবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছিল ?

(ঝ) উত্তর-বস্তুবাদী (Post Materialist) পরিবেশ দর্শন কাকে বলে ?

(ঞ) গান্ধীজীর পরিবেশ দর্শন কোন ঐতিহ্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ?

বড় উত্তরের জন্য অনুশীলনী :

(ক) প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে পরিবেশ-চিন্তার কী পরিচয় পাওয়া যায় ?

(খ) প্রাচীন ভারতের পরিবেশ দর্শনের মূল বিষয়গুলি কি কি ?

(গ) মার্কসীয় দৃষ্টিতে পরিবেশকে কীভাবে ব্যাখ্যা করা যায় ?

(ঘ) তুলনায় ভারতীয় পরিবেশ-দর্শনের গুরুত্ব কতটা ?

পর্যায় গ্রন্থ - ১

ENVIRONMENT IN INDIAN PHILOSOPHY & SETTLEMENT ARCHAEOLOGY

একক - ২

Settlement and Archaeology

বিন্যাসক্রম :

১০.২.১ : উদ্দেশ্য

১০.২.২ : প্রস্তাবনা

১০.২.৩ : প্রত্নবসতির গোড়ার কথা

১০.২.৪ : প্রত্নবসতির আগে

১০.২.৫ : হরপ্পা ও সিন্ধু প্রত্নবসতির বিস্তার

১০.২.৬ : প্রত্নবসতির পরিবেশ

১০.২.৭ : প্রত্নবসতির পরম্পরা

১০.২.৮ : নগরজীবনের পুনরাবির্ভাব

১০.২.৯ : অবিকৃত পরিবেশ

১০.২.১০ : সারসংক্ষেপ

১০.২.১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১০.২.১২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.২.১ : উদ্দেশ্য

এই এককের মূল বিষয় প্রত্নসূত্রে পাওয়া 'জনপদনিবেশের' প্রেক্ষিতে টিকে যাওয়া সমসাময়িক পরিবেশ। প্রাক্-লৈখিক পর্বের ভারতীয় জনপদনিবেশের পরিচয় একমাত্র প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকেই পাওয়া সম্ভব। পরবর্তী সময়ের কথা লৈখিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক দু'ধরনের উপাদান থেকেই পাওয়া যায়। কিন্তু যে সূত্রেই পাওয়া যাক না কেন, সে ইতিহাসের কেন্দ্রীয় বিষয় নগর-সংস্কৃতি, যার আর এক নাম প্রত্নবসতি। এই প্রত্নবসতির সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নির্ণয় করাই বর্তমান এককের উদ্দেশ্য।

১০.২.২. : প্রস্তাবনা

খ্রীষ্টপূর্ব ছয় সহস্রাব্দ থেকে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রত্নবসতির সূচনা। একদিকে কৃষির বিস্তার, আর অন্যদিকে নাগরিক অর্থনীতি — এই দুইয়ের চাপে পরিবেশের ভারসাম্যের অভাব ঘটেছিল কিনা, সেটা ঐতিহাসিকদের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। বর্তমান এককের আলোচ্য বিষয় সেটাই।

১০.২.৩ : প্রত্নবসতির গোড়ার কথা

আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে প্রত্নতত্ত্বের সম্পর্কটা ঠিক কী, তা বোঝার জন্য পন্ডিত নীহাররঞ্জন রায়ের একটি মন্তব্যের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে। ১৯৭৮-এ বারোমাস পত্রিকায় তিনি একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন, "ঐতিহাসিকরা ইতিহাস রচনা করে না, ইতিহাস রচনা করে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ, তাদের ধ্যান-ধারণা-রীতিনীতি-কলাকৌশলানুযায়ী সমসাময়িক জীবনের দাবি- দাওয়া, আশা-আকাঙ্ক্ষা, স্বপ্ন-কল্পনা মেটাবার তাগাদায় পথ চলতে চলতে, পায়ের নিচের মাটিতে পদচিহ্ন এঁকে এঁকে। অগণিত, বিরামহীন এই পদচিহ্নের অধিকাংশই কালের স্থূলহস্তাবলেপে অথবা মানুষের অবহেলায় অবলুপ্ত হয়ে যায় কিছুমাত্র চিহ্ন না রেখে, স্বল্পাংশ মাত্র এদিক সেদিক পড়ে থাকে। ঐগুলির ওপরেই ঐতিহাসিকের নির্ভর।" এই যে চিহ্নের কথা নীহাররঞ্জন বলেছেন, তা আসলে "অতীত মানবসমাজের চিহ্ন বহনকারী পার্থিব অবশেষ।" এইসব প্রত্নচিহ্ন থেকেই একদিকে যেমন জানা যায় নগর, বাড়ি-ঘর, রাস্তাঘাট বা হাত-হাতিয়ারের কথা, তেমনি জানা যায় গাছপালা ও প্রাণীর অস্তিত্বের কথা, জলবায়ু, নদীর গতিপথ বা বন্যার কথা। আর নগরজীবন ও প্রাকৃতিক ধারা — এই দুইয়ে মিলেই তৈরি হয় প্রত্নবসতি। প্রাচীন ভারতের প্রত্নবসতির সমৃদ্ধতম উদাহরণ হরপ্পা-সংস্কৃতি। এর সমৃদ্ধির সূচনা যেমন সিন্ধুনদের প্রাকৃতিক দাক্ষিণ্য থেকে, তেমনি এর অবনতির মূলেও ছিল 'প্রকৃতির প্রতিশোধ'। সুতরাং প্রত্নবসতির সবচাইতে দরকারি আলোচনা, অন্তত ভারতীয় ইতিহাসের প্রেক্ষিতে, হরপ্পা সংস্কৃতিকে কেন্দ্র করেই চলতে পারে।

১০.২.৪ : প্রত্নবসতির আগে

ভূ-প্রত্ন-ঐতিহাসিকরা বলেন, হরপ্পা-সংস্কৃতিরও আগে ভারতীয় ভূ-প্রকৃতির এক দীর্ঘ ইতিহাস আছে। লক্ষ লক্ষ বছর আগে মহাদেশীয় ভূকম্পন-এর ফলে অস্ট্রেলীয় ভূ-স্তর থেকে আলাদা হয়ে ভারতীয় ভূখন্ড জন্ম নিয়েছিল। এই সংগঠন সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বটিকে আমরা 'থিয়োরি অব্ কন্টিনেন্টাল ড্রিফট্' বলে জানি। এরপর খ্রীঃ পূঃ ৩,০০০ অব্দের হরপ্পার স্তরে পৌঁছনোর আগে অন্তত এগারোটি বড় বড় ভূ-তাত্ত্বিক পর্ব অতিক্রম করতে হয়েছিল। সেগুলো হল :

কত বছর আগে	পর্বের নাম	এলাকা ও বৈশিষ্ট্য
১। ৫৭০ মিলিয়ন বছর	কাম্ব্রিয়ান	(ক) পাক সল্টরেঞ্জ, (খ) গাছের শুরু
২। ৩২০ মিলিয়ন	কার্বোনিফেরাস	(ক) গন্ডোয়ানা পার্বত্য অঞ্চল ও দাক্ষিণাত্য
৩। ২৪৮ মিলিয়ন	প্যালিওজোইক	(খ) ধারওয়ার ও বিন্ধ্য অঞ্চল
৪। ২১৩ মিলিয়ন	জুরাসিক	(ক) পশ্চিম রাজস্থান, (খ) কচ্ছ
৫। ১৪৪ মিলিয়ন বছর	ক্রেটাসিয়াস	(ক) গুজরাট
৬। ৬৫ মিলিয়ন বছর	মেসোজোইক	(ক) হিমালয়
৭। ১.৮ মিলিয়ন বছর থেকে ১০,০০০ বছর	প্লিস্টোসিন	(ক) শিবালিক পর্বতমালা (খ) প্রাণের চিহ্ন
৮। ১ মিলিয়ন বছর	পেব্‌ল ফ্লেক	(ক) শোন
৯। ১১,০০০ বছর	পুরনো প্রস্তর যুগ	হলোসিন/বরফের যুগ শেষ হয়ে সমুদ্র ও নদীর সৃষ্টি এবং উৎপাদন সভ্যতার উন্মেষ।
১০।৮,০০০ বছর	মধ্য প্রস্তর যুগ	
১১।৩,০০০ বছর	নব্যপ্রস্তর যুগ	

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে, প্লিস্টোসিন যুগের শেষ দিক থেকে ভারতের জলবায়ু ও আবহাওয়া স্থায়িত্ব অর্জন করে এবং প্রাণীকুল ক্রমশ বসতি স্থাপন ও খাদ্যসংগ্রহ-সংগঠনে অভ্যস্ত হয়। অনুমান করা চলে যে, খ্রীষ্টপূর্ব ৮,০০০ অব্দ থেকে দক্ষিণ এশিয়ার মানুষ প্রকৃতিকে ব্যবহার করে জীবনধারার উন্নতি ঘটাতে শেখে এবং খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০০ অব্দ থেকে শুরু হয় নগর বসতির প্রক্রিয়া। ৩০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দের কিছু আগে পরে তাম্রাশ্মীয়যুগের সূচনা হয়, শুরু হয় হরপ্পা-সংস্কৃতির প্রস্তুতিপর্ব। ঐ সময় থেকে সিন্ধু অববাহিকার প্রত্নবসতি পর্যন্ত সময়কে এইভাবে ভাগ করা যেতে পারে :

খ্রীষ্টপূর্ব	এলাকা ও বৈশিষ্ট্য
৩২০০-২৭০০	শাহর-ই-সোকতা, ‘প্রাচীন পর্ব’
৩২০০-২৬০০	দাম্ব সাদাত বা কোয়েত্তা পণ্য সংস্কৃতি
৩২০০-২৬০০	কোট-দিজি, সোথি সিসওয়াল, আম্রিনাল
৩২০০-২৬০০	চাষবাস, লাঙল ও গরুর গাড়ির ব্যবহার
২৭০০-২১০০	হেলমান্দ সভ্যতা/মেহেরগড়
২৬০০	হাতলের ছিদ্রযুক্ত কুঠার এবং বাটালির ব্যবহার
২৬০০-২৫০০	সিন্ধু সভ্যতার উন্মেষ
২৬০০-২০০০	পরবর্তী কোট-দিজি সংস্কৃতি, কুল্লি সংস্কৃতি
২৫০০-২০০০	পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতি

১০.২.৫ : হরপ্পা ও সিন্ধু প্রত্নবসতির বিস্তার

আনুমানিক দেড় লক্ষ বর্গমাইল এলাকা জুড়ে ছড়িয়ে ছিল সিন্দু সভ্যতার অবশেষ, যখন তার সন্ধান মেলে। পশ্চিমে আফগানিস্থান থেকে ইরান সীমান্ত, উত্তরে তুর্কমেনিয়া, পূর্বে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিমাংশ এবং দক্ষিণে গোদাবরী নদী পর্যন্ত এই প্রত্নবসতির বিস্তার। এর পূর্বাভিমুখী প্রসারণ ঘটেছিল পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর রাজস্থান, এবং পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষার পর এক হরিয়ানাতেই ১৫৩৪টি প্রত্নস্থল পাওয়া গেছে — প্রাক-হরপ্পা থেকে উত্তর-হরপ্পা পর্বের। কলিবংগান, রোপার, বারা, সিসওয়াল, মিথিথাল, বনওয়ালি, ভগবানপুর এবং রাখিগঢ়ি-র মতো প্রত্নস্থলগুলো এই অঞ্চলেই।

শতদ্রু এবং গঙ্গার মধ্যবর্তী অঞ্চলের প্রাচীনতম খাদ্য উৎপাদনকারী গ্রাম-সমাজের সঙ্গে হরপ্পাকালীন সভ্যতার এক ধরনের সংযোগ গড়ে উঠেছিল। সথি বা কলিবংগান থেকে পাওয়া প্রত্নসূত্রের ব্যখ্যা অনুযায়ী, হরপ্পা-ধাঁচের নগরায়ণের আগেই প্রাচীনতম খাদ্য-উৎপাদক গোষ্ঠী এখানে বসতি স্থাপন করেছিল। এই অঞ্চলের সংস্কৃতি সিন্ধু সভ্যতার পর্বেও ছিল বহুমাত্রিক। সিন্ধু সভ্যতার লক্ষণযুক্ত মৃৎপাত্রের পাশাপাশি পাওয়া গেছে স্থানীয় বিশিষ্ট মৃৎপাত্রের পরম্পরার ইঙ্গিত।

১০.২.৬ : প্রত্নবসতির পরিবেশ

দীর্ঘ সময় ধরে নাগরিক অর্থনীতির বিকাশ পরিবেশের ওপর কী প্রভাব ফেলেছিল, সেটাই বড় প্রশ্ন। সাধারণত গ্রাম-অর্থনীতির সমর্থকরা নগর-জীবনকে পরিবেশের পরিপন্থী বলে মনে করেন। কিন্তু হরপ্পা সংস্কৃতি ও তার আগে-পরের নগরায়ণের ইতিহাস থেকে যা বোঝা যায়, তা হল পরিকল্পিত, নিয়ন্ত্রিত ও সুসমঞ্জস নগরায়ণ পরিবেশের পক্ষে তেমন ক্ষতিকর নাও হতে পারে, প্রাকৃতিক ও জৈবিক বৈচিত্র্য নষ্ট না করেও নগর-বসতি তৈরি হতে পারে।

আগেই বলা হয়েছে, প্রাচীন ভারতে ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে নাগরিক বসতির শুরু। অথচ খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১০ থেকে ২২৩০ অব্দের মধ্যে সিন্ধু উপত্যকায় প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়েছিল, বড় বড় তৃণভূমি ও বনাঞ্চলের অস্তিত্ব ছিল এবং সেই 'আর্দ্রপর্ব' কৃষি-বিপ্লব ঘটিয়ে সিন্ধুর নগরায়ণকে সাহায্য করেছিল। রাজস্থানের সরোবর সংক্রান্ত গবেষণা থেকে করা গুরদীপ সিং-এর এই সিদ্ধান্ত হয়তো থর মরুভূমি-এলাকার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়, কিন্তু মোটের ওপর হরপ্পা সংস্কৃতির পরিণতি ও বিস্তার পর্যন্ত যে পরিবেশ মানুষের প্রতিকূলে যায়নি, তা বোঝা গেছে। সিন্ধু যুগেও বড় বড় বনবাসী প্রাণী, গৃহপালিত পশু ও প্রচুর সংখ্যায় 'জেবু' (বুনো গরু) যে ছিল, তা প্রমাণিত হয়েছে ফসিল বিশ্লেষণের সূত্রে। অনেকে 'আর্দ্র' যুগ-এর পর একটা শুষ্কদশা এসেছিল বলে মনে করেন। কিন্তু তা যদি এসেও থাকে, তাহলেও কিন্তু তা বসতির পক্ষে বিপজ্জনক হয়নি, অচিরেই অনুকূল পরিবেশ ফিরে এসেছিল। সিন্ধু অঞ্চলের সামুদ্রিক বাণিজ্য, বাহাওয়ালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত ঘগ্গর-হাক্রা নদীপথ কিংবা লোথাল বা ধোলাভিরার মতো বন্দর-শহর — এ সবই নদী-সমৃদ্ধ অনুকূল পরিবেশের সাক্ষ্য দেয়।

সম্প্রতি দুই প্রত্ন-আবহবিজ্ঞানী অনিল গুপ্ত ও ডেভিড অ্যান্ডারসন জানিয়েছেন, ঐতিহাসিক-পুরাতাত্ত্বিক ও ভূবৈজ্ঞানিক নানা প্রামাণ্য তথ্য ঘেঁটে তারা দেখেছেন যে, হরপ্পা সংস্কৃতির মূল অনুঘটক ছিল অবশ্যই অনুকূল আবহাওয়া। প্রচুর বৃষ্টিপাত, মনোরম জলবায়ু ও উর্বর জমি — এই তিন উপাদানের মেল-বন্ধনই ছিল হরপ্পার নগরায়ণের ভিত্তি।

তাহলে হরপ্পার পতনের জন্যে কি প্রতিকূল আবহাওয়া দায়ী ছিল না? গুপ্ত এবং অ্যান্ডারসন মনে করেন, ছিল, কিন্তু তার কারণ প্রত্নবসতি বা নগরায়ণ নয়, কারণ ছিল অন্যত্র। সেটা তাঁরা খুঁজে পেয়েছেন ওমানের অনতিদূরে আরব সাগরের তলদেশ থেকে উদ্ধার করা পাললিক শিলায়। ঐ শিলায় লুকিয়ে থাকা জলজ উদ্ভিদের জীবাশ্ম পরীক্ষা করে তারা গত দশ হাজার বছরে দক্ষিণ এশিয়া অঞ্চলে মৌসুমী বায়ুর গতিপ্রকৃতির হদিস পেয়েছেন।

ঐ জীবাশ্ম থেকে জানা গেছে যে, খ্রীষ্টজন্মের ছ'হাজার বছর আগেও সিন্ধু সভ্যতার মূল কেন্দ্র

পাকিস্তানের মেহেরগড় সংলগ্ন অঞ্চলের আবহাওয়া যথেষ্ট আর্দ্র ছিল, আর বৃষ্টিপাতের পরিমাণও ছিল চাষবাসের পক্ষে ভাল। কিন্তু হাজার চারেক বছরের মধ্যেই জলবায়ুর চরিত্র বদলে যায়, মৌসুমী বায়ু দুর্বল হয়ে পড়ে, পরিবেশ কঠিন হয়ে যায়। কিন্তু এর জন্য দায়ী হরপ্পা নয়।

গুপ্ত ও অ্যান্ডারসনের ধারণা, আবহাওয়ার এই ভোল বদলের কারণ ছিল উত্তর আটলান্টিক অঞ্চলের জলস্রোতের পরিবর্তন। ভারতীয় উপমহাদেশের বৃষ্টিপাত ঘটত যে মৌসুমী বায়ুর প্রভাবে, তার উৎস ছিল উত্তর আটলান্টিকের উষ্ণ জলস্রোত। সম্ভবত ঐ অঞ্চলের বনধ্বংসের কারণে তাপমাত্রা হঠাৎ বেড়ে যায় এবং উষ্ণ জলস্রোত বিপরীত পথে চালিত হয়। এর প্রভাবেই সিন্ধু উপত্যাকার নদীপ্রবাহ বিপর্যস্ত হয়, বৃষ্টিপাত কমে যায়, কোথাও মরুভূমায়ন ঘটে, আবার কোথাও পলিবদ্ধ নদী বন্যার কারণ হয়। সুতরাং পরিবেশগত কারণে হরপ্পা-র প্রত্নবসতির পতন হলেও হরপ্পার নগরায়ণই যে তার জন্য দায়ী নয়, সেটা স্পষ্ট।

১০.২.৭ : প্রত্নবসতির পরম্পরা

সিন্ধু সভ্যতার পতন থেকে ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়টি ছিল গ্রামীণ-সভ্যতার সময়, এর কেন্দ্রীয় ক্ষেত্র ছিল গাঙ্গেয় উপত্যকা। সংস্কৃতির নায়ক ছিল আর্যরা। এর অর্থ কিন্তু এই নয় যে নগরভিত্তিক প্রত্নবসতির অধ্যায় শেষ হয়ে গিয়েছিল। এটা ছিল একটা সাময়িক ছেদ।

ঋগ্বেদ ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে (অর্থাৎ সংহিতা, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ সূত্র) ইতস্তত বিক্ষিপ্ত পর্বত ও নদীর নাম থেকে ভারতে আর্যদের ক্রমসম্প্রসারণ ও বসতি স্থাপন সম্পর্কে মোটামুটি ধারণা করা যায়। ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের অন্তর্গত নদীস্তুতি এজন্য বিশেষ সহায়ক। ঋগ্বেদে হিমবৎ (হিমালয়) এবং সম্ভবত কাশ্মীরের অন্যতম শৃঙ্গ মুজবন্ত-এর উল্লেখ আছে। এখানে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে বিন্ধ্য পর্বতের উল্লেখ নেই। সুতরাং অনুমান করা যায় যে, ঋগ্বেদের যুগে বিন্ধ্য অঞ্চল আর্য অধিকারের বাইরে ছিল। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে ৩৯টি নদীর উল্লেখ আছে তার মধ্যে প্রায় ২৫টি নদীর নাম ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। গঙ্গা নদীর উল্লেখ একবারের বেশি পাওয়া যায় না। সুতরাং ঋক-বৈদিক আর্যদের কাছে গঙ্গার গুরুত্ব বিশেষ ছিল না, মনে হয়।

আর্যরা আফগানিস্থান সীমান্ত থেকে পাঞ্জাবের সীমান্ত পর্যন্ত প্রসারিত বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে "সপ্তসিন্ধু" আখ্যা দিয়েছিল। "সপ্তসিন্ধু" বলতে পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী (শতদ্রু, বিপাশা, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা এবং বিতস্তা) এবং সিন্ধু ও সরস্বতী বোঝাত। আর্যরা সম্ভবত তাদের অভিপ্রয়াণের দ্বিতীয় পর্যায়ে এই সপ্তসিন্ধু অঞ্চলে এসেছিল। নদীস্তুতিতে মরুদ্বৃধা ও সুশোমা নামে আরও দুইটি নদীর উল্লেখ আছে। এদের মধ্যে প্রথমটি কাশ্মীর-জম্মু এলাকার মধ্য দিয়ে প্রবাহিত। দ্বিতীয়টি রাওয়ালপিন্ডি জেলায়। পরবর্তীকালে আর্যরা পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হয়ে গঙ্গা যমুনা উপত্যকায় বসতি স্থাপন করেছিল। তখন তাদের সরযু নদীর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। সুতরাং বলা যায় যে, এই পর্যায়ে আর্যদের অগ্রগতি আফগানিস্তান, উত্তর

পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, কাশ্মীর, পাঞ্জাব, সিন্ধুর অংশ বিশেষ, রাজস্থান এবং পূর্ব ভারতে সরয়ু নদী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আর্যদের ভৌগোলিক দিগন্ত আরও সম্প্রসারিত হওয়ার আভাস আছে। এই সাহিত্যে পূর্বাঞ্চলের উল্লেখ আরও বেশি করে পাওয়া যায়। সুতরাং বলা চলে যে, এই সময় ইতিহাসের কেন্দ্রবিন্দু সিন্ধুবিধৌত অঞ্চল থেকে মধ্যদেশে অর্থৎ গঙ্গা-যমুনার উপত্যকায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। এই যুগে আর্যরা সরয়ু নদী অতিক্রম করে পূর্বদিকে আরও অগ্রসর হয়েছিল। যমুনাতীরে কোশল, কাশী, উত্তর বিহারে বিদেহ, দক্ষিণ বিহারে মগধ, এবং দক্ষিণ-পূর্ব বিহারে অঙ্গ-র উল্লেখ থেকে একথা জানা যায়। বিন্ধ্য পর্বতের সঙ্গে অপরিচয়ের ব্যবধানও এই যুগে দূর হয়েছিল। এইভাবে হিমালয় থেকে বিন্ধ্য পর্যন্ত সমগ্র ভূখন্ড আর্য অধিকারভূক্ত হওয়ায় আর্যাবর্ত পরিচিত হয়েছিল।

বৈদিক সাহিত্যের পাশাপাশি বেশ কয়েকটি জায়গার প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে এই পর্বের বিকাশ সম্পর্কে জানা যায়। সেগুলো হল নোহ্, যোধপুর, ভগবানপুর, দাধেরি, হস্তিনাপুর, অত্রঞ্জিখেড়া, লালকেল্লা, জাখেড়া, পানিপথ, ইন্দ্রপ্রস্থ, মথুরা, বৈরাট, শোণপুর ও আলমগীরপুর।

১০.২.৮ : নগরজীবনের পুনরাবির্ভাব

একথা সর্বমান্য যে, মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার প্রাকৃতিক পরিবেশ স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজের বিকাশের পক্ষে আদর্শ ছিল। কিন্তু এই ক্রমোন্নত কৃষিকে ভিত্তি করেই খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকে শুরু হয়েছিল পুনর্নগরায়ণ। সেই সময়ে নগরগুলো যে প্রাচ্য অর্থাৎ পূর্বদিকেই ছিল বেশি, সেকথা উল্লেখ করেছেন পাণিনি। দীঘনিকায়ের মহাপরিনিব্বান সুত্ত অনুসারে বুদ্ধের সময়ে নগরের সংখ্যা ছিল ষাট। এর মধ্যে প্রধান ছ'টা ছিল বারাণসী, কৌসাম্বি, চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী ও কুশীনগর। পরে গুপ্তযুগ পর্যন্ত, অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের মধ্যে পাটলিপুত্র, পুরুষপুর, তক্ষশীলা, মথুরা, লক্ষ্মণাপতী — এইসব নগর যুক্ত হয়।

১০.২.৯ : অবিকৃত পরিবেশ

কিন্তু হরপ্পা-সংস্কৃতির সময়েও যেমন, এই পুনর্নগরায়ণের যুগেও পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়নি। তার অন্যতম কারণ অবশ্যই নগর পরিকল্পনার সামঞ্জস্য, গ্রাম দিয়ে শহর ঘিরে রাখা এবং পরিবেশ সম্পর্কে সামাজিক বিধিগুলো মেনে চলা।

পরিবেশ যে নষ্ট হয়নি, তার প্রমাণ বিদেশি পর্যটক বা পর্যবেক্ষকদের সাক্ষ্য। ডোনাল্ড হিউজেস ডিয়োডোরাস, স্ট্র্যাবো এবং প্লুটার্চের বর্ণনার সারকথা লিখেছেন এইভাবে —

"Now India has lofty mountains that abound its trees of every variety including those that bear fruit and many large and fertile plains which are remarkable for their beauty and are supplied with water by a multitude of rivers. The larger part of the country is well watered and for this reason yields two crops each year and it abounds in all kinds of animals."

ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্ব শতকে স্কাইল্যাক্সের দেওয়া বর্ণনার প্রতিধ্বনি যেন এটা। স্কাইল্যাক্স তখন লিখেছিলেন :

"A mountain range extends on both sides of the Indus river covered with virgin forest and with the thorny Kunara (wild rose)."

১০.২.১০ : সারসংক্ষেপ

প্রাচীন ভারতে প্রায় ছ'হাজার বছর আগে শুরু হয়েছিল নগরায়ণ। হরপ্পা সভ্যতায় সেই প্রথম পর্বের নগরায়ণের পরিণতি। তারপর প্রায় হাজার বছরের বিরতি। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের পর পুনর্নগরায়ণ। প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে এই জীবনের যেসব চিহ্ন পাওয়া গেছে, তাতে মিলেছে সমৃদ্ধ প্রত্নবসতির সন্ধান। পরিবেশের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে নগরের পরিকল্পনা করলে যে প্রতিকূলতার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায়, তারই ইঙ্গিত পাওয়া গেছে এই প্রত্নবসতির ইতিহাসে। প্রাচীন ভারতে বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে নগরায়ণ হয়েছিল, প্রত্নবসতির বিকাশ ঘটেছিল, তবু আহত হয়নি প্রকৃতি, বিঘ্নিত হয়নি বাস্তু-পরিবেশ।

১০.২.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

রণবীর চক্রবর্তী : প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে

এ. এল. ব্যাসাম : অতীতের উজ্জ্বল ভারত

Donald Hughes : Early Ecological knowledge of India

Richard Grove এবং
অন্যান্য সম্পাদিত : Nature and the Orient

১০.২.১২ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(ক) প্রত্নবসতি বলতে কী বোঝায় ?

(খ) প্লিস্টোসিন যুগ গুরুত্বপূর্ণ কেন ?

(গ) কোন যুগে প্রথম গাছের জন্ম হয়েছিল ?

(ঘ) কোন্ সময়ে ভারতে প্রথম লাঙলের ব্যবহার শুরু হয় ?

(ঙ) সিন্ধু সভ্যতার বিস্তৃতি কতদূর ছিল ?

(চ) আর্দ্রপর্ব কাকে বলে ?

(ছ) 'জেবু' কাকে বলা হয় ?

(জ) মৌসুমী বায়ুর দশহাজার বছরের ইতিহাস কারা লিখেছেন ?

(ঝ) আর্যাবর্ত কোন অঞ্চলকে বলা হয় ?

(ঞ) বৌদ্ধ সাহিত্যে কতগুলো ভারতীয় নগরের উল্লেখ করা হয়েছে ?

অনুশীলনী — বড় উত্তরের জন্য

(ক) প্রাক্-হরপ্পা যুগের প্রত্নবসতিস্তরগুলোর পরিচয় দাও। সিন্ধু সভ্যতা কতদূর বিস্তৃত ছিল ?

(খ) পরিবেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতীয় নগরায়ণের কোন বিরোধ ছিল কি ? সিন্ধু সভ্যতার অবক্ষয়ের পেছনে পরিবেশের কোন ভূমিকা ছিল কিনা আলোচনা কর।

(গ) বৈদিক প্রকৃতির কী পরিচয় বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় ? প্রাচীন ভারতের পরিবেশ সম্পর্কে বিদেশি লেখকরা কী বলেছেন ?

’Ÿ> þÞM

পর্যায় গ্রন্থ - ২

Expansion of Agriculture and Geographical Zones

একক - ৩

Expansion of Agriculture

কৃষিকাজের সম্প্রসারণ

!î˜Äÿ¢ « ƒ

10.2.3.1 ƒ þÞ"Å,,þÿ
10.2.3.2 ƒ „þ¦ì îÄîßþî û√þ¼î
10.2.3.3 ƒ ²ÿ,,þ¢ú !"þÿ!¢,,þë¢ÿ „þ¦ì îÄîßþ
10.2.3.3.1 ƒ ‹œ îÿë¢ç „þ¦ì îÄîßþî û¢Á™,,Åþ
10.2.3.4 ƒ ú !"þÿ!¢,,þë¢ÿ „þ¦ì îÄîßþ
10.2.3.4.1 ƒ !ŸÒ !î²õîî îû²¦ þî
10.2.3.5 ƒ xÿ•‰,,þë¢ÿ „þ¦ì îÄîßþ
10.2.3.6 ƒ „þ¦ì îÄîßþ ç ›ÿ˜ î ¢›ÿ ‹
10.2.3.7 ƒ „þ¦ì îÄîßþî û!î "Åþ ç ²ÿ,,þ"þ,þþÞM!îõîŸ
10.2.3.8 ƒ vþÞM¢£ÿîû
10.2.3.9 ƒ ¢£ÿë û,þ@ù þîœ#
10.2.3.10 ƒ ¢½þîÄ ²ÙÅîœ#

10.2.3.1 ƒ þÞ"Å,,þÿ

অতি প্রাচীনকালে মানুষ খাদ্যের ¢õ|þõî এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। তাদের কোন স্থায়ী বাসস্থান ছিল না। বুদ্ধি বিকাশ তখন ছিল অসম্পূর্ণ। ক্রমে মানুষ পশুপালন করতে শিখল। পশুপালন অনেকাংশে মানুষকে দিল …ÿ"Ä নিশ্চয়তা। মানুষ তখনও এক স্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত পশুখাদ্যের সন্ধানে।

পৃথিবীতে তখন শুরু হয়েছে উষ্ণ যুগ। উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উদ্ভিদ জগতের আরো উত্তর-দক্ষিণে বিস্তার ঘটল। গড়ে উঠল মানুষের বসবাস করার জন্য নূতন নূতন যথোপযুক্ত ভৌগোলিক অঞ্চল। সময়ের সাথে সাথে মানুষ কৃষিকাজ করার পদ্ধতিও নিজের করায়ত্ত করেছে। ফলে অনুকূল প্রাকৃতিক অঞ্চলগুলিতে মানুষ বসবাস শুরু করে এবং কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করে। ক্রমে কৃষিকাজ মানবজীবনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটাল। পৃথিবীব্যাপী গড়ে ওঠা সমাজব্যবস্থাই এই সময়কার প্রকৃত ঐতিহাসিক নিদর্শন।

উষ্ণায়ন পৃথিবীর বহু স্থানে কৃষি আরো বিস্তার ঘটাল। এই কৃষির উপর নির্ভর করে মানবসমাজও ক্রমশ সুসংবদ্ধ রূপ পেল। সুসংবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থায় ক্রমে ক্রমে জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং অধিক খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন অবশ্যম্ভাবী হল। কৃষিকাজে এল ব্যাপক পরিবর্তন। উন্নত প্রথায় চাষবাস খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক হলেও অনেকাংশে প্রাকৃতিক পরিবেশে তার প্রভাব বাস্তুতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে পড়েছে।

10.2.3.2 ƒ,,,|þi ïÄïŠþïÙwþi

পৃথিবীতে কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভব নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে মতভেদ আছে। তথাপি প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে আজ থেকে প্রায় ১১০০ বছর আগে মধ্য এশিয়ার পার্বত্য অঞ্চলে কৃষি ব্যবস্থার প্রথম সূত্রপাত হয়। ঐ সময় এই অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর খাদ্য তালিকায় পশুখাদ্য ছাড়া বন্য গম ও বার্লি অন্তর্ভুক্ত ছিল।

একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না যে মানুষ সচেতনভাবে অথবা অবচেতনভাবে কৃষিকাজ শুরু করেছিল। যেভাবেই কৃষি ব্যবস্থার সূত্রপাত হোক না কেন মানুষ পশুখাদ্য ছাড়া বন্য শস্যকে তাদের খাদ্য তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল প্রায় ১১০০০ বছর আগে। অপর এক গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে পূর্ব তুর্কি অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী স্থানান্তরে গমন করত প্রধানত শস্য সংগ্রহের জন্য। অধ্যাপক রাইট এর সপক্ষে মতবাদ পোষণ করেন। এই অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীই ইতিহাসে প্রথম কৃষি গ্রামরূপে আত্মপ্রকাশ করে।

10.2.3.3 ƒ²ì,,ÉÕü!'Þ!Ç,|ëëê ,,,|þi ïÄïŠþ

কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন মানব সভ্যতার এক ঐতিহাসিক ঘটনা। প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে কৃষি ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল মূলতঃ নদী অববাহিকা অঞ্চলে। কারণ এই অঞ্চলগুলি শস্য উৎপাদনে সহায়ক ছিল। এই অঞ্চলে প্রধানত খাদ্যশস্যের চাষবাস করা হত। প্রধানত গম, বার্লি, ভুট্টা ও ধান জাতীয় দানা শস্য এবং ছোলা ও ডাল জাতীয় শস্য উৎপাদন করা হত। স্থানভেদে তুলা ও আখের চাষের প্রচলন ছিল। এই সময়ে উৎপাদিত খাদ্যশস্য অধিবাসীদের দিয়েছিল খাদ্যে নিশ্চয়তা।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীব্যাপী উষ্ণায়নের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। শুরু হয় অভিযোজন প্রক্রিয়া। পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীকুল ব্যস্ত হয়ে পড়ে এই অভিযোজন প্রক্রিয়ায়। এরই মধ্য দিয়ে প্রায় নিঃশব্দে ঘটে চলে কৃষি ব্যবস্থার বিকাশ।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে জলবায়ুর পরিবর্তন কৃষি ব্যবস্থায়ও বিবর্তন আসে। লিপিবদ্ধ তথ্যের অভাবে আজ তা আমাদের অজানা। তথাপি পৃথিবীব্যাপী সেই সময় যে সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল তার ধ্বংসাবশেষ থেকে

প্রাপ্ত তথ্য এই কথাই প্রমাণ করে যে সমসাময়িক সভ্যতার মূল ভিত্তি ছিল কৃষি। একথা বলাই বাহুল্য যে এই সময় প্রাকৃতিক পরিবেশেল বিবর্তনের সাথে কৃষি ব্যবস্থায় বিবর্তনের সমন্বয় না হওয়ায় অনেকস্থানে কৃষি ব্যবস্থায় বিপর্যয় ঘটে।

10.2.3.3.1 ƒ œeÎyë©¢ç ,,|þ¡i ÎÄ¡I$þ¡Ú¢Á™,,Åþ

জলবায়ু কৃষি ব্যবস্থার মূল উপাদান। কারণ উপযুক্ত উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত শস্য উৎপাদনের সহায়ক। হিম যুগের পর উষ্ণযুগের সূচনা পৃথিবীব্যাপী অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ তৈরী করে। এই সমস্ত অনুকূল প্রাকৃতিক অঞ্চল বিশেষরূপে চিহ্নিত হয় কৃষিকাজের জন্য। প্রাথমিক পর্যায়ে এই সমস্ত অঞ্চল কৃষি ব্যবস্থার আওতায় আসে। ক্রমে শস্য বৈচিত্র্য ও অন্য জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলগুলিতে প্রসার লাভ করে।

কৃষি ব্যবস্থা উদ্ভাবনের সাথে সাথে মানবগোষ্ঠী যে সমস্ত শস্যগুলিকে চিহ্নিত করেছিল সময়ের সাথে সাথে তার বিবর্তন ঘটে। উন্নততর বীজ ও প্রযুক্তির সাহায্যে আসে কৃষি বিপ্লব। প্রধানত জলবায়ুর উপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করার উদ্দেশ্যে আধুনিক কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন হয়। তবুও পৃথিবীর অনেকস্থানে কৃষি ব্যবস্থার সাফল্য বা ব্যর্থতা আজও জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল।

10.2.3.4 ƒú!‘þ!¢,|ëé¢ôb ,,|þ¡i ÎÄ¡I$þ

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভব হলেও বহু যুগ ধরে একই প্রথায় কৃষিকাজ করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিক যুগে প্রথমদিকে এই ব্যবস্থার তেমন কোন পরিবর্তন হয়নি।

ঐতিহাসিক যুগে ব্যণিজ্যের প্রসার ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি খাদ্যের চাহিদা অনেকাংশে বৃদ্ধি পেল। প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থায় অনুরূপ পরিমাণ খাদ্য উৎপাদনে প্রায় অনিশ্চয়তা দেখা দিল। প্রয়োজন হল উন্নততর কৃষি ব্যবস্থা যা প্রয়োজনীয় খাদ্য উৎপাদনে সহায়ক। কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন ক্রমশ কৃষি বিপ্লবের পর্যায়ে উন্নীত হল।

10.2.3.4.1 ƒ !ŸÒ !I²ÕÎ¡ÎÚ²|¦þô

সপ্তদশ শতকে শিল্প বিপ্লব এক যুগান্তকারী ঐতিহাসিক ঘটনা। শিল্প বিপ্লবের ফলে মানুষের দৃষ্টি কৃষি অপেক্ষা শিল্পের দিকে বেশী করে নিবদ্ধ হল এবং শিল্পের চাহিদা মেটাতে কৃষি ব্যবস্থায়ও পরিবর্তন সূচিত হল। বিপুল পরিমাণ কৃষিজাত সামগ্রী উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন অনেক বেশী কৃষিযোগ্য জমি। ফলে অনেক নূতন স্থানকে কৃষিকাজের আওতায় আনা হল। কৃষির ব্যাপ্তি ঘটল। একইসঙ্গে চলল কৃষির বিবর্তন। বিবর্তনের ধারায় এল নানা ধরনের নূতন ফসল। গবেষণালব্ধ জ্ঞানের সাহায্যে কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তনের ধারা আজও অক্ষুণ্ণ আছে।

10.2.3.5 ƒ×y•%,|ëé¢ôb ,,|þ¡i ÎÄ¡I$þ

বিংশ শতাব্দীতে কৃষির যে বিপ্লব সূচিত হয় তার গোড়াপত্তন হয়েছিল উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে।

বস্তুত পক্ষে ঐ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের প্রভুত উন্নতির সাথে সাথে কৃষি ব্যবস্থায় পরিবর্তন আনা সম্ভব হয়।

উন্নত প্রথায় চাষ আবাদ করার সাথে সাথে কৃষি কাজে জলসেচ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ও যন্ত্রের ব্যবহার ফসল উৎপাদনকে অনেকগুণ বাড়িয়ে তুলল। মানুষ অধিক ফসল উৎপাদনের জন্য যথেচ্ছভাবে সার ও কীটনাশকের ব্যবহার শুরু করে। ফলস্বরূপ বহুক্ষেত্রে মাটির কার্যকারীতা নষ্ট হয়ে যায়। অপরপক্ষে উন্নত প্রথায় কৃষির অন্যতম প্রধান চাহিদা হল সেচ ব্যবস্থা। এই সেচ ব্যবস্থা প্রচলনে স্বাদু জলের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেল। অনেকস্থানে জল দূষণের প্রধান কারণই এই সেচ ব্যবস্থা যা পরবর্তীকালে এক ভয়ঙ্কর জনস্বাস্থ্য সমস্যারূপে অধিক পরিচিত হল।

10.2.3.6 ƒ,,|þi ïÄI‡þç ›y˜ î Φy <

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগে মানুষ কিভাবে কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল তা আজ অজানা। এ নিয়ে মতভেদ আছে। তথাপি মানুষ নিজ প্রয়োজনে খাদ্যে নিশ্চয়তা পাওয়ার জন্য কৃষিব্যবস্থার প্রচলন করেছিল।

নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে মানবগোষ্ঠী পশুখাদ্যের সাথে সাথে বন্য শস্য সংগ্রহ করত প্রধানত খাদ্যে নিশ্চয়তা অর্জন করার জন্য। অপর এক গবেষণালব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে কৃষিকাজ মানব সমাজে নিরন্তর খাদ্যভাব ও দুর্দশা থেকে উদ্ভব।

অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে মানবগোষ্ঠী কৃষিকাজের সম্ভাবনায় নূতন স্থানের খোঁজ করতে শুরু করে এই এবং অল্প সময়ে একই স্থানে ফসল উৎপাদনের জন্য স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। কালক্রমে শুরু হয় কৃষির বিস্তার। খাদ্যে নিশ্চয়তা লাভ করে মানবগোষ্ঠী। এই নিশ্চয়তা মানবগোষ্ঠীকে উন্নত সমাজ গঠনে উৎসাহিত করে।

প্রাক্-ঐতিহাসিক যুগেও মানবগোষ্ঠী কৃষি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করে উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। পরবর্তীকালে কৃষির বিপর্যয় এই উন্নত সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসের কারণ হয়।

10.2.3.7 ƒ,,|þi ïÄI‡þûl î '‡þç ²Ì,,|þ',,þþ‡îüiŸ

কৃষি ব্যবস্থার সূত্রপাত থেকে আজ পর্যন্ত আনুমানিক প্রায় ১১০০০ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। এই বিশাল সময়ে এসেছে যেমন শস্যের বৈচিত্র্য তেমনি শস্য উৎপাদনেও। বাস্তুতঃ বিজ্ঞানের অগ্রগতির সাথে সাথে কৃষির অগ্রগতিও এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

প্রাথমিক পর্যায়ে খাদ্য উৎপাদন মানুষর জীবন ধারণের পক্ষে যথেষ্ট হলেও পরবর্তীকালে তার ব্যাপকতা বৃদ্ধি পায়। বাণিজ্যের প্রসার, শিল্প বিপ্লব ও আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় কৃষির বিবর্তন প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। অধিকতর খাদ্য উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন অনেক বেশী কৃষিযোগ্য জমি। জমির প্রয়োজনে বনভূমিকে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করা হয়। ফলস্বরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটে। বহুস্থানের বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন কৃষির সহায়ক হয়নি। কৃষির প্রয়োজনে আজও মানুষ প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিনষ্ট করছে ফলস্বরূপ নানাস্থানে কৃষিকাজের উপর তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে।

10.2.3.8 ƒvµ¶ÇÇ,y îÛ

আজ থেকে ১১০০০ বছর আগে মানুষ যে কৃষি ব্যবস্থার প্রচলন করেছিল, সময়ের সাথে সাথে তার বহু বিবর্তন ঘটেছে। এসেছে নূতন ধরনের Ÿ¡Å- নূতন প্রযুক্তি। ঘটেছে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার পরিবর্তন। কৃষিবিপ্লব এনেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের আমূল পরিবর্তন। ফলস্বরূপ বহুস্থানে বাস্তুতন্ত্রের ঘটেছে বিপুল পরিবর্তন। বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন কৃষি কাজের দিশারী রূপে আত্মপ্রকাশ এক ঐতিহাসিক ঘটনা।

10.2.3.9 ƒ ¢Eyë,¸|@ùl|ôœ#

১। The agricultural revolution of the 20th Century -- Don Paarlberg, and Philip Paarlberg, Iowa State University Press, 2000.

২। Historical geography of crop plants : A selected roster, Boca Ratan, USA, 1993.

10.2.3.10 ƒ ¢¼|ôÄ²ùl/Àœ#

১। কোথায়, কিভাবে কৃষি ব্যবস্থার উদ্ভব হয়?

২। ঐতিহাসিক যুগে কৃষি ব্যবস্থা সম্পর্কে তোমার নিজস্ব মতামত ব্যক্ত কর।

৩। মানব সমাজে কৃষি ব্যবস্থার প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

EXPANSION OF AGRICULTURE AND GEOGRAPHICAL ZONES

একক - ৪

Geographical zones (forests, mountains, river systems, oceans, deserts)

বিন্যাসক্রম :

১০.২.৪.১ : পূর্বকথা
১০.২.৪.২ : ভৌগোলিক অঞ্চল কি ?
১০.২.৪.৩ : ভৌগোলিক অঞ্চলের উদ্ভব
১০.২.৪.৪ : ভৌগোলিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য
১০.২.৪.৪.১ : ভূপ্রকৃতি
১০.২.৪.৪.২ : জলবায়ু
১০.২.৪.৪.৩ : মৃত্তিকা
১০.২.৪.৪.৪ : স্বাভাবিক উদ্ভিদ
১০.২.৪.৪.৫ : প্রাণীকূল
১০.২.৪.৪.৬ : অধিবাসী
১০.২.৪.৫ : মানুষের কার্যশৈলী
১০.২.৪.৫.১ : বনভূমি
১০.২.৪.৫.২ : পার্বত্যভূমি
১০.২.৪.৫.৩ : নদীতন্ত্র
১০.২.৪.৫.৪ : সমুদ্র
১০.২.৪.৫.৫ : মরুভূমি
১০.২.৪.৬ : উপসংহার
১০.২.৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী
১০.২.৪.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.২.৪.১ : পূর্বকথা

সৃষ্টির পর থেকে পৃথিবীতে নানা বিবর্তন ঘটেছে। বিবর্তনের এই ধারায় পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশেরও পরিবর্তন ঘটেছে। জলবায়ু, আজকের পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ গড়ার মূল উপাদান। প্রধানত জলবায়ুর উপর নির্ভর করে পৃথিবীতে প্রধান প্রধান ভৌগলিক অঞ্চলগুলি গড়ে উঠেছে।

অতি প্রাচীন কাল থেকে পৃথিবীতে মানবজাতির জীবনধারাও গড়ে উঠেছে প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে। প্রাকৃতিক এই পরিবেশ বোঝাতে আমরা সাধারণত ভূমিরূপ, নদনদীর বিন্যাস, জলবায়ু, মৃত্তিকার উপাদান, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, প্রাণীজ সম্পদ ও খনিজ সম্পদের লভ্যতাকে বুঝি। বৈজ্ঞানিকদের মতে পৃথিবীতে প্রাকৃতিক সম্পদের লভ্যতা মূলতঃ ভৌগলিক অঞ্চলের স্বরূপের উপর নির্ভর করে, যা জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। ফলস্বরূপ মানবজাতির জীবনযাপন ও অর্থনৈতিক কার্যকলাপ স্থানভেদে বিভিন্ন। একই মহাদেশের ভিন্ন ভিন্ন ভৌগলিক অঞ্চল মানবজাতির জীবনযাপন পদ্ধতিকে বিশেষরূপে প্রভাবিত করে। কৃষি ও শিল্প বিস্তারের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এ সম্পর্কে বিশদ আলোকপাত করা সম্ভব।

১০.২.৪.২ : ভৌগোলিক অঞ্চল কি?

পৃথিবীতে যেসব অঞ্চলের জলবায়ু, স্বাভাবিক উদ্ভিদ, মানবজাতি ও তাঁদের কাজ করবার ও অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি একই রকম সেইসব অঞ্চলকে ভৌগলিক অঞ্চল বলা হয়। যেমন নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চল, মরু অঞ্চল, নদী উপত্যকার সমভূমি অঞ্চল ইত্যাদি।

১০.২.৪.৩ : ভৌগোলিক অঞ্চলের উদ্ভব

উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের উপর নির্ভর করে পৃথিবীর স্থলভাগকে মূলতঃ উষ্ণ অঞ্চল, নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চল ও ঠাণ্ডা অঞ্চলে ভাগ করা হয়ে থাকে। যদিও স্থানীয়ভাবে প্রতিটি বৃহৎ অঞ্চল আবার অনেকগুলি ছোট ছোট অঞ্চলে বিভক্ত।

প্রাক-ঐতিহাসিক যুগে উষ্ণায়নের ফলে সমগ্র পৃথিবীতে ঘটে যায় আমূল প্রাকৃতিক পরিবর্তন। পরিবর্তনের সূত্র ধরে গড়ে উঠে একই প্রকার বৃক্ষরাজির সমষ্টি। তৈরি হয় অনুকূল প্রাকৃতিক পরিবেশ। ধীরে ধীরে প্রাণীকূলের সমাবেশ ঘটে। জীব জগৎ ও জড় জগতের সমন্বয়ে গড়ে উঠে ভৌগোলিক অঞ্চল। পরবর্তীকালে মানুষ এইসব ভৌগোলিক অঞ্চলগুলির উপর নির্ভর করে জীবনযাপনে অভ্যস্থ হয়। গড়ে তোলে সমাজব্যবস্থা, সংস্কৃতি, ধর্মাচরণ, খাদ্যাভ্যাস, পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি। মানবজীবনের পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রভাব সহজেই অনুমান করা যায়।

১০.২.৪.৪ : ভৌগোলিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য

ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা, বৃক্ষরাজি, প্রাণীসমূহ ও অধিবাসী প্রভৃতি কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্য। তাই কোন নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদকে ব্যবহার করে অধিবাসীদের যে জীবনযাত্রা প্রণালী গড়ে উঠে তা ঐ অঞ্চলের ভৌগোলিক পরিবেশের বৈশিষ্ট্যকে নির্দেশ করে।

১০.২.৪.৪.১ : ভূপ্রকৃতি

ভূপ্রকৃতি ভৌগোলিক অঞ্চলের অবিচ্ছেদ্য অংশ। সৃষ্টির পর থেকে নানা বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে আজকের পৃথিবী। ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন গড়ে তুলেছে নানা ভূপ্রাকৃতিক পরিবেশ। আবার প্রাকৃতিক নিয়মে ক্ষয়চক্রের মাধ্যমে তার অবলুপ্তিও ঘটেছে। ক্রমাগত এই ভাঙাগড়ার মধ্য দিয়ে সচল রয়েছে পৃথিবীর ভূপ্রকৃতি।

ভূপ্রকৃতিকে মূলতঃ পর্বত, মালভূমি ও সমভূমি এই তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়। স্থানবিশেষে প্রতিটি ভাগের মধ্যে অনেক বৈসাদৃশ্য দেখা যায়। এই বৈসাদৃশ্যই গড়ে তুলেছে এক একটি নির্দিষ্ট ভৌগোলিক অঞ্চল। যেমন হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, তিব্বতের মালভূমি অঞ্চল প্রভৃতি।

১০.২.৪.৪.২ : জলবায়ু

বৃক্ষরাজি ও প্রাণীসমূহের বিস্তার লাভে জলবায়ু, ভূপ্রকৃতি ও মৃত্তিকা মূল ভূমিকা গ্রহণ করে। তাই ভৌগোলিক অঞ্চল গঠনে জলবায়ুর ভূমিকাই মুখ্য। প্রাক-ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জলবায়ুর অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। তার সাথে সাথে জীবকূল ও বৃক্ষরাজির ঘটেছে বিবর্তন। বিবর্তনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে নানারকমের ভৌগোলিক অঞ্চল।

১০.২.৪.৪.৩ : মৃত্তিকা

ভূপ্রকৃতির গঠন ও জলবায়ুর প্রভাবে তৈরি হয় মৃত্তিকা। মৃত্তিকার উপর নির্ভর করে গড়ে উঠে গাছপালা। গাছপালা অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। মানুষের জীবনযাপন প্রণালী ও সমৃদ্ধি অনেকাংশে ভৌগোলিক অঞ্চলের মৃত্তিকার গঠনের উপর নির্ভরশীল।

১০.২.৪.৪.৪ : স্বাভাবিক উদ্ভিদ

স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী ভৌগোলিক অঞ্চলগুলিকে চিহ্নিত করা হয়। যেমন নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চল, সাভানা তৃণভূমি অঞ্চল, মরু অঞ্চল ইত্যাদি। স্বাভাবিক উদ্ভিদ একটি অন্যতম প্রাকৃতিক সম্পদ। প্রধানত ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু ও মৃত্তিকার গুণাগুণের উপর নির্ভর করে এক একটি স্বাভাবিক উদ্ভিদ যুক্ত ভৌগোলিক অঞ্চল গড়ে উঠেছে।

১০.২.৪.৪.৫ : প্রাণীকূল

প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভর করে জীবকূলের বিকাশ ঘটে। তাই ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতাই জীবকূলের বিভিন্নতাকেই সূচিত করে। ফলস্বরূপ মরু অঞ্চলে যেসমস্ত জীব দেখা যায় নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চলে তা দেখা যায় না।

১০.২.৪.৪.৬ : অধিবাসী

ভৌগোলিক অঞ্চলের বৈশিষ্ট্যই অধিবাসীদের জীবনযাত্রাকে প্রভাবিত করে। স্বাভাবিকভাবে অনুকূল ভৌগোলিক অঞ্চলে মানুষের বসবাস অন্যান্য অঞ্চল থেকে উন্নত। জীবনযাত্রার ভিন্নতাই ভৌগোলিক অঞ্চলের ভিন্নতাকে নির্দেশ করে। তাই নদী অববাহিকা অঞ্চলে জনবসতি অন্যান্য অঞ্চল থেকে অনেক বেশি। অনুকূল ভৌগোলিক অঞ্চলে মানুষ অতি প্রাচীন কাল থেকে বসবাস করে আসছে। এখানেই তাঁরা গড়ে তুলেছে সভ্যতা, সংস্কৃতি। ইতিহাস আজও তার সাক্ষ্য বহন করে চলেছে।

১০.২.৪.৫ : মানুষের কার্যশৈলী

ভূপ্রকৃতি, জলবায়ু, মৃত্তিকা এবং তার সাথে সাথে স্বাভাবিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকূলের বিকাশ ও বিস্তৃতি নিয়ে গড়ে উঠেছে বিভিন্ন প্রকার ভৌগোলিক অঞ্চল। এক একটি ভৌগোলিক অঞ্চল এক এক রকমের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বিরাজমান। যেহেতু ভূপ্রকৃতি ও জলবায়ুর বৈসাদৃশ্য পৃথিবীর বিবর্তনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত তাই ভৌগোলিক অঞ্চলের এত ভিন্নতা।

মানুষের জীবন যাত্রার স্বরূপ বিশ্লেষণে ভৌগোলিক অঞ্চলের গুরুত্ব অন্যতম। মানবসভ্যতার ইতিহাস অনুসন্ধানেও ভৌগোলিক অঞ্চলের আলোচনা প্রয়োজনীয়। সভ্যতার ঊষালগ্নে মানুষ যখন খাদ্যের অনুসন্ধানে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে গমন শুরু করে তখন তারা বিশেষ বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলগুলিকে বেছে নেয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। সূচনা হয় মানব সভ্যতার ইতিহাস।

১০.২.৪.৪.১ : বনভূমি

স্বাভাবিক উদ্ভিদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী এক একটি ভৌগোলিক অঞ্চলের নামকরণ করা হয়। যেমন নিরক্ষীয় বনভূমি অঞ্চল, পর্ণমোচী বনভূমি অঞ্চল, সাভানা তৃণভূমি অঞ্চল ইত্যাদি।

বনভূমি অঞ্চলের উদ্ভিদের বিন্যাস, ঘনত্ব ও বিকাশ ঐ অঞ্চলের প্রাপ্ত প্রাকৃতিক সম্পদের মধ্যে অন্যতম। মানুষ প্রথম পর্যায়ে খাদ্য সংগ্রহের তাগিদে বনভূমির কাছাকাছি বসবাস শুরু করে। কালক্রমে তারা বনভূমি ছেড়ে নদী অববাহিকার সমভূমি অঞ্চলে বসবাস শুরু করে। মানবসভ্যতার পালাবদল ঘটে। এই পালাবদলের ইতিহাসে বনভূমির গুরুত্ব ক্রমে ক্রমে বাড়তে থাকে। বনভূমি থেকে সংগৃহীত সম্পদ মানুষ বিভিন্ন কাজে লাগাতে থাকে। অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ পৃথিবীতে বনভূমির পরিমাণ ক্রমশ কমতে

থাকে। ঘটে যায় বাস্তুতন্ত্রের পরিবর্তন। মানুষ তার অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান থেকে বনভূমির প্রয়োজন উপলব্ধি করে এবং সংরক্ষণের প্রয়োজনীয় তাগিদ অনুভব করে। তাই বনভূমি সংরক্ষণের কর্মসূচী আজ সর্বাধিক গুরুত্ব পেয়েছে।

১০.২.৪.৪.২ : পার্বত্যভূমি

ভূপ্রকৃতির ভিন্নতার অন্যতম বৈশিষ্ট্যই পার্বত্য ভূমি। পার্বত্য ভূমি এক একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল গড়ে তুলেছে। যেমন হিমালয় পার্বত্য অঞ্চল, আল্পস পার্বত্য অঞ্চল ইত্যাদি। পৃথিবীর বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল বিচিত্র প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। অপরপক্ষে পার্বত্যভূমির বৈশিষ্ট্যই মানব গোষ্ঠীর জীবন যাত্রা প্রণালীকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করে। তাই পার্বত্য অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর সঙ্গে সমভূমির জনগোষ্ঠীর জীবনযাপন পদ্ধতির পার্থক্য দেখা যায়।

১০.২.৪.৪.৩ : নদীতন্ত্র

ভৌগোলিক অঞ্চলের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য হল নদীতন্ত্র। অতি প্রাচীন কাল থেকে মানব সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল নদীকে কেন্দ্র করে। নদী একাধারে পানীয় জলের উৎস হিসাবে এবং প্রয়োজনে শষ্য উৎপাদনে সেচের উৎস হিসাবে মানব সভ্যতায় গুরুত্ব পেয়েছে। নদীর নাব্যতাকে কাজে লাগিয়ে মানুষ এক স্থান থেকে অন্যস্থানে যাতায়াতের ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। নদীতন্ত্রের কল্যাণময় দিকগুলি ছাড়াও এর ধ্বংসাত্মক দিকও বর্তমান। বন্যার প্রভাবে বহু মানব সভ্যতার বিনাশ ঘটেছে। এর বহু নিদর্শন ইতিহাসে লিপিবদ্ধ আছে।

১০.২.৪.৪.৪ : সমুদ্র

পৃথিবীতে সমুদ্রের বিস্তার বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। তথাপি তাদের মধ্যে একটা বিশেষ সাদৃশ্য আছে। সমুদ্র অফুরন্ত সম্পদে ভরপুর। সৃষ্টির আদি থেকে মানুষ প্রথমে সমুদ্র উপকূলের কাছে ঘুরে বেড়াত খাদ্যের অনুসন্ধানে। সভ্যতা বিকাশের সাথে সাথে মানুষ সমুদ্রকে কাজে লাগায় সম্পদ সংগ্রহে এবং যাতায়াতের প্রয়োজনে। সমুদ্র উপকূলবর্তী অঞ্চলকে বেছে নেয় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য। আধুনিক যন্ত্র সভ্যতার যুগে মানুষ বসবাস ছাড়া কল-কারখানা স্থাপন করার জন্য সমুদ্র উপকূলকে নির্বাচন করে।

১০.২.৪.৪.৫ : মরুভূমি

মরুভূমি তৈরি হয়েছে মূলতঃ জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সাথে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে অবাস্থিত মরুভূমিগুলি এক একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল নির্দেশ করে, যা প্রধানত জলশূন্য, বৃক্ষহীন, রুক্ষ অঞ্চল নামে পরিচিত।

মরু অঞ্চলে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতি সম্পূর্ণভাবে পৃথক। এই অঞ্চলের অধিবাসীরা যাযাবর। এক স্থান থেকে অন্য স্থানে পশুখাদ্যের সন্ধানে তাঁরা ঘুরে বেড়ায়। কৃষিকাজ প্রায় অসম্ভব। স্থানে স্থানে মরুদ্যানে খেজুর ইত্যাদির চাষ করা হয়।

মরু অঞ্চল নানা প্রকার খনিজ সম্পদে ভরপুর। খনিজ তৈল তাদের মধ্যে অন্যতম। মরু অঞ্চলের অধিবাসীরা খনিজ তৈল আহরণ করে অনেক স্থানে আধুনিক নগর সভ্যতা গড়ে তুলেছে।

১০.২.৪.৬ : উপসংহার

বিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবীতে গড়ে উঠেছে নানা ভৌগোলিক অঞ্চল। যা করে তুলেছে বৈচিত্রময় পৃথিবী। স্বয়ংসম্পূর্ণ এইসব অঞ্চলগুলি বিভিন্ন প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিও অনেকাংশে এইসব ভৌগোলিক অঞ্চলের প্রাকৃতিক সম্পদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তাই অঞ্চলভেদে মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতির অনেক বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়।

১০.২.৪.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। এ. এন. স্ট্রেলার : **প্রাকৃতিক ভূগোল** : তৃতীয় সংস্করণ উইলি ইষ্টার্ন প্রাইভেট লিমিটেড, নতুন দিল্লী

২। এ. স্ট্রেলার এবং এ. স্ট্রেলার : **প্রাকৃতিক ভূগোল** : ভূমিকা, জন্ উইলি এণ্ড সনস্ লিমিটেড, নিউ ইয়র্ক

১০.২.৪.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভৌগোলিক অঞ্চল কি ? কিভাবে ভৌগোলিক অঞ্চল মানুষের জীবনযাপন পদ্ধতিকে প্রভাবিত করে ?

২। ভৌগোলিক অঞ্চলের উপাদানগুলি কি কি ? দুটি মূল উপাদানের বৈশিষ্ট্য আলোচনা কর।

৩। মরুভূমি একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চল — এ সম্পর্কে তোমার নিজস্ব ধারণা লিপিবদ্ধ কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

Climate Factors in the Evolution Societies and Nature Based Activities

একক - ৫

Climatic factors in the evolution of societies

বিন্যাসক্রম :

১০.৩.৫.০ : উদ্দেশ্য

১০.৩.৫.১ : সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর গুরুত্ব : পূর্ব কথা

১০.৩.৫.২ : মানব জাতির উদ্ভব

১০.৩.৫.৩ : মানব জাতির বিস্তার

১০.৩.৫.৪ : গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

১০.৩.৫.৫ : অন্যান্য প্রাণীদের থেকে প্রভেদ

১০.৩.৫.৬ : সমাজ ব্যবস্থার প্রাক্ অবস্থা

১০.৩.৫.৭ : সমাজ ব্যবস্থার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ

১০.৩.৫.৮ : সমাজ ব্যবস্থার সংহত রূপ

১০.৩.৫.৯ : সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন

১০.৩.৫.১০ : পৃথিবীর জলবায়ু

১০.৩.৫.১০.১ : হিম যুগে পৃথিবীর জলবায়ু

১০.৩.৫.১০.২ : হিম যুগের অবসান ও উষ্ণ আবহাওয়ার সূচনা

১০.৩.৫.০ : উদ্দেশ্য

(১) মানবজাতির উদ্ভব, বিস্তার।

(২) সমাজব্যবস্থার উন্মেষ, ক্রমবিকাশ ও বিবর্তন।

(৩) জলবায়ুর উপাদান ও পরিবর্তন সমূহ।

(৪) প্রাক্ ঐতিহাসিক ও ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থা।

১০.৩.৫.১ : সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর গুরুত্ব : পূর্ব কথা

আজ থেকে প্রায় ৩৫০ কোটি বছর আগে সরল প্রোটিন যুক্ত কিছু ভাইরাস্ (Virus) ইত্যাদির আকারে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণ স্পন্দিত হয়েছিল। সময়ের সাথে সাথে পৃথিবী যেমন বিবর্তিত হয়েছে প্রাণও তেমন করেই হয়েছে বিবর্তিত। বিবর্তনের এই ধারায় এসেছে প্রাণের সর্বাপেক্ষা জটিলরূপ-মানুষ। সৃষ্টির পর থেকে মানুষের মধ্যেও ঘটেছে বিবর্তন। হোমো হাবিলিস্ (Homo habilis) থেকে হোমো ইরেকটাস্ (Homo erectus) এবং সবশেষে হোমো সাপিয়েনস্ (Homo sapiens) হোমো হাবিলিস্ থেকে হোমো সাপিয়েনস্ পর্যায়ে উন্নীত হতে মানুষের সময় লেগেছে আনুমানিক ১৮ লক্ষ বছর।

পৃথিবীতে বর্তমানে মানবজাতি হোমো সাপিয়েনস্ নামে পরিচিত। একই স্থানে উদ্ভব হলেও হোমো সাপিয়েনস্রা অনেক পরে খাদ্য ও বাসস্থানের প্রয়োজনে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়েছিল। বিভিন্ন স্থানে বসবাসের সূত্রে কালক্রমে তারা গড়ে তুলেছিল নানা প্রকার সমাজব্যবস্থা।

বাস্তুতন্ত্রের নিয়ম অনুসারে জীব জগৎ ও জড় জগৎ পরস্পরের উপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতার মুলে রয়েছে তাপশক্তি। সূর্য এই তাপশক্তির একমাত্র উৎস। তাপশক্তির তারতম্যের জন্য বিবর্তন প্রক্রিয়া এখনও সচল। তাপ যেমন জীবনের উৎস, তেমনই জলবায়ুর প্রধান উপাদান।

অতি প্রাচীনকাল থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে জলবায়ুর বহু পরিবর্তন ঘটেছে। আর তার সঙ্গে সমান্তরালভাবে ঘটেছে মানব সমাজের বিবর্তন। সামাজিক এই বিবর্তনের মূলে আছে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি যা খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের উপর নির্ভরশীল। তাই সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর গুরুত্ব অনস্বীকার্য। সংগৃহীত নৃতাত্ত্বিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদিও সামাজিক বিবর্তনে জলবায়ুর অগ্রণী ভূমিকাকে স্বীকৃতি দেয়।

১০.৩.৫.২ : মানব জাতির উদ্ভব

পৃথিবীতে বসবাসকারী বর্তমান মানব জাতি হোমো সাপিয়েনস্ (Homo sapiens) নামে পরিচিত। বিবর্তনের মাধ্যমে হোমো ইরেকটাস্ (Homo erectus) গোষ্ঠী থেকে এই মানব গোষ্ঠীর উদ্ভব। প্রায় ২ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশের পূর্বপ্রান্তে এই আদি মানবগোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছিল।

নৃতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা যায় যে হোমো হাবিলিস্রা (Homo habilis) হোমো ইরেকটাস্দের (Homo erectus) পূর্বপুরুষ। এরা প্রায় ২০ লক্ষ বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশে আবির্ভূত হয়ে অতি অল্প সময়ে ঐ মহাদেশের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে ও বসবাস শুরু করে। পৃথিবীতে তখন ছিল হিম যুগ। কালটা প্লায়োসিন্ (Pliocene) । প্রাকৃতিক বিবর্তনের ফলে হোমো হাবিলিস্ (Homo habilis) গোষ্ঠী হোমো ইরেকটাস্ (Homo erectus) গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হল। সমসাময়িক যুগে নিয়েনডারথাল (Neandarthal) নামে অপর এক মানব প্রজাতির উদ্ভব হয়েছিল যারা পরবর্তীকালে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

১০.৩.৫.৩ : মানব জাতির বিস্তার

বর্তমান মানবগোষ্ঠীর বিস্তার নিয়ে বির্তক থাকলেও আধুনিক গবেষণা দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আজ থেকে প্রায় ৫৫ হাজার বছর আগে আফ্রিকা মহাদেশ থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে হোমো সাপিয়েনস্ (Homo sapiens) মানবগোষ্ঠী ছড়িয়ে পড়েছিল। সেই সময় এশিয়া ও ইউরোপের বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী অন্যান্য মানবপ্রজাতি গুলিকে অপসারিত করে হোমো সাপিয়েনস্রা তাদের স্থান দখল করে।

আদিম মানুষের সংগৃহীত হাড়ের ডি.এন.এ. (DNA) ও মাথার খুলি পরীক্ষা করে জানা যায় যে হোমো সাপিয়েনস্দের সঙ্গে অন্যান্য মানব প্রজাতির মিশ্রণ ঘটেনি। আজ থেকে ১ লক্ষ ৫০ হাজার বছর আগে হোমো সাপিয়েনস্দের আবির্ভাব ঘটলেও পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ার আগে তারা প্রায় ৯৫ হাজার বছর ঐ মহাদেশে বসবাস করেছিল।

এক স্থান থেকে উদ্ভব হলেও পৃথিবীব্যাপী ছড়িয়ে পড়া মানুষের মধ্যে কালক্রমে জীনগত পার্থক্য ঘটে যায়। এর প্রকৃত কারণ অনুসন্ধানে গবেষণার অন্ত নেই। এ পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে মূলত জলবায়ু ও ভৌগোলিক অবস্থার ভিন্নতা এর অন্যতম প্রধান কারণ।

১০.৩.৫.৪ : গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজনীয়তা

আদিম মানুষ ছিল একাকী। আদিম প্রতিকূল প্রাকৃতিক পরিবেশে খাদ্য সংগ্রহ ও আত্মরক্ষা সহজসাধ্য ছিল না। খাদ্য সংগ্রহ ও প্রাকৃতিক প্রতিকূলতার সঙ্গে লড়াইয়ে লিপ্ত মানুষ উপলব্ধি করেছিল যূথবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা। এই অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়েই মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল।

১০.৩.৫.৫ : অন্যান্য প্রাণীদের থেকে প্রভেদ

পৃথিবীতে পিঁপড়ের আবির্ভাব কয়েক কোটি বছর আগে। সময়ের সাথে সাথে জীবতাত্ত্বিক কারণে এদের দেহে অনেক শারীরবৃত্তিয় পরিবর্তন ঘটেছে। এই পরিবর্তন সত্ত্বেও প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত পিপঁড়েরা সমাজবদ্ধ। জীনগত কারণে বহু প্রাণীও প্রথম থেকে সমাজবদ্ধ। মানুষ কিন্তু প্রাথমিক অবস্থায় সমাজবদ্ধ ছিল না। মানুষ ছিল একাকী। সিংহ, বেবুন, শিম্পাঞ্জী প্রভৃতি প্রাণীদের ক্ষেত্রে পারিবারিক যে যূথবদ্ধতা দেখা যায় সুদূর অতীতে মানুষের মধ্যে তাও কতটা ছিল তা প্রায় অজানা। জীনগত কারণে মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়নি। মানুষ গোষ্ঠীবদ্ধ হয়েছিল প্রয়োজনের তাগিদে।

১০.৩.৫.৬ : সমাজ ব্যবস্থার প্রাক্ অবস্থা

প্রাচীনকালে মানুষ ছোট ছোট দলে বিভক্ত ছিল। ছোট ছোট এই দলগুলি শিকারের সন্ধানে ঘুরে বেড়াত। প্রধানত শিকারের ভাগ নিয়ে নিজেদের মধ্যে তারা সংঘাতে লিপ্ত হত। এই সংঘাতই যে তাদের অস্তিত্বের সংকট ঘনিয়ে তুলবে এই উপলব্ধিই ধীরে ধীরে ছোট দলগুলিকে বৃহত্তর গোষ্ঠীতে পরিণত হতে প্রাণিত করেছিল।

সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ নিজেদের অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে পশুপালন করতে শিখল। পশুপালন মানব সভ্যতার বিবর্তনে প্রথম ধাপ। এই পশুপালনই মানুষের খাদ্য সংস্থানকে বহুলাংশে নিশ্চিত করে। পশু খাদ্যের সন্ধানে গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ পশুর দলকে নিয়ে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে ঘুরে বেড়াত। তখনও মানুষ স্থায়ী ভাবে বসবাস করতে শুরু করেনি।

১০.৩.৫.৭ : সমাজ ব্যবস্থার উন্মেষ ও ক্রমবিকাশ

সভ্যতার দ্বিতীয় ধাপে এসে মানুষ শিখল কৃষিকাজ। কৃষিকাজের প্রয়োজনে যাযাবর মানুষ নির্দিষ্ট স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করল। গড়ে তুলল সমাজব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থা ধীরে ধীরে সুসংবদ্ধ

রূপ পেল। মানব সভ্যতা সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করে প্রবেশ করল শিল্প যুগে, শিল্প সভ্যতা মানুষের জীবনে আনল আমূল পরিবর্তন। উন্নত জীবন যাপনে অভ্যস্থ মানুষ এবার গড়ে তুলল আধুনিক সভ্যতা।

মানব সভ্যতার ধারায় ঐতিহাসিক এই পরিবর্তনের সূচনা করেছিল কৃষিকাজ। কৃষিকে নির্ভর করে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে প্রাচীন সভ্যতাগুলি বিকাশ লাভ করে। জলবায়ু কৃষির প্রধান নিয়ন্ত্রক। বলাবাহুল্য কৃষিপ্রধান সভ্যতাগুলিও জলবায়ুর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে গড়ে উঠে ও বিকাশ লাভ করে।

কৃষি নির্ভর এই সভ্যতার ভিত্তি ছিল এক সুসংহত সমাজব্যবস্থা। পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তনে কৃষিকাজের প্রচলিত ধারা ব্যহত হয়। অনিবার্য্য ভাবে এর প্রভাব পড়ে কৃষি নির্ভর সভ্যতা ও সমাজ ব্যবস্থার উপর। পরিবর্তিত জলবায়ুর প্রভাবে একদা বিকশিত এই সভ্যতাগুলি ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

১০.৩.৫.৮ : সমাজ ব্যবস্থার সুসংহত রূপ

সমাজব্যবস্থা সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে মানুষ প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও বিধি নিষেধের প্রচলন করেছিল। অতি প্রাচীনকালে ছোট ছোট মানবগোষ্ঠী গুলিতে কোন প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ম নীতি প্রচলিত ছিল না। দলপতিরা প্রধানতঃ পেশী শক্তির দ্বারা ছোট ছোট দলগুলিকে নিয়ন্ত্রণে রাখত। প্রাথমিক পর্য্যায়ে পেশী শক্তির ভিত্তিতে দলপতি নির্বাচিত হলেও কালক্রমে এই নির্বাচন বংশানুক্রমিক হয়ে পড়ে। প্রয়োজনের তাগিদে ছোট ছোট দলগুলি বৃহৎ গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত হলে তাকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য দলপতিরা অনেক অনুশাসন প্রচলন করে। বেঁচে থাকার প্রয়োজনে অন্যান্য প্রাণীদের মত মানুষ প্রাকৃতিক নির্বাচন তত্ত্ব অনুসারে দলপতির অনুশাসনকে মেনে নিয়েছিল। প্রাথমিক ভাবে প্রচলিত এই অনুশাসনই পরে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ নেয় এবং সুসংহত সমাজ ব্যবস্থা গঠনে মানব গোষ্ঠীগুলিকে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে অনুপ্রাণিত করে।

প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মনীতি ও বিধি নিষেধ দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সুসংহত সমাজব্যবস্থা গঠনে ঠিক কোন সময়ে মানুষ অনুপ্রাণিত হয়েছিল তা আজ প্রায় অজানা, তথাপি ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক তথ্য থেকে অনুমান করা হয় যে কৃষিকাজ ও স্থায়ীভাবে বসবাস মানবগোষ্ঠী গুলিকে সমাজ গঠনে উদ্বুদ্ধ করে। যা পরবর্তীকালে সুসংহত রূপ নেয়। এই সিদ্ধান্তের কারণ পৃথিবীব্যাপী ধ্বংস প্রাপ্ত কৃষি নির্ভর প্রাচীন সভ্যতাগুলিতে যে সুসংবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থার প্রচলন ছিল তা প্রমাণিত।

১০.৩.৫.৯ : সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তন

স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য প্রয়োজন অনুকূল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ। যেখানে খাদ্য উৎপাদন এবং অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সহজলভ্য হয়। জলবায়ুর পরিবর্তন খাদ্য উৎপাদনে ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সংগ্রহে ব্যাঘাত ঘটায়। প্রাক ঐতিহাসিক যুগ থেকে আধুনিক যুগে পৃথিবীতে বহুবার জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে। পরিবর্তিত হয়েছে অনুকূল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ। ফলে অনুকূল পরিবেশ নির্ভর সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটেছে।

সৃষ্টির পর থেকে আজও পৃথিবীতে ঘটে চলেছে নানা বিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তন এই বিবর্তনের অন্যতম প্রধান উপাদান, জীব জগৎ, জড় জগৎ ও মানুষের সৃষ্ট সমাজব্যবস্থা সবই এই জলবায়ু পরিবর্তনের অংশীদার।

১০.৩.৫.১০ : পৃথিবীর জলবায়ু

জলবায়ু বলতে বোঝায় কোন নির্দিষ্ট স্থানের ৪০ থেকে ৫০ বৎসরের আবহাওয়ার সামগ্রিক বিবরণকে। সূর্যতাপ ও বৃষ্টিপাত জলবায়ুর প্রধান উপাদান। পৃথিবীর অবস্থান ও গতির জন্য ঋতুভেদে উষ্ণতার তারতম্য ঘটে। উষ্ণতার তারতম্যই বৃষ্টিপাতের প্রধান কারণ।

উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যে পৃথিবীব্যাপী নানা জলবায়ু অঞ্চল গড়ে উঠেছে। এক এক জলবায়ু অঞ্চলে এক এক রকম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট লক্ষ করা যায়। বৈশিষ্টের এই ভিন্নতা খাদ্য উৎপাদনে ও প্রাকৃতিক সম্পদে লভ্যতার ক্ষেত্রে ভিন্নতার সৃষ্টি করেছে।

১০.৩.৫.১০.১ : হিমযুগে পৃথিবীর জলবায়ু

প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পর্যায়ক্রমে পৃথিবীতে উষ্ণ ও শীতল আবহাওয়া বিরাজ করত। প্রাপ্ত আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে আজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ৫০ হাজার, ৯০ হাজার ও ৭০ হাজার বছর আগে পৃথিবীতে এসেছিল হিমযুগ। পর পর তিনটি হিম যুগের মধ্যে ছিল উষ্ণ আবহাওয়া, পৃথিবীতে সর্বশেষ হিম যুগ দেখা গিয়েছিল আজ থেকে ১০ হাজার ৮ শত বছর আগে।

হিম যুগে পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল ঢাকা ছিল বরফের আস্তরণে। পৃথিবীব্যাপী উষ্ণতা ছিল অনেক কম। উষ্ণতা কম হওয়ার জন্য উত্তর-দক্ষিণে উদ্ভিদ জগতের বিস্তার ছিল সংক্ষিপ্ত। সমুদ্র জলতল ছিল

অনেক নীচে। শিকারের সন্ধানে আদিম মানুষেরা এই সময় ঘুরে বেড়াত সমুদ্র উপকূলের আশে-পাশে। সমাজব্যবস্থার ধারণা ছিল অজানা।

১০.৩.৫.১০.২ : হিমযুগের অবসান ও উষ্ণ আবহাওয়ার সূচনা

ক্রমে হিম যুগের অবসান হল। সমগ্র পৃথিবীতে উষ্ণ আবহাওয়ার বিস্তার ঘটল। উষ্ণ আবহাওয়ার ফলে পৃথিবীর নানা স্থানে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের সূত্রপাত হল। উষ্ণতার তারতম্যের জন্য অতিদ্রুত তৈরী হতে থাকল অনুকূল জলবায়ু যুক্ত ভৌগোলিক পরিবেশ। এই সমস্ত অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলে খাদ্য সংগ্রহ ও উৎপাদন সহজ। তাই অতি প্রাচীনকাল থেকে শিকারী মানুষ খাদ্য সংগ্রহের স্থান হিসাবে প্রাথমিক ভাবে অনুকূল জলবায়ুযুক্ত অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিল। মানুষের সার্বিক জীবন যাপন ও উন্নতির মূলে ছিল অনুকূল জলবায়ু।

১০.৩.৬.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

১। Burrough, W.J. 2005. Does the weather Really Malter? Cambridge University Press. Cambridge, England.

২। Huntington, E. 1948, Civilization and Climate Yale University Press, London.

৩। Lamb, H. H. 1995. Climate, History and the Modern World, Rontledge, London.

Websites :

১। http://www.sunysuttolk.edu

২। http://www.urantia.org

১০.৩.৬.১২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

1 Describe the origin and development of Human Society. Do you think environment played a keyrole in the growth of Society ?

————

পর্যায় গ্রন্থ্ - ৩

Climate Factors in the Evolution Societies and Nature Based Activities

একক - ৬

Climatic factors in the evolution of societies

বিন্যাসক্রম :

১০.৩.৬.১ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

১০.৩.৫.১১.১ : দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

১০.৩.৫.১১.২ : ক্ষণস্থায়ী প্রভাব

১০.৩.৬.২ : জলবায়ুর উপাদান

১০.৩.৬.৩ : জলবায়ুর পরিবর্তন

১০.৩.৬.৪ : জলবায়ু পরিবর্তনের নিদর্শন সমূহ

১০.৩.৬.৪.১ : ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন

১০.৩.৬.৪.২ : নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন

১০.৩.৬.৪.৩ : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

১০.৩.৬.৪.৪ : জীব তাত্ত্বিক নিদর্শন

১০.৩.৬.৫ : প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থা

১০.৩.৬.৫.১ : হিম যুগে পৃথিবীর অবস্থা

১০.৩.৬.৫.২ : হিমোত্তর যুগে পৃথিবীর অবস্থা

১০.৩.৬.৬ : ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর অবস্থা

১০.৩.৬.৭ : কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা

১০.৩.৬.৮ : খৃষ্টপূর্ব যুগ

১০.৩.৬.৯ : খৃষ্ট যুগ

১০.৩.৬.১০ : আধুনিক যুগ

১০.৩.৬.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১০.৩.৬.১২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.৩.৬.১ : জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব (Impact of Climate Change)

জলবায়ুর ভিন্নতার জন্য আদিম পৃথিবীতে নানা প্রাকৃতিক অঞ্চল গড়ে উঠেছিল। প্রতিটি প্রাকৃতিক অঞ্চলের এক এক রকম ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য ছিল। গাছপালা, প্রাণী, প্রাকৃতিক সম্পদ সবই ছিল আলাদা। প্রাথমিক ভাবে খাদ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এবং পরবর্তী কালে স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য বিভিন্ন গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ এক একটি প্রাকৃতিক অঞ্চলকে বেছে নিয়েছিল। এই সব অঞ্চলে তারা তাদের প্রয়োজনমত অনেক পরীক্ষা নিরিক্ষার মাধ্যমে গড়ে তুলেছিল বিভিন্ন সমাজব্যবস্থা।

যেহেতু খাদ্য উৎপাদন জলবায়ুর উপর নির্ভরশীল তাই গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষ খাদ্য উৎপাদনের জন্য অনুকূল জলবায়ু যুক্ত অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এখানে তারা প্রয়োজনীয় সমাজব্যবস্থা গঠনে উদ্যোগী হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে জলবায়ুর ভিন্নতা মানব গোষ্ঠীর ভিন্নতার প্রধান কারণ। ফলত গড়ে উঠেছে ভিন্ন প্রকার খাদ্যাভ্যাস, সামাজিক রীতিনীতি, আচরণ, ধর্মাচরণ, লোকাচার ইত্যাদি, যা সমাজ ব্যবস্থার বিভিন্ন উপাদান।

সংস্কৃতির বিচারে আজকের পৃথিবীতে আনুমানিক ৬০০০ মানবগোষ্ঠী আছে। এই ৬০০০ মানব গোষ্ঠী ৫০০০ রকমের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। সমাজ ব্যবস্থাও ভিন্ন। যে ভিন্নতা মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গড়ে উঠেছে।

১০.৩.৬.১.১ : দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব

জলবায়ুর প্রভাব মানব সমাজে নানা ভাবে অনুভূত হয়। দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব তাদের মধ্যে অন্যতম। দীর্ঘস্থায়ী অনুকূল জলবায়ু খাদ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক রসদের যোগান সুনিশ্চিত করে। খাদ্যের নিরাপত্তা মানবগোষ্ঠীগুলিকে বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশে সহায়তা করে। মানবগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও কর্মক্ষমতা অটুট থাকে। অর্থনৈতিক উন্নতির ফলে মানুষ উন্নত জীবন যাপন করতে পারে এবং উন্নত সমাজ ব্যবস্থা গঠনে নিজেরা অংশীদার হতে পারে। খাদ্যের নিরাপত্তা ও অর্থনৈতিক উন্নতি মানবগোষ্ঠীগুলিকে আরো সুসংবদ্ধ সমাজব্যবস্থা গঠনে অনুপ্রাণিত করে। মানুষের সার্বিক কৃতি উন্নতি লাভ করে। সভ্যতা বিকশিত হয়।

পক্ষান্তরে দীর্ঘ সময় ধরে প্রতিকূল জলবায়ু খাদ্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। প্রাকৃতিক রসদের যোগান অনিশ্চিত হয়ে পড়ে। উর্বর কৃষি জমি খরা অঞ্চলে পরিণত হয়। মানুষ স্থানান্তরে গমন করে। সমাজব্যবস্থার অবক্ষয় শুরু হয়। দুর্ভিক্ষ, মহামারী, গোষ্ঠী সংঘাত প্রচলিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটায়। দীর্ঘস্থায়ী প্রতিকূল জলবায়ুর অপর প্রধান প্রভাব রোগের আবির্ভাব ও বিস্তার। গবেষণা লব্ধ

তথ্য থেকে জানা যায় যে প্রতিকূল আবহাওয়া নানা রকম রোগের আবির্ভাব ও বিস্তার ঘটায়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় প্রাচীন গ্রীক ও রোমান সভ্যতা ধ্বংসের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল ম্যালেরিয়া রোগের আবির্ভাব ও বিস্তার।

১০.৩.৬.১.২ : ক্ষণস্থায়ী প্রভাব

জলবায়ুর ক্ষণস্থায়ী প্রভাব গুলির মধ্যে বন্যা ও পতঙ্গের আক্রমণ অন্যতম। বন্যা ও ক্ষতিকারক পতঙ্গের আক্রমণে খাদ্য উৎপাদন ব্যাহত হয়। প্রাকৃতিক সম্পদের যোগান বাধাপ্রাপ্ত হয়। মানুষের প্রচলিত জীবন যাপন পদ্ধতি ও অভ্যাস হঠাৎ করে পরিবর্তিত হয়। বহুদিন ধরে প্রচলিত সংস্কৃতির পরিবর্তন ঘটে। মানুষের জীবিকার পরিবর্তন সূচীত হয়। ক্রমে মানুষ অন্যত্র গমন করতে শুরু করে। পরিবর্তন ঘটে সমাজ ব্যবস্থার।

একথা বলাই বাহুল্য যে জলবায়ুর পরিবর্তন মানব সমাজের পরিবর্তনের জন্য বহুলাংশে দায়ী। পৃথিবীব্যাপী সংগৃহীত ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে যেমন জলবায়ু পরিবর্তনের তথ্য পাওয়া যায় তেমনিভাবে সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদি সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনের স্বপক্ষে মতবাদ ব্যক্ত করে।

১০.৩.৬.২ : জলবায়ুর উপাদান

উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত জলবায়ুর দুটি প্রধান উপাদান। পৃথিবীর অবস্থান ও গতিপথ অনুসারে $২৩\frac{১}{২}^\circ$ উত্তর থেকে $২৩\frac{১}{২}^\circ$ দক্ষিণ অক্ষাংশের মধ্যবর্তী অংশে সুর্য কিরণ লম্বভাবে পড়ে। স্বাভাবিক ভাবে উক্ত অঞ্চলে উষ্ণতা পৃথিবীর অন্য অংশ থেকে বেশী। আবার যতই উত্তর ও দক্ষিণে যাওয়া যায় উষ্ণতা ততই কমতে থাকে। পক্ষান্তরে বৃষ্টিপাত সব সময় উষ্ণতাকে অনুসরণ করে না। তাই উষ্ণতা কম হলেও বৃষ্টিপাত কম নয় এমন অনেক অঞ্চল পৃথিবীতে দেখা যায়। মূলত সমুদ্রের কাছাকাছি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশী আর মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে বৃষ্টিপাত কম। কারণ জলীয়বাষ্পপূর্ণ বাতাস যখন মহাদেশের অভ্যন্তর ভাগে গিয়ে পৌঁছায় তখন তার বৃষ্টিপাত ঘটানোর ক্ষমতা প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। বায়ুপ্রবাহ আবার পৃথিবীর উষ্ণতার সমতা নিয়ে আসে।

১০.৩.৬.৩ : জলবায়ুর পরিবর্তন

কোন স্থানে স্বাভাবিক উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের জন্য যখন প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশের পরিবর্তন ঘটে তখন বলা হয় যে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছে। সৃষ্টির পর

থেকে অনেক বিবর্তনের মধ্যদিয়ে পৃথিবী আজকের অবস্থায় পৌঁছেছে। এই বিবর্তনের সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্তন ওতপ্রোত ভাবে জড়িত। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর বিশাল অংশ বরফের আস্তরণে ঢাকা ছিল। উষ্ণতা ছিল অনেক কম। উষ্ণ আবহাওয়ার সূচনা পৃথিবীর প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অবস্থার আমূল পরিবর্তন ঘটাল। উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে উদ্ভিদ জগতের আরো বেশী বিস্তার ও প্রাণীকুলের নিরন্তর অভিযোজন প্রক্রিয়ায় রচিত হল আধুনিক পৃথিবী। আধুনিক পৃথিবীতে মানুষের বিরামহীন প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল সুসংবদ্ধ সমাজ ব্যবস্থা। ক্রমবিবর্তনের পটভূমিকায় গড়ে উঠা এই সমাজ ব্যবস্থা বহুবার কালের বিবর্তনে ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আবার প্রাকৃতিক নিয়মে পুনরায় গড়ে উঠে। ধ্বংস ও গড়ে উঠার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থাকে সমাজ ব্যবস্থা। যেখানে জলবায়ুর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০.৩.৬.৪ : জলবায়ু পরিবর্তনের নিদর্শন সমূহ

অতি প্রাচীনকালে আবহাওয়া সম্পর্কিত কোন তথ্য আদিম মানুষ লিপিবদ্ধ করে যায় নি। পক্ষান্তরে আবিস্কৃত গুহা চিত্র থেকে আদিম যুগে মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতি সম্বন্ধে একটা প্রাথমিক ধারণা পাওয়া যায়। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাত যেহেতু আবহাওয়ার মূল উপাদান তাই প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগের আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা পাওয়ার জন্য পরোক্ষ উপাদানগুলির সহায়তা নেওয়া হয়। পরোক্ষ উপাদানগুলির মধ্যে ভূতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও জীবতাত্ত্বিক উপাদানগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

১০.৩.৬.৪.১ : ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে পৃথিবীতে জলবায়ুর বহু পরিবর্তন ঘটেছে। এসেছে হিম যুগ ও উষ্ণ আবহাওয়ার যুগ। উভয়যুগে পৃথিবীব্যাপী প্রাকৃতিক তথা ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন ঘটেছে। আবিষ্কৃত ভূতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে আজ আমরা তৎকালীন পৃথিবীর আবহাওয়া সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি। যদিও এই ধারণা প্রত্যক্ষভাবে তখনকার মানব সমাজের বৈশিষ্টের উপর কোন আলোকপাত করতে পারে না। তথাপি বিভিন্ন প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় গঠিত ভূভাগ, জীবাশ্ম, নদীর বাৎসরিক বন্যা, মাটির নীচে সঞ্চিত খনিজ দ্রব্য, হ্রদে সঞ্চিত কাদামাটি থেকে যে তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়েছে তা মূলত প্রাকৃতিক বিবর্তনকে নির্দেশ করে। প্রাকৃতিক এই বিবর্তন নিয়ে আসে ভৌগোলিক পরিবর্তন। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে পৃথিবীতে ভৌগোলিক বিবর্তন প্রক্রিয়া এখনও সচল।

১০.৩.৬.৪.২ : নৃতাত্ত্বিক নিদর্শন

মানুষের বিবর্তনের ইতিহাস নৃতাত্ত্বিক তথ্যাদি থেকে জানা যায়। বিবর্তনের এই ধারায় বর্তমান

মানুষের উদ্ভব হয়েছিল প্রাকৃতিক বিবর্তনের সূত্রধরে। অনুকূল পরিবেশে পৃথিবীতে যেমন প্রাণের আবির্ভাব ঘটেছিল তেমনি করে প্রাণ বিবর্তিত হতে হতে মানুষের সৃষ্টি করেছিল। বর্তমান মানুষ শিকারী থেকে পর্যায়ক্রমে আধুনিক মানুষে পরিণত হয়েছে। গড়ে তুলেছে সুসংবদ্ধ সমাজব্যবস্থা যা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তিত হয়েছে।

১০.৩.৬.৪.৩ : প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যাদি জলবায়ু পরিবর্তনে পরোক্ষ ভাবে আলোকপাত করতে পারে। সভ্যতার ধ্বংসাবশেষ থেকে সংগৃহীত প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি তখনকার দিনে মানুষের খাদ্য, তৈজসপত্র, পোষাক পরিচ্ছদের ব্যবহার সমকালীন আবহাওয়া সম্পর্কে ধারণা দেয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে প্রাচীন সভ্যতাগুলির মূল ভিত্তি ছিল কৃষি, জলবায়ুর পরিবর্তনে প্রচলিত কৃষি ব্যবস্থার ব্যাঘাত ঘটে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে সমাজ ব্যবস্থারও পরিবর্তন ঘটে যায়।

১০.৩.৬.৪.৪ : জীবতাত্ত্বিক নিদর্শন

জীবতাত্ত্বিক উপাদানগুলি ঐতিহাসিক সময়ে পৃথিবীর জলবায়ু পরিবর্তনের অন্যতম নিদর্শন, জীব বিজ্ঞানীরা গবেষণার মাধ্যমে প্রধানত বীটল (Beetles) জাতীয় পতঙ্গের চরিত্র থেকে জলবায়ু পরিবর্তনের সঠিক ধারণা দিতে সমর্থ হয়েছেন, কারণ উষ্ণতার তারতম্য বীটল জাতীয় পতঙ্গ গোষ্ঠীর হ্রাস বৃদ্ধিকে নিয়ন্ত্রণ করে। অপরপক্ষে উষ্ণতার হ্রাসবৃদ্ধি উদ্ভিদ জগতের পরিবর্তনের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। উদ্ভিদ জগতে এই তারতম্যের নিদর্শন পাওয়া গেছে উদ্ভিদ কাণ্ডে জমা 'বার্ষিক বলয়' এর সাহায্যে। যা থেকে আবহাওয়া পরিবর্তনের চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে।

ঐতিহাসিক কাল থেকে আজ পর্য্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য সমাজ ব্যবস্থার সচলরূপকে নির্দেশ করে, প্রাকৃতিক বিবর্তনের সাথে সাথে সমাজ ব্যবস্থারও বিবর্তন ঘটেছে। সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের জ্ঞান, কারিগরী কুশলতা, শিক্ষা, সংস্কৃতি, আচরণ, মূল্যবোধ সবই পরিবর্তনশীল। বলাবাহুল্য কার্য্যকারণ শৃঙ্খলানুযায়ী এই পরিবর্তন জলবায়ুর পরিবর্তনের উপর নির্ভরশীল।

১০.৩.৬.৫ : প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর সামগ্রিক অবস্থা

পৃথিবীর নানা প্রান্তে প্রাপ্ত গুহাচিত্র গুলি প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে আদিম মানুষের জীবন সংগ্রামের প্রামাণ্য দলিল। আদিম মানুষের সামগ্রিক কৃতি আবর্তিত হত খাদ্য সংগ্রহকে কেন্দ্র করে। মানুষ তখন যূথবদ্ধ হয়নি ফলে সমাজ সম্পর্কিত ধারণা ছিল অজানা। নিজেদের মধ্যে ভাবের আদান প্রদানের

মাধ্যম ছিল চিত্র। যা আদিম মানুষ সম্পর্কে অমূল্য ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবে গৃহীত। প্রাক্ ঐতিহাসিক কালে পৃথিবীতে একাধিকবার এসেছিল হিম যুগ ও উষ্ণ যুগ।

১০.৩.৬.৫.১ : হিমযুগে পৃথিবীর অবস্থা

হিমযুগে পৃথিবীর বিশাল অংশ বরফে ঢাকা ছিল। সমুদ্রের জলতল ছিল অনেক নীচে। গাছপালার বিস্তার অনেক কম ছিল। কারণ পৃথিবীব্যাপী উষ্ণতা ছিল অনেক কম। এই সময় আদিম মানুষ তাদের কৃতি গুহাগাত্রে চিত্রের আকারে রেখে গেছে। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে আবিষ্কৃত গুহা চিত্রগুলি বিশ্লেষণ করলে সেই সময়কার প্রাকৃতির ও সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করা যায়।

মধ্য ফ্রান্স ও উত্তর স্পেন অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত গুহাচিত্র গুলি বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে এগুলি আনুমানিক ৫০ হাজার বছরের পুরানো। ভাব প্রকাশের মাধ্যম হিসাবে ঐ গুহাচিত্রগুলি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সমসাময়িক মানুষদের জন্য এবং সবোপরি ভবিষৎ প্রজন্মের জন্য আদিম মানুষ তাদের শিকার সম্পর্কে অভিজ্ঞতালব্ধ জ্ঞান রেখে যেত ঐ সব গুহাচিত্রের মধ্যে।

গুহাচিত্রগুলিকে আরো বিশ্লেষণ করে জানা যায় ঐ সময় উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী মানুষ বন্য মহিষ, ম্যামথ, গন্ডার, হরিণ, গরু ও ঘোড়া প্রভৃতি শিকার করার জন্য কুঠার ও তীর ধনুক ব্যবহার করত। ইউরোপের বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন ঘাসে ঢাকা প্রান্তর ছিল। সেখানে বন্য মহিষ, ম্যামথ, গণ্ডার, হরিণ, গরু ও ঘোড়ারা অবাধে বিচরণ করত।

গুহাচিত্র গুলিতে বিশ্লেষণ করে আদিম শিকার নির্ভর সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। প্রতিকূল জলবায়ুতে মানুষের জীবন যাপনের যে চিত্র পাওয়া সম্ভব হয়েছে। তা আসলে সমাজ ব্যবস্থার ভিত্তি হিসাবে গণ্য করা যায়।

ভূতাত্ত্বিক তথ্য থেকে জানা যায় যে আজকের আলাস্কা তখন বরফ মুক্ত ছিল, বেরিং প্রণালী ছিল শুষ্ক। সমুদ্রের জলতল অনেক নীচে। আদিম মানুষ শিকারের সন্ধানে সাইবেরিয়ার সমভূমির উপর ঘোরাফেরা করত। পৃথিবীর মূল ভুখণ্ডের এক স্থান থেকে অন্যস্থানে অবাধে যাতায়াত করতে পারত।

১০.৩.৬.৫.২ : হিমোত্তর যুগে পৃথিবীর অবস্থা

ভূতাত্ত্বিক ইতিহাসে হলোসিন্ (Holocene) যুগের প্রথমে অর্থাৎ আজ থেকে প্রায় ১০ হাজার বছর আগে হিম যুগের অবসান ঘটে। যদিও এই অবসানের সূত্রপাত ঘটেছিল প্রায় ১৫ হাজার বছর আগে। হিমোত্তর যুগে পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন সুচিত হল। উষ্ণতা বৃদ্ধির সাথে সাথে জমে

থাকা বরফ গলে নীচু এলাকাগুলি জলপূর্ণ হল। সমুদ্র জলতল বৃদ্ধি বহুস্থানকে প্লাবিত করল এবং বহু মানুষের মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়ালো। বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মগ্রন্থে উল্লিখিত উপকথায় পৃথিবীব্যাপী বিশাল বন্যার উল্লেখ এই তথ্যকে সমর্থন করে।

হিমোত্তর যুগে উষ্ণতা বৃদ্ধি পৃথিবীব্যাপী গাছপালা ও প্রাণীকূলের বিপুল পরিবর্তন ঘটাল। বৈজ্ঞানিক হিসাবে সেই যুগে পৃথিবীর উষ্ণতা আজকের তুলনায় ১° থেকে ৩° সেলসিয়াস্ পর্যন্ত বেশী ছিল। উষ্ণতা বৃদ্ধির ফলে পৃথিবীতে বনভূমি ক্রমশ উত্তর ও দক্ষিণ দিকে প্রসারিত হল।

হিমোত্তর যুগে জলবায়ুর পরিবর্তন মানব সমাজের ও পরিবর্তন ঘটায়। মানুষ স্থানান্তরে গমন করতে শুরু করে। কারণ খাদ্যের অভাব। এই সময় মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে বুদ্ধিবৃত্তির প্রয়োগ শুরু করে। ফলে পশুপালন ও ক্রমে কৃষিকাজ মানুষের করায়ত্ত হল।

প্রত্নতাত্ত্বিক ও নৃতাত্ত্বিক গবেষণা প্রাপ্ত তথ্য থেকে জানা যায় যে বর্তমান তুর্কি, সিরিয়া, ইরাক ও ইরানের সীমান্তবর্তী জাগরোজ্ পার্বত্য এলাকায় বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ১২ হাজার বছর আগে পশু মাংস ছাড়া বন্য গম, বার্লি ও ভূট্টা জাতীয় শষ্য খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করত। পশুমাংস ছাড়া খাদ্য হিসাবে শষ্যের ব্যবহার কৃষি ব্যবস্থার প্রচলনকে সমর্থন করে। যদিও এই সময়ে সমাজব্যবস্থা কেমন ছিল তার কোন চিত্র উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব হয়নি। তথাপি সংগৃহীত তথ্য থেকে বলা যায় হিমোত্তর যুগে জলবায়ুর পরিবর্তন মানুষের সমাজ ব্যবস্থার বিকাশে সহায়ক ছিল।

অধ্যাপক রাইট এর গবেষণা লব্ধ তথ্য থেকে জানা যায় যে আজ থেকে প্রায় ৮০০০ বছর আগে পূর্ব তুর্কি অঞ্চলের জনগোষ্ঠীর স্থানান্তরে গমনের প্রধান কারণ শষ্য সংগ্রহ। মেসোপটেমিয়ার সমভূমি অঞ্চলে প্রাপ্ত গম ও বার্লির নমুনা ঐ অঞ্চলের জলবায়ু পরিবর্তনের দিক নির্দ্দেশ করে। সমসাময়িক কালে এখানকার মানুষ স্থায়ীভাবে ভেড়া, ছাগল শুকর ও কুকুর নিয়ে বসবাস শুরু করে। ইতিহাসে যা প্রথম কৃষিগ্রাম রূপে পরিচিত।

১০.৩.৬.৬ : ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীর অবস্থা

মানব সভ্যতায় কৃষিগ্রামের আত্মপ্রকাশ এক অবিস্মরণীয় ঘটনা। যা আধুনিক সভ্যতার প্রাথমিক পদক্ষেপ। ঐ সময়ে পাওয়া ভূতাত্ত্বিক তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহের উপকূলীয় সমভূমি আরো বেশী বিস্তৃত ছিল। সমসাময়িক কালে ঐ অঞ্চলে জেরিকোতে (Jericho) গড়ে উঠেছিল পৃথিবীর প্রথম নগর সভ্যতা। সুদূর অতীতে এই ঐতিহাসিক ঘটনা মানুষের

সামাজিক জীবনে যুগান্তকারী প্রভাবের সূচনা করেছিল, মূলত জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এই অবস্থার সম্ভাবনা আরো বেশী উজ্জ্বল হয়েছিল।

মানুষের সামাজিক বিবর্তনের ঐতিহাসিক নিদর্শন এখনও পাওয়া যায় পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে। উদাহরণ স্বরূপ ইংল্যাণ্ডের ইয়র্কশায়ারে ম্যাগলেমস্ (Maglems) সংস্কৃতির উপস্থিতির কথা বলা যায়। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে উত্তর সাগরের সমভূমি অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠী ডেনমার্ক অঞ্চল থেকে এই সংস্কৃতি বয়ে নিয়ে আসে।

ওয়েগুল্যাণ্ড ও ব্রাইসন্ এর গবেষণা থেকে জানা যায় যে জলবায়ুর পরিবর্তনের সাথে সাথে মানবগোষ্ঠীর কৃষ্টির ও পরিবর্তন ঘটেছে। পৃথিবীব্যাপি সংগৃহীত ৩৭০০ টি নমুনার রেডিও কার্বন ডেটিং এর ফলাফলকে বিশ্লেষণ করে এই তথ্যকে আরো সুদৃঢ় করা সম্ভব হয়েছে।

মধ্য সাহারা অঞ্চলে বসবাসকারী মানবগোষ্ঠী জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে সাথে নিজেদের কৃষ্টির পরিবর্তন ঘটায়। আজ থেকে প্রায় ৫০০০ বছর আগে সাহারা অঞ্চল রুক্ষ হতে শুরু করে। ঐ সময়ে নীলনদের উৎস মুখে ইথিওপিয়ায় বৃষ্টির পরিমান কমে যায়। ফলে খাদ্য উৎপাদন ও বসবাস করার মত ভূপ্রকৃতির অভাব দেখা দেয়। এমত অবস্থায় মানুষ ক্রমশ স্থানান্তরে গমন করে। পরিবর্তন ঘটে মানুষের কৃষ্টি ও সমাজ ব্যবস্থায়।

১০.৩.৬.৭ : কৃষিভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থা

কৃষিকাজ মানব সভ্যতার ইতিহাসে এক অনন্য সাধারণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিল। কৃষিকাজের মাধ্যমে মানবগোষ্ঠীগুলি এক সুসংহত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলে। কারণ কৃষি মানবজীবনে খাদ্য সরবরাহে যে স্থিতিশীলতা নিয়ে এসেছিল তাঁর ফলে মানুষ এক স্থানে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। আদিতে মানুষ প্রধানত নদীর নিম্ন অববাহিকার সমভূমি অঞ্চলে কৃষিকাজ শুরু করে। কারণ এই অঞ্চলে শষ্য উৎপাদন করার জন্য প্রয়োজনীয় সুবিধা ছিল।

খৃষ্ট জন্মের প্রায় ৩০০০ বছর আগে সিন্ধু নদের অববাহিকা অঞ্চলে, ইউফ্রেটিস ও টাইগ্রীস নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, হোয়াং হো নদীর অববাহিকা অঞ্চলে, এবং নীল নদের অববাহিকা অঞ্চলে কৃষি ভিত্তিক প্রাচীন সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। হিমোত্তর যুগে পৃথিবীব্যাপী জলবায়ুর পরিবর্তন ঐসব অঞ্চলে অনুকূল প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক অঞ্চল গড়ে তোলে। ঐতিহাসিক যুগে এই অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন খাদ্য উৎপাদনে ব্যাঘাত ঘটায়, কারণ রাজস্থান, আরব, গোবি ও সাহারার বিস্তীর্ণ অঞ্চল তখন রুক্ষ মরু

অঞ্চল রূপে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। বৃষ্টিপাত কম হওয়ার ফলে কৃষিযোগ্য জমির পরিমান হ্রাস পেতে থাকে।

খাদ্য উৎপাদনে অনিশ্চয়তা মানুষের তৈরি সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন নিয়ে আসে, কৃষিনির্ভর সুসংহত সমাজব্যবস্থা ধীরে ধীরে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় কারণ কৃষির ব্যর্থতা সমাজ ব্যবস্থাতেও ব্যর্থতা নিয়ে আসে। খাদ্যের সন্ধানে মানুষ স্থানান্তরে গমন করে।

ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীব্যাপী উষ্ণতার তারতম্য বায়ুপ্রবাহে তারতম্য ঘটায়। বৃষ্টিপাতের তারতম্য দেখা দেয়। কৃষি অঞ্চলের হ্রাস ঘটে। কম বৃষ্টিপাত হওয়ার জন্য নদীর জলপ্রবাহ কমে যায় এবং কৃষিকাজে নদীর জলের ব্যবহার স্বভাবতই হ্রাস পায়। একথা বলাই বাহুল্য যে জলবায়ুর পরিবর্তন এই সব কৃষি নির্ভর সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

১০.৩.৬.৮ : খৃষ্টপূর্ব যুগ

প্রধানতঃ প্রত্মতাত্বিক নিদর্শন থেকে প্রাক্ খৃষ্ঠ যুগের সমাজ ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। এই সময় পৃথিবীর বহু স্থানে সাময়িক ভাবে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছিল। অনেক স্থানে বৃষ্টিপাত কমে যায়। উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। ফলে পূর্ব সৃষ্ট অনুকূল জলবায়ু অঞ্চলে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক পরিবেশ নষ্ট হতে শুরু করে। পূর্বে যেখানে খাদ্য উৎপাদন সহজ ছিল তা ক্রমশ পরিবর্তিত হতে থাকল। ফলে মানুষের জীবন যাপন পদ্ধতির আমূল পরিবর্তন ঘটে। জীবিকার সন্ধানে মানুষ ভিন্ন ভিন্ন স্থানে যাত্রা করে। খাদ্যের অভাব মানবগোষ্ঠী গুলির মধ্যে সংঘাতের সূত্রপাত ঘটায়, জলবায়ু পরিবর্তনের এক যুগান্তকারী প্রভাব এই সময় সমাজ জীবনে দেখা যায়।

খৃষ্ট জন্মের ১২০০ বছর আগে ভূমধ্যসাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহে জলবায়ুর পরিবর্তনে সমাজ জীবনে অস্থিরতা দেখা যায়। এই সময় আর্য্যরা ইরান থেকে পূর্ব দিকে যাত্রা শুরু করে এবং ভারতবর্ষের উত্তরপশ্চিমে বসবাস শুরু করে। সমসাময়িক কালে গ্রীসে মাইসিন্ সভ্যতা পুরোপুরি ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। এর প্রায় ১০০ বছর পরে উত্তর থেকে দোরিয়ান (Dorian) সম্প্রদায়ের লোকেরা প্রাচীন গ্রীসে এসে বসতি স্থাপন করে। জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে আনাটোলিয়ার মালভূমি অঞ্চল ক্রমে রুক্ষ হয়ে উঠে। ফলত স্থানীয় হিট্টিটি (Hittite) সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষেরা নতুন বাসস্থানের সন্ধানে বারে বারে মিশর আক্রমণ করতে থাকে।

মধ্য এশিয়ায় বিকশিত নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা ক্রমে উত্তরে ভল্গা ও নীপার নদীর তীরবর্তী

অঞ্চলে সম্প্রসারিত হয়। অপর পক্ষে মধ্য এশিয়া অঞ্চল থেকে আগত অশ্ববাহিনীর হাতে চীনের ইয়াং-শো এবং লাং-শান সভ্যতা বারে বারে আক্রান্ত হতে থাকে। কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন এই সব অঞ্চলকে মরুপ্রায় ভূমিতে পরিবর্তিত করেছিল। যে পরিবর্তন ঐ সব মানবগোষ্ঠীর সামাজিক বিবর্তন ঘটিয়েছিল। যার ফলে নতুন বাসস্থানের সন্ধানে এই সব গোষ্ঠীগুলি সংঘাতে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়।

চৌ-কো-চেন এর মতে ৮০০ খৃষ্ট পূর্বাব্দে চীনের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। তখন উষ্ণতা বেড়ে যাওয়ায় পূর্ব চীনের দক্ষিণে বেশী ভাগ অংশে দু'বার ভূট্টা চাষ করা সম্ভব হয়েছিল। প্রায় ৫০০ বছর পরে অর্থাৎ ২০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ উষ্ণতা কমে যাওয়ায় ঠাণ্ডার প্রভাব বাড়তে থাকে। জলবায়ুর এই পরিবর্তন কৃষির অনুকূল পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট করায় সমাজ জীবনে পরিবর্তন ঘটে। চীনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে এই পরিবর্তনের প্রত্যক্ষ ফল দেখতে পাওয়া যায়। চীনের বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি এই সময়ে অস্তিতের সংকটে পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হয়। সংঘাত সংকুল এই পরিস্থিতি ইতিহাসের পৃষ্ঠায় Warring States Period নামে পরিচিত।

৭৫৩ খৃষ্ট পূর্বাব্দে রোমের পত্তন হয়। ঐ সময় গ্রীকেরা সিসিলিতে উপনিবেশ স্থাপন করে। ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে পূর্ব ও দক্ষিণ ভূমধ্যসাগরের তীরে বসবাসকারী লোকেরা ঠাণ্ডা জলবায়ুর জন্য গরমের পোষাক ব্যবহার শুরু করে, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় ঢালু ছাদ বিশিষ্ট বাড়ী ঘর তৈরি করে। জলবায়ুর পরিবর্তন এবং শীতকালে বেশী বৃষ্টিপাতের ফলে অনেক বেশী পরিমাণ জমি কৃষিযোগ্য হয়ে উঠে। সমসাময়িক কালে গড়ে উঠা ফিনিসিয়ান্ ও কারথজিনিয়ান সভ্যতা জলবায়ুর পরিবর্তনে বিলুপ্ত হয়ে যায়।

উত্তর আমেরিকায় মেক্সিকো উপত্যকায় সমাজ ব্যবস্থার অগ্রগতি তিনটি সুনির্দিষ্ট কাল পর্যায়ে বিকশিত হয়েছিল। সময়টা ছিল ৫০০ থেকে ১০০ খৃষ্টপূর্বাব্দ। আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে ৫০০ খৃষ্টপূর্বাব্দে সমগ্র উত্তর গোলার্ধে উষ্ণতার সামগ্রিক রূপ বদলে যায়। ফলস্বরূপ বায়ুপ্রবাহের গতি পরিবর্তিত হয়। ঠাণ্ডার প্রকোপ বাড়তে থাকে। ঐ সমস্ত স্থানে গড়ে উঠা সভ্যতা ধীরে ধীরে অবলুপ্ত হয়।

জলবায়ু পরিবর্তনের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে মানবসভ্যতা ও সংস্কৃতির পরিবর্তন সর্বদাই জলবায়ু পরিবর্তনের দ্বারা প্রভাবিত। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক এবং চিন্তাবিদ্গণ সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তনে জলবায়ুর গুরুত্ব সম্পর্কে মতবাদ পোষণ করেন।

১০.৩.৬.৯ : খৃষ্ট যুগ

গৌতম বুদ্ধ ও কনফুসিয়াসের তুলনায় যিশুখৃষ্ট মনোরম জলবায়ু চলাকালীন সময়ে জন্মগ্রহণ করেন। সমগ্র পৃথিবীতে আবহাওয়ার অনেক পরিবর্তন ঘটেছে। কোথাও বৃষ্টিপাতের সময় সীমা পরিবর্তিত হয়েছে। আবার বৃষ্টি বহুল অঞ্চল খরায় পরিণত হয়েছে। টলেমির বিবরণ থেকে জানা যায় আর্দ্র বাতাস ও বৃষ্টিপাত উত্তর আফ্রিকার জলবায়ুর উন্নতি ঘটায়। ফলে ১২০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ আলেকজান্দ্রিয়ার পত্তন হয়।

ঐতিহাসিক প্লিনির সময়ে প্রাপ্ত আবহাওয়ার বিবরণ থেকে জানা যায় যে ৫০০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত রোম ও তার আশপাশের আবহাওয়া ক্রমশ উষ্ণতর হতে থাকে ফলে দ্রাক্ষা চাষ ইটালি থেকে জার্মানী ও ইংল্যাণ্ড পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়।

খৃষ্টিয় ৪ শতকে মধ্য এশিয়ায় খরার প্রকোপে ঐ অঞ্চলে পশু খাদ্যের অভাব দেখা দেয়। জনবসতিগুলি পরিত্যক্ত হয়। বসবাসকারী মানবগোষ্ঠীগুলি ক্রমশ পশ্চিমে যাত্রা শুরু করে। ফলস্বরূপ মধ্যএশিয়ায় বসবাসকারী যাযাবর সম্প্রদায়ভুক্ত মানবগোষ্ঠীগুলির দ্বারা রোম সাম্রাজ্য বার বার আক্রান্ত হয়।

উষ্ণতা বৃদ্ধি ও খরার সূচনা ভয়াভব রোগের সূত্রপাত ঘটায়। খৃষ্টিয় ১৪৪ থেকে ১৭৪ এর মধ্যে ভূমধ্য সাগরের তীরবর্তী অঞ্চলে গড়ে উঠা মানব সভ্যতা প্লেগের দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং মহামারীর রূপ নেয়। উক্ত সময়ে মিশরের মোট জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ প্লেগে আক্রান্ত হয়ে মারা যায়। মিশর থেকে ম্যাসিডোনিয়া এবং ক্রমে রোমে প্লেগের বিস্তার ঘটে। ৫৫০ খৃষ্টাব্দ নাগাদ সমগ্র ইউরোপে প্রায় ১০ কোটি লোকের মৃত্যু ঘটে ভয়াবহ প্লেগের আক্রমণে। ইতিহাসে এই সময়টা “ব্ল্যাক ডেথ” নামে পরিচিত। জলবায়ুর পরিবর্তনে এই রোগের আবির্ভাব ও বিস্তার ঘটেছিল। ফলস্বরূপ মিশর, ম্যাসিডোনিয়া ও রোমে গড়ে উঠা সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

মধ্য আমেরিকায় মায়া সভ্যতা খৃষ্টিয় ৮ শতকে দ্রুত পরিবর্তিত হতে শুরু করে। উক্ত অঞ্চলে প্রাপ্ত ফুলের রেণু বিশ্লেষণ করে জানা যায় যে জলবায়ুর পরিবর্তন এ অঞ্চলে উদ্ভিদের পরিবর্তন ঘটায়। ঘাসে ঢাকা অঞ্চল ক্রমে বৃহৎ বৃক্ষরাজিতে পরিণত হয়। মায়া সভ্যতায় যে সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে উঠেছিল তা ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার ভার বহনে অক্ষম হয়ে পড়ে। কারণ জলবায়ুর পরিবর্তন তৈরি করা সেচ ব্যবস্থায় আঘাত হানে। শষ্য উৎপাদন ব্যহত হয়। সমাজব্যবস্থায় অবক্ষয় শুরু হয় এবং পরিবর্তন ঘটে।

১০.৩.৬.১০ : আধুনিক যুগ

মানুষের বুদ্ধিবৃত্তির বিকাশ নিয়ে এলো কৃষি ব্যবস্থায় বিবর্তন। ফলে ক্রমন্নতি ঘটল মানব সভ্যতার। কালক্রমে মানব সভ্যতা আধুনিক যুগে প্রবেশ করল। জলবায়ুর উন্নতি সভ্যতার বিকাশে প্রধান সহায়ক ছিল। পৃথিবীব্যাপি জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটেছিল অনেক আগেই। ফলস্বরূপ সভ্যতার বিবর্তন নানা স্থানে সমাজ ব্যবস্থায় নিয়ে এসেছিল পরিবর্তন।

খৃষ্টিয় ১০ শতকের পর পৃথিবীতে জলবায়ুর সামগ্রিক উন্নতি হয়। প্রাপ্ত আবহাওয়া সম্বন্ধীয় তথ্য থেকে জলবায়ুর এই উন্নতি 'মধ্যযুগীয় ক্লাইমেটিক অপটিমাম্' (Medieval climatic optimum) নামে পরিচিত। ইউরোপ ও আমেরিকায় জলবায়ুর এই উন্নতি জাপান ও চীনে লক্ষ করা যায় নি।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে ৮০০ থেকে ১২০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে বর্তমান আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডে'এ ভাইকিং (Viking) সভ্যতার বিকাশ ঘটেছিল। ইতিহাসে ভাইকিং'রা নোরস্ (Norse) নামেও পরিচিত। জলবায়ুর উন্নতির ফলে আইসল্যাণ্ড ও গ্রীনল্যাণ্ডের অনেক অংশ তখন ঘাস, গুল্ম ও ছোট ছোট গাছে ঢাকা অঞ্চল ছিল। ভাইকিংদের তৈরি বিশাল খামার বাড়ী ও বার্লি চাষের প্রমাণ প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্য থেকে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ঠাণ্ডার প্রকোপে ঐ অঞ্চলের শষ্য উৎপাদনে ব্যঘাত ঘটায়, খাদ্যাভাবের ফলে ভাইকিং সভ্যতার অবলুপ্তি হয়।

খৃষ্টিয় ১০ শতক থেকে ২০ শতকের মধ্যে পৃথিবীর বেশীর ভাগ স্থানে জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন হয়। ঐ সমস্ত অঞ্চলে বিকশিত সমাজ ব্যবস্থাতে ও পরিবর্তন আসে এবং স্থান বিশেষে অবলুপ্ত হয় সমাজ ব্যবস্থা। উষ্ণতা কমে যাওয়ায় উত্তর মেরু থেকে বরফের আস্তরণ ক্রমশ দক্ষিণ দিকে আইসল্যাণ্ড ও গ্রীণল্যাণ্ড পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। ফলে সমুদ্রপথে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। জনবসতিগুলি পরিত্যক্ত হয়। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়।

১২০০ খৃষ্টাব্দে ডরসেট্ (Dorset) কৃষ্টিভুক্ত এস্কিমো'রা জলবায়ুর পরিবর্তনে উত্তর কানাডা থেকে ক্রমশ দক্ষিণে সরে এসে বসবাস শুরু করে। খাদ্যের অভাবে উক্ত অঞ্চলে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষের সূচনা হয়। গোষ্ঠী সংঘাত ও রোগের প্রকোপে ক্রমশ ঐ অঞ্চল জনবসতি শূন্য হয়ে যায়। সমাজব্যবস্থার অবলুপ্তি হয়।

উত্তর সাগরের তীরবর্তী দেশ সমূহে জলবায়ুর এই পরিবর্তন বিশেষ ভাবে লক্ষ করা যায়। খৃষ্টিয় ১৩ শতকে সামুদ্রিক বন্যা ও ঝড়ের প্রভাবে বহু লোকের মৃত্যু হয়। সামুদ্রিক ঝড় ও বন্যা কৃষি ও কৃষি জমির প্রভূত ক্ষতি সাধন করে। খাদ্য শষ্যের অভাবে ইউরোপের বহুস্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বহু স্থান জনবসতি শূণ্য হয়ে যায়। সমাজ ব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

উত্তর আফ্রিকায় জলবায়ুর পরিবর্তন মরু অঞ্চলের বিস্তার ঘটায়। খৃষ্টিয় ১৩ শতকে পশ্চিম আফ্রিকায় মালি (Mali) সাম্রাজ্যের বিস্তার জলবায়ুর পরিবর্তনে বিশেষ ভাবে ব্যাহত হয়। মালি সুলতানরা টিমবাকটু (Timbaktu) তে প্রাসাদ নির্মাণ করেছিল। গড়ে তুলেছিল উন্নত সমাজব্যবস্থা। পশ্চিম আফ্রিকায় জলবায়ুর পরিবর্তন মালি সাম্রাজ্যের পতনকে তরান্বিত করে। অধিক বৃষ্টিপাতে নাইজার নদীতে বন্যা দেখা দেয়। ঐ সময় আবার প্রাকৃতিক কারণে নাইজার নদীর গতিপথ পরিবর্তিত হয়। বন্যার ফলে টিমবাকটু'র বাসিন্দারা শহর ছেড়ে অন্যত্র চলে যায়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এই অঞ্চলে সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। পরবর্তীকালে খরার প্রকোপে ঐ অঞ্চলের প্রাকৃতিক পরিবেশ পরিবর্তিত হয়। তীব্র খরার ফলে সহেল (Sahel) অঞ্চলের সৃষ্টি হয় যা এমন বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলরূপে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বৃষ্টিপাত কমে যাওয়ায় পশ্চিম আফ্রিকার বেশীর ভাগ অংশ খরা অঞ্চলে পরিণত হয়। চাদ হ্রদ অঞ্চলের রুক্ষতার কারণে কৃষিকাজে বিঘ্ন এবং খাদ্যের অনিশ্চয়তা অধিবাসীদের ক্রমশ দক্ষিণে সরে আসতে বাধ্য করে।

ঐতিহাসিক তথ্য থেকে জানা যায় যে মধ্যযুগে ভারতে জলবায়ুর পরিবর্তন খরার সূচনা করেছিল। শষ্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায় খাদ্যের অভাবে বহু স্থানে দুর্ভিক্ষ দেখা দেয়। বহু মানুষ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীতে প্রাণ হারান। সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন ঘটে। ঐতিহাসিক ব্রাইসনের মতে জলবায়ুর পরিবর্তনে আগ্রায় তৈরী হওয়া নগরী ফতেপুর সিক্রি (Fatepur Sikri) মাত্র ১৬ বছরের মধ্যেই পরিত্যক্ত হয়।

উত্তর আমেরিকায় মধ্যযুগে জলবায়ুর পরিবর্তনে জনসংখ্যার বিশাল পরিবর্তন ঘটে। উষ্ণতা ও বৃষ্টিপাতের তারতম্যের ফলে বহু স্থান জনবসতিশূন্য হয়ে যায়। নতুন স্থানে মানুষ বসবাস শুরু করে। ফলস্বরূপ সমাজ ব্যবস্থায় পরিবর্তন হয়।

খৃষ্টিয় ষোড়শ শতকের পর থেকে আবহাওয়া সম্পর্কিত সংগৃহীত বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে পৃথিবী ব্যাপি জলবায়ুর বিশদ বিবরণ পাওয়া যায়। ষোড়শ শতক আগের শতক থেকে উষ্ণ ছিল।

পর্যটকদের বিবরণ থেকে জানা যায় যে জলবায়ুর পরিবর্তনে ষোড়শ ও সপ্তদশ শতকে আনাটোলিয়ার মালভূমি অঞ্চলে কৃষিযোগ্য জমি ও বাসস্থান পরিত্যক্ত হয়ে যায়। ফলে ঐ অঞ্চলে গড়ে উঠা সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটে।

সপ্তদশ, অষ্টাদশ, ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে খরা, বন্যা ও প্রাকৃতিক ঝড়ের প্রভাবে ব্যাপক শষ্য, সম্পত্তি ও জীবনহানি হয়। বহু মানুষ নিজ নিজ বাসস্থান ত্যাগ করে জীবিকার সন্ধানে অন্যত্র গমন করে, গড়ে ওঠা সমাজ ব্যবস্থার বিলুপ্তি হয়। নতুন পরিস্থিতিতে

স্থানান্তারিত মানুষের বয়ে নিয়ে আসা কৃষ্টি ভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করে। পৃথিবীব্যাপী এই পরিবর্তনের ইতিহাস আজও সচল যেমন সচল জলবায়ুর পরিবর্তন।

১০.৩.৬.১১ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (Reference Books)

১। Burrough, W.J. 2005. Does the weather Really Malter? Cambridge University Press. Cambridge, England.

২। Huntington, E. 1948, Civilization and Climate Yale University Press, London.

৩। Lamb, H. H. 1995. Climate, History and the Modern World, Rontledge, London.

Websites :

১। http://www.sunysuttolk.edu

২। http://www.urantia.org

১০.৩.৬.১২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। মানব সমাজের উন্মেষ ও ক্রমবিকাশে জলবায়ুর ভূমিকা সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা কর।

২। মানুষ সমাজবদ্ধ হয়েছিল কেন? এই সমাজবদ্ধতার মধ্য দিয়ে মানুষ কি কি সুবিধা লাভ করেছিল?

৩। প্রাক্ ঐতিহাসিক যুগে পৃথিবীব্যাপী যে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তার মূল ভিত্তি কি ছিল? কিভাবে এই সভ্যতা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়?

৪। জলবায়ু পরিবর্তনের পরোক্ষ উপাদান গুলি কি কি? তাদের সম্পর্কে বিশদ আলোচনা কর।

৫। মানব সভ্যতায় অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি উন্নত সমাজব্যবস্থার গঠনের সহায়ক এ সম্বন্ধে তোমার নিজস্ব মতবাদ ব্যক্ত কর।

৬। "জলবায়ুর পরিবর্তনে মানুষের বাসস্থানের পরিবর্তন ঘটে"— ঐতিহাসিক সূত্র ধরে কি ভাবে বিভিন্ন সময়ে এই পরিবর্তন হয়েছে সে সম্পর্কে তোমার মতবাদ ব্যক্ত কর।

————

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

CLIMATE FACTORS IN THE EVOLUTION SOCIETIES AND NATURE BASED ACTIVITIES

একক - ৭

Nature based activities and social formation

বিন্যাসক্রম :

১০.৩.৭.০ : উদ্দেশ্য

১০.৩.৭.১ : প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ ও সামাজিক প্রক্রিয়াকরণ

১০.৩.৭.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১০.৩.৭.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.৩.৭.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

১। প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ বলতে কি বোঝায়?

২। ভারতীয় পরিবেশবাদ ও ইউরোপীয় পরিবেশবাদের পার্থক্য।

৩। ভারতবর্ষে প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ ও তার সীমাবদ্ধতা।

১০.৩.৭.১ : প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ ও সামাজিক প্রক্রিয়াকরণ

আধুনিক ভারতে পরিবেশ, প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ক কার্যকলাপ অনুকরণের পূর্বে প্রয়োজন পরিবেশের সংকটের চরিত্রকে নির্ণয় করা। প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগে পরিবেশের সংকট ভারতবর্ষে থাকলেও তা একটি বৃহৎ সংকটে পরিণত হয়েছিল কিনা তা ঐতিহাসিক মহলে একটি বহুচর্চিত ও বহু বিতর্কিত বিষয়। Richard Grove তাঁর ‘Green Imperialism’ গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে পরিবেশের সংকট ভারতবর্ষে শুরু হয়েছিল উপনিবেশের যুগের পূর্বে। ইউরোপীয়রা ভারতবর্ষে আগমনের পূর্বেই মালাবার অঞ্চলের জঙ্গল ধ্বংস হয়েছিল স্থানীয় মানুষের কার্যকলাপের দ্বারা। তাছাড়া সমুদ্রের তাপমান বেড়ে যে ‘El Nino’ বা উত্তপ্ত সামুদ্রিক জলোচ্ছ্বাস বহুবার মধ্যযুগে প্রাকৃতিক সংকটের সূচনা করে, সে তথ্যও অজানা নয়। কিন্তু গ্রোভের এই বক্তব্য বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। ভারতবর্ষের প্রকৃতি বিশেষত এর অরণ্য সম্পদকে ব্যবহারের প্রয়োজন প্রাক্ ঔপনিবেশিক পর্বে খুব বৃহৎ ছিল না। ইউরোপসহ সমস্ত উন্নত দেশগুলির ইতিহাস পর্যালোচনা করলেই দেখা যায় যে শিল্পবিপ্লবের পূর্বে খনিজসহ অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারের প্রয়োজন ছিল অত্যন্ত সীমিত। শিল্পবিপ্লবের কাঁচামালের চাহিদা প্রকৃতিকে শোষণের পথ সুনির্দিষ্ট করেছিল ও সেই পথ ধরেই প্রথম ইংল্যাণ্ডসহ অন্যান্য ইউরোপের দেশগুলির প্রকৃতির উপর প্রত্যক্ষ আঘাত নেমে আসে। ভারতবর্ষ ছিল ইংল্যাণ্ডের উপনিবেশ। সে দেশে পৃথিবীতে প্রথম শিল্পবিপ্লব সূচিত হয় অষ্টাদশ শতকের শেষপর্ব থেকে। ইংল্যাণ্ডের ঔপনিবেশিকরণের একটি মূল উদ্দেশ্য ছিল ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের শোষণ যা শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজনে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল। এই অর্থনৈতিক প্রক্রিয়াতেই ভারতবর্ষের পরিবেশের উপর প্রথম প্রত্যক্ষ আঘাত নেমে আসে। রামচন্দ্র গুহ, মাধব গ্যাডগিল এর মত চিন্তাবিদ তাই ভারতে পরিবেশের সংকটের মূল কারণ হিসাবে উপনিবেশের প্রক্রিয়াকে দায়ী করেন। মাধব গ্যাডগিলের সুস্পষ্ট অভিমত — “There was a perfect balance between man and nature before 1800 A.D. and the real imbalance started after that”. উন্নয়নের প্রক্রিয়াতে পরিবেশের অবক্ষয় স্তর, উন্নয়নের প্রক্রিয়া ইংল্যাণ্ডে অব্যাহত রাখার জন্য

ঔপনিবেশিকরণের প্রয়োজন ও এই উপনিবেশের প্রক্রিয়াতেই ভারতবর্ষের পরিবেশের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত এসেছিল। উপনিবেশের পূর্বে বিভিন্ন সংকট থাকলেও তার ব্যাপকতা সন্দেহাতীত নয়।

প্রকৃতি বিষয়ক কার্যকলাপ বা 'Nature based activities' ও আধুনিক পৃথিবীতে প্রথম লক্ষ্য করা যায় ইউরোপে। উনিশ শতকের প্রথমে ব্রিটিশ রোমান্টিক লেখকরা যার মধ্যে ছিলেন — পারসী শেলী, লর্ড বাইরন বা উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত ব্যক্তিত্ব, প্রকৃতিকে রক্ষার আর্তি করেন তাদের সাহিত্য সৃষ্টির মাধ্যমে। আমেরিকায় ইমারসন, থেরো বা টম মুর সরাসরি প্রকৃতির জগৎকে বাঁচানোর কথা বলেন ও প্রকৃতির জগতে মানুষের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন। এই প্রাথমিক সচেতনতা উনিশ শতকেই পরিণত হয় বিজ্ঞানমনস্ক পরিবেশের সংরক্ষণের ধারণাতে যাকে এককথায় বলা হয় 'Scientific forestry' বা 'বিজ্ঞানসম্মত অরণ্যভাবনা'। ইউরোপে জার্মানী বিশেষত জার্মানীর 'বন' বিশ্ববিদ্যালয় ছিল এর অন্যতম নেতৃত্বে। ইংল্যাণ্ডসহ সমস্ত দেশেই বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রকৃতি সংরক্ষণের গবেষণা শুরু হয় যার সূত্র ধরে ভারতবর্ষেও প্রকৃতি সংরক্ষণ বিষয়ে ইউরোপীয় উদ্যোগেই প্রথম প্রক্রিয়া শুরু হয়।

ভারতবর্ষে প্রকৃতি বিষয়ক কার্যকলাপ প্রথমে দেখা যায় বিভিন্ন বোটানিকাল গার্ডেন স্থাপনের উদ্যোগের মধ্যে দিয়ে, যার নেতৃত্বে ছিলেন উইলিয়াম রক্সবার্গের মত ব্যক্তিত্ব। রিচার্ড গ্রোভ তার গ্রন্থে এই উদ্যোগগুলির সদর্থক দিক বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন। ভারতীয় অরণ্যকে চেনা ও এর সংরক্ষণ বিষয়ক গবেষণার সূত্রপাত এখানেই। ইংল্যাণ্ডের টেম্স নদীর তীরে যে 'কিড' গার্ডেন তৈরি হয়েছিল, সেই প্রকল্পের অনুসরণে তৈরি হয় কলকাতার বোটানিকাল গার্ডেন। কিন্তু এই প্রক্রিয়া ছিল সীমিত, কারণ সার্বিকভাবে ভারতবর্ষের অরণ্যসম্পদকে বাঁচানোর প্রচেষ্টা এর মধ্যে ছিল না।

উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই ভারতবর্ষে অরণ্য সম্পদের উপর প্রত্যক্ষ আঘাত নেমে আসে। যার মূল কারণ ছিল রেলপথের বিস্তার। রেলের পাটাতন তৈরির প্রয়োজনে লক্ষ্য লক্ষ্য হেক্টর অরণ্য ধ্বংস প্রয়োজন ছিল। উনিশ শতকের মধ্যভাগ থেকে ভারতবর্ষে অরণ্য সম্পদ এই প্রক্রিয়াতে একটি ব্যাপক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়। এই সংকটের সময়ে ইংল্যাণ্ডসহ ইউরোপে বিজ্ঞানভিত্তিক অরণ্যসম্পদ ব্যবহারের গবেষণার সূচনা হয় ও এরই সূত্র ধরে ভারতবর্ষে প্রথম বিজ্ঞানভিত্তিক অরণ্য-ভাবনার ধারণা গড়ে ওঠে যার প্রত্যক্ষ ফল হয় ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত দেরাদুনের প্রথম 'Forestry Research School' ও ১৮৬৫-র প্রথম ভারতবর্ষের অরণ্য আইন।

ভারতবর্ষে অরণ্য আইন ও প্রথম অরণ্যগবেষণা কেন্দ্রের পথিকৃৎ ছিলেন Dictrich Brandis যিনি গবেষণা কেন্দ্রটির প্রতিষ্ঠাতা ও ভারতের প্রথম অরণ্য-আইনের খসড়াটিও তিনি তৈরি করেছিলেন। ব্রাণ্ডিস জার্মানীর বন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র যিনি কর্মজীবন শুরু করেন বার্মাতে ও পরে ভারতে অরণ্য-সংরক্ষণের প্রকল্পে ব্রিটিশ সরকার তাকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসেন। প্রথম অরণ্য-আইনে ভারতের অরণ্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংরক্ষণের কথা বলা হয়, ব্যক্তিগত মালিকানাধীন অরণ্যের স্থানে সরকার নিয়ন্ত্রিত

অরণ্যের কথা বলা হয় ও সর্বোপরি অরণ্যের উপর থেকে আদিবাসিদের অধিকারের বিষয়টিতে নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়। উল্লেখ্য যে — ব্রাণ্ডিস আদিবাসিদের অরণ্যের অধিকারের কথা না বললেও অরণ্য-সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আদিবাসি ও সরকারের যৌথ উদ্যোগের কথা বলেছিলেন যে নীতি ব্রিটিশ সরকার গ্রহণ করেননি। এককথায় এই যৌথ অরণ্য-সংরক্ষণের ধারণা ব্রাণ্ডিসই প্রথম বলেন ভারতবর্ষের ক্ষেত্রিতে সে ধারণা প্রয়োগ করা হয়েছিল তার প্রায় একশ বছর পরে ১৯৭০ এর দশকে স্বাধীন ভারতবর্ষে।

১৮৭৮-র দ্বিতীয় অরণ্য আইনে ভারতবর্ষের অরণ্যের উপর ব্রিটিশ সরকারের নিয়ন্ত্রণ আরও সুদৃঢ় হয়। কিন্তু এই উদ্যোগগুলিকে কতঅংশে প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ বা ‘Nature based activities’ বলা যাবে তা বিতর্কের ঊর্ধ্বে নয়। ব্রিটিশ সরকারের আইনি পদক্ষেপের উদ্যোগ যতটা অরণ্য সংরক্ষণের প্রয়োজনে ছিল, তার থেকেও বেশি ছিল অরণ্য সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণের তাগিদে। ইংল্যাণ্ডের শিল্পবিপ্লবের প্রয়োজনে অনিবার্য হয়ে পড়েছিল ভারতবর্ষের অরণ্যসম্পদের যথাযথ নিষ্কাশন। এই অরণ্যসম্পদের শোষণ ছাড়া শিল্প বিপ্লবের খনিজ ও অন্যান্য কাঁচামাল ভারতবর্ষ থেকে নিষ্কাশন সম্ভবপর ছিল না। উৎপাদিত পণ্য ভারতবর্ষের বাজারে পৌঁছে দেওয়া ও কাঁচামাল ভারতবর্ষের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে জাহাজবন্দরগুলি নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষে রেলপথ বিস্তার করে। রেলপথ ভারতবর্ষের অরণ্যসম্পদের উপর সরাসরি আঘাত করে কারণ রেলের পাটাতন তৈরি হ’ল অরণ্যের সর্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট কাঠ দিয়ে। এভাবেই বলা যায় যে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সরকারের প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ যতটা সংরক্ষণের তাগিদে, তার থেকে অনেক বেশি শোষণের প্রয়োজনে।

ইউরোপের সূত্র ধরে অরণ্য-আইন যেমন ভারতবর্ষে তৈরি হয়েছিল, সেরকমই কিছু সংরক্ষণের ধারণা তৈরি হয়েছিল। মূলতঃ ইউরোপীয় পরিবেশবাদীরা ছিলেন এই ধারণার পথিকৃৎ। বিশেষত ভারতবর্ষে যারা বনবিভাগের বিভিন্ন পদে আসীন ছিলেন ও দেরাদুন অরণ্য গবেষণাকেন্দ্রের কাজে যুক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে পরিবেশবিষয়ক ধারণাগুলি পাওয়া যায়। উল্লেখ্য যে এদের কেউ কেউ সাম্রাজ্যবাদী চিন্তার থেকে পৃথক হলেও কখনও সাম্রাজ্যবাদের বিরোধিতা করেননি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে F. Canning, যিনি ভারতবর্ষে অরণ্য বিভাগের সর্বোচ্চ আসনে আসীন ছিলেন, বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের অরণ্যসম্পদ রক্ষার প্রয়োজন। কারণ তা অচিরে চিরবিনষ্ট হতে পারে। কিন্তু Canning -ই ছিলেন অন্যতম শিকারী যিনি কয়েক শত বাঘ মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে হত্যা করেছিলেন উত্তরপ্রদেশের অরণ্যে। সেখানে এই সময়ে ব্যাঘ্র প্রজাতিকে রক্ষার জন্য আন্দোলন চলছে। A.P.F. Hamilton প্রথম জলসম্পদ রক্ষার কথা ও ক্রমবর্ধমান বৃষ্টিপাত বৃদ্ধির বিষয়টিকে আলোকপাত করেছিলেন। কিন্তু তিনি উল্লেখ করেননি যে ব্রিটিশ-ভারতে অরণ্যের ব্যাপক ক্ষতি বৃষ্টিপাতের পরিমাণের তারতম্যের বা এই প্রাকৃতিক পরিবর্তনের জন্য দায়ী। এইরকম পরিবেশবিদদের মধ্যে উল্লেখ করা যায় (Philip Mason,

F.W. Champion, E.A. Smythes, Herbest Haward, Harry J. Champion এর মত ব্যক্তিত্বকে যারা নানাভাবে প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার কথা বলেছেন। F.W. Champion ছিলেন প্রথম ব্যক্তি যিনি শিকারের বন্দুকের বদলে অরণ্যের প্রকৃতি ও পশুকে ক্যামেরার ফোটোয় বন্দী করার কথা বলেন। Harry Champion ১৯১৫-১৯৪০ খ্রীষ্টাব্দে ভারতবর্ষে ছিলেন, ভারতবর্ষের সমস্ত অরণ্যে (সিন্ধু অঞ্চল বাদে) ভ্রমণ করেন ও সংরক্ষণের কথা বলেন। কিন্তু এদের কারও ধারণাই সাম্রাজ্যবাদের প্রক্রিয়ার ঊর্ধ্বে ছিল না। এরা ব্রিটিশ সরকারের শোষণমূলক অরণ্যনীতির বিরোধিতা করেননি। অরণ্যের ভারতীয় অধিবাসীদের অধিকারের সমর্থনে কথা বলেননি ও সর্বোপরি তিনি ইংরেজ সরকারের সাম্রাজ্যবাদী অরণ্যনীতির প্রত্যক্ষ সমর্থক ছিলেন।

ভারতবর্ষে ইউরোপীয়রা প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ শুরু করলেও তা অনেক সীমাবদ্ধতায় আবদ্ধ ছিল। এই সীমাবদ্ধতার ঊর্ধ্বে ছিলেন না জিম করবেটের মত মানুষও যিনি ভারতবর্ষেই জন্মেছিলেন। বিভিন্ন পরিবেশবাদী সংস্থা যেমন বোম্বে ন্যাচারাল হিস্ট্রি সোসাইটি, ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফাণ্ড প্রভৃতির ভূমিকা এখানে গুরুত্বপূর্ণ।

স্বাধীন ভারতের সরকার ১৯৫২ সালে প্রথম কৃষি-আইনের মধ্যেই অরণ্য-আইনের প্রাথমিক খসড়া তৈরি করে। এতে কৃষির পাশাপাশি অরণ্য সংরক্ষণের কথা বলা হয়। কিন্তু স্বাধীন ভারতে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন ইন্দিরা গান্ধী যিনি ১৯৭২ সালে নিজে প্রত্যক্ষভাবে স্টকহোমসে অনুষ্ঠিত প্রথম আন্তর্জাতিক বিশ্বসম্মেলনে গিয়েছিলেন ও যাকে ভারতের পরিবেশের প্রধানমন্ত্রীরূপে চিহ্নিত করা হয়। তাঁর উদ্যোগেই স্বাধীন ভারতে প্রথম পরিবেশ আইন তৈরি হয়, জাতীয় অরণ্যগুলি সৃষ্টি হয় ও পরিবেশরক্ষক বিষয়ে সরাসরি সচেতনতা বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে।

প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও কোন নিবন্ধের ক্ষুদ্র পরিসরে তা সামগ্রিকভাবে অনুধাবন সম্ভব হয়। কিন্তু উল্লেখ্য যে সমাজে এই কার্যকলাপ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উপজাতি সমাজ এই প্রক্রিয়ায় তাদের অরণ্যের উপর থেকে চিরাচরিত অধিকার হারিয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় ঔপনিবেশিক সরকার অরণ্যের উপর নিরঙ্কুশ অধিকারকে কায়েম করে অরণ্যসম্পদ ধ্বংসের পথ প্রশস্ত করেছিল। এই প্রক্রিয়ায় বর্তমান পরিস্থিতি এমন এক পর্যায়ে যা একটি দ্বিমুখী বিপরীত ভাবনার সৃষ্টি করে — অরণ্যের প্রয়োজনে যেমন উপজাতিদের অরণ্যের অধিকার ফিরিয়ে দেওয়া কঠিন, এরকমই উপজাতিদের বেঁচে থাকার প্রয়োজনে তাদের অরণ্যের উপর কিছু অধিকার থাকা প্রয়োজন। বিপরীতমুখী এই প্রক্রিয়ার টানাপোড়েনেই বর্তমান ভারতবর্ষের প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ দ্বিধাগ্রস্ত আর সেই কার্যকলাপের মধ্যে দিয়েই সন্ধান পাওয়া যায় এর সামাজিক প্রক্রিয়াকরণের চরিত্রটির।

১০.৩.৭.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। R. Guha and M. Gadgil — *'This Fissared Land : an Ecological history of India'.*

২। R. Sivaramkrishnan — *Modern Forests.*

৩। R. Grove — *Green Imperialism*

৪। M. Sarkar (ed) — *"Environmental History" Recent Dialogues*.

৫। R. Chakraborty (ed) — *'Situating environmental History of India*.

১০.৩.৭.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপ বলতে কি বোঝ ? (What is nature base activity ?)

২। ভারতবর্ষের ইতিহাসে প্রথম প্রকৃতিভিত্তিক কার্যকলাপের উদ্যোগ কারা নিয়েছিলেন ? তাদের মূল সীমাবদ্ধতাগুলি কি ছিল ?

৩। ইউরোপীয় পরিবেশবাদের সঙ্গে ভারতীয় পরিবেশবাদের মূল পার্থক্যগুলি কি ?

৪। স্বাধীন ভারতে অরণ্য-আইন কিভাবে রচিত হয়েছিল ? এর উদ্যোগ কিভাবে ও কারা নিয়েছিলেন ?

৫। সামাজিক প্রক্রিয়াকরণের প্রেক্ষিতে উপজাতিদের অরণ্যের অধিকারের বিষয়টি সংক্ষেপে আলোচনা কর।

————

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS, NATURE AND SOCIETIES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HISTORY

একক - ৮

দেশীয় তথ্য ও জ্ঞান, প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশ

Indigenous Knowledge Systems, Nature and Societies

বিন্যাসক্রম :

১০.৪.৮.০ : ভূমিকা

১০.৪.৮.১ : প্রকৃতি ও দেশীয় জ্ঞান

১০.৪.৮.২ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.৪.৮.০ ঃ ভূমিকা

বর্তমানে বিশ্বের তাপবৃদ্ধি ও এর জন্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যাওয়াকেই মূলতঃ দায়ী করার ফলে এক নতুন পরিবেশ চেতনার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষ ও প্রকৃতির সম্পর্ক ও আদান প্রদান, মানবসমাজ কর্ত্তৃক প্রকৃতির ব্যবহার ও তার ফলাফল ইত্যাদিকে ঘিরে উঠে এসেছে নতুন প্রশ্নমালা। আদিবাসীরা অতীতে যেভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করতেন তার ফলে পরিবেশের ভারসাম্য বিনষ্ট হোত না। বর্তমানেও আদিবাসী ও অরণ্য সন্নিহিত অঞ্চলে বসবাসকারী বিভিন্ন আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির মধ্যে যে প্রকার অরণ্য ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় তার মধ্যেও আমরা এই সম্প্রদায়গুলির সংস্কৃতির মধ্যে ও চেতনার মধ্যে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার তাগিদ দেখতে পাই। এই পরিবেশ চেতনা কিন্তু আধুনিক ও তথাকথিত বিজ্ঞান সম্মত পরিবেশ চেতনার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তবে পৃথক হওয়া সত্ত্বেও এই পরিবেশ চেতনা কিন্তু বিজ্ঞানসম্মত। আদিবাসীদের এই দেশীয় বা স্থানীয় জ্ঞানকে বলা হয় 'Indigenous Knowledge'। এই জ্ঞান স্থানীয় তথ্য নির্ভর এবং অভিজ্ঞতা ও স্মৃতি নির্ভর। কোন তত্ত্ব অথবা সাধারণসূত্র অনুসন্ধানকারী জ্ঞান এটা নয়। এখানেই আধুনিক বিজ্ঞানের থেকে এটি আলাদা।

১০.৪.৮.১ ঃ প্রকৃতি ও দেশীয় জ্ঞান

আধুনিক পরিবেশবিদ্ এবং পরিবেশকর্মীরা এই আদিবাসী সম্প্রদায়গুলির স্থানীয় জ্ঞানের উপযোগিতার বিষয় আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ঔপনিবেশিক যুগেও ইংরেজ আধিকারিকরা এই জ্ঞানের গুরুত্ব উপলব্ধী করেছিলেন। প্রকৃতিকে করায়ত্ত করে নিজেকে রক্ষা করা মানুষের আদিম প্রবৃত্তি। প্রকৃতির বিভিন্ন বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার জন্য ও খাদ্য সংগ্রহ করার জন্য অভিজ্ঞতালব্ধ বিভিন্ন কৌশল আদিবাসীদের অর্জন করতে হয়েছিল। আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতি এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে তথাকথিত 'অনগ্রসর' ও 'অসভ্য' সমাজ ও ইউরোপীয়দের সংযোগসাধনের ফলে প্রকৃতি ও পরিবেশ সম্পর্কে আদিবাসীদের দেশীয় জ্ঞান (Indigenous Knowledge) সম্পর্কে মানুষের আগ্রহ বৃদ্ধি পায়। এই প্রক্রিয়া পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে ঔপনিবেশিক শাসন বিস্তারের ফলে দ্রুততর হয়ে ওঠে। যেমন ভারতে ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসনের প্রয়োজনে শাসকদের প্রয়োজন ছিল ভারতীয় উপমহাদেশ সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ ও জ্ঞানার্জন। এই জ্ঞানার্জন সম্ভব হয়েছিল দেশীয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীদের সহযোগিতার ফলেই। ইংরেজ ঔপনিবেশিক সরকারী আধিকারিকদের লেখায় এই বিষয় বিস্তারিত উল্লেখ পাওয়া যায়। Andew Fraser, W.W. Hunter প্রমুখের লেখা এর উৎকৃষ্ট উদাহরণ। A. Mervyn Smith নামে একজন ইংরেজ আধিকারিক উনিশ শতকে ছোটনাগপুর জেলায় কর্মরত ছিলেন। Mervyn সাহেব পরবর্তীকালে তাঁর অভিজ্ঞতা লিপিবদ্ধ করেন Sport and Adventure in the Indian

Jungle নামক গ্রন্থে। এখানে পরিবেশ, অরণ্য, বন্যজন্তু বাস্তুবিদ্যা সম্পর্কে দেশীয় মানুষের অভিজ্ঞতা এবং দেশীয় জ্ঞানের উল্লেখ পাওয়া যায়। Mervyn এর এই রচনায় পরদেশী নামে এক আদিবাসীর উল্লেখ আছে। পরদেশীর বিবিধ দক্ষতার উল্লেখ আছে। বিশেষতঃ সে বিভিন্ন জাতের পাখি ফাঁদ পেতে ধরার ব্যাপারে ছিল সিদ্ধহস্ত। এই দক্ষতা এবং স্থানীয় পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতাই হোল দেশীয় জ্ঞান। (Indigenous Knowledge) Mervyn এর লেখার কিছু নিদর্শন এখানে দেওয়া হোল :

"পরদেশীর সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় এমন এক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে হয়েছিল যে তা আমি কখনো ভুলতে পারব না। এটা ছিল 1877-78 সালে ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষের সময় যখন দক্ষিণ ভারতে খাদ্যের অভাব ও রোগের প্রাদুর্ভাবে লক্ষাধিক মানুষ মারা গিয়েছিল। 5.25 মিলিয়ন লোকের মধ্যে শুধু মাত্র মহীশূরেই দশলক্ষ লোকের মৃত্যু হয়েছিল যেখানে বেলারি (Bellary) জেলা খুব বেশি ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল। মাদ্রাজের বিভিন্ন প্যাকেটভর্তি খাদ্যশস্য যে গুলি পোতাশ্রয় গুলিতে জমা হয়েছিল সেগুলি কলকাতা, বার্মা, গোপালপুর এবং অন্যত্র জাহাজের মাধ্যমে ছড়িয়ে দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছিল। কিন্তু প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির পরিবহন ব্যবস্থা বিশেষত দুর্ভিক্ষপীড়িত জেলাগুলিতে যোগাযোগ ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত। সেই সময় মাদ্রাজ রেলওয়ে দক্ষিণ পশ্চিমে বাঙ্গালোর ও উত্তর পশ্চিমে বেলারির মধ্যে যোগাযোগ গড়ে তুলেছিল। যদিও এই দুই শহরের সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশগুলির রেলযোগাযোগ গড়ে ওঠেনি। দুর্ভিক্ষপীড়িত এই মৃত্যুতে মানুষের চেয়ে গবাদিপশুর দুর্দশা আরো বৃদ্ধি পেয়েছিল। ফলে গরুর গাড়ীর মত যোগাযোগও পঙ্গু হয়ে গিয়েছিল। বেলারি জেলা এবং উত্তর মহীশূরের বেশ কিছু এলাকা খাদ্যশূন্য হয়ে যাওয়ায় জনশূন্য হয়ে পড়েছিল। এখানকার অধিবাসীরা অভুক্ত অবস্থায় দিন কাটিয়েছিল। এই দুই জেলার সর্বাপেক্ষা ক্ষতিগ্রস্থ এলাকার চরম দুর্দিনের সঙ্গে আমি পরিচিত হয়েছিলাম এবং সেখানকার নীরব মানুষগুলির করুণ অবস্থাকে আমি আর স্মরণে আনার ইচ্ছা করি না।"

"এবার আসল গল্পে আসা যাক, বড়দিনের বেশ কিছুদিন আগে আমি চিতলদ্রুগ ও বেলারির মধ্য দিয়ে পরিভ্রমণ করছিলাম। জেলাটির প্রায় কুড়ি মাইলেরও বেশি আমাকে অতিক্রম করতে হয়েছিল। এই এলাকা দিয়ে ভ্রমণের সময় এখানকার চরম জনশূন্যতা দেখতে পেয়েছিলাম। বছরের সেই সময়টিতে Cholum (millet) দিয়ে মাঠটি ভর্তি ছিল যা বেলারির কালো মাটিতে খুব ভালো হয়েছিল। কিন্তু উত্তর-পূর্বের বর্ষার আগমনের ব্যর্থতার কারণে ফসল নষ্ট হয়ে যায়। আমাকে আরো বেশ কয়েক মাইল যেতে হয়েছিল যখন আমি লক্ষ্য করেছিলাম বেশ কিছু কুঁড়েঘর। আমি যখন এখানে আমার বিছানাপত্র ও গাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করলাম তখন কেউ কোন উত্তর দিল না। বেশ কিছু কুঁড়েঘর ছিল বন্ধ। আবার কিছু খোলা থাকলেও সেখানে কোন জনপ্রাণী লক্ষ্য করা গেল না। আমার গন্তব্যস্থলে যাওয়ার পথে একটি মর্মান্তিক দৃশ্য দেখতে পেলাম। একদল গ্রামীণ কুকুর paraiah একজন মানুষের পা ধরে টানাটানি করছে। দরিদ্র মানুষটি ক্ষুধায় এত দুর্বল যে সে কুকুরদের কামড়ানোর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে

ব্যর্থ। গত কয়েকমাসের অভিজ্ঞতা আমাকে শিখিয়ে ছিল যে, গ্রামীণ কুকুরগুলি তীব্র ক্ষুধার মুখোমুখি হয়ে মৃত ও দুর্বল মানুষগুলিকে খাওয়া শুরু করেছে। আমি আমার সাইসকে (syce) পাঠালাম এবং আমি তাকে আমার ক্যাম্পে পাঠালাম কিছু গ্রামবাসীসহ। কয়েকফোটা তরল পানীয় খুব শীঘ্রই তাকে সক্রিয় করে তুলল এবং তাকে তরল পানীয় মিশ্রিত বিস্কুট দিলাম। আমি দেখলাম যে ক্ষুধাটাই ছিল তার প্রধান অসুখ। কিছুক্ষণবাদে সে উঠে বসল এবং বলল যে সে এই গ্রামের বাসিন্দা নয়, সে একজন ডোম বা Pahariah এর সদস্য। তারা বেশ কিছুদিন ধরে খাদ্যহীন ছিল। তারা দেখল সমগ্র গ্রাম জনশূন্য। এবং যেহেতু সে তার অনুগামীদের দুর্বলতার কারণে অনুসরণ করতে পারেনি সেহেতু তার সঙ্গীরা তাকে ঐ কুড়েঘরের মধ্যে ফেলে গেছে। সে সেখানে সারাদিন ধরে পড়েছিল এবং কোন প্রাণীও তার কাছে আসেনি। রাত্রিতে কুকুরগুলি তাকে আক্রমণ করল কিন্তু সে সময় সে বেঁচে গেলেও পরের দিন সকালে কুকুরগুলি আবার তাকে আক্রমণ করল। যদি আমি না আসতাম তাহলে নিঃসন্দেহে কুকুরগুলি তাকে মেরে ফেলত। উঃ — দরিদ্র মানুষটি খুব-বেদনার সহিত উচ্চারণ করল। কিছুক্ষণ বাদেই আমার চাপরাশী বেশ কিছু গ্রামবাসী ও Charpoy নিয়ে এল এবং ঐ দরিদ্র মানুষটিকে আমার ক্যাম্পে নিয়ে গেল এবং আমার দাসদাসীরা তাকে সেবাযত্ন করতে শুরু করল।”

“বড়দিনের ছুটি অতিক্রান্ত হবার পর আমি যখন ক্যাম্পে ফিরে এলাম দেখলাম যে পরদেশীর অবস্থা তুলনামূলক ভাল। পরদেশী তাঁর আসল নাম দিল না। কেউ তাকে তার আসল পরিচয় জিজ্ঞেস করেনি। সে বলল সে আসলে একজন ‘পরদেশী’ (সাহিত্যের পরিভাষায় বিদেশাগত মানুষ, কিন্তু আক্ষরিক ভাষায় বলা চলে চরম দরিদ্র যিনি) সে ভ্রাম্যমাণ একটি গোত্র (Clan) এর সদস্য যা সারা ভারতে জড়িয়ে আছে এবং যারা বিভিন্ন নামে যেমন ডোম, ঘাসিয়া ভূহ ও কুরাভির প্রভৃতি নামে পরিচিত। ভ্রাম্যমাণ এই সমস্ত গোষ্ঠীগুলির কোন স্থায়ী জায়গা নেই। তাদের গাধা-গুলি গৃহস্থালীর জিনিসপত্র বহন করত যা তৎকালীন গ্রামগুলির সাধারণ বৈশিষ্ট্য হয়ে দাড়িয়েছিল। মহিলারা তাঁত বুনত, পুরুষরা ফাঁদ পেতে পাখি ধরত। তারা কুখ্যাত চোর ছিল এবং পাখি, বিড়াল তাদের সীমানার মধ্যে কখনো নিরাপদ ছিল না। সে আমাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল তার জীবনকে বাঁচাবার জন্য। কিন্তু আমি একান্তভাবেই বিশ্বাস করি যে পাখির মাংসের জন্য তার যে ভালবাসা তার সঙ্গে তুলনা করলে তার এই অভিনন্দন ছিল নিতান্তই সামান্য।”

“পরদেশী সম্পূর্ণরূপে সুস্থ হয়ে উঠতে বেশ কিছু মাস সময় লেগেছিল। তারপর সে আমার তাঁবুর সঙ্গে যেন সম্পৃক্ত হয়ে গিয়েছিল। সর্বদা তৎপরতার সঙ্গে কাজ করত। সারাদিন ধরে কথা বলত বা আমার দিকে দৃষ্টি দিত। সে পাখি বা ছোট জন্তুর ফাঁদ, জাল, বল্লম তৈরিতে বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিল। সে বিভিন্ন ডাকের অনুকরণ প্রিয় হয়ে উঠেছিল। এবং তিতির পক্ষী, ময়ূর বা ময়ূরীর ডাকের নকল করতে ভালবাসত। বেশ কিছু সময় সে অদৃশ্য হয়ে যেত এবং বেশ কিছুদিন পরে তাকে আবার ফিরে পাওয়া যেত — অসংখ্য তিতির পক্ষী, ময়ূর বা ময়ূরীকে সঙ্গে নিয়ে।”

"পরদেশী আমার সঙ্গে বেশ সুখেই দিন কাঠাতো। সেখানে সে শুধু তাঁর জাল বা ফাঁদ নিয়েই দিন কাটাতে শুরু করেছিল। কিন্তু আমি যখন তাকে বাধ্য করেছিলাম ঐ সমস্ত কিছু তার মালিকদেরকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তখন থেকে সে আর ঐ গ্রামীণ পাখিগুলিকে নিয়ে আসত না। কিন্তু আমি নিশ্চিত ছিলাম যে ঐ চুরি তখনও অব্যাহত ছিল কেননা তখনও পর্যাপ্ত আমার ক্যাম্পের কর্মচারীদের অনেকেই সেগুলি কিনত। যেহেতু এই সমস্ত কর্মচারীরা পাখিগুলি কিভাবে আসছে সে বিষয়ে সন্দিগ্ধ ছিল না। আমি তাকে একদিন জিজ্ঞেস করলাম কোন রকম শব্দ ছাড়াই সে কিভাবে পাখিগুলিকে ধরে। সে উত্তর দিয়েছিল যে সে পাখি গুলিকে খাবারের মাধ্যমে উত্তেজিত করে তোলে যা সারা রাত্রি ধরে মুখের মধ্যে রেখে দেয় এটা মুখের মধ্যে ঘোরাফেরা করে এবং পাখিদের মাতাল করে দেয়। পাখিরা এই খাবার খেয়ে মাতাল বা বোকা হয়ে যায় এবং সহজে ধরা পড়ে।" পরদেশীর মতো দক্ষতাসম্পন্ন মানুষের আদিবাসী সমাজে কোন অভাব নেই। বিপদসংকুল ও অজানা অরণ্যের অভ্যন্তরে স্থানীয় মানুষের অভিজ্ঞতালব্ধ এই দক্ষতাই মানুষকে রক্ষা করে। যেমন ধরা যাক সুন্দরবন অঞ্চল। এখানে পদে পদে বিপদ। কথায় বলে সুন্দরবনে ডাঙ্গায় বাঘ, জলে কুমীর। স্থানীয় মানুষজনকে জীবিকার প্রয়োজনে জঙ্গলে প্রবেশ করতেই হয়। তাঁরা ছোট ছোট দলে জঙ্গলের ভেতরে ঢোকে। দলের প্রবীণ সদস্যদের অরণ্যের খুটিনাটি জানা থাকে। ছোটখাটো অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যও অনেকসময় জীবনদায়ী হয়ে ওঠে। এদের জানা আছে যে বাঘ শিকারের উপর ঝাপিয়ে পড়ার আগে মাটিতে তিনবার লেজের বাড়ি দেয়। বনের ভিতরে কেউ কারো নাম ধরে ডাকে না। শব্দ করলে হিংস্র জন্তু আকৃষ্ট হতে পারে। এখানে তাই পাখির ডাকের মত জোরে 'কু' দেয়। সুন্দরবনে বানরের দল এক নির্ভয়ের নিশানা। যেখানে বানর আছে, বুঝতে হবে সেখানে বাঘ অন্তত নেই। গাছের উপর থেকে বানররাই বাঘকে সহজে দূর থেকে দেখতে পায়। দেখতে পেলেই বানরের দল কিচির মিচির শব্দ করে সেখান থেকে পালিয়ে যায়। বানরের এই ডাক স্থানীয় মানুষদের কাছে এবং বনের সকল জীবের কাছে এক বিপদের সংকেত। বনের ভেতরে তাই বানর দেখেই এগিয়ে চলতে হয়।

সুন্দরবনের মানুষের হরিণ-শিকার পদ্ধতিও অভিনব। বর্তমানে অবশ্য হরিণ শিকার আইনত দণ্ডনীয়। সুন্দরবনে হরিণ মারা যে কোন শিকারীর পক্ষেই খুব কঠিন কাজ। কিন্তু স্থানীয় চোরা-শিকারীদের পক্ষে তা বিশেষ কঠিন নয়। হরিণ এত সজাগ যে, একটু শব্দ হলেই পালিয়ে যায়। সুন্দরবনের অরণ্যে বানর ও হরিণের মধ্যে অত্যন্ত সখ্যতা। বানর গাছের উপর থেকে দূরে কোন বাঘ বা শিকারীকে দেখলেই আর্তনাদ করে হরিণকে সতর্ক করে দেয়। বানর যখন গাছের ফল খেয়ে বেড়ায়, তখন ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে হরিণকে পাতা খেতে দেয়। স্থানীয় হরিণ শিকারীরা এই ব্যাপার লক্ষ্য করে হরিণ শিকারের এক সহজ পদ্ধতি বার করেছে। এই পদ্ধতিকে 'গাছাল শিকার' বলে। কেওড়া গাছ সাধারণতঃ নদীর তীর ধরে হয়। শিকারী খুব ভোরে একটা গাছে উঠে বসে। সুন্দরবনের সব নদীই উত্তর থেকে দক্ষিণে বয়ে গেছে। কাজেই সূর্য পূব আকাশে বা পশ্চিম আকাশে থাকলে নদীর কুলের এই সব

কেওড়া গাছের তলায় রোদ ভালভাবেই পড়ে। হরিণের পাল তখন গাছের তলায় আসে সেই রোদ আর কেওড়া পাতার লোভে। সুযোগ বুঝে শিকারীরা গাছে বসে বানরের মত ডাকে বা বানরের মত কিচিরমিচির শব্দে ঝগড়ার নকল করে, আর সেই ডাল ভেঙ্গে ভেঙ্গে মাটিতে ফেলতে থাকে। হরিণের তখন মতিভ্রম ঘটে। হরিণ উপর দিকে দৃষ্টি দিতে অক্ষম। তারা দল বেঁধে অতি নিশ্চিন্ত মনে এই গাছের তলায় পাতা খেতে আসে। তখন শিকারী সুযোগ বুঝে পুরুষ হরিণ শিকার করে। এই শিকার-পদ্ধতি সম্পূর্ণ স্থানীয় মানুষের দেশীয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলের আদিবাসীদের মধ্যে প্রকৃতি এবং অরণ্য থেকে খাদ্য সংগ্রহ করার অথবা প্রাকৃতিক বিপদ ও বিপর্যয় থেকে নিজেদের রক্ষা করার অজস্র পদ্ধতি আছে। বিভিন্ন অসুখ বিসুখ নিরাময় ও চিকিৎসার ক্ষেত্রেও বিশেষ গাছ গাছালির ব্যবহারও এই স্থানীয় ও দেশীয় জ্ঞানের কথাই স্মরণ করিয়ে দেয়।

১০.৪.৮.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

1. Mahesh Rangarajan : People, Park and Wildlife
2. Richard Grove (eds.) : Nature and the Orient
3. রঞ্জন চক্রবর্তী ঃ সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ
4. Ranjan Chakrobarti, Situating Environmental History

——————

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

INDIGENOUS KNOWLEDGE SYSTEMS, NATURE AND SOCIETIES AND ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HISTORY

একক - ৯

দেশীয় তথ্য ও জ্ঞান, প্রকৃতি, সমাজ ও পরিবেশ

Indigenous Knowledge Systems, Nature and Societies

বিন্যাসক্রম ঃ

১০.৪.৯.০ ঃ পরিবেশ চিন্তার ইতিহাস, সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান

১০.৪.৯.১ ঃ সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান

১০.৪.৯.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

১০.৪.৯.৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১০.৪.৯.০ ঃ পরিবেশ চিন্তার ইতিহাস, সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান

মানব সমাজে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সর্বত্রই বিরাজিত ছিল। মানব সমাজের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয়। অতীতে মানব সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে একটি কেন্দ্র হল প্রাকৃতিক জগতের স্বাভাবিক ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা। যেহেতু বিশ্বের সর্বত্র মানব সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে সেহেতু প্রাকৃতিক জগতের বৈধ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নটি গুরুত্ব পাচ্ছে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে এই অমিমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র উপলব্ধ হচ্ছে। ক্ষমতার ভাষা দিয়ে এদিকে সম্ভবত ব্যাখা করা চলে। প্রাকৃতির জগতের সঙ্গে মানব সমাজের সংঘাতকেও এই ক্ষমতার ভাষা দিয়ে, ব্যাখা করা সম্ভব। পরিবেশ হল ক্ষমতা প্রকাশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতীয়তাবাদ—সমাজ ক্ষমতার এই প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়গুলির সঙ্গে প্রকৃতিকে ও সমপর্যায়ভুক্ত করা চলে। ক্ষমতার সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর, প্রাকৃতিক জগতের অবিরাম অপব্যবহার, প্রকৃতিকে শোষণ করার জন্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় পুরাতন এই বিতর্ককে এমন জটিল করে তুলেছে বা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। সমগ্র মানব সমাজের কাছে এটিই কেন্দ্রীয় ও বিশ্বজনীন প্রশ্ন হয়ে দাড়িয়েছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানের বিষয়টিও দীর্ঘতর হচ্ছে লেখক, দাশনিক, ঐতিহাসিক, আইনজীবী, প্রশাসক ও চিন্তাবিদরা এই অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছেন। গত দুদশক ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিষয়টি একটি নতুন রূপ পেয়েছে এবং জ্ঞানের জগতে একটি নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে যাকে পরিবেশের ইতিহাস বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতে বনকে আধ্যাত্মিক জগতের অঙ্গ বলে মনে করা হত এবং সন্ন্যাসীদের আশ্রমে বন ও বন্যপ্রাণীকে রক্ষণাবেক্ষণের ধারণাও গড়ে উঠেছিল। বন নির্ভর এই আশ্রমকেই অরণ্য সংস্কৃতি বলা চলে। বনের বাস্তুতন্ত্রের উপযোগিতা এবং তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্যই গাছ এবং বণ্যপ্রাণীর প্রতি একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় প্রদর্শিত হত। রামায়ণের মত প্রাচীন মহাকাব্য থেকে এই বোধশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অযোধ্যা সম্রাট রাম যখন গাঙ্গেয় উপত্যাকায় দক্ষিণ দিকের বনে নির্বাসিতের জীবন- যাপন করতে যাত্রা করেছিলেন তাঁর মা নিরাপত্তার বিষয়ে ভয় পেয়ে ঘোষণা করেছিলেন বনের হাতি, সিংহ, বাঘ বা বন্য মহিষ তোমাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাম তার পত্নীকে সুরক্ষিত করার জন্য গোপন স্থান নির্বাচিত করেছিলেন। বন একটি নির্দিষ্ট জমিতে গড়ে উঠেছিল যেখানে আমোদও কষ্টক্লিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এটি একইসঙ্গে সুন্দর জায়গাও ছিল। সুতরাং বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং সুরম্য স্থান উপভোগ করা—বনের দ্বিবিধ চরিত্র মহাকাব্যেও স্থান পেয়েছে।

মৌর্যদের সময় থেকে হাতিকে রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছিল। অর্থশাস্ত্র বনের হাতিকে রক্ষার জন্য নিয়মের কথা তুলে ধরেছে। হাতির বন ছাড়াও সেখানে এমন কিছু বন ছিল যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বনের কাঠ, বাঘ এবং সিংহকে রক্ষা করা। মধ্যযুগেও বন ও বন্যপ্রানীকে রক্ষা করার

জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বন ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন।

শিল্পবিপ্লবের পর সংরক্ষণবাদীদের আচরণ এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়েছে। বনের হ্রাস এবং স্থলভাগের পরিবর্তন প্রাকৃতিক জগতে রোমান্টিক ভাবধারাকে গড়ে তোলে। বিভিন্ন রোমান্টিক রচনায় শিল্প বিপ্লবের সমালোচনা থাকলেও প্রকৃতির অবক্ষয় এর গুণকীর্তন করা হয়েছে। এটি 'back-to the land' আন্দোলনকে উৎসাহ দিয়েছিল। উইলিয়াম ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ জন রাস্কিন, এবং উইলিয়াম ডারিস, এর আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এবং ইউরোপে পরিবেশ ভিত্তিক সমাজের গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় বনের অতিদ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ফলে এক নতুন বন্য ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যা নৈতিকতা, বিজ্ঞান এবং রুচি সম্পন্ন বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস আমেরিকায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এখানে প্রথম আত্মসচেতনতা সম্পন্ন পরিবেশের ইতিহাস গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। আমেরিকায় পরিবেশের ইতিহাস একটি আদর্শ ও সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠেছিল এবং এটি ঐতিহ্য থেকে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। জর্জ পারকিন মার্শ এবং ফ্রেডারিক জ্যাকসন টার্নার প্রমুখ গবেষকদের রচনার মধ্যে এই ঐতিহ্যগত ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমেরিকার দৃশ্যের অভ্যন্তর থেকেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশের ইতিহাসের বীজ অঙ্কুরিত, হয়েছিল এবং প্রধান কারণ হল পরিবেশের ইতিহাস সংরক্ষণের পথ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যা আমেরিকাতেই সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার পরিবেশের ইতিহাস চর্চায় উৎসাহের একান্ত অভাব এবং বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে আমেরিকার ঐতিহাসিকরা বর্তমানে তাদের সংকীর্ণ আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছেন।

1970 এর দশকের আগে পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বা মানবসভ্যতার ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে চর্চার আগ্রহ তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। 1970 এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে ঐতিহাসিকরা অর্থনৈতিক সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার সময়ে পরোক্ষভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সংকীর্ণ বা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছিলেন। ফলে কৃষক আন্দোলনের ইতিহাস, নিম্নবর্গের ইতিহাস, কৃষির ইতিহাস, আদিবাসীদের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে পরিবেশের ইতিহাস বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। তবে এটা সত্যি যে কয়েকটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া এই ধরনের ইতিহাস প্রধানত কৃষিযোগ্য জমির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বভাবতই এই ধারার ঐতিহাসিকরা অকৃষিযোগ্য জমি, জলাজমি, পার্বত্য এলাকা নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেননি। স্যার যদুনাথ সরকার যিনি মুঘল যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন, তিনি দক্ষিণ ভারতে মুঘলদের সামরিক অভিযানে পরিবেশের ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল তা নিয়ে আলোচনা করেছেন। কিন্তু এখানে পরিবেশের অবক্ষয় সম্পর্কে খুব কম আলোচনা করা হয়েছে। 1970 সালের পূর্বে ঐতিহাসিক জগতে ঔষধ ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইতিহাস

চর্চা করতে পরিবেশের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। অপরাধের ইতিহাস, বনের আইন সংক্রান্ত সমস্যা, বিভিন্ন প্রকার গ্রামীণ বিচার সংক্রান্ত আন্দোলন এবং গণ সংস্কৃতি সম্পর্কে ক্ষুদ্র আলোচনায় পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বলা চলে পরিবেশের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায় (১) পরিবেশ সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস, (২) সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিকতা নির্ভর পরিবেশের ইতিহাস, (৩) শক্তি প্রয়োগের মাধ্যম হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস চর্চা, (৪) পরিবেশের ইতিহাস যা উল্লেখিত তিনটির সমন্বয়ে গঠিত। পরিবেশ সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস প্রধানত পরিবেশের জৈব ও ভৌত পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন মানব সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর বা মানুষের কার্যকলাপ কতখানি পরিবেশের ভৌত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করে। সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিকতা সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস খুবই উৎকৃষ্ট এবং এখানে প্রকৃতিকে বিভিন্ন ধারণা, কলা এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এই তুলে ধরার প্রক্রিয়ায় যে পরিবর্তন এবং এর ফলে উদ্ভুত পরিবেশের ওপর তার আলোকপাত করে। তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত পরিবেশের ইতিহাস পরিবেশকে ক্ষমতার ব্যবহারের একটি মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরে। এটি প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণা, আইন এবং রাষ্ট্রনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে রাষ্ট্রশক্তি কিভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে এবং সেক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থবাহী গোষ্ঠী কিভাবে সংগ্রাম করে ক্রমপরম্পরায় আলোচনা করা হয়। শেষ পর্যায় ভুক্ত পরিবেশের ইতিহাস উপরে উল্লেখিত একটি বা একাধিক বিষয়ে আলোচনা করে। এই ইতিহাস বহুবিধ চরিত্রবিশিষ্ট এবং চিত্তাকর্ষক।

আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক গবেষণার পরিবর্তিত ধারা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সচেতন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইতিহাস চর্চার এই পরিবর্তিত ধারার ফলে পরিবেশের ইতিহাস যথেষ্টভাবে উপকৃত হয়েছে। ইতিহাসের অভ্যন্তরেই একটি নতুন ধারার উদ্ভব বিষয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং রক্ষণশীল ঐতিহাসিকদের এই নবধারার মধ্যে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করেছে।

পরিবেশের ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি তাকে একটি স্বতন্ত্রধারায় পরিচিতি দান করেছে। বর্তমানে এই বিষয়ের গুরুত্বকে খাটো করে দেখানোর প্রবণতা দেখা গিয়েছে এবং এটাকে পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ক পড়াশোনার অভিন্ন অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়েছে। তবে পরিবেশের ঐতিহাসিকদের নিজেদের পথ হিসাবে পরিবেশকে আলোচনার পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিতে পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ক আলোচনায় ঐতিহাসিকরা গুরুত্বগুলি অবদান রাখতে পারবে। ইতিহাস এমন একটি ধারা যেখানে নিঁখুত কোন তত্ত্ব নেই। ঐতিহাসিকরা তথ্য ছাড়া সহায়হীন এবং ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্য অর্থহীন। অনেক সমাজবিজ্ঞানী মনে করেন যে, এই ধারার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। এবং তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আধুনিকোত্তোর ইতিহাস এই ধারার মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। ঐতিহাসিকদের তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এবং তাদের তত্ত্ব পুনর্গঠনের তুলনায় তথ্যগুলির ভাষ্য রচনা করতে হয়। ইতিহাস একটি পৃথক ধারা হিসাবে উত্তর আধুনিকতার প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং একটি স্বাধীন ধারা হিসাবে একে রক্ষা করাও ঐতিহাসিকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

১০.৪.৯.২ ঃ সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান

সরকারী সংরক্ষণ নীতির ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে, ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বস্তুতন্ত্র ও বন্যপ্রাণী সম্পর্কিত যে জ্ঞান ছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। এই সমস্ত জ্ঞান এবং তাদের ব্যবহারিক রীতিনীতি ও ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্পদ ও সংরক্ষণকে তেমনভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি। একজন বন অধিকর্তার মতানুসারে এই ধরনের জ্ঞানগুলিকে উপেক্ষা করা হয় — এটি ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রেই অধিকারিকরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বন, জন্তু এবং পরিবেশগত উপাদানের বিষয়ে কথা বলতে বিশেষ আগ্রহী নয়। জৈব উপাদান সম্পর্কে ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে বুঝতে হবে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে এবং তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদ জগতের কি সম্পর্ক রয়েছে তার উপর নির্ভর করে। বিভিন্ন সরকারী পরিবেশ দপ্তরের নীতির মধ্যে এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন উপজাতির সদস্যকে ডাকা হয় না। বর্তমান সময়েও বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে চলেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলি সমাজের ধ্বংসসাধন এবং জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংসসাধনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে সরকার যে আয় করে তার সিংহভাগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। উদাহরণ স্বরূপ সরকার ট্যুরিজম থেকে যে রাজস্ব আদায় করে তার বেশীরভাগ অংশই ভারতীয় শহরগুলির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ নীতির প্রতি আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিভঙ্গি অনেক ক্ষেত্রেই বিদ্বেষপূর্ণ। দেশে বনদপ্তর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে সংঘঠিত বহু সংঘর্ষের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে 222 টি সংরক্ষিত এলাকার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এরূপ 47 টি সংঘর্ষের উদাহরণ পাওয়া গেছে। 1990 এর দশকে এই পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে উঠেছিল। এইসব সংঘর্ষের মধ্যে 1981 সালে ভারতপুর অভয়ারণ্যের কথা বলা চলে যেখানে পুলিশের গুলিতে নয়জনের মৃত্যু হয়। অতি সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত অর্থে পুনর্বাসন কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে পুলিশ নাগরহোল বাঘ সংরক্ষণকেন্দ্রে উপজাতিগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে উপজাতি জনসংখ্যার হ্রাস ঘটানো।

রাষ্ট্রের সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে হিংসাত্মক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বন্য কাঠ এবং বিভিন্ন জন্তুর শরীর চোরাকারবারী করা, বন্য প্রাণীদের বিষ প্রয়োগ, বনে অগ্নিসংযোগ এই হিংসাত্মক কার্যকলাপের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বাঘ মানুষের এই সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ হল সাম্প্রতিককালে অন্ধ্রপ্রদেশের ঘটনাটি যেখানে 20 টির মধ্যে 15 টি বাঘকে বিষ প্রদান করা হয়েছিল। একইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিমালয়ের মধ্যবর্তী অঞ্চলে মানুষ বনদপ্তরকে সাহায্য করেছিল আগুন নেভাতে সেখানে মানুষ বর্তমানে বনদপ্তরের সঙ্গেই অসহযোগিতা করেছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সঙ্গে এই ধরনের সম্প্রদায়গুলি বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। এই বিচ্ছিন্নতার অপর একটি নিদর্শন হল গুজরাটের শুলপানেশ্বর অভয়ারণ্যের কার্যকলাপ — যেখানে রাজ্য সরকার সেখানকার

উপজাতিগুলিকে নিষিদ্ধ করলেও একটি পেপার মিলকে বাঁশ সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করেছে। সাম্প্রতিককালে গজদন্ত ও চন্দনকাঠ শিকারী বীরাপ্পন (Veerappan) দীর্ঘসময় ধরে আত্মগোপন করে থাকতে সমর্থ হয়েছিল এবং তাকে একাজে স্থানীয়রা অনেক বেশী সাহায্য করেছিল একথা বলা হয়ে থাকে। এই সাহায্য হয়তো ছিল জবরদস্তিমূলক। কিন্তু একথাও বলা চলে স্থানীয়রা তাঁর কাছে থেকে রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল। এর ফলে সরকারী পরিবেশ নীতি স্থানীয় মানুষের দেশীয় ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ সংরক্ষণের জন্য দেশীয় জ্ঞানের (Indigenous Knowledge) কোন বিকল্প নেই।

বীরাপ্পনের উদাহরণ প্রমাণ করে যে, পশু শিকারের মত ঘটনাগুলি স্থানীয়দের সহযোগিতার মাধ্যমেই ঘটে। স্বভাবতই স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমেই এগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। রাষ্ট্র ও সম্পদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে চোরা শিকারীরা আঞ্চলিক সমর্থন ও স্থানীয় জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে।

১০.৪.৯.৩ ঃ সহায়ক গ্রন্থ (Reference Books)

1. Mahesh Rangarajan : People, Park and Wildlife
2. Richard Grove (eds.) : Nature and the Orient
3. রঞ্জন চক্রবর্তী ঃ সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি ও পরিবেশ
4. Ranjan Chakrobarti, Situating Environmental History

১০.৪.৯.৪ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। দেশীয় জ্ঞান (Indigenous Knowledge) বলতে কি বোঝ ? পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব কি?

২। আদিবাসী সমাজের পরিবেশ চেতনা কিভাবে আধুনিক পরিবেশ চিন্তাকে সমৃদ্ধ করতে পারে?

৩। দেশীয় জ্ঞানের গুরুত্ব সম্পর্কে উদাহরণসহ আলোচনা কর।

৪। সুন্দরবনের মানুষের স্থানীয় জ্ঞান কিভাবে বিপদসংকুল অরণ্যে তাঁদের আত্মরক্ষার কাজে সাহায্য করে?

৫। এই দেশীয় জ্ঞান সম্পর্কে সরকারী পরিবেশনীতি এবং অরণ্য সংরক্ষণনীতির মনোভাব কি?

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IN HISTORY

একক - ১০

Management of Environment in History

(ইতিহাসে পরিবেশ পরিচালনা)

বিন্যাসক্রম :

১০.৪.১০.০ : উদ্দেশ্য

১০.৪.১০.১ : অরণ্য পরিচালনা

১০.৪.১০.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১০.৪.১০.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.৪.১০.০ : উদ্দেশ্য

এককটি পড়ে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি জানা যাবে ---

১। পরিবেশ পরিচালনা বলতে কি বোঝায়।

২। অরণ্য-পরিচালনা কাকে বলে ।

৩। অরণ্য পরিচালনার মূল লক্ষ্য কি ।

৪। অরণ্য পরিচালনায় স্থানীয় মানুষদের ভূমিকা কি।

৫। অরণ্য পরিচালনায় সরকারের ভূমিকা কি।

৬। অরণ্য পরিচালনায় বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ও বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা কিভাবে কাজ লাগানো যায়।

৭। কঠোর বিকল্প উদ্ভাবনের মাধ্যমে কিভাবে বন সংরক্ষণ করা যায়।

১০.৪.১০.১ : অরণ্য পরিচালনা

পরিবেশ পরিচালনা বা কথাটির বা Environment Management কথাটির প্রকৃত অর্থ হল প্রাকৃতিক সম্পদের পূর্ণ ব্যবহার ও সংক্ষরণ। এর প্রধান উদ্দেশ্য হল প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত সুবিধাগুলিকে যতদূর বেশী সম্ভব ব্যবহার করা। এর আর একটি উদ্দেশ্য হল প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার ও সংরক্ষণ করার কাজে খরচের পরিমাণ যতদূর সম্ভব হ্রাস করা। বিশ্বপরিবেশকে রক্ষা করা পরিবেশ পরিচালনার একটি প্রধান লক্ষ্য।

অরণ্য পরিচালনার লক্ষ্য :

ভারত সরকারের পরিবেশ নীতির একটি প্রধান দিক হল অরণ্য পরিচালনা। অরণ্যের সংরক্ষণ, উপযুক্ত ব্যবহার ও প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার জন্য অরণ্য পরিচালনা একান্তই জরুরী। ভারতের খাদ্য ও কৃষিমন্ত্রক ১৯৫২ সালে একটি অরণ্য নীতি ঘোষণা করেছিলেন। তবুও দীর্ঘদিন ধরে এদেশের বন আরও নিঃশেষ হতে চলেছে। এর প্রধান কারণগুলি হল :

(১) বনভূমিকে অন্যান্য কাজে ব্যবহার করা এবং পরিবেশ-সতর্কতা গ্রহণ না করা।

(২) জ্বালানি, পশুখাদ্য ও কাঠের ক্রমবর্ধমান চাহিদা।

(৩) বনাঞ্চলকে রাজস্ব আদায়ের উৎসরূপে দেখাবার প্রবণতা।

এই পরিস্থিতিতে বনসংরক্ষণের জন্য উপযুক্ত অরণ্য পরিচালন ব্যবস্থা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। অরণ্য পরিচালনার মূল্য লক্ষ্যগুলি হল :

(১) বর্তমান বন ও বনভূমিকে রক্ষা করা এবং এদের উৎপাদিত শক্তিকে উন্নত করা।

(২) পার্বত্য এলাকায় ঢালু জমিতে, নদী, হ্রদ ও জলাধার সংলগ্ন অঞ্চলে এবং প্রায় শুষ্ক অঞ্চলে বন ও বৃক্ষ আচ্ছাদন দ্রুত বৃদ্ধি করা।

(৩) বিচিত্র জীব জগতের সম্পূর্ণ সংরক্ষণের জন্য জাতীয় পার্ক, অভয়ারণ্য এবং সংরক্ষিত এলাকার যথার্থ রক্ষণাবেক্ষণ ও বিস্তৃতির প্রয়োজন।

(৪) বনসংলগ্ন এলাকায় গোচারণ, পশুচারণ ভূমি এবং জ্বালানি ব্যবস্থা রাখতে হবে। ফলে বনভূমি নিঃশেষিত হবার হাত থেকে রক্ষা পাবে।

(৫) দেশের সমগ্র ভূমি এলাকায় অন্ততঃ এক তৃতীয়াংশ বনভূমি অন্তর্গত করাই জাতীয় উদ্দেশ্য।

(৬) রাস্তা, রেললাইন, নদী-নালা, খাল এবং অব্যবহার্য জমি --- যেগুলি রাজ্য অথবা যৌথ সংস্থার আওতায় অথবা ব্যক্তি মালিকানার অধীনস্থ, সে সব জায়গায় বৃক্ষরোপন করা খুবই প্রয়োজন। নগর ও শিল্পাঞ্চলের শুকনো জমিতে সবুজ বন্ধনী তৈরী করতে হবে।

এই সমস্ত কর্মসূচীর মাধ্যমে ভূমিক্ষয় ও মরু সম্প্রসারণ রোধ করা যাবে এবং স্থানীয় জলবায়ুর উন্নতি ঘটানো যাবে।

অরণ্য পরিচালনার প্রধান বৈশিষ্ট্য :

(১) যে সমস্ত প্রকল্পের ফলে পাহাড়ে ঢাল, নদীর খাদ, হ্রদ ও জলাশয় সংলগ্ন বনভূমি ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হয় সে সমস্ত প্রকল্প কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন। সরকারের অনুমোদিত প্রকল্প ছাড়া কোন বনাঞ্চলে কোন প্রকল্প হওয়া উচিত নয়।

(২) বনাঞ্চল এবং বনজাত দ্রব্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা দরকার। এজন্য কারিগরী ও বিজ্ঞানভিত্তিক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা যেতে পারে।

(৩) কোনভাবেই যেন সমৃদ্ধ প্রাকৃতিক অরণ্য ধ্বংস করা না হয় সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখা দরকার। কোন বহিরাগত প্রজাতির অনুপ্রবেশ ঘটানোর ক্ষেত্রে সতর্কতা গ্রহণ করতে হবে।

(৪) বনাঞ্চলের প্রচলিত সুযোগ-সুবিধাভোগীদের বনের উন্নতি সাধনে ও রক্ষার্থে যত্নবান হতে হবে।

(৫) অরণ্যের অধিকার ও সুযোগ যেন স্থানীয় মানুষ বা উপজাতি সম্প্রদায়ের মানুষেরা পায়।

(৬) রেল লাইনের স্লিপার, ফার্ণিচার, কাগজ, নির্মাণ শিল্প ইত্যাদিতে কাঠের ব্যবহার কমানো দরকার। এর বিকল্প সন্ধান করা প্রয়োজন।

(৭) জ্বালানী কাঠের পরিবর্তে বায়োগ্যাস, সৌরশক্তি, এল.পি.জি প্রভৃতি ব্যবহার করতে হবে।

(৮) বে-আইনীভাবে গাছকাটা চলবে না। বনের সঙ্গে সম্পর্কহীন মানুষেদর প্রয়োজনে বনভূমির ব্যবহার করতে দেওয়া যাবে না।

(৯) বন্য প্রাণীর সংরক্ষণে বিশেষ যত্ন নিতে হবে।

(১০) বনসংলগ্ন উপজাতি মানুষদের বনের রক্ষণাবেক্ষণ, বন পুনরুদ্ধার এবং উন্নয়নের কাজে যুক্ত করা দরকার।

(১১) বদলী চাষ-এর ক্ষেত্রে চাষীদের এ ব্যাপারে নিরুৎসাহ করতে হবে এবং তাদের বিকল্প আয়ের ব্যবস্থা করতে হবে।

(১২) বনভূমি জবরদখল ও বনভূমিতে দাবানল বন্ধ করতে হবে। পশুচারণ নিয়ন্ত্রিত করতে হবে।

(১৩) বনভিত্তিক শিল্প গড়ে তুলতে হবে। সেখানে স্থানীয় মানুষদের চাকরীর সুযোগ দিতে হবে।

(১৪) বনবিদ্যা শিক্ষা ও গবেষণার উন্নতি ঘটাতে হবে।

তবে সুষ্ঠুভাবে অরণ্য পরিচালনার জন্য বন সংক্রান্ত পর্যাপ্ত তথ্য সংগ্রহ করা সর্বাগ্রে প্রয়োজন। তথ্য সংগ্রহ ও সংকলনের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে।

১০.৪.১০.২ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

(১) রতনলাল ব্রহ্মচারী -- বন ও বন্য প্রাণী।

(২) শৈল চক্রবর্তী -- অরণ্যের দিন ফুরালো।

(৩) সলিল লাহিড়ী -- পরিবেশ ভাবনা।

(৪) R. Guha — The Unquiet Woods : Ecological Change and Peasant Resistance in The Indian Himalayas.

(৫) B. P. Pal — Environmental Conservation and Development.

১০.৪.১০.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। পরিবেশ পরিচালনা বলতে কি বোঝ?

২। অরণ্য পরিচালনার মূল লক্ষ্য কি কি?

৩। অরণ্য পরিচালনার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা কর।

——————

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

পরিবেশ সমস্যা, পরিবেশের ইতিহাস ও পরিবেশ আন্দোলন : আধুনিক ভারত

COLONIAL INTERVENTION AND ENVIRONMENT AND TRIBALIZATION OF COMMUNITIES

একক - ১১

Colonial Intervention and Environment

বিন্যাসক্রম ঃ

১০.৫.১১.০ ঃ উদ্দেশ্য

১০.৫.১১.১ ঃ ভূমিকা

১০.৫.১১.২ ঃ আধুনিক পরিবেশ চেতনা ও পরিবেশ বিতর্ক

১০.৫.১১.৩ ঃ ক্লাব অব রোমের রিপোর্ট (The Club of Rome Report)

১০.৫.১১.৪ ঃ স্থিতিশীল উন্নয়ন

১০.৫.১১.৫ ঃ পরিবেশ চিন্তার ইতিহাস

১০.৫.১১.৬ ঃ ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি

১০.৫.১১.৭ ঃ দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতের পরিবেশের ইতিহাসের চালচিত্র

১০.৫.১১.৮ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১০.৫.১১.০ ঃ উদ্দেশ্য

বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য ভারতবর্ষ তথা দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের সমস্যা ও পরিবেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দিকগুলি তুলে ধরা। প্রথমেই উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পরিবেশের বিষয়টি একটি আন্তর্জাতিক সমস্যা এবং এটিকে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটেই বিচার করা প্রয়োজন। এই অধ্যায়ের উদ্দেশ্য আন্তর্জাতিক পরিবেশ বিতর্ক, স্থিতিশীল উন্নয়নের ধারণা ও সমস্যা, পরিবেশ চিন্তার ইতিহাস, ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি ও ভারতীয় সমাজের উপর তার প্রভাব, পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার ক্ষেত্রে দেশীয় জ্ঞানের (Indigenous knowldge) গুরুত্ব, পরিবেশ সংরক্ষণ ও পরিবেশ-সমস্যা সমাধানে আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির (NGO) ভূমিকা ও বিভিন্ন অঞ্চলিক পরিবেশ আন্দোলনগুলির উপর আলোকপাত করা।

১০.৫.১১.১ ঃ ভূমিকা

বিশ্বায়ন এবং আধুনিক প্রযুক্তির বিকাশ একুশ শতকের পৃথিবীকে এক নতুন সমস্যার সামনে হাজির করেছে। প্রকৃতির বৈধ ব্যবহার কি এবং কিভাবে তা স্থির হবে বর্তমান প্রজন্মকেই তা ঠিক করতে হবে। এই প্রশ্নটি এখন মানব সমাজের অস্তিত্বের সাথে সংযুক্ত হয়ে গেছে। কারণ বিশ্বের ক্রমবর্ধমান তাপমাত্রা স্মরণ করিয়ে দিয়েছে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় না রাখলে পৃথিবীর অস্তিত্ব বিপন্ন হতে পারে। প্রশ্নটির গুরুত্ব এমনই যে শুধু বিজ্ঞানীরা নন, এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কাজে নিযুক্ত হয়েছেন অর্থনীতিবিদ, ঐতিহাসিক ও অন্যান্য সমাজ বিজ্ঞানীরাও। সৃষ্টি হয়েছে ইতিহাসের এক নতুন শাখা ঃ পরিবেশের ইতিহাস। বর্তমান অধ্যায়টি ভারতের পরিবেশের ইতিহাসের বিভিন্ন দিক নিয়ে।

১০.৫.১১.২ ঃ আধুনিক পরিবেশ চেতনা ও পরিবেশ বিতর্ক

অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাষ্পচালিত যন্ত্রের আবিষ্কার সমগ্র বিশ্বে শিল্প বিপ্লবকে সূচিত করেছিল। তখন থেকেই মানব সমাজ ক্লান্তিহীনভাবে পার্থিব উন্নতির লক্ষ্যে প্রকৃতিকে শোষণ করে চলেছে। এইভাবে বিশ্বের বেশ কিছু দেশ শিল্পোন্নত হয়ে উঠেছিল।

যুদ্ধোত্তর পর্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগত ক্ষেত্রে মানুষের জ্ঞানের পরিধি বহুদূর সম্প্রসারিত হয়েছে। এই সময়কে দ্বিতীয় শিল্প বিপ্লবের সূচনাকাল বলা চলে যা প্রথম শিল্প বিপ্লবের তুলনায় নতুন শক্তি ও উদ্যম নিয়ে আবির্ভূত হয়েছিল। উপনিবেশিক শক্তির নিয়ন্ত্রণাধীন দেশগুলি এই পর্বে মুক্তি লাভ করেছিল। এই সমস্ত দেশগুলি এবং অপরাপর শিল্পে অনুন্নত দেশগুলি যাদেরকে উন্নয়নশীল দেশ

(developing countries) বলা চলে তারা তাদের উন্নয়নমূলক কাজে নিজেদের নিয়োজিত করেছিল। একইসঙ্গে ঐ দেশগুলিতে জনসংখ্যা তীব্র হারে বৃদ্ধি পেয়েছিল। উন্নত বিশ্বের দেশগুলি নতুন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সহায়তাকে কাজে লাগিয়ে দেশবাসীর পার্থিব সুখ স্বাচ্ছন্দ্য ও বিলাসিতাকে বৃদ্ধি করেছিল। এইভাবে উন্নয়নশীল ও উন্নত দেশগুলি তাদের কার্যকলাপের মাধ্যমে বিশ্বের সীমিত সম্পদের উপর চাপ সৃষ্টি করেছিল। অন্যদিকে, প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ ও সৃষ্টি হয়েছিল যা দূষণের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। স্বভাবতই বিংশ শতকের ষাটের ও সত্তরের দশকে প্রকৃতির অবক্ষয়ের বিভিন্ন বিষয়গুলি যেমন - বৃক্ষচ্ছেদন, মৃত্তিকা ক্ষয়, পরিবেশের ভারসাম্যহীনতা, বায়ু ও জল দূষণ প্রভৃতি উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে যা মানব জাতির ভবিষ্যৎ সম্পর্কে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিন্তার আবির্ভাব ঘটিয়েছে।

১০.৫.১১.৩ ঃ ক্লাব অব রোমের রিপোর্ট (The Club of Rome Report)

পরিবেশ বিষয়ে বর্তমানে যে সচেতনতা তা শুরু হয়েছিল ষাটের দশকে এবং তা সত্তরের দশকে নতুন মাত্রা পেয়েছিল। ম্যালথাসই (Malthus) সর্বপ্রথম সর্বপ্রথম পরিবেশের ভারসাম্যতা বৃদ্ধির সীমাবদ্ধতাকে সকলের দৃষ্টিগোচর করেন। তবে, যাই হোক না কেন তাঁর উক্তি যা ম্যালথুসিয়ান বিপর্যয় (Malthusian disaster) নামে পরিচিত তা ব্রিটেন ও অপরাপর শিল্পোন্নত দেশগুলিতে দেখা যায়নি। সুতরাং তাঁর এই মত সার্বজনীন ভাবে গৃহীত হয়নি। কিন্তু Club of Rome নামক একটি গোষ্ঠী মানবজাতির ভবিষ্যৎ নিয়ে 1968 সাল থেকে আলোচনা শুরু করে এবং 1972 সালে তারা এ বিষয়ে একটি বিস্তরিত প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এই রিপোর্টটি যে বইটির মাধ্যমে প্রকাশ পায় তার শিরোনাম হল The limits of Growth যদিও এই মডেলটি পুরোপুরি সঠিক ছিল না এবং অনেক ক্ষেত্রে অতিশয়োক্তি লক্ষ্য করা যায় তথাপি ও এটি তাৎপর্যপূর্ণ। এটাই ছিল মানব সভ্যতার ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কম্পিউটার নির্ভর এবং বিজ্ঞান শাস্ত্র সম্মত প্রথম পদক্ষেপ।

তবে যাই হোক না কেন এই রিপোর্টের মূল কেন্দ্রীয় বিষয় ছিল এই যে, এই পৃথিবীর নিদিষ্ট পরিমাণে গ্রহণ সক্ষমতা রয়েছে। বর্তমানের এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি, শিল্পায়ন, দূষণ, খাদ্য উৎপাদন, সম্পদ ক্ষয় যদি একই হারে চলতে থাকে তাহলে আগামী একশো বছরের মধ্যে পৃথিবী তার বৃদ্ধির প্রান্ত সীমায় পৌঁছাবে। আর এর সম্ভাব্য ফল হবে বিশ্বের জনসংখ্যা এবং শিল্প সম্ভাবনার আকস্মিক ও নিয়ন্ত্রণহীন পতন।

এই দ্রুতহারে বৃদ্ধির প্রবণতা আকস্মিক পতনের সম্ভাবনা বহন করে। এর পরিবর্তে এমন একটি পরিবেশগত ও অর্থনৈতিক সুস্থিতির প্রয়োজন যা অদূর ভবিষ্যতে উন্নতির ধারাকে বজায় রাখতে পারবে। বিশ্বব্যাপী একটি ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত প্রয়োজন যাতে করে প্রত্যেকটি মানুষ তার প্রাথমিক চাহিদা মেটাতে পারে এবং প্রতিটি মানুষ তার স্বতন্ত্র মানব সত্ত্বাকে উপলব্ধি করতে পারে। এটি হল স্থিতিশীল বৃদ্ধির (Sustainable growth) পথ। ক্লাব অব রোমের রিপোর্ট অনুসারে সমগ্র

বিশ্বের মানুষ এই নিয়ন্ত্রণহীন বৃদ্ধির পরিবর্তে একটি স্থিতিশীল বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে সচেষ্ট হবে। পৃথিবী মানুষের প্রয়োজন মেটাতে পারে কিন্তু লোভের শিকার হতে পারে না (mother earth can meet every body’s need but not greed) মহাত্মা গান্ধীর এই বক্তব্যের সঙ্গে তাদের বক্তব্যের এক আশ্চর্যজনক মিল লক্ষ্য করা যায়। অতি সম্প্রতি প্রকাশিত Intergovernmental panal on climate change (2007) প্রতিবেদন পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি, আবহাওয়া পরিবর্তন ও পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষার প্রয়োজন সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছে। শুরু হয়েছে আন্তর্জাতিক আবহাওয়া বিতর্ক।

১০.৫.১১.৪ ঃ স্থিতিশীল উন্নয়ন

স্থিতিশীল উন্নয়ন বলতে বোঝায় ভবিষ্যৎ প্রয়োজনের সঙ্গে কোনরূপ সমঝোতা না করে বর্তমানের প্রয়োজন মেটানো। সম্পর্ণরূপে স্থিতিশীল উন্নয়ন বিভিন্ন ক্ষেত্রে হয়তো সম্পূর্ণ না ও হতে পারে, কিন্তু এই পথে কিছুটা অগ্রসর হওয়া সম্ভব আত্ম-নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে।

দ্বিশত বৎসর পূর্বে Malthus যে উক্তি করেছিলেন তারই প্রতিধ্বনি আমরা লক্ষ্য কারি ক্লাব অব রোম (Club of Rome) এর রিপোর্টের মধ্যে। এই রিপোর্টের উপর ভিত্তি করে যে দুটি পরস্পর বিরোধী গোষ্ঠীর আবির্ভাব ঘটেছে তার একদিকে রয়েছে নয়া ম্যালথুসিয়ানরা (Neo-Malthusians) যারা স্থিতিশীল উন্নয়নের সপক্ষে কথা বলেন। দ্বিতীয় গোষ্ঠীর প্রবক্তা ছিলেন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে বিশ্বাসী। তারা মনে করেন এই বৃদ্ধির পথে গড়ে ওঠার বিভিন্ন সমস্যাগুলিকে যেমন-সম্পদের ক্ষয় (বিকল্প-উপায়ে, বা বৃত্তাকার পদ্ধতির মাধ্যমে সমাধান, জনসংখ্যা বৃদ্ধি (জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির উন্নয়নের মাধ্যমে এবং শিক্ষা বিস্তারের মাধ্যমে জনগণের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের মাধ্যমে সমাধান), দূষণ প্রভৃতির সমাধান করা সম্ভব। নয়া ম্যালথুসিয়ানদের আশঙ্কা ও ভীতি এক্ষেত্রে সত্য এবং দৃষ্টিগোচর হলেও বর্তমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি দ্বিতীয় গোষ্ঠীর মতামতকেই দৃঢ় ভিত্তির ওপর স্থাপন করেছে। দ্রুত পরিবর্তনশীল এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের এই পৃথিবীতে বেশ কিছু দুঃখজনক বিষয় ও অনিবার্য স্থিতিশীল বৃদ্ধির পক্ষপাতী এই পরিবেশবিদ ও সংরক্ষণবাদী এই দুঃখবাদী গোষ্ঠীরই অন্তর্ভুক্ত। স্থিতিশীল বৃদ্ধির এই ইচ্ছা সম্পূর্ণ নতুন নয়। প্রাচীন কালের মুনি-ঋষিরা এই আত্মত্যাগের মন্ত্র এবং সাধারণ জীবনধারা ও উচ্চচিন্তাকে (simple living and high thinking) বিশেষ গুরুত্ব দিতেন।

ক্লাব অব রোমের রিপোর্টের বিভিন্ন প্রকার সমালোচনা এবং বিরুদ্ধে নানা মন্তব্য করা হলে ও এর দুটি তাৎপর্যকে কিছুতেই অস্বীকার করা যায় না। প্রথমত, জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চারটি আর্থ-সামাজিক বিষয়ও যুক্ত হয়ে বিষয়টিকে জটিল করে তুলেছে। এগুলি হল অপুষ্টি, শিল্পায়ন, সম্পদের শোষণ এবং পরিবেশে অবক্ষয় সম্মিলিত ভাবে এই সমস্ত বিষয়গুলি পৃথিবীর ধারণ ক্ষমতাকে কমিয়ে দিচ্ছে। যদিও এই রিপোর্টটি সমগ্র বিশ্বের পরিপ্রেক্ষিতে করা হয়নি। তথাপি এটি ক্রমবর্ধমান বিতর্ক এবং বিশ্বে বৃদ্ধির প্রবণতার বিষয়ে দৃষ্টি দিতে সক্ষম হয়েছিল। দ্বিতীয়ত, এই প্রতিবেদন আংশিক হলেও বিশ্বে মানুষের মূল্যবোধ সম্পর্কে একটি নতুন সচেতনতাকে বৃদ্ধি করেছিল। এই রিপোর্টকে অনুসরণ

করে UN কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিল। এর প্রভাবে বিশ শতকের শেষভাগ থেকে 'সবুজ অন্দোলন' শক্তিশালী হয়ে ওঠে।

১০.৫.১১.৫ ঃ পরিবেশ চিন্তার ইতিহাস

মানব সমাজে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা সর্বত্রই বিরাজিত ছিল। মানব সমাজের গৃহীত সিদ্ধান্তগুলির মধ্যে সম্ভবত সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হল প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে তার সম্পর্ক নির্ণয়। অতীতে মানব সমাজের আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বগুলির মধ্যে একটি কেন্দ্র হল প্রাকৃতিক জগতের স্বাভাবিক ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নের সমাধানের জন্য অবিরাম প্রচেষ্টা। যেহেতু বিশ্বের সর্বত্র মানব সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে এবং প্রযুক্তির উন্নতি ঘটেছে সেহেতু প্রাকৃতিক জগতের বৈধ ব্যবহার সংক্রান্ত প্রশ্নটি গুরুত্ব পাচ্ছে। সময়ের অগ্রগতির সাথে সাথে এই অমীমাংসিত প্রশ্নের মীমাংসা করার প্রয়োজনীয়তা সর্বত্র উপলব্ধ হচ্ছে। ক্ষমতার ভাষা দিয়ে এটিকে সম্ভবত ব্যাখ্যা করা চলে। প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে মানব সমাজের সংঘাতকে ও এই ক্ষমতার ভাষা দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব। পরিবেশ হল ক্ষমতা প্রকাশের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য মাধ্যম। জাতি, শ্রেণী, লিঙ্গ, জাতীয়তাবাদ-সমাজে ক্ষমতার এই প্রতিদ্বন্দ্বী বিষয়গুলির সঙ্গে প্রকৃতিকে ও সমপর্যায় ভুক্ত করা চলে। ক্ষমতার সম্পর্কের বিভিন্ন স্তর, প্রাকৃতিক জগতের অবিরাম অপব্যবহার, প্রকৃতিকে শোষণ করার জন্য নতুন প্রযুক্তির উদ্ভব এবং প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমবর্ধমান অবক্ষয় পুরাতন এই বিতর্ককে এমন জটিল করে তুলেছে যা ইতিপূর্বে আর দেখা যায়নি। সমগ্র মানব সমাজের কাছে এটিই কেন্দ্রীয় ও বিশ্বজনীন প্রশ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। মানব সভ্যতার অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্যার সমাধানের বিষয়টিও দীর্ঘতর হচ্ছে। লেখক, দার্শনিক, ঐতিহাসিক, আইনজীবী, প্রশাসক ও চিন্তাবিদরা এই অমীমাংসিত প্রশ্নের সমাধানের চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছেন। গত দু, দশক ধরে এই গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের বিষয়টি একটি নতুন রূপ পেয়েছে এবং জ্ঞানের জগতে একটি নতুন চিন্তাধারার উদ্ভব ঘটেছে যাকে পরিবেশের ইতিহাস বলে উল্লেখ করা যেতে পারে।

প্রাচীন ভারতে বনকে আধ্যাত্মিক জগতের অঙ্গ বলে মনে করা হত এবং সন্ন্যাসীদের আশ্রমে বন ও বন্যপ্রাণীকে রক্ষণাবেক্ষণের ধারণাও গড়ে উঠেছিল। বন নির্ভর এই আশ্রমকেই অরণ্য সংস্কৃতি বলা চলে। বনের বাস্তুতন্ত্রের উপযোগিতা এবং তাদের অর্থনৈতিক গুরুত্বের জন্যই গাছ এবং বন্যপ্রাণীর প্রতি একটি শ্রদ্ধামিশ্রিত ভয় প্রদর্শিত হত। রামায়ণের মত প্রাচীন মহাকাব্য থেকে এই বোধশক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। অযোধ্যা সম্রাট রাম যখন গাঙ্গেয় উপত্যাকায় দক্ষিণ দিকের বনে নির্বাসিতের জীবন-যাপন করতে যাত্রা করিছিলেন তাঁর মা নিরাপত্তার বিষয়ে ভয় পেয়ে ঘোষণা করেছিলেন বনের হাতি, সিংহ, বাঘ বা বন্য মহিষ তোমাকে কোন ক্ষতি করতে পারবে না। রাম তার পত্নীকে সুরক্ষিত করার জন্য গোপন স্থান নির্বাচিত করেছিলেন। বন একটি নির্দিষ্ট জমিতে গড়ে উঠেছিল যেখানে আমোদ ও কষক্লিষ্ট হয়েছিল। কিন্তু এটি একইসঙ্গে সুন্দর জায়গাও ছিল। সুতরাং বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করা এবং সুরম্যস্থান উপভোগ করা—বনের এই দ্বিবিধ চরিত্র মহাকাব্যে ও স্থান পেয়েছে।

মৌর্যদের সময় থেকে হাতিকে রক্ষা করা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। অর্থশাস্ত্র বনের হাতিকে রক্ষার জন্য নিয়মের কথা তুলে ধরেছে। হাতির বন ছাড়াও সেখানে এমন কিছু বন ছিল যার প্রধান লক্ষ্য ছিল বনের কাঠ, বাঘ এবং সিংহকে রক্ষা করা। মধ্যযুগেও বন ও বন্যপ্রাণীকে রক্ষা করার জন্য বিভিন্ন পন্থা গ্রহণ করা হয়েছিল। বাবর তাঁর আত্মজীবনীতে বনও বন্যপ্রাণী সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেছেন।

শিল্প বিপ্লবের পর সংরক্ষণবাদীদের উচ্চারণ এ বিষয়ে আরও স্পষ্ট ও দৃঢ় হয়েছে। বনের হ্রাস এবং স্থলভাগের পরিবর্তন প্রাকৃতিক জগতে রোমান্টিক ভাবধারাকে গড়ে তোলে। বিভিন্ন রোমান্টিক রচনায় শিল্প বিপ্লবের সমালোচনা থাকলে ও প্রকৃতির অবক্ষয় এর গুণকীর্তন করা হয়েছে। এটি 'back-to-the land' আন্দোলনকে উৎসাহ দিয়েছিল। উইলিয়াম ওয়াউসর্থ, জন রাস্কিন এবং উইলিয়াম মরিস এই আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছিলেন। এবং ইউরোপে পরিবেশ ভিত্তিক সমাজের গঠনে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন। ইউরোপ ও আমেরিকায় বনের অতিদ্রুত অদৃশ্য হয়ে যাওয়ার ফলে এক নতুন বন্য ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল যা নৈতিকতা, বিজ্ঞান এবং রুচিসম্পন্ন বিষয় নিয়ে গড়ে উঠেছিল।

স্বতন্ত্র ধারা হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস আমেরিকায় সমৃদ্ধি লাভ করেছে। এখানেই প্রথম আত্মসচেনতা বোধ সম্পন্ন পরিবেশের ইতিহাস গড়ে উঠতে শুরু করেছিল। আমেরিকায় পরিবেশের ইতিহাস একটি আদর্শ ও সামাজিক আন্দোলন হিসাবে গড়ে উঠেছিল। এবং এটি ঐতিহ্য থেকে উদ্দীপনার সৃষ্টি করেছিল। জর্জ পারকিন মার্শা এবং ফ্রেডারিক জ্যাক্সন টর্নার প্রমুখ গবেষকদের রচনার মধ্যে এই ঐতিহ্যগত ধারণার প্রমাণ পাওয়া যায়।

আমেরিকার দৃশ্যের অভ্যন্তর থেকেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে পরিবেশের ইতিহাসের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল। এর প্রধান কারণ হল পরিবেশের ইতিহাস সংরক্ষণের পথ থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, যা আমেরিকাতেই সর্বপ্রথম দেখা দিয়েছিল। কিন্তু আমেরিকার পরিবেশের ইতিহাসচর্চায় উৎসাহের একান্ত অভাব এবং বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগের অভাব লক্ষ্য করা যায়। তবে আমেরিকার ঐতিহাসিকরা বর্তমানে তাদের সংকীর্ণ আবর্ত থেকে বেরিয়ে আসতে আন্তরিকভাবে সচেষ্ট হয়েছেন।

1970 এর দশকের আগে পর্যন্ত ঐতিহাসিকদের মধ্যে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বা মানব সভ্যতার ওপর তার প্রভাব সম্পর্কে চর্চার আগ্রহ তেমনভাবে লক্ষ্য করা যায়নি। 1970 এর দশকেব মাঝামাঝি সময়ে ঐতিহাসিকরা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস রচনার সময়ে পরোক্ষ ভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে সংকীর্ণ বা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে তুলে ধরেছিলেন। ফলে —ইতিহাস, নিম্নবর্গের ইতিহাস, কৃষির ইতিহাস, আদিবাসীদের ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস প্রভৃতির মধ্যে পরিবেশের ইতিহাস বিক্ষিপ্তভাবে রয়েছে। তবে এটা সত্যি যে কয়েকটি ব্যতিক্রমী দৃষ্টান্ত ছাড়া এই ধরনের ইতিহাস প্রধানত কৃষিযোগ্য জমির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। স্বভাবতই এই ধারার ঐতিহাসিকরা, অকৃষিযোগ্য জমি, জলাজমি, পাবত্য এলাকা, নিয়ে খুব বেশি আলোচনা করেননি। স্যার যদুনাথ সরকার যিনি মুঘল যুগের রাজনৈতিক ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি দক্ষিণ ভারতে মুঘলদের সামরিক অভিযানের পরিবেশের ওপর কি ধরনের প্রভাব ফেলেছিল তা নিয়ে আলোচনা

করেছেন। কিন্তু এখানে পরিবেশের অবক্ষয় সম্পর্কে খুব কম আলোচনা করা হয়েছে। 1970 সালের পূর্বে ঐতিহাসিক জগতে ঔষধ ও জনস্বাস্থ্য সংক্রান্ত ইতিহাস চর্চা করতে পরিবেশের বিষয়টি বিশেষ গুরুত্ব পায়। অপরাধের ইতিহাস, বনের আইন সংক্রান্ত সমস্যা, বিভিন্ন প্রকার গ্রামীণ বিচার সংক্রান্ত আন্দোলন এবং গণ সংস্কৃতি সম্পর্কে ক্ষুদ্র আলোচনায় পরিবেশের বিষয়টি গুরুত্ব পায়।

বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে বলা চলে পরিবেশের ইতিহাসকে চারটি পর্যায়ে বিভক্ত করা যায়— (১) পরিবেশ সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস, (২) সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিকতা নির্ভর পরিবেশের ইতিহাস, (৩) শক্তি প্রয়োগের মাধ্যম হিসাবে পরিবেশের ইতিহাস চর্চা, (৪) পরিবেশের ইতিহাস যা উল্লেখিত তিনটির সমন্বয়ে গঠিত। পরিবেশ সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস প্রধানত জৈব ও ভৌত পরিবর্তন এবং এই পরিবর্তন মানব সমাজের পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর বা মানুষের কার্যকলাপে কতখানি পরিবেশের ভৌত অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে পারে তা নিয়ে আলোচনা করে। সংস্কৃতি ও বৌদ্ধিকতা সংক্রান্ত পরিবেশের ইতিহাস খুবই উৎকৃষ্ট এবং এখানে প্রকৃতিকে বিভিন্ন ধারণা, কলা এবং চিঠিপত্রের মাধ্যমে তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়। এই তুলে ধরার প্রক্রিয়ায় — এবং এর ফলে উদ্ভূত পরিবেশের ওপর তারা আলোকপাত করে। তৃতীয় পর্যায়ভুক্ত পরিবেশের ইতিহাস পরিবেশকে ক্ষমতার ব্যবহারের একটি মাধ্যম হিসাবে তুলে ধরে। এটি প্রাকৃতিক জগতের সঙ্গে সম্পর্কিত ধারণা, আইন এবং রাষ্ট্রনীতিকে অন্তর্ভুক্ত করে। এখানে রাষ্ট্র শক্তি কিভাবে প্রকৃতিকে ব্যবহার করে এবং সেক্ষেত্রে বিভিন্ন স্বার্থবাহী গোষ্ঠী কিভাবে সংগ্রাম করে ক্রম পরম্পরায় আলোচনা করা হয়। শেষ পর্যায় ভুক্ত পরিবেশের ইতিহাস উপরে উল্লেখিত একটি বা একাধিক বিষয়ে আলোচনা করে। এই ইতিহাস বহুবিধ চরিত্রবিশিষ্ট এবং চিত্তাকর্ষকযুক্ত।

আধুনিক যুগে ঐতিহাসিক গবেষণার পরিবর্তিত ধারা সম্পর্কে আমরা মোটামুটি সচেতন। সাম্প্রতিক বছরগুলিতে ইতিহাস চর্চার এই পরিবর্তিত ধারার ফলে পরিবেশের ইতিহাস যথেষ্টভাবে উপকৃত হয়েছে। ইতিহাসের অভ্যন্তরেই একটি নতুন ধারার উদ্ভব বিষয়কে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে এবং রক্ষণশীল ঐতিহাসিকদের এই নবধারার মধ্যে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতে বাধ্য করেছে। পরিবেশের ইতিহাসের ক্রমবর্ধমান বিস্তৃতি তাকে একটি স্বতন্ত্র ধারায় পরিচিতি দান করেছে। বর্তমানে এই বিষয়ের গুরুত্বকে খাঁটো করে দেখানোর প্রবণতা দেখা গিয়েছে এবং এটাকে পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ক পড়াশোনার অভিন্ন অঙ্গ হিসাবে দেখা হয়েছে। তবে পরিবেশের ঐতিহাসিকদের নিজেদের পথ হিসাবে পরিবেশকে আলোচনার পদ্ধতি রয়েছে। এই পদ্ধতিতে, পরিবেশ বিদ্যা বিষয়ক আলোচনায় ঐতিহাসিকরা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে। ইতিহাস এমন একটি ধারা যেখানে নিঁখুত কোন তত্ত্ব নেই। ঐতিহাসিকরা তথ্য ছাড়া সহায়হীন এবং ঐতিহাসিক ছাড়া তথ্য অর্থহীন। অনেক সমাজ বিজ্ঞানী মনে করেন যে, এই ধারার ক্ষেত্রে বেশ কিছু অসুবিধা রয়েছে। এবং তাদের অনেকেই বিশ্বাস করেন যে, আধুনিকোত্তোর ইতিহাস এই ধারার মর্যাদা বৃদ্ধিতে যথেষ্ট পরিমাণে সাহায্য করবে। ঐতিহাসিকদের তথ্যের প্রয়োজন রয়েছে। এবং তাদের এই প্রয়োজনের তুলনায় তথ্যগুলির ভাষা রচনা করতে হয়। ইতিহাস একটি পৃথক ধারা হিসাবে উত্তর আধুনিকতার প্রভাব থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রেখেছে এবং একটি স্বাধীন ধারা হিসাবে একে রক্ষা করাও ঐতিহাসিকদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে।

১০.৫.১১.৬ ঃ ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতি

ঊনবিংশ শতকের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ভারতের বৃহৎ ক্রান্তীয় অরণ্য ইংরেজ ঔপনিবেশিক শাসকগোষ্ঠীর শক্তি প্রয়োগের একটি অন্যতম কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানে ও দুই বিপরীতমুখী ধারা দেশীয় প্রথা ও পাশ্চাত্য আইন ও বিচার ব্যবস্থার মধ্যে সংঘর্ষ দেখা যায়। ভারতবর্ষে উপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী ক্ষমতা (power)-র যে নতুন ধারা গড়ে তোলে সেখানে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকেতা স্পর্শ করতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্ববর্তী সময়ে তাৎপর্যহীন হিসাবে মানব চরিত্র বা বিধির বেশিষ্ট্যকে পরিদর্শনের আওতার আনা জরুরী হয়ে ওঠে। যখন জমি বা প্রাকৃতিক সম্পদের ওপর ব্যক্তিগত অধিকারের কথা বলা হয় তখন ঔপনিবেশিক শাসক গোষ্ঠী তাদের উন্নত আইন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর বন্দোবস্ত গড়ে তোলে। এই অনুচ্ছেদের প্রধান উদ্দেশ্য এটা দেখানো যে বনের ঔপনিবেশীকরণ ছিল বৃহত্তর ভাবে শক্তি প্রয়োগের একটি মাধ্যম এবং এর লক্ষ্য ছিল অবদমিত সমাজে বন ও তার মানুষের মধ্যে একটি নতুন সাংস্কৃতিক ধারা ও নতুন আদর্শকে প্রয়োগ করা। বিদেশিক শাসন দেশীয় সমাজের সঙ্গে বিভিন্নভাবে সম্পর্ক স্থাপন করেছিল। এবং অরণ্যের উপর এর প্রভাব কি পড়েছিল তা দেখা প্রয়োজন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে ব্রিটিশরা যখন ভারতে তাদের নিয়ন্ত্রণ অর্জন করে তখন বৃহত্তর এলাকা ছিল গভীর অরণ্যে পরিপূর্ণ। ঔপনিবেশক শাসনের পূর্ববর্তী সময়ে এগুলি ছিল কম ঘনবসতি এলাকা। সেখানের বেশ কিছু মানুষ শিকারের মাধ্যমে, আবার কেউ স্থানান্তর চাষের (shifting cultivation) মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহ করত। কারিগররা গ্রামাঞ্চলে বাস করত, অনেকে গরু, ঘোড়া এবং ছাগল সেখানে চরাত। কৃষক এবং কারিগরদের কাঁচামাল বিশেষত কাঠের সরবরাহের ক্ষেত্রে অরণ্য একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। দূর্ভিক্ষ সংকটের সময়েও অরণ্য অনেক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল এবং মানুষের জীবিকা নির্বাহের সুযোগ করে দিয়েছিল।

কিন্তু ঊনবিংশ শতকে ব্রিটিশ সরকার অরণ্যের ওপর বিভিন্ন বাধা নিষেধ আরোপ করে। বিভিন্ন শহর ও জাহাজ নির্মাণে এবং ভারতে রেলপথ নির্মাণের জন্য প্রচুর পরিমাণে কাঠের প্রয়োজন ছিল। 1849 খ্রীঃ বনজ সম্পদের ওপর একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠার উদ্যেগ নেওয়া হয়েছিল যখন গভর্নর জেনারেল লর্ড জালহৌসী বেশ কিছু জলাভূমিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের আওতায় আনতে চেয়েছিলেন। 1852 খ্রীঃ তিনি শুষ্ক খাদ্য, জ্বালানী বনজ সম্পদকে সংরক্ষণের আওতায় আনার নির্দেশ দিয়েছিলেন। 1864 খ্রীঃ Imperial Forest Department প্রতিষ্ঠিত হয়। 1865 খ্রীঃ প্রথম অরণ্য আইন পাশ হয়। এর মাধ্যমে অরণ্য সংরক্ষণের আওতায় আনা হয় এবং এখানকার উৎপাদিত দ্রব্যের ওপর ব্রিটিশ সরকারের একচেটিয়া আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংরক্ষিত এলাকার ওপর ব্রিটিশ সরকার তার পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে। পরবর্তী কয়েক দশকে বনের ওপর সমীক্ষা করা হয় এবং সেখানকার বাসিন্দাদের নথিভুক্ত করা হয়। 1878 খৃষ্টাব্দে দ্বিতীয় অরণ্য আইন ব্রিটিশসরকারকে আরো বেশী ক্ষমতা দেয়। এই দ্বিতীয় আইন ব্রিটিশ সরকারকে অদখলীকৃত বা জলাজমিকে সংরক্ষণের আওতায় আসার অধিকার দেয়।

ভারতীয় জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে ঔপনিবেশিক শাসনের পর থেকে যে ধরণের বাস্তুতান্ত্রিক ও সামাজিক পরিবর্তন সংগঠিত হয়েছিল তা ইতিপূর্বেকার পরিবর্তনের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় অরণ্য সংক্রান্ত ইতিহাসের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক যুগের অরণ্য আইনকে বাস্তুতান্ত্রিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে জলবিভাজিকা বলা চলে।

ঔপনিবেশিক শাসনের আগমনের ফলে প্রথাগত সমাজের পতন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল। সাম্রাজ্যবাদের চাপে ভারতের ঐতিহ্যগত সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা পরিবর্তিত হয়েছিল এবং নতুন আইন — মানুষ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোর এক নতুন কৃষি সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। নতুন কৃষি সম্পর্ক এবং রাষ্ট্র ও জনগণের মধ্যে নতুন সম্পর্কের ফলে একটি নতুন শাসন প্রবর্তন করা অনিবার্য হয়ে ওঠে। জমির ওপর ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার প্রবর্তন করা এবং পশ্চিমী ধারার আইনী ব্যবস্থা ইংল্যাণ্ডের দুই শাসকদের কাছে জরুরী হয়ে ওঠে। ভারতীয় উপমহাদেশের প্রত্যন্ত এলাকাতে আইনের শাসন বজায় রাখার ওপরেই সম্পত্তির অধিকার কার্যকর করা সম্ভব ছিল। স্বভাবতই ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ ও তাদের সহযোগীদের কাছে প্রধান বিষয় হয়ে ওঠে সেই সমস্ত জনগোষ্ঠীকে অনুশাসিত করা যারা যে কোন কারণে বিদ্রোহী হয়ে উঠতে পারে। নতুন আইন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামোয় দেশীয় সমাজে সামাজিকতার ধারণাও পরিবর্তিত হয়। কোনটি অপরাধ, কোনটি সম্পত্তি, কোনটি ন্যায়, কোনটি অন্যায়, কোনটি বৈধ, কোনটি অবৈধ সমস্ত কিছুই নতুনভাবে নির্ধারিত হয়। স্বভাবতই জনগণের ওপর প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও কঠোর রাষ্ট্রীয় অনুশাসন প্রবর্তন করা অপরিহার্য হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক শাসকদের পক্ষ থেকে আইন, আদালত, ঔপনিবেশিক পুলিশ বাহিনী কারাগার এবং জরুরী অবস্থার জন্য একটি সেনা বাহিনী প্রস্তুত রাখা অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের স্বার্থেই এই সমস্ত উপাদান গুলিতে বৈধতার ছাপ দেওয়া হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক শাসকদের কাছে উদ্বেগের বিষয় ছিল প্রাক্-ঔপনিবেশিক যুগে রাষ্ট্রই এই ‘বেআইনী’ বিষয়গুলিকে সহ্য করত। কিন্তু এখন আইনের সুসংবদ্ধকরণ প্রক্রিয়া শুরু হল। আইনের সুসংঘবদ্ধকরণের ক্ষেত্রে বেন্থামের উপযোগিতাবাদ একটি গুরুত্ব পূর্ণ শক্তি হিসাবে কাজ করেছিল। বোর্ড অব কন্ট্রোটের সভাপতি Dundus এর কাছে বেন্থাম যেন ‘Indian Solon’ হিসাবে আবিভূত হয়েছিলো। ভারতে আইন প্রবর্তনের ক্ষেত্রে কি ধরনের রূপান্তর প্রয়োজন সেই বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে তিনি তাঁর প্রবন্ধ Influence of Time and place in Matters of Legislation রচনা করেছিলেন উপযোগবাদীদের মতে, মানুষ সুশৃঙ্খলাবদ্ধ হওয়ার পূর্বে তার সর্বোদ যুগের জন্য আইনের সংগঠনরূপে ‘severe schoolmaster’ প্রয়োজন। তাদের কাছে, আইনের মত জনমত এবং শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণও তাৎপর্যপূর্ণ নয়। আইন অনুশাসনের মাধ্যমে বিপথে গমন নিয়ন্ত্রণ করবে এবং দীর্ঘ পদক্ষেত্রের মাধ্যমে অপরাধকে দূর করবে। এটাই হ’ল আইনের Instrumentalist’ দৃষ্টিভঙ্গি সেখানে বলা হয় আইন সমাজের চাহিদা ও পদ্ধতি এবং প্রয়োজনের সঙ্গে সঙ্গতি রাখার ক্ষেত্রে যন্ত্রের মত কাজ করবে। আইনের ‘Instrumentalist’ দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে আইন শুধুমাত্র জনগণের দ্বন্ধ এবং সামাজিক অপরাধগুলিকে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে একটি বাহক হিসাবে কাজ করে না, বরং সমাজের একটি রূপান্তরকারী

যন্ত্র হিসাবে সে কাজ করে। প্রকৃত পক্ষে আইন শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে একটি মাধ্যম হিসাবে কাজ করে এবং জনগণ তাদের কার্যকলাপ, তাদের পরিচিতি এবং তাদের সমস্ত তৎপর্যহীন অঙ্গভঙ্গি প্রভৃতি বিষয়ের ক্ষেত্রে পরিদর্শকের কাজ করে। সুতরাং আইনের কাজ হয়ে দাঁড়ায় 'smallest frogment of life' এর উপর নজরদারী করা। মানুষের এই নতুন জ্ঞান সরাসরি প্রত্যক্ষগোচর না হলেও বাস্তবে অস্তিত্বশীল। নিয়ম শৃঙ্খলার প্রকৃত যন্ত্রপাতি অবয়বহীন হলেও সর্বদা সে সব কিছুকে পর্যবেক্ষণ করে। সমাজও হল কারাগারের মত একটি সংঘবদ্ধ ও শৃঙ্খলাপূর্ণ প্রতিষ্ঠান। চরিত্র দৃষ্টিভঙ্গি, সম্ভাব্যতা এবং সন্দেহদনক সমস্ত কিছুই আধুনিক রাষ্ট্র নথিভ্যুক্ত করে।

1865 এবং 1878 সালের Forest Act-এর তাৎপর্য ও উদ্দেশ্যকে এই পরিপ্রেক্ষিত থেকেই আমাদের ব্যাখ্যা করতে হবে। এক ধাক্কায় অরণ্যের উপর সরকারের অধিকার বৈধতা পেল এবং দেশীয় মানুষের শিকার, খাদ্যসংগ্রহ বা গাছ কাটা অবৈধ বা বেআইনী হয়ে গেল। শিকার করা, প্রাণী হত্যা ও চুরি করা, মাছ ধরা প্রভৃতি সমস্ত কিছুই অপরাধমূলক কাজ হিসাবে গণ্য হল। এইভাবে অরণ্য অপরাধের নতুন তালিকা তৈরী হল।

ভারতীয় অরণ্য ও পার্বত্য এলাকায় মানুষের বেশ কিছু কার্যকলাপকে অপরাধ মূলক কাজ হিসাবে গণ্য করা হল যা প্রাক্ - ঔপনিবেশিক আমলে আইনের চোখে অপরিচিত বা স্বল্প পরিচিত ছিল। আইন প্রণয়ণকারীরা সমগ্র ঔপনিবেশিক শাসন জুড়ে অরণ্য অপরাধের সীমানাকে সম্প্রসারিত করেছিল, যদিও সাধারণের মধ্যে অপরাধ সংক্রান্ত ধারণা প্রায় একই রয়ে যায়। শাসক গোষ্ঠীর স্বার্থানুসারে আইন প্রণয়ন করা হয়। আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন শাসকগোষ্ঠী কিছু ক্ষেত্রে আইনকে সম্প্রসারিত করে। উপনিবেশিক সরকার অরণ্যের ওপর তার আধিপত্যকে আইনি বৈধতা দান করেছিল। স্বভাবতই ব্রিটিশ রাজের কাছে সামাজিক স্থিতিশীলতা দান করা প্রয়োজনীয় হয়ে পড়েছিল। রাষ্ট্র এবং তার সহযোগীরা তাদের নিজেদের কার্যকর্মকে বৈধতা দিয়েছিল নতুন আইন প্রণয়নের মাধ্যমে। সাধারণভাবে আইন ও প্রশাসনিক পরিকাঠামো এবং বিশেষভাবে অরণ্য আইন ও প্রতিরোধ ছিল ব্রিটিশদের রাজনৈতিক ও আদর্শগত প্রয়োজনের অনিবার্য ফলশ্রুতি। এর মাধ্যমে ভারতীয়দের একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী, নির্দিষ্ট স্থান ও বিশিষ্ট ভূমিকায় শৃঙ্খলাবদ্ধ করা হয়েছিল।

প্রাচ্যের অরণ্য ব্যবস্থাকে পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে যে সমস্ত ব্যক্তিদের ত্রুটিকে অদ্ভূত বিদেশী এবং অজানা বলে মনে হয়েছিল তারা অনতিকাল ধরে অরণ্যকে ব্যবহার করে আসছিল। ঊনবিংশ শতকে ভারতে বহু সম্প্রদায় ছিল যারা আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে খাদ্য সংগ্রহ বা শিকারের ওপর নির্ভরশীল ছিল। রাষ্ট্রের অরণ্য সংরক্ষণ এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলির কার্যকলাপকে নিঃসন্দেহে নিয়ন্ত্রিত করেছিল। এই সমস্ত সম্প্রদায়গুলির মধ্যে অনেকে ঔপনিবেশিক অরণ্য সংক্রান্ত আইনের ব্যাপারে সচেতন ছিল না। তারা সরকারের দাবীর বৈধতাকে অস্বীকৃত করেছিল। তারা আগের মতই একইভাবে গাছ কাটতে থাকে, ও মাংসের জন্য ছোট প্রাণীকে শিকার করে। খাদ্য সংগ্রহকারী ও শিকারীরা বনের আইনকে অস্বীকার করে বনে প্রবেশ করতে থাকে কারণ এটি ছিল তাদের কাছে একটি ঐতিহ্যগত পেশা। কিন্তু বিদেশীদের চোখে এটি ছিল 'অপরাধ'। ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র নতুন সামাজিক স্থায়িত্ববোধ গড়ে তোলার প্রচেষ্টার

অপরাধের কথা বললেও বনের আদিবাসীরা কিন্তু এ ব্যাপারে শাসকদের চিন্তার দ্বারা প্রভাবিত হয়নি। এটা দুর্ভাগ্যজনক যে, বৈদেশিক আইন ও মতাদর্শ সনাতন অর্থনীতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল এবং এর ফলে সামাজিক নৈতিক ও ভাবাদর্শগত একটি অধঃপতন শুরু হয়েছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের প্রথম পর্বের শাসকদের এই সমস্ত সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল। ভারতের সমস্ত প্রশাসনিক পরিকাঠামোই দেশীয় আদিবাসী মানুষদের কাছে অদ্ভুত বিদেশী এবং অস্পষ্ট বলে মনে হয়েছিল।

শিকারী, খাদ্য সংগ্রহকারী এবং স্থানান্তরিত কৃষক হিসাবে বনের আদিবাসী সম্প্রদায়গুলি কৃষিভিত্তিক সভ্যতার সব যুগেই নানা ধরনের চাপের সম্মুখীন হয়েছিল। কিন্তু পূর্বেকার এই চাপ ছিল গুণগতভাবে কিছুটা পৃথক ধরনের। ঊনবিংশ শতকে রাষ্ট্র বনের দায়িত্ব গ্রহণের পর তারা নতুন ধরনের সমস্যার সম্মুখীন হয়। পূর্বে বনজ সম্পদের ওপর বাণিজ্যিক শোষণ সীমাবদ্ধ ছিল গোলমরিচ এলাচ গজদন্ত প্রভৃতির মধ্যে। এগুলির শোষণ বা অবক্ষয় পরিবেশ অথবা দৈনন্দিন জীবনযাত্রার উপর কোন ব্যাঘাত ঘটায়নি। কিন্তু যখন বনের কাঠ গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক পণ্য হয়ে উঠল তখনই তা পরিবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে আসে এবং অরণ্যের ব্যবহারে ও পরিবর্তন হয়। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে, রাষ্ট্রের এই বন সংরক্ষণ প্রাচীন অদিবাসী সম্প্রদায়গুলি কার্যকলাপের উপর আঘাত এনেছিল এবং তাদের স্থানান্তরিত হতে বাধ্য করেছিল। রাষ্ট্র কর্তৃক বলপূর্বকভাবে বনের এই দখল বনের অধিবাসীদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি করেছিল। এর ফলে ব্রিটিশ বিরোধী একাধিক আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। বহু অরণ্যবাসীরা বন সংরক্ষিত হয়নি এমন এলাকায় চলে যেতে বাধ্য হয়ে ছিলেন। আয়ের প্রধান উৎস থেকে বঞ্চিত হয়ে কীচক বাধকি লিধা প্রভৃতি আদিবাসীরা চুরি ও ডাকাতিতে লিপ্ত হয়।

ঊনবিংশ শতকে যে সমস্ত আদিবাসীরা স্থানচ্যুত ও কর্মচ্যুত হয়ে বাংলার বিভিন্ন জেলাতে ডাকাতি শুরু করেছিল তারা ছিল মূলতঃ উত্তর ভারতের বাধাক সম্প্রদায়ের শাখা। অফিসের বিভিন্ন ডাকাতি নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত তথ্যাদি শিকারীদের জীবনের ওপর আলোকপাত করে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে কৃষ্ণনগরের রাজা বাংলায় এই বাধাক সম্প্রদায়কে স্থাপনের অনুমতি দিয়েছিলেন। তাদের শুল্ক হীন জমি প্রদান করা হয়েছিল এবং শিকারী হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। বাংলায় ব্রিটিশদের আসার পর যে সামাজিক অস্থিরতা দেখা দিয়েছিল তার ফলে এরা ডাকাতির মত বিপদজনক পথ গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল। শিকারী ডাকাতদের প্রধান কেন্দ্র ছিল বারাসাত। তাঁরা দুটি বৃহৎ গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল যার একটি ভাগ ছিল উত্তর পশ্চিম দিকে। অপরটি ছিল জেলার কেন্দ্রস্থলে যেটি সুন্দরবনের বাঙ্গুর যানা থেকে নদিয়ার গোবরডাঙ্গা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মেদিনীপুরের চুয়াড় সম্প্রদায় যা সিলেটের কীচক উপজাতির মত খাদ্য সংগ্রহকারী সম্প্রদায় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের নীতিকে তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়। এই অবস্থা সমগ্র সমাজকে বিপথগামী করেছিল। এই সময় নতুন সম্প্রদায় ও সামাজিক শ্রেণীর আবির্ভাব ঘটে। ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতির বিরুদ্ধে এই সম্প্রদায় গুলি অনেক সময় প্রতিরোধ গড়ে তোলে। কিন্তু উপনিবেশিক রাষ্ট্র এই আন্দোলনগুলির অর্থনৈতিক উৎস সম্পর্কে আগ্রহ দেখায়নি। তারা এগুলিকে আইন শৃঙ্খলার সমস্যা হিসাবেই দেখেছিল। এর পেছনে যে প্রশাসনিক পরিকাঠামো ও মতাদর্শ গড়ে উঠেছিল তার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল একটি নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যেই নির্দিষ্ট ক্রিয়াকলাপের মধ্যে তাদের ভূমিকাকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করা।

ঔপনিবেশিকরা আইন ও শৃঙ্খলার ওপর গুরুত্ব আরোপ ও অন্যান্য সংবেদনশীল সম্প্রদায়গুলির প্রতি কঠোর পরিদর্শকের ওপর গুরুত্ব আরোপ করার ফলে Criminal Tribes Act পাশ করা হয়। উত্তর ভারতের একটি সম্প্রদায় Minas দের নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সর্বপ্রথম Criminal Tribes Act পাশ করা হয়। ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষের কাছে অপরাপর কিছু সম্প্রদায় ও বিপজনক (‘dangerou’) বলে মনে হয়েছিল। এই আইনের মাধ্যমে প্রশাসকদের হাতে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল যেকোন সম্প্রদায়, জাতি ও উপজাতিকে অপরাধী বিপজনক হিসাবে ঘোষণা করার। 1897, এবং 1911 খ্রীঃ 1923 খ্রীঃ আইনটির পুনর্নবীকরণ করা হয়েছিল। মাদ্রাজের মাদুরাতে Piramalai Kalloers সম্প্রদায়কে অপরাধী হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। সম্প্রদায়ের সদস্যদের ক্রিমিন্যাল আখ্যা দিয়ে সমবেত হবার ও অন্যান্য বিষয়ের ওপর বাধা নিষেধ আরোপ করা হয়েছিল। তাদের বিশেষ সময়ে সীমে অনুপস্থিত থাকতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। এবং ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত স্থানে তাদের অবস্থানের সম্মতি দেওয়া হয়েছিল। Criminal Tribes Act কিন্তু ব্রিটিশদের বন নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অরণ্যের সম্প্রদায়গুলির স্থানান্তরিত করণের সঙ্গে ক্রিমিন্যাল ট্রাইব অ্যাক্টের অঙ্গাঙ্গী ভাবে সম্পর্ক ছিল। খরু উপজাতি যাদেরকে এই আইনের আওতাধীন করা হয়েছিল তারা ছিল বাজাখদের একটি শাখা। এই বাজাখরা অযোধ্যায় নেপালের পার্বত্য অঞ্চলে বাস করত। তারা প্রায় ব্রিটিশ ভূখণ্ডে আকস্মিকভাবে প্রবেশ করত বিশেষত পূর্বদিকে ঊনবিংশ শতকে উত্তর ভারত থেকে বাংলা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকার বিভিন্ন জাতি ও অদিবাসী সম্প্রদায়কে অপরাধী সম্প্রদায় হিসাবে গণ্য করা হয়েছিল। 1916 এবং মেদিনীপুরে লোকদের ও অপরাধী সম্প্রদায় ঘোষণা করা হয়েছিল। লোকদের ছিল অত্যন্ত দরিদ্র গোষ্ঠী। প্রথাগতভাবে বন থেকেই তাদের অর্জিত আয়ের ওপর ভিত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত। তারা তাদের আয়ের উৎস থেকে বিতাড়িত হয় এবং চুরি ডাকাতির জীবন গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। এই ধরনের উদাহরণের সংখ্যা অসংখ্য।

১০.৫.১১.৭ ঃ দক্ষিণ এশিয়া ও ভারতের পরিবেশের ইতিহাসের চালচিত্র

দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশের ইতিহাস চর্চা শুরু হয়েছিল 1980-র দশক থেকে। কতকগুলি গ্রন্থ এবং অনুচ্ছেদ দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশের ইতিহাসকে সামনে এনেছিল। প্রথম দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একটি হল উত্তর আমেরিকার বন বিশেষজ্ঞ রবার্ট কে উইন্টার্স (Robert K. Winters) এর। অপর জন হল চরমপন্থী ভারতীয় এবং রাজনৈতিক ঐতিহাসিক রিচার্ড টাকের (Richard Traker)। টাকের পশ্চিম ভারতে ঔপনিবেশিক বন নীতি এবং জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদের মধ্যে একটি যোগসূত্র রচনা করতে চেয়েছিলেন তাঁর এই অনুচ্ছেদের পর কাজের গতি পরিবর্তিত হয় এবং 1980 এর দশকের প্রথম থেকে বিভিন্ন ধারার লেখকরা দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার পরিবেশের ইতিহাস নিয়ে আলোচনা ‘পুনর্গঠন’ করেন। এই সময় থেকে পরিবেশের ইতিহাস বিশেষত ভারতের যন্ত্রের ইতিহাসকে উদ্দেশ্যগত ভাবে রাজনীতিকরণ করা শুরু হয়েছে। এই রাজনীতিকরণের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উত্তর ভারতে

চিপকো আন্দোলনের উদ্ভবের সাথে সাথে। 1980 ও 90 এর দশকে পরিবেশ ঐতিহাসিকরা দুটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নকে আলোচনার মধ্যে রেখেছিলেন—

(১) ভারতে বন সংক্রান্ত নীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের প্রকৃত ইতিহাস কি এবং কোন প্রেক্ষাপট থেকে জাতীয়তাবাদীদের প্রতিবাদে এটিকে অঙ্গীভূত করা যায়।

(২) ভারতে বস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে যে আশঙ্কা দেখা গিয়েছে সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় সংস্থাগুলির মতাদর্শগিত ইতিহাস কেমন।

(৩) 1980 খ্রীঃ Forest Act পাশ হবার পর এই বিতর্ক কিন্তু নতুন মাত্রা পেয়েছে ভারতে, ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় এবং অক্সফোর্ডে অনেকে পৃথক পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিষয়টিকে ব্যাখা করার চেষ্টা করেছেন। এক্ষেত্রে ডিউক বিশ্ববিদ্যালয় যেখানে কৃষিক্ষেত্রে পরিবর্তন, ক্রান্তীয় অঞ্চলে ব্যবহার এবং পরিবেশের ওপর তার প্রভাব নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতী, সেখানে ভারতীয় গবেষকরা উপনিবেশিক বননীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ইতিহাস এবং বননীতি গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে মতাদর্শ প্রভৃতি নিয়ে আলোচনার পক্ষপাতী।

রামচন্দ্র গুহ তাঁর অনুচ্ছেদ এবং পরবর্তীতে গ্রন্থে দেখিয়েছে যে, প্রাক-উপনিবেশিক যুগে বনের বা বনজ সম্পদের ব্যবহারের ক্ষেত্রে কোন বাঁধা ছিল না। এই ভাবে গুহ দেখিয়েছেন পার্থিব বিবেচনার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উপনিবেশিকরা বননীতি ও সংরক্ষণ চেয়েছিল যা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কলাকৌশল ও রাজস্ব আদায়ে সাহায্য করেছিল। সুতরাং গ্যাডগিল এবং গুহ-র মতে, রেলপথ, জাহাজ নির্মাণে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রচুর কাঠের প্রয়োজন হওয়ায় তারা সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থে বন আইন তৈরি করেছিলেন। কিন্তু রিচার্ড গ্রেভ এই মতের বিরোধিতা করে ব্রিটিশদের সংরক্ষণনীতির মধ্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিশক্তির প্রকাশ লক্ষ্য করে বলেন যে এটি ক্রমবর্ধমান বৃক্ষচ্ছেদন ও দুর্ভিক্ষের জন্য গড়ে উঠেছিল। গ্রোভ মনে করেন, শুষ্কতার বিষয়টি (desiccationism) ব্রিটিশদের উপনিবেশগুলিতে বন সংরক্ষণে বাধ্য করেছিল। বৃক্ষছেদন ও দুর্ভিক্ষ জলৎ সম্পদের হ্রাস, মৃত্তিকা ক্ষয়, এবং উৎপাদনের বিষয়টি শুল্কতার সঙ্গে জড়িত ছিল। ইউরোপীয় ব্যবসায়ীরা এই বিষয়টিকে তাদের দৃষ্টিতে এনেছিলেন। এই সমস্ত মানুষরা শুষ্কতার বিষয়টিকে তুলে ধরে এবং বন সংরক্ষণে রাষ্ট্রীর হস্তক্ষেপের কথা বলে। এইভাবে, ব্রিটিশদের বন নীতির পেছনে সাম্রাজ্যবাদী বা ধনতান্ত্রিক লোভকে তিনি অস্বীকার করে অপরাপর বিষয়গুলিকে আলোচনার মধ্যে এনেছেন। মহেশ রঙ্গরাজন অবশ্য এই দুই ধারার থেকে সম্পূর্ণ পৃথক একটি দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করেছেন এবং বলেন যে বিষয়টির প্রতি একটি একমুখিনতা লক্ষ্য করা যায়। তাঁর মতে, শুষ্কতার ভীতিটির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ছিল এবং ঊনবিংশ শতকের প্রথম দিকে ভারতীয় বনের আকার গঠনের ক্ষেত্রে এটি যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। অজয় সাকরিয়া (Ajay Skaria) বলেন শুষ্কতার পরিপ্রেক্ষিতে বন সংরক্ষণের বিষয়টি ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের সভ্য করার মানসিকতার (Civilising mission) একটি অঙ্গ। সাকরিয়া ক্ষোভের মতকে অস্বীকার করে বলেন যে, বন সংরক্ষণের বিষয়টি ঔপনিবেশিক আধিপত্যের বিষয়ে একেবারে অজ্ঞ (innocent of colonial domination) ছিল না। ডি. ডি. ডাঙ্গায়ল (D. D. Danagwal) সাকরিয়া (Skaria) -র বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করে

দেখিয়েছেন যে, হিমালয়ের বনাঞ্চলের (উত্তরাখণ্ডে) ওপর রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে শুষ্কতার বিষয়টিকে কিভাবে তুলে ধরা হয়েছিল।

কিন্তু মূল সমস্যাটিকে বিচার করলে দেখা যায় এটি ছিল ক্ষমতা প্রয়োগের একটি অন্যতম মাধ্যম যার প্রধান লক্ষ্য ছিল শেতাঙ্গ সাহেবদের মাধ্যমে ভারতীয় উপনিবেশে আধিপত্যটাকে সুদৃঢ় করা। ব্রিটিশ শাসকদের কাছে মনে হয়েছিল জঙ্গলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে না পারলে ভারতে ঔপনিবেশিকীকরণের কাজ অসমাপ্ত থাকবে।

একটি আঘাতেই এর Forest Act এর মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার বনের ওপর তাদের দাবীকে বৈধ করে এবং শিকার করা, খাদ্য সংগ্রহ করা এবং বনে গাছ কাটা অবৈধ করে। প্রধান অপরাধী গোষ্ঠী হিসাবে আবির্ভূত হয় শিকারীরা, বন্যজন্তু আরোহণকারী এবং মৎসজীবীরা। এইভাবে বন্য অপরাধের একটি নতুন শ্রেণী তৈরি করা হয়। বনের অভ্যন্তরে মানুষের যে সমস্ত কার্যকলাপ ইতিপূর্বে গণ্য করা হত না, সেগুলি এখন রাষ্ট্রের তীক্ষ্ণ নিয়ন্ত্রণে আসে। ঔপনিবেশিক শাসন জুড়েই আইন প্রণয়নকারীরা তাদের বন্য অপরাধের পরিধিকে বৃদ্ধি করেছিল। যদিও 'বন্য অপরাধ' বিষয়ে সাধারণের ধারণা একই রকম রয়ে যায়। বনের ওপর সরকারের আধিপত্য আইনি বৈধতা পেল। নতুন বননীতি বন ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটি বোধশক্তি নিয়ে আসে। এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই যে ঔপনিবেশিক শাসকদের নিষ্ঠুর বাণিজ্যিক শোষণই বন ধ্বংসের জন্য দায়ী। প্রথমে ব্রিটিশরা বন ধ্বংস করে এবং তারপর নিজস্ব ভঙ্গি তে সেই বনের রক্ষক হয়ে দাঁড়ায়। ইংরেজরাই ছিল প্রকৃত অপহরণকারী (poacher) কিন্তু তারা দেশীয় জনগণকে এইভাবে দোষী সাব্যস্ত করে যারা বন থেকেই আশৈশবকাল থেকে উপার্জন করত। দেশীয় জনগণ তাদের বহু পুরানো বনজ অধিকার হারিয়ে ফেলে। অনেক ক্ষেত্রেই তারা সরকারের অধিকারের দাবীকে অস্বীকার করে এবং ইচ্ছা অনুসারে চাষ, গাছ কাটা, বনে আগুন জ্বালানো প্রভৃতি কাজ করতে থাকে যা তারা বহু যুগ থেকেই করে আসছিল। এইভাবে বন্য প্রাণীগুলিকে ধ্বংস করে ইউরোপীয় শিকারীরা নিজস্ব ভঙ্গিতেই সংরক্ষণে প্রবৃত্ত হয় এবং ক্রান্তীয় অরণ্য ও প্রাণীকে রোমান্টিসাইজ করতে থাকেন।

গুহ দক্ষিণ এশিয় পরিবেশের ইতিহাসকে সুবর্ণযুগ ('a golden age') হিসাবে চিহ্নিত করলেও Grove এই মতকে অস্বীকার করেছেন এবং গ্রোস প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে সাধারণের সম্পত্তির অস্তিত্ব এবং প্রচলিত বন ব্যবহারের বিষয়কে প্রশ্ন করেছেন। রঙ্গরাজন, সাকরিয়া, দামোদারান এবং অন্যান্যদের সাম্প্রতিক গবেষণা টাকের এবং নিম্নবর্গীয়দের আদি পর্বের কাজের সূত্র ধরে অগ্রসর হয়েছে। তবে আলফ্রেড ক্রসবি (Alfred Cresby) এবং ক্রিস্টোফার বেইলি (Beyly) -র রচনার দ্বারা ও এই সমস্ত পণ্ডিতরা অনেকাংশে অনুপ্রাণিত হয়েছেন। বেইলী পরিবেশবাদী ঐতিহাসিদের ঔপনিবেশিক শাসনকে জলবিভাদিকা হিসাবে চিহ্নিত করতে নিষেধ করেছেন। বরং প্রাক ঔপনিবেশিক যুগের থেকে শুরু করে যে ধারা প্রবহমান ছিল সেটি হল গুরুত্বপূর্ণ। গ্রোভ ও দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের ইতিহাসের মধ্যে পক্ষপাতিত্ব লক্ষ্য করেছেন যা 1857 খ্রীঃ পর অতিরিক্ত গুরুত্ব আরোপ করার ফলে সৃষ্ট হয়েছিল। রঙ্গরাজন এবং গ্রোভ উভয়েই অত্যন্ত সঠিকভাবে মোগলদের পতনের পর তার উত্তরসুরি রাষ্ট্রগুলি যে

বননীতি গ্রহণ করেছিল তার গুরুত্বকে তুলে ধরেছেন। গ্রোভ বিশেষ করে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন বন্যা, দুর্ভিক্ষ এবং আবহাওয়ার পরিবর্তন সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতি। বর্তমান যুগে আবহাওয়ার পরিবর্তনের প্রভাবকে এখনও যথাযথ ভাবে ব্যাখা করা সম্ভব হয়নি। এই ধরনের গবেষণার ক্ষেত্রে আমরা আগামী বছরগুলিকে দক্ষিণ এশিয়ায় পরিবেশের ইতিহাসে আরো বেশ কয়েকটি আন্দোলনকে আশা করতে পারি। গ্রোভ এবং অন্যান্য বেশ কিছু পণ্ডিতদের রচনায় এই বিষয়টি কিছুটা স্থান পেয়েছে। দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের ইতিহাসে উপনিবেশিক শাসনকে একটি জলবিভাজিকা ধরা হয়। মানব সভ্যতার অবক্ষয়ের ক্ষেত্রে ঔপনিবেশিক বা ঔপনিবেশিকোত্তর রাষ্ট্রগুলির হস্তক্ষেপ মূলক ভূমিকার একটি নৈতিবাচক প্রভাবকে অস্বীকার করা যায় না। এই ইতিহাসচর্চার নতুন মোড় তাকে নবযৌবন দান করতে সাহায্য করবে।

১০.৫.১১.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

1 Richand Grore (ed) : Nature and the Orient.

2 Mahesh Rangarajan : Fencing the Forest

3 Mahesh Rangarajan : Environmental Issues in India. (ed.) A Reader

4 Ranjan Chakrabarti : Does Environmental History Matter.

5 Ranjan Chakrabarti : Situating Environmental History

১০.৫.১১.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

1 Why way Colonial Forest Policy important ?

2 Briefty describe the history of Environment.

——————

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

পরিবেশ সমস্যা, পরিবেশের ইতিহাস ও পরিবেশ আন্দোলন : আধুনিক ভারত

COLONIAL INTERVENTION AND ENVIRONMENT AND TRIBALIZATION OF COMMUNITIES

একক - ১২

Colonial Intervention and Environment

বিন্যাসক্রম ঃ

১০.৫.১২.০ ঃ সংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান

১০.৫.১২.১ ঃ পরিবেশ সংরক্ষণে সাধারনের অংশ গ্রহণ

১০.৫.১২.২ ঃ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা (Role of International Agencies)

১০.৫.১২.৩ ঃ ভারতে প্রান্তিক পর্যায়ের বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলন (Some Grass Root Environmental Movements in India)

১০.৫.১২.৪ ঃ উড়িষ্যার পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movements in Orissa)

১০.৫.১২.৫ ঃ সম্ভাব্য গ্রন্থাবলী

১০.৫.১২.৬ ঃ প্রশ্নমালা

১০.৫.১২.৭ ঃ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

১০.৫.১২.০ ঃসংরক্ষণ ও দেশীয় জ্ঞান

সরকারী সংরক্ষণ নীতির ব্যর্থতা প্রমাণ করে যে ভারতের বিভিন্ন আঞ্চলিক সম্প্রদায়ের মধ্যে যে বস্তুতন্ত্র ও বন্যপ্রাণী সম্পকিত যে জ্ঞান ছিল সেগুলিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা হয়েছিল। এই সমস্ত জ্ঞান এবং তাদের ব্যবহারিক রীতি নীতি ও ব্যবহৃত বিভিন্ন সম্পদ ও সংরক্ষণকে তেমনভাবে নথিভুক্ত করা হয়নি। একজন বন অধিকর্তার মতানুসারে এই ধরনের জ্ঞান গুলিকে উপেক্ষা করা হয় এটি ঠিক নয়। অনেক ক্ষেত্রেই আধিকারিকরা স্থানীয় মানুষের সঙ্গে বন, জন্তু এবং পরিবেশগত উপাদানের বিষয়ে কথা বলতে বিশেষ আগ্রহী নয়। কিন্তু জৈব উপাদানের সম্পর্কে ঐতিহ্যগত জ্ঞানকে বুঝতে হবে কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের সামাজিক সাংস্কৃতিক পরিপ্রেক্ষিত থেকে এবং তার সঙ্গে পারিপার্শ্বিক উদ্ভিদ জগতের কি সম্পর্ক রয়েছে তার উপর নির্ভর করে বিভিন্ন সরকারী পরিবেশ দপ্তরের নীতির মধ্যে এই বিষয়টি পরিলক্ষিত হয় না। কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ বা নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে কোন উপজাতির সদস্যতে ডাকা হয় না। বর্তমান সময়েও বিভিন্ননীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এই দৃষ্টিভঙ্গি কাজ করে চলেছে।

অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলি সমাজের ধ্বংসসাধন এবং জীবন ও সম্পত্তির ধ্বংসসাধনের ফলে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করে সরকার যে আয় করে তাঁর সিংহভাগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। উদাহরণস্বরূপ সরকার টুরিজম থেকে যে রাজস্ব আদায় করে তার বেশীরভাগ অংশই ভারতীয় শহরগুলির মধ্যে আবদ্ধ থাকে। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংরক্ষণ নীতির প্রতি আঞ্চলিক সম্প্রদায়গুলির দৃষ্টিভঙ্গি অনেকক্ষেত্রেই বিদ্বেষপূর্ণ। দেশে বনদপ্তর এবং গ্রামের মানুষের মধ্যে সংগঠিত বহু সংঘর্ষের মাধ্যমে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 1980-র দশকের মাঝামাঝি সময়ে 222 টি সংরক্ষিত এলাকার ওপর সমীক্ষা চালিয়ে এরূপ 47 টি সংঘর্ষের উদাহরণ পাওয়া গেছে। 1990 এর দশকে এই পরিস্থিতি আরো খারাপ হয়ে উঠেছিল। এইসব সংঘর্ষের মধ্যে 1981 সালে ভারতপুর অভয়াবণ্যের কথা বলা চলে যেখানে পুলিশের গুলিতে নয়জনের মৃত্যু হয়। অতি সম্প্রতি বিশ্ব ব্যাংকের মঞ্জুরীকৃত অর্থে পুনর্বাসন কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে পুলিশ নাগরহোল বাঘ সংরক্ষণ কেন্দ্রে উপজাতিগুলির সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল সংরক্ষিত এলাকার মধ্যে উপজাতি জনসংখ্যার হ্রাস ঘটানো।

রাষ্ট্রের সংরক্ষণ নীতির বিরুদ্ধে আঞ্চলিক বিদ্বেষ অনেক ক্ষেত্রে হিংসাত্মক পদক্ষেপের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়। বন্য কাঠ এবং বিভিন্ন জন্তুর গরীব চোরা কারবারী করা, বন্য প্রাণীদের বিষ প্রয়োগ, বনে অগ্নি সংযোগ এই হিংসাত্বক কার্যকলাপের অঙ্গ হয়ে ওঠে। বাঘ মানুষের এই সংঘাতের বহিঃপ্রকাশ হল সাম্প্রতিককালে অন্ধ্র প্রদেশের ঘটনাটি যেখানে 20 টির মধ্যে 15 টি বাঘকে বিষ প্রদান করা হয়েছিল। একইভাবে বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে হিমালয়ে মধ্যবর্তী অঞ্চলে মানুষ বন দপ্তরকে সাহায্য করেছিল আগুন নেভাতে সেখানে মানুষ বর্তমানে বন দপ্তরের সঙ্গে অসহযোগিতা করেছে। প্রাকৃতিক

সম্পদের সঙ্গে এই ধরনের সম্প্রদায়গুলি বিচ্ছেদ ঘটানো হয়েছে। এই বিচ্ছেদক্ষমতা অপর একটি নিদর্শন হল গুজরাটের শুলপানেশ্বর অভয়ারণ্যের কার্যকলাপ যেখানে রাজ্য সরকার সেখানকার উপজাতিগুলিকে নিষিদ্ধ করলেও একটি পেপার মিলকে ধোঁয়া সংগ্রহের অনুমতি প্রদান করেছে। সাম্প্রতিককালে গজদন্ত ও চন্দনকাঠ শিকারী বীরাপ্পান (Veerappan) দীর্ঘ সময় ধরে আত্মগোপন করে থাকতে সমর্থ হয়েছিল এবং একথা বলা হয়ে থাকে। এই সাহায্য হয়তো ছিল জবরদস্তিমূলক। কিন্তু একথা ও বলা চলে স্থানীয়রা তাঁর কাছ থেকে রাষ্ট্রের তুলনায় অনেক বেশী সাহায্য ও সমর্থন পেয়েছিল। এর ফলে সরকারী পরিবেশ নীতি স্থানীয় মানুষকে দেশীয় জ্ঞান ব্যবহারের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েছে। অথচ সংরক্ষণের জন্য দেশীয় জ্ঞানের কোন বিকল্প নেই। বিরাপ্পানের উদাহরণ প্রমাণ করে যে, পশু শিকারের মত ঘটনাগুলি স্থানীয়দের সহযোগিতার মাধ্যমেই ঘটে। স্বভাবতই স্থানীয়দের সঙ্গে যোগাযোগ গড়ে তোলার মাধ্যমেই এগুলির নিয়ন্ত্রণ সম্ভব। রাষ্ট্রও সম্পদের প্রতি বিদ্বেষমূলক মনোভাবের পরিপ্রেক্ষিতে চোরা শিকারীরা আঞ্চলিক সমর্থন লাভ করে ও স্থানীয় জ্ঞান ব্যবহার করতে পারে।

১০.৫.১২.১ ঃ পরিবেশ সংরক্ষণে সাধারণের অংশ গ্রহণ

সমগ্র বিশ্বে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ আন্দোলন ও দিনের পরদিন শক্তি অর্জন করেছে। জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে আজ সবুজ (পরিবেশ) কর্মী আমাদের রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে এবং বিংশ শতকের প্রথম ভাগে যেমন বুদ্ধিজীবীদের কাছে মার্কসবাদ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল ঠিক একইভাবে বর্তমানে পরিবেশ সংরক্ষণের কারণটি আকর্ষণীয় ও চাকচিক্যময় হয়ে উঠেছে। বিশ্বের বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের পরিবেশ কর্মী হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে। ভারতের প্রাক্তন প্রধান মন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী, নরওয়ের জি. এইচ. ব্রাণ্ডল্যাণ্ড (G. H. Brundtland), পশ্চিম জার্মানীর প্রাক্তন চ্যান্সেলর ঊলি ব্রাণ্ডট (Willy Brandt) তানজানিয়ার প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি জুলিয়াস নায়ার (Julius Nyrere), আমেরিকার ²)ৗ ৼ ভাইস প্রেসিডেন্ট অ্যালগোরে (Al Gore)-র নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

পরিবেশ আন্দোলন অন্যান্য সামাজিক আন্দোলনের মতই শান্তি প্রতিষ্ঠা, সামাজিক মর্যাদা ও লিঙ্গ বিচার, দরিদ্র দূরীকরণ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গে সংযুক্ত আন্দোলন প্রধানত অর্থনৈতিক বৃদ্ধির জন্য মানুষের নিরন্তর সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া হিসাবেই পরিবেশ আন্দোলনের আবির্ভাব। শিল্প বিপ্লবের মূল্য হিসাবে যে সামাজিক পরিবেশের অবক্ষয় দেখা দিয়েছে তারই প্রতিক্রিয়া হল পরিবেশ আন্দোলন। প্রাকৃতিক সম্পদের ক্রমাগত ক্ষয়, পরিবেশের অবনতি, ধনী দরিদ্রের মধ্যে ব্যবধান যখন দ্রুতহারে বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে তখন এই সমস্ত বিষয়গুলিকে আর পুরোপুরিভাবে উপেক্ষা করা যায় না। আর তাই গণক্ষেত্রগুলির মানসিকতার পরিবর্তন সাধনে ব্যক্তিগতভাবে বা বেসরকারীভাবে অনেক সংগঠন বর্তমানে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে।

বিভিন্ন বেসরকারী সংগঠনগুলির ভূমিকা (Role of Non-Governmental Organization)

সমগ্র বিশ্বে NGO গুলি পরিবেশ আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাদের কার্যক্রমকে সম্প্রসারিত করেছে এবং বিভিন্ন নীতি নির্ধারণের প্রক্রিয়ায় তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সর্বজনস্বীকৃত বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হল দ্য ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ডলাইফ ফান্ড (WWF, বর্তমান নাম Worldwide Fund for Nature) ইন্টারন্যাশনাল কনজারভেশন অব নেচার (IVCN গ্রীনপিস (Greenpeace) প্রভৃতি। বিভিন্ন আঞ্চলিক সংগঠনগুলির এবং তাদের সামাজিক আন্দোলনকে উৎসাহদানের পাশাপাশি তারা মানুষের উন্নতিকে তাদের আলোচনার কেন্দ্র হিসাবে তুলে ধরেছিল। পরিবেশ বহির্ভূত বিষয়গুলি হল দরিদ্র ও প্রান্তবাসী, আদিবাসী ও দেশীয় জনগণ, মহিলা ও সমাজের অপরাপর অনুন্নত সম্প্রদায়ের মানুষ। নমনীয় এবং ঝুঁকি নিতে ইচ্ছুক হওয়াই NGO বিভিন্ন আর্থসামাজিক বিষয়গুলিকে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে পরিণত করতে পারে এবং বিভিন্ন তথ্যের মাধ্যমে এগুলি রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে। পরিবেশ এবং উন্নতির সঙ্গে সম্পর্কিত জটিল বিষয়গুলিকে জনগণের মধ্যে তারা শিক্ষার প্রসার ঘটিয়ে তুলে ধরার চেষ্টা করে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সহানুভূতিশীল বিষয়গুলি নিয়েও তারা আলোচনা করে। তাদের কার্যক্রমের অপরিসীম মূল্যের কারণেই 1987 খ্রীঃ UN অনুমোদিত Brundtland Commission তাদের রিপোর্টে উল্লেখ করে যে, জাতীয় সরকার NGO গুলিকে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ নথি ও তথ্য সরবরাহের পাশাপাশি পরিবেশের প্রভাব সম্পর্কে বিভিন্ন আলোচনায় এবং নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে NGO-র কথা অনুসরণ করে চলবে।

1972 খ্রীঃ স্টকহোম কনফারেন্স (Stockholm Conference) -এর সময় থেকে UN এর প্রতি বৈঠকে NGO গুলি তাদের পূর্ণশক্তি নিয়ে যোগদান করে এটি থেকেই তার গুরুত্ব ও প্রভাব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। উন্নতি সংক্রান্ত নীতির ক্ষেত্রে এটি একটি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য। স্বাধীন হওয়ায় NGO দরিদ্র, দূর্বল এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। বর্তমানে বিভিন্ন দাতা সংস্থা উন্নতিমূলক কাজকর্মে অর্থ প্রদানের সময় NGO গুলিকে পরিসম্পর্ক হিসাবে নিয়োগ করে।

NGO মধ্যবিত্ত শ্রেণীকে নিয়ে গড়ে ওঠে এবং উন্নত সত্তর এবং উন্নয়নশীল দক্ষিণের মধ্যে সহাবস্থান করে। এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী শিক্ষিত এবং নগরবাসী যদি ও তারা সমাজকল্যাণের পক্ষপাতী এবং একেবারে নিম্নস্তরে মানুষ তাদের আলোচনায় স্থান পায় তথাপি তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থান, মধ্যবিত্ত মূল্যবোধ তাদের কাজের ক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হয়ে দাড়িয়েছে। একইভাবে ভিন্ন পরিপ্রেক্ষিত (background) থেকে আসায় NGO গুলি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির ব্যপারে পৃথক দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করে এবং উন্নতির তুলনায় পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দেওয়া সত্বে ও উন্নতদেশগুলিকে বেশী প্রাধান্য দেয়। সাধারণভাবে তারা নিজেদের দেশের সামাজিক পরিকাঠামোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে পারেনা। আবার দেশবাসীর ভোগের ধরন ও জীবন ধারাকে ও

পরিবর্তন করতে পারে না। উন্নত দেশগুলির NGO -র কাছে উন্নয়ন, সামাজিক এবং বিশ্বব্যাপী সাম্য, গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে দাড়িয়েছে।

১০.৫.১২.২ ঃ আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলির ভূমিকা (Role of International Agencies)

UNO-র মত আন্তর্জাতিক সংস্থা এবং বিশ্ব ব্যাঙ্কের মত এর শাখা প্রশাখাগুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবেশ আন্দোলনে সাহায্য করেছিল। 1972 খ্রীঃ 5-16 জুন স্টকহোমের সুইডিশ ক্যাপিটালে ইউ.এন.কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট (UNCHE) নামে যে সম্মেলন হয়েছিল সেখানে পুরোপুরিভাবে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয় আলোচিত হয়েছিল। পূর্ব জার্মানীকে এই সম্মেলনে না রাখায় প্রতিবাদ হিসাবে রাশিয়া ও তার মিত্ররা ব্যতীত মোট 112 টি দেশ এই সম্মেলনে যোগদান করেছিল। সম্মেলন শেষে এর প্রতিনিধিরা বিশ্বকে পরিস্কার রাখতে, বন্যা, ভূমিকম্প ও সাইক্লোনের মত বিষয়গুলির ক্ষেত্রে সংকেত ব্যবহার করতে বজ্য পদার্থ সমুদ্রে না ফেলতে এবং আরো বহুবিধ প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করেছিল।

নরওয়ের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী Ms Gro Harlem Brundtland -এর সভাপতিত্বে UN World Commission for Environment and Development প্রতিষ্ঠা করে। 1983 খ্রীঃ এই কমিশন তার কাজ শুরু করে এবং 1987 তে Our Common Future নামে একটি রিপোর্ট পেশ করে। এই রিপোর্ট স্থিতিশীল উন্নয়ন, সম্পদের সুষম বন্টন, গণতন্ত্র, উন্নয়ন এবং পরিবেশের সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন নীতি আনয়দের ক্ষেত্রে মহিলা ও দেশীয় মানুষদের নীতি নির্ধারণের কমিটিতে নিয়ে আসা প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরে। তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির দারিদ্রের কারণকে রিপোর্ট চিহ্নিত করে। 1980 সালের Brandt Commission Report এবং 1992 সালে South Commission Report একই বক্তব্য পেশ করে। এই সমস্ত রিপোর্টগুলি বিশ্বব্যাপী দারিদ্রকে পরিবেশ সংরক্ষণ প্রচেষ্টার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গে পরিণত করতে চেয়েছিল। এবং দরিদ্র দেশগুলির উন্নয়নের ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে বলে তারা মনে করেছিল। এই রিপোর্টগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়কে তুলে ধরেছিল যার ওপর পরিবেশ আন্দোলনগুলি গড়ে উঠেছিল। এবং পরিবেশভিত্তিক বিভিন্ন গোষ্ঠীগুলি অনুপ্রেরণার উৎস পেয়েছিল। ইতিমধ্যে 1992 খ্রীঃ ব্রাজিলের রিও তে UN এর পরিবেশ সংক্রান্ত দ্বিতীয় কনফারেন্স UN Conference on Environment and Development (UNCED) অনুষ্ঠিত হয়। যেখানে সর্ববিধ উন্নতি এবং পরিবেশ সংরক্ষণ সংক্রান্ত বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্ট পেশ করা হয়। তৃতীয় বিশ্বের প্রতিনিধিরা জোরপূর্বকভাবে তাদের বক্তব্য পেশ করে। 1972 ও 1992 এই দুই বৈঠকেই NGO একটি গুরুত্ব পূর্ণভূমিকা পালন করে।

ইউনাইটেড নেশনস এনভায়রনমেন্ট প্রোগ্রাম (UNEP) এর পিরয়ডিক ওয়াল্ড রিপোর্ট, ইউনাইটেড নেশনস ডেভলপমেন্ট প্রোগ্রাম, (UNDP), বিশ্ব ব্যাঙ্ক, পরিবেশ, বিশ্ব বাণিজ্য, সমাজ

কল্যাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে পরিসংখ্যান নির্ভর যে তথ্যগুলি তুলে ধরেছিল তার ওপর ভিত্তি করেই পরিবেশবিদরা তাদের বক্তব্যগুলিকে তুলে ধরেছিলেন।

১০.৫.১২.৩ ঃ ভারতে প্রান্তিক পর্যায়ের বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলন (Some Grass Root Environmental Movements in India)

ভারতীয় দর্শন প্রকৃতি ও তার সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরেছে। ঋকবেদের অনেকগুলি মন্ত্রই প্রকৃতির উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের অন্যতম শক্তি গান্ধীবাদ (Gandhism) সাধারণ জীবনের কথা বলেছিল। গান্ধী আর্থিক সমৃদ্ধির যে মডেল তুলে ধরেছিলেন তা ছিল স্থিতিশীল উন্নয়নেরই মডেল যার কথা পরিবেশবিদরা বর্তমানে তুলে ধরেন। কিন্তু স্বাধীনতার পর আমাদের নেতা ও নীতি নির্ধারকরা দেশের আর্থিক সমৃদ্ধির ক্ষেত্রে সর্বাধিক পরিমাণে সম্পদ শোষণ এই পশ্চিমী মডেলকে তুলে ধরেছেন। বেশ কিছু পশ্চিমী চিন্তাবিদ পশ্চিমী ধারাকে অনুসরণ না করার কথা বলেছেন। কিন্তু তাদের এই বক্তব্যকে অনেক সময় অনুন্নত করে রাখার মানসিকতা বলে সমালোচনা করা হয়। গান্ধীবাদীদের বক্তব্যকে ও অনেক সময় সমালোচনা করা হয়।

1970-র দশক থেকে অবস্থার পরিবর্তন হয় যখন 1972 খ্রীঃ স্টকহোমে মিসেস ইন্দিরা গান্ধী ইউনাইটেড নেশনস কনফারেন্স অন হিউম্যান এনভায়রণমেন্টে (UNCHE) যোগদান করেন। তাঁর বক্তব্য উচ্চস্বরে প্রশংসিত হয়েছিল। তিনি ঐ বছর National Committee for Environmental Planing and Cooperation (NCEPC) প্রতিষ্ঠা করেন যা পরিবেশ সংক্রান্ত সরকারের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে পরামর্শ দিত এবং বিভিন্ন উন্নয়নশীল কাজের ক্ষেত্রে পরিবেশগত তাৎপর্যের মূল্যায়ন করত। পার্লামেন্টে এই সময় বেশ কিছু পরিবেশ সংক্রান্ত আইন এবং সাংবিধানিক সংস্কার পাশ করা হয়েছিল। UN কনফারেন্সের প্রথম বছরেই Wildlife Act, 1972 পাশ করা হয়েছিল। এই ক্ষেত্রে বলা চলে, ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন একজন উল্লেখযোগ্য পরিবেশ কর্মী এবং যার জন্য তিনি সম্মানজনক International Union of Conservation of Nature পুরস্কার লাভ করেছিলেন।

সাম্প্রতিককালে তথাকথিত উন্নতিমূলক কার্যকলাপের বিরুদ্ধেপ্রান্তীয় স্তরে বেশ কিছু পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন গড়ে উঠেছে। হিমালয়ের পাদদেশে গাছ ধ্বংসের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদী নেতা সুন্দরলাল বহুগুনার (Sunderal Bahuguna) নেতৃত্বে যে চিপকো আন্দোলন (Chipko Movrement) সংগঠিত ও সাফল্য লাভ করেছিল তা আজ সর্বজনবিদিত। হিন্দী ভাষায় চিপকো শব্দের অর্থ হল 'আলিঙ্গন করা' (embracing) চিপকো আন্দোলনে মহিলারা গাছগুলিতে জড়িয়ে ধরে ব্যবসাদারদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন। ভারতবর্ষে এই আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক ভিত্তি রয়েছে।

রাজস্থানের বিষ্ণোই (Bishnoi) সম্প্রদায়ের মধ্যে গাছকে রক্ষা করা এবং প্রাণীদের ভালবাসার

একটি ঐতিহ্য রয়েছে। পরিবেশ সংরক্ষণে গাছের গুরুত্বকে তারা জানত। 1731 খ্রীঃ Anita Bai এর নেতৃত্বে বিষ্ণোই মহিলারা প্রাসাদ নির্মাণের উদ্দেশ্যে মহারাজার কর্মচারীদের গাছ কাটার হাত থেকে গাছকে রক্ষা করেছিল গাছকে জড়িয়ে ধরে। মহারাজার সশস্ত্র কর্মীদের হাতে অনিতা বাঈ, তাঁর স্বামী এবং তিন কন্যাসহ 363 জন নিহত হয়। অনিতা বাঈ ও তাঁর অনুগামীদের এই আত্মোৎসর্গ পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাসে পথপ্রদর্শকের ঘটনা হিসাবে কাজ করেছিল।

1972 সালে উত্তর প্রদেশের পার্বত্য এলাকায় দালালদের সশস্ত্র কর্মচারীরা Advani গ্রামের Bachni Devi এবং Rani গ্রামের Gouri Devi দ্বারা বিতাড়িত হয়। 1986 খ্রীঃ দুন উপত্যাকায় (Doon Vally) Nahikala গ্রামে চুমন দেবীর নেতৃত্বে অনুরূপ আন্দোলন সংগঠিত হয়।

পরিবেশ আন্দোলনের আর একটি উদাহরণ হল কেরালায় Silent Vally hydro electric project এর বিরুদ্ধে। কেরালার সরকারী বিদ্যুতের ঘাটতি মেটাতে Sitent Valley র গভীর অরণ্যের পাশে Hydroelectric project তৈরীর পরিকল্পনা করে। এই অরণ্যটিই একমাত্র কেরালায় টিকে ছিল। পরিবেশবিদরা এই পরিকল্পনার বিরোধিতা করে হাইকোর্টে মামলা করলেও তারা হেরে যায়। শেষ পর্যন্ত ইন্দিরা গান্ধীর হস্তক্ষেপে পরিকল্পনাটি বন্ধ হয়।

নর্মদা নদীর ওপর প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের বিরুদ্ধে মেধা পাটেকার এক পরিবেশ আন্দোলন গড়ে তোলেন। তিনি নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন গড়ে তোলেন স্থানীয় আদিবাসীদের সহায়তা নিয়ে যাদের জমি এর ফলে জলমগ্ন হয়ে পড়ছিল। যদিও তিনি প্রকল্পটিকে বন্ধ করতে পুরোপুরি সফল হননি, তথাপি বাঁধটির উচ্চতা কমাতে সক্ষম হয়েছিল। ফলে জলমগ্ন এলাকা হ্রাস পেয়েছিল। Centre for Science and Enviroment এর Anil Agarwal ও তাঁর অনুগামীরা Citizens Reports এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম ভারতের পরিবেশ সংক্রান্ত সমস্যাগুলিকে সর্বসাধারণের সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। 1972 সালে এর প্রথম রিপোর্ট প্রকাশিত হয়। এই রিপোর্টটি ভারতে পরিবেশভিত্তিক জার্নালিজমের ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক হিসাবে কাজ করেছিল। Vandana Shiva তাঁর রচনার মাধ্যমে উন্নতিশীল মডেলকে প্রশ্ন তুলেছেন এবং তাঁর মতে, এটি অভিজাততান্ত্রিক ও দরিদ্র বিরোধী। তিনি একই সঙ্গে বিশ্ব ব্যাঙ্ক মজুরীকৃত বিভিন্ন প্রকল্পগুলির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন কারণ এগুলি তাঁর মতে, দান গ্রহীতা দেশের তুলনায় দাতা দেশের স্বার্থই যেখানে গুরুত্ব পায়। তিনি একই সঙ্গে সফলভাবে নারীবাদী আন্দোলনের সঙ্গে পরিবেশভিত্তিক আন্দোলনকে অবিচ্ছেদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি ছিলেন একজন আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব এবং তিনি Alternate Nobel Prize-এ ভূষিত হয়েছিলেন।

Maneka Gandhi ও ছিলেন একজন পরিবেশভিত্তিক সাংবাদিক। তাঁর রচনা এবং টি. ভি. প্রোগ্রাম ভীষণ জনপ্রিয় এবং এর মাধ্যমে তিনি---- মানুষ এক ঐতিহাসিক আন্দোলনে পরিবেশ সংরক্ষণের কারণ, প্রাণীদের প্রতি ভালবাসা ও দয়া প্রদর্শন, নিরামিষভোজন প্রভৃতি বিষয়কে তুলে ধরেছেন।

১০.৫.১২.৪ ঃ উড়িষ্যার পরিবেশ আন্দোলন (Environmental Movements in Orissa)

উড়িষ্যাতে বেশ কিছু সাফল্যের ইতিহাস রয়েছে। প্রয়াত স্বাধীনতা সংগ্রামী Shradhakar Supkar, কোর্টে একটি পিটিশন দেন Ib ও Mahanandi-র দূষণের জন্য, যা 1950 এর দশকে Brajarajnagar এর Orient Paper Mill এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল। তৎকালীন সময়ে হীরাকুঁদ বাঁধ ছিল না। Ib নদীর দূষণ Sambalpur থেকে নিম্নদিকে গিয়ে Mahanandi-র সঙ্গে মিশেছিল। তাই ওড়িষ্যা সরকার এর প্রতিরোধের চেষ্টা করে এবং জলের দূষণ কমাবার চেষ্টা করে। Orissa River Water Act 1953 জলের, দূষণ নিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রথম পদক্ষেপ। কিন্তু এই Act এর বাস্তবায়িত করার কোন রাজনৈতিক বা প্রশাসনিক সদিচ্ছা ছিল না। ফলে ওড়িষ্যায় জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়নি। এই Act নতুন রূপ পেয়েছে 1974 সালে Water Act এর মাধ্যমে (Prevention and Controll of Pollution)

1991-92 সালে ডাটা কোম্পানীর দ্বারা Chilka farm তৈরীর প্রচেষ্টা Sri Banka Bihari Das এবং অপরাপর সংগঠনের নেতৃত্বে। ওড়িষ্যা কৃষক মহাসংঘ প্রতিরোধের চেষ্টা করে। এই আন্দোলনের কারণে শেষ পর্যন্ত এই প্রকল্প বাতিল হয়। শ্রী দাসের নেতৃত্বে অনুরূপ বহু আন্দোলন উন্নতিশীল প্রজেক্টের বিরুদ্ধে গড়ে উঠেছিল যা তার মতে, পরিবেশভিত্তিক সাম্রাজ্যবাদ (environment aggressive)

আদিবাসী এবং অনাদিবাসীদের নিয়ে সংগঠিত Gandhamardhan yuba Parishad এর নেতৃত্বে পশ্চিম ওড়িষ্যার মানুষ এক ঐতিহাসিক আন্দোলনে সামিল হয় যার মাধ্যমে তারা Gandhamardhan Hills এ বক্সাইট খনন কার্য সরকারকে বন্ধ করতে বাধ্য করে। এই পার্বত্য এলাকায় বহু গাছ ছিল যেগুলি ওষুধ তৈরীতে ব্যবহৃত হত। কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত প্রকল্পটি বাতিল ঘোষিত হওয়াই আন্দোলনে ভাঁটা পড়ে। বক্সাইট প্রকল্প ব্যতিরেকে Gandhamardhan Hills-এ বৃক্ষছেদন চলতে থাকে। পশ্চিম ওড়িষ্যার মানুষ বনছেদনের ফলে কালাহান্দি ও কেলানগির এই দুই অবিভক্ত জেলার মানুষের অবস্থাকে উপলব্ধি করে। শেষ পর্যন্ত সম্বলপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে Orissa Environment Consciousness Society (OECS) স্থাপিত হয়। পশ্চিমী জেলাতে পরিবেশ সম্পর্কিত সচেতনতা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে Jyoti Vihar তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

শ্রী প্রসন্ন কুমার দাসের নেতৃত্বে Orissa Environment Society (OFS) যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে বাধ্য করে ময়ূরভঞ্জের সিমলিপাল বনকে সংরক্ষিত এলাকা হিসাবে ঘোষণা করতে, এটা ছিল দেশের পঞ্চদশ biosphere reserve এবং রাজ্যে প্রথম। (OFS) এটি কোন প্রকার আন্দোলন ছাড়াই, শুধু দলগত ভাবে এটি করতে সমর্থ হয়েছিল। এটা যুক্তরাষ্ট্রীয় সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য প্রদান করেছিল। শেষ পর্যন্ত গজপতি জেলায় মহেন্দ্রগিরি পর্বতের সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের ইতিহাস অসম্পূর্ণ থেকে যাবে যদি না উচ্চ বিচারালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উল্লেখ করা না হয়। বিভিন্ন পরিবেশ সংক্রান্ত নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে সুপ্রিম কোর্টে রায় ও বিচার তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

১০.৫.১২.৫ ঃ সম্ভাব্য গ্রন্থাবলী

(1) Richand Grore (ed) : Nature and the Orient.

(2) Mahesh Rangarajan : Fencing the Forest

(3) Mahesh Rangarajan : Environmental Issues in India. (ed.) A Reader

(4) Ranjan Chakrabarti : Does Environmental History Matter.

(5) Ranjan Chakrabarti : Situating Environmental History

১০.৫.১২.৬ ঃ প্রশ্নমালা

(১) বর্তমান বিশ্বের পরিবেশ বিতর্ক সম্পর্কে যা জান লেখ। অতীতে কি এই বিতর্ক ছিল না?

(২) পরিবেশের ইতিহাস কি? কিভাবে এর উৎপত্তি হয়?

(৩) ঔপনিবেশিক অরণ্যনীতির উপর একটি প্রবন্ধ লেখ।

(৪) দক্ষিণ এশিয়ার পরিবেশের ইতিহাসের মূল বিতর্ক সম্পর্কে মন্তব্য কর।

(৫) ভারতবর্ষের পরিবেশ আন্দোলনের উপর সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ রচনা কর।

১০.৫.১২.৭ ঃ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলী

(১) উড়িষ্যার পরিবেশ আন্দোলনের উপর একটি টীকা লেখ।

(২) নর্মদা আন্দোলনের উৎপত্তি ও গতিপ্রকৃতি আলোচনা কর।

(৩) Club of Rome Report কি?

(৪) পরিবেশের ইতিহাসের উৎপত্তি আলোচনা কর।

(৫) ঔপনিবেশিক অরণ্য আইন প্রবর্তনের পেছনে ঔপনিবেশিক সরকারের উদ্দেশ্য কি ছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

COLONIAL INTERVENTION AND ENVIRONMENT AND TRIBALIZATION OF COMMUNITIES

একক - ১৩

Tribalisation of Communities

বিন্যাসক্রম :

১০.৫.১৩.০ : উদ্দেশ্য

১০.৫.১৩.১ : ভূমিকা

১০.৫.১৩.২ : উপজাতির ধারণা

১০.৫.১৩.৩ : ভারতের উপজাতি

১০.৫.১৩.৪ : উপজাতি থেকে অ-উপজাতি

১০.৫.১৩.৫ : পুন-উপজাতিকরণ

১০.৫.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (Suggested Readings)

১০.৫.১৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Assignments)

১০.৫.১৩.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

১। উপজাতি বলতে কি বোঝায়?

২। ভারতের বিভিন্ন উপজাতি।

৩। কিভাবে উপজাতি থেকে অ-উপজাতি এবং অ-উপজাতি থেকে পুনঃ উপজাতিকরণ ঘটছে।

১০.৫.১৩.১ : ভূমিকা

বহুজাতি, ভাষা, ধর্ম ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র সম্পন্ন ভারতীয় সমাজে বিভিন্ন জনগোষ্ঠির সহাবস্থান নিঃসন্দেহে এক বিস্ময়ের বিষয়। প্রতিটি সম্প্রদায়রই কিছু না কিছু নিজস্বতা আছে। এই নিজস্বতার চরিত্র অঞ্চল ও ভৌগলিক পরিবেশের উপর অনেকটাই নির্ভরশীল। আবার এই সম্প্রদায় (Community) গুলির আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের ধারা অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সামাজিক সাংস্কৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে গভীর ভাবে সম্পর্কযুক্ত। তাই তথাকথিত মূল ভারতীয় জনগোষ্ঠির সংস্কৃতির (Main Stream Indian culture) যুগপৎ সমান্তরাল ও আড়াআড়ি ভাবে প্রবহমান উপজাতিয় সংস্কৃতি (Tribalisation Culture) ও নানাবিধ কারণে ক্রমাগত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে।

রাজনৈতিক কারণে উপজাতিয় সমাজ ব্যবস্থায় অ-উপজাতীয় (Non-tribal) রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের (Political Institutions) উৎপত্তি ও বিকাশ উপজাতীয় সমাজের ক্ষমতাগত শ্রেণীবিভাজন (Power lurarchy) কে পরিবর্তিত করে অ-উপজাতি স্বত্তায় নিয়ে গেছে সরকার। একইভাবে অর্থনৈতিক বিবর্তনের ধারা উপজাতীয় অর্থনৈতিক উৎপাদন ব্যবস্থায় (Tribal mode of praduction) অউপজাতির উৎপাদন ব্যবস্থা (Non-tribal mode of production) বা আধুনিক অর্থনীতির (advanced economy) বৈশিষ্ট্য সমূহের ঘটেছে যা উপজাতি সমাজের অ-উপজাতিকরণ (de-tribalisation) প্রক্রিয়াকে মজবুত করেছে। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজনে উপজাতি। আদিবাসী অধ্যুষিত অঞ্চলে বিশেষ করে পাহাড়, অরণ্য ও নদীর প্রাকৃতিক সম্পদকে শোষণ করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বহুমুখী উন্নয়নমূলক প্রকল্প (Multi-purpose development project) উপজাতি স্বত্তার পরিবর্তনে শক্তিসঞ্চর করেছে।

উপজাতি স্বত্তার অ-উপজাতি স্বত্তায় রূপান্তরের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য অনুঘটক হল সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। ভারতীয় উপজাতীয় জনগোষ্ঠির প্রধানত অ-উপজাতিয় ধর্মীয় সংস্কৃতি (Non-tribal ruligious culture) গ্রহণ করার ফলে তাদের ভাষাগত, ধর্মগত, সামাজিক আচার, আচরণ,

জীবনশৈলী, খাদ্যাভ্যাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে ব্যপক পরিবর্তন নিয়ে এসেছে। মূলত হিন্দু ও খ্রীষ্টান এবং সামান্য পরিমানে ইসলাম ধর্মীয় সংস্কৃতি গ্রহণ করায় ঐ সমস্ত ধর্মীয় সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। ফলে তাদের উপজাতীয় পরিচিতি (Tribal identity)-র রূপান্তর (transformation) ঘটেছে। ধর্মীয় সংস্কৃতির পাশাপাশি আধুনিক শিক্ষার বিস্তার উপজাতী সমূহকে অ-উপজাতীয় স্বত্তয়ে বিকশিত হওয়ার পথকে আরো মশৃন করেছে।

স্বাভাবিক ভাবেই উপজাতির অ-উপজাতিকরণ (de-tribalization) প্রক্রিয়া সমাজ বিজ্ঞানের আলোচনার বিষয়ে পরিনত হয়েছে মূলত উপনিবেশিক আমল থেকে। পাশাপাশি ঔপনিবেশিক উৎপাদন ব্যবস্থা (Colonial mode of production)-র বিকাশের জন্য উপজাতি শ্রমিক শক্তির (Tribal labour force) স্থানান্তর করণ উপজাতি বসতির (Tribal settlement) স্থানচ্যুতি (displacement) ঘটিয়েছে। এটা একদিকে যেমন ঔপনিবেশিক অর্থনীতির অবশ্য প্রসবীয় সন্তান বিশেষত বাগিচা শিল্প ও খনি শিল্পের বিকাশ ঘটিয়েছে অন্যদিকে তেমনি উপজাতি সমাজের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে গভীর পরিবর্তন তথা সংকটের সূচনা করেছে। অন্যদিকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারে রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনে উপজাতি সমাজের প্রতি অহস্তক্ষেপ নীতি (policy of non-interference) ও উপজাতি সমাজকে বিচ্ছিন্ন রাখার নীতি (policy of seclusion) উপজাতি স্বত্তার অস্তিত্ব বজায় রাখার ক্ষেত্রে সহযোগী হয়েছিল। কিন্তু পিছিয়ে পড়া সামাজিক শ্রেণী (Backward class/Depressed caste/Depressed Class/1936 থেকে তপজাতি উপজাতি Scheduled Tribe) হিসাবে উপজাতি সম্প্রদায় সমূহের জন্য সরকারের বিশেষ জনকল্যাণমূলক ব্যবস্থা উপজাতি সমাজের কে দ্রুত অ-উপজাতি করে তুলছে।

কিন্তু স্বাধীনোত্তর কালে প্রাকৃতির অপক্ষয় (environmental degradation) ও উন্নয়নমূলক কার্যকলাপের অশুভ প্রভাব (désrceptive impact) অ-উপজাতিয় উৎপাদন ব্যবস্থা (Non-tribal mode of production) বা আধুনিক উৎপাদন ব্যবস্থা গ্রহণ করা উপজাতি সমাজের উদ্বৃত্ত উৎপাদন (surplus generation) করার ক্ষমতাকে নষ্ট করে দিচ্ছে। ফলে ভারতের বিভিন্ন উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চলে (Tribal dominated V and VI Schedule area) উপজাতীয় জনগোষ্ঠী উদ্ধৃত্ত-উৎপাদনে অক্ষম subsistence economy -র মধ্য দিয়ে জীবন যাপন করছে। এটাকে ক্ষুদ্র দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পুনঃ উপজাতিকরণ (re-tribalisation) বলা যায়। পাশাপাশি অ-উপজাতি হওয়া পূর্বতন উপজাতি সমূহের অনেকগুলিই তপশিলি উপজাতি (scheduled tribe) হিসাবে সরকারী সুযোগ সুবিধা ভোগ করার জন্য নিজেদের ST হিসাবে চিহ্নিত করার আন্দোলন শুরু করেছে। ভারতীয় জনগোষ্ঠির এই ধরনের পশ্চাৎগতি (downward social mobility)-ও একধরনের পুনঃ উপজাতিকরণ।

এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে উপজাতির অ-উপজাতিকরণ (de-tribalisation) এবং অ-উপজাতিয় স্বত্তার পুনঃউপজাতি করণ (tribalization) নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি 'উপজাতি' ধারণার বিতর্ক ও তাদের আভ্যন্তরীন পরিবর্তনের সামাজিক শক্তি (social force) গুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে।

১০.৫.১৩.২ : উপজাতির ধারণা (CONCEPT OF TRIBE)

কোন নির্দিষ্ট ছকের মধ্যে উপজাতি সমাজকে সংজ্ঞায়িত করা অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভারত তথা বিভিন্ন দেশে উপজাতিদের নিয়ে সমাজ বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল হিসাবে পাওয়া জ্ঞান উপজাতির সংজ্ঞা নির্ণয়কে আরো কঠিন করে তুলেছে। এই গবেষণা লব্ধ জ্ঞান থেকে উপজাতি সমাজের কতগুলি সাধারণ বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করেছেন নৃতাত্ত্বিক (anthrapalogists) ও সমাজ বৈজ্ঞানিকগণ। এই বৈশিষ্ট্যগুলোর সাহায্যে কোন উপজাতি সমাজকে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

Dictionary of Sociology and Related science

এ উপজাতি (Tribe)কে 'a social group usually comprising a number sibs, bands, villages or other sub-groups, which is normally characterised by the possession of a territory, a distinct dialect, a hemogenous and distinctive culture and either a unified political organisation or at least some sense of common solidarity as against outsiders' হিসাবে ব্যাখ্যা করেছেন John Peter Murdok. অন্যদিকে R. Piddington-এর মতে উপজাতি হচ্ছে নির্দিষ্ট ভুখন্ডে বা অঞ্চলে বসবাসকারী বহু সামাজিক সংগঠনের সমন্বয়ে গঠিত একটি সামাজিক স্বত্তা যাদের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যসহ সামাজিক সংঘবদ্ধতা আছে। বৃহত্তর অর্থে উপজাতি হচ্ছে a social group usually with a definite area and deleact, cultural homogeneity and unifying social organisation. It can include several subgroups such as clans and sibs. The families or groups are linked through blood ties, religious, social and cultural functions.

তবে অনেক সমাজতত্ববিদই উপজাতির এই সরলীকৃত সংজ্ঞা গ্রহণ করতে রাজী নন। বিশেষ করে ভারতের মত সাংস্কৃতিক বহুত্বতা (Cultural Plurality)-র দেশে মূল সংস্কৃতি ও উপজাতির মত প্রান্তিক সংস্কৃতির সহাবস্থান সাংস্কৃতিক আদান প্রদান (cultural exchange) এর ধারাকে সচল রাখে। ফলে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রবাহমানতা (continuity of cultural change) উপজাতি সমাজকে সদা পরিবর্তনশীল সামাজিক পরিচিতি (a social group in continuous transition) হিসাবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। উপজাতির সংজ্ঞা নিয়ে বিতর্ক ও বহুত্বতা থাকলেও International Labour Organisation (ILO) তার 169th Convention, Article এ উপজাতি সম্পর্কে নিম্নেবর্ণিত সংজ্ঞা দিয়েছে —

Tribal people in independent countries are those whose social, cultural and economic conditions distinguish them from other sections of national community and whose statues is regulated wholely or partially by their own customs or traditions or by special laws or regulation.

1989 এ ILO এই সংজ্ঞাটি রাষ্ট্র সংঘ United Nations Organization) ও গ্রহণ করেছে। পরবর্তীকালে UNO তত্বাবধানে Human Rights Commission-এর দ্বারা গঠিত Working Group on Indigenous Population আরো বিস্তৃতভাবে উপজাতির সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে নিম্ন লিখিতভাবে —

They are those tribal and semitribal papulation that are regarded as having their descent from the population which inhabited the country on the geographical region to which the country belongs, at the time of the conquest or colonized by Europe. They are in addition are also those who, irrespective of their legal status, live more in conformity with their social, economic and cultural institution than with the institute of nation to which they belong. অন্যদিকে Semi-tribal বলতে তাদেরকে বোঝানো হয়েছে যারা are in the process of lessing their indentity but not yet integrated in the national community.

সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে উপজাতি বা আদিবাসীর ধারণায় কতগুলি বৈশিষ্ট্য রয়েছে। প্রথমত আদিবাসীরা ঔপনিবেশিক শাসন বা বাইরের কোন শক্তির দ্বারা পরাজিত হওয়ার আগে থেকেই নির্দিষ্ট অঞ্চলে বসবাস করছে। দ্বিতীয় বাইরের শক্তির কাছে পরাজিত বা ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে তারা প্রান্তিক জনগোষ্ঠি (Marginalized communuties) তে পরিণত হয়েছে। তৃতীয়ত এই সমস্ত জনগোষ্ঠিগুলি মূলত নিজেদের মধ্যে প্রচলিত সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ও প্রথা সমূহের পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হয়।

১০.৫.১৩.৩ : ভারতের উপজাতি

ভারতের Anthropological survey of India তার ‘People of India Project এর গবেষণায় মোট 461টি সম্প্রদায়কে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করেছে। 1991 সালের আদমসুমারী অনুযায়ী ভারতের মোট জনসংখ্যার 8.08% হল আদিবাসী জনগোষ্ঠী। 1971 ও 1981 সালে এদের জনসংখ্যা ছিল ভারতের মোট জনসংখ্যার যথাক্রমে 6.94% ও 7.85% । এই জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণ শুধুমাত্র উপজাতি জনগোষ্ঠির জন্মহার বৃদ্ধি বা মৃত্যুহার হ্রাসের দ্বারা ব্যাখ্যা করা যাবে না। এর সঙ্গে যুক্ত আছে বিভিন্ন জনগোষ্ঠি নতুন করে নিজেদের উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার আন্দোলন যাকে Re-tribalization হিসাবে চিহ্নিত করার যেতে পারে।

ভারতের কোন জনগোষ্ঠিকে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করার ক্ষেত্রে কতগুলো জটিলতা আছে।

প্রথমত অর্থনৈতিক ভাবে এই জনগোষ্ঠির জীবন যাত্রায় অদ্ভুত বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। এখানে শিকারী ও ফলমূল সংগ্রহকারী (hunters and Food gatherers) (জারওয়া, বিরহোর, চেঞ্চু)র উপজাতির পাশাপাশি পশুপালনকারী (গুজ্জর, বাফরওয়াল) ও জুমচাষী ও (Shifting cultivators) উত্তর-পূর্ব ভারত, দক্ষিণ উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, ছত্রিশগড়) রয়েছে। তাছাড়া আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতিতে উদ্ভাষিত জনগোষ্ঠি ও ব্যক্তিও রয়েছে। তাসত্ত্বেও ভারতের উপজাতি সমূহের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। (১) অঞ্চলের সঙ্গে সম্প্রদায়ের সংযোগ, (২) নির্দিষ্ট ভাষা, (৩) সাধারণ (simple) ও স্বয়; সম্পূর্ণ (self-sufficient) অর্থনীতি, ও (৪) প্রথাগত স্বায়ও-শাসনের প্রথা ইত্যাদি। তবে ভারতের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তন তথা বিশ্বায়নের প্রভাবে ‘উপজাতিয় সমাজের পরিবর্তনও হচ্ছে দ্রুতগতিতে। তাছাড়া আছে কতগুলি প্রথাগত শক্তি যা উপজাতি সমূহকে অ-উপজাতি স্বত্মায় (Non-tribal identity) পরিণত করেছে বা করে চলেছে যা পরবর্তী অংশে আলোচনা করা হল।

১০.৫.১৩.৪ : উপজাতি থেকে অ-উপজাতি

উপজাতি সমূহের অ-উপজাতি স্বত্তায় রূপান্তরের 2ǃ ëûঅতি প্রাচীনকাল থেকেই প্রবাহমান যার প্রধান পরিচালিকা শক্তিসমূহ হল (ক) রাজনৈতিক (খ) আর্থ-সামাজিক (গ) সাংস্কৃতিক ইত্যাদি। উপজাতিয় জনগোষ্ঠীর পরিচিতি পরিবর্তনের কারণ হিসাবে রাজনৈতিক ব্যবস্থার পরিবর্তন অতি-প্রাচীন কাল থেকেই অত্যন্ত কার্যকরী। বিশেষ করে উপজাতি গোষ্ঠীর দ্বারা রাজ্য গঠন 2ǃ ëûû(State-formation process) উপজাতিয় স্বত্ত্বার অ-উপজাতিকরণে (Detribalization/non-tribalization) শক্তি সঞ্চার করেছিল। কারণ উপজাতিয় সমাজ পরিচালিত হয় মূলত গোষ্ঠীপতি বা 2ǃ ë Chief এর দ্বারা অন্যদিকে রাজগঠন 2ǃ ëûûগোষ্ঠিপতি প্রকৃত শাসক বা রাজায় পরিণত হতেন। রাজা এক্ষেত্রে গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ বহির্ভূত হয়ে আলাদা স্বত্ত্বায় পরিণত হতেন। রাজার শাসনকে বৈধতা প্রদান (Legitimacy) করার জন্য অ-উপজাতীয়সুলভ সামাজিক আচার-আচরণ তথা উপাধি গ্রহণ করতেন রাজা। এক্ষেত্রে রূপ কুমার বর্মনের গবেষণা মূলক গ্রন্থ Form Tribalism to State: Reflection on the Emergence of Koch kingdom (Delhi, 2007) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এখানে লক্ষ্য করা যায় প্রাক্-ঔপনিবেশিক আমলে উত্তর পূর্বভারতের বিভিন্ন উপজাতি (বিশেষ করে কোচ্, মেচ্, আহোম, মনিপুরী, জয়ন্তীয়া, ত্রিপুরি প্রভৃতি) রাজ্যগঠন প্রক্রিয়াকে সাফল্যমন্ডিত করার জন্য অ-উপজাতিয় আচার আচরণ বিশেষ করে হিন্দু সংস্কৃতিকে গ্রহণ করেছিল। সুরজিত সিনহার গবেষণাতেও (Tribal Polities and State System of Eastern and North Eastern India, 1987) অনুরূপ ব্যাখ্যা উপস্থাপিত হয়েছে। উত্তর পূর্ব ভারত ছাড়াও ছোটনাগপুর অঞ্চলেও অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়।

উপজাতি সমূহের দ্বারা নতুন আর্থসামাজিক ব্যবস্থা গ্রহণের দ্বারাও অ-উপজাতি করণ ঘটেছে ভারতের ক্ষেত্রে। মূলত Simple mode of production এর উপর নির্ভরশীল উপজাতি সমাজের অর্থনীতি (যা অতিরিক্ত উদ্বৃত্ত উৎপাদনে সক্ষম নয়) জটিল উৎপাদন ব্যবস্থা তথা নতুন উৎপাদন কৌশল ও প্রযুক্তি (Technique and Technology) গ্রহণ করার মাধ্যমে উপজাতির অর্থনৈতিক অ-উপজাতীয়করণ ঘটে। তাছাড়া বাজার অর্থনীতির প্রবেশ ভারতীয় উপজাতি সমূহকে - অউপজাতিয় স্বত্ত্বায় রূপান্তরিত করেছে দ্রুতগতিতে। ঔপনিবেশিক আমল থেকে এই প্রকৃয়া অতিদ্রুত ধাবমান হতে থাকে।

তাছাড়া উপজাতি সমূহের দ্বারা সংগঠিত ধর্মীয় ও ভাষা সংস্কৃতি গ্রহণ করার প্রবণতা বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায় ঔপনিবেশিক আমল থেকে। হিন্দুয়ায়ন, সংস্কৃত্যায়ন বা খৃষ্টানায়ন প্রকৃয়া উপজাতি সমূহের ধর্মীয় ধ্যান ধারণার বিশেষ পরিবর্তন ঘটায়। তাছাড়া ভারতের জাতি গঠন প্রকৃয়ায়ও (Nation building process) পরোক্ষভাবে উপজাতি সমূহের ভাষা সংস্কৃতির পরিবর্তনে সহযোগী হয়েছে।

১০.৫.১৩.৫ : পুন : উপজাতিকরণ (RE-TRIBALIZATION)

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে 1971 সালে ভারতের মোট জনসংখ্যার 6.94% ছিল উপজাতি যা শতাংশের হিসাবে 1991 সালে বৃদ্ধি পেয়ে দ্বারায় 8.08% এ। অর্থাৎ ভারতে উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত হওয়ায় প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর সাধারণ ব্যাখ্যা হল তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) হিসাবে সংরক্ষণ (Resrvation) অর্থাৎ সরকারী চাকরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ইতিবাচক পক্ষপাতিত্ব (Posititive discrimation) এর ব্যবস্থা চালু করা ও একে চালিয়ে যাওয়া। কিন্তু এটা অতিসরলীকৃত ধারণা। এর পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি হল ভারতীয় উপজাতি সমূহের মধ্যে আত্মচেতনা (Self consciousness)-র বিকাশ। আত্মচেতনা বিকাশের সবচেয়ে উল্লেখ ক্ষেত্রগুলো হল ভারতের বৃহত্তর সমাজ ও রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে তাদের অবস্থান ও পরিচিতির নির্মাণ।

পরিচিতি নির্মাণের প্রধান চালিকা শক্তি হল উপজাতি সমূহের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার। মূলক ঔপনিবেশিক আমল থেকে শিক্ষা বিস্তারের একটা সদর্থক প্রভাব ভারতীয় উপজাতি সমূহের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যদিও ঔপনিবেশিক শাসনে তাদের আলাদা ভাবে রাখার (Excluded) ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছিল তা সত্ত্বেও ঔপনিবেশিক আমলের শেষ পর্যায়ে উত্তর-পূর্ব ও পূর্ব ভারতের বিভিন্ন উপজাতি সমূহের মধ্যে নিজস্ব পরিচিত নির্মাণের প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তাদের কতগুলি সংগঠন তৈরীর মাধ্যমে। এক্ষেত্রে Naga Nationalist council (NNC, 1946), Mizo National Famine Front (MNFF, 1946), Garo National Council (GNC, 1946), United Mizo Freedom Organization UMFO, 1946), Adivasi Mahasabha (1939), ইত্যাদির

কথা বলা যেতে পারে। স্বাধীনোত্তর কালে এই রাজনৈতিক সংগঠনসমূহ নানাবিধ বিবর্তনের মাধ্যমে তাদের স্বায়ত্বশাসনের অধিকার অর্জনের আন্দোলনকে বিকশিত করে। কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সংখ্যা গরিষ্ঠ উপজাতি সমূহের জন্য পৃথক রাজ্য (separati state) বা সায়ত্বশাসিত পরিষদ গঠন করার সাফল্য অপেক্ষাকৃত সংখ্যালঘু উপজাতিগুলিকেও উপজাতি-পরিচিতির নির্মাণ ও সুদৃঢ় করনে (structural integration) উৎসাহিত করে। ফলে ভাষা বা সংস্কৃতির পরিচিতির বিষয়টিকে সামনে রেখে উপজাতি সমূহের মধ্যে পুনঃ উপজাতিকরণ ভাবনা (Re-tribalization)-র বিকাশ ঘটতে থাকে। উদাহরণ হিসাবে নাগল্যাণ্ড, মিজোরাম, মেঘালয় রাজ্য বা কাবি অংলং স্বায়ত্বশাসিত পরিষদের কথা বলা যেতে পারে যা Badaland Territorial Council, Darjeeling Hill Council ঝাড়খণ্ড রাজ্য (২০০০) গঠনের আন্দোলনকে উৎসাহিত করেছিল।

তবে উপজাতি পরিচিতি নির্মাণের সবচেয়ে বড় বাধা হল কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে সংযোগ বিছিন্নতা। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ভারতীয় উপজাতি সমূহের সাধারণ বৈশিষ্টের অন্যতম হচ্ছে কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলের সঙ্গে উপজাতির সংযোগ। কিন্তু সংযোগ বিচ্ছিন্নতা পরিচিতি নির্মাণের প্রকৃয়াকে লংঘিত করে। ঔপনিবেশিক আমলে ব্যপক হারে ঝাড়খণ্ডের উপজাতি সমূহের স্থানান্তর করণ বর্তমানে ঝাড়খণ্ডী উপজাতি সমূহের Integrated Identity-র ভাবনাকে দূর্বল করে দিচ্ছে।

তাছাড়া 'উপজাতি পরিচিতি' বা ভারতীয় রাষ্ট্র কাঠামোর মধ্যে 'উপজাতি পরিচিতি' হিসাবে তাদের অবস্থান উপজাতিদের আত্মচেতনার ফসল নয়। Virginiusxaxa-র মতে- The designation or description of tribes as indigenous people had not emerged from self identification. Or description by the tribal people themselves. It was not a part of positive identification and evaluation by the tribes. Rather the outsiders had imposed it on the tribes. তবে 1993 সালকে আন্তজাতিক আদিবাসী বর্ষ (International year of the Indigenous people) হিসাবে ঘোষণা করা ও উপজাতি সমূহকে আদিবাসী হিসাবে চিহ্নিত করার ফলে উপজাতি পরিচিতি এখন আর সামাজিকভাবে নীচু মাণের পরিচিত (lowly or inferior identity) নয়।

তাই উপজাতি হিসাবে নিজেদের পরিচিত করার প্রবণতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে। একসময় যারা সাংস্কৃত্যায়ন প্রকৃয়ার মাধ্যমে নিজেদের উপজাতি থেকে জাতিতে (From tribe to caste) পরিণত করে তারা পুনরায় নিজেদের উপজাতি হিসাবে চিহ্নিত করতে কুণ্ঠাবোধ করছে না। উদাহরণ হিসাবে উত্তরবঙ্গ ও উত্তরপূর্ব ভারতের কোচ রাজবংশীদের কথা বলা যেতে পারে যারা রাজ্য গঠন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে জাতিতে (caste) পরিণতি হয়েছিল তারা এখন তপশিলি উপজাতি (Scheduled Tribe) হিসাবে চিহ্নিত হওয়ার জন্য আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। Scheduled Tribe হিসাবে সংরক্ষণের সুবিধাও এতে ইন্ধন যুগিয়েছে। এক্ষেত্রে 2007 সালের রাজস্থানের গুজ্জরদের আন্দোলন উল্লেখ্যনীয়।

১০.৫.১৩.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী (SUGGESTED READINGS)

1. Barman, Rupkumar : From Tribalism to State : Reflections on the Emergence of the Koch kingdom (Delhi, Abhijeet Publication, 2007)
2. Barman, Rup Kumar : Contented Regionalism (Delhi, Abhijeet Publication, 2007)
3. Bara Joseph (ed): Ordeals and voices of the Indigenous Tribal People of India, (Guwahati, Indian Confederation of Indigenous and tribal People, 2006)
4. Betteills, A. : The concept of Tribe with Special References to India, European Journal Sociology, Vol 27, 1986.
5. Roy Burman : Transformation of tribes and Analogous Social Formation, EPW 1983.
6. Sinha Surajit (ed) : Tribal Politics and State System of Eastern and North Eastern India, (Calcutta, Centre for Social Science Research, 1987).

১০.৫.১৩.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (ASSIGNMENTS)

১। উপজাতির ধারণা ব্যাখ্যা করুন।

২। উপজাতি থেকে অ-উপজাতি প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করুন।

৩। পুনঃ উপজাতিকরন প্রক্রিয়ার শক্তি সমূহকে চিহ্নিত করুন।

————————

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

IMPACT ON INDUSTRY ON ECOLOGY AND ORIENTAL SYSTEMS AND DEVELOPMENT ALTERNATIVES

একক - ১৪

Impact of Modern Industry on Ecology

(পরিবেশের উপর আধুনিক শিল্পের প্রভাব)

বিন্যাসক্রম :

১০.৬.১৪.০ : উদ্দেশ্য

১০.৬.১৪.১ : পরিবেশের উপর আধুনিক শিল্পের প্রভাব

১০.৬.১৪.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১০.৬.১৪.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.৬.১৪.০ : উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে জানতে পারবেন :

১। শিল্প কিভাবে বাতাস ও পরিবেশকে দূষিত করে।

২। শিল্প দূষণের ফলে কিভাবে মানুষের শরীর ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

৩। শিল্পায়নের ফলে গঙ্গার জল কিভাবে দূষিত হয়েছে।

৪। তাজমহল, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, বেলুড় মঠ কিভাবে দূষণের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

৫। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা কিভাবে মানুষের ক্ষতি করেছে।

৬। ধাতুঘটিত দূষণ কিভাবে মানবদেহের ক্ষতি করে।

১০.৬.১৪.১ : পরিবেশের উপর আধুনিক শিল্পের প্রভাব

শিল্পের সঙ্গে দূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা প্রায় সকলেরই জানা। শিল্পে উন্নত দেশগুলিতেই প্রথম শিল্পদূষণের ভয়াবহ রূপ লক্ষ্য করা গেছে। উন্নয়ণশীল দেশ হিসাবে ভারতও শিল্পদূষণ থেকে মুক্ত হতে পারে নি। ভারতের পরিবেশ দপ্তর দূষণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে ক্ষতিকারক হিসাবে কতকগুলি শিল্পকে চিহ্নিত করেছে। সেগুলি হল : রাসায়নিক সার, কীটনাশক, কাগজ, ট্যানারী, সিমেন্ট, অ্যাসবেস্টাস্, ইলেকট্রোপ্লেটিং, কাপকল, সাবান, তৈল শোধনাগার, তামা, দস্তা, অ্যালুমিনিয়াম, ইস্পাত সমেত ধাতুশিল্প। ভারতের মোট বায়ুদূষণের বেশির ভাগই ঘটে বোম্বাই, দিল্লী, কলকাতা, কানপুর, পুণা, থানে, কোয়েম্বাটোর, এর্ণাকুলাম প্রভৃতি শিল্পাঞ্চলে। অনেকগুলি শিল্প থাকার ফলে বোম্বাই-এর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। দিল্লী ও কলকাতার অবস্থাও ভাল নয়।

শিল্পায়নের সবচেয়ে ক্ষতিকারক ফল হল বায়ুদূষণ। শিল্পাঞ্চলে কারখানার বাহ্য গ্যাস থেকে বায়ুতে নাইট্রোজেন ডাই অক্সাইড, সালফার ডাই অক্সাইড, কোথাও কার্বন মনোক্সাইড ইত্যাদির পরিমান বৃদ্ধি পায়। প্রকৃতি ও জীবজগতের পক্ষে এটি খুবই ক্ষতিকারক। মানুষের দেহে বিভিন্ন ধরণের রোগের সৃষ্টি হয়। এই গ্যাস আর্দ্র ও জলীয় বাষ্পের সঙ্গে সালফিউরিক অ্যাসিড হয়ে বাড়িঘর ও জলাশয়ে অম্লদূষণ ঘটায়। বায়ুর এই অম্ল দূষণের ফলে শুধু বাড়িঘর ও সুরম্য সৌধ ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে না, ধাতব বা পাথরের মূর্তি, রেল লাইন, লোহার সেতু ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বিশ্ববিখ্যাত তাজমহল, ঐতিহ্যবাহী বেলুড় মঠ, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল ও বায়ু দূষণের কবলে পড়েছে। আগ্রার তাজমহল বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ স্থাপত্য কীর্তি। কিন্তু সেই তাজমহল আজ বায়ু দূষণের শিকার। পরিবেশবিদরা একে 'মার্বেল

ক্যান্সার’ আখ্যা দিয়েছেন। তাজমহলের আশেপাশে অবস্থিত ছোট বড় বিভিন্ন শিল্প কারখানায় সৃষ্ট বায়ুদূষণ এর অন্যতম প্রধান কারণ। তাজমহলের অদূরে আছে মথুরার তৈল শোধনাগার। এছাড়া কাছাকাছি আছে কাঁচের কারখানা, রবার কারখানা, রাসায়নিক শিল্প, ফাউন্ড্রি ইত্যাদি। বায়ুদূষণের ফলে তাজমহলের গায়ে দুর্মূল্য স্ফটিক ও বেলে পাথরের আবরণ ক্রমশ ক্ষয়ে যাচ্ছে এবং বিবর্ণ হয়ে পড়ছে। কলকাতার ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল বায়ু দূষণের আর এক নজির। এর গায়ে এখন অবক্ষয়ের চিহ্ন স্পষ্ট। এখানে মার্বেল পাথরের সাদা রঙ কোথাও বিবর্ণ হয়ে গেছে আবার কোথাও তা খসে পড়েছে। বিভিন্ন স্থানে পাথর খণ্ড জোড়া লাগানোর ধাতব বাঁধন ক্ষয়ে গেছে। তবে এখানকার বায়ু দূষণ অনেকটাই যানবাহন থেকে সৃষ্ট। বেলুড় মঠ পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের এক অনন্য স্থাপত্য নিদর্শন। এই সৌধেও তখন দূষণজনিত অবক্ষয়ের ছাপ পড়েছে। বেলে পাথরের রঙ কোথাও বিবর্ণ হয়ে গেছে, কোথাও সছিদ্র হয়ে পড়েছে। লক্ষ্য করা গেছে বেলুড় অঞ্চলে অবস্থিত কলকারখানা ইত্যাদির বায়ু দূষণ এর অন্যতম প্রধান কারণ।

শিল্পের ফলে নদীর জল দূষণের উদাহরণ অনেক আছে। গঙ্গার জল দূষণ এক্ষেত্রে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গঙ্গার উপরে অবস্থিত অনেকগুলি বড় শহরের আবর্জনা থেকে বেশীর ভাগ দূষণ ঘটে থাকে। তাছাড়া উত্তরপ্রদেশ, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের অনেকগুলি বড় শিল্প থেকেও আবর্জনা যায় গঙ্গায়। হৃষিকেশের ঔষধ কারখানা, কানপুরের কাপড়কল, ফুলপুরের সার কারখানা, মোকামার ট্যানারি, বারোনীর তৈল শোধনাগার, হুগলী নদীর তীরের পাটকল ও কাপড়কল সবই গঙ্গার জলদূষণের জন্য দায়ী। এছাড়া বরাকর থেকে আসানসোল-দুর্গাপুর শিল্পাঞ্চলের সামগ্রিক প্রভাবে দামোদর নদের জলও দূষিত। এছাড়া গোয়ার জুয়ারি এগ্রো কেমিক্যালস্ কারখানার আবর্জনার দূষিত জলের ফলে মাছ, গবাদি পশু এমনকি নারকেল গাছ পর্যন্ত মরতে শুরু করে।

শিল্প-কারখানায় দুর্ঘটনার ফলে আবহাওয়া মারাত্মকভাবে দূষিত হয়ে যায় এবং এর ফলে প্রাণহানি ঘটে। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা এর প্রকৃষ্ট প্রমাণ। ১৯৪৮ সালের ২ ডিসেম্বর রাতে ভূপালের ইউনিয়ন কার্বাইড কারখানায় বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে প্রায় ৪০ টন অতি বিষাক্ত মিক (MIC), হাইড্রোজেন সায়নাইড এবং অন্যান্য বিষক্রিয়াজাত গ্যাস দ্রুত বায়ুর সাথে সন্নিহিত প্রায় ৪০ বর্গ কিলোমিটার অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় প্রায় ২৫০০ মানুষ মারা যায়। গ্যাসের বিষাক্ত ক্রিয়ায় অনেকে অন্ধ হয়ে গেছে। ফুসফুস, মস্তিষ্ক, জননতন্ত্র ইত্যাদির গুরুতর অসুখে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত প্রায় ৫৩২৫ জন মারা গেছে। পাঁচ লক্ষেরও বেশি মানুষ এই মারাত্মক গ্যাসের সংস্পর্শে আসে। তাদের মধ্যে অনেকেই এখন প্রতিবন্ধীর জীবন যাপন করছে। প্রায় ৭০,০০০ মানুষ ভূপাল ছেড়ে পালায়।

বায়ুতে ধাতুঘটিত দূষণ ঘটে। এর মধ্যে ইলেকট্রোপ্লেটিং, প্লাস্টিক, রং, সার কারখানা ইত্যাদি থেকে ক্যাডমিয়াম জনিত দূষণ হয় যা কিডনি ও জননতন্ত্রের পক্ষে ক্ষতিকারক। সীসা ঘটিত দূষণও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। পাইপ, সীসাঘটিত ব্যাটারী, ছাপাখানার হরফ, রং, প্লাস্টিক শিল্প, সীসাযুক্ত

পেট্রোল ইত্যাদি বায়ু দূষণের কারণ। এর ফলে রক্তাল্পতা, কিডনিঘটিত ব্যাধি, স্নায়ুতন্ত্রের গোলযোগ, জননতন্ত্রের ব্যাধি প্রভৃতি বিভিন্ন রোগ দেখা দিতে পারে। হাইড্রোকার্বন ও মানবদেহের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক ও ক্যান্সারের কারণ হিসাবে চিহ্নিত। এছাড়া কলকারখানার ছাই, এসবেস্‌টাস্, খনিজ পদার্থের সূক্ষ্ম কণিকা ইত্যাদি ভাসমান বিষাক্ত ধুলিকণা মানুষের শ্বাসক্রিয়ায় বিঘ্ন ঘটায়। কলকারখানার ধোঁয়া, বিশেষত তাপবিদ্যুত কেন্দ্রগুলি এই ধরণের ধুলিকণার প্রধান উৎস।

তাছাড়া শিল্পায়নের সঙ্গে সঙ্গে বহু উর্বর কৃষিজমি যার সবুজ থাকছে না। এ ব্যাপারে শিল্পের থেকে বেশি দায়ী হল খনি। ওপেন কাস্ট মাইন পৃথিবীর বুকে বিরাট বিরাট গর্তের সৃষ্টি করেছে। ভূগর্ভস্থ খনিতে দুর্ঘটনার ফলে বিস্তৃত এলাকার জমি বসে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। রাণীগঞ্জ এলাকায় এধরণের ঘটনা ঘটেছে।

পারমানবিক শক্তি উৎপাদন কেন্দ্রগুলি থেকেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। শক্তি উৎপাদনের জন্য বিশেষ ধরণের তেজস্ক্রিয় উপাদান ব্যবহার করা হয়। শক্তি উৎপাদনের পরে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের বর্জ্য ছাই এর মতই পারমানবিক শক্তি কেন্দ্রেও তৈরী হয় কিছু বর্জ্য। সেগুলি প্রায় সবই তেজস্ক্রিয়। এইসব বর্জ্য পদার্থের তেজস্ক্রিয়তা সব সময়ই বিপজ্জনক।

১০.৬.১৪.২ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. S. C. Jorhi and G. Bhattacharya (ed) : *Mining and Environment in India*.

2. B. N. Banerjee : *Environmental Pollution and Bhopal killings*.

3. R. Kuman (ed). : *Environmental Pollution and Health Hazards in India.*

১০.৬.১৪.৩ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। শিল্প কিভাবে পরিবেশকে দূষিত করে তা আলোচনা কর।

২। শিল্প-দূষণের ফলে তাজমহল, বেলুড় মঠ ও ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ?

৩। ভূপাল গ্যাস দুর্ঘটনা সম্বন্ধে যাহা জান লিখ।

——————

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

IMPACT OF INDUSTRY ON ECOLOGY AND ORIENTAL SYSTEMS AND DEVELOPMENT ALTERNATIVES

একক - ১৫

Development and Pollution

বিন্যাসক্রম :

১০.৬.১৫.০ : প্রস্তাবনা

১০.৬.১৫.১ : উন্নয়ন ও পরিবেশ

১০.৬.১৫..২ : উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ

১০.৬.১৫.০ : প্রস্তাবনা

আজকের পৃথিবীতে অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পরিবেশ রক্ষার জন্য সমাজের বিভিন্ন স্তরে নানাবিধ গণআন্দোলন 'উন্নয়ন' ও 'পরিবেশ'কে অর্থনীতিবিদ ও রাজনীতিবিদদের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না রেখে মানব সভ্যতার অস্তিত্ব রক্ষার একটি সাধারণ বিষয় হিসাবে চিহ্নিত করছে ভারতসহ সারা বিশ্বে। পরিবেশ ও উন্নয়ন বিষয়ে একটা সময় বিশেষ করে 1971 খ্রীষ্টাব্দের স্টকহোম সম্মেলনের প্রাক্কাল পর্যন্ত মনে করা হতো যে উন্নয়নশীল দেশসমূহে দারিদ্র্য দূরীকরণ ও অর্থনৈতিক অনগ্রসরতার অপসারণের জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন একান্ত প্রয়োজন। পরিবেশ সেখানে ছিল গৌণ বিষয়। কিন্তু পরিবেশকে উপেক্ষা করে অর্থনৈতিক উন্নয়নের যে প্রয়াসসমূহ পরিলক্ষিত হয়েছে সেগুলি উন্নয়নশীল দেশসমূহের উন্নয়নের সুফলকে দীর্ঘস্থায়ী হতে দিচ্ছে না। পরিবেশ সচেতনতা না থাকার জন্য উন্নয়নের প্রধান উদ্দেশ্যসমূহ ব্যর্থ হচ্ছে। বর্তমান এককে পরিবেশ ও উন্নয়নের সামঞ্জস্যপূর্ণ পরিবর্ত হিসাবে প্রাচ্যের উন্নয়নের ধারণা (Oriental alternatives of development) ও Sustainable development এর সম্ভাবনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

১০.৬.১৫.১ : উন্নয়ন ও পরিবেশ

পরিবেশের বিভিন্ন উপাদানকে নির্বিচারে ব্যবহার করে একদিকে মানবসভ্যতার জীবনযাত্রার সামগ্রিক প্রগতি যেমন সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে অন্যদিকে এই প্রক্রিয়া প্রকৃতির উপাদানগুলির পুনঃ ব্যবহারের সুযোগ সংকুচিত করছে। যেহেতু প্রাকৃতিক উপাদান অপর্যাপ্ত নয় তাই পরিবেশকে নিশ্বেষিত করে অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রকৃতপক্ষে অর্থহীন। উন্নত দেশগুলির অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় পরিবেশকে রক্ষা করে উন্নয়ন ঘটানোর সমস্যার মোকাবিলা করতে হয়নি। কিন্তু উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন ভাবনা পরিবেশের ভারসাম্য ও উন্নয়ন এর উভয় সংকটে জর্জরিত। তাই অর্থনৈতিক উন্নয়নও পরিবেশের গুণগত মান রক্ষা করা ভারতসহ উন্নয়নশীল দেশগুলির এক জ্বলন্ত সমস্যায় পরিণত হয়েছে।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে অর্থনৈতিক উন্নয়নের প্রকৃত উদ্দেশ্য হচ্ছে আর্থসামাজিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে মানুষের জীবনযাত্রার সামগ্রিক মান উন্নত করা। বৃহৎ অর্থে একটি নির্দিষ্ট লক্ষ্যমাত্রা অর্জন করার জন্য যে উন্নয়ন পদক্ষেপ নেওয়া হয় সেখানে মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিসহ, আয়ের সামঞ্জস্যপূর্ণ বিতরণ (আর্থ-সামাজিক ন্যায় বিচার), পরিবেশের গুণগতমানের উন্নয়ন, স্বাস্থ্যের উন্নয়ন, শিক্ষার

বিস্তার, স্বাভাবিক অধিকারের বিকাশ, ইত্যাদি মহৎ উদ্দেশ্যসমূহের প্রতি জোর দেওয়া হয়। তবে উন্নয়নের লক্ষ্যমাত্রা সবসময়ই পরিবর্তনশীল, কারণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মানুষের চাহিদারও পরিবর্তন ঘটতে থাকে। উন্নয়নের এই ধারণা থেকে বলা যায় যে পরিবেশের গুণগত মান রক্ষা করা উন্নয়নের একটা উল্লেখযোগ্য উদ্দেশ্য। কিন্তু লক্ষ্যণীয় বিষয় হল যে উন্নয়ন ও পরিবেশের সদর্থক সম্পর্ক রক্ষা করা প্রায়শই সম্ভব হচ্ছে না। উন্নয়ন প্রক্রিয়া তার নিজের প্রকৃতির (Nature of process of development) জন্যই প্রাকৃতিক উপাদানের পর্যাপ্ততা, দীর্ঘস্থায়িতা ও পরিবেশের গুণগত মানরক্ষার সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক সম্পর্ক তৈরি করে।

উন্নয়ন ও পরিবেশের মধ্যে আবার একটা ধারণাগত পার্থক্য বিদ্যমান। অর্থনৈতিক বৃদ্ধি একটা সদা-পরিবর্তনশীল ধারণা যা একটি নির্দিষ্ট একক (GNP or Gross National Product) এর দ্বারা পরিমাপযোগ্য। কিন্তু পরিবেশের ধারণা অপেক্ষাকৃত বৃহৎ ও কোন নির্দিষ্ট এককের দ্বারা পরিমাপযোগ্য নয়।

উন্নয়ন ও পরিবেশের এই ক্রিয়াগত সম্পর্কের প্রেক্ষিতে একটা প্রশ্ন উঠে আসে যে প্রাকৃতিক উপাদানের বিনিময়ে সংগঠিত উন্নয়ন কতটুকু আর্থিক বৃদ্ধি ঘটাতে পারে ? মূল সমস্যা হল উন্নয়নের গতি একটা সময় হ্রাস পেতে থাকে কারণ দূষণের ফলে পরিবেশের উপাদানগুলির উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়। এ প্রসঙ্গে একথাও স্মর্তব্য যে পরিবেশ দূষণ মানুষের জীবনযাত্রার মান (standard of living) এর অবনমন ঘটায়। তবে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করে দিয়েও পরিবেশের এই সমস্যার সমাধান সম্ভব নয় কেননা পরিবেশ দূষণের মূল কারণ হল বাজারের চাহিদা অনুযায়ী প্রাকৃতিক উপাদানের নির্বিচারে ব্যবহার। তাই অর্থনীতিবিদগণ মনে করেন যে পরিবেশের ভারসাম্য বজায় রেখে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে চালু রাখার জন্য প্রয়োজন একটি নির্দিষ্ট কার্যকরী প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা বা বাজারগত যান্ত্রিক ব্যবস্থা (Market Based Instruments MBIs) যেখানে দরকষাকষি, দূষক। আক্রান্ত, পরিবেশগত কর, প্রাকৃতিক উপাদানের ব্যবসার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণ, ইত্যাদি বিষয়ের সাহায্যে প্রাকৃতিক উপাদানগুলিকে নির্বিচারে ব্যবহার করার হাত থেকে বাচানো যেতে পারে।

অন্যদিকে 'উন্নয়ন' হল উন্নয়নশীল দেশসহ উন্নত দেশগুলির প্রধান অর্থনৈতিক ক্ষেত্র। এক্ষেত্রে উন্নত দেশ আরো বেশি বস্তুগত লাভ ও উন্নয়নশীল দেশগুলি দারিদ্র্য দূরীকরণসহ আর্থিক বৃদ্ধি আশা করে। এই অবস্থায় অর্থনৈতিক উন্নয়ন না পরিবেশ কোনটাকে প্রাধান্য দেওয়া হবে ? এই প্রশ্নটিকে ঘিরে অর্থনীতিবিদ, বিজ্ঞানী, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি গোষ্ঠী, বুদ্ধিজীবি, দার্শনিক, সমাজকর্মী ও সাধারণ মানুষের মধ্যে একটা জটিল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে।

1970 এর দশকে একদল পরিবেশবিদ মনে করতেন যে পরিবেশের সমস্যা প্রকৃত অর্থে কোন সমস্যাই নয় কেননা পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে প্রকৃতি তার নিজের মতো করে অভিযোজিত করতে পারে। কিন্তু তারাও আজকে তাদের মত পরিবর্তন করেছেন। একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন যে পরিবেশের সমস্যা প্রকৃত অর্থেই একটি জ্বলন্ত সমস্যা যা ভবিষ্যতকে ভয়ের রাস্তায় পরিচালিত করছে।

উন্নয়নজনিত পরিবেশ সমস্যাটিকে ঘিরে আবার উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে স্পষ্ট মতপার্থক্য বিদ্যমান। 1971 এর Founex Report এ বলা হয়েছিল যে উন্নত দেশগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়া পরিবেশ সমস্যার সৃষ্টি করেছে; তা সত্বেও উন্নয়নশীল দেশগুলির দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য দ্রুত অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রয়োজন। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে উন্নত দেশগুলির প্রথম দিকের অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিবেশের সঙ্গে নেতিবাচক সম্পর্ক তৈরি করলেও পরবর্তীকালের অধিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক নয় বরং পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষার অনুকূল। কারণ একটা অদৃশ্য পরিবেশের হাত (Invisible Environmental hand) শিল্পগত বাজারী অর্থনীতিতে পরিবেশের অনুকূলেই কাজ করে। এই ধারণা ধনী দেশগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বৈধতা ও পরিবেশ সমস্যাজনিত উদ্বিগ্নতা থেকে সাময়িক স্বস্তি দান করে। কিন্তু অদৃশ্য পরিবেশের হাতের প্রকল্প কখনই নির্বিচারে গ্রহণযোগ্য নয়। অন্যদিকে উন্নয়নশীল দেশগুলির উন্নয়ন পরিকল্পনা পরিবেশের প্রতি অবিচার করলেও উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে বন্ধ করা সম্ভব নয়, কেন না এই দেশগুলির জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধি অত্যন্ত জরুরী। এই দেশগুলি আবার আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আর্থিক সাহায্য, বহুজাতিক সংস্থা, শিল্পজাত বর্জ্য, দূষণমুক্ত শিল্প সংস্থাসমূহের বিকাশ ইত্যাদির ক্ষেত্রে ধনী দেশগুলির সবুজ উপনিবেশিকতাবাদ (Green Colonialism) এর অস্তিত্ব লক্ষ্য করে যা তাদের পরিবেশের গুণগত মান রক্ষা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সুফল ভোগের পক্ষে বাধার কারণ। একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে ধনী দেশগুলির অতীতের অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়া বর্তমানে তাদেরকে sustainable development policy গ্রহণে বাধ্য করছে যারা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য, আর্থিক সাহায্য ও বহুজাতিক সংস্থার মূল নিয়ন্ত্রক। এরা তাদের শিল্পজাত কঠিন ও তরল বর্জ্যকে নিক্ষেপ করার জন্য বেছে নিচ্ছে উন্নয়নশীল দেশগুলির সমুদ্র বা প্রাকৃতিক উৎসগুলিকে। উন্নয়নশীলদেশগুলির Eco-friendly বা sustainable development প্রযুক্তি আবার ধনী দেশগুলির আর্থিক সহায়তার উপর নির্ভরশীল। ফলে পরিবেশ বান্ধব নীতি গ্রহণের ক্ষেত্রেও উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলির মধ্যে পার্থক্য বিদ্যমান।

১০.৬.১৫.২ : উন্নয়ন ও পরিবেশ দূষণ

উন্নয়ন ও পরিবেশের নেতিবাচক সম্পর্কের আলোচনা প্রসঙ্গে পরিবেশদূষণের প্রধান কারণগুলিকে চিহ্নিত করা দরকার। কারণ উন্নয়নের পরিবর্ত প্রক্রিয়া ভাবনার জন্য দূষণের মাত্রা সম্পর্কে একটা ধারণা করা একান্ত প্রয়োজন। সাধারণভাবে জনসংখ্যা বৃদ্ধি, আধুনিক পদ্ধতির কৃষিকাজ ও তৎসম্পর্কিত বিষয়, শিল্পায়ন, খনি, পরিবহন ও যোগাযোগ ব্যবস্থা, আবাসন, নগরায়ণ ইত্যাদি বিষয়গুলিকে পরিবেশ দূষণের জন্য চিহ্নিত করা হয়ে থাকে।

পরিবেশ দূষণের প্রধান কারণ হল জনবিস্ফোরণ। কারণ অধিক জনসংখ্যার জন্য অধিক উৎপাদন দরকার। অধিক উৎপাদনের চাহিদা পরিবেশ বান্ধব নাও হতে পারে। কারণ প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সাধারণ সম্পর্কই হল দ্বন্দ্বমূলক কেননা মানুষ তার প্রয়োজনেই প্রকৃতি থেকে তার খাদ্য, আশ্রয় ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় বস্তু আহরণ করে। বিংশ শতকের মাঝামাঝি থেকে জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও পরিবেশের সম্পর্ক একটা জটিল আকার ধারণ করতে থাকে যা বর্তমানের জনবহুল দেশগুলির কাছে জ্বলন্ত সমস্যায় পরিণত হয়েছে। অধিক জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অতিরিক্ত পরিমাণে খাদ্য ও অ-খাদ্য (Food and non-food crops) শস্যের চাহিদা তৈরী করেছে যার জন্য প্রয়োজন অতিরিক্ত কৃষিকাজ ও অধিক উৎপাদন হার। এরজন্য অরণ্য অঞ্চল পরিষ্কার করে কৃষি জমিতে রূপান্তরিত করতে হচ্ছে। তাছাড়া কৃষিকাজের অর্থ হচ্ছে অধিক পরিমাণে কৃষিযন্ত্র, সেচব্যবস্থা, রাসায়নিক সার, কীটনাশক ইত্যাদির অধিক ব্যবহার। ফলে কৃষিকাজের জন্য ব্যবহৃত ক্ষতিকারক উপাদানগুলো প্রকৃতির ক্ষতি করছে।

কৃষিবিপ্লবের পাশাপাশি শিল্পায়ন প্রক্রিয়াও পরিবেশ দূষণের মাত্রাকে বাড়িয়ে তুলেছে। এককথায় অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণ ও উপায় হল শিল্পায়ন। কিন্তু শিল্পায়ন শ্রীবৃদ্ধির পাশাপাশি পরিবেশের প্রভূত ক্ষতি করছে।

নির্বিচারে খনিজ পদার্থের উত্তোলন, পরিবহন ব্যবস্থার অভূতপূর্ব উন্নতি, যানবাহনের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি ইত্যাদি মানব প্রগতির সূচক হলেও এগুলি বায়ুদূষণের মাত্রাকে বৃদ্ধি করছে। এমনকি দূরযোগাযোগের ক্ষেত্রে Cellphone এর সংখ্যা বৃদ্ধি জীব বৈচিত্র্যের ক্ষতির কারণ হয়ে দাড়াচ্ছে। কৃষি জমিতে আবাসন প্রকল্প ও বহুতল নির্মাণ, অপরিকল্পিত নগরায়ণ প্রক্রিয়া, দূষণ নিয়ন্ত্রণে পরিকল্পনার অভাব, নাগরিকচেতনার অভাব ইত্যাদিও পরিবেশ দূষণের কারণ হিসেবে দেখা যাচ্ছে।

১০.৬.১৫.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। G.S. Monga (ed) : *Environment and Development,* New Delhi, Deep and Deep Publications Pvt. Ltd. 2001.

২। World Bank : World Development Report, Washington D.C. 1991.

৩। Rup Kumar Barman : *Fisheries and Fishermen : A Socio-economic history of colonial Bengal and Post colonial Bengal*, Delhi, Abjijeet Publications, 2008.

৪। K.S. Ramchandran (ed) : Development perspective, New Delhi, Vikas Publishing House. 1990.

———

পর্যায় গ্রন্থ্ - ৬

IMPACT OF INDUSTRY ON ECOLOGY AND ORIENTAL SYSTEMS AND DEVELOPMENT ALTERNATIVES

একক - ১৬

Development and Pollution

বিন্যাসক্রম :

১০.৬.১৬.০ : উন্নয়ন ও পরিবেশের সম্পর্কের পরিবর্ত ভাবনা

১০.৬.১৬.১ : উন্নয়নের প্রাচ্য পরিবর্ত

১০.৬.১৬.২ : উপসংহার

১০.৬.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১০.৬.১৬.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১০.৬.১৬.০ : উন্নয়ন ও পরিবেশের সম্পর্কের পরিবর্ত ভাবনা

প্রাকৃতিক উপাদানকে কাজে লাগিয়ে উন্নয়ন যখন অত্যন্ত জরুরী তখন মানুষের স্বার্থেই পরিবেশ ও তার উপাদানসমূহের গুণগত মান রক্ষা করাও একান্ত প্রয়োজন। কেননা প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের অবাধ ব্যবহার চলতে থাকলে একসময় দেখা যাবে ব্যবহারযোগ্য উপাদান নিঃশ্বেষিত হয়ে গেছে, কারণ প্রাকৃতিক উপাদান অফুরন্ত নয়, তাই উন্নয়ন প্রক্রিয়ার স্বার্থেই উন্নয়নের এমন ধরন গ্রহণ করা দরকার যা উন্নয়নের সুফল ও পরিবেশের উপাদানকে দীর্ঘস্থায়ী করবে। এই প্রয়োজন থেকেই উদ্ভুত হয়েছে উন্নয়নের পরিবর্ত (alternatives) ভাবনার। পরিবর্ত ভাবনার ক্ষেত্রেও পাশ্চাত্য ও প্রাচ্যের মধ্যে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ধনী দেশগুলির উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে দীর্ঘস্থায়ী করার জন্য sustainable development-এর ধারণার প্রচার হচ্ছে গত দুই দশক ধরে।

অর্থনীতিবিদদের কাছে sustainable development-এর ধারণা কোন নতুন বিষয় নয়। তবে পরিবেশকে রক্ষা করার জন্য এই ধারণার নতুন ব্যাখ্যা নিঃসন্দেহে একটি নতুন পদক্ষেপ। অর্থনৈতিক উন্নয়নে পরিবেশের ভূমিকা এবং Sustainable ধারণাটির সম্পর্কে বিতর্কের সূত্রপাত ঘটে মূলত 1987 খ্রীষ্টাব্দে, যখন The World Commission on Environment and Development বা Brundteand Commission উন্নয়নের ক্ষেত্রে sustainable development বিষয়টির উপর গুরুত্ব দেয়। এই কমিশন ছয় রকমভাবে Sustainable Development-এর সংজ্ঞা দিয়েছিল, সেগুলি ছিল পরস্পর বিরোধী। এই সংজ্ঞাগুলির সবকটি একটি জায়গায় একমত যেখানে Sustainable development কে ; "as the ability of society to meet the needs of its present generation without compromising the ability of the future generation to meet their own needs" হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কিন্তু এই সরলীকৃত ব্যাখ্যা Sustainable development-এর সমস্ত বিষয়গুলিকে ব্যাখ্যা করে না। অর্থনীতিবিদগণ Sustainable development-এর কতগুলি সাধারণ সূচক-এর কথা বলেছেন। যেমন — G. D. P. Growth rate, জনসংখ্যার হ্রাস, Human Resource Development India, Clean Air India, পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য শক্তির সন্ধান, প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের অনুপাত নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি।

Sustainable Development-এর ধারণাকে বাস্তবায়িত করার জন্য কতগুলি স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী নীতি গ্রহণ করা একান্তভাবে জরুরী। স্বল্পমেয়াদী পদক্ষেপের মধ্যে পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক এমন উৎপাদন প্রক্রিয়া বা কার্যকলাপকে সরাসরি নিয়ন্ত্রণ ও জন্ম নিরোধকসমূহের উপর ভর্তুকি দিয়ে জনমানসে প্রচারের উপর গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়। দীর্ঘমেয়াদি পদক্ষেপের মধ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির গতিরোধ, উৎপাদন পুনঃব্যবহারযোগ্য প্রযুক্তির উৎভাবনা, শিল্পোন্নয়নকে এক জায়গায় কেন্দ্রিভূত না করা প্রভৃতির কথা বলা যেতে পারে।

১০.৬.১৬.১ : উন্নয়নের প্রাচ্য পরিবর্ত

পরিবেশ সচেতনতা বর্তমানে সমগ্র বিশ্বের একটা সাধারণ বিষয়ে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে পরিবেশ রক্ষা করার জন্য আন্দোলন বা Environmentalism-এর বিকাশের জন্য আমরা সকলেই কমবেশী পরিবেশ নিয়ে ভাবতে শুরু করেছি। কিন্তু মজার বিষয় হল প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির সময় থেকেই পরিবেশ বিষয়ক চেতনার জন্ম হয়েছিল।

পরিবেশের ইতিহাস চর্চার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বলা যায় যে, মানব সভ্যতার বিকাশের সময় থেকেই ভারতে উন্নয়ন প্রক্রিয়াও পরিবেশের মধ্যে সামঞ্জস্য রক্ষা করার প্রয়াস বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতার বিভিন্ন নিদর্শন বৃক্ষরূপী দেবদেবীর উপাসনার সাক্ষ্য বহন করে যা থেকে অনেকেই অনুমান করেন যে সিন্ধু সভ্যতার মানুষ অরণ্যের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। এটি নিঃসন্দেহে অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যা। কারণ সিন্ধুসভ্যতার নগরগুলি তৈরী করার জন্য যে পরিমাণ পোড়া ইঁট ব্যবহৃত হয়েছিল সেগুলি তৈরী করার জন্য নির্বিচারে বৃক্ষ ছেদনের প্রয়োজন হয়েছিল, যার জন্য সিন্ধুবাসীদের বৃক্ষ দরদীর পরিবর্তে অরণ্যধ্বংসকারী বলা অসংগত নয়। তবে সিন্ধু সভ্যতার সু-পরিকল্পিত নগরায়ন, বিশেষ করে নিকাশি ব্যবস্থাসহ আবাসনের পরিকল্পনাটি অবশ্যই তাদের স্বাস্থ্য সচেতন বা পরিবেশ সচেতন হিসাবে চিহ্নিত করতে পারা যায়।

সিন্ধু সভ্যতার পরবর্তীকালে বিশেষ করে বৈদিকযুগে পরিবেশ সম্পর্কে কতগুলি ধারণা গড়ে উঠেছিল। বৈদিক আর্যদের অরণ্যানী বা অরণ্যের রাণীকে সিন্ধু সভ্যতার বৃক্ষপোসনার সঙ্গে সমগোত্রীয় বলা যেতে পারে। অরণ্যানীকে অরণ্যের প্রধানা দেবী হিসেবে নানা ধরনের প্রাকৃতিক উপাদানকে উৎসর্গ করা হতো যাকে অরণ্যের সকল প্রাণীর 'মা' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। ঋগ্বেদে ও অথর্ববেদে বৃক্ষকে দেবতা হিসাবে চিহ্নিত করার অসংখ্য উদাহরণ আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে বৃক্ষপোসনা ভারতে এখনও ধর্মীয় জীবন চর্চার অতি পরিচিত একটি অঙ্গ। ভারতের অরণ্য অধ্যুষিত রাজ্যগুলোয় অসংখ্য উপজাতি এখনও অরণ্য তথা প্রকৃতির উপাসক যাদের সমাজতত্ত্বের ভাষায় Animist বলা যায়।

প্রকৃতপক্ষে প্রাচীন ভারতীয়গণ বিশ্বজগতের বিভিন্ন উপাদান তথা উদ্ভিদ ও প্রাণীজগতকে আলাদাভাবে গণ্য করতেন না। মানুষ, জন্তুজানোয়ার, উদ্ভিদসহ সকল জীবন্ত বস্তুকে পরস্পর সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হতো। মানুষের প্রতিটি কাজ এমনকি পারস্পরিক সম্পর্ককেও কোন না কোনভাবে প্রকৃতির সঙ্গে (সাদৃশ্য হলেও) সম্পর্কযুক্ত বলে মনে করা হতো। ঋগ্বেদে বলা হয়েছে যে জল ও বাতাস আমাদের জন্য অমৃত বহন করে নিয়ে আসে। আমাদের গাছগাছালিও অমৃতময় হোক। আমাদের প্রভাত ও রাত এখনই মধুময় হোক। অমৃতময় হোক আমাদের বৃক্ষরাজি, সূর্য প্রাণীসহ সংস্কৃতির সমস্ত বিষয় (ঋগ্বেদ

১-৯-৬-৮)। প্রাচীন সাহিত্যে হনুমান ও গণপতিকে দেবতা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋগ্বেদ অশ্বত্থ (পিপল), গঙ্গা, হিমবাহ, তুলসী, বটবৃক্ষকে অত্যন্ত পবিত্র বলে বর্ণনা করা হয়েছে, যা এখনও সমানভাবে পবিত্র হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। বৈদিক আর্যরা প্রকৃতির চারটি প্রধান উপাদান যেমন — সূর্য (মিত্র), অগ্নি (আগুন), পৃথি (মাটি), ও আকাশ (দ্যু) ইত্যাদিকে জীবন ধারণের অপরিহার্য অঙ্গ বলে বর্ণনা করেছেন যাদের তারা দেবতাজ্ঞানে পূজা করতেন। আয়ুর্বেদিক ঔষধ সম্পর্কে লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ চরক সংহিতা প্রাকৃতিক উপাদানের গুণাগুণ সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। এখানে মানুষের উপকারের গাছ গাছালিকে আয়ুর্বেদ (অর্থাৎ (divine herbs) হিসাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে যাদের সংরক্ষণের কথা বারবার গুরুত্ব সহকারে বলা হয়েছে মানুষের নিজস্ব প্রয়োজনেই। তাছাড়া দূষণমুক্ত পরিবেশ তথা আদর্শ গ্রাম ও শহরের খনি, জল, মাটি ইত্যাদি বিষয়ের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে এখানে।

বৃক্ষরোপণ ও তাদের উপকারিতা সম্পর্কে বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় পুরাণ সাহিত্যগুলিতে, অগ্নি পুরাণ ও বরাহ পুরাণে বৃক্ষরাজি থেকে প্রাপ্ত উপকারিতার বর্ণনা পাওয়া যায়। দুর্গা সপ্তমীতে বলা হয়েছে যে যতদিন পর্যন্ত ধরিত্রীমাতা বৃক্ষরাজির দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে ও পাহাড়সমূহ অরণ্য আচ্ছাদিত থাকবে ততদিন পর্যন্ত ধরিত্রী মানব সভ্যতাকে সযত্নে পালন করবে। সুতরাং একথা বলতে কোন বাধা নেই যে প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের সংরক্ষণ ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করার ভাবনা প্রাচীন ভারতীয় চিন্তাভাবনার মধ্যে উজ্জ্বলভাবে উপস্থিত ছিল। এই ধরনের চিন্তার পেছনে প্রধান চালিকা শক্তি ছিল মানুষ ও তার সমাজের সার্বিক উন্নতি ঘটানো যেখানে প্রকৃতি ও প্রাণহীন জড়পদার্থ সমূহের সঙ্গে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ককে পরস্পরের প্রয়োজন হিসাবে মনে করা হতো। এই ধরনের ভাবনা রাষ্ট্রীয় নীতিতেও পাওয়া গেছে। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র রাষ্ট্রীয় নীতিতে অরণ্যের গুরুত্বকে স্বীকার করেছে (জনপদনিবেশ ও বসুধৈবকুটুম্বকম, বসুকুটুম ইত্যাদি।

প্রাচীন ভারতের বিশেষ করে মৌর্য শাসনকালে সংরক্ষিত অরণ্য (Reserve Forest) ও অভয়ারণ্য (Sanctuary)-র ধারণারও বিকাশ ঘটেছিল। সম্রাট আশোকের আমলে বৃক্ষরাজির গুরুত্ব সম্পর্কে জনসচেনতা বৃদ্ধির প্রয়াসও লক্ষ্য করা যায়। অশোকের সপ্তম স্তম্ভ লিপিতে তাই দেখা যায় যে অর্ধক্রোশ অন্তর অন্তর আমগাছ লাগিয়েছিলেন মানুষ ও পশুপাখীর ব্যবহারের প্রয়োজনে।

প্রাচীন ভারতের সংস্কৃত সাহিত্যে-অরণ্যের বারবার উল্লেখ পাওয়া যায়। নৈমিষ্যারণ্য, অশোকবন, চম্পারণ্য, দণ্ডকারণ্য ইত্যাদি অরণ্যের কথা বারবার রামায়ণ ও মহাভারতে উল্লিখিত হয়েছে। প্রাচীনকালের কবি - সাহিত্যিকরা প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সুসম্পর্ক বজায় রাখার কথা বারবার উল্লেখ করেছেন।

মধ্যকালীন ভারতেও প্রকৃতি ও মানুষের সম্পর্ককে নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। সুলতানী ও মুঘল

আমলে মানুষের সুবিধার জন্য জাতীয় উদ্যান ও বাগিচা নির্মাণ ছিল ভারতের অতি পরিচিত একটি বিষয়। শেরশাহের আমলে রাস্তার দুইধারে ছায়া ও ফলপ্রদানকারী বৃক্ষরোপনের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। বৃক্ষ ও ফল-ফুল প্রদানকারী গাছগুলিকে শুধুমাত্র মানসিকভাবে উপভোগ নয়, খাদ্যসামগ্রীর যোগানদাতা হিসাবে গুরুত্ব দেওয়া হতো এই সময়। তাছাড়া ঔষধ, আসবাবপত্র ও গৃহ নির্মাণে বৃক্ষের গুরুত্বকে স্বীকার করা হতো।

সাধারণভাবে মনে করা হয় যে প্রাচীন ও মধ্যযুগে ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতিতে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের যে সদ্ভাব রাখার প্রয়াস লক্ষ্য করা যায় তা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় কোন নেতিবাচক প্রভাব ফেলেনি। তবে একথা ভুললে চলবে না যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন অঞ্চলে কৃষি সভ্যতার বিকাশ ও বাধা নির্মাণ নিঃসন্দেহে অরণ্য ধ্বংস ও পাহাড়ের স্বাভাবিক আকারের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল। তাছাড়া নদীবাঁধ নির্মাণও ছিল ভারতের একটা ঐতিহ্য। তবে প্রাক্-আধুনিককালের উন্নয়ন প্রক্রিয়া প্রকৃতির কোন সমস্যার তৈরী করেনি, এমনকি শিল্প কারখানাগুলোও তেমনভাবে প্রকৃতির পক্ষে ক্ষতিকারক পদার্থ উৎপাদন করতো না। তবে চিনি ও চর্মশিল্পের বর্জ্য বহতা নদীর পক্ষে ক্ষতিকারক ছিল। এছাড়া সামাজিক ও রাজনৈতিক আধিপত্য প্রদর্শন করার ভারতের শাসক শ্রেণীর মৃগয়া বা পশুশিকার করার প্রথা নিঃসন্দেহে অরণ্যের জীববৈচিত্র্যের পক্ষে অশুভ ছিল।

ভারতে ব্রিটিশ শাসনের সূচনা ও ভারতীয় চিরাচরিত ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্পের পতন্মোমুখতা ভারতের প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহারের রাস্তা তৈরী করে। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ভাগ থেকে ভারতে আধুনিক শিল্পায়ন প্রক্রিয়ার ও দ্রুতগতিতে বাগিচা শিল্প, পাট, বস্ত্র, লৌহ ও ইস্পাত ও পরিবহন, রাস্তাঘাট ও খনিশিল্পের বিকাশ ভারতের প্রাকৃতিক পরিবেশের ভারসাম্যে নানাধরনের সমস্যা তৈরী করে। রেল লাইনের দ্রুত বিকাশের জন্য অরণ্য ও পাহাড় ধ্বংস, জ্বালানীর জন্য নির্বিচারে কয়লা উত্তোলন ও তৈল শোধনাগার স্থাপন, অভ্যন্তরীণ পরিবহন ব্যবস্থার দ্বারা সৃষ্ট বর্জ্য পদার্থের নিক্ষেপ, লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের ও অন্যান্য শিল্পের বিকাশ পরিবেশ সমস্যাকে তীব্র করতে থাকে। স্বাধীনতার পর খাদ্য সমস্যার সমাধান ও ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পরিকল্পিত অর্থনীতির বিকাশ পরিবেশের ভারসাম্যকে আরো বিনষ্ট করে ফেলে, তথাকথিত সবুজ বিপ্লব, বহুমুখী নদী পরিকল্পনা ভারীশিল্পের বিকাশ ইত্যাদি ভারতের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সঙ্গী হয়েছে ঠিকই কিন্তু পাশাপাশি এগুলি উন্নয়ন ও পরিবেশের সুসম্পর্ককে গুরুত্ব দেয়নি।

তবে এখানে উল্লেখ্যনীয় যে ঔপনিবেশিক শাসনের সময়েও ভারতের প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল। এক্ষেত্রে অরণ্য সংক্রান্ত আইন বিশেষত 1927 খ্রীঃ Indian Forest Act, Indian Fisheris Act 1897, Share Nuisance Act, Indian Part Act, ইত্যাদির কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্যনীয়। স্বাধীনোত্তরকালে ভারতে ঔপনিবেশিক আমলের পরিবেশ সংক্রান্ত আইনানুসারে ধারাবাহিকতা

ছাড়াও কতগুলি নতুন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। 1972-এর স্টকহোম সম্মেলনের সুপারিশক্রমে গৃহীত Indian Water Act (1974), Environmental Practition Act 1986, 1988, Ganga Action Plan (1985), NEERI, CETP, 1988-এর দ্বারা সৃষ্ট State ও Central Pollution Control Boards ইত্যাদি সমসাময়িককালের পরিবেশ দূষণ সমস্যার মোকাবিলা করার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে।

কিন্তু ভারতের মত জনবহুল দেশে যেখানে দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষের সংখ্যা 25% থেকে 50% (অঞ্চলভেদে), শিক্ষা, বিদ্যুৎ, পানীয়জল ও স্বাস্থ্যের ন্যূনতম পরিকাঠামো বিহীন হাজার হাজার গ্রাম, দূষণমুক্ত অসংখ্য নদী ও জলাশয়, সেখানে অর্থনৈতিক উন্নয়নের সময় প্রকৃতির উপর সাময়িকভাবে নজর দেওয়া সম্ভব কিনা সেই প্রসঙ্গ বারবার উঠে আসছে। যেহেতু মানুষের নিজের স্বার্থেই পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করা একান্ত দরকার তাই ভারতের পরিবেশ ও উন্নয়নের পক্ষে অনুকূল ভারতের এমন প্রথা ও সামাজিক রীতিনীতি সমূহের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। উন্নয়ন পরিবর্ত হিসাবে প্রাচ্যের যে প্রথাগুলি প্রকৃত অর্থে কার্যকরী হতে পারে সেই সম্পর্কে এবার একটু আলোকপাত করা যাক।

প্রথমতঃ প্রাকৃতিক উপাদানসমূহের নির্বিচারে ব্যবহার না করার যে দার্শনিক ভাবনা ভারতীয়দের জনমানসে তৈরী হয়েছিল অতি প্রাচীনকালেই তাকে পরিবেশ চেতনার কাজে লাগানো যেতে পারে। ভারতীয়দের ধর্মীয় সংস্কৃতিতে প্রকৃতির উপাদানকে যেভাবে দেবতাজ্ঞানে ভক্তির প্রথা তৈরী হয়েছে তাকে শুধুমাত্র কুসংস্কার ভেবে উড়িয়ে না দিয়ে তাদের যৌক্তিকতা বিচার করে প্রাকৃতিক সম্পদের সংরক্ষণের একটা মানসিক ভীত গঠনের জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের উপর সম্পূর্ণভাবে নির্ভরশীল ভারতের বিভিন্ন জনগোষ্ঠী বা প্রথাগত জীবিকাগোষ্ঠী (traditional professional caste) তাদের জীবিকার উৎসকে রক্ষা করার জন্য যে সমস্ত চিরাচরিত প্রথার প্রচলন করেছে সেগুলিকে common property সমূহের চিরস্থায়ী ব্যবহারের পরিবর্ত হিসাবে ভাবা যেতে পারে। যেমন প্রথাগত মৎসজীবী জাতিগুলি মাছের ডিম ছাড়া বা পোনা তৈরী হওয়ার সময় কিছুদিন মাছ ধরা বন্ধ করার জন্য জাল পলানী (জালকে লুকিয়ে রাখা) উৎসব পালন করে বা জলকে দেবী (গঙ্গা) জ্ঞানে আরাধনা করে। এই ধরনের প্রথাগুলি জলজ জগতের সামঞ্জস্য বজায় রাখার কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে। অন্যদিকে অরণ্যকে সকলের সম্পত্তি (Common Property) ভেবে ভারতীয় বিভিন্ন উপজাতি যে সমস্ত প্রথা মেনে আসছে সেগুলি অবশ্যই অরণ্য সংরক্ষণের পক্ষে সহায়ক হতে পারে (যেহেতু অরণ্য সংলগ্ন অঞ্চলে উপজাতিদেরই বসবাস বেশী)।

তৃতীয়তঃ নির্বিচারে বৃহৎ শিল্পায়ন যেহেতু অধিক পরিমাণে পরিবেশ দূষণ ঘটায় তাই ভারতের প্রথাগত কুটিরশিল্পকে শিল্পায়নের পরিবর্ত হিসাবে ভাবা যেতে পারে। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষুদ্রশিল্প ভারতের মতো দেশের উন্নয়ন ঘটানোর জন্য যথেষ্ট নয়।

চতুর্থতঃ শ্রীমদ্ভাগবদগীতার বাণী উন্নয়নের পরিবর্ত পথের দিশার সন্ধান দিতে পারে। গীতার উন্নয়ন দর্শনের দুটো দিক আছে। একটা হলো মানুষের চাহিদা পূরণ করা, অন্যটি হলো চূড়ান্ত আত্মিক উন্নয়ন (Spiritual Development) বা ইহ জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করা। আপাতদৃষ্টিতে উন্নয়নের এই দুটি দিক পরস্পর দ্বন্দ্বমূলক বলে মনে হলেও গীতা প্রকৃতপক্ষে এই দুটি উদ্দেশ্যের মধ্যে একটা মেলবন্ধন ঘটিয়েছে। গীতার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য দক্ষতা ও উৎপাদন বৃদ্ধির উপায় হিসাবে সঠিক কর্মের দিকে দৃষ্টি দিতে বলা হয়েছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য পৃথিবীর সকল জীবন্ত বস্তুর প্রতি বন্ধুত্বমূলক ব্যবহার, ইহ জগতের বন্ধন থেকে মুক্তি, কর্মের ফল আশা না করা, ব্যর্থতা ও সাফল্যকে সমান দৃষ্টিতে দেখা (স্থিতপ্রজ্ঞ) প্রভৃতি বিষয়ের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করেছে গীতা।

গীতায় কর্ম অনুযায়ী অর্থ উপার্জনের প্রতিও আলোকপাত করা হয়েছে যা অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক উন্নয়নের জন্য দরকার। সঙ্গে সঙ্গে অর্থ উপার্জনের জন্য সৎ পথ (অর্থাৎ ধর্ম দ্বারা স্বীকৃত পথ), ব্যবহারের উপর গুরুত্ব দিয়েছে। গীতায় সকলের মানুষের স্বার্থে আর্থিক কেন্দ্রিকরণকে সমর্থন করা হয়েছে।

পঞ্চমতঃ ভারতের সনাতন আদর্শের দ্বারা সৃষ্ট ও বহু মনীষীর দ্বারা প্রচারিত উন্নয়ন সম্পর্কিত মূল্যবোধ পাশ্চাত্যের উন্নয়ন ধারণার পরিবর্ত হিসাবে চিহ্নিত হয়েছে। এক্ষেত্রে মহাত্মা গান্ধীর বাণীর কথা উল্লেখযোগ্য। গান্ধী মনে করতেন যে উৎপাদনের প্রধান ক্ষেত্র হওয়া উচিত গ্রাম যেখান থেকে উদ্বৃত্ত বিতরণসহ খাদ্য ও শ্রমিকের যোগান সম্ভব এবং যা মানুষের সার্বিক অর্থনৈতিক, সামাজিক ও আত্মিক উন্নতির পক্ষে সহায়ক। গান্ধীজী বক্তব্য ছাড়াও ভারতীয়দের সনাতন মূল্যবোধ বিশেষ করে পরিমিত ভোগ বিলাস, সম্পদ কেন্দ্রিকরণ না ঘটানো ও বিশ্ব জগতের সকলকে আপন ভাবার মধ্যে উন্নয়ন ও পরিবেশের দ্বন্দ্বমূলক সম্পর্কের একটা সুস্থ সমাধানের উপায় হিসাবে চিহ্নিত হতে পারে।

১০.৬.১৬.২ : উপসংহার

মানব সভ্যতার সার্বিক উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক বৃদ্ধি ও সুস্থ পরিবেশ দুটোই একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু সমস্যার সূত্রপাত হয় তখনই যখন উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক উপাদানের অপব্যবহার শুরু হয়। এই অপব্যবহারের পেছনে মানুষের অতিরিক্ত চাহিদা, অতিরিক্ত সম্পদ বাসনা বা দ্রুত উন্নয়নভাবনাসহ নানাবিধ কারণ দায়ী। মানুষের স্বার্থেই উন্নয়নের গতি বন্ধ করা সম্ভব নয়। তাই দরকার এমন এক ধরনের উন্নয়নের ধারণা যা প্রাকৃতিক সম্পদের অপব্যবহার বা অপচয় বন্ধ করবে ও মানুষের স্বার্থেই পরিবেশে দূষণ ঘটাবে না। এক্ষেত্রে পাশ্চাত্যের Sustable Development ও প্রাচ্যের উন্নয়নের ধারণা কোনটাই স্বয়ং সম্পূর্ণ নয়। এখানে প্রয়োজন প্রাচ্যের জীবনদর্শনের সঙ্গে পাশ্চাত্যের উন্নয়ন ধারণার সংমিশ্রণ (synthesis)।

১০.৬.১৬.৩ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। G.S. Monga (ed) : *Environment and Development,* New Delhi, Deep and Deep Publications Pvt. Ltd. 2001.

২। World Bank : World Development Report, Washington D.C. 1991.

৩। Rup Kumar Barman : *Fisheries and Fishermen : A Socio-economic history of colonial Bengal and Post colonial Bengal,* Delhi, Abjijeet Publications, 2008.

৪। K.S. Ramchandran (ed) : Development perspective, New Delhi, Vikas Publishing House. 1990.

১০.৬.১৬.৪ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। উন্নয়ন ও পরিবেশের সম্পর্ক আলোচনা করুন।

২। উন্নত ও উন্নয়নশীলদেশের উন্নয়নের ধারণা ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করুন।

৩। উন্নয়নের পরিবর্ত হিসাবে প্রাচ্যের ধারণা আলোচনা করুন।

————

ইতিহাস

দ্বি বার্ষিক সেমেস্টার ভিত্তিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম

এম এ তৃতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পাঠ – ১১

History of Science and Technology

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

Directorate of Open and Distance Learning (DODL),
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia.

বর্তমান গ্রন্থটি রচনায় মুখ্য ভূমিকা গ্রহন করেছেন

শ্রী বিদ্যুৎ পাতর, (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি.ও.ডি.এল. কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

শ্রী সুকান্ত প্রামাণিক, (সহকারী অধ্যাপক, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ডিসেম্বর ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও
নিউ স্কুল বুক প্রেস, ৩/২, ডিকসন লেন, কলকাতা – ৭০০ ০১৪ হইতে মুদ্রিত।

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত, মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.03.2018

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia,
West Bengal

SEMESTER- III

EC-9	4 CREDITS	100 MARKS	100 HOURS

EC. History of Science and Technology

BLOCK 1: Science and Empire

Unit-1: Theoretical perspectives and conceptual aspects of western science.
Unit-2: Debates on the nature and growth of western Science, Technology and Medicine (STM)
Unit-3: The role of STM in the colonial process.

BLOCK 2: Pre-colonial India

Unit-4: State of science and technology in late pre-colonial India.

BLOCK 3: Science and Colonial Explorations

Unit-5: East India Company and scientific explorations.
Unit-6: European scientists, surveyors, botanists, doctors under the company's service.

BLOCK 4: Development of scientific and technical education

Unit-7: Technical Education in the 19^{th} Century.
Unit-8: Some case studies of Technical Education in the 19^{th} Century--Calcutta Medical College, Guindy Engineering College, Thomason College (Roorkee), Bengal Engineering College etc.
Unit-9: Technical education in the 20^{th} Century.
Unit-10: Some case studies of Technical Education in the 20^{th} Century: Bengal Technical Institute, Bengal National College & School etc.
Unit-11: Establishment of scientific institutions.
Unit-12: Survey of India, Geological Survey of India etc.

BLOCK 5: Indian response to Western Science

Unit-13: Indian response to Western Science.
Unit-14: Impact of western science on the Indian society.

BLOCK 6: Science and Indian nationalism

Unit-15: Emergence of national science and its relations vis-à-vis colonial science
Unit-16: Radhanath Shikdar, Mahendralal Sarkar, P.N.Bose, P.C Ray, J.C Bose, M.N.Saha & S.N.Bose.

Content

Blocks	Author	Title	Page
Block-1	Dr. Sukanta Pramanik	Science and Empire	1-9
Block-2	Dr. Sukanta Pramanik	Pre-colonial India	10-13
Block-3	Mr. Bidyut Patar	Science and Colonial Explorations	14-26
Block-4	Mr. Bidyut Patar	Development of scientific and technical education	27-50
Block-5	Mr. Bidyut Patar	Indian response to Western Science	51-59
Block-6	Mr. Bidyut Patar	Science and Indian nationalism	60-99

পর্যায়- ১
একক- ১, ২, ৩

সূচীপত্র

১১.১.১.১. উদ্দেশ্য
১১.১.১.২. পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারণা এবং তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট
১১.১.২.৩. পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার উদ্ভব এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত বিতর্ক
১১.১.৩.৪. ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার (STM) ভূমিকা
১১.১.৩.৫. সহায়ক গ্রন্থ
১১.১.৩.৬. নমুনা প্রশ্ন

১১.১.১.১. উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের ইতিহাস সম্পর্কে পর্যালোচনা করা। পাশাপাশি পাশ্চাত্য বিজ্ঞান,প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার উদ্ভব, ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার বিকাশ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা এই অংশে করা হয়েছে।

১১.১.১.২. পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের ধারণা এবং তাত্ত্বিক প্রেক্ষাপট

বিজ্ঞান হল এমন একটি সম্ভাব্য সত্য যা কিছু অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গণ্য করা হয়। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান বলতে বোঝায় সেই সমস্ত জ্ঞান যা পরীক্ষাগারে গবেষণা করা হয় এবং গবেষনার পর সেটি বৈজ্ঞানিক গ্গান বলে গণ্য হয়। বিজ্ঞান কিছু পরীক্ষালব্ধ তথ্যের উপর নির্ভর করে। বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলি বিশ্লেষণ করা হয় বিষয়বস্তুর অবস্থান অনুযায়ী। বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা বোঝার জন্য এগুলির অবদান যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। এবং এগুলির প্রধান অবদান হল বিজ্ঞানের স্বাভাবিক মূল্য নির্ধারণ। বৈজ্ঞানিক কর্মপ্রচেষ্টা জ্ঞান উৎপাদনে বৈজ্ঞানিকদের প্রতিনিধি হিসেবে নিযুক্ত রাখে। বিজ্ঞান অর্থাৎ সম্ভাব্য তথ্যটি যদি পরীক্ষাগারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করা যায় তাহলে এটি বিজ্ঞান বলে গণ্য হবে না।

পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং অভিজ্ঞতা অর্থাৎ *Experiment* এবং *Experience*-এর ভিত্তিতে আমরা বিজ্ঞানকে প্রাচীন বিজ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞান-এই দুই ভাগে ভাগ করতে পারি। ষোড়শ শতাব্দীর সময়কালকে আমরা আধুনিক বিজ্ঞানের সূত্রপাত বলে মনে করতে পারি। কারণ এইসময় থেকে বৈজ্ঞানিক গ্যালিলিও প্রথম পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে শুরু করেন। ষোড়শ শতাব্দীর আগে পর্যন্ত সময়কালকে আমরা প্রাচীন বিজ্ঞানের যুগ বলতে পারি কারণ এইসময় সম্ভাব্য সত্য থাকলেও তা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার উপায় ছিল না। অর্থাৎ প্রাচীনকালের বিজ্ঞান এবং আধুনিক বিজ্ঞান এর মধ্যে পার্থক্য হল প্রাচীনকালের বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র পর্যবেক্ষণ এবং অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু আধুনিক যুগের বিজ্ঞান এর প্রধান ভিত্তি হলো পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাচীন প্রস্তর যুগে মানুষ ভোঁতা পাথরের অস্ত্রের সাহায্যেই শিকার করতো। ধারালো অস্ত্রের কার্যকারিতা সম্পর্কে তাদের মনে কোনো ধারণা ছিল না। কিন্তু কোনোভাবে ধারালো অস্ত্রের কার্যকারিতা জানার পর অর্থাৎ অভিজ্ঞতার পর মানুষ ধারালো অস্ত্র তৈরি করতে লাগল এবং এর মাধ্যমে নব্য প্রস্তর যুগ শুরু হল। এর ভিত্তিতেই পুরানো প্রস্তর যুগ এবং নব্য প্রস্তর যুগের পার্থক্য করা হয়।

বৈজ্ঞানিক জ্ঞান উৎপাদনে সামাজিক ক্ষেত্রের মতো প্রকৃতিরও ব্যাপক ভূমিকা আছে। এই প্রকৃতিতে যে সম্পদ আছে—বিভিন্ন সময় ধরে তা জানার পর মানুষ পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে তা বিজ্ঞানের পর্যায়ে উপনীত করে। সামাজিক ক্ষেত্রের প্রভাব থাকায় কেউ কেউ মনে করেন পদার্থের আপেক্ষিকতাবাদ-এর বিরুদ্ধে জ্ঞানতত্ত্বের আপেক্ষিকতাবাদের উত্তরণে প্রাকৃতিক বিশ্বের কোন ভূমিকা নেই। কারণ দুই দশক আগে বার্নস বলেছেন, সামাজিক গঠনমূলক কাজের মাধ্যমে প্রাকৃতিক জ্ঞান উৎপাদনে বাস্তবের কোনো ভূমিকা নেই। প্রত্যক্ষ কাজের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই এটি বোঝা যায়। কিন্তু আমরা বলতে পারি যে, প্রবল উদ্যমে যে সামাজিক বিশ্লেষণ করা হয় এই ধারণা হল তারই একটি উপজাত দ্রব্য। ভাস্কর রায় বৈজ্ঞানিক ধারণায় প্রাকৃতিক বিশ্বের ভূমিকা বোঝাতে গিয়ে বলেছেন, 'As a social process, irreducible to an individual acquisition, whose aim is the production of the knowledge of the mechanisms of the production of phenomena in nature.'

মানুষের সমস্ত কাজকর্ম, চিন্তাভাবনা বিজ্ঞানের দ্বারা পরিচালিত হয় না। এক্ষেত্রে অন্যান্য ক্ষেত্রের ভূমিকাও অনস্বীকার্য। এখানে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিস্ক্রিয়। সুতরাং বলা যায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির কাজ করার জন্য একটি সীমানা নির্ধারণ করা আছে। A.J Toyenbee তাঁর 'Age of Civilization' নামক গ্রন্থে বলেছেন, 'How thinks happened science has answer but why thinks happened science has no answer.' এই সময়েই বিজ্ঞানের ভূমিকা শেষ হয় এবং অধিবিদ্যা (metaphysics) তার কাজ করতে শুরু করে। এ প্রসঙ্গে ধর্মের কথাও উল্লেখযোগ্য। কারন ধর্ম অধিবিদ্যাকে বিশ্বাস করে এবং বিজ্ঞান পদার্থবিদ্যাকে বিশ্বাস করে। সুতরাং আমাদের বিশ্বাস করতে হয় যে, বিজ্ঞানের সীমা আছে। অন্যদিকে ধর্মও মানবজীবনকে গভীরভাবে প্রভাবিত করে। কখনও কখনও বিশেষ পরিস্থিতিতে মানুষ অন্য ক্ষমতার উপরেও নির্ভর করে। এক্ষেত্রে আবেগের ভূমিকা (সুখ, দুঃখ, কান্না, ভালবাসা ইত্যাদি) মানবজীবনে অপরিহার্য। এটি ধর্মের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভর করলেও প্রত্যক্ষভাবে নির্ভর করে না। কারন দান, দয়ালু মনোভাব, কল্যাণ প্রভৃতি ধর্মের গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য বলে বিবেচিত হয়। তাই আবেগ ধর্মের উপর পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল হয়। এই আবেগ এবং অনুভূতিগুলিও সমাজের বিকাশ ও শান্তির জন্য গভীরভাবে প্রয়োজনীয় এবং এক্ষেত্রে বিজ্ঞানের কোনো ভূমিকা নেই। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, বিজ্ঞানের একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে এবং বিজ্ঞান তার সীমার মধ্যেই কাজ করে।

সমাজতত্ত্ববিদরা কিভাবে বিজ্ঞানকে বিশ্লেষণ করে এবং বৈজ্ঞানিকরা কিভাবে সমাজতত্ত্বকে বিশ্লেষণ করে, তা একটি তত্ত্বের উপর নির্ভর করে। এটিকে বলা হয় 'constructivists perspective.' কোনো সমাজ যদি আবিষ্কৃত বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিকে গ্রহন না করে তাহলে বিজ্ঞানের বিকাশ হবে না। অর্থাৎ সেই সমাজকে নতুন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারকে গ্রহন করার মত যোগ্য হতে হবে। বিজ্ঞানের বিকাশের ক্ষেত্রে যে সামাজিক ক্ষেত্রের ভূমিকা আছে, তা মুলত প্রয়োজনের চাহিদা, মানসিক প্রস্তুতি প্রভৃতির উপর নির্ভর করে। অর্থাৎ বিজ্ঞানের গ্রহনযোগ্যতা সমাজের উপর নির্ভর করে। এই কারনে বলা হয়, 'All the scientific development are socially constructed.' সমাজতত্ত্ববিদরা বিজ্ঞানের এই বিকাশ বিশ্লেষণ করে।

সভ্যতার বিকাশের পরিমাপের ক্ষেত্রে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। Steven Yearly-র মতে এই বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সামাজিক গঠনগত দিক দিয়ে এক না হলেও গঠনতান্ত্রিক দিক দিয়ে তারা একই। এদের গুরুত্ব নির্ধারণে তিনি 'সামাজিক গঠনমূল্য' এবং 'রাজনৈতিক অর্থনীতির মূল্য' উপমা দুটি

ব্যবহার করেছেন। অর্থাৎ তাঁর মতে, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি হল একটি সামাজিক প্রতিষ্ঠান, যার বিকাশ পরিচালিত হয় একটি আভ্যন্তরীণ যুক্তির দ্বারা।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিশ্বব্যাপী হতে পারে কিনা? হলেও কিভাবে হয় এবং কেন হয়?—তা নির্ণয় করা বর্তমান দিনে একান্ত প্রয়োজনীয়। প্রাচীনকালে প্রচারমাধ্যম এত উন্নত ছিল না। কোন বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কৃত হওয়ার পর কোন একটি নির্দিষ্ট দেশ বা সমাজ এটি গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু অন্য সমাজ তথা দেশ আবার একটি গ্রহণ না করতেও পারে। বস্তুতপক্ষে মানব সমাজে কোন উদ্ভাবিত বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রয়োজনীয়তা নির্ভর করে সময়ের উপর। এছাড়া বিশ্বব্যাপী হওয়ার ক্ষেত্রে এখানে 'প্রয়োজনীয়তা' হল গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় ব্রিটিশরা ভারতে এসে প্রশাসনের সুবিধার্থে এবং নিজের উৎসাহে ভারতীয় সমাজ, সংস্কৃতি ইত্যাদি বিশ্লেষণ করেছিলেন। মরিস-ডে-মরিস এর মতে, প্রকৃত পক্ষে ভারতে কোনো শিল্পায়নই হয়নি। কারণ ভারতীয় সমাজ স্বয়ংসম্পূর্ণ ছিল। বস্তুতপক্ষে এখানে বিজ্ঞানের কোনো বিকাশ ছিল না। ভারতীয়দের প্রয়োজন মেটাবার জন্য যে প্রযুক্তি ছিল, তা ইউরোপীয়দের মত ছিল না। কারণ ইউরোপীয়দের মত ভারতীয়রা অন্য কোনো সমাজ বা উৎস থেকে বৈজ্ঞানিক বিকাশের কোন পন্থা গ্রহণ করতে অভ্যস্ত ছিল না। অর্থাৎ স্বয়ংসম্পূর্ণ হওয়ার কারণে কোন সমাজ বিজ্ঞানের কোনো আবিষ্কার গ্রহণ করতে নাও পারে। যদিও একটি সমাজের চাহিদা অন্য কোন সমাজের চাহিদা থেকে ভিন্ন হতে পারে। সুতরাং সময়ের নিরিখে এবং চাহিদার নিরিখে একটি সমাজ অন্য সমাজের মত যথাযথ নাও হতে পারে।

তবে বিজ্ঞানকে বিশ্বব্যাপী বলা যেতে পারে কারণ কিছু সময়ের জন্য একটি সমাজ বা একটি দেশ আবিষ্কৃত প্রযুক্তির উপর একচেটিয়া কর্তৃত্ব করলেও ধীরে ধীরে তা প্রসারিত হয়। যদি কোন সমাজের চাহিদা মেটানোর জন্য বিকল্প কোনো ব্যবস্থা থাকে, তাহলে সেই সমাজ নতুন বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি গ্রহণ নাও করতে পারে। এ প্রসঙ্গে George Basalla তাঁর 'The Spread of Western Science and Technology (1967)' প্রবন্ধে বলেছেন, বারুদ এবং চৌম্বকীয় কম্পাস সর্বপ্রথম চীনে আবিষ্কৃত হলেও প্রকৃত বিপ্লব এনেছিল ইউরোপের ক্ষেত্রে। কারন চীনে এই বারুদ ব্যাপক পরিমাণে ব্যবহার করা হয়নি। অর্থাৎ তাঁর মতে, এশিয়ার মানুষদের কোনো নতুন জিনিষকে গ্রহণ করার মত মানসিকতা ছিল না।

সামগ্রিক আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায় যে, বিজ্ঞানের সংজ্ঞা, সীমানা এবং সমগ্র বিশ্বে এর প্রয়োজনীয়তার ক্ষেত্রে 'সমাজ' একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। Zaheer Baber-এর গবেষণা মূলক তথ্য এবং বৈজ্ঞানিক ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা বলতে পারি, দেশ-কাল ভেদে কোনো সমাজ তথা দেশের উন্নতি নির্ভর করেছে বিজ্ঞান তথা প্রযুক্তির বিকাশের উপর।

১১.১.২.৩. পাশ্চাত্য বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার উদ্ভব এবং প্রকৃতি সম্পর্কিত বিতর্ক

ত্রয়োদশ শতাব্দীর আগের সময় সমস্ত কিছুই তালপাতার উপর লেখা হত। প্রাচীন যুগে বিভিন্ন জ্ঞান ব্রাহ্মণদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। উচ্চশ্রেণীর ব্রাহ্মণরা কৃষি, জ্যোতির্বিদ্যা প্রভৃতি সম্পর্কে তাদের জ্ঞান সাধারণ মানুষের সঙ্গে বিনিময় করত না। কিন্তু তারপর ধীরে ধীরে বিভিন্ন বিদেশি, আরব এবং ইংরেজদের দ্বারা বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি বিকাশ লাভ করল।

ভারতের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিকাশের আলোচনার ক্ষেত্রে তিনটি স্কুলের আলোচনা উল্লেখের দাবি রাখে—(১) Colonial School (২) Orientalist School এবং (৩) Nationalist School.

১) Colonial School : উনিশ শতকে ভারতে ব্রিটিশ শাসকদের একটি অংশ ভারতের ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম প্রভৃতির চর্চা করেন নি। তারা ছিলেন শুধুমাত্র প্রশাসক। তাদের মতে, ভারত আদৌ সভ্য ছিল না এবং সুসভ্য ইংরেজরা ভারতকে সভ্য করতে এসেছে। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন জেমস মিল, চার্লস গ্রান্ট, টি বি মেকলে প্রমুখ। তাদের মতে ভারতীয় সমাজের শুধুমাত্র প্রারম্ভিক বিকাশ (Rudimentary Nature) হয়েছে। এখানে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতনতার অভাব আছে। ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা ছিল তাদের মতে, 'laughter of girls of an English boarding school.' অর্থাৎ তাঁরা ভারতীয় সমাজ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেন নি।

২) Orientalist School : এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন এইচ. টি. প্রিন্সেপ, কোলব্রুক এবং উইলিয়াম জোন্স। ওরিয়েন্টালিস্টরা ভারতের বিভিন্ন ভাষার গ্রন্থ অনুবাদ করেছিলেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটিতে সেগুলি রাখা হয়েছিল এবং এর মাধ্যমে এশিয়ার সংস্কৃতি নিয়ে গবেষণা করা হয়। তাদের মতে অতীতে ভারতীয় বিজ্ঞান খুবই সমৃদ্ধ ছিল।

৩) Nationalist School : উনিশ শতকে বাংলায় নবজাগরনের সময় বেশ কিছু বুদ্ধিজীবীর আবির্ভাব হয়। এই সমস্ত জাতীয়তাবাদীদের মতে, ভারতীয় সমাজ, বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি খুবই সমৃদ্ধশালী ছিল এবং অন্যান্য দেশের বিকাশের মূল উৎস ছিল এই ভারত। বস্তুতপক্ষে ভারতের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিকাশের সম্পর্কে এটি ছিল কাল্পনিক মতবাদ।

প্রাচীন ভারতের বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রের মতো চিকিৎসাবিদ্যা এবং তার অনুশীলনীর বিকাশও অতি সমৃদ্ধশালি হয়েছিল। যদিও সুপ্রাচীন যুগের চিকিৎসাবিদ্যা বিভিন্ন বুদ্ধিজীবী এবং সামাজিক রীতিনীতি থেকে উৎপত্তি লাভ করেছিল, তবুও সে কিছু মৌলিক ধারনা এবং ঔষধ প্রণালী সম্বন্ধে ধারণা দিয়েছিল। এগুলি সাধারণভাবে আয়ুর্বেদ এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা যায়। এই আয়ুর্বেদের আভিধানিক অর্থ হল 'দীর্ঘায়ু বিজ্ঞান' (the science of longevity).

প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যে চরক সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত সংহিতা' (200B.C.E-400A.D.) ঐশ্বরিক উৎপত্তির ফলাফল হিসেবে সাধারণত বর্ণিত হয়েছে। ঐশ্বরিক উৎপত্তির একটি ধারণা পরোক্ষভাবে প্রকাশ করে যে চূড়ান্ত সত্যের একটি সম্পূর্ণ এবং গুপ্ত ব্যবস্থার দ্বারা আয়ুর্বেদ গঠিত হয়েছে। এই কারণে আয়ুর্বেদ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্পন্ন নয়। বিজ্ঞান এবং চিকিৎসার ঐতিহাসিকরা এই মতামত প্রকাশ করেছেন যে, আয়ুর্বেদের ঐশ্বরিক চরিত্রের ধারণা হল ধর্মীয় গোঁড়ামির একটি প্রতারণা। প্রচলিত ধর্মমত বিরুদ্ধ কঠোর রক্ষণশীল পণ্ডিতদের দ্বারা এই প্রক্রিয়াটি চিকিৎসা তত্ত্বের নানাবিধ অংশকে পুঞ্জীভূত এবং সুসংবদ্ধ করেছিল। এই প্রক্রিয়াটি সাধিত হয়েছিল বৈদিক এবং বৌদ্ধ যুগে। এ প্রসঙ্গে জনৈক পণ্ডিত মন্তব্য করেছেন যে, 'Hinduism assimilated the store house of medical knowledge into its socio-religious intellectual tradition and by the application of an orthodox veneer rendered it into a Brahmanic science.' এই মন্তব্য বিভিন্ন দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ আয়ুর্বেদের ঐশ্বরিক উৎপত্তির ধারনা স্বত্তেও প্রাচীন ভারতের চিকিৎসাবিদ্যার চর্চাটি মুলত যুক্তিসংক্রান্ত অভিজ্ঞতাগত পর্যবেক্ষণের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। সমাজ ইতিহাসের বিভিন্ন পদ্ধতির মাধ্যমে এগুলি বারবার চর্চা করা হত। ইতিহাসের বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে চিকিৎসকদের বিভিন্ন গোষ্ঠী আয়ুর্বেদের সাথে যুক্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচনায় সাহায্য সাহায্য করেছিলেন। এই দুটি হল 'চরক সংহিতা' এবং 'সুশ্রুত সংহিতা'। এই দুটি গ্রন্থে ঔষধ প্রনালী এবং শল্য চিকিৎসা পদ্ধতির মাধ্যমে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্ক, রোগের বিভিন্ন তত্ত্ব, উপসর্গের দ্বারা বিভিন্ন রোগ

নির্ণয়, ভেষজ পদ্ধতি, চিকিৎসা পদ্ধতি প্রভৃতি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে। মূলত চরক সংহিতা থেকে ঔষধ প্রণালী এবং সুশ্রুত সংহিতা থেকে শল্যচিকিৎসার বিভিন্ন পদ্ধতির বর্ণনা পাওয়া যায়। সুশ্রুত সংহিতাতে শল্যচিকিৎসার ১২০ টি যন্ত্রপাতির বিবরণ পাওয়া যায়।

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস মানব ইতিহাসের ন্যায় প্রাচীন। সুদূর অতীতে মানব প্রজাতির বিকাশের সাথে সাথেই চিকিৎসাবিদ্যাও বিকশিত হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক কাল থেকে ঔষধ হিসাবে উদ্ভিদ (herbalism), পশুর দেহের বিভিন্ন অংশ, এবং খনিজ পদার্থ ব্যবহার করা হতো। অনেক ক্ষেত্রে পুরোহিত, shamans বা চিকিৎসকরা এই উপকরণগুলিকে ঐন্দ্রজালিক পদার্থ হিসাবে ব্যবহার করতেন। সুপরিচিত কিছু আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাসমূহের কথা বলা যায় যেমন, প্রাণবৈচিত্র্য (আত্মার অনিবার্য বস্তু সম্পর্কে ধারণা), আধ্যাত্মিকতা দেবতাদের কাছে আপীল বা পূর্বপুরুষের আত্মার সাথে আলাপ করা; (Shamanism) রহস্যময় ক্ষমতার সঙ্গে ব্যক্তির পরিচিতি; এবং ভবিষ্যৎবাণী চিকিৎসা নৃতত্ত্বের ক্ষেত্রগুলি মূলত স্বাস্থ্য ।(জাদুর মাধ্যমে সত্যকে প্রাপ্তি), স্বাস্থ্যসেবা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলির দ্বারা আমাদের সংস্কৃতি ও সমাজের চারপাশ কী করে সংগঠিত বা প্রভাবিত হয় এমন উপায়গুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা করে দেখে।

প্রাচীন যুগ

মহান গ্রিক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস কে চিকিৎসাবিজ্ঞানের জনক বলা হয়ে থাকে। প্রাচীন গ্রেকো-লাতিন সংস্কৃতির আরেকজন বিখ্যাত চিকিৎসক হলেন গ্যালেন।

প্রাচীন চিকিৎসার প্রমাণগুলি পাওয়া গেছে মিশরীয় ঔষধ, বেবিলনিয়ান ঔষধ, আয়ুর্বেদিক ঔষধ (যা ভারতীয় উপমহাদেশে সুপ্রচলিত ছিল), ক্লাসিক্যাল চীনা ওষুধ (যাকে আধুনিক ঐতিহ্যবাহী চীনা ওষুধের পূর্বসূরি বলে ধারণা করা হয়), প্রাচীন গ্রিক ঔষধ এবং রোমান ঔষধ থেকে।

মিশরের ইমহোতেপ (৩য় সহস্রাব্দের বিসি) ছিল প্রথম পরিচিত চিকিৎসক যা ইতিহাসে পাওয়া যায় । ২০০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দ থেকে প্রাচীনতম মিশরীয় চিকিৎসা পাঠ্যক্রমটি কাহুন গাইনোকোলজিক্যাল প্যাপিরাস নামে পরিচিত যা মূলত গাইনোকোলজিক্যাল রোগের বর্ণনা দেয়ার ক্ষেত্র ব্যবহৃত হতো। ১৬০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে এডউইন স্মিথ প্যাপিরাস সার্জারির উপর প্রথম কাজ করেছিলেন, আর ১৫০০ খ্রিস্টপূর্বাব্দে Ebers Papyrus কাজ করেছিলেন যা চিকিৎসা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকের অনুরূপ ছিল।

চীনে চিকিৎসা বিষয়ক প্রত্নতাত্ত্বিক যে প্রমাণগুলি পাওয়া যায় তা ছিল ব্রোঞ্জ যুগের নিদর্শন । তখন সেখানে শং রাজবংশের শাসন চলিতেছিল । চীনে অস্ত্রোপচারের জন্য বনজঙ্গল থেকে সংগৃহীত বীজ ব্যবহৃত হতো । Huangdi Neijing ছিল চীনের চিকিৎসা শাস্ত্রের জন্য মাইল ফলক যা ছিল দ্বিতীয় খ্রিস্টপূর্বাব্দের শুরু এবং তৃতীয় শতাব্দীতে লেখা একটি মেডিকেল পাঠ।

ভারতে, শল্যচিকিৎসক Sushruta প্লাস্টিকের অস্ত্রোপচারের প্রাচীনতম রূপসহ অসংখ্য অস্ত্রোপচারের বর্ণনা দিয়েছেন। অস্ত্রোপচারের সবচেয়ে পুরনো রেকর্ডগুলি পাওয়া যায় শ্রীলংকার মিহিনটলে অবস্থিত উৎসর্গীকৃত হাসপাতালে , যেখানে রোগীদের জন্য সুষম চিকিৎসা ব্যবস্থার প্রমাণ পাওয়া যায়।

গ্রীসে, গ্রীক চিকিৎসক হিপোক্রেটিস যাকে 'পশ্চিমা চিকিৎসা শাস্ত্রের জনক বলা হয়', তিনিই প্রথম ঔষধের যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতির ভিত্তি স্থাপন করেন। হিপোক্রেটিসই চিকিৎসকদের জন্য হিপোক্রেটিক ওথ চালু করেছিলেন, যা এখনও প্রাসঙ্গিক এবং আজ অবধি ব্যবহৃত হয়ে আসতেছে । রোগকে তখনি প্রথম acute, chronic, endemic and epidemic হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছিল। তাছাড়া তাদেরকে "exacerbation, relapse,

resolution, crisis, paroxysm, peak, and convalescence" হিসাবেও শ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছিল । গ্রীক চিকিৎসক গ্যালেন প্রাচীন বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সার্জন ছিলেন বলে ধারণা করা হয় । মস্তিষ্ক ও চক্ষু অস্ত্রোপচার সহ অনেক অদ্ভুত অপারেশন তিনি করেছিলেন। পশ্চিমা রোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর এবং মধ্যযুগীয় যুগের সূচনা হওয়ার পরে পশ্চিম ইউরোপে ঔষধের গ্রীক ঐতিহ্য হ্রাস পেতে থাকে, যদিও এই পদ্ধতিটি পূর্ব রোমান (বাইজানটাইন) সাম্রাজ্যের মধ্যে অব্যাহত ছিল।

১ম সহস্রাব্দের দিকে প্রাচীন হিব্রু চিকিৎসা পদ্ধতির অধিকাংশই তওরাত থেকে আসে । যেমন মুসা (আ) এর পাঁচটি বই, যা বিভিন্ন স্বাস্থ্য সংক্রান্ত আইন এবং রীতিনীতিগুলি ধারণ করে। আধুনিক ঔষধের উন্নয়নে হিব্রুদের অবদান বাইজেন্টাইন যুগে শুরু হয়েছিল ইহুদি চিকিৎসক আসফ এর মাধ্যমে।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগে মুসলিম বিজ্ঞানীদের হাতে চিকিৎসাক্ষেত্রে প্রভূত উন্নতি সাধিত হয়। মুসলিম বিজ্ঞানীদের মধ্যে আবু আলী হোসাইন ইবনে সিনা সবচেয়ে বিখ্যাত। মধ্যযুগীয় জ্ঞান-বিজ্ঞানের ভিত রচনায় তার অবদান অনস্বীকার্য। তার মূল অবদান ছিল চিকিৎসা শাস্ত্রে। তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রের বিশ্বকোষ আল-কানুন ফিত-তীব রচনা করেন যা ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্তও প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় ও মেডিকেল প্রতিষ্ঠানসমূহে পাঠ ছিল। আরবিতে ইবন সীনাকে আল-শায়খ আল-রাঈস তথা জ্ঞানীকুল শিরোমণি হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়। পশ্চিমে তিনি *অ্যাভিসিনা* নামে পরিচিত। তাকে চিকিৎসাবিজ্ঞানের একজন জনক হিসেবে সম্মান করা হয়ে থাকে।

৭৫০ খ্রিষ্টাব্দের পর মুসলিম বিশ্বের হাতে ছিল হিপোক্রেটস, Galen এবং Sushruta আরবি অনুবাদিত অনুলিপি । তাছাড়া ইসলামী চিকিৎসকগণ কিছু গুরুত্বপূর্ণ চিকিৎসা গবেষণার সাথেও জড়িত ছিল। উল্লেখযোগ্য ইসলামিক চিকিৎসা অগ্রগামীদের মধ্যে রয়েছে ফারসি আভিসিনা, ইমহোটেপ ও হিপোক্রেটসের সাথে তাকেও 'মেডিসিনের জনক' বলা হয়। তিনি কানুন অফ মেডিসিন গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন যা চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে বিখ্যাত বইগুলির মধ্যে একটি বলে গণ্য করা হয়। এছাড়া আবুলকাসিস, আভেনজার, ইবনে আল নাফিস, এবং আভিরোস ও তাদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন। Rhazes গ্রিক theory of humorism নিয়ে প্রথম প্রশ্ন করেছিল, যা মধ্যযুগীয় পশ্চিমা ও মধ্যযুগীয় ইসলামী চিকিৎসা পদ্ধতিতে খুবই প্রভাবশালী ছিল। শিয়া মুসলমানদের অষ্টম ইমাম আলি-আল-রাধা Al-Risalah al-Dhahabiah রচনা করেছিলেন যা আজ অবধি চিকিৎসা বিজ্ঞানের সবচেয়ে মূল্যবান ইসলামি সাহিত্য হিসেবে সম্মানিত। ফারসি বিমরস্তান হাসপাতালগুলি পাবলিক হাসপাতালগুলির মধ্যে প্রাথমিক উদাহরণ হিসাবে গণ্য করা হয়।

ইউরোপে, শার্লিমেন ঘোষণা করেছিলেন যে প্রতিটি ক্যাথিড্রাল এবং মঠের জন্য একটি হাসপাতালকে সংযুক্ত করা উচিত । ইতিহাসবিদ জ্যফ্রে ব্লেইন মধ্যযুগের স্বাস্থ্যসেবার ক্যাথলিক চার্চের কার্যক্রমগুলিকে একটি কল্যাণ রাষ্ট্রের প্রাথমিক সংস্করণের সাথে যুক্ত করেছিলেন । যেখানে বয়স্কদের জন্য হাসপাতাল, অনাথ শিশুদের জন্য এতিমখানা এবং সব বয়সের রোগীদের জন্য ঔষধ, কুষ্ঠরোগীদের জন্য থাকার জায়গা; এবং তীর্থযাত্রীদের জন্য হোস্টেল বা inns যেখানে তারা সস্তায় বিছানা এবং খাবার কিনতে পারবে। এটি দুর্ভিক্ষের সময় জনসাধারণের জন্য খাদ্য সরবরাহ এবং দরিদ্রদের মধ্যে খাদ্য বিতরণের ব্যবস্থা করে। এই কল্যাণ ব্যবস্থাটি মূলত গির্জা অর্থায়ন করতো । এই বড় আকারের টাকা তারা কর সংগ্রহের মাধ্যমে সম্পন্ন করতো যার মূল উৎস ছিল বৃহৎ কৃষিভূমি এবং এস্টেটগুলি। বেলডিসটাইনের আদেশটি তাদের মঠগুলিতে হাসপাতাল ও রোগীর স্থাপনা

নির্মাণ করাতে ব্যাপক ভূমিকা রেখেছিল, ক্রমবর্ধমান চিকিৎসা সেবার জন্য এবং তাদের জেলাসমূহের প্রধান চিকিৎসা সেবা গ্রহণকারীর জন্য Abbey of Cluny সুপরিচিত ছিল। এছাড়াও গির্জা ক্যাথেড্রাল স্কুল এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিল যেখানে চিকিৎসা বিদ্যা অধ্যয়ন করা যেতো । মধ্যযুগীয় ইউরোপের সালেনোতে গ্রিক ও আরব চিকিৎসকগণের চিকিৎসা শাস্ত্র অধ্যয়নেরর জন্য সেরা মেডিকেল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যার নাম ছিল Schola Medica Salernitana.

তবে, চৌদ্দ এবং পঞ্চদশ শতকের কালো মৃত্যু মধ্যপ্রাচ্য ও ইউরোপ উভয়কেই ধ্বংস করে দিয়েছিল । তাছাড়া তর্কবিতর্ক করা হয়েছিল যে মধ্যপ্রাচ্যের তুলনায় পশ্চিম ইউরোপ সাধারণত আরও বেশি কার্যকর ছিল রোগ মুক্তির জন্য । প্রাক আধুনিক যুগে, চিকিৎসা বিদ্যা এবং শরীর বিদ্যা বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাথমিক পরিসংখ্যান ইউরোপে আবির্ভূত হয়েছিল, যার মধ্যে Gabriele Falloppio এবং William Harvey এর নাম অন্যতম।

চিকিৎসা সংক্রান্ত চিন্তাভাবনায় প্রধান পরিবর্তন ক্রমবর্ধমান প্রত্যাখ্যানটাই ছিল একটি আলোচ্য বিষয় যা মূলত চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বিশেষভাবে কালো মৃত্যুর সময় যাকে 'traditional authority' বলা যেতে পারে চিকিৎসা ও বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে । Andreas Vesalius 'De humani corporis fabrica' নামে একটা বই লিখেছিলেন যা মানব অঙ্গ গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ বই। ১৬৭৬ সালে এন্টোনি ভ্যান লিউভেনহোক একটি মাইক্রোস্কোপ দিয়ে ব্যাকটেরিয়া পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে প্রথম বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে মাইক্রোবায়োলজির যাত্রা শুরু করেছিলেন। মাইকেল সার্ভেটাস 'pulmonary circulation' সন্ধান পেয়েছিলেন স্বাধীনভাবে ইবনে আল নাফিসের কাছ থেকে, , কিন্তু এই আবিষ্কারটি জনগণের কাছে পৌঁছেনি কারণ এটি প্রথমবারের জন্য "Manuscript of Paris" এ লেখা হয়েছিল ১৫৪৬ সালের দিকে । পরবর্তীতে এটি ধর্মতত্ত্ব নামে প্রকাশিত হয়েছিল ১৫৫৩ সালে যা তার জীবনের সবচেয়ে কাজ ছিল এটি। পরবর্তীতে এটি রেনালডাস কলম্বাস এবং আন্দ্রে সিলেপিনোর মাধ্যমে বর্ণনা করা হয়েছিল । Herman Boerhaave কখনও কখনও তাকে "শারীরবৃত্তির জনক" হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন লিডেন এবং পাঠ্যপুস্তক 'ইনস্টিটিউশন মেডিয়াকে' (1708) শিক্ষা প্রদান করার কারণে । পিয়ের ফৌচারকে "আধুনিক দন্তচিকিৎসার জনক" বলা হয়। সম্পাদনা মোঃ শাহাদাত হোসেন, বাংলা বিভাগ, ঢাবি

১১.১.৩.৪. ঔপনিবেশিক প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও চিকিৎসাবিদ্যার (STM) ভূমিকা

আধুনিক যুগ

চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাসে সবচেয়ে উজ্জ্বল যুগ হচ্ছে ঊনবিংশ এবং বিংশ শতক। এই দুই শতকে বিজ্ঞানের অন্যান্য সব শাখার ন্যায় চিকিৎসাবিজ্ঞানেও বিপ্লবাত্মক সব আবিষ্কার হয়। বিশেষ করে বিংশ শতকের প্রথমার্ধে সংঘটিত দুই দুটি বিশ্বযুদ্ধ চিকিৎসাবিজ্ঞানের উন্নতিতে ব্যাপক ভূমিকা রাখে। যুদ্ধকালীন প্রয়োজনেই আবিষ্কার হয় বহু চিকিৎসাকৌশল।

১৭৬১ সালের দিকে পশু চিকিৎসা ব্যাবস্থা শুরু হয়েছিল যা মানবদেহের চিকিৎসা ব্যাবস্থা থেকে একটু পৃথক ছিল। ফ্রান্সের পশু চিকিৎসক ক্লড বুগ্রেল্যাট ফ্রান্সের লায়নে বিশ্বের প্রথম পশুচিকিৎসা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। এই আগে মেডিকেলের ডাক্তারাই মানুষের এবং অন্যান্য প্রাণীর চিকিৎসা করতো।

আধুনিক বৈজ্ঞানিক বায়োমেডিকাল গবেষণা (যেখানে ফলগুলি পরীক্ষাযোগ্য এবং প্রজননযোগ্য হয়)শুরু হয়েছিল পশ্চিমা ঐতিহ্য ভেষজের উপর ভিত্তি করে। প্রথম দিকে গ্রীক "four humours" এর পরিবর্তে এবং পরে অন্যান্য ধরনের প্রাক-আধুনিক ধারণার পরিবর্তন শুরু হতে থাকে । আধুনিক যুগ আসলে শুরু হয়েছিল ১৮

শতকের শেষের দিকে এডওয়ার্ড জেনারের smallpox এর ভ্যাকসিন আবিষ্কার (এশিয়ায় প্রচলিত টিউশুর পদ্ধতির দ্বারা অনুপ্রাণিত), ১৮৮৮ সলে রবার্ট কোচের ব্যাকটেরিয়া দ্বারা রোগের সংক্রমণের আবিষ্কার তারপর ১৯০০ এর কাছাকাছি এন্টিবায়োটিকের আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে ।

অষ্টাদশ শতাব্দীর পরে আধুনিকতার যুগ ইউরোপ থেকে আরো জাগ্রত গবেষক খুঁজে পেয়েছিল। জার্মানি ও অস্ট্রিয়া থেকে, ডাক্তার রুডলফ বীরভো, উইলহেল্ম কনরাড রন্টজেন, কার্ল ল্যান্ডস্টেইনটার ও অটো লোইই উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন। যুক্তরাজ্য থেকে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং, জোসেফ লিস্টার, ফ্রান্সিস ক্রিক এবং ফ্লোরেন্স নাইটিংগেলকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। স্প্যানিশ ডাক্তার সান্তিয়াগো র্যামন ও কাজালকে আধুনিক স্নায়ুবিজ্ঞানের জনক বলে মনে করা হয়।

নিউজিল্যান্ড এবং অস্ট্রেলিয়া থেকে মরিস উইলকিন্স, হাওয়ার্ড ফ্লোরী এবং ফ্রাঙ্ক ম্যাকফার্লেন বার্নেট কে গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয় ।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে উইলিয়াম উইলিয়ামস কিন, উইলিয়াম কলি, জেমস ডি.ওয়াটসন ইতালি (সালভাদর লুরিয়া) থেকে, সুইজারল্যান্ড থেকে আলেক্সান্ডার ইয়ারসিন, জাপান থেকে কিটাসাটো শিবাশাবুরো এবং ফ্রান্স থেকে জিন মার্টিন চারকোট, ক্লাউড বার্নার্ড, পল ব্রোকা এবং অন্যান্য উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল। রাশিয়ান নিকোলাই করতোকভ উল্লেখযোগ্য কাজ করেছিলেন যেমন করেছিলেন স্যার উইলিয়াম ওসলার এবং হার্ভি কুশিং ।

বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির উন্নয়নের সাথে সাথে চিকিৎসা ব্যাবস্থা ও ঔষধের উপর নির্ভরশীলতা বাড়তে থাকে । ইউরোপ জুড়ে অষ্টাদশ শতকের শেষের দিকে কেবল পশু ও উদ্ভিদজাত দ্রব্যই ঔষধ হিসেবে ব্যবহৃত হয় নি সাথে সাথে মানুষের দেহের অংশ এবং তরলও ব্যবহৃত হয়েছিল। ফারমাকোলজি বিকশিত হয়েছে হারবালিজম থেকে এবং কিছু কিছু ঔষধ (এট্রোপাইন, এফ্রেডিন, ওয়ারফারিন, অ্যাসপিরিন, ডাইগক্সিন, ভিনকা অ্যালকোলোড, ট্যাকোলোল, হাইস্কিন ইত্যাদি) এখনও উদ্ভিদ থেকে থেকে প্রস্তুত হয়। এডওয়ার্ড জেনার এবং লুই পাস্তুর টিকা আবিষ্কার করেছিলেন।

প্রথম অ্যান্টিবায়োটিকটি ছিল অ্যারফেনামাইন (সালভারসন) যা ১৯০৮ সালে পল এরিলিচ আবিষ্কার করেন। তারপর তিনা আবিষ্কার করেন ব্যাক্টেরিয়া যে বিষাক্ত রঞ্জন গ্রহণ করে মানুষের কোষে তা করেনা। প্রথম এবং প্রধান এন্টিবায়োটিকস হলো সালফা ওষুধ যা জার্মান রসায়নবিদ azo dyes থেকে সংগ্রহ করেছিলেন ।

ফার্মাকোলজি ক্রমবর্ধমানভাবে অত্যাধুনিক হয়ে উঠেছে; আধুনিক জৈবপ্রযুক্তি নির্দিষ্ট শারীরবৃত্তীয় প্রক্রিয়ায় মাদকদ্রব্যকে বিকশিত করতে সহায়তা করে, আবার কখনও কখনও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া কমাতে শরীরের সাথে সামঞ্জস্যের ব্যবস্থা করা হয়। জিনোমিক্স এবং জেনেটিক্স সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান ঔষধের উপর কিছু প্রভাব ফেলেছে, কারণ বেশিরভাগ মনোজেনিক জেনেটিক ডিসঅর্ডারগুলির জিনগুলি এখন চিহ্নিত করা হয়েছে যা causative genes হিসাবে কার্যকারী। তাছাড়া আণবিক জীববিদ্যা এবং জেনেটিক্সের কৌশলগুলির বিকাশ ও চিকিৎসা প্রযুক্তি অনুশীলনের এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণকে অনেক প্রভাবিত করছে।

শাখা

চিকিৎসাবিদ্যা অনেকগুলো শাখায় বিভক্ত। এগুলোকে তিনভাগে ভাগ করা যায়। প্রাথমিক বা বেসিক, প্যারাক্লিনিক্যাল এবং ক্লিনিক্যাল। বেসিক শাখাগুলোর মধ্যে রয়েছে এনাটমী বা অঙ্গংস্থানতত্ত্ব, ফিজিওলজি বা শারীরতত্ত্ব, বায়োকেমিস্ট্রি বা প্রাণরসায়ন ইত্যাদি। প্যারাক্লিনিক্যাল শাখার মধ্যে অণুজীববিদ্যা, রোগতত্ত্ব বা

প্যাথোলজি, ভেষজতত্ত্ব বা ফার্মাকোলজি অন্যতম। ক্লিনিক্যাল হলো প্রায়োগিক চিকিৎসাবিদ্যা। এর প্রধান দুটি শাখা হলো, মেডিসিন এবং শল্যচিকিৎসা বা সার্জারি। আরও আছে ধাতৃ ও স্ত্রীরোগবিদ্যা, শিশুরোগবিদ্যা বা পেডিয়াট্রিক্স, মনোরোগবিদ্যা বা সাইকিয়াট্রি, ইমেজিং ও রেডিওলোজি ইত্যাদি। এগুলোর সবগুলোরই আবার বহু বিশেষায়িত্ব শাখা রয়েছে।

১১.১.৩.৫. সহায়ক গ্রন্থ

- রবীন বল, বাংলায় বিজ্ঞানচর্চা, সোমিল প্রেস অ্যান্ড প্রেস
- দীপক কুমার, ব্রিটিশ ভারতে বিজ্ঞান, সাউথ এশিয়া রিসার্চ সোসাইটি
- ভবানী প্রসাদ মুখোপাধ্যায়, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও সাম্রাজ্যবাদ, পত্রলেখা

১১.১.৩.৬. নমুনা প্রশ্ন

1. Describe the development of Science and Technology in the context of social progress.
2. What was the ancient heritage of medical science in India? What was the impact of western medicine in India?

পর্যায়- ২

একক- ৪

প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সূচীপত্র

১১.১.৪.১. উদ্দেশ্য
১১.২.৪.২. প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি
১১.২.৪.৩. বিজ্ঞান এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রসার
১১.২.৪.৪. সহায়ক গ্রন্থ
১১.২.৪.৫. নমুনা প্রশ্ন

১১.১.৪.১. উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়টি থেকে ছাত্র- ছাত্রীরা প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পর্কে অবহিত হবে। ব্রিটিশদের ভারতে আসার আগের সময়ে ভারতের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি কিরূপে বিকশিত হয় তার ব্যাখ্যা এখানে পাওয়া যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস প্রাগৈতিহাসিক সিন্ধু সভ্যতার সময় থেকে বিদ্যমান। আধুনিক কালে স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির নতুন নতুন ক্ষেত্রে, যথা, গাড়ী প্রযুক্তি, তথ্যপ্রযুক্তি, যোগাযোগ, মহাকাশ, মেরু ও আণবিক প্রযুক্তিতে ভারত উল্লেখযোগ্য অগ্রগতির পরিচয় দিয়েছে।

১১.২.৪.২. প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

মধ্যযুগের অন্তিম পর্বে দেখা যায়, সঙ্গমাগ্রামের মাধব (খৃষ্টীয় ১৩৪০ - ১৪২৫) ও তার কেরালার জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত বিদ্যালয় গাণিতিক বিশ্লেষণের প্রতিষ্ঠা ও উন্নতি সাধন করে। মাধব প্রথম π-এর অসীম ক্রমের কথা বলে. তিনি ক্রমের সম্প্রসারণ ব্যবহার করে -এর যে অসীম ক্রমের উপস্থাপনা করেন, তা আজ *মাধব-গ্রেগরি ক্রম* নামে পরিচিত। এই ক্রমের সীমিত সমষ্টির *চ্যুতির* যুক্তিসঙ্গত আসন্নমানের যে গণণা তারা করেছিলেন তা বিশেষ আগ্রহের বিষয়। তারা এই চ্যুতিকে এমন কৌশলে ব্যবহার করেছিলেন যাতে এর একটি দ্রুততর অভিসারী ক্রম পাওয়া যায়।

১৫শ শতাব্দীতে কেরালার গণিত বিদ্যালয়ের গণিতজ্ঞেরা ত্রিকোণমিতিক অপেক্ষকের (সাইন, কোসাইন ও আর্ক ট্যানজেন্ট) জন্য বিভিন্ন ধরনের গাণিতিক ক্রমের প্রভুত উন্নতি সাধন করেন। ইউরোপে কলনবিদ্যা উদ্ভাবনের দুই শতাব্দী আগেই তারা যা কাজ করেছিলেন তা আজ ঘাত শ্রেণীর (গুণোত্তর শ্রেণী ব্যতিরেকে) প্রাচীনতম উদাহরণ হিসাবে পরিচিত। শের শাহ ইসলামি চিহ্ন সম্বলিত রৌপ্য মুদ্রার প্রচলন করেছিলেন, যা পরে মুঘল সাম্রাজ্য অনুকরণ করে। চৈনিক ব্যবসায়ী *মা হুয়ান* (১৪১৩-৫১) কোচিতে দেখেছিলেন *ফানম* নামের স্বর্ণমুদ্রা। চৈনিক ওজনের হিসাবে এই মুদ্রার ওজন ছিল মোট এক *ফেন* ও এক *ইল*-এর সমতুল্য। উচ্চমানের এই স্বর্ণমুদ্রাগুলির বিনিময়ে চীনে চার *ইল* ওজনের ১৫টি রৌপ্যমুদ্রা সহজেই পাওয়া যেত।

কেরালার জ্যোতির্বিদ্যা ও গণিত বিদ্যালয়ের নীলকণ্ঠ সোমযাজি খৃষ্টীয় ১৫০০ শতাব্দীতে তার *তন্ত্রসংগ্রহ* গ্রন্থে আর্যভট্টের বুধ ও শুক্রগ্রহের উপবৃত্তাকার কক্ষপথ সংক্রান্ত ধারণার পরিমার্জন করেছিলেন।

এই গ্রহগুলির কেন্দ্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে তার সমীকরণ ১৭শ শতাব্দীতে ইউরোপীয় জ্যোতির্বিদ জোহানেস কেপলারের আগমনের আগে পর্যন্ত সবথেকে সঠিক গণনা পদ্ধতি ছিল।

৯৯৮ হিজরি সালে (খৃঃ ১৫৮৯-৯০) কাশ্মীরে আলি কাশ্মীরী ইবন লাকমান জোড়হীন জ্যোতির্বৈজ্ঞানিক গোলকের উদ্ভাবন করেন। পরবর্তী পর্যায়ে, মুঘল শাসনকালে লাহোর ও কাশ্মীরে আরও কুড়িটি অনুরূপ গোলক তৈরী হয়। ১৯৮০-এর দশকে এই গোলকগুলির পুনরাবিষ্কারের আগে, আধুনিক ধাতুবিদেরা, যাবতীয় আধুনিক প্রযুক্তি থাকা সত্বেও, জোড়হীন ধাতব গোলক বানানো অসম্ভব বলে মনে করতেন। এই মুঘল ধাতুবিদেরা ভারেওয়া পদ্ধতি বা *হৃতমোম ঢালাই* (ইংরাজি:*lost-wax casting*) পদ্ধতিতে পথিকৃত ছিলেন।

ভারতে মোঙ্গল আক্রমণের মাধ্যমে বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্রের আমদানি হয়েছিল। দিল্লির সুলতান আলাউদ্দিন খিলজি মোঙ্গলদের পরাজিত করায়, কিছু মোঙ্গল ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে উত্তর ভারতে পাকাপাকিভাবে থেকে যায়। 'তারিখ-ই ফিরিস্তা'য় (*১৬০৬–১৬০৭*) *লেখা আছে ১২৫৮ খৃষ্টাব্দে মোঙ্গল শাসক হালাকু খানের দূতকে স্বাগত জানাতে দিল্লিতে আতসবাজির প্রদর্শনী করা হয়। তৈমুরীয় শাসক শাহ রূখের (১৪০৫-১৪৪৭) ভারতীয় দূতাবাসের আব্দ অল-রাজ্জাক বলেছেন হাতির পিঠে বসে ন্যাপথা ছুঁড়ে নানা ধরনের আতসবাজির প্রদর্শনী দেখানো হত। ১৩৬৬ সালে বিজয়নগর সাম্রাজ্যে* তোপ-ও-তুফাক *নামে আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহৃত হত। এই সময় থেকে ভারতীয় উপমহাদেশের যুদ্ধে আগ্নেয়াস্ত্রের বহুল ব্যবহার শুরু হয়। ১৪৭৩ সালে বেলগাঁও-এ বাহমানি সুলতান মুহম্মদ শাহ বাহমনির অবরোধের মত সমরকৌশল, যা মধ্যযুগে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ভর যুদ্ধের অন্যতম অভিজ্ঞান, প্রায়শঃই দেখা যেতে শুরু করে।*

জেমস রিডিক পার্টিংটন তাঁর ‘A History of Greek Fire and Gunpowder’ গ্রন্থে ১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর মুঘল ভারতে আগ্নেয়াস্ত্র নির্ভর যুদ্ধের বর্ণনা করেছেন, এবং লিখেছেন যে, "ইউরোপে ব্যবহার করার আগে ভারতীয় যুদ্ধ রকেটগুলি ভয়ঙ্কর অস্ত্র ছিল। বাঁশের লাঠিতে লোহার ছুঁচালো মাথাযুক্ত রকেটগুলি বাঁধা থাকত। সলতেয় অগ্নিসংযোগ করে লক্ষ্যবস্তুর দিকে তাক করে চালনা করা হত, তবে গতিপথ অনিশ্চিত ছিল ... আকবর ও জাহাঙ্গীরের আমলে বিস্ফোরক মাইন ও পাল্টা-মাইন ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়।" ভারতে এই রকেটগুলি *তীর-এ-হাওয়াই* বা *অগ্নি বাণ* নামেও পরিচিত ছিল।

১৬শ শতাব্দী থেকেই, ভারতে বিভিন্ন ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র বানানো শুরু হয়ে গিয়েছিল। তাঞ্জোর, ঢাকা, বিজাপুর ও মুর্শিদাবাদে, বিশেষ করে, বড় বড় কামান দেখা যেতে শুরু করে। কালিকট (১৫০৪) ও দিউ (১৫৩৩) থেকে ব্রোঞ্জের কামান পাওয়া গেছে। ১৭শ শতাব্দীতে গুজরাট থেকে ইউরোপে শোরা রপ্তানি করা হত আগ্নেয়াস্ত্র নির্ভর যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য। বাংলা ও মালওয়াতে শোরা প্রস্তুত করা হত। ইংরেজ, ফরাসি, ওলন্দাজ ও পর্তুগীজেরা ছাপরাকে কেন্দ্র করে শোরা পরিশোধন করত।

জল সরবরাহ নির্মাণ ও সংশ্লিষ্ট প্রযুক্তির বর্ণনা পাওয়া যায় বিভিন্ন আরবি ও ফার্সি ভাষার গ্রন্থে। মধ্যযুগে, ভারতীয় ও পারসিক সেচ প্রযুক্তির আদান-প্রদানের কারণে এক উন্নত সেচ ব্যবস্থার প্রচলন হয়, ফলে অর্থনৈতিক উন্নতির সাথে জনজীবনে সামগ্রিক উন্নতিও দেখা যায়। কাশ্মীরের ১৫শ শতাব্দীর শাসক, জায়ন-উল-আবিদিনকে পশমিনা শিল্পের জনক বলে মনে করা হয়। তিনি মধ্য এশিয়া থেকে বয়নশিল্পীদের এনে এই শিল্পের পত্তন করেন।

উত্তর প্রদেশের জৌনপুরের পন্ডিত সাদিক ইস্ফাহানি বিশ্বের কিছু অংশের মানচিত্রের এক সঙ্কলন করেছিলেন, যা তার মতে 'মানব জীবনের জন্য উপযুক্ত'। ৩২পাতার এই সঙ্কলন—সেই যুগের ইসলামী সংস্কৃতির সাথে সাযুয্য রেখে দক্ষিণমুখী—ইস্ফাহানি করেছিলেন ১৬৪৭ সালে এক বৃহৎ শিক্ষামূলক গ্রন্থের অংশ

হিসাবে। জোসেফ ই. স্বোয়ার্টজবার্গের মতে 'বৃহত্তম ভারতীয় মানচিত্রটি প্রাক্তন রাজপুত রাজধানী অম্বরের প্রতিটি বাড়ির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ সম্বলিত ছিল আর তার আয়তন ছিল ৬৬১ × ৬৪৫ সে.মি. (২৬০ × ২৫৪ ইঞ্চি, বা প্রায় ২২ × ২১ ফুট')।

১১.২.৪.৩. বিজ্ঞান এবং ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রসার

ঔপনিবেশিক যুগে স্থানীয় ও ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান গবেষণার গভীর আদান-প্রদান ছিল। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবকে শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক সত্তা হিসাবে দেখা হত না বরং ভারতীয় জাতি গঠনে এর উপযোগিতা, বিশেষ করে কৃষি ও বাণিজ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। ভারতের স্বাধীনতার সময় ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে ওঠা ভারতীয় বিজ্ঞান সারা বিশ্বে সমাদৃত হতে শুরু করে।

১৮শ শতাব্দীর শেষে ভারতীয় ডাক ব্যবস্থা অতীব দক্ষ হয়ে ওঠে। যেমন টমাস ব্রোটনের বক্তব্য অনুযায়ী, যোধপুর মহারাজা তার রাজধানী থেকে ৩২০ কি.মি. দূরে নাথাদেওরার মন্দিরে প্রত্যেক দিন তাজা ফুলের অর্ঘ্য পাঠাতেন, যা পরের দিন সূর্য্যোদয়ের সাথে সাথে ঠিক প্রথম দর্শনের সময় পৌঁছে যেত। পরবর্তী পর্যায়ে ব্রিটিশ রাজ আসার সঙ্গে ডাক ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ হয়। ১৮৩৭ সালের ১৭তম পোস্ট অফিস আইন (*The Post Office Act XVII of 1837*) বলে ভারতের গভর্নর-জেনারেল ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির এলাকার যে কোনো স্থানে ডাক মাধ্যমে সংবাদ পাঠাতে পারতেন। কিছু আধিকারিকের এই বিনামূল্যে ডাক ব্যবস্থা ব্যবহার করার সুবিধা, পরের দিকে বিতর্কের সৃষ্টি করে। ১লা অক্টোবর ১৮৩৭ সালে ভারতীয় পোস্ট অফিস পরিষেবার সূচনা হয়। কৌশলগত এবং বাণিজ্যিক প্রয়োজনে ব্রিটিশেরা ভারতে এক সুবিশাল রেল পরিবহন ব্যবস্থা গড়ে তোলে।

ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা মূলতঃ স্থানীয় জন সমাজ থেকে পুর ও প্রশাসনিক চাকরির যোগ্য প্রার্থী তৈরী করার উদ্দেশ্যে চালু হলেও, এর ফলে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা খুলে যায়। জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮–১৯৩৭), আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪–১৯৭৪), মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩–১৯৫৬), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩–১৯৭২), চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (১৮৮৮–১৯৭০), সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর (১৯১০–১৯৯৫), হোমি জাহাঙ্গীর ভাভা (১৯০৯–১৯৬৬), শ্রীনিবাস রামানুজন (১৮৮৭–১৯২০), উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৩–১৯৪৬), বিক্রম সারাভাই (১৯১৯–১৯৭১), হর গোবিন্দ খোরানা (১৯২২–২০১১), হরিশ চন্দ্র (১৯২৩–১৯৮৩), এবং আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬) হলেন এই সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য কৃতি বিজ্ঞানী।

ফরাসি জ্যোতির্বিদ, পিয়ের জ্যানসেন ১৮ই আগস্ট ১৮৬৮ সালের সূর্যগ্রহণ নিরীক্ষা করে হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের গুন্টুর থেকে। ১৮৯৭ সালে স্যার রোনাল্ড রস প্রথমে সেকেন্দ্রাবাদে ও পরে কলকাতায় গবেষণা করে আবিষ্কার করেন ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ মশক-বাহিত। এই কাজের জন্য তিনি নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, ঔপনিবেশিকতাবাদ এর প্রসারে বিজ্ঞান এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে এটাও সত্যি যে উপনিবেশিকতাবাদের প্রসারের সূত্রেই পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ভারতবর্ষের সংযোগ সাধন হয়েছিল এবং এ ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সুফল ভোগ করেছিল ভারতবর্ষ। এ প্রসঙ্গে উমা দাশগুপ্ত সম্পাদিত 'Science and Modern India: An Institutional History, C. 1784-1947' প্রবন্ধ

থেকে জানা যায় যে, ১৯৩৬ সালে ভারতের অন্যতম জাতীয়তাবাদী কংগ্রেস নেতা তথা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির পৃষ্ঠপোষক পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু বৈজ্ঞানিক অবদানের সুত্রেই পাশ্চাত্যের কাছে ভারতের প্রাপ্তির কথা উল্লেখ করেছিলেন। নেহেরু এ প্রসঙ্গে বলেন যে, 'I feel sure that it was a good thing for India to come in contact with the scientific and industrial west. Science was the great gift of the west, and India lacked this, and without it she was doomed to decay.' নেহেরু বিজ্ঞানের সুফল সম্পর্কে অবহিত ছিলেন। প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের সংযোগ সাধনে তিনি বিজ্ঞানকে গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম বলে অভিহিত করেছেন।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতার সময়কালে বিজ্ঞান এবং বৈজ্ঞানিক ধারনার প্রসারে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। একদিকে প্রাচীন ভারতের সাহিতয, বিজ্ঞান, লেখমালা, ভাষা ইত্যাদি পুনরুদ্ধারে প্রাচ্যবাদীদের উদ্যোগ এবং অন্যদিকে মানচিত্র নির্মাণ ও ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আধিকারিকদের দ্বারা ভূ-তত্ত্বগত নিরীক্ষন প্রকৃতপক্ষে উপমহাদেশের সামরিক, অর্থনৈতিক এবং প্রশাসনিক ক্ষেত্রের উপর ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রন সুদৃঢ় করেছিল। ১৮০৭ সালে ফ্রান্সিস বুকানন প্রথম নিরীক্ষন এর কাজ শুরু করেন। এছাড়া ১৮৪৮ সালে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে প্রথম জনগণনা শুরু হয়।

কোম্পানির পক্ষ থেকে সরাসরি ব্রিটেন থেকে বৈজ্ঞানিকদের নিয়োগ করা হতে থাকে একইভাবে রয়েল সোসাইটি থেকে অসংখ্য গবেষকদের নিয়োগ করা হয়। এই সমস্ত গবেষকরা বিপুল পরিমাণে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি সম্পর্কিত ইউরোপিয়ান সাহিত্য আমদানি করতে শুরু করেন এবং এর ফলে ভারতবর্ষে বিভিন্ন ধরনের বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, রসায়ন এবং বিভিন্ন গবেষণামূলক যন্ত্রপাতির বিকাশ ঘটে। তারা বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলে ভূগোল, ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, প্রাকৃতিক ইতিহাস প্রভৃতি ক্ষেত্রে উৎকর্ষ সাধন করে।

১১.২.৪.৪. সহায়ক গ্রন্থ

- Irfan Habib, Technology in Medieval India, Tulika Books
- O.P. Jaggi, History of Science and Technology in Medieval India, Atma Ram and Sons.
- অপরাজিত বসু, ভারতের ইতিহাসে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি, বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

১১.২.৪.৫. নমুনা প্রশ্ন

1. Do you think science and technology evolved in India only at the time of British period? Give reasons behind your answer.
2. How do we know about the technological development of pre-colonial India?

পর্যায়- ৩
একক- ৫, ৬
প্রাক-ঔপনিবেশিক যুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

সূচীপত্র

১১.৩.৫.১. উদ্দেশ্য
১১.৩.৫.২. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান
১১.৩.৫.৩. কোম্পানির বিজ্ঞান এষণ
১১.৩.৬.৪. কোম্পানির অধীনে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, জরিপকারী ও চিকিৎসকগণ
১১.৩.৬.৫. সহায়ক গ্রন্থ
১১.৩.৭.৬. নমুনা প্রশ্ন

১১.৩.৫.১. উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়টি পাঠ করে ছাত্র ছাত্রীগণ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আমলে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং অনুসন্ধান সম্পর্কে জানতে সক্ষম হবে।

১১.৩.৫.২. ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান

ভারতবর্ষের ইতিহাসে অষ্টাদশ শতক একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও বহু বিতর্কিত অধ্যায়। এই শতকের প্রথম দিকেই মোগল সাম্রাজ্যের বিশাল মহীরুহ প্রায় ধরাশায়ী হয়, আর সেই সুযোগে ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীন কয়েকটি রাজ্যের উত্থান হয়। আবার এই শতকেরই মাঝামাঝি পলাশি যুদ্ধের [১৭৫৭] পরে, ইংরেজরা বাংলার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতা কুক্ষিগত করে। পৃথিবীর ইতিহাসে কোন একটি শতকে একসঙ্গে এত সব ঘটনাক্রম বিরল। তাই এই শতক নিয়ে বিতর্কের শেষ নেই। ইরফান হাবিব, আতহার আলি, সতীশচন্দ্র প্রমুখের কাছে অষ্টাদশ শতক অবক্ষয়ের প্রতীক। তাঁরা বারংবার এই শতককে চিহ্নিত করেছেন ‘অন্ধকারের যুগ’ হিসেবে— চারদিকে রাজনৈতিক অস্থিরতা, ব্যবসাবাণিজ্য ও অর্থনীতিতে অচলাবস্থা, শিল্প অবক্ষয় । অন্য দিকে, পিটার মার্শাল, ক্রিস বেইলি, মুজাফফর আলম, বার্টন স্টাইন, ফ্র্যাঙ্ক পারলিন, আন্দ্রে ভিঙ্ক প্রমুখের বক্তব্য, কোনও কোনও অঞ্চলে অবনতি দেখা গেলেও, অনেক জায়গায় কিন্তু বেশ অগ্রগতি হয়েছিল। এই বিতর্ক যে এখনও সজীব, তার প্রমাণ বর্তমান শতকের শুরুতেই সীমা আলাভি, পিটার মার্শাল ও রিচার্ড বার্নেটের সম্পাদনায় পরপর তিনটি প্রবন্ধ সংকলন প্রকাশিত হয়েছে।

সাধারণ ভাবে অষ্টাদশ শতকে যে অবক্ষয়ের কথা বলা হয় তা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা কথা বলেছেন অধ্যাপিকা তিলোত্তমা মজুমদার। তিনি তাঁর ‘পলিটিক্যাল কালচার অ্যান্ড ইকনমি ইন এইটিন্থ সেঞ্চুরি বেঙ্গল’ গ্রন্থে অবক্ষয়ের কথা পুরোপুরি অস্বীকার না করেও বলছেন, এক দিকে বাংলার যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, আর অন্য দিকে র-হাটের সুসংগঠিত গ ব্যবস্থা ও বাজার-হাটের সংগঠন বিশ্লেষণ করার চেষ্টা করেছেন। সঙ্গে আছে শহরাঞ্চলে শাসকগোষ্ঠী, অভিজাত ও উচ্চবিত্ত শ্রেণির ভোগবিলাসের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর চাহিদা বর্ণনা এবং তার ফলে আর্থিক উন্নয়নের কাহিনি তিনি তুলে ধরেন।

বিজ্ঞান এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ সম্পর্কে দ্রুত প্রসারিত চর্চার প্রসারতা জরিপ করা সহজ কাজ নয়। ষোড়শ শতাব্দীতে ব্রিটেন উত্তর আমেরিকায় প্রথম উপনিবেশ স্থাপন শুরু করেছিল, তবে "সাম্রাজ্য" সম্পর্কে কোনও ধারণা ছিল না —আমরা এটি বুঝতে পেরেছি - অনেক পরে, সম্ভবত উনিশ শতকের দিকে। বিজ্ঞান এবং সাম্রাজ্যবাদের প্রসার প্রায় একইসঙ্গে হয়। যদিও ঐতিহাসিকরা সবসময় উপনিবেশগুলিতে বিজ্ঞানের পরিবর্তিত মুখকে স্বীকার করেছেন। ঔপনিবেশিকরণের প্রাথমিক পর্যায়ে "বিজ্ঞান" ধারণাটি *অ্যানাক্রোনিজমের* দিকে ঝুঁকছে। গবেষকরা বিজ্ঞানের আধুনিক ধারণাগুলি এমন ক্রিয়াকলাপগুলির দিকে অনুমান করেছেন যেগুলি প্রাকৃতিক দর্শন হিসাবে আরও ভাল বোঝা যায়, যার ফলে তাদের যথাযথ প্রসঙ্গ থেকে প্রকৃতির অনুসন্ধানগুলি ছড়িয়ে দেওয়া হয়। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের অপরিহার্যকরণের ফলে ইতিহাসবিদরা এটিকে আরও সমন্বিত ও একীভূত হিসাবে চিত্রিত করতে নেতৃত্ব দিয়েছিল। ফলে তারা বিজ্ঞানচর্চার এমন দিকগুলি উপেক্ষা করে যা রাজ্য বা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির দ্বারা পরিচালিত হয়নি। তদুপরি, ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান প্রায়শই অবিচ্ছিন্ন প্রেক্ষাপটে অনুশীলিত বিজ্ঞান থেকে মূলত পৃথক হিসাবে দেখা যায়। এইকারনে আলোচ্যপর্বের বিজ্ঞানচর্চাকে সাধারণত অমৌলিক, *ইনস্ট্রুমেন্টালিস্ট* এবং শোষক হিসাবে দেখানো হয়। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানীরা দেশীয়দের কেবল তথ্য সংগ্রহকারী হিসাবে দেখেন। এই দাবির কিছু সত্যতা রয়েছে, তবে তারা ব্রিটিশ উপনিবেশগুলিতে বৈজ্ঞানিক কাজের একটি আংশিক চিত্র আঁকেন। সাম্প্রতিক গবেষণা অনেক সমৃদ্ধ ছবি প্রকাশ করেছে।

প্রথমত, এটি বোঝার দরকার যে কীভাবে ‘ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান’ ধারণাটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং কয়েক বছর ধরে এটি কীভাবে পরিমার্জিত এবং বিবর্তিত হয়েছে। একটি যথাযথ সূচনা পর্ব হ'ল জর্জ বাসাল্লার "পশ্চিমের বিজ্ঞানের বিকাশ" (১৯৬৭) শীর্ষক রচনা, যা ১৯৮০-এর দশক পর্যন্ত ব্রিটিশ বিজ্ঞানের উপর অনেক ঐতিহাসিক বৃত্তির উপর গঠনমূলক প্রভাব ফেলেছিল। আধুনিকায়নের তত্ত্বটি যখন আরোহণের দিকে ছিল, তখন বাসাল্লা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের বিস্তারের জন্য একটি সার্বজনীন মডেল তৈরি করেছিলেন। আবিষ্কারের প্রথম পর্যায় থেকে - যেখানে উপনিবেশগুলি পশ্চিমে বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণের জন্য কাঁচা তথ্য এবং উপকরণ সরবরাহ করেছিল - উপনিবেশের মাধ্যমে নির্ভরতা এবং শেষ পর্যন্ত স্বাধীনতার দিকে ।

তবে, ১৯৯০-এর দশকে মার্কসবাদীদের দ্বারা বিশেষত পল বারান, আন্দ্রে গন্ডার ফ্রাঙ্ক এবং ইমমানুয়েল ওয়ালারস্টেইন মতো তাত্ত্বিকদের কঠোর সমালোচনা গবেষক মহলে একটি আবহ তৈরি করেছিল যার মধ্যে বিজ্ঞানের ভূমিকা ছিল ঔপনিবেশিক প্রসারকে আরও ক্রিটিক্যালি দেখা শুরু হল। বাসাল্লার কালানুক্রমিক প্রভাবশালী তত্ত্ব ধাক্কা খায়। এখন এই সত্যে উপনিত হয় বিজ্ঞান বিকাশের মূল চাবির নয়, বরং সাম্রাজ্য নিয়ন্ত্রণের একটি সরঞ্জাম। নির্ভরতা এখন সাম্রাজ্য ‘মূল’ বা মহানগর ("Core") এবং ‘পরিধি’র ("Periphery") মধ্যে সম্পর্কের অন্তর্নিহিত রসায়নের ওপর নির্ভরশীল। এই সন্ধিক্ষণে একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা ছিল মাইকেল ওয়ারবোয়সের, যিনি দেখিয়েছিলেন যে মহানগরী এবং মুকুট উপনিবেশগুলিতে অনেক বৈজ্ঞানিক উদ্যোগ ১৮৯০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে "গঠনমূলক সাম্রাজ্যবাদ" নীতি থেকে শুরু হয়েছিল। তারপরে ১৯৪০ এর দশক পর্যন্ত ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের প্রধান কাজ ছিল সাম্রাজ্য বিকাশের উদ্দেশ্যে নিত্য নতুন সংস্থার নির্মান এবং তার মূল্যায়ন ("Core & Crown")। ঐতিহাসিকরা যেমন পেরিফেরির বৈচিত্র এবং গতিশীলতা বুঝতে পেরেছিলেন, রয় ম্যাকলিডের "চলমান মহানগরী" [Moving Core] ধারণাটি বিজ্ঞানের ঔপনিবেশিক সম্পর্কের চিত্রিত করার প্রচলিত পদ্ধতির চেয়ে বেশি উপযুক্ত বলে মনে করেছিল। ম্যাকলিউডের প্রকল্পে, সিডনি এবং কলকাতার মতো স্থানীয় কেন্দ্রগুলি সাম্রাজ্যের আধিপত্যের

কাঠামোর মধ্যে থাকা অবস্থায় স্বায়ত্তশাসন এবং কর্তৃত্বের কিছুটা ব্যবস্থা গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের অন্যান্য মাত্রাগুলিও ১৯৮০-এর দশকের শেষভাগ থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, যখন মিশেল ফুকো এবং এডওয়ার্ড সাইদের রচনা সাম্রাজ্যবাদকে নতুনভাবে ব্যাখ্যা করেছিল। বিজ্ঞানকে ক্রমবর্ধমান সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদের এজেন্ট হিসাবে দেখা শুরু হয়। এমন যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে নৃতাত্ত্বিক, চিকিৎসকগণ এবং অন্যান্যরা বর্ণ ও প্রাচ্যবাদী '*স্টেরিওটাইপস*' তৈরির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন।

"বৈজ্ঞানিক বর্ণবাদ" এর উত্থানের উপর ঔপনিবেশিক সম্প্রসারণের গুরুত্বপূর্ণ গঠনমূলক প্রভাবকে জোর দিয়েছিল। পশ্চিমী বিজ্ঞানের দেশীয় প্রতিক্রিয়াগুলির আগ্রহ, তবে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার প্রকৃতির সাথে বর্তমান উদ্বেগকে পূর্বাভাস দেয়, উদাহরণস্বরূপ, ভারতে এখনকার বিস্তৃত সাহিত্য থেকে।ঔপনিবেশিক শাসনের আগে এবং সময়ে উভয় ক্ষেত্রেই ভারতীয় ঐতিহাসিকরা পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রতি এদেশের ব্যবহারিক ও নির্বাচনী পদ্ধতির উপর দীর্ঘদিন ধরে জোর দিয়েছিলেন। অন্যদিকে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিকবাদীগন অতীতকে প্রত্যাখ্যান করেছিল, পুরোপুরি পশ্চিমী যৌক্তিকতা এবং বিজ্ঞানকে গ্রহণ করেছিল। তবে পশ্চিমী বিজ্ঞানচর্চার বেশিরভাগ প্রতিক্রিয়া এই দুটি 'বাইনারির' মধ্যে রয়েছে- যার এক প্রান্তে 'প্রাচ্য এবং অন্যদিকে পাশ্চাত্য'। কিছু ভারতীয় "পাশ্চাত্য" বিজ্ঞানকে একটি সার্বজনীন বৈজ্ঞানিক ঐতিহ্যের অংশ হিসাবে দেখে সরলীকরণের চেষ্টা করেছিলেন। ভারতীয়রাও অবদান রেখেছিলেন, নিজস্ব সংস্কৃতির প্রাচীন গ্রন্থগুলিতে রসায়নের মতো পশ্চিমী বিজ্ঞানের উপমাগুলি আবিষ্কার করার চেষ্টা করেছিলেন। রসায়নবিদ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় সহ অনেকে ভারতীয় বিজ্ঞানী জ্ঞানকে "হাইব্রিড" ফর্ম বলে মন্তব্য করেছিলেন। প্রতীক চক্রবর্তী যেমন দেখিয়েছেন, উনবিংশ এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় বিজ্ঞানের বৈশিষ্ট্যযুক্ত সাংস্কৃতিক বৈধতার সন্ধানটি বৈজ্ঞানিক শিল্পবাদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব দ্বারা বাস্তুচ্যুত হয়েছিল।

ভারতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি

১৬০০ সালে ভারত ও পূর্ব এশিয়ায় বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ইংল্যান্ডের একদল বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি গঠন করে। ৩১শে ডিসেম্বর রাণী এলিজাবেথের সনদ বলে উক্ত কোম্পানি উত্তমাশা অন্তরীপ (Cape of Good Hope) থেকে সমগ্র পূর্বাঞ্চলে বাণিজ্যের একচেটিয়া অধিকার লাভ করে। তারা ১৬০৮-এ মোগল সম্রাট জাহাঙ্গিরের শাসনকালে সুরাটে প্রথম বাণিজ্য কুঠি স্থাপনের অনুমতি পায়। পরে অন্যান্য স্থানসহ হুগলিতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর ১৬৫৮ সালে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির একজন প্রতিনিধি হিসেবে জেমস হার্ট ঢাকা প্রবেশ করার মধ্য দিয়ে বাংলায় ইংরেজ আগমন শুরু হয়। ১৭১৫ সালে মোগল দরবার থেকে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে নিজস্ব মুদ্রা ব্যবহারের অনুমতি দেওয়া হয়। ঐ মুদ্রা মোগল সাম্রাজ্যেও চালু হয়। ১৭৫৬ সালে নবাব সিরাজউদৌলা কোলকাতা দখল করে নেবার পরে (২০ জুন) লর্ড ক্লাইভ এবং ওয়াটসন তামিলনাড়ু থেকে জাহাজযোগে সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসেন ও কোলকাতা পুণরায় দখল করেন (২ জানুয়ারি, ১৭৫৭)। কোম্পানির কেরানি, পরে ফ্রান্স-ইংল্যান্ড যুদ্ধ শুরু হলে সৈন্যবাহিনীতে যোগ দেন। নিজের যোগ্যতায় পরে উঁচু পদ পান। চন্দননগর দখল করার পরে সিরাজউদৌলাকে উৎখাত করার জন্য সিরাজের পরিবারের কয়েকজন ও মীরজাফর, উমিচাঁদ, জগৎ শেঠ প্রমুখদের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করেন। চুক্তি মতো কাজ হয় ও নদীয়ার পলাশির প্রান্তরে সিরাজউদৌলার সঙ্গে মেকি যুদ্ধ হয়। সিরাজউদৌলা পরাজিত হয়ে পালাবার সময় ধরা পড়ে নিহত হন। চুক্তি মতো মীরজাফর নবাব হন এবং ক্লাইভ নগদ ত্রিশ লক্ষ টাকা ও

চব্বিশ পরগনার জায়গিরদারি লাভ করেন। জায়গির থেকে ক্লাইভের বছরে তিন লক্ষ টাকা আয় হত। পরে ১৭৬০-এ ক্লাইভ দেশে ফিরে যান। এ দিকে তার অভাবে ইংরেজরা বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে, তখন আবার ক্লাইভের ডাক পড়ে।

ক্লাইভ এ দেশে আবার ফিরে আসেন ১৭৬৫ খ্রিষ্টাব্দের মে মাসে এবং ইংরেজ সরকারের গভর্নর নিযুক্ত হন। তিনি তখন দিল্লির বাদশাহ শাহ আলমের কাছ থেকে বাংলা-বিহার-ওড়িশার দেওয়ানি লাভ করেন (১৭৬৫, আগস্ট ১)। বিহার-ওড়িশার প্রকৃত শাসন ক্ষমতা লাভ করে, নবাবের নামমাত্র অস্তিত্ব থাকে। ফলে পূর্ব ভারতের এই অঞ্চলে যে শাসন-ব্যবস্থা চালু হয় তা দ্বৈত শাসন নামে পরিচিত। নবাবের হাতে থাকে প্রশাসনিক দায়িত্ব, আর রাজস্ব আদায় ও ব্যয়ের পূর্ণ কর্তৃত্ব পায় কোম্পানি। এতে বাংলার নবাব আসলে ক্ষমতাহীন হয়ে পড়ে আর এই সুযোগে কোম্পানির লোকেরা খাজনা আদায়ের নামে অবাধ লুণ্ঠন ও অত্যাচার শুরু করে দেয়। ১৭৭০-এ (বাংলা ১১৭৬) অনাবৃষ্টি হয়। দেশে দেখা দেয় চরম বিপর্যয় ও দুর্ভিক্ষ। কয়েক লক্ষ মানুষ না খেতে পেয়ে মারা যান। এটাই ইতিহাসখ্যাত ছিয়াত্তরের মন্বন্তর নামে পরিচিত। এরপর ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিশ প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে কোম্পানির শাসন চলেছিল মূলত এবং মুখ্যত লাভজনক ব্যবসায়িক দৃষ্টি ও রীতিপদ্ধতিতেই। কোম্পানির স্বার্থে ও সুবিধার জন্য ১৭৬৫ সালে বাংলার কৃষিপণ্যকে বাণিজ্যিকীকরণ, ১৭৭৩ সালে রেগুলেটিং অ্যাক্ট পাস, ১৮১৩ সালে ভারতে ফ্রি ট্রেড প্রবর্তন এবং ওই বছরই বাংলার মুখ্য শিল্প টেক্সটাইল রপ্তানি বন্ধ, ১৮২০ সালে টেক্সটাইলকে আমদানি পণ্য হিসেবে ঘোষণা, ১৮৩০-এ কলকাতা ডকিং কোম্পানি প্রতিষ্ঠা, ১৮৩৫ সালে ইংরেজিকে অফিস-আদালতের ভাষা হিসেবে ঘোষণা, ১৮৩৮-এ বেঙ্গল বন্ডেড ওয়্যারহাউস অ্যাসোসিয়েশন গঠন এবং ১৮৪০ সালে বেসরকারি খাতে চা-বাগান স্থাপনের মাধ্যমে এ দেশীয় অর্থনীতির স্বনির্ভর সত্তাকে পরনির্ভর করার কার্যক্রম শুরু হয়। বাংলা নামের এই অঞ্চলটি ধীরে ধীরে ইংরেজদের সম্পূর্ণ করায়ত্ব হয় ১৮১৩ সালে। ব্রিটিশ সরকার এক চার্টার অ্যাক্ট বলে কোম্পানির একচেটিয়া বাণিজ্যাধিকার বিলুপ্ত করে এবং দেশের শাসনভার কোম্পানির উপর ন্যস্ত করে। ১৮৫৮ সালে কোম্পানি বিলুপ্ত ঘোষণা করে ব্রিটিশ সরকার ভারত শাসনের দায়িত্ব সরাসরি গ্রহণ করে।

কোম্পানির বিজ্ঞান এষণঃ

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্তিম ভাগে উইলিয়াম জোন্স প্রাচ্য সম্বন্ধে গবেষণার উদ্দেশ্যে কলকাতা শহরে একটি উচ্চশিক্ষা সংস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্যোগী হন। ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ১৫ই জানুয়ারি তার পাঠানো একটি আমন্ত্রণপত্রে সাড়া দিয়ে বিচারপতি জন হাইড, জন কার্নাক, হেনরি ভ্যান্সিট্রাট, জন শোর, চার্লস উইল্কিন্স, ফ্রান্সিস গ্ল্যাডউইন, জোনাথন ডানকান প্রভৃতি তিরিশ জন ইউরোপীয় বিদগ্ধ ব্যক্তি কলকাতা শহরের পুরাতন সুপ্রিম কোর্ট ভবনের এক সভায় মিলিত হন। এই সভার সভাপতিত্ব করেন মুখ্য বিচারপতি স্যার রবার্ট চেম্বার্স। এই সভায় জোনসের পরিকল্পনা মতো *দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি* নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান স্থাপনের মূল উদ্দেশ্য ছিল, এশিয়ার ভৌগোলিক সীমার মধ্যে মানুষ ও প্রকৃতি দ্বারা সৃষ্ট সমস্ত বিষয় সম্বন্ধে অনুসন্ধান ও অধ্যয়ন করা। সংস্থার প্রথম সভায় তৎকালীন গভর্নর জেনারেল ওয়ারেন হেস্টিংস সভাপতিত্ব করেন এবং উইলিয়াম জোনস সহসভাপতির পদ অলঙ্কৃত করেন। ওয়ারেন হেস্টিংস এই সংস্থার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সহানুভূতিশীল হলেও তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি পদে অধিষ্ঠিত হতে অস্বীকার করেন এবং তার অনুরোধে জোনস ১৭৮৪ খ্রিষ্টাব্দের ৫ ফেব্রুয়ারি এই পদে অধিষ্ঠিত হন এবং আমৃত্যু এই পদে থাকেন। প্রথম দিকে এই প্রতিষ্ঠানের কার্যকরী সমিতি ছিল না এবং শুধুমাত্র সভাপতি ও সম্পাদক নামক দুইটি পদ ছিল যারা

সমস্ত বিষয় দেখাশোনা করতেন। জোনসের মৃত্যুর পর সভার কাজ অনিয়মিত হয়ে পড়ে এবং হেনরি ট্রেল সহ বেশ কয়েকজন কার্যনির্বাহী সদস্য পদত্যাগ করলে প্রতিষ্ঠানটি কয়েক বছরের জন্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়লেও উনবিংশ শতাব্দীর শুরু থেকে আবার ঘুরে দাঁড়াতে সক্ষম হয়। ১৮০৮ খ্রিষ্টাব্দে চিকিৎসাশাস্ত্র, ভৌতবিজ্ঞান প্রভৃতির উন্নতি সাধনের জন্য *ফিজিক্যাল কমিটি* এবং সাহিত্য, দর্শন, ইতিহাস, শিল্পকলা প্রভৃতি বিষয়ের উন্নতি সাধনের জন্য *লাইব্রেরি কমিটি গঠিত হয়।*

উইলিয়াম জোনস *'এশিয়াটিক মিসচ্যালেনি'* নামক একটি বার্ষিক গবেষণা পত্রিকা চালু করেন। কিন্তু প্রতিষ্ঠানের আর্থিক সামর্থ্য ভালো না হওয়ায় এই পত্রিকা অনিয়মিতভাবে ছাপা হত। অবশেষে ম্যানুয়েল ক্যান্টোফার নামক ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির ছাপাখানার এক কর্মচারী এই পত্রিকা ছাপাতে রাজি হন। গবেষণা পত্রিকাটির নাম পাল্টে রাখা হয় *এশিয়াটিক রিসার্চেস* এবং এর প্রথম সংস্করণ ১৭৮৮ খ্রিষ্টাব্দে বের হয়। ১৮২৯ খ্রিষ্টাব্দে ডেপুটি সার্ভেয়ার জেনারেল ক্যাপ্টেন হার্বার্ট *'গ্লিনিংস ইন সায়েন্স'* নামক একটি মাসিক পত্রিকা চালু করলে জেমস প্রিন্সেপ এই পত্রিকার নাম পরিবর্তন করে *'দ্য জার্নাল অব দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি'* রাখার প্রস্তাব করেন। ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাসে এই প্রস্তাব গৃহীত হয়। ১৮১৪ খ্রিষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহালয় আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ১৮৩৯ খ্রিষ্টাব্দে এই প্রতিষ্ঠান থেকে সরকারের নিকট কলকাতা শহরে জনগণের জন্য উন্মুক্ত একটি সংগ্রহালয় নির্মাণের জন্য আবেদন করা হয়। ১৮৬৬ খ্রিষ্টাব্দে ভারতীয় সংগ্রহালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এরপর এশিয়াটিক সোসাইটির সংগ্রহালয় থেকে সংগৃহীত বহু সামগ্রী নবনির্মিত ভারতীয় সংগ্রহালয়ে স্থানান্তরিত করা হয়।

প্রতিষ্ঠাকালে এশিয়াটিক সোসাইটির ইংরেজি নামের বানানটি ছিল *Asiatick Society.* ১৮২৫ সালে কোনওপ্রকার আনুষ্ঠানিক ঘোষণা ছাড়াই নামটির আধুনিকীকরণ করে ইংরেজি *'k'* অক্ষরটি বাদ দেওয়া হয়। এই সময় এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাতিষ্ঠানিক নামকরণ হয় "দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি" ("The Asiatic Society")। ১৮৩২ সালে নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় "দ্য এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল (The Asiatic Society of Bengal)। *১৯৩৬ সালে পুনরায় নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়* দ্য রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল (The Royal Asiatic Society of Bengal)। *অবশেষে ১৯৫১ সালের ১ জুলাই এশিয়াটিক সোসাইটির বর্তমান নামটি প্রবর্তিত হয়।*

ভারতীয় জাদুঘর হল ভারতের বৃহত্তম জাদুঘর। ১৮১৪ সালে ব্রিটিশ ভারতের রাজধানী কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল এই জাদুঘর প্রতিষ্ঠা করে। জাদুঘরের প্রতিষ্ঠাতা কিউরেটর ছিলেন ড্যানিশ বোটানিস্ট ড. নাথানিয়েল ওয়ালিচ।

কলকাতা জাদুঘর একটি সাংস্কৃতিক ও বিজ্ঞান জাদুঘর। এর ছয়টি বিভাগ রয়েছে – শিল্পকলা, পুরাতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব, ভূতত্ত্ব, প্রাণীতত্ত্ব ও অর্থনৈতিক উদ্ভিজ্জ। ভারতীয় সংবিধানের সপ্তম তফসিলে এই প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানের মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এটি বিশ্বের অন্যতম প্রাচীন জাদুঘর। এখন এটি ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের পরিচালনাধীন।

১৭৮৪ সালে স্যার উইলিয়াম জোন্স এশিয়াটিক সোসাইটি অফ বেঙ্গল প্রতিষ্ঠা করেন। ১৭৯৬ সালে সোসাইটির সদস্যরা মানুষের তৈরি বস্তু ও প্রাকৃতিক সামগ্রী নিয়ে একটি জাদুঘর স্থাপনের সিদ্ধান্ত নেন। ১৮০৮ সালে জাদুঘর তৈরির কাজ শুরু হয়। এই বছরই ভারত সরকার সোসাইটিকে চৌরঙ্গী অঞ্চলে জাদুঘর তৈরির জন্য জমি দেয়।

১৮১৪ সালের ২ ফেব্রুয়ারি ডাচ উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ড. নাথানিয়েল ওয়ালিচ (তাকে শ্রীরামপুরের যুদ্ধের সময় বন্দী করা হয়েছিল ও পরে মুক্তি দেওয়া হয়েছিল) কলকাতায় জাদুঘর স্থাপনের সম্পর্থনে একটি চিঠি লেখেন। তিনি বলেছিলেন, এই জাদুঘরে দুটি বিভাগ থাকা উচিত। একটি পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক ও প্রযুক্তিগত এবং অপরটি ভূতাত্ত্বিক ও প্রাণিতাত্ত্বিক। তিনি তার সংগ্রহের কিছু সামগ্রীও জাদুঘরে দান করতে চান।

সোসাইটি এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ড. ওয়ালিচ সেই সময় ছলেন এশিয়াটিক সোসাইটির প্রাচ্য জাদুঘরের সুপারিনটেন্ডেন্ট। তাকেই ভারতীয় জাদুঘরের প্রথম সাম্মানিক পরিচালক (কিউরেটর) নিযুক্ত করা হয়। ১৮১৪ সালের ১ জুন তিনি কার্যভার গ্রহণ করেন। জাদুঘর প্রতিষ্ঠার পর থেকে তার উৎসাহেই জাদুঘরের আকার দ্রুত বৃদ্ধি পেতে থাকে। সংগ্রাহকরা ছিলেন ইউরোপীয়। একমাত্র ভারতীয় সংগ্রাহক ছিলেন বাবু রামকমল সেন। ইনি পরে সোসাইটির ভারতীয় সচিব হয়েছিলেন। ড. ওয়ালিচ প্রতিষ্ঠার সময় জাদুঘরকে সবচেয়ে বেশি সামগ্রী দান করেছিলেন। ১৮১৬ সাল পর্যন্ত জাদুঘরে দান করা ৭৪টি সামগ্রীর মধ্যে ৪২টি ছিল উদ্দিজ্জ।

ড. ওয়ালিচ পদত্যাগ করার পর মাসিক ৫০ থেকে ১০০ টাকা বেতনে কিউরেটর নিয়োগ শুরু হয়। ১৮৩৬ সাল পর্যন্ত এশিয়াটিক সোসাইটি এই বেতন দিত। এরপর সোসাইটির ব্যাঙ্কার পামার অ্যান্ড কোম্পানি দেউলিয়া হয়ে গেলে সরকার বেতন দিতে শুরু করে। জাদুঘর ও গ্রন্থাগারের রক্ষনাবেক্ষণের জন্য মাসিক ২০০ টাকা অনুদান দেওয়া শুরু হয়। ১৮৪০ সালে সরকার জাদুঘর ভূতাত্ত্বিক ও খনিজ সংগ্রহ বিভাগ চালুর ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে আরও ২৫০ টাকা মাসিক অনুদান দিতে শুরু করে শুধুমাত্র ভূতত্ত্ব বিভাগের জন্য। একটি নতুন বাড়ির প্রয়োজন হয় এই সময়। বাড়ির নকশা করেন ওয়াল্টার আর গ্র্যানভিল। ১৮৭৫ সালে ১,৪০,০০০ টাকা ব্যয়ে এই নতুন বাড়িটি তৈরি হয়।১৮৭৯ সালে সাউথ কেনসিংটনের ইন্ডিয়ান মিউজিয়ামের সংগ্রহের একাংশ এই জাদুঘরে আসে।

১৯১৬ সালে 'জুওলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার' অনুদানে জাদুঘরে প্রাণিতত্ত্ব এবং ১৯৪৫ সালে অ্যানথ্রোপোলজিক্যাল সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার অনুদানে নৃতাত্ত্বিক বিভাগ চালু হয়।

গুরুত্বপূর্ণ প্রাচীন সামগ্রী ও হস্তনির্মিত শিল্পকর্ম যেমন, পাণ্ডুলিপি, অভিলেখন (শিলালিপি, মুদ্রালিপি, তাম্রলিপি ইত্যাদি) স্মৃতিসৌধ ইত্যাদির জরিপ, সংগ্রহ এবং এগুলোর প্রামাণিক দলিল তৈরি, ব্যবহার ও প্রদর্শনের বিষয়টি স্যার উইলিয়ম জোনস কর্তৃক ১৭৮৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি, কলকাতা প্রতিষ্ঠার পর পূর্ণ উদ্যোগে শুরু হয়। এই সোসাইটির উদ্যোগে বা ব্যক্তিগত প্রচেষ্টার মাধ্যমে ভারতের প্রাচীন নিদর্শনসমূহের সংগ্রহের ধারা প্রায় শতাধিক বছর ধরে অব্যাহত থাকে।

১৮০০ সালে সরকারের পক্ষ থেকে এ ধরনের প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এ সময় ওয়েলেসলির মার্কুইস কর্তৃক ফ্রান্সিস বুকাননকে মহীশুর জরিপ করার কাজে নিযুক্তি করা হয়। তিনি ১৮০৭ সালে বর্তমান বিহার ও উত্তর প্রদেশের স্মৃতিসৌধ এবং প্রাচীন নিদর্শন জরিপের কাজ শুরু করেন। এ সময় স্মৃতিসৌধ সংস্কারের কথা ভাবা না হলেও তাজমহল, ফতেপুর সিক্রি এবং সিকান্দারাবাদের মতো কিছু স্মৃতিসৌধ সংস্কার করা হয়। ১৮১০ সালের বেঙ্গল রেগুলেশনের ১৯ ধারার মাধ্যমে সরকার সর্বপ্রথম ঝুঁকিপূর্ণ ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধের সংস্কারের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করে।

বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ার্সের দ্বিতীয় লেফটেন্যান্ট আলেকজান্ডার কানিংহাম ইন্দো-গ্রিক রাজবংশ অনুসন্ধানের প্রথম দিকে জেমস প্রিন্সিপকে সহায়তা করেন। আলেকজান্ডার কানিংহাম ১৮৪৮ সালে 'ইন্ডিয়ান আর্কিওলজিক্যাল সার্ভের' জন্য একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করে ব্রিটিশ সরকারের নিকট পেশ করেন। কিন্তু তা

ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। এই সময়ে যুক্তরাজ্যের রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির সুপারিশমালার ভিত্তিতে সরকার অনেক গুলো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। এই সুপারিশমালার আলোকে ভারত সরকার স্মৃতিসৌধসমূহ সংস্কারের জন্য সামান্য তহবিল অনুমোদন করে। লর্ড হার্ডিজ ভারতীয় প্রাচীন নিদর্শনসমূহের উপর গবেষণা এবং জ্ঞানের উপর ভিত্তি করে কোনো ব্যক্তি কর্তৃক প্রদত্ত প্রস্তাব অনুমোদনের একটি পদ্ধতি চালু করেন। পরবর্তী বছরগুলোতে ১৮৫৭ সালের বিপ্লবের প্রভাব পড়ে এবং যে কারণে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান প্রকৃতপক্ষে বন্ধ হয়ে যায়।

আলেকজান্ডার কানিংহাম একটি নতুন প্রস্তাব পেশ করেন। এই প্রস্তাবকে লর্ড ক্যানিং গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করেন এবং তিনি উত্তর ভারত জরিপের জন্য একটি পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই পরিকল্পনাকে নিম্নভাবে বর্ণনা করা হয়: "একটি সঠিক বর্ণনা, নকশার সচিত্র ব্যাখ্যা, পরিমাপন, অঙ্কন বা ছবি এবং যে সব বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন সেগুলোর অভিলিখনের চিত্রসহ ব্যাখ্যা। এ ছাড়া এতে রয়েছে এগুলো সম্পর্কে এ পর্যন্ত প্রাপ্ত ইতিহাসের বর্ণনা এবং এগুলো সম্পর্কে যে ঐতিহ্য রয়েছে তার দালিলিক প্রমাণাদি।" ১৮৬১ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে কানিংহামকে প্রথম প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপকারক নিযুক্ত করা হয়।

তিনি ১৮৬১ সাল থেকে ১৮৬৫ সালের মধ্যে পূর্বে গয়া থেকে উত্তর পশ্চিমে সিন্ধু পর্যন্ত, এবং উত্তরে কালসি থেকে দক্ষিণে নর্মদা পর্যন্ত বিস্তৃত এলাকা জরিপ করেন। এ ব্যাপারে তিনি চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করেন। কিন্তু ১৮৬৬ সালে লর্ড লরেন্স কর্তৃক প্রত্নতাত্ত্বিক জরিপ বিলুপ্ত ঘোষণার পর এই প্রচেষ্টা হঠাৎ করেই বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য ইতোমধ্যে ১৮৬৩ সালে একটি আইন (অ্যাক্ট-২০) পাশ হয় যাতে সরকারকে এই ক্ষমতা প্রদান করা হয়: "প্রাচীন নিদর্শনের জন্য সুপ্রসিদ্ধ বা যার ঐতিহাসিক বা প্রত্নতাত্ত্বিক মূল্য রয়েছে সেগুলোর সংরক্ষণ করা ব্যতীত কোনো ক্ষতিসাধন করা যাবে না।"

তৎকালীন সেক্রেটারি অব স্টেট স্যার স্টাফোর্ডের প্রস্তাবের উপর ভিত্তি করে লর্ড লরেন্স স্থানীয় সরকারকে ঐতিহাসিক দালানকোঠার তালিকা প্রস্তুত ও সেগুলোর ছবি সংগ্রহের নির্দেশ দেন। সেক্রেটারি অব স্টেট ডিউক অব অর্গিল ভারত সরকারকে দেশের প্রত্নতাত্ত্বিক সমস্যা মোকাবেলা করার জন্য একটি কেন্দ্রীয় বিভাগ স্থাপনের নির্দেশ দেন। তিনি স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণের উপর গুরুত্ব দিয়ে বলেন যে, সরকারের অবশ্যপালনীয় কাজ হচ্ছে স্মৃতিসৌধসমূহকে 'সরকারের নিজস্ব কর্মচারীদের দ্বারা যথেচ্ছাভাবে দ্রুত ধ্বংসসাধনের হাত থেকে রক্ষা করা'। কানিংহামকে মহাপরিচালক 'করে সরকারের একটি বিভাগ হিসেবে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেকে পুনঃপ্রবর্তন করা হয়। তিনি ১৮৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এই বিভাগকে দায়িত্ব দেয়া হয় যে, তারা 'সমগ্র দেশে একটি পূর্ণ অনুসন্ধান কাজ পরিচালনা করবে এবং প্রাচীনত্ব বা সৌন্দর্য বা ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রত্নতাত্ত্বিক এবং এরূপ অন্যান্য স্থাপনার একটি সুসংবদ্ধ তালিকা এবং এগুলোর একটি বিবরণমূলক তথ্য সংরক্ষণ করবে।'

কানিংহামকে আরো দায়িত্ব দেওয়া হয় যে, তিনি 'পূর্ববর্তী সকল অনুসন্ধান কাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী এবং এই অনুসন্ধান কাজ থেকে ইতোমধ্যে প্রাপ্ত ফলাফলেরও বিবরণী তৈরি করবেন। এছাড়া তিনি বর্তমান ও ভবিষ্যৎ অনুসন্ধান কাজের সঙ্গে যুক্ত সহকারীদের দিক নির্দেশনার জন্য একটি সার্বিক পরিকল্পনা তৈরি করবেন।'

১৮৭১ সালে কানিংহাম দিল্লী এবং আগ্রায় পুনরায় জরিপ কাজ শুরু করেন; ১৮৭২ সালে তিনি রাজপুতনা, বুন্দেলখন্দ, মথুরা, বোধগয়া এবং গৌড় জরিপ করেন; ১৮৭৩ সালে তিনি পাঞ্জাব এবং ১৮৭৩ ও ১৮৭৭ সালের মধ্যে তিনি কেন্দ্রীয় প্রদেশ, বুন্দেলখন্দ এবং মালওয়া জরিপ করেন। সুশৃঙ্খল ও

সুপরিকল্পিতভাবে জরিপ কাজ শুরু করার জন্য আলেকজান্ডার কানিংহাম বৌদ্ধ-স্থাপনা ও স্মৃতিসৌধগুলোকে মানচিত্রের উপর ছক আকারে রেকর্ড করেন।

১৮৭২ সালে জেমস বার্জেস কর্তৃক ইন্ডিয়ান এন্টিকয়ারি জার্নাল প্রকাশের ফলে বুলার ও ফ্লিট, ইগেলিং ও রাইস, ভন্ডারকার ও ইন্দ্রজির মতো পন্ডিতদের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ অভিলেখন এবং এগুলোর সংকেতলিপির অর্থোদ্ধার করে প্রকাশ করা সহজ হয়। উৎকীর্ণ লিপি সামগ্রীর একটি সুসংবদ্ধ ও সুন্দর সংখ্যা প্রকাশ করার জন্য কানিংহাম করপাস ইন্সক্রিপশনাম ইন্ডিকারাম নামে একটি জার্নালও প্রকাশ করেন। কানিংহামের প্রস্তাবে সরকার ইপিগ্রাফিক্যাল সার্ভে নামে একটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। ১৮৮৩ সালের জানুয়ারি মাসে সরকার জে. এফ. ফ্লিটকে তিন বছরের জন্য সরকারি উৎকীর্ণ লিপিবিদ হিসেবে নিযুক্ত করেন।

১৮৭৮ সালের ট্রেজার ট্রোভ এ্যাক্ট প্রবর্তন ছিল পরীক্ষামূলক খননের সময় প্রাপ্ত মূল্যবান ধাতু সামগ্রী ও প্রাচীন নিদর্শনসমূহ বাজেয়াপ্তকরণ ও সংরক্ষণ নিশ্চিতকরণের একটি মাইল ফলক। ১৮৭৮ সালে লিটন লক্ষ্য করেন যে, কেন্দ্রীয় সরকার ১৮৭৩ সালে প্রাদেশিক সরকারকে প্রাচীন স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণের যে দায়িত্ব প্রদান করে তা এককভাবে তাদেও উপর ছেড়ে দেওয়া ঠিক নয় বলে তিনি মনে করেন। তাই এই দায়িত্ব ভারত সরকারের ক্ষমতার মধ্যেই আনা উচিত। স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণের সঙ্গে সম্পর্কিত সকল বিষয়ে প্রাদেশিক ও কেন্দ্রীয় সরকারকে সাহায্য করার জন্য ১৮৮১ সালে রিপনের শাসনামলে মেজর এইচ. এইচ. কোলেকে প্রাচীন স্মৃতিসৌধসমূহের কিউরেটর নিযুক্ত করা হয়। তিনি বোম্বে, মাদ্রাজ, রাজপুতনা, হায়দ্রাবাদ, পাঞ্জাব ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের স্মৃতিসৌধের উপর বহু প্রাথমিক প্রতিবেদন প্রদান করেন। ১৮৮৩ সালে কোলের চাকরির মেয়াদ শেষ হলে স্মৃতিসৌধ সংরক্ষণের কাজটি পুনরায় স্থানীয় সরকারকে প্রদান করা হয়।

১৮৮৫ সালে কানিংহাম চাকরি থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি মহা-পরিচালকের পদ বিলুপ্তি এবং উত্তর ভারতকে পুনঃসংগঠিত করে পাঞ্জাব, সিন্ধু এবং রাজপুতনা; উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ (উত্তর প্রদেশ) এবং কেন্দ্রীয় প্রদেশ; এবং বিহার, উড়িষ্যা, আসাম ও ছোটনাগপুরসহ বাংলা নামে তিনটি স্বাধীন অঞ্চল করার জন্য সরকারের নিকট সুপারিশ করেন। এই তিনটি অঞ্চলের প্রতিটি দুইজন নকশাকার ও দুইজন সহকারীসহ একজন জরিপকারক দ্বারা পরিচালিত হবে। মাদ্রাজ, বোম্বে এবং হায়দ্রাবাদ এলাকা বার্জেসের অধীন এবং উৎকীর্ণ লিপি ফ্লিটের অধীন ন্যস্ত করার সুপারিশ করেন। এভাবে বাংলা বেগলারের অধীন, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ মেজর জে.বি. কিথ এবং তাঁর সহকারী হিসেবে ড. এ. ফুরারের অধীন, এবং পাঞ্জাব সি.জে. রজার্সের অধীন চলে আসে।

- An industrialised mining industry, with a Geological Survey of India, mechanical pumps, rock crushers, coal mining (1774) ... eg. Mining Industry India
- Concrete construction.
- The introduction of a metaled and maintained road network, including the Grand Trunk Road, under the supervision of the Survey of India (1767).
- Railways: Red Hills (1837), Roorkee (1849), Bombay (1853), ...
- Post Office and Telegraph network.
- The Ganges canal, and numerous other Irrigation schemes to greatly expand the cultivable land.

- Expanding the cultivation of cash crops, like Opium, Tea and Indigo, to raise a few out of subsistence farming.
- Banning of human and animal sacrifices in EIC territory, along with infanticide.
- A professional Civil Service, even if it was rather corrupt.
- The Match, to save the hours lost lighting fires.
- A slightly more liberal legal code than the Fatawa-e-Alamgiri.

- Paper mills, from 1812 eg. A Publication on World Pulp, Paper & Allied Industry
- Book shops, from the 1840's eg. Higginbotham's
- Newspapers, form the Hicky's Bengal Gazette (1780)
- Photography in India during the 19th Century
- Schools of the European variety, with books, slates, University trained teachers, canes.
- Libraries
- The Asiatic Society
- Universities, from the Indian Institute of Technology Roorkee
- Medical colleges, Madras (1835)
- Museums, from 1814 eg. Indian Museum
- Public Vaccination programs, Smallpox (1802)
- General Hospitals, Madras (1664)
- The New European style cities of: Bombay, Madras, Calcutta, Shimla, Roorkee Etc.

১১.৩.৫.৩. কোম্পানির অধীনে ইউরোপীয় বৈজ্ঞানিক, উদ্ভিদবিজ্ঞানী, জরিপকারী ও চিকিৎসকগণ

যিশু সোসাইটি ১৫৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। প্রথম জেসুইট ১৫৪২ সালে ভারতে এসেছিলেন এবং তারা ২০০ বছরেরও বেশি সময় ধরে সক্রিয় ছিলেন। সূচনার দিনগুলিতে, ইউরোপীয়রা - উপকূলীয় অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল এবং অভ্যন্তরে প্রবেশের কোন কারণও ছিল না। ১৭৫৯ সালে পর্তুগালের রাজা তাঁর উপনিবেশ থেকে সমস্ত জেসুইটকে নিষিদ্ধ করেছিলেন; এবং ১৭৭৩ সালে পোপ আদেশ সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়। জেসুইটসের সময়, বৈজ্ঞানিক প্রশিক্ষণ এবং দেশকে ক্রস করার সুযোগ ছিল। এভাবে ১৫৮০ সালে ফাদার মনিটরেট (১৫৩৬-১৬০০) সম্রাট আকবরের একটি মিশনে সুরত থেকে ফতেহপুর সিক্রি পর্যন্ত অক্ষাংশের জন্য পর্যবেক্ষণ নিয়েছিলেন। পরের বছর আকবর যখন তার মামা ভাই মির্জা হাকিমের বিরুদ্ধে কাবুলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলেন, তখন তিনি দ্বিতীয় পুত্র মুরাদকে এবং শিক্ষকের পথে পর্যবেক্ষণের জন্য গৃহশিক্ষক হিসাবে নিযুক্ত হন। জেসুইটগুলি তাদের পর্যবেক্ষণ এবং ডায়েরিগুলি ইউরোপে প্রেরণ করেছিল যেখানে তারা বিশ্বস্ততার সাথে সংরক্ষণ এবং উপেক্ষা করা হয়েছিল। ইউরোপ তখনও ভারতের জন্য প্রস্তুত ছিল না। এটি কেবল অষ্টাদশ শতাব্দীতে যখন জেনে ভারত একটি অর্থ প্রদানের প্রস্তাব হয়ে যায় যে জেসুইট ডেটা খনন

করে ব্যবহার করা হয়েছিল। প্যারিসে ১৭০২ থেকে ১৭৪১ এর মধ্যে প্রকাশিত জেসুইট পর্যবেক্ষণের ৩৪ খণ্ডটি ঔপনিবেশবাদীদের দ্বারা আকৃষ্টভাবে পড়েছিল, এবং একটি ২৬-খণ্ড সংস্করণ ১৭৮০-৮৩-এ প্রকাশিত হয়েছিল, যার মধ্যে ছয়টি খণ্ড ভারতকে উৎসর্গ করা হয়েছিল। ভূগোলটি মিশনারিদের কাছে ছেড়ে দেওয়ার সময়, উদ্ভিদ বিজ্ঞান ব্যবসায়ীদের আগ্রহী ছিল না।

সর্বোপরি, রন্ধনসম্পর্কীয় প্রতি উদ্ভিদের লোভ ইউরোপীয়দেরকে ভারতে প্রথম স্থানে নিয়ে এসেছিল। তবে উদ্ভিদের অন্যান্য ব্যবহারও ছিল। তারা রোগের চিকিৎসায় ওষুধ সরবরাহ করেছিল এবং এর সাথে বহিরাগত মূল্যও ছিল। এটি কেবল স্বাভাবিক ছিল যে বীজ পরিদর্শন করা তাদের নিজস্ব স্বাস্থ্যের কারণে উদ্ভিদের প্রতি আগ্রহী হওয়া উচিত এবং তাদের ঔষধি, বাণিজ্যিক এবং কৌতূহল মূল্যে ফিরে আসার জন্য। ভারতে প্রথম পাশ্চাত্য উদ্ভিদবিদ ছিলেন পর্তুগিজ গার্সিয়া ডি অরতা (১৪৭৯-১৫৭২), লিসবনের চিকিৎসক এবং অধ্যাপক, যিনি ১৫৩৪ সালে ভারতে এসেছিলেন এবং তাঁর মৃত্যুর আগ পর্যন্ত স্থায়ী ছিলেন। ধর্মান্তরিত ইহুদী হিসাবে ডর্টা ১৫৩৮ বা ১৫৪১ সালে বোম্বাই দ্বীপে চলে এসেছিলেন যা পর্তুগিজরা ১৫২৮ সালে অধিগ্রহণ করেছিল। স্পষ্টতই ডি'অরতা তার এস্টেট ধরে রাখতে পারেনি, তবে ১৫৬৩ সালে তিনি নমুনা ও ওষুধের উপর 'ডায়ালগস' নামে একটি বই লিখেছিলেন। উদ্ভিদবিদ্যার পরবর্তী ছদ্মবেশী ডাচরা ছিলেন, যারা কোচিনে একটি ফ্যাক্টরি (একটি দুর্গের গুদাম) খোলেন ১৬৬৩ সালে। মালাবার থেকে সংগ্রহ করা উপাদান আমস্টারডামে ১২-খণ্ডের 'হার্টাস মালবারিকাস' হিসাবে প্রকাশিত হয়েছিল এবং ৭৯৪ প্লেটের দ্বারা চিত্রিত হয়েছিল - যার মধ্যে বেশ ভাল রয়েছে যে প্রজাতিগুলি তারা উপস্থাপন করতে চায় তাদের সাথে তাদের সনাক্তকরণে কোনও অসুবিধা নেই। 'এই ধরনের কাজের একটি কৌতূহল মূল্য ছিল। প্রভাবশালী সাড়া নিয়ে আরেকটি কাজ হ'ল পল হারম্যান সাত বছর ডাচ কোম্পানির ব্যয়ে সিলোন জীবজন্তু আবিষ্কার করেছিলেন। যেহেতু এই প্রজাতির সংগ্রহটি ইউরোপে প্রেরণ করা হয়েছিল, তাই ১৭৩৮ সালে এই দুর্দান্ত পদ্ধতিবাদী লিনাইজ তার ফ্লোরা জেইলানিকা প্রকাশের জন্য ব্যবহার করেছিলেন।

আমরা দেখেছি যে ভারতে আধুনিক বিজ্ঞানের প্রাথমিক ব্যবহার বিক্ষিপ্ত এবং এলোমেলো ছিল এবং স্থানীয় কৌতূহল দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়েছিল। এর বেশিরভাগের সমসাময়িক তাৎপর্য ছিল না এবং অনেক পরে বিজ্ঞানের মূল অঙ্গটিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। অতিরিক্তভাবে, এটি ভারতীয়দের নিজেরাই ছোঁয়াচে ফেলেছে। এর চেয়েও বড় তাৎপর্যটি ছিল ব্রিটিশ চিকিৎসকদের চিকিৎসা দক্ষতা। এই দক্ষতা ভারতীয় শাসকরা চেয়েছিলেন যারা এর জন্য সদিচ্ছা এবং বাণিজ্য ছাড়ের ক্ষেত্রে অর্থ প্রদান করেছিলেন। সুতরাং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জাহাজ হোপওয়েলের সার্জন গ্যাব্রিয়েল বুফটনকে আগ্রার সম্রাট শাহজাহানের দরবারে প্রেরণ করা হয়েছিল। সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র এবং ভাইসরয়ের শাহ সুজার সার্জন হিসাবে তিনি ১৬১৬-৫০ এর মধ্যে কাজ করেছিলেন। এরপরে কোম্পানি জন সুরম্যানের অধীনে মুঘল সম্রাট ফররুখসিয়রের কাছে পাঠালে, এতে একজন সার্জন উইলিয়াম হ্যামিল্টন অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যিনি একটি বেদনাদায়ক রোগের সম্রাটকে নিরাময়ে কাজে এসেছিলেন, যা তাঁর বিবাহকে বিলম্ব করেছিল। সার্জনের দক্ষতা কেবল ইংরেজ দলকেই সম্রাটের সাথে নয়, তাঁর শক্তিশালী মন্ত্রীর পক্ষে ছিল দূতাবাস তিনটি ফরমানকে সমস্ত শুল্কমুক্ত বাণিজ্য করার অধিকারের নিশ্চয়তা দিয়ে ফিরে এসেছিল। কৌতুকজনকভাবে, এটি কোম্পানির পাশাপাশি ব্যবসায়ীদের তাদের স্থানীয় প্রতিযোগীদের উপর একটি বড় সুবিধা দিয়েছে। সুরম্যানের দূতকে ‘কোম্পানির বন্দোবস্তের ইতিহাসে একটি যুগান্তকারী’ হিসাবে প্রশংসিত করা হয়েছে।

Role of the Portuguese:

The gold coins minted by the Portuguese for use in India depict the armillary sphere, the pretelescopic basic navigational instrument used for determining the latitude. This was Portugal's way of paying tribute to science to which it owed its power. The Portuguese arrived in India even before the Mughals did. Their love for Christianity and hatred for Muhammadans far exceeded their desire for Indian Territory. Moreover, given their small population they did not quite know how to successfully deal with the scurvy deaths on the sea. The Portuguese introduced navy as a parameter in India's geo-political equations, placing the Indian rulers at a disadvantage. Even when its power was at its peak, the Mughal Empire had to seek the help of the religiously neutral British to thwart the Portuguese attempts at preventing Indian Muslims from sailing to Mecca. When the Portuguese first arrived in India, Copernican heliocentrism had not yet made its 84 appearance. But by the time the Mughal Empire collapsed, Europe was already on the verge of industrial revolution, so that science and colonialism could feed each other.

French Initiative:

Filling the political vacuum in India required as a first step knowledge about its geography. The French were more successful on the scientific front than on the colonial. The first worthwhile map of India was compiled in 1752 by the French geographer Jean-Baptiste Bourguignon D'Anville at the request of French East India Company, who based it on Jesuit data and on whatever geographical information he could lay his hands on. The value of D'Anville's Carte de l'Inde can be judged from the fact that it was reprinted in England in 1754 and then again in 1759, along with the annotated translation of his memoirs

Rise of the British:

Astronomy was the first modern science to be brought to India, as a geographical and navigational aid. Its early use was however sporadic and mostly out of personal curiosity. Systematic scientific effort became essential when the 1757 battle of Plassey transformed the British East India Company into a shareholder of Indian polity. The Company Bahadur was fully conscious of its needs: survey of its present and future lands; safety of navigation; increased revenue; and proper administration. The first need was geographical knowledge. In 1757 itself when Clive was still at the Nawab's capital Murshidabad, he proposed that _an exact and useful survey may be made which

will enable us to settle beneficial boundaries‘. Accordingly a ‗Surveyor of the New Lands‘ was appointed in 1761, and in 1767, two years after the Company received divani rights over Bengal, Bihar and Orissa, Maj. James Rennell was made the ‗Surveyor-General of Bengal‘. Rennell‘s Bengal and Behar Atlas appeared in 1779-81, and the Map of Hindoostan in 1782-92. Surveys were continually required for military purposes. Geographical location of important places in the country was determined with alacrity by ‗borrowing a sextant here, a watch there, and a quadrant in another quarter, from different officers at Calcutta who happened to possess them‘. Surveyors were sent out with every army to prepare route maps. The importance of ‗military geography can be gauged from the fact that in 1790 when the Governor General took the command against Tipu, the Sultan of Mysore, he appointed the Surveyor-General to his personal staff. In 1793 the Company paid the fabulous amount of Rs 6000 to a surveyor, Lt Robert Hyde Colebrooke, for a map of Mysore accompanied by a memoir Colebrooke served as Surveyor General of Bengal in 1794-1808.

আঠারো শতকের মাঝামাঝি সময়ে ভারতে বিভিন্ন ঘরানার চিকিৎসক ছিল। সেখানে যথাক্রমে বৈদ্য এবং হাকিম ছিলেন, যারা আয়ুর্বেদ এবং ইউনানী অনুশীলন করেছিলেন। খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ অব্দের দিকে ভারতে আয়ুর্বেদ আবির্ভূত হয়েছিল এবং এর অনুশীলনটি শাস্ত্রীয় সংস্কৃত গ্রন্থের ভিত্তিতে ছিল। ইউনানী বা গ্রেকো-আরবি medicine-টি দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলিম শক্তি প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতে চালু হয়েছিল। তখন থেকে হাকিম এবং বৈদ্যেরা একে অপরের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা নিয়েছিলেন। সাধারণত বৈদ্য এবং হাকিমগণ যথাক্রমে হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অধিকন্তু, প্রাচীন কাল থেকেই জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় ছিলেন অনুশীলনকারীগণ।

এছাড়াও ছিলেন ইউরোপীয় চিকিৎসকরা, যারা ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইউরোপীয় প্রধান সংস্থাগুলির নিয়োগে ভারতে আসতে শুরু করেছিলেন। তারা ইউরোপে তৎকালীন চিকিৎসায় প্রশিক্ষিত ছিলেন এবং সংস্থার সৈন্য এবং কর্মকর্তাদের চিকিৎসার প্রয়োজনের দায়িত্ব নিয়েছিলেন। এই চিকিৎসকগণ ভারতে পশ্চিমী চিকিৎসা ব্যবস্থা চালু করেছিলেন [introduced]। পাশ্চাত্য ঔষধগুলি সাধারণত ভারতে 'ডক্টরি' হিসাবে পরিচিত ছিল এবং এর চিকিৎসকদের "ডাক্তার" বলা হত। "ডাক্তার"দের উপস্থিতি, পোশাক, বাচনভঙ্গি বৈদ্য এবং হাকিমদের চেয়ে আলাদা ছিল।

সকল প্রকার চিকিৎসাপদ্ধতির মিথস্ক্রিয়তার প্রাথমিক বছরগুলিতে, পাশ্চাত্য চিকিৎসা আয়ুর্বেদ এবং ইউনানী মানবদেহের কৌতুকপূর্ণ গঠনতন্ত্র এবং মানবিক ভারসাম্যহীনতা সম্পর্কে একই ধারণাকে রোগের প্রাথমিক কারণ হিসাবে ভাগ করে নিয়েছিল। পারস্পরিক শ্রদ্ধা ছিল এবং ইউরোপীয় চিকিৎসকরা ভারতীয় চিকিৎসক, বিশেষত গ্রীষ্মমণ্ডলীয় রোগের চিকিৎসার কাছ থেকে শিখতে আগ্রহী ছিলেন। তবে, ইউরোপে যুক্তিবাদী চিন্তার উত্থান এবং ঐতিহ্য ও প্রজ্ঞার চেয়ে পর্যবেক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়াটিকে ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব দেওয়া হওয়ায় ইউরোপীয় চিকিৎসকরা মনে করেছিলেন যে তাদের ব্যবস্থাটি ভারতীয় পদ্ধতির চেয়ে উচ্চতর।

ভারতের সমস্ত ইউরোপীয় বাণিজ্য সংস্থাগুলির মধ্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি প্রভাবশালী হয়ে উঠেছে। আঠারো শতকের শেষার্ধে ভারতে ব্রিটিশ শাসনের ভিত্তি স্থাপন করা হয়েছিল। ১৭৫৭ সালের পর বাংলা সহ সারা দেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতে আঞ্চলিক সম্পদ অর্জন শুরু করে। উনিশ শতকের

মাঝামাঝি নাগাদ, সংস্থাটি ভারতীয় উপমহাদেশের বেশিরভাগ অংশে রাজত্ব করছিল। ১৮৫৮ সালে ভারতের শাসন ব্রিটিশ মুকুটে স্থানান্তরিত হয়।

আঠারো শতকের মাঝামাঝি থেকে যুদ্ধের কারণে, ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির বেশিরভাগ সার্জনদের প্রাথমিকভাবে সামরিক দায়িত্ব ছিল এবং তারা প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিল। সংস্থাটিতে নিয়োগপ্রাপ্ত ভারতীয় সেনা হলেন প্রথম ভারতীয় যারা ব্রিটিশ সার্জনদের কাছ থেকে চিকিৎসা নিয়েছিলেন। উচ্চ বর্ণের সৈন্যরা প্রায়শই কঠোর বর্ণের নিয়মের কারণে ইউরোপীয়দের দ্বারা প্রস্তুত ওষুধ গ্রহণ করতে রাজি ছিল না। সুতরাং, সংস্থাটি ব্রিটিশ সার্জনদের দ্বারা নির্ধারিত ওষুধগুলি মিশ্রণ ও সরবরাহের জন্য নতুন ভারতীয় রেজিমেন্টগুলির জন্য ভারতীয় অনুশীলনকারীদের নিয়োগ করেছিল। তদুপরি, ভারতীয়দের চিকিৎসা সহায়ক এবং হাসপাতালের আদেশের ভূমিকা গ্রহণের জন্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শুরু থেকে নিয়োগ করা হয়েছিল। তবে, ১৭৬০ এর পরে, প্রত্যেক প্রদেশের অধীনে একটি অধস্তন মেডিকেল সার্ভিস (এস.এম.এস.) তাদের সংগঠিত করার জন্য তৈরি করা হয়েছিল। এই পরিষেবাটি ১৯৪৪ অবধি "উচ্চতর" চিকিৎসা সেবার সাথে সহাবস্থান ছিল। তারা সাধারনত দেশীয় চিকিৎসা ব্যবস্থাগুলি সম্পর্কে কিছুটা ধারণা রাখে এবং ইউরোপীয় সার্জনের অধীনে কাজ করার সময় অতিরিক্ত দক্ষতা অর্জন করেছিল। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে তাদের জন্য কোনও আনুষ্ঠানিক প্রশিক্ষণ ছিলনা। ব্রিটিশদের দ্বারা প্রশিক্ষিত ভারতীয় সহায়কদের "দেশীয় চিকিৎসক" বলা হত। কয়েকজন ব্রিটিশ সার্জনের কাজের চাপ কম ছিল, কারণ ভারতীয় জনসাধারণের জন্য কোনও চিকিৎসা সুবিধা ছিল না, এবং ব্যক্তিগত অনুশীলন বড় শহরগুলিতেই সীমাবদ্ধ ছিল। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে কলকাতার প্রথম হাসপাতালটি ভারতীয় জনগণের জন্য উন্মুক্ত করে এই পরিবর্তন শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সার্জনরা এখন সকল আর্থ-সামাজিক স্তরের ভারতীয়দের চিকিৎসা করেছিলেন এবং ভারতীয়রা বিশেষত গুরুতর অসুস্থতায় তাদের সাহায্যের জন্য ফিরে এসেছিলেন। এই শতাব্দির শেষে তিনটি প্রেসিডেন্সিতেই (বোম্বে, মাদ্রাজ, বাংলা) হাসপাতাল স্থাপন শুরু হয়েছিল।

১১.৩.৬.৫. সহায়ক গ্রন্থ

১) B. V. Subbarayappa [editor], Medicine and Life Sciences in India, New Delhi : Centre for Studies in Civilizations.

২) Naresh Ch. Datta, Tulika Sen, Aspects of History of Science, The Asiatic Society.

৩) বিনয়ভূষণ রায়, চিকিৎসাবিজ্ঞানের ইতিহাস, সাহিত্যলোক।

৪) সুব্রত পাহাড়ি, উনিশ শতকের বাংলায় সনাতনী চিকিৎসা ব্যবস্থার স্বরূপ, প্রগ্রেসিভ।

১১.৩.৭.৬. নমুনা প্রশ্ন

১) How did the European doctors penetrate Indian Medical spehre?

২) Critically analysis the science policy of EIC.

পর্যায়- ৪

BLOCK 4: Development of scientific and technical education

একক - ৭, ৮, ৯, ১০, ১১

সূচীপত্র

১১.৪.৭.১. উদ্দেশ্য
১১.৪.৭.২. উনবিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষার ইতিহাস
১১.৪.৮.৩. উনবিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু নজির (Case Studies)
১১.৪.৯.৪. বিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষার ইতিহাস
১১.৪.১০.৫. বিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু নজির (Case Studies)
১১.৪.১১.৬. বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ
১১.৪.১১.৭. সহায়ক গ্রন্থ
১১.৪.১১.৬. নমুনা প্রশ্ন

১১.৪.৭.১. উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল উনবিংশ ও বিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষার ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করা। পাশাপাশি কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু নজির ও বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ ও বিকাশ সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা এই অংশে করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস পড়তে গেলে এই প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে সম্যক ধারনা প্রয়োজন।

১১.৪.৭.২. উনবিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষার ইতিহাস (Technical Education in the 19th Century.)

ভারতে কারিগরি শিক্ষার ইতিহাসটি পৌরানিককাল (1000 খ্রিঃপূঃ) এবং বৈদিক কাল (500 খ্রিস্টপূর্বের পূর্বে) থেকে সন্ধান করা যেতে পারে। যখন তক্ষণ[ছুতোরের কাজ], কামারশালা, ঢালাইয়ের কাজ এবং বুননের মতো অসংখ্য প্রযুক্তিগত দক্ষতা শিক্ষার অঙ্গ ছিল। সমসাময়িক প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ থেকে প্রমাণিত পরবর্তীকালে মধ্যযুগীয় ভারতবর্ষে বৃত্তিমূলক দক্ষতা উচ্চতর উচ্চতায় পৌঁছেছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা অধুনা পাকিস্তানের সিন্ধু নদীর তীরে চারশো মাইল দূরে চার হাজার বছরের পুরনো দুটি শহর আবিষ্কার করেন। দক্ষতার সাথে নির্মিত এই শহরগুলি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের সাথে তুলনীয় একটি উন্নত সভ্যতার অংশ ছিল। প্রত্নতাত্ত্বিকেরা শহরগুলির নামকরণ করেছিলেন- মোহেনজোদারো এবং হরপ্পা।প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সিন্ধুসভ্যতার বিভিন্ন স্থান থেকে মূল্যবান পাথর সহ সূক্ষ্ম গহনার অবশেষ খুঁজে পেয়েছেন। এথেকে প্রমানিত হয় যে সিন্ধু সভ্যতায় শিল্প ও ব্যবসা-বানিজ্যকে যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হত। সিন্ধু সভ্যতা প্রায় 1700 খ্রিস্টপূর্বাব্দে মহাবন্যা এবং ভূমিকম্পসহ বিভিন্ন প্রাকৃতিক এবং মনুষ্যসৃষ্ট কারনের ফলে পরিত্যক্ত হয়েছিল।তবে প্রত্নতাত্ত্বিকেরা আজও নতুন নিদর্শনগুলি সন্ধান করতে থাকেন। সুতি ও রেশম কাপড়, অঙ্কিত-সূচিকর্ম, কলাই করা

[enameled] জিনিসপত্র, স্বর্ণ ও রূপা গহনা, তরোয়াল এবং ছুরি চাকু, ধাতব পাত্র নির্মান প্রযুক্তিগত শিক্ষার একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা না থাকলে এত দীর্ঘ সময় ধরে তা টেকসই হতনা।

তবে, আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার [Technical Education] বিষয়টি ইংরেজ ব্যবসায়ীদের দ্বারা ১৭৯৪ সালে মাদ্রাজে (চেন্নাই) "সার্ভে স্কুল" প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে ভারতে শুরু হয়েছিল। ব্রিটিশ সমীক্ষকদের সহায়তার পাশাপাশি, স্কুলটি আধুনিক ভূমি সমীক্ষায় ভারতীয়দের ব্যক্তিগত প্রশিক্ষণ প্রদান করেছিল। পরবর্তীতে, প্রযুক্তিগত শিক্ষা দেশের অন্যান্য অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। আঠারো-উনিশ শতকে শিল্পবিপ্লবের ফলে কৃষিতে বড় ধরনের পরিবর্তন ঘটে। উৎপাদন, খনন, পরিবহন এবং প্রযুক্তির আর্থ-সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থার উপর গভীর ব্যাপক প্রভাব ফেলেছিল। প্রাথমিকভাবে ব্রিটেনে শিল্পবিপ্লব শুরু হলেও পরবর্তীকালে ইউরোপ, উত্তর আমেরিকা এবং শেষ পর্যন্ত বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে। শিল্পবিপ্লব মানব ইতিহাসের একটি প্রধান 'টার্নিং পয়েন্ট' বা সন্ধিক্ষন হিসাবে পরিচিত। প্রাত্যহিক জীবনের প্রায় প্রতিটি দিকই শেষ পর্যন্ত কোন না কোনভাবে প্রভাবিত হয়েছিল।

শিল্পবিপ্লব উৎপাদন, বিতরণ, এবং প্রযুক্তি-সঞ্চয়ী সভ্যতার [techno savouring civilization] ভিত্তি স্থাপনের নতুন ধারণাগুলি প্রবর্তন করেছিল তাতে সন্দেহ নেই। টেক্সটাইল শিল্পের যান্ত্রিকীকরণ, লৌহ-ইস্পাত শিল্পের বিকাশ এবং পরিশোধিত কয়লার ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছিল। ক্যানাল, রাস্তা এবং রেলপথ প্রবর্তনের মাধ্যমে বাণিজ্য সম্প্রসারণ সহজ হয়েছিল। টমাস সেভারি [Thomas Savery] দ্বারা স্টিম ইঞ্জিন দিয়ে যান্ত্রিকীকরণ শুরু হয়েছিল,যা পুর্নতা পায় টমাস আলভা এডিসনের ফোনোগ্রাফ ও লাইটবাল্ব আবিস্কারের মাধ্যমে। ছোট চাকরীর যান্ত্রিকীকরণ এবং মেশিনের অগণিত আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল। এর ফলে কাজে উৎসাহ আসে যা উতপাদনে গতি আনে। দলে দলে দক্ষ-অদক্ষ নির্বিশেষে কলকারখানায় ভিড় জমাতে থেকে। প্রযুক্তিবিদদের প্রশিক্ষণের জন্য, অনেক টেকনিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কারণ ১৮৪২ সালে গিন্দি, মাদ্রাজে একটি শিল্প বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল যা বন্দুকবাহী কারখানার [Gun Carriage Factory] সাথে যুক্ত ছিল। ইউরোপে উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লবকে তাই বলা যেতে পারে প্রকৌশল যুগের সূচনা।

আমরা যদি প্রযুক্তিগত শিক্ষার ঐতিহাসিক বিকাশ পরীক্ষা করে দেখি তবে জানা যাবে যে- ভারতে কারিগরি শিক্ষার ভিত্তি ইউরোপের মতো প্রায় একই সময়ে স্থাপন করা হয়েছিল কিন্তু ভারত স্বাধীন হওয়ার আগ পর্যন্ত ভারতে এর বিকাশ অত্যন্ত সীমাবদ্ধ এবং ধীর ছিল। যদিও, ১৭৫৪ সালে পলাশি যুদ্ধের পরে, ব্রিটিশদের অবস্থান ব্যবসায়ী থেকে উপনিবেশকারীতে পরিবর্তিত হয়েছিল। সুতরাং, দেশকে শাসন করার জন্য, এদেশের টোগোগ্রাফি বা ভূমিরূপ সম্পর্কে অন্তরঙ্গ জ্ঞান থাকা আবশ্যিক হয়ে পড়ে। এই উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য, ইংরেজ ব্যবসায়ীরা ব্রিটিশ সার্ভেয়ারদের সহায়তার জন্য ভূমি জরিপে ভারতীয় কর্মীদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করে। ১৭৯৪ সালে মাদ্রাজে (চেন্নাই) একটি সমীক্ষা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

সুতরাং, এটি উল্লেখযোগ্য যে ব্রিটিশরা ভারতে প্রথমে রাস্তা, সেতু, ভবন, রেলপথ, ক্যানাল এবং জাহাজঘাটা ইত্যাদির উপর নিরীক্ষকদের প্রশিক্ষণ দিয়ে প্রযুক্তিগত শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করেছিল । একই সঙ্গে নিম্ন পদমর্যাদার প্রযুক্তিবিদদেরও প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছিল সেনাবাহিনী, নৌবাহিনী এবং অন্যান্যক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত সাহায্যের স্বার্থে। এই প্রশিক্ষণ স্কুলের প্রশিক্ষকরা কারিগর এবং কারিগরদের মতো নিম্ন নিম্ন পদ ব্যাতিত বেশিরভাগই ছিলেন ব্রিটিশ।সুতরাং, আমরা বলতে পারি যে ব্রিটিশদের অধীনে উনিশ শতকে ভারতে আধুনিক প্রযুক্তিগত শিক্ষার সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল। ভারত স্বাধীনতা অর্জনের [১৯৪৭] পরে এটি বহুগুণে প্রসারিত হয়েছিল এবং এখনও এগিয়ে চলছে।

[Pioneering technical schools and colleges in India]

Year	College Name	Branch	New Name
1847	Thompson's Engg. College, Roorkee	Civil	Roorkee University IIT, Roorkee
1856	Calcutta College of Civil Engg., Writers building	Civil Mechanical (1931), Electrical(1939)	Bengal Engg. College
1858	Poona College of Engg.	Civil	
1858	Industrial School, Gun Carriage Factory	Civil	Guindy College of Engg.
1887	Victoria Jubilee Technical Institute, Bombay Electrical Mechanical, Textile		
1908	College of Engg. And Technology, Jadavpur		
1915	Indian Institute of Science, Bangalore Mechanical(1908) Electrical Chemical(1921)		
1917	Banaras University Mechanical, Electrical, Metallurgy.		

১৮৪৪ সালে বৃটিশ সরকার উডস ডেসপ্যাচ নামে পরিচিত একটি নথিতে পেশাগত শিক্ষার প্রবর্তনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়টি তুলে ধরে। ডিরেক্টর অফ কোর্টসের বিখ্যাত উডস ডেসপাচ, "ভারতে বর্ধিত শিক্ষাব্যবস্থার পশ্চাৎপদকরণের পরিকল্পনা করা হয়েছিল"। তৎকালীন ভারতের গভর্নর জেনারেল লর্ড ডালহৌসিকে প্রতিটি রাষ্ট্রপত্রে ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস প্রতিষ্ঠার জন্য পরিচালক আদালতে সুপারিশ করার অনুরোধ জানানো হয়েছিল।

কারিগরি শিক্ষার দুটি পৃথক স্তরে বিকাশ ঘটে - একটি কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয় এবং অন্যটি স্কুল দ্বারা প্রতিনিধিত্ব করে। উন্নত উপার্জনের জন্য এই ধরণের শিক্ষা অপরিহার্য বলে বিবেচিত হবার পরে ১৮৪০

সাল থেকে প্রযুক্তিগত শিক্ষা তার গুরুত্ব অর্জন করে। স্কুল পর্যায়ে বলা হয়েছে যে, ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুলগুলি ১৮২৫ সালের প্রথম দিকে কলকাতা (কলকাতা) এবং বোম্বাই (মুম্বাই) এ বিদ্যমান ছিল। তবে আমাদের কাছে প্রথম প্রামাণিক বিবরণ মেজর মাইটল্যান্ডের ১৮৪০ সালে মাদ্রাজের গুইন্ডি/গিন্ডি-তে প্রতিষ্ঠিত একটি শিল্প বিদ্যালয়ের।

১৮৪২ সালে, উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট গভর্নর, জেমস থমসন সর্বপ্রথম দেশের সরকারী কাজের জন্য প্রকৌশল [Engineering] কর্মীদের প্রশিক্ষণের জন্য রুরকিতে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপনের প্রস্তাব করেছিলেন। এর মধ্যে গঙ্গা খালের নির্মাণকাজও অন্তর্ভুক্ত ছিল। সুতরাং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারদের প্রশিক্ষণের জন্য রুরকি কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। জেমস থমসন ১৮৫৩ সালে মারা গেলে, রুরকি কলেজ-এর 'থমসন কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং' নামকরণ করা হয়েছিল। ১৯৪৪ সালে, রুরকি বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাস হয়েছিল এবং ১৯৪৯ সালে এই কলেজের মর্যাদা আরও বাড়ানো হয়েছিল এবং রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রথম কারিগরি হয়ে উঠল স্বাধীন ভারতে । প্রতিষ্ঠার সার্ধশতবর্ষে ইনস্টিটিউটকে ২০০৩ সালে ভারতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট (আইআইটি)-এর মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। এটি সরকার কর্তৃক গৃহীত সেচ ও অন্যান্য প্রকৌশল প্রকল্পের সরাসরি উতপাদন এবং ১৮৯৯ সালে স্থায়ী ভিত্তিতে স্থাপন করা হয়েছিল, ভবিষ্যতে কারিগরি শিক্ষার বিস্তারে ভারতে মডেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করা ।

১৮৫৪ সালে, পুনেতে অধ্যক্ষদের প্রশিক্ষণের জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। 'পুনা ইঞ্জিনিয়ারিং ক্লাস এবং মেকানিক্যাল স্কুল'- এর প্রধান কাজ অফিসারদের ভবন, বাঁধ, খাল, রেলপথ এবং সেতুর মতো জনকল্যান মূলক কাজে প্রশিক্ষণ দেওয়া। পরবর্তীকালে, বিদ্যালয়টি 'পুনা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' হয়ে ওঠে এবং আরও পরে ১৯১১ সালে নামটি 'ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পুনা' নামকরণ করা হয় (ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, পুনে বা সিওইপি)। সিওইপি-র শিক্ষার্থী এবং প্রাক্তন ছাত্রদের কথাবার্তায় সিওইপিয়ান হিসাবে অভিহিত করা হয়।

১৮৫৬ সালের নভেম্বরে, কলকাতা কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং নামে একটি কলেজ রাইটার্স ভবনে চালু হয়েছিল। ১৮৫৭ সালে নামটি বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বদলে দেওয়া হয়। এটি সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের লাইসেন্স কোর্স দেয়। ১৮৬৫ সালে, এটি প্রেসিডেন্সি কলেজের সাথে একত্রিত হয়েছিল। তারপরে এটি বিশপ কলেজের অন্তর্গত হয় এবং পরে এটি শিবপুরে স্থানান্তরিত হয়।

১৮৬৬ সালে বোম্বে বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত হয় পুনা কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং। ১৮৮০ সালে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অব গুইন্ডি, শিবপুর, পুনা এই কলেজগুলিতে শিক্ষা, বিজ্ঞান, প্রযুক্তিচর্চা শুরু হয়েছিল। ১৮৮০-এর পরে, যান্ত্রিক এবং বৈদ্যুতিক প্রকৌশলীদের চাহিদাও অনুভূত হয়েছিল। তবে আলোচ্য সময়ে উক্ত বিষয়গুলিতে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কেবল শিক্ষানবিশ শ্রেণিই শুরু হয়েছিল। ১৮৮৭ সালে, বেসরকারী উদ্যোগের মাধ্যমে, রানী ভিক্টোরিয়া রাজত্বের হীরকজয়ন্তী স্মরণে বোম্বাই (মুম্বই)-তে 'ভিক্টোরিয়া জুবিলি টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল। ভি.জে.টি.আই.-এর মূল লক্ষ্য ছিল বৈদুতিন, যান্ত্রিক এবং টেক্সটাইল ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রযুক্তিতে লাইসেন্স প্রশিক্ষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়া।

১৯০২-১৯১১ সাল থেকে দেশে উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তিগত শিক্ষার গুরুত্ব উপলব্ধি করে, ভারতীয় শিক্ষানীতি (১৯০২) প্রযুক্তিগত শিক্ষার দ্রুত বিকাশের লক্ষ্যে উদ্যোগী হয়েছিল। এই সময়কালে, ভারত সরকার কারিগরি এবং পেশাদার শিক্ষার দিকে কোনও মনোযোগ দেয়নি। তবে, ভারতীয় শিক্ষা কমিশনের সুপারিশগুলি

গৃহীত হয়েছিল এবং প্রযুক্তিগত ও বৃত্তিমূলক বিষয়গুলি বিভিন্ন প্রদেশের উচ্চ বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১১.৪.৮.৩. উনবিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু নজির (*Some case studies of Technical Education in the 19th Century*) :

কারিগরি শিক্ষার মূল লক্ষ্য হল শিক্ষার্থীদের শিল্প এবং কলকারখানার জন্য দক্ষ ও প্রযুক্তিগতভাবে উপযুক্ত করে তোলে। কারিগরি শিক্ষার প্রকল্পগুলি পেশা এবং কর্মসংস্থানের জন্য খুবই কার্যকরী। এর ফলে উদীয়মান প্রযুক্তিগত প্রত্যাশীদের উন্নত এবং আধুনিক প্রযুক্তিতে উন্নীত করে। যে শিক্ষা প্রযুক্তি এবং দক্ষতার বিশেষ ব্যবহারিক জ্ঞান সরবরাহ করে তা কারিগরি শিক্ষা হিসাবে পরিচিত। এটি সাধারণত প্রথাগত শিক্ষার চেয়ে আলাদা। এই শিক্ষা প্রকল্প স্বতন্ত্র এবং স্ব-শিক্ষার প্রচার করে, কার্যকরভাবে ছাত্রকে সুর দেয় এবং শিক্ষার্থীদের সম্ভাবনা বৃদ্ধি করে। কারিগরি শিক্ষা পরীক্ষার অধ্যয়ন এবং পাস-ফেল নিয়ে চিন্তিত নয়, বরং এটি শিক্ষার্থীদের নিজে হাতে প্রযুক্তিগত কাজে সক্ষম করে তোলার ওপর জোর দেয়। A.Rahman বলেছেন- বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তি হল 'যমজ' সন্তান। ভারতে প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিভিন্ন পর্যায়:

- শিল্প প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট [Industrial training institute]
- ডিপ্লোমা, এবং ডিগ্রি [Diploma and degree]
- স্নাতকোত্তর এবং বিশেষায়িত প্রযুক্তি ক্ষেত্রে গবেষণা [Post-graduate and research in specialized technical fields]

মধ্যযুগের ভারতবর্ষে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিচর্চা

বৈজ্ঞানিক A.K.Biswas-এর মতে সুলতানি[১২০৬-১৫২৬] এবং মুঘল আমলে [১৫২৬-১৭৫৭] ভারতবর্ষে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রসার হয়নি বললেই চলে। সনাতন ভারতবর্ষের 'হিন্দু বিজ্ঞান' চর্চার অবলুপ্তি ঘটেছিল। কারণ আলোচ্য পর্বে বিদেশী শাসকের অত্যাচার, জুলুম, কর ব্যবস্থা ভারতীয়দের উন্নতির পথে প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। তদুপরি, ধ্রুপদী ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে আঞ্চলিক ভাষা যথা, বাংলা, মারাঠি, তামিল, গুজরাতি প্রভৃতির মধ্যে যে সমন্বয় সাধন প্রয়োজন ছিল- তা হয়নি। একথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে- পঞ্চদশ শতকে মুসলিম বিশ্বের অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক বাতাবরন কিছুটা হলেও বিপর্যয় এসেছিল। সম্ভবত সেই কারনেই মুঘল শাসকদের আমলে বৌদ্ধিক চেতনার বিকাশ খুব একটা হয়নি। কিন্তু একথা বললে অন্যায় হবে যে- সম্রাট আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান প্রমুখ শাসক শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পকলা এবং বিজ্ঞানের কদর করতেন না! নিশ্চয় করতেন। যে কারনে তাজমহল, মোতি মসজিদ, আগ্রা দূর্গ, লাল কেল্লার মতো জগদ্বিখ্যাত স্থাপত্য আজও মাথা তুলে স্বগর্বে নিজের অস্তিত্ব জাহির করছে। আবুল ফজল, ফৈজি, বীরবলের রচনা এবং তাঁদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা নানান গল্প 'কিংবদন্তি' হয়ে বেঁচে আছে। আকবর, ফিরোজ শাহ বাহমনি, রাজা সোয়াই জয় সিংহ প্রমুখ ব্যক্তিগত উদ্যোগে বিজ্ঞান সাধনায় উৎসাহ দিয়েছিলেন। কিন্তু এর পাশাপাশি একথাও সত্যি যে- এই শিল্প-সাহিত্য-বিজ্ঞানচর্চা রাজসভার মধেই সীমাবদ্ধ ছিল। সাধারন জনতার মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়েনি। ফলে সামগ্রিক বিচারে একথা মেনে নিতেই হবে, প্রাচীন ভারতের তুলনায় মধ্যযুগে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রসার অনেক কম হয়েছিল।

অন্যদিকে মধ্যযুগীয় ইউরোপ *'রেনেসাঁ'র* হাত ধরে উন্নতির চরম শিখরে পৌঁছে যায়। ইউরোপের এই উন্নতি প্রাচীন ভারতের গৌরবময় অতীতের সঙ্গে অনেক মিল আছে। উভয়ক্ষেত্রেই রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, ধর্মীয় গোঁড়ামি, বহির্বিশ্বের সঙ্গে যোগাযোগ বিচ্যুতি এবং স্বাধীন চিন্তার প্রতিবন্ধিকতা প্রভৃতি কারনে পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে বিজ্ঞান-প্রযুক্তির প্রসার রোধ হয়েছিল।

ঔপনিবেশিক আমলে বিজ্ঞান-প্রযুক্তিচর্চা

প্রথাগত সংস্কৃত এবং আরবি-ফারসি জ্ঞান-বিজ্ঞানের পরিবর্তে আধুনিক পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-প্রযুক্তি চর্চার সূচনা হয় ব্রিটিশ আমলে। এই শিক্ষাচর্চার মাধ্যম ছিল বিদেশি ভাষা 'ইংরাজি'। এই শিক্ষা প্রসারের মূল কারণ ছিল ঔপনিবেশিক স্বার্থ সিদ্ধি। সরকারী উদ্যোগে মেডিসিন, সার্ভে, প্রশাসন, সামরিক কার্যকলাপ সংক্রান্ত বিভিন্ন দপ্তর স্থাপিত হয়। এই সকল দপ্তর বা প্রতিষ্ঠানের সুপ্ত উদ্দেশ্য ছিল নানান উপায়ে রাজস্ব বৃদ্ধি করা, সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ চরিতার্থ করা। এই উদ্দেশ্য পূরনের প্রথম ধাপ হিসাবে Trigonometrical, Topographical, Hydrographical, Geodetic, Geological সার্ভে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সরকার সচেতন ভাবে উক্ত প্রতিষ্ঠানগুলি থেকে ভারতীদের দূরে রাখেন। কোন উচ্চপদে ভারতীয়দের নিয়োগ করা হতনা। ১৮৮০ সালে Dr. P.N.Bose প্রথম ভারতীয় হিসাবে উচ্চপদে [A Grade] নিযুক্ত হন। তবে উচ্চপদেও ইউরোপীয়রা ভারতীদের সঙ্গে বিমাতৃসুলভ আচরণ করতেন। ভারতীয় আধিকারিকদের সংখ্যা এবং মাসিক বেতন ছিলে ইউরোপীদের তুলনায় অনেক কম।

Employment of Europeans and Indians in the Officers' Rank during the British Period:

Name of the Service	Officer Grade European-Indian	Salary European-India
Botanical Survey	2-0	1000-0
Geological Survey	16-0	1010-0
Agricultural service	38-5	1000-460
Medical & Bacteriological service	24-5	12020-520
Veterinary Department	2-0	1100-0

স্যার উইলিয়াম জোন্স কর্তৃক ১৭৮৪ সালে Asiatic Society [Kolkata] প্রতিষ্ঠার পর এদেশে আধুনিক বৈজ্ঞানিক গবেষণার পথ প্রশস্ত হয়।এই প্রতিষ্ঠানের উদ্যোগে ১৮৬৬ সালে Indian Museum নির্মিত হয়। এছাড়া মাদ্রাজ, বোম্বে সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে গড়ে ওঠে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সংক্রান্ত বিভিন্ন সংস্থা, সভা, সমিতি। আলোচ্য পর্বে গড়ে ওঠা কয়েকটি সংস্থা হল নিম্নলিখিত;

a) An Agricultural Society of India 1820
b) Madras Literary Society 1833
c) Indian Association for Cultivation of Science 1876

d) Natural History Society of Bombay	1883
e) Indian Mathematical Society	1903

Calcutta Medical College:

কলকাতা মেডিক্যাল প্রাচীনতম মেডিকেল কলেজ ভারতে. এটি 1835 এ সম্মিলিত ফলাফলের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল উভয় ভারতীয় এবং ব্রিটিশদের প্রচেষ্টা; ধনী প্রাথমিক রাজধানীর একটি বড় অংশকে অবদান রেখেছিল ভারতীয়রা। যদিও প্রতিষ্ঠানটি অনেক অগ্রগামীদের লালন-পালন করেছে চিকিৎসা বিজ্ঞান, এর স্বর্ণযুগের সাথে শেষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে ভারতে ব্রিটিশ শাসন। **কলকাতা মেডিকেল কলেজ ভারতের প্রাচীনতম মেডিক্যাল কলেজ। ভারতীয় এবং ইংরেজদের যৌথ উদ্যোগে ১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়। এই প্রতিষ্ঠান ভারতবর্ষে বহু গুণী চিকিৎসক তৈরি করেছে। যদিও রঞ্জিত পাঞ্জা, আরতি ঘোষ মনে করেন- ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের শ্রেষ্ঠ সময়ের অবসান হয়।**

বাংলার নবাব এবং ডাচদের সঙ্গে যুদ্ধের কারনে ইংরেজ সৈন্যদলের চিকিৎসার জন্যে হাসপাতাল তৈরির প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। ১৭৬০ সাল নাগাদ খিদিরপুরে অস্থায়ীভাবে হাসপাতাল গড়ে ওঠে। পরে এটি স্থায়ীভাবে ফোর্ট উইলিয়ামে স্থানান্তরিত হয়। ১৭৬৭ সালে দমদমে টিকাকরনের জন্যে একটি হাসপাতাল গড়ে ওঠে। ১৭৬৮ সালে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি একটি বাগান বাড়ি ক্রয় করে। এটি পরে Presidency General Hospital নামে পরিচিত হয়। বর্তমানে এটি Seth Sukhlal Karnani Memorial (SSKM) Hospital বিখ্যাত। **কলকাতার প্রথম অসামরিক হাসপাতালটি গড়ে ওঠে চিৎপুর রোডের ফৌজদারি হাউসে। ১৮১৪ সালে পার্ক স্ট্রিটে গড়ে ওঠে প্রথম প্রসূতি চিকিৎসালয়। এটি** 'Calcutta Lying-in Hospital' নামে পরিচিত ছিল।

১৮২২ সালে মাত্র ২০ জন কলকাতায় একটি মেডিক্যাল স্কুল চালু হয়। একে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজের আদিরূপ বলে মনে করা হয়। ভারতীয় পণ্ডিতদের ওপর দায়িত্ব বর্তায় পাশ্চাত্যের চিকিৎসা শাস্ত্রকে ভারতীয় ভাষায় অনুবাদ করার। *The London Pharmacopoeia ভারতীয় ভাষায় অনুদিত হয়।* মেডিক্যাল ক্লাসও স্থানীয় ভাষায় নেবার উদ্যোগ নেওয়া হয়। যে কারনে সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত এবং কলকাতা মাদ্রাসাতে উর্দু ভাষায় মেডিক্যাল ক্লাস শুরু হয়। শিক্ষণের সময়কাল তিন বছর ছিল। শরীরবৃত্ত,অ্যানাটমি, ফার্মাসি এবং মেটেরিয়া মেডিকা পড়তে হত প্রথম (জুনিয়র ক্লাস) বছর এবং বাকি দু'বছর মেডিসিন এবং সার্জারি (সিনিয়র ক্লাস)। ক্লিনিকাল প্রশিক্ষণের জন্য শিক্ষার্থীদের নেটিভ হাসপাতাল, জেনারেল হাসপাতাল, কোম্পানির ডিসপেনসারি, চোখের ইনফার্মেরি এবং টিকা অধিদপ্তরে হাতেকলমে কাজ শিখতে হত। শিক্ষার্থীদের চরক সংহিতা, সুশ্রুত সংহিতা এবং আরবি-ফারসি চিকিৎসাশাস্ত্রও অধ্যায়ন করতে হয়।

শিক্ষার্থীদের ব্যাপক আগ্রহ সরকারকে একটি ছোট হাসপাতাল চালু করতে উৎসাহিত করে তোলে। ১৮৩১ সালের আগস্টে সংস্কৃত কলেজের শিক্ষার্থীরাও একই অনুরোধ করে। তৈরি হয় হাসপাতাল। ১৮৩৩ সালের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুযায়ী হাসপাতাল 30 টি শয্যা ছিল আট মাসের মধ্যে ১৫৮ জন রুগীর চিকিৎসা করা হয়। তৎকালীন গভর্নর জেনারেল লর্ড উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক ভারতবর্ষের স্বাস্থ্য অবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করার জন্য একটি কমিটি নিযুক্ত করেন। এর আরো উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের মেডিক্যাল এডুকেশন সংক্রান্ত রিপোর্ট সংগ্রহ। কমিটির সদস্যরা সর্বসম্মতিক্রমে ভারতীয়দের জন্য একটি মেডিকেল কলেজ গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।তবে শিক্ষার ভাষা বা মাধ্যম নিয়ে বিভক্ত ছিল কমিটির সদস্যরা। হিন্দু কলেজের কাছে একটি

পুরাতন বাড়ি *'নিউ মেডিকেল কলেজ* হিসাবে গড়ে তোলা হয়। পঞ্চাশজন যুবককে ভর্তি করা হয়েছিল চার বছরের কোর্সে প্রতিমাসে 7 থেকে 12 টাকা উপবৃত্তিতে। চূড়ান্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ শিক্ষার্থীরা অনুশীলন করতে পারত মেডিসিন এবং সার্জারি। দেশীয় চিকিৎসকগণ প্রথম বেতন পেতেন প্রতি মাসে 30 টাকা।

প্রাথমিকভাবে কলেজটিতে লাইব্রেরি, ল্যাব, যন্ত্রপাতি ছিল না। দুটি কঙ্কাল কেনা হয় এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতি ইংল্যান্ড থেকে আমদানি করা হয়। প্রথমদিকে চিত্রের মাধ্যমে ভেড়ার মস্তিষ্ক এবং ছাগলের লিভারের মডেল নিয়ে অ্যানাটমি শেখানো হত। এর ঠিক ৬ মাস পরে মানুষের মৃতদেহ নিয়ে ছাত্রদের আন্যাটমি শেখানো হত। ১৮৩৬ সালের ১০ই জানুয়ারি পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্ত এবং চার তরুণ শিক্ষার্থী গোপনে ড.গুডেভের পিছু পিছু চলে গেল কলেজের বিল্ডিংয়ের বাইরে এবং গোপনে পর্যবেক্ষোন করত মৃতদেহ ব্যবচ্ছেদ করতে। ১৮৩৮ সালে এক বক্তৃতায় ড.গুডেভ মন্তব্য করেছিলেন যে তাঁর ছাত্ররা ৫০০ টিরও বেশি মৃতদেহ বিচ্ছিন্ন করেছিল।1839 সালে, 70 ইউরোপীয়ান এবং ভারতীয়দের ওয়ার্ডে এবং দিনে 200 জন রোগী আউট ডোরে চিকিৎসা করা হত।এই ছোট সাফল্য সরকারকে আরও বৃহত্তর হাসপাতাল নির্মাণে উৎসাহিত করেছিল। এগারো-জন শিক্ষার্থী প্রথম পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিল ১৮৩৮ সালের নভেম্বরে। শীর্ষ চার ছাত্রকে মাসিক ১০০ টাকা বেতনে উপ-সহকারী সার্জন নিয়োগ করা হয়। ১৮৪০ সালে মহিলাদের জন্য 100 শয্যা বিশিষ্ট একটি হাসপাতাল নির্মিত হয়েছিল কলেজ ক্যাম্পাসের মধ্যে। ১৮৪৫ সালে প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুরের উদ্যোগে চারজন ছাত্রকে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিলেতে পাঠানো হয়।

১৮৫২ সালের ১লা ডিসেম্বর আনুষ্ঠানিকভাবে হাসপাতাল রোগীদের জন্য খোলা হয়েছিল, তবে প্রকৃতপক্ষে তিন মাস পরে পাকাপাকিভাবে চিকিৎসাকার্য শুরু হয়। কলেজের ইতিহাসকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। 1852 থেকে পরবর্তী শতাব্দীর শুরু পর্যন্ত, তারপর থেকে ১৯৪৭ পর্যন্ত এবং স্বাধীনতার পর থেকে আজ পর্যন্ত।

- Calcutta Medical College was established in 1835
- Its history goes back further. It was in June 1822 that the School of Native Doctors was established in Bengal
- In 1833, Lord Bentinck appointed a committee to report on the quality of education being imparted in these medical institutions
- In February 1835 twenty students were selected through a preliminary examination of about one hundred students.
- Mutty Lall Seal donated a plot of land on which the buildings of the new Medical College were built.
- Madhusudan Gupta is often given the credit of being the first person in modern India to have dissected a human body. But many accounts state that Umacharan Set, Rajkrishna De, Dwarakanath Gupta and Nabin Chandra Mitra comprised the first batch of students to take part in dissection.
- Kadambini Ganguly, a Bengali Brahmo became the first woman admitted to the CMC[Calcutta Medical College]

Guindy Engineering College

আজ থেকে ২২৫ বছর আগে, করোমন্ডল উপকূল জরিপে জনবলের অভাবের কথা মাথায় রেখে মাদ্রাজ জরিপ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এটি বর্তমানে গিন্ডি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নামে পরিচিত। ১৭৯৪ সালের মে মাসে ফোর্ট সেন্ট জর্জ এর নিকটে একটি ভবনে আটজন শিক্ষার্থীকে নিয়ে একটি স্কুল অফ সার্ভে হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।এটি ইউরোপের বাইরে প্রতিষ্ঠিত প্রাচীনতম প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠান। এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন মাইকেল টপ্পিং। ইতিপূর্বে, শীর্ষস্থানীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানী উইলিয়াম পেট্রিকে তাঁর সরঞ্জাম সরকারকে উপহার দেওয়ার জন্য প্ররোচিত করেছিলেন এবং নুনাম্বাক্কামে প্রথম আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞান পর্যবেক্ষণ স্থাপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে ১৭৯২ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল এবং টপিংকে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির জ্যোতির্বিদ হিসাবে নিয়োগ করা হয়েছিল। ১৮৫৮ সালে এই স্কুলটি চিপকের 'কালাসা মহল' ভবনে স্থানান্তরিত হয়। উদ্দেশ্য ছিল উচ্চ ও নিম্ন অধীনস্থদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। কলেজটি ১৮৬২ সালে মাদ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুমোদিত হয়। ভারতের প্রথম মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক প্রকৌশল, টেলিযোগাযোগ, হাইওয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রিন্টিং প্রযুক্তিতে ডিগ্রি প্রদানকারী ইনস্টিটিউটগুলির মধ্যে এটি অন্যতম।

সেই প্রথম দিকে এর বিশেষত্ব সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং। ১৮৬৪ সালে শিক্ষার্থীদের প্রথম ব্যাচ ডিগ্রি লাভ করে। ১৯০২ সালে কলেজটি গিন্ডির ১৮৫ একর ক্যাম্পাসে বিস্তৃত হয়। ১৯২৫ সালে, রাও বাহাদুর জি. নাগরথিনাম আইয়ার কলেজের প্রথম ভারতীয় অধ্যক্ষ হন। সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং দিয়ে যাত্রা শুরু হলেও পরবর্তীকালে অন্যান্য বিভাগও চালু হয়।

Mechanical Engineering:	1894
Electrical Engineering:	1930
Telecommunication and High ways:	1945
Printing Technology:	1982

গবেষণা কার্যক্রম ১৯৩৩ সালে চালু হয়েছিল। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় সেচ মন্ত্রী ডঃ কে এল এল রাও প্রথম এম.এস.সি. ডিগ্রি অর্জন করেছিলেন। মিস লীলা জর্জ এবং মিস এ. ললিথা ছিলেন গিন্ডির প্রথম দুই মহিলা ইঞ্জিনিয়ার (১৯৪০)। ১৯৪৬ সালে প্রথম পিএইচডি ডিগ্রি লাভ করেন অধ্যাপক কে.সুকুমারান । ১৯৪৭ সালে আরও দুটি কলেজ চালু হয়েছিল, একটি অনন্তপুরে এবং অন্যটি বিশাখাপত্তনমে। পরিকাঠামোগত সুবিধার্থে কলেজদুটি গিন্ডির অধীনে ছিল কিছু সময়ের জন্য । ১৯৫৭সালে কলেজের জন্য শিক্ষার্থীদের আসন সংখ্যা ১৭৫ থেকে বাড়িয়ে ২৭৫ করা হয়। প্রাক পেশাদার কোর্স চালু করা হয়েছিল এবং প্রবেশ স্তরটি ছিল সদ্য শুরু হওয়া প্রাক-বিশ্ববিদ্যালয় কোর্স। এটি পরবর্তীতে 5 বছরের সমন্বিত কোর্সে পরিবর্তন করা হয়। ১৯৭৮ সালে, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, গিন্ডি একটি সমবায়ী কলেজ [constituent] এবং আন্না বিশ্ববিদ্যালয়ে অন্তর্ভূক্ত হয়। একাডেমিক শ্রেষ্ঠত্বের এই প্রতিষ্ঠানের দ্বিবার্ষিকীর স্মরণে ভারতীয় ডাক বিভাগ ১৯৯৪ সালে কলেজের ছবিসহ ডাকটিকিট প্রকাশ করে।

Notable Alumni

- C. Muthiah, Indian industrialist and Former President, Board of Control for Cricket in India
- Akkineni Nagarjuna, Film Actor
- Bhargav Sri Prakash, Former National Tennis Champion, Inventor of the Digital Vaccine, Founder & CEO of FriendsLearn
- Dhiraj Rajaram, Founder & Chairman of Mu Sigma Inc
- Gopalaswami Parthasarathy, Former Indian High Commissioner to Pakistan, Australia and Myanmar and Chancellor, Central University of Jammu
- Kanuri Lakshmana Rao, Architect of India's water management, Former Union Minister of Irrigation & Power and recipient of the Padma Bhushan
- Krishnamachari Srikkanth, Former Indian Cricket Captain and Former Chairman, National Selection Committee of the Indian Cricket Team
- R. K. Baliga, the father of the Electronics City in Bangalore, India
- Rangaswamy Narasimhan, cognitive scientist who developed TIFRAC, the first indigenous Indian computer, Padma Shri winner
- Verghese Kurien, architect of Operation Flood and India's White Revolution and recipient of the Padma Vibhushan, Ramon Magsaysay Award and the World Food Prize

Thomason College (Roorkee)

উত্তরাখণ্ডের শিবালিক পাহাড়ের ছায়ায় ভারতের প্রাচীনতম ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ অবস্থিত। রুরকিতে একটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ প্রতিষ্ঠার জন্য উত্তর পশ্চিম প্রদেশের লেফটেন্যান্ট-গভর্নর মাননীয় জেমস থমাসনকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছিল। ইতিপূর্বে ১৮৩৭-৩৮ সালে আগ্রা দুর্ভিক্ষের পরে ৮০০,০০০ মানুষ ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছিল এবং ত্রাণের জন্য দশ কোটি টাকা ব্যয় করা হয়েছিল। ব্রিটিশ সরকার জল সরবরাহের জন্যে গঙ্গা-যমুনা দোয়াবে খাল বা ক্যানাল খননের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে। শীঘ্রই ৫০০ কিমি দীর্ঘ ক্যনাল খনন করে সম্ভাব্য খরার হাত থেকে রক্ষা পেতে। এই খনন কার্যের প্রধান ইঞ্জিনিয়ার হিসাবে নিযুক্ত হন স্যার জন থমাসন। ভারতের ভাষা, কর্মপদ্ধতি সম্পর্কে জ্ঞানার্জন এবং প্রকল্প বাস্তবায়নে ভারতীয় শ্রমিক, কর্মিদের প্রশিক্ষনের জন্য অবিলম্বে একটি প্রশিক্ষণকেন্দ্র তৈরির প্রয়োজনীতা উপলব্ধ হয়। তারপর বাকিটা ইতিহাস।

স্বাধীনতার ঠিক ১০০ বছর আগে ১৮৪৭ খ্রিস্টাব্দে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের প্রথম প্রকৌশল কলেজ হিসাবে রুরকিতে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। পরবর্তীকালে কলেজটির নাম পরিবর্তন করে *থমাসন কলেজ অফ সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং* হিসাবে নামকরণ করা হয়। লেফেট্যান্ট আর. ম্যাক্লাগন মাত্র ২৭ বছর বয়সে এই কলেজের প্রিন্সিপ্যাল হিসাবে নিযুক্ত হন। ১লা জানুয়ারি ১৮৪৮ সালে প্রথম ছাত্র ব্যাচটি ভর্তি হয়। বর্তমান ক্যাম্পাসটি ৩৬৫ একর জমির ওপর। কিন্তু শুরুতে এর কোন শ্রেণীকক্ষ ছিলনা, তাই তাঁবুতে ক্লাস হত। রায় বাহাদুর কানাইয়া লাল প্রথম ভারতীয় হিসাবে এই কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন।

প্রতিষ্ঠার পর থেকে রুরকি বিশ্ববিদ্যালয় দেশের প্রযুক্তিগত জনশক্তি এবং জ্ঞান-সরবরাহ এবং গবেষণায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। ১৯৪৮ সালে তৎকালীন ইউনাইটেড প্রদেশে (উত্তর প্রদেশ) Act No. IX দ্বারা কলেজটি বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা লাভ করে। উদ্দেশ্য ছিল স্বাধীনোত্তর ভারতের প্রকৌশলী শিক্ষার প্রয়োজন মেটানোর জন্যে। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহরু ১৯৪৯ সালের নভেম্বরে এই কলেজটিকে স্বাধীন ভারতের প্রথম প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করেন। বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের সেরা প্রযুক্তিগত প্রতিষ্ঠানের মধ্যে স্থান পেয়েছে এবং প্রযুক্তিগত বিকাশের সকল ক্ষেত্রে অবদান রেখেছে। এটি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং প্রকৌশল ক্ষেত্রে শিক্ষা এবং গবেষণায় পথপ্রদর্শক রূপে কাজ করে আসছে। ১৯৯৬ সালের অক্টোবরে বিশ্ববিদ্যালয়টি এক বা অন্য রূপে তার অস্তিত্বের দেড়শতম বছরে প্রবেশ করেছিল।

২১ শে সেপ্টেম্বর ২০০১-এ, সংসদে একটি বিল পাসের মাধ্যমে, বিশ্ববিদ্যালয়টিকে রুরকি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ভারতীয় প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট-এ [IIT, Rookee] রূপান্তরিত করে একটি জাতীয় প্রতিষ্ঠান হিসাবে ঘোষণা করা হয়। এই ইনস্টিটিউটের ইতিহাসে ইতিমধ্যে চকচকে মুকুটে আরও একটি রত্ন যুক্ত করা হয়েছিল। এখানে ইঞ্জিনিয়ারিং এবং আর্কিটেকচারের ১০টি শাখায় স্নাতক ডিগ্রি কোর্সে পড়বার সুযোগ আছে। ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত বিজ্ঞান [Applied Science], আর্কিটেকচার প্রভৃতি ৫৫টি স্নাতকোত্তর ডিগ্রি কোর্স আছে। ইনস্টিটিউটের সমস্ত বিভাগ এবং গবেষণা কেন্দ্রগুলিতে ডক্টরাল কাজের সুযোগ রয়েছে।

- IIT Roorkee was the **country's first engineering college** established in 1847 for the civil engineers training.
- Most of the dams and canals, roads and highways railway bridges 0f 1850's period have been the outcome of Roorkee.
- It got renamed as Thomason college of engg (1854), Roorkee University (1948) and finally as IIT(2001). No other IIT or IISc has the architectural heritage as that of IIT Roorkee.
- Roorkee University also became the first institution in the country to offer postgraduate programs in engineering and technology in 1955.
- The Mahatma Gandhi Central Library [IIT Roorkee] finds a unique place in the academic spectrum of the institute. Started in 1848 with a few hundred donated books, its collection has grown to more than 3, 50,000 documents in all media. The library contains rare manuscripts including a 1623 edition of William Shakespeare's complete works.
- Nilmani Mitra [19th century architect, designer of several palaces in Kolkata], John Underwood Bateman-Champain [British army officer and engineer in India, instrumental in laying the first electric telegraph line from Britain to India by way of the Persian Gulf], Sir Ganga Ram [a leading philanthropist and agriculturist. A civil engineer by profession and a graduate of the 1873 batch, Sir Ganga Ram supervised the construction of several prominent structures in Punjab. Referred to as

'Father of modern Lahore'], Nilmani Mitra [19th century architect, designer of several palaces in Kolkata] were notable alumni.

Bengal Engineering College

এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি পথ চলা শুরু করে ১৮৫৬ সালে। এটি দেশের দ্বিতীয় প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।প্রতিষ্ঠানের আদিনাম বিশপস কলেজ। মাত্র দশ জন ছাত্র ও সামান্য কয়েকজন শিক্ষাকর্মী নিয়ে এই কলেজটি ১৮৫৬ সালের ২৪ নভেম্বর ক্যালকাটা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ নাম নিয়ে যাত্রা শুরু করে । কলেজের অফিসিয়াল সমস্ত কাজ হত রাইটার্স বিল্ডিং-এ। ১৮৬৪ সালে প্রথম স্নাতক স্তরে সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পরীক্ষা হয় এবং এতে ২ জন ছাত্র গ্র্যাজুয়েট হন। ১৮৮০ সালে প্রতিষ্ঠানটিকে শিবপুরের বর্তমান ক্যাম্পাসে সরিয়ে আনা হয়। ১৮৮০ সালে কলেজটি হাওড়ার বিশপস কলেজের বিশাল ক্যাম্পাসে স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত হয়। ১৯২০ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি পুনরায় নাম পরিবর্তন করে এই কলেজের নাম বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (বি. ই. কলেজ, শিবপুর) রাখা হয়। শিবপুর শব্দটি অবশ্য ১৯২১ সালের ২৪ মার্চ মুছে ফেলা হয়।১৯২০ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি কলেজটির নাম পাল্টে করা হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, শিবপুর। ১৯২১ সালের ২৪ মার্চ নাম থেকে শিবপুর শব্দটি বাদ দেওয়া হয়। প্রতিষ্ঠানটির নাম হয় বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ।

১৮৫৭ থেকে ১৯৯২ সাল পর্যন্ত এটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদিত কলেজ ছিল। জাতির প্রতি এই প্রতিষ্ঠানের অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ১৯৯২ সালে এই কলেজটিকে ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা দেওয়া হয়। ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. শঙ্করদয়াল শর্মা ১৯৯৩ সালের ১৩ই মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে এই ডিমড বিশ্ববিদ্যালয়টি উদ্বোধন করেন। ২০04 সালের ১লা অক্টোবর ডিমড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি পূর্ণাঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মর্যাদা পায়। ২০০৫ সালের ১৩ই জুলাই ভারতের তৎকালীন রাষ্ট্রপতি ড. এ পি জে আব্দুল কালাম আনুষ্ঠানিকভাবে *বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড সায়েন্স ইউনিভার্সিটি,* শিবপুর (বেসু)-র আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। ২০১4 সালের মার্চে, একে কেন্দ্রীয় সরকার জাতীয় গুরুত্বের প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। প্রতিষ্ঠানটিকে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স ও টেকনোলজির অধীনে নিয়ে আসা হয়। এর নাম হয় আইআইইএসটি [Indian Institute of Engineering Science and Technology], শিবপুর। ২০১4 সালের জুন মাসে আইআইইএসটি, শিবপুরকে আইআইআইটি **[Indian Institute of Information Technology, Kalyani]** কল্যাণীর মেন্টর প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচিত করা হয়।

- After the independence of India in 1947, the Department of Architecture, Town and Regional Planning was started on the recommendation of a committee appointed by Government of West Bengal.
- The famous ISM Dhanbad, owes it existence in part, to The Mining Engineering Dept here
- The Department of Architecture is the first to offer a Degree in Architecture and Diploma in Town Planning in India.
- The Metallurgy Dept here is the second oldest the country.

- The 125th Anniversary of the college was celebrated on 11 December 1981, with inauguration by Sri N. Sanjiva Reddy, the then President of India.
- That is Bengal Engineering and Science University, Shibpur (**BESU**) has become the first IIEST of the country with effect from 4 March 2014.
- Alumnus Budhadeb Dasgupta is a Padma Bhusan Receipient (amazing)
- Alumnus Badal Sarkar is a Padma Shree award

১১.৪.৯.৪. বিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষার ইতিহাস

আশির দশকের গোড়া থেকে, দ্রুত শিল্পায়ন এবং অর্থনৈতিক বৃদ্ধি, প্রকৌশল ও প্রযুক্তিগত কারণে ভারতে শিক্ষা বিশ্বের যে কোনও জায়গার চেয়ে দ্রুত বিকাশ লাভ করেছে, এবং ভারতের এখন প্রকৌশল শিক্ষার্থী বা ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ুয়ার নিরিখে দ্বিতীয় স্থান রয়েছে বিশ্বের বৃহত্তম সংখ্যক। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের প্রাথমিক নীতিটি হল উন্নয়নশীল অর্থনীতির জন্য প্রয়োজনীয় প্রকৌশলীদের সরবরাহ করা। Indian Institutes of Technology, the Regional Engineering colleges (এবং তাদের পরবর্তী জাতীয় প্রতিষ্ঠানে রূপান্তর প্রযুক্তি) এটি অর্জনে লক্ষ্যযুক্ত হয়েছিল। ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং 10 + 2 তে উজ্জ্বল শিক্ষার্থীদের জন্য পছন্দসই বিকল্প স্তর। এর ফলে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি প্রাথমিকভাবে বেসরকারী খাতে বেড়েছে। এই সত্ত্বেও, শিল্পপতিরা তাদের শিল্পের জন্য মানের প্রকৌশলীগুলির অনুপস্থিতি সম্পর্কে অভিযোগ করেন। এর সাথে তাৎপর্যপূর্নভাবে স্নাতক ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যে বেকারত্বের হার বেড়েই চলেছে। একটি আন্তর্জাতিক তুলনা দেখায় যে বেশিরভাগ ভারতীয় প্রতিষ্ঠানের নেই স্নাতক-স্নাতকোত্তর স্তরে থেকে শিক্ষাদান এবং গবেষণা করাবার পরিকাঠামো।

ভারতে ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষা ব্রিটিশ আমলে শুরু হয়েছিল এবং প্রধানত সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের দিকে মনোনিবেশ করেছিল। একজন ভারতের ইঞ্জিনিয়ারিং শিক্ষার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস রাও কমিটির রিপোর্টে এবং মন্ত্রনালয়ে পাওয়া যায় মানব সম্পদ বিকাশ ওয়েবসাইট । ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ গিন্ডি, মাদ্রাজ (জরিপ হিসাবে শুরু হয়েছিল স্কুল 17৯৪), রুরকি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ(১৮৭৪)পুনাতে পুনা সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (১৮৫৪), শিবপুরের ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (1856), বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় (১৯১৬), বিশ্বেশ্বরয়ইয়া ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ (1917) এবং হারকোর্ট বাটলার টেকনোলজিক ইনস্টিটিউট, কানপুর (1920)।

১৯৪৫ সালে ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির আদলে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার [The **Interim Government of India**, also known as the **Provisional Government**, formed in 2 September 1946 from the newly elected Constituent Assembly of India, had the task of assisting the transition of British India to independence] উচ্চতর প্রযুক্তি ইনস্টিটিউট স্থাপনের সুপারিশ করেছিল ভারতের চারটি অঞ্চলে । এর ফলে পাঁচটি প্রতিষ্ঠান স্থাপন করা হয়েছিল খড়গপুর (১৯৫০), বোম্বাই (১৯৫৮), কানপুর (১৯৫৯), মাদ্রাজ (১৯৬০) এবং দিল্লিতে (1961)। *টেকনিক্যাল এডুকেশন ফর অল ইন্ডিয়া কাউন্সিল* 1945 সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এর মূখ্য কাজ ছিল দেশের সমস্ত কারিগরি শিক্ষার (ডিপ্লোমা, ডিগ্রি এবং স্নাতকোত্তর) তত্ত্বাবধান করা।

Time Line of Indian Engineering Education

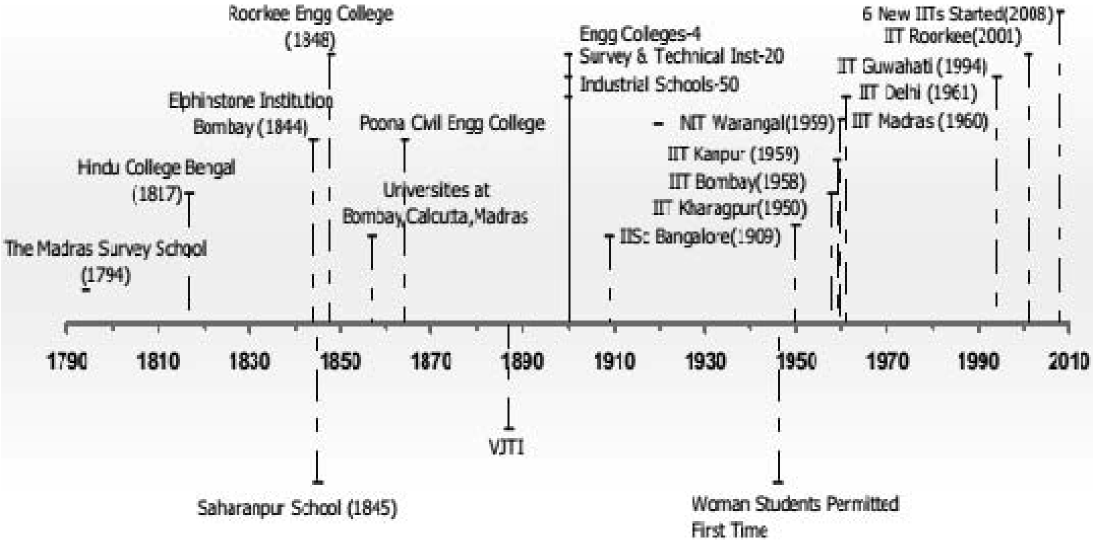

ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এবং শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তিগত *আউটপুট* উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। নামীদামী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির অনেকগুলি (আইআইটি এবং এনআইটি) তাদের ভর্তি প্রক্রিয়ায় অত্যন্ত নির্বাচনী । এই কারনে উপলব্ধ আসনের জন্যে আবেদনকারীর মাত্র 1-2% সুযোগ পায়। সরকারীর পাশাপাশি প্রচুর বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ স্থাপন করা হয়েছে। কেন্দ্রীয় শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের (Central Advisory Board of Education/CABE) অধীনে বেশ কয়েকটি সংস্থার দ্বারা শিক্ষানীতি প্রণয়ন করা হয়। ইঞ্জিনিয়ারিং এবং অন্যান্য প্রযুক্তিগত শাখায় কেন্দ্রীয় নীতিনির্ধারণী এবং নিয়ন্ত্রক সংস্থা হল অল *ইন্ডিয়া টেকনিক্যাল এডুকেশন কাউন্সিল* (AICTE)। এআইসিটিই নতুন বিশ্ববিদ্যালয় এবং অধ্যয়নের প্রোগ্রামগুলির প্রয়োজনীয়তা নির্ধারণ করে এবং পাঠ্যক্রমের মান এবং নিয়মের রূপরেখা দেয়। তারপর জাতীয় স্বীকৃতি বোর্ডের (National Board of Accreditation/NBA) মাধ্যমে কর্মসূচীর অনুমোদন দেওয়া হয়।

ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে স্নাতক ডিগ্রির সংখ্যা (বি.টেক, বি.ই.) ১৯৪৭ সাল থেকে বেড়ে 2006 সালে ২৩.৩৭ লক্ষে বেড়ে দাঁড়ায়। যৌগিক বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার ১২%।

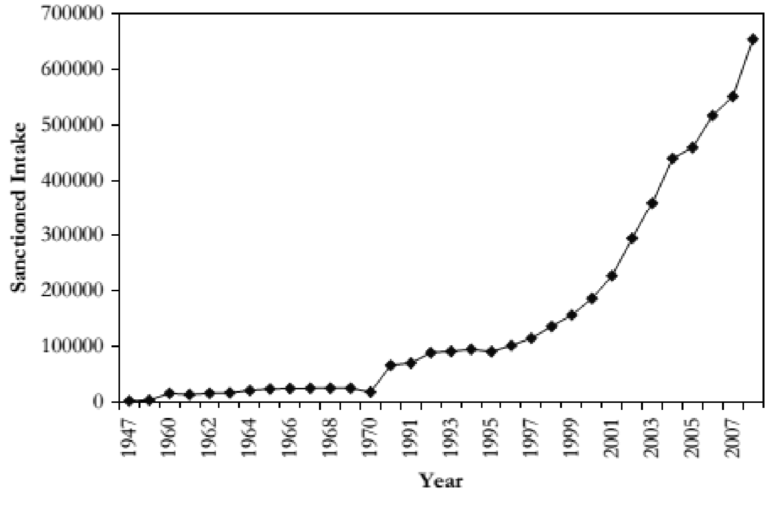

ভারতে প্রায় 1500 engineering কলেজ এবং 67,000 faculties রয়েছে। ২০০৮ সালের হিসাব অনুযায়ী ভারতে 3.5 লাখ ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতক এবং 23000 ইঞ্জিনিয়ারিং স্নাতকোত্তর ডিগ্রি দেওয়া হয়েছিল। ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রির জন্য ভারতের বৃদ্ধি হার অন্যান্য দেশের তুলনায় বেশি। চীন *পিএইচডি* ডিগ্রি জন্য উচ্চ বৃদ্ধি হারে সবথেকে এগিয়ে। ভারতের ডক্টরেট ডিগ্রি মোট স্নাতক ডিগ্রির 1% এরও কম। এই পরিসংখ্যান অন্যান্য সমস্ত দেশের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যভাবে বেশি।

INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY

ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি (আইআইটি) নামে পরিচিত আন্তর্জাতিক খ্যাতিযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারিং প্রতিষ্ঠানগুলি পঞ্চাশের দশকের গোড়ার দিকে বিজ্ঞান এবং প্রকৌশল শিক্ষায় শ্রেষ্ঠত্ব প্রদানের দৃষ্টি দিয়ে তৈরি করা হয়েছিল। আইআইটিগুলি সর্বোচ্চ মানের প্রযুক্তি এবং ইঞ্জিনিয়ারিং প্রোগ্রাম বিশেষত স্নাতক স্তরের জন্য বিখ্যাত।

পাঁচটি মূল আইআইটি 1950 এবং 1961 (খড়্গপুর- 1950; বোম্বাই-1958; মাদ্রাজ-1959; কানপুর-1960; দিল্লি- 1961) এর মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরুর দৃঢ় সমর্থন নিয়ে, আইআইটি নেটওয়ার্ক দেশের ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাহিদা পূরণের জন্য প্রয়োজনীয় বহু সিভিল এবং মেকানিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করতে একটি উচ্চ শিক্ষিত কর্মশক্তি তৈরি করে ভারতকে আধুনিকীকরণে সহায়তা করার উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করে। এই পাঁচটি আইআইটি কেবল এটি সম্পাদন করতে সহায়তা করে নি, তারা এই প্রক্রিয়াতে নিজেদের একটি বৈশ্বিক খ্যাতিও গড়ে তুলেছিল যা এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীদের বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে থাকা নামী সংস্থাগুলিতে উচ্চ-প্রোফাইল এবং অসাধারণভাবে ভাল-বেতনভোগী উচ্চ-পদে প্রতিষ্ঠিত করতে সাহায্যও করেছে। গ্লোবাল ব্র্যান্ডের সাফল্যের ভিত্তিতে আইআইটি গুয়াহাটি ১৯৯৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং ২০০২ সালে আইআইটি রুরকি রুরকি বিশ্ববিদ্যালয়কে উন্নীত করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ২০০০ সালে এশিয়া সপ্তাহে [Asia week] এশিয়ার সেরা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানের একটি র‍্যাঙ্কিংয়ে, মূল পাঁচটি আইআইটি মহাদেশের শীর্ষ আট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ছিল।

NATIONAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY

২০০২ সালে রুরকি বিশ্ববিদ্যালয়কে আইআইটিতে উন্নীত করার পাশাপাশি, ভারত সরকার তার আঞ্চলিক প্রকৌশল [Engineering]কলেজগুলিকে (Regional Engineering Colleges/REC) সারা দেশে বুনিয়াদী এবং উন্নয়নের কেন্দ্র হিসাবে রূপান্তর করেছে উচ্চতর স্তরে গবেষণা এবং প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রাসারের স্বার্থে। নতুন মনোনীত *ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি* (এনআইটি), যার মধ্যে বর্তমানে ২০ জন রয়েছে, পাঠ্যক্রম ও প্রশাসনের উপর একই স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করে আইআইটি, এবং প্রতিষ্ঠানগুলি *"ডিমড-টু-বি-ইউনিভার্সিটি"*, তাদের নিজস্ব ডিগ্রি প্রদান করে।

REC-র 50% আসন উক্ত রাজ্যের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য নির্ধারিত হয়, বাকি 50% অন্যান্য রাজ্যের জন্য বরাদ্দ। তবে REC - তে কোন শিক্ষার্থী ভর্তি হবে তা নির্ধারণ করার জন্য প্রতিটি রাজ্যের নিজস্ব নির্বাচনের মানদণ্ড রয়েছে। আঞ্চলিক উন্নয়নের প্রচারের প্রয়াসে সরকারের লক্ষ্য দেশের প্রতিটি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে একটি এনআইটি প্রতিষ্ঠা করা। আরইসিগুলিকে রাজ্য সরকার এবং কেন্দ্রীয় সরকার যৌথভাবে অর্থায়ন করে, এনআইটি তহবিল বাড়িয়েছে এবং কেন্দ্রীয় সরকার একচেটিয়াভাবে সরবরাহ করেছে।

Private Engineering Colleges

Engineering স্নাতকদের প্রায় 75% বেসরকারী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলিতে পড়ানো হয়। এখানে 1100 টিরও বেশি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ রয়েছে। তবে শীর্ষ পঞ্চাশটি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির একটি র‍্যাঙ্কিং কেবলমাত্র বেসরকারী কলেজগুলির একটি সামান্য শতাংশ প্রকাশ করে। প্রাইভেট ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলির 90% এরও বেশি অনুমোদিত অনুমোদিত কলেজগুলি যাদের সামান্য একাডেমিক স্বায়ত্তশাসন রয়েছে।

বেসরকারী কলেজগুলির বিদ্যমান প্রশাসনিক কাঠামো এবং প্রকৃতির ফলে খুব অল্প আর্থিক স্বায়ত্তশাসন ঘটে। উন্মুক্ত আসনের জন্য বেতনক্রম AICTE রীতি নীতি এবং কলেজের ব্যালেন্সশিটের একটি মূল্যায়নের ভিত্তিতে নিয়ন্ত্রিত হয়। মাত্র কয়েকটি বেসরকারি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে সক্ষম হয়েছে।

শীর্ষস্থানীয় ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল হিসাবে খ্যাতি অর্জন করা সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানগুলি হলঃ

- Birla Institute of Technology and Science (BITS), Pilani & Mesra (which also has campuses in Goa and Dubai)
- Thapar Institute of Engineering & Technology, Patiala
- Jadavpur University, Kolkata
- Netaji Subhas Institute of Technology (DIT), New Delhi
- The Indian Institutes of Information Technology in Hyderabad, Bangalore and Allahabad
- Punjab Engineering College
- Delhi College of Engineering
- The Banaras Hindu University Institute of Technology
- Aligarh Muslim University
- Thapar University, Patiala
- Manipal Institute of Technology, Manipal
- Dhirubai Ambani Institute of Information and Communication Technology.

Indian Institute of Science, Bangalore; the Tata Institute of Fundamental Research, Mumbai; and the Institute of Mathematical Sciences, Chennai, প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান বিশ্ব-মানের খ্যাতি উপভোগ করে। বিশ্ববিদ্যালয় ব্যবস্থার বাইরে ৩৮ টি গবেষণা প্রতিষ্ঠান *Council of Scientific and Industrial Research* [CSIR] তত্ত্বাবধানে মৌলিক গবেষণার কাজ করে। এর মধ্যে অনেক বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টরাল কাজের কেন্দ্র হিসাবে স্বীকৃত। বেশিরভাগ সফল বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে বিশ্ববিদ্যালয় হিসাবে *Deemed university status* মর্যাদা দেওয়া হয়েছে।

১১.৪.১০.৫. বিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু নজির (Some case studies of Technical Education in the 20th Century)

The Bengal Technical Institute ভারতের পূর্ব অঞ্চল রাজ্যগুলির অন্যতম পশ্চিমবঙ্গে জনসাধারণের মধ্যে প্রযুক্তিগত শিক্ষার বিস্তারের লক্ষ্যে STPE-র ছত্রছায়ায় ১৯০৬ সালের ২৫ জুলাই প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে, ১৯১০

সালের মধ্যে দুটি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিষ্ঠানটির একীকরণ হয়েছিল। দক্ষিণ কলকাতার যাদবপুরে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষাপ্রাঙ্গনটি অবস্থিত। দ্বিতীয় শিক্ষাপ্রাঙ্গনটি রয়েছে কলকাতার পার্শ্ববর্তী বিধাননগরে। যাদবপুরবিশ্ববিদ্যালয় ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্যা কালটিভেশন অফ সায়েন্স ও সেন্ট্রাল গ্লাস অ্যান্ড সেরামিকস রিসার্চ ইনস্টিটিউট-এর মতো অগ্রণী গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃদ্ধি প্রথম থেকে আজ অবধি দেশে এবং বিদেশে শ্রেষ্ঠত্ব এর প্রধানতম এক কেন্দ্র হিসাবে অগ্রগনিত হয়ে রয়েছে।

1904 সালে বিশ্ববিদ্যালয় আইন পাশ হওয়ার পরেই সরকার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনঃগঠন করে। 1905 সালের 16ই নভেম্বর, ল্যান্ডহোল্ডার্স সোসাইটি পার্ক স্ট্রিটের এক বৈঠকে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ, রাজা সুবোধচন্দ্র মল্লিক এবং ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী সহ প্রায় 1500ডেলিগেট উপস্থিতিতে একটি জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ধারণা আলোচিত হয়। ব্রিটিশ শাসনকে চ্যালেঞ্জ করে জাতীয় আইন ও জাতীয় নিয়ন্ত্রণে জনসাধারনকে আধুনিক শিক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্য ব্রজেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরী, মহারাজা সূয কান্তো আচার্য চৌধুরী এবং রাসবিহারি ঘোষ, এবং সুবোধচন্দ্র মল্লিক প্রচুর টাকা প্রদান করে শিক্ষাঙ্গনটি গড়ে তোলেন এবং তখন এই বিশ্ববিদ্যালয়টির নাম ছিল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়। অরবিন্দ ঘোষ কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালনকরেন।

সেই সময় বিশ্ববিদ্যালয়টি স্বায়ত্তশাসিত ছিল না।

১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে **১১** ই মার্চ ৯২ জন সদস্যবিশিষ্ট 'জাতীয় শিক্ষাপরিষদ' (National Council of Education) গঠিত হয় । সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, অরবিন্দ ঘোষ প্রমুখ এর মূল কর্ণধার ছিলেন । এই সময় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বীরভূমের ভুবনডাঙ্গা-র জমিদারীতে 'শান্তিনিকেতন আশ্রম' গঠন করেন । কোনো প্রকার সরকারি সাহায্য ছাড়াই এই শিক্ষা পরিষদের অধীনে **১৯০৮** খ্রিস্টাব্দে জাতীয় শিক্ষায়তন প্রতিষ্ঠিত হয় । কয়েকটি কলেজ, ৫০০টি মাধ্যমিক স্কুল ও ৩০০টির বেশি প্রাইমারি স্কুল তৈরি হয়েছিল । এইসব শিক্ষায়তনগুলিতে বহিষ্কৃত ছাত্রদের ভর্তি ও শিক্ষাদানের ব্যবস্থা করা হয় । জাতীয় শিক্ষার আর্থিক ব্যয় নির্বাহের জন্য **রাজা সুবোধ চন্দ্র মল্লিক** এক লক্ষ টাকা, মুক্তাগাছার রাজা **সূর্যকান্ত আচার্য চৌধুরি** আড়াই লক্ষ টাকা, ময়মনসিংহের গৌরীপুরের জমিদার **ব্রজেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী** পাঁচ লক্ষ টাকা দান করেন । **রাসবিহারী ঘোষ** প্রমুখ লক্ষ লক্ষ দেশবাসীর দানে গড়ে ওঠে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ, ন্যাশনাল মেডিকেল স্কুল, বিজ্ঞান কলেজ। বিজ্ঞানী **তারকনাথ পালিত** নিজ ব্যয়ে 'বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট' গঠন করেন । এটি বর্তমানে 'যাদবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ' নামে পরিচিত । অরবিন্দ ঘোষ বরোদার মহারাজার রাজ কলেজের লোভনীয় চাকরি ছেড়ে বাংলায় এসে সামান্য ৫০০ টাকা বেতনে জাতীয় শিক্ষাপরিষদের অধ্যক্ষের পদ গ্রহণ করেন । স্বদেশি আন্দোলনের এই ব্যাপকতা ব্রিটিশ সরকারকে চিন্তিত করে তোলে । সরকার নানা প্রকার ব্যবস্থা অবলম্বন করে এই আন্দোলন বন্ধ করতে তৎপর হন । **১৯০৯** খ্রিস্টাব্দে মর্লে মিন্টো সংস্কার প্রবর্তন করে মুসলিমদের কিছু সাম্প্রদায়িক সুবিধা দিয়ে আন্দোলনকে দূর্বল করার চেষ্টা করেন । নরমপন্থী নেতৃবৃন্দ এবং মুসলিম লিগ এই সংস্কার আইন গ্রহণ করলেও চরমপন্থীরা তা প্রত্যাখ্যান করেন । বাংলার বাইরে বোম্বাই, মাদ্রাজ, পাঞ্জাবে স্বদেশি আন্দোলনের ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হয় । ভারতীয় বাজারে ব্রিটিশ পণ্যের বাজার মন্দা ডেকে আনে । শেষ পর্যন্ত স্বদেশি আন্দোলনের তীব্রতায় এবং ব্রিটিশ পুঁজিপতিদের প্রবল চাপে **১৯১১** খ্রিস্টাব্দের **১২** ডিসেম্বর ব্রিটিশ সরকার কলকাতা থেকে ভারতের রাজধানী দিল্লিতে স্থানান্তরিত করে বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহার করার সিদ্ধান্ত ঘোষণা করেন ও বাংলায় স্বদেশি আন্দোলনের অবসান হয়

বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা B.T.I –এ মূলত দুই ধরনের পাঠ্যক্রম চালু ছিল
ক] তিন বছরের অন্তর্বর্তী পাঠ্যক্রম।
খ] চার বছরের মাধ্যমিক পাঠ্যক্রম।
অন্তর্বর্তী পাঠ্যক্রমের তিনটি বিষয় ছিল- ক)যন্ত্র বিজ্ঞান ও বৈদ্যুতিক যন্ত্র বিজ্ঞান খ)ফলিত রসায়ন এবং গ)ভূ-বিদ্যা। এই পাঠ্যক্রমের প্রথমবর্ষে পদার্থবিদ্যা, গণিত, ইংরেজি ও চিত্রাঙ্কন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হতো। বেশ কিছু নামকরা শিক্ষক এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যেমন প্রমথনাথ বসু, শরৎ দত্ত, প্রফুল্ল মিত্র প্রমুখ ব্যক্তি।

সে সময় কারিগরি শিক্ষার যে কর্মবর্ধমান চাহিদা তৈরি হয়েছিল তা পূরণ করতে পেরেছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। বিটিআই প্রতিষ্ঠিত হওয়ার দুই বছর পরে অর্থাৎ **১৯০৮** সালে এর ছাত্র সংখ্যা হয় **১২৪** জন এবং **১৯১৬** সালে **১৫০** জন, **১৯২০** সালে **২৪০** জন এবং **১৯২৪** সালে তা আরও বেড়ে গিয়ে মোট ছাত্র সংখ্যা দাড়ায় **৫২০** জন। যার ফলে এই প্রতিষ্ঠানের প্রসারের প্রয়োজনীয়তাও উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।**১৯২৫** খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই প্রতিষ্ঠান থেকেগড়ে প্রায় **১০০** জন সুযোগ্য ইঞ্জিনিয়ারিং তৈরি হয়।যারা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে কারিগরি শিক্ষার বিকাশে নিয়োজিত হয়। **১৯২৮** খ্রিস্টাব্দে বিটিআই এর নতুন নাম হয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি এবং ভারত স্বাধীন হওয়ার পর **১৯৫৫** খ্রিস্টাব্দে এটি যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিতি লাভ করে।

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা বর্তমান ও প্রাক্তন শিক্ষকদের মধ্যে রয়েছেন –

- অমর্ত্য সেন (অর্থনীতিবিদ)
- বুদ্ধদেব বসু (তুলনামূলক সাহিত্যের অধ্যাপক, সাহিত্যিক)
- অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত (অধ্যাপক)
- শঙ্খ ঘোষ (অধ্যাপক, কবি, শিক্ষাবিদ)
- নবনীতা দেবসেন (অধ্যাপিকা, কবি)

Bengal National College & School

স্বদেশি ও বয়কট আন্দোলনের পটভুমিকায় **১৯০৬** সালে দেশীয় উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় জাতীয়শিক্ষা পরিষদ, যার উদ্দেশ্য ছিল বিদেশি নিয়ন্ত্রনমুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা প্রবর্তন করা। ইতিপূর্বে **১৯০২-০৫** পর্বে লর্ড কার্জন বাঙালিদের নানা ভাবে দমিয়ে রাখতে চাইছিলেন, বঙ্গভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। জারি হয়েছিল দমনমূলক কার্লাইল, লায়ন ও রিজলি সার্কুলার। ছাত্ররা রাজনৈতিক আন্দোলনে যোগ দিলেন, তিনশোর বেশি ছাত্রকে ঔপনিবেশিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহিষ্কার করা হল। প্রধান শিক্ষক কালীপ্রসন্ন দাশগুপ্ত পদচ্যুত হলেন। এই রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে মুক্ত-স্বদেশি শিক্ষালয় হিসেবে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের ভিত্তিপত্তন। এই সময় জাতীয় শিক্ষা পরিষদের নেতৃবৃন্দের মধ্যে কোন কোন শিক্ষাকে গুরুত্ব দেবে সে বিষয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। গুরুদাস ব্যানার্জি, সতীশ মুখার্জী, হীরেন দত্ত প্রমুখ যারা মনে করত জাতীয় শিক্ষা পরিষদ দেশের সব শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করবে অপরদিকে তারকনাথ পালিত নীলরতন সরকার মনিন্দ্র চন্দ্র নন্দী প্রমুখ যারা বিশ্বাস করতেন যে জাতীয় শিক্ষা পরিষদের মূল লক্ষ্য হবে কারিগরি শিক্ষার বিস্তার। প্রথম দলের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় **বেঙ্গল**

ন্যাশনাল কলেজ ও স্কুল এবং দ্বিতীয় দল ১৯০৬ খ্রীষ্টাব্দের ২৫ শে জুলাই তারকনাথ পালিতের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠা করেন **বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট বা** B.T.I .

১৯১০ সাল নাগাদ সংস্থা দুটির পার্থক্য বিদূরিত হয়। ততোদিনে তারকনাথ পালিত সোসাইটি ফর দ্য প্রমোশন অব টেকনিক্যাল এডুকেশন থেকে তাঁর পুরো অনুদান প্রত্যাহার করে তা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ‘ইউনিভার্সিটি কলেজ অব সায়েন্স’কে দান করেন। সে সময় কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। ১৯২৮ সালে বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউট জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিলের কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজির সঙ্গে একীভূত হয়। কলা ও বিজ্ঞান বিষয়ে শিক্ষাক্রম নিয়ে বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ তখনও টিকে ছিল। সে সময় থেকেই কলেজ দুটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটতে থাকে এবং নামকরা শিক্ষকদের অধীনে বহুসংখ্যক ছাত্র এখানে শিক্ষালাভ করতে থাকে।*বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন* -অরবিন্দ ঘোষ।

১৯১৭ সালে নানা বাধায় শেষ পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যায় সতীশচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দের বেঙ্গল ন্যাশনাল কলেজ। বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটটি অবশ্য ছিল এবং ভারতবর্ষে প্রথম কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ চালু হয় এখানেই। এই প্রতিষ্ঠানই পরে নাম বদলে হয় কলেজ অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এবং পরে এই কলেজ পরিদর্শন করে তাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে উন্নীত করার সুপারিশ করেন সর্বেপল্লি রাধাকৃষ্ণন। শেষ পর্যন্ত ১৯৫৫ সালে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় বিল পাশ হয় বিধানসভায়। ওই বছরই ২৪ ডিসেম্বর জাতীয় শিক্ষা পরিষত-এর জমিতে গড়ে ওঠে আজকের যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়। কলেজ অব ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি জাতীয় প্রকৌশল মহাবিদ্যালয়ে পরিণত হয়ে সমগ্র ভারতে এবং বিদেশে প্রকৌশলিদের ছড়িয়ে দিয়েছিল। এ কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রিধারীরা বাংলায় বহু স্বদেশী শিল্পোদ্যোগ গ্রহণ করেছিল যার কয়েকটি এখনও টিকে আছে। কলা ও বিজ্ঞান কলেজও সুখ্যাতি অর্জন করে এবং যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ভারতের একটি প্রধান বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত হয়। এ ভাবেই ১৯০৫-১৯১১ সালের উত্তাল বছরগুলিতে জাতীয় শিক্ষা কাউন্সিল যে বিকল্প শিক্ষাব্যবস্থার সন্ধান করছিল তা পূর্ণতা লাভ করে।

১১.৪.১১.৬. বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশঃ-

Survey of India

সমীক্ষার ইতিহাস মানুষের ইতিহাস এবং দেশ এবং জাতির ইতিহাসের অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি ভাবে যুক্ত। ভারতে সমীক্ষার প্রচেষ্টা বোঝার জন্য আমাদের ভূ-বৈচিত্র এবং সভ্যতা সম্পর্কে সম্যক ধারনা থাকা উচিত। সিন্ধু সভ্যতা, প্রাচীনতম এবং প্রথম বৃহত্তর সভ্যতার পরিচিত, আনুমানিক ৩৫০০ খ্রিঃপূঃ-এর আগে শুরু হয়েছিল এবং সম্পূর্ণরূপে ২৬০০-১৭০০ খ্রিঃপূঃ মধ্যে বিকশিত হয়েছিল। তারপরে আর্য সভ্যতা এসেছিল, যা সিন্ধু উপত্যকা, পাঞ্জাব অঞ্চল এবং গঙ্গা উপত্যকার পশ্চিম অঞ্চলে ১৫০০-৬০০ খ্রিঃ পূঃ সময়ে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশে তখন থেকেই অনেকগুলি রাজ্য ছিল যা সময়ে সময়ে বৃদ্ধি, একীভূত এবং বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।

- মৌর্য রাজবংশ -গুপ্ত রাজবংশ-পল্লব-সাতবাহন-শক-চালুক্য-চোল রাজবংশ-পাল-সেন
- দিল্লী সুলতান-মুঘল রাজবংশ -বিজয়নগর বাহামনি
- ইস্ট ইন্ডিয়া -১৮৫৮ সাল থেকে ব্রিটেনের রানী ক্ষমতা নিজের হাতে তুলে নেন
- ভারত ১৯৪৭ সালে তার স্বাধীনতা অর্জন করে

ভারতীয় উপমহাদেশের ভূ-বৈচিত্র বা টপোগ্রাফি বিশ্বের সর্বোচ্চ পাহাড়ের তুষার-আচ্ছাদিত হিমালয়ের চূড়া থেকে শুরু করে গঙ্গার সমৃদ্ধ ও উর্বর সমভূমি পর্যন্ত বিস্তৃত। বিস্তীর্ণ অঞ্চল, ঘন জঙ্গল, মরুভূমি, জলমগ্ন নদী, দীর্ঘ উপকূলরেখা ভারতবর্ষকে ঘিরে রয়েছে। স্বাধীন ভারতে (পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে ১.২২ মিলিয়ন বর্গমাইল বড়) বিভিন্ন বর্ণ, সংস্কৃতি, ভাষা এবং মিশ্রণ নিয়ে গঠিত। ভারতের প্রায় ১৩০ কোটি মানুষের প্রধান ধর্মীয় সম্প্রদায় হল হিন্দু, মুসলিম, খ্রিস্টান, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ এবং পার্সী। ১৫ টি সরকারী - স্বীকৃত ভাষা ছাড়াও কয়েকশো ভাষা এবং কয়েক হাজার উপভাষা আছে।

সার্ভে অফ ইন্ডিয়া হল ভারতের কেন্দ্রীয় প্রকৌশল সংস্থা। ম্যাপিং এবং জরিপের জন্যে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৭৬৭ সালে এটি চালু করে। এটি ভারত সরকারের অন্যতম প্রাচীন ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ। দেশের প্রধান ম্যাপিং এজেন্সি হিসাবে নির্ধারিত ভূমিকার ক্ষেত্রে, দেশের নির্দিষ্ট এক্তিয়ার অন্বেষণ ও যথাযথভাবে ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ম্যাপ করা হয়েছে। দেশের উন্নয়নের জন্য মানচিত্র সরবরাহ করে আমাদের দেশের বর্তমান অগ্রগতি, সমৃদ্ধি ও সুরক্ষা এবং পরবর্তী প্রজন্মের জন্য দেশকে একটি নির্দিষ্ট মার্গে নিয়ে যাওয়া ছিল এর মূল লক্ষ্য। এর সদস্যরা নির্বাচিত হন *সিভিল সার্ভিসেস অফ ইন্ডিয়া*-র সার্ভিস ক্যাডার এবং ইন্ডিয়ান *আর্মি কর্পস অফ ইঞ্জিনিয়ার্সের* সেনা অফিসারদের মধ্যে থেকে। বর্তমানে, সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার নেতৃত্বে রয়েছেন লেঃ জেনারেল গিরিশ কুমার। এর হেড-কোয়ার্টার দেরাদুনে অবস্থিত।

ভারতের জরিপের ইতিহাসটি অষ্টাদশ শতকের। মিঃ ল্যাম্বটন এবং স্যার জর্জ এভারেস্টের মতো বিশিষ্ট সার্ভেয়ারদের শ্রমসাধ্য প্রচেষ্টা দ্বারা ভারতীয় ভূখণ্ডের ট্যাপেষ্ট্রি কিছুটা হলেও শেষ হয়েছিল। এ জাতীয় জরিপকারীদের দূরদর্শিতার জন্য এটি একটি শ্রদ্ধাঞ্জলি যে স্বাধীনতার সময় দেশটি বৈজ্ঞানিক নীতির উপর ভিত্তি করে একটি জরিপ নেটওয়ার্ক উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিল। উত্তর থেকে দক্ষিণ এবং পূর্ব থেকে পশ্চিমে দেশ জুড়ে বিস্তৃত দুর্দান্ত ত্রিকোণমিতিক সিরিজ হ'ল বিশ্বের কয়েকটি সেরা জিওডেটিক নিয়ন্ত্রণ সিরিজ। সমীক্ষার বৈজ্ঞানিক নীতিগুলি পরিকল্পনাকারী এবং বিজ্ঞানীদের কাছ থেকে উপাত্তের বহু-শৃঙ্খলাবদ্ধতার প্রয়োজনীয়তা পূরণের জন্য সর্বশেষ প্রযুক্তি দ্বারা সংযুক্ত করা হয়েছে।

উত্তর পশ্চিম এবং উত্তর পূর্বাঞ্চলে প্রতিরক্ষা বাহিনীর ম্যাপিংয়ের প্রয়োজনীয়তা দেখাশোনার জন্য ১৯৫০ সালে মাত্র ৫ টি অধিদপ্তর গঠন করা হয়। বর্তমানে সারা দেশে ১৮ টি ডিরেক্টরেটে পরিণত হয়েছে, যাতে দেশের সার্বিক উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় মানচিত্রের *কভারেজ* সরবরাহ করতে পারে। ভূ-বিজ্ঞান, ভূমি ও সংস্থান ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে প্রতিরক্ষা বাহিনী, পরিকল্পনাকারী এবং বিজ্ঞানীদের প্রয়োজন মেটাতে প্রশিক্ষিত করা হয়েছে। এর বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ বিভিন্ন মন্ত্রক এবং সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পে নেওয়া হয়। আন্তর্জাতিক সীমানা, রাজ্য সীমানা নিষ্পত্তিতে সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ন।

ডিজিটাল টপোগ্রাফিকাল ডেটার প্রয়োজনীয়তার মুখোমুখি এই বিভাগ আশির দশকের শেষের দিকে তিনটি ডিজিটাল কেন্দ্র তৈরি করেছে যাতে বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রক্রিয়া এবং ভৌগলিক তথ্য ব্যবস্থা তৈরিতে ব্যবহারের জন্য পুরো দেশের ডিজিটাল টপোগ্রাফিকাল ডেটা বেস তৈরি করতে পারে। Geodetic and Research Branch, Directorate of Research and Development, Survey Training Institute-এর মতো বিশেষায়িত অধিদফতরগুলির ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তা মেটাতে সার্ভে অফ ইন্ডিয়াকে আরও শক্তিশালী করা হয়েছে।ভূ-পদার্থবিজ্ঞান, রিমোট সেন্সিং এবং ডিজিটাল ডেটা স্থানান্তর সম্পর্কিত ক্ষেত্রে দেশের অনেক গুরুত্বপূর্ন বৈজ্ঞানিক প্রকল্পে এর ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

সার্ভে অফ ইন্ডিয়া জাতীয় সুরক্ষা, স্থায়ী জাতীয় উন্নয়ন এবং নতুন তথ্য সরবরাহ করে বাজারের প্রয়োজনীয়তা পূরণে দেশকে সাহায্য করে। সার্ভে অফ ইন্ডিয়া তাৎপর্য, অনুশীলন, সংগ্রহ এবং ভূ-স্থান সংক্রান্ত

তথ্য প্রয়োগের ক্ষেত্রে নিজেকে উৎসর্গ করে এবং তথ্য নির্মাতারা এবং ব্যবহারকারীদের মধ্যে তথ্য, ধারণা এবং প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনের সক্রিয় বিনিময়কে উৎসাহ দেয় যা সর্বোচ্চ সম্ভাব্য রেজোলিউশনের এই জাতীয় ডেটাতে অ্যাক্সেস পাবে। রিয়েল-টাইম পরিবেশে সাশ্রয়ী মূল্যে তথ্য প্রদানে সাহায্য করতে এই বিভাগ বদ্ধপরিকর।

সার্ভে অফ ইন্ডিয়া সমস্ত জরিপ সম্পর্কিত বিষয়গুলি যেমন- জিওডেসি, ফটোগ্রামমেট্রি, ম্যাপিং এবং মানচিত্রের পুনরুৎপাদন সম্পর্কে ভারত সরকারের পরামর্শদাতা হিসাবে কাজ করে। এছাড়াও সার্ভে অফ ইন্ডিয়ার আরও অনেক দায়িত্ব পালন করতে হয়। যেমন:

- All Geodetic Control (Horizontal and Vertical) and Geodetic and Geophysical surveys.
- All Topographical Control, Surveys and Mapping within India.
- Mapping and Production of Geographical Maps and Aeronautical Charts.
- Surveys for Developmental Projects.
- Survey of Forests, Cantonments, large scale city surveys, guide maps, cadastral surveys etc.
- Survey and Mapping of special maps.
- Spellings of Geographical names.
- Demarcation of the External Boundaries of the Republic of India, their depiction on maps published in the country and also advice on the demarcation of inter-state boundaries.
- Training of officers and staff required for the Department, trainees from Central Government Departments and States and trainees from Foreign Countries as are sponsored by the Government of India.
- Research and Development in Cartography, Printing, Geodesy, Photogrammetry, Topographical Surveys and Indigenisation.
- Prediction of tides at 44 ports including 14 foreign ports and publication of Tide Tables one year in advance to support navigational activities.
- Scrutiny and Certification of external boundaries of India and Coastline on maps published by the other agencies including private publishers.

জনগণকে আরও বেশি মানচিত্র সচেতন করতে এবং ভারতীয় শহর, রাজ্য এবং দেশ সম্পর্কে আরও সচেতন করার জন্য, উন্নত মানের মানচিত্রের প্রকাশ করা হয়েছে। এর মধ্যে অন্যতম হল: পর্যটন মানচিত্রের সিরিজ, দেশের সমস্ত বড় শহরগুলির ম্যাপ; ট্রেকিং ম্যাপ সিরিজ; রাজ্য মানচিত্র সিরিজ, এক বা একাধিক রাজ্যকে আচ্ছাদন করে এমন ম্যাপ; এবং *'ডিসকভার ইন্ডিয়া সিরিজ'* যার অধীনে মোটরিং ম্যাপ, পার্বত্য অঞ্চল ও নদী, জাতীয় উদ্যান এবং অভয়ারণ্যগুলির মতো আগ্রহের থিম প্রকাশিত হয়েছে।

Geological Survey of India

১৮৩৬ সালে **জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া** [GSI] প্রতিষ্ঠিত হয়। নৌপরিবহণ ও অন্যান্য উদ্দেশ্যে ভারতীয় কয়লা ব্যবহারের সম্ভাব্যতা যাচাই করতে ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি *Coal Committee* গঠন করে। *'গ্রেট ট্রিগনোমিট্রিক্যাল সার্ভের'* শল্যচিকিৎসক ড. হেনরি ওয়েস্টলি ভয়সিকে ভারতীয় ভূতত্ত্ববিদ্যার জনক বলে গণ্য

করা যেতে পারে। ১৮৩৭ ও ১৮৪৫ সালে কমিটির সচিব স্যার জন ম্যাকক্লিল্যান্ড প্রথমবারের মতো ট্রেনিংপ্রাপ্ত ভূতাত্ত্বিকদের নিয়োগের জন্য সুপারিশ করেন। স্যার ম্যাকক্লিল্যান্ডের ১৮৪৮-৪৯ সময়কালের প্রথম রিপোর্টে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া' শব্দগুচ্ছ প্রথমবার ব্যবহৃত হয়। ১৮৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি স্যার ডেভিড হিরাও উইলিয়মস জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ভূ-তাত্ত্বিক জরিপকারী হিসেবে নিয়োজিত হন। ১৮৪৮ সালে স্যার উইলিয়মের মৃত্যুর পর ম্যাকক্লিল্যান্ড স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে এগিয়ে আসেন এবং ১৮৫০ সালের পয়লা এপ্রিল তাঁর অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত 'অফিসিয়েটিং সার্ভেয়র' হিসেবে ভূতাত্ত্বিক প্রতিষ্ঠানের দায়িত্বে ছিলেন। ১৮৫১ সালের ৫ মার্চ তারিখে স্যার টমাস ওল্ডহ্যাম ভূ-তাত্ত্বিক জরিপকারীর দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তখন থেকে অনেক নতুন খনিক্ষেত্র আবিষ্কারে ও মৃত্তিকা বিজ্ঞানে বিরাট সাফল্য-অর্জনে 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার' উজ্জ্বল কৃতিত্বের অবিচ্ছিন্ন যাত্রা চলতে থাকে।

স্যার টমাস ওল্ডহ্যাম তাঁর স্মারকলিপিতে (১৮৫২) বাংলার গভর্নরের কাছে ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র তৈরি ও খনিজ পদার্থসমূহ আবিষ্কার নথিবদ্ধ করার উদ্দেশ্যে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া-র কার্যাবলীকে ভূ-তাত্ত্বিক গবেষণার আওতায় নিয়ে আসার জন্য উপস্থাপন করেন। ১৮৪৮ সালে যে বড় ধরনের কর্মভারের সূচনা করা হয় তাতে ১৯০৫ সালে শুধুমাত্র ১৬ জন ভূ-তত্ত্ববিদ ও দুজন খনিজ বিশেষজ্ঞ ভূতাত্ত্বিক ছিলেন এবং ১৯৩৯ সালে ভারত থেকে ১৭ জন ভূ-তত্ত্ববিদকে অধিষ্ঠিত করার পর তাঁদের সর্বমোট সংখ্যা ২৫-এ উন্নীত হয়। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার ভারতীয় ভূ-তত্ত্ববিদদের পথ প্রদর্শনকারীদের মধ্যে রাম সিংহ (১৮৭৩), কিষেণ সিংহ (১৮৭৪), হীরালাল (১৮৭৪), পি.এন বসু (১৮৮০), পি.এন দত্ত (১৮৮৭-১৮৯৪) প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার প্রথম নথি ১৮৭৬ সালে প্রকাশিত হয়। শুরুতে জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার কর্মকর্তাদের নিজস্ব কোনো প্রকাশনার ব্যবস্থা ছিল না এবং তাঁদের গবেষণাপত্রসমূহ এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের জার্নাল [Journal of Asiatic society of Bengal] ও মাদ্রাজ জার্নাল অব লিটারেচার অ্যান্ড সাইন্স [Madras Journal of Literature and Science]-এর মাধ্যমে প্রকাশ করা হতো।

প্রথমদিকে কয়লা খনি সনাক্ত এবং কয়লা উত্তোলনের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়। বাংলার কয়লা খনিগুলিতে ব্যাপকভাবে পরীক্ষা করা হয়। পশ্চিম বর্ধমান, মানভূম ও বীরভূমের ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র ১৮৪৭ সালের গোড়ার দিকে তৈরি করা হয়। জরিপ কাজ পরিচালনার পর ডব্লিউ.টি. ব্ল্যানফোর্ড রাণীগঞ্জ কয়লাঞ্চলের প্রথম ভূতাত্ত্বিক মানচিত্র সরকারিভাবে প্রকাশ করেন। অন্যান্য কয়লাঞ্চল এবং উত্তর বাংলার দার্জিলিং জেলায় তামার উপস্থিতি সরকারকে এই কাজে আরও উৎসাহিত করে তোলে।

শিলা ও খনিজ পদার্থের উপর গবেষণা চালাতে মাইক্রোস্কোপের ব্যবহার প্রবর্তিত হয় ১৮৯০ সালে। জব চার্নকের কবরের উপর স্থাপিত স্মৃতিপ্রস্তর বিশ্লেষণ করে কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রভাষক স্যার টমাস হল্যান্ড তাঁর স্মৃতিকথায় [১৯০০] হাইপারস্থিন বহনকারী গ্রানাইট শিলার বর্ণনা দেন এবং চার্নোকাইট শিলা আবিষ্কার করেন।

পরীক্ষামূলকভাবে লৌহ আহরণের জন্য রানীগঞ্জ কয়লাঞ্চল সর্বাধিক প্রতিশ্রুতিশীল স্থান হিসাবে বিবেচিত হয় এবং গঠন করা হয় বঙ্গীয় লৌহ কোম্পানি [Bengal Iron Company]। ১৮৭৪ সাল পর্যন্ত ১২,৭০০ টন লৌহ উৎপাদিত হয়। এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের অধীনে অনুষ্ঠিত সভার কার্যবিবরণীতে ১৮৬৯ সালের ১০-ই জানুয়ারি কাছাড় ভূমিকম্পের উপর পরিচালিত গবেষণার উদ্ধৃতিসমূহ প্রকাশিত হয়। ১৮৯৭ সালের ১২-ই জুন তারিখে আরেকটি ভূমিকম্প হয় যার উৎপত্তিস্থল ছিল আসাম এবং এটি ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চল ও বাংলা প্রদেশের বিশাল এলাকাকে প্রভাবিত করে। রানীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্র পর্যন্ত প্রস্তাবিত

রেললাইন সম্প্রসারণ জন্য ভূতাত্ত্বিক অনুসন্ধানের কাজ শুরু হয় স্যার টমাস হল্যান্ডের নেতৃত্বে এবং ১৮৫৩ সালে প্রথম রেললাইনের শিলান্যাস করা হয়। [The first passenger train in eastern India ran from **Howrah to Hooghly** on 15 August 1854. The track was extended to **Raniganj by 1855**]

১৯০০ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত সময়ব্যাপী বাংলায় প্রধান ভূতাত্ত্বিক কার্যাবলীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল ঝরিয়া ও রানীগঞ্জ কয়লাক্ষেত্রসমূহের বিস্তারিত জরিপের জন্য একটি মানচিত্র তৈরি করা। শুরুর দিকে রানীগঞ্জ থেকে কয়লা ধারণকারী হিসেবে প্রকল্পিত ভূখন্ডসমূহের অভ্যন্তরে লৌহশিলা স্ফীতি সহযোগে প্রাপ্ত লৌহকে আকরিক থেকে পৃথক করার জন্য ধাতু গলানোর আধুনিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা হয়। বাঁকুড়া জেলার সুবিদিত টাংস্টেন নামক দুষ্প্রাপ্য ধাতুর আকরিক উত্তোলনের প্রকল্প শুরু হয়। ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপ বিভাগ [Geological Survey of India] কলকাতার ভারতীয় জাদুঘরের [Indian Museum] ভূতাত্ত্বিক শাখার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। ১৮৪০ সালে প্রতিষ্ঠিত জাদুঘরটি শুরুতে এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের [ASB] দালানে অবস্থিত ছিল। জাদুঘরটি ভারতের ভূতাত্ত্বিক জরিপের সঙ্গে একীভূত হয়ে যায় এবং ১৮৫৬ সালের ১লা জানুয়ারি জনসাধারণের দর্শনার্থে উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়। তখন থেকে ভারতীয় জাদুঘরটি দেশ ও বিদেশ উভয় স্থান থেকে প্রাপ্ত শিলা, খনিজদ্রব্য ও জীবাশ্মসমূহের গুরুত্বপূর্ণ নমুনা রাখার জন্য চেষ্টা করতে থাকে। এর উল্কাপিন্ডসমূহের সংগ্রহ (১৮৬৭ সালে এগুলির সংখ্যা ছিল ২৪৭) বিশ্বের অন্যতম সেরা ও এশিয়ার মধ্যে সর্ববৃহৎ।

স্বাধীনতার পরে জিএসআই-এর কার্যক্রম খনিজ অন্বেষণের পাশাপাশি ভূমিরেখা সমীক্ষাতেও জোর দিয়েছে। ফলস্বরূপ জাতীয় অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতি বহুগুণ বেড়েছে। বছরের পর বছর ধরে এই বিভাগ কেবলমাত্র একটি বিশাল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি, বিভিন্ন প্রয়োগ মূল্যবান ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য দেশে উন্নয়নমূলক ক্ষেত্রও উন্মোচিত করেছে। জিএসআইয়ের মূল কাজ জাতীয় ভূ-বৈজ্ঞানিক তথ্য এবং খনিজ সম্পদ মূল্যায়ন করা। এর সদর দফতর কলকাতায় অবস্থিত। জিএসআই-এর ছয়টি আঞ্চলিক অফিস রয়েছে

যথাক্রমে-লখনউ, জয়পুর, নাগপুর, হায়দরাবাদ, শিলং এবং কলকাতা এবং দেশের প্রায় সমস্ত রাজ্যেই অফিস আছে।

- **E. H. PASCOE** [l921—l932] became Director during the post-war coal 'boom', at a time when trade enquiries were brisk and 'mushroom' industries were much in evidence. He had long ago made a name for himself by his excellent work in connection with the petroleum resources of India and Burma
- It was during Pascoe's time that the department attained the full sanctioned strength of 36 officers, and the foundation was laid for the ***'Indianisation'*** of the service
- As facilities for advanced studies in geology were lacking in the country, young Indian officers in the junior grade were encouraged to proceed to the Imperial College of Science and Technology, London, for a thorough grounding in the subject before their promotion to the senior grade.
- Several officers including A. K. Banerji, L. A. N. Iyer, A. M. N. Ghosh and A. K. Dey were granted study leave for the purpose, but the promotion of the last three

officers to the senior grade was considerably delayed by the drastic retrenchment of the cadre in 1932.

- In addition to recruiting an appreciable number of young Indians with suitable Qualifications in geology, scholarships were given to Indian students for study on scienti•c and industrial subjects in Europe.
- In the planning and founding of the Indian School of Mines (now known as the Indian School of Mines and Applied Geology), Dhanbad, Pascoe took a leading part and the school was •nally opened in 1927, with Pascoe as the President of the Governing Body of the school.

১১.৪.১১.৭. সহায়ক গ্রন্থঃ

১) জিতেন্দ্রনাথ রায়, বাংলার কলকারখানা ও কারিগরি বিদ্যার ইতিহাস, দে'জ পাবঃ
২) সমরেন্দ্রনাথ সেন, বিজ্ঞানের ইতিহাস, শৈব্যা প্রকাশন
৩) David Arnold, Science, Technology and Medicine in Colonial India, OUP

১১.৪.১১.৬. নমুনা প্রশ্নঃ

1. Compose a note on Technical Education in 19th century India
2. Describe the evolution of Calcutta medical college
3. Role of 'Survey of India' for the development of the country

পর্যায়- ৫

BLOCK 4: Indian response to Western Science

একক- ১২, ১৩

সূচীপত্র

১১.৫.১২.১. উদ্দেশ্য
১১.৫.১২.২. পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয় প্রতিক্রিয়া
১১.৪.১৩.৩. ভারতীয় সমাজে পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রভাব
১১.৫.১৩.৪. সহায়ক গ্রন্থ
১১.৫.১৩.৫. নমুনা প্রশ্ন

১১.৫.১২.১. উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়টির উদ্দেশ্য হল উনবিংশ ও বিংশ শতকে পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয় প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে আলোচনা করা। পাশাপাশি ভারতীয় সমাজে পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রভাব কি রকম পরিবর্তন এনেছিল তার সম্পর্কে প্রাথমিক আলোচনা এই অংশে করা হয়েছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ইতিহাস পড়তে গেলে এই বিষয়গুলি সম্পর্কে ছাত্র- ছাত্রীদের সম্যক ধারনা থাকা প্রয়োজন।

১১.৫.১২.২. পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয় প্রতিক্রিয়া (Indian response to Western Science)

বাসাল্লার থিসিস [A three-stage *model* describes the introduction of modern science into any non-European nation] অনুসারে অ-বৈজ্ঞানিক সংস্কৃতি অঞ্চল ঔপনিবেশিক ছাতার উন্নত ও পরিশীলিত হয়। একইভাবে ব্রিটিশদের বিজ্ঞানচর্চা ভারতীয় জনগণের ইতিহাস গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। ঔপনিবেশিকতার প্রভাব সত্ত্বেও, নতুন বিজ্ঞানচর্চা স্থানীয় জনগণের মনে আলাদা ছাপ ফেলে। দীর্ঘদিন পর্যন্ত এই ধারণা প্রচলিত ছিল যে- ভারতীয় মন নতুন ধারণাগুলিকে একীভূত করার পক্ষে পরিপক্ক ছিল না। বিদেশ থেকে আমদানি করা প্রযুক্তির প্রতি ভারতীয়দের বৈরিতা এই মতকে সমর্থন করে।

ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে যখন পশ্চিমী বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির সাথে ভারতের যোগাযোগ শুরু হয় তা আগের তুলনায় বহুগুন অসংহত ছিল। তবে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষদিকে কেপ রুট [The **European-Asian sea route**, also known as the **sea route to India** or the **Cape Route**, is a shipping route from European coast of the Atlantic Ocean to Asia's coast of the Indian Ocean passing by the Cape of Good Hope and Cape Agulhas at the southern edge of Africa. The first recorded completion of the route was made in 1498 by Portuguese explorer Vasco da Gama. The route was important during the Age of Sail, but became partly obsolete as the Suez Canal opened in 1869.] খোলার পর থেকে অনেক পরিবর্তন হয়েছিল। ইউরোপীয় কোম্পানীর কর্মচারীগণ, যারা এতকাল দেশীয় রাজা এবং সরকারী আধিকারিকদের খুশি করার জন্য

কিছু নতুন প্রযুক্তির নমুনা নিয়ে আসত, তাঁরা এখন এই সামান্য আর্থিক লাভে আর সন্তুষ্ট ছিল না। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকে সংস্থাগুলি তাঁদের বানিজ্যিক নকশা থেকে সরে এসেছিল এবং বানিজ্যের পাশাপাশি আঞ্চলিক অধিগ্রহণের বিষয়টিকে প্রাধান্য দিয়েছিল।

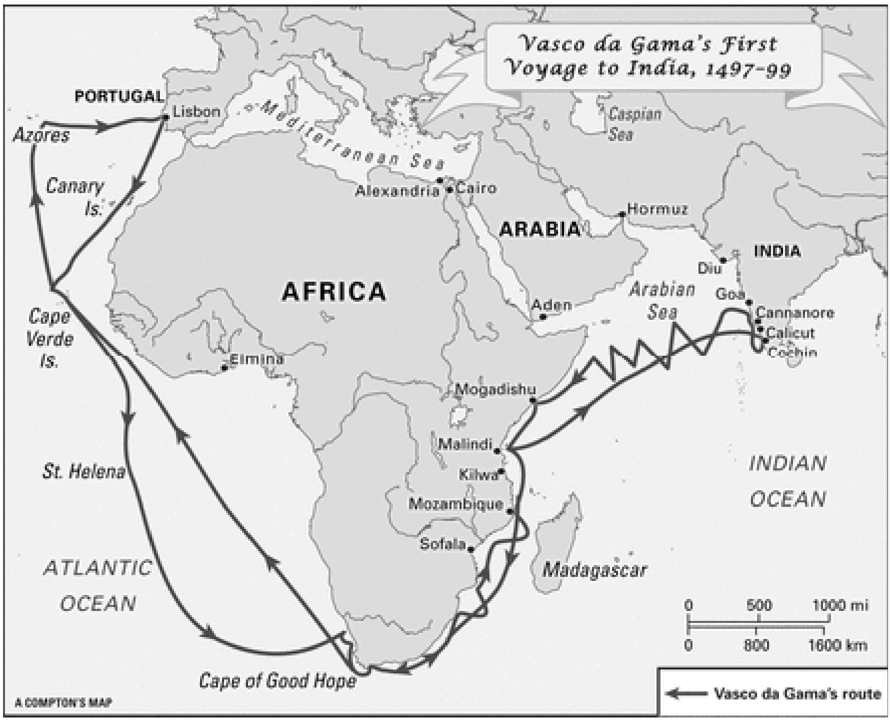

প্রাচ্যে একটি সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা, যা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অবধি দিবা-স্বপ্নের মতো মনে হয়েছিল, একশো বছরেরও কম সময়ে তা বাস্তবে পরিণত হয়েছিল। এরফলে ইউরোপীয়দের *'নেটিভ'* বা এদেশীয়দের সম্পর্কে মনোভাবকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। প্রযুক্তিগত উদ্ভাবনগুলির প্রদর্শন শুধুমাত্র স্থানীয় ধনী ব্যক্তিদের মুগ্ধ করার জন্য এখন আর নৈমিত্তিক অনুশীলন ছিল না। এটি একটি রাজনৈতিক প্রয়োজনীয়তা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ষোড়শ-সপ্তদশ শতকে এই যান্ত্রিক ব্যবস্থা ভারতে ইউরোপীয় বসতি স্থাপনকারীদের দ্বারা নতুন বিজ্ঞান নামে অধিষ্ঠিত হয়েছিল। আঠারো শতকের শেষে প্রাকৃতিক ও শারীরিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ইউরোপীয়দের ক্রিয়াকলাপ ভারতকে আধুনিক বিজ্ঞানের *কেন্দ্রবিন্দু* করে তোলে।

অন্যদিকে ভারতীয়রাও এইসময় নতুন বিজ্ঞানের তাত্ত্বিক দিকে মনোনিবেশ করেছিল। ইউরোপীয় পন্যের প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহের হিসাব পাওয়া যায় ১৮৩০ এর দশকে। R. Rickards, India or Facts Submitted to Illustrate the Character and Condition of Native Inhabitants নামক রচনায় একটি তথ্য দিয়ে দেখান যে – ইউরোপীয় পন্যের মধ্যে চাকু, কাঁচি, রোদচশমা, চশমার চাহিদা ব্যাপক বৃদ্ধি পেয়েছিল। স্টিম-ইঞ্জিন, রেলপথ, বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ, মুদ্রণ প্রেস, টেলিস্কোপ এবং ঔপনিবেশিক নিয়মের ভারতীয় জনগণকে আকৃষ্ট করেছিল। এছাড়া *প্রযুক্তিগত বিপ্লব* [Technological Revolution] ভারত এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে দূরত্ব এক বছরেরও বেশি সময় থেকে কমিয়ে কয়েক দিনে নামিয়ে এনেছিল এসেছিল। ফলে পশ্চিম বিশ্ব থেকে বৈজ্ঞানিক তথ্যের আগমন আরও দ্রুততর হয়েছিল। কে.এন. চৌধুরী বলেন যে কোনও ভারতীয়দের পক্ষে ইংল্যান্ড যেতে আসতে সময় লাগতো ১৬ মাস। অষ্টাদশ শতকের মাঝামাঝি স্টিম-ইঞ্জিনের আবিষ্কার যাত্রাপথকে অনেক সুগম এবং দ্রুতগামী করে তোলে।

আলোচ্য সময়ের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভারতে ব্রিটিশদের অবস্থানের ক্ষেত্রে যথেষ্ট কাঠামোগত পরিবর্তন হয়েছিল। ভারতে তাদের জনসংখ্যা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল তা নয়, তবে তাদের বৈজ্ঞানিক কার্যক্রম ঔপনিবেশিক শাসনের একটি গুরুত্বপূর্ন হাতিয়ার [*tools*] হয়ে দাঁড়িয়েছিল। প্রথমত, আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে ভাগ্যের সন্ধানে ভারতে আসা ইউরোপীয়দের বেশিরভাগই পেশাদার শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাদের মধ্যে যারা সংস্থার বেসামরিক বা সামরিক চাকরিতে যোগ দিয়েছিলেন তাদের বেশিরভাগই বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। এই প্রসঙ্গে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং শাখাগুলি অমূল্য সেবা প্রদান করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, সার্জন এবং ইঞ্জিনিয়াররা দু'জন প্রধান বৈজ্ঞানিক সেবা কর্মী নিযুক্ত করেছিলেন যাদের র্যাঙ্কের লোকেরা বিভিন্ন ধরণের অন্যান্য প্রযুক্তিগত কাজের জন্য আকৃষ্ট হয়েছিল। বাকি যারা এই বিভাগগুলির মধ্যে পড়ে না তারা বৈজ্ঞানিক বিপ্লবের অভিজ্ঞতা অর্জন করেছিলেন। একটি অজানা দেশে বৈজ্ঞানিক কাজ সম্পাদনের জন্য, ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানী প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করতে পারে এমন স্থানীয় লোকদের কাছ থেকে খারাপভাবে সমর্থন প্রয়োজন। ইউরোপীয়দের অধীনে কাজ করে, ভারতীয়রাও কিছু বৈজ্ঞানিক তথ্য অর্জন করেছিল।

ভারতবর্ষে প্রথম বৈজ্ঞানিক শিক্ষা সার্ভে এজেন্সির মাধ্যমে এসেছিল। প্রথমদিকে, ভারতীয়রা ইউরোপীয় জরিপকারীদের কাছে বেয়ারা এবং ফ্ল্যাগম্যান হিসাবে নিযুক্ত হত। R.H. Phillimore তাঁর 'Historical Records of the Survey of India'-তে বলেন, এই প্রক্রিয়ায় ভারতীয়রা অত্যন্ত সন্তর্পনে বিজ্ঞান শিক্ষায় অনুরক্ত হয়েছিল। পরে যখন গাণিতিক ও ত্রিকোণমিত্রিক শাখায় ভারতীয়দের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তখন ইউরোপীয় সমীক্ষকরা তাদের সহায়তা করার জন্য কয়েকজন ভারতীয়দের নিয়োগ করে। এই পরিস্থিতিতে ভারতীয়রা খুব দ্রুত সাড়া ফেলে এবং বিজ্ঞানচর্চায় নিয়োজিত হয়। জর্জ এভারেস্ট এবং অ্যান্ড্রু ওয়াওয়ের অধীনে কাজ করা ভারতীয় প্রতিভাধর রাধানাথ সিকদারের গাণিতিক বিশ্বাসযোগ্যতা নতুন বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান আগ্রহকে আরোও বাড়িয়ে তোলে । জরিপ যন্ত্রের নতুন মডেলগুলি গ্রহণের ক্ষেত্রে ভারতীয়রাও সমানভাবে সহায়ক ছিল। আর্কটের মহসিন হুসেন যান্ত্রিক মেরামত, সমন্বয় ও পুরাতন যন্ত্রগুলির পুনর্নির্মাণে তার দক্ষতা প্রমাণ করেন। তার যান্ত্রিক সম্ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এভারেস্ট হুসেনকে কলকাতায় গণিতের যন্ত্র নির্মাতা হিসাবে নিযুক্ত করেছিলেন।

নিঃসন্দেহে শারীরিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ব্রিটিশ উদ্যোগ ভারতীয়দের সামনে নতুন সম্ভাবনা তৈরি করেছিল। এই কাজগুলি মূলত পৃথক প্রকৃতিবিদগণ দ্বারা পরিচালিত হত, যারা দেশীয় উদ্ভিদ এবং প্রাণীজগতের [Flaura and Fauna] নমুনাগুলি সংগ্রহ কার্যে লিপ্ত থাকতেন। এই ধরনের বৈজ্ঞানিক গবেষণার সঙ্গে সম্পর্কিত কোনও কাজই সম্ভবত ভারতীয়দের আকৃষ্ট করতে পারেনি। তবুও কিছু বিভাগ ছিল যার মধ্যে ভারতীয়দের কিছু ভূমিকা ছিল। ব্রিটিশ শিল্পীরা যেহেতু গাছপালা ইত্যাদির রুটিনমাফিক অনুলিপি [copying of plants] করতে ভারতে যেতে রাজি হতেন না, তাই ইউরোপীয় উদ্ভিদবিদদের ভারতীয় শিল্পীদের নিয়োগ ছাড়া বিকল্প ছিল না। Roxburgh নিজেই ভারতীয় শিল্পীদের নিয়ে একটি ছোট দল তৈরি করেছিলেন এবং এই কাজটি প্রশংসিত হয়েছিল।

একথা অস্বীকার করা যায়না, ইউরোপীয় চিকিৎসা ব্যবস্থার নিত্যনতুন গবেষণা, আবিষ্কার এবং শল্যচিকিৎসা ভারতীয়দের জন্যে আশির্বাদ বয়ে আনে । ইউরোপীয়দের চিকিৎসা দক্ষতার প্রতি ভারতীয়দের আগ্রহ সপ্তদশ শতকে শুরু হয়েছিল যখন ইংরেজ জাহাজগুলির চিকিৎসকরা সুরাটের ধনী ব্যবসায়ীদের সাথে বিভিন্ন আলাপ-আলোচনা করতেন। অল্প সময়ের মধ্যে তাদের খ্যাতি ও দক্ষতা মুঘল সম্রাটের কানে পৌঁছেছিল ইউরোপীয় কোম্পানির ব্যবসায়ীরা ভারতীয় শাসকদের কাছ থেকে অনুগ্রহ লাভের হাতিয়ার হিসাবে চিকিৎসা

বিজ্ঞানের সদ্ব্যবহার করেছিল। C.J.C. Davidson তাঁর '***Diary of Travels and Adventures in Upper***' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, সময়ের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপীয় চিকিৎসা বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয় আবেগ এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে 'সমস্ত ফিরিঙ্গিদের চিকিৎসক বলে ধরে নেওয়া হত।' ব্রিটিশরা ভারতীয়দের চিকিৎসার জন্য বিভিন্ন অঞ্চলে ডিসপেনসেরিও চালু করেছিল।

শুরুর দিকে ইউরোপীয় পদ্ধতিগুলির সফল প্রয়োগে বেশ কিছু সমস্যা ছিলস। সাধারন জনগণের উদাসীনতা ছাড়াও, সবচেয়ে প্রতিরোধী প্রতিক্রিয়া এসেছিল ধর্মগুরুদের দিক থেকে। উদাহরণ স্বরূপ পক্সের টিকাকরনের বিরোধীতার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। বিশেষ করে ব্রাহ্মণ এবং তাঁদের ভয়ে ভৃত একদল নিম্নজাতের মানুষ এই চিকিৎসার বিরোধীতা করে। নতুন অনুশীলনটিকে ব্যর্থ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে। প্রাথমিকভাবে, ভ্যাকসিনের প্রতি স্থানীয় প্রতিক্রিয়া পুরোপুরি উৎসাহজনক ছিল না। উইলিয়াম বেন্টিঙ্ক স্বীকার করেছেন যে 'নাগরিকরা অনুশীলনের প্রতি উদাসীন, যদি না হয় তবে এবং পাটনা ছাড়িয়ে বেশিরভাগ প্রদেশে প্রচণ্ড উত্তপ্ত ও শুষ্ক পরিবেশের কারণে বছরের কয়েক মাস ছাড়া অনুশীলন বজায় রাখা সম্ভব তবে ধীরে ধীরে প্রতিরোধটি শেষ হয়ে যায় এবং বিহার থেকে মার্টিনের প্রতিবেদন অনুসারে, অনেক পরিবার যারা প্রাথমিকভাবে ভ্যাক্সিনেসান প্রত্যাখ্যান করেছিল, পরবর্তীকালে তা মেনে নেন। একইভাবে, জেমস থমাসনের অধীনে উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় প্রদেশগুলিতে এবং বিশেষত কুমায়ুন অঞ্চলে ব্যাপক অগ্রগতি ঘটেছিল । '29 দেশের দক্ষিণাঞ্চলে ফরাসি মিশনারী অ্যাবে ডুবাইস [Abbe Dubois] গুটি-বসন্তের টিকাদান চালু করেছিলেন। গুটি। 1803-1804 সালের মধ্যে সকল প্রকার কুসংস্কার সত্ত্বেও মোট 25,432 জন ভারতীয়কে টিকা দেওয়া হয়েছিল।

তবে, কলকাতা সংস্কৃত কলেজ ও কলকাতা মাদ্রাসায় শারীরবৃত্তির [anatomy] বিষয়ে শেখার ক্ষেত্রে প্রচুর আগ্রহ প্রকাশ করলে সমস্ত সংশয় ও আশঙ্কা অদৃশ্য হয়ে যায়। ১৮৩০ সালে, একজন ডাঃ উইলসন সংস্কৃত কলেজের মেডিকেল ক্লাস পরীক্ষা করার পরে বলেছিলেন যে, 'the triumph gained over native prejudices is no-where more remarkable than in this class in which not only are the bones of human skeleton handled without reluctance but in some instances dissection of the soft parts of animal is performed by the students themselves' তবে দীর্ঘ প্রতীক্ষিত কীর্তিটি ছয় বছর পরে ১০-ই জানুয়ারী, 1836 সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজের মেডিকেল সায়েন্সের অধ্যাপক পণ্ডিত মধুসূদন গুপ্তের দ্বারা। কারণ এই দিনেই তিনি সফলভাবে মানবদেহকে বিচ্ছিন্ন করেন এবং ভারতীয় চিকিৎসার ইতিহাসে নতুন দিগন্ত উন্মোচন করেন। ধর্মীয় গোঁড়ামির মূলে কুঠারাঘাত করেন, যা ভারতীয়দের পাশ্চাত্যের চিকিৎসাবিজ্ঞান শিক্ষার পথকে সুগম করে।

ব্রিটিশ বৈজ্ঞানিক ও প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রতি ভারতীয়দের সদর্থক প্রতিক্রিয়া তাদের সচেতনতার সাক্ষ্য বহন করছে। ঘটনাক্রমে, ভারতে তাদের শাসনের অর্ধ-শতাব্দীরও বেশি সময় ধরে ব্রিটিশরা শিক্ষার মতো বিষয়ে হস্তক্ষেপ এড়িয়েছিল, সম্ভবত এই অনুভূতি থেকে যে ভারতীয়রা এই ধরনের প্রচেষ্টা সহ্য করবে না। যদিও ১৮১৩ সালের সনদ আইনটি স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে- ভারতীয়দের মধ্যে শিক্ষার প্রসার কোম্পানি/সরকারের দায়িত্ব। তবুও এই পরিকল্পনাটি আরও কয়েক দশক ধরে অবরুদ্ধ ছিল। এই পর্যায়ে, ব্রিটিশ পরিকল্পনাগুলি ('প্রাচ্য সাহিত্য ও বিজ্ঞানের পুনর্জাগরণ') বাদ দিয়ে কলকাতার কিছু স্থানীয় বাসিন্দা অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান কলেজ খোলার জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। '***বিদ্যালয়*** ' [It provided instruction in natural and experimental philosophy, chemistry, math], ভারতে ইউরোপীয় বিজ্ঞানের শিক্ষার প্রচারের জন্য প্রথম শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। ইউরোপীয় বিজ্ঞানের প্রতি ভারতীয়দের ক্রমবর্ধমান আগ্রহের আরেকটি

সর্বোত্তম উদাহরণ হল এর গভর্নর জেনারেলকে রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক ১৮২১ সালে বিজ্ঞান প্রসারে ঐতিহাসিক চিঠি প্রেরণ। এই সময় কলকাতায় Hindu Sanskrit College প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ।এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয়দের 'হিন্দু সাহিত্যে' শিক্ষিত করা। রামমোহন রায় আক্ষেপ করেছিলেন যে এই শিক্ষাব্যবস্থা এই দেশকে অন্ধকারে রাখার জন্য সবচেয়ে ভাল উদ্যোগ।

১৮৪০ এবং ১৮৫০-এর দশকে ইউরোপীয় বিজ্ঞান শেখার জন্য ভারতীয় উদ্যোগ আরও স্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয়েছিল। ১৮৩৫ সালে সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে 'ইংরাজী' শিক্ষার প্রচার ভারতে তাদের শিক্ষানীতিতে মূল উদ্দেশ্য হবে। কোম্পানির এই অবস্থানের মূলে ছিল জনশিক্ষা কমিটিতে অ্যাংলিসিষ্টদের ক্রমবর্ধমান প্রভাব এবং ১৮৩৪ সালে তার রাষ্ট্রপতি হিসাবে Maculey-এর নিয়োগের কারণে প্রাচ্যবিদদের নকশাকে মারাত্মক ধাক্কা দেয়। তবে, এইসময় ভারতীয়দের মধ্যে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্য। একইসঙ্গে ইউরোপীয় বিজ্ঞান, ভূগোল এবং প্রাকৃতিক দর্শন অধ্যয়নে ঝোঁক বেড়েছিল। এই শিক্ষাব্যবস্থায় অসন্তুষ্ট হয় অনেকে দিবি করেন ' এই শিক্ষা ব্যবস্থা কেবল অর্থোপার্জনের জন্য, বৌদ্ধিক অগ্রগতির জন্য নয়'। আবার একদল ইউরোপীয় বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিতে ভারতীয়দের কঠোর প্রশিক্ষণের দাবি করেছিলেন। উদাহরণস্বরূপ মাদ্রাজ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির শিক্ষার্থী মাধব রাও 'নেটিভ এডুকেশন' শীর্ষক তাঁর প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন যে, *'...it is not necessary that the Hindus would be carried through the complicated mazes of classic lore. It is not requisite that he should study all the poets of the English language. But what is of far greater importance to him and to his countrymen, is that he should direct his attention towads the science and arts of Western'*

ভারতীয়রা স্টিম রেলপথেও আগ্রহ দেখিয়েছিল। মজার বিষয় হচ্ছে, রবার্ট ম্যাকডোনাল্ড স্টিফেনসন যখন ভারতে রেলপথ চালু করার পরিকল্পনার অনুমোদনের জন্য ইংল্যান্ডের কর্তৃপক্ষের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিলেন, তখন কোর্ট অব ডিরেক্টরসের কয়েকজন সদস্য বলেছিলেন যে 'ভারতীয়রা রেলপথ নিয়ে খুব বেশি আকর্ষিত হবে না'। এমনকি তারা এই ধারণা নিয়েও কটূক্তি করেছিল যে রেলপথের জন্য ভারত অনুপযুক্ত। কিন্তু, ভারতীয়দের প্রতিক্রিয়া অবশ্য এ ধরণের আশঙ্কার বিপরীতে ছিল। তারা অদ্ভুতভাবে তাদের বস্তুগত অবস্থার উন্নতির একটি সরঞ্জাম হিসাবে রেলপথের প্রবর্তনের অপেক্ষায় ছিল। উদাহরণস্বরূপ, কলকাতার একজন ব্যবসায়ী বাবু রাম গোপাল ঘোষ আশা করেছিলেন যে 'railway travelling would generally and largely be availed of by all classes of men except, perhaps, by a few old, antiquated Hindus, who look upon every innovation with feelings of horror'। শেষ অবধি 1850 এর দশকে ভারতে যখন রেলপথ চালু হয়েছিল, স্থানীয় বিরোধ সম্পর্কে সমস্ত সন্দেহ ভিত্তিহীন প্রমাণিত হয়েছিল। যদিও প্রথমদিকে ভারতীয়দের মধ্যে এক ধরণের অনিশ্চয়তা ছিল, ধীরে ধীরে তা বিলুপ্ত হয়ে যায় এবং পরে রেল গাড়ি যাত্রা 'ফ্যাশনে' পরিণত হয়। বর্তমানে ভারতীয় রেল এশিয়ার বৃহত্তম কোম্পানি।

বৈদ্যুতিন টেলিগ্রাফ ছিল আরও রোমাঞ্চকর এবং ভিন্ন। স্টিম ইঞ্জিন এবং রেলপথের ঠিক বিপরীত উদ্দেশ্যে কেবল সামরিক উদ্দেশ্যে পরিবেশন করার জন্য একটি সাম্রাজ্যবাদী উদ্ভাবন ছিল। টেলিগ্রাফ লাইনের নির্বাচন সম্পূর্ণ কৌশলগত নির্দেশিকাগুলির অধীনে করা হয়েছিল। কিছু অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিল যে, ভারতীয়রা সামাজিক মিলনের জন্য নতুন উপায়গুলি ব্যবহার করবে না। তবে শেষ পর্যন্ত ১৮৫৫ সালে ব্যক্তিগত সংস্থাগুলির জন্য টেলিগ্রাফ চালু হওয়ার পরে তাদের অনুমানটি ভুল প্রমাণিত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য প্রযুক্তিতে ভারতের প্রতিক্রিয়া হিসাবে, প্রাথমিকভাবে ভারতীয় কারিগর এবং কৃষকরা তাদের ঐতিহ্যবাহী সরঞ্জামগুলি নিয়ে কাজ করা পছন্দ করেছিলেন এবং সমস্ত উন্নতির বিরোধিতা করেছিল। প্রকৃতপক্ষে, ইউরোপীয় যোগাযোগের শুরু থেকে এবং ১৮৫৮ সালে কোম্পানির শাসনের শেষ অবধি, ভারতীয়রা ইউরোপ থেকে অনেককিছুই গ্রহণ করেছিল এবং যখন তাঁরা নিশ্চিত হয় তখন সহজেই মেনে নিতে শেখে। দুর্ভাগ্যক্রমে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টদের মধ্যে ভারতীয় কৃষিক্ষেত্র বা অন্য যে কোনও উৎপাদনশীল ক্ষেত্রের বিকাশের জন্য তাঁরা এই নীতিতে বিশ্বাস করত যে- 'a conservative preference for all that is Western; that anything that is good must come from the West'। কিন্তু এই যুক্তি সর্বত্র খাটেনি। ভারতবর্ষ নিজের চাহিদা অনুসারে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে নিজস্ব ধাঁচে বিজ্ঞান চর্চায় নিয়োজিত হয়েছিল। অবশ্যই এই চর্চায় ইউরোপীয় পথকেই ভারতীয়রা অনুসরণ করেছিল, তবে তা অনুকরণ নয়।

১১.৪.১৩.৩. ভারতীয় সমাজে পশ্চিমী বিজ্ঞানের প্রভাব (Impact of western science on the Indian society.)

ইতিহাস হল বর্তমান ও অতীতের এক ধারাবাহিক সংলাপ। তবে, তা কখনোই বিমূর্ত ও বিচ্ছিন্ন ব্যক্তির মধ্যে সংলাপ নয়। বরং আজকের সমাজ ও বিগত সমাজের মধ্যে একনিষ্ঠ প্রবাহমান সংলাপ। জে বুক হার্ট-এর ভাষায় ‘ইতিহাস হল এক যুগ অন্য যুগের মধ্যে লক্ষণীয় যা খুঁজে পায় তার নথি।’ অতীত আমাদের কাছে শুধু বর্তমানের আলোকেই বোধগম্য। আর বর্তমানকে আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারি শুধু অতীতের আলোতেই। অতীতের সমাজ বুঝতে মানুষকে পারঙ্গম করা ও বর্তমান সমাজের ওপর তার দখল বাড়ানো—এই হল ইতিহাসের দ্বিমুখী ধারা। দার্শনিক হেগেল বলেন—‘পৃথিবীর ইতিহাস অগ্রসর হচ্ছে প্রাচী থেকে প্রতীচীর দিকে। এশিয়ার আদিম সভ্যতা নিয়ে হয়েছে ইতিহাসের সূত্রপাত। প্রাচীন এশিয়া খণ্ডে সভ্যতার জন্মলগ্নে প্রজ্ঞার রুদ্ধদ্বার উন্মিলিত হয়েছে। তারপর ইতিহাসের প্রতিপর্বে গ্রিকসভ্যতা, রোমক প্রজাতন্ত্র, খ্রিস্টীয় সাম্রাজ্যতন্ত্রের মধ্যে যে মানুষের নতুন নতুন রুদ্ধদ্বার খুলে গেল, জার্মান, রিফর্মেশন ও রাষ্ট্র ঐক্য সাধনের দ্বারা চার্চ ও স্টেটের দ্বন্দ্ব, বস্তু ও আত্মার দ্বন্দ্বের একটা সমন্বয় সাধিত হল।এই পর্বে আমরা অনায়াসেই ব্রিটিশ পরিচালিত ১৭৮৪ সালের কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটির ক্রিয়াকর্মে প্রবেশ করতেই পারি। তবে, একথা ঠিক কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিমি পণ্ডিতদের মধ্যে প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার সূত্রপাত হচ্ছে। প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের মধ্যে দিয়ে শুধুমাত্র ভারতীয় তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বই নয়, ভারতীয় জ্ঞান চর্চার নানান শাখা-প্রশাখার উন্মেষ ঘটছে। যেমন প্রত্নতত্ত্ব, লিপিতত্ত্ব, মুদ্রাতত্ত্ব, শিল্পতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব, লোকসাহিত্য এমনকী স্থানীয় ইতিহাস চর্চার মতন বিষয়ও ব্রিটিশ পণ্ডিতবর্গ অনুশীলন করেছেন। হয়তো তাদের প্রয়োজনেই কিন্তু আমাদের দেশের অতীত উন্মোচিত হচ্ছে একের পর এক। এতদিন যা সুপ্ত ছিল সে জাগ্রত হচ্ছে। প্রাচ্যবিদ্যা চর্চার অন্যতম অঙ্গ হিসেবে বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্য এমনকী আরবি ও পারসি গবেষণাও এখানে উপেক্ষিত হয়নি। একইভাবে ঐতিহাসিক জে.বি.বারি বলেছেন- ইতিহাস হল বিজ্ঞান, তার থেকে কমও নয়, বেশিও নয়। কাজেই কোন দেশ বা জাতির বিবর্তনকে জানতে গেলে ইতিহাসে বিজ্ঞানে এবং বিজ্ঞানের ইতিহাসকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হবে।

আধুনিক ভারতবর্ষে *‘এশিয়াটিক সোসাইটি’* হল প্রথম প্রতিষ্ঠান, যেখানে বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়। ভারতের পুনর্জাগরণ পর্বে এশিয়াটিক সোসাইটির ভূমিকা ছিল অসাধারণ। এ প্রসঙ্গে প্রগতি এবং অভিব্যক্তি বিষয় দুটি একটু পরিষ্কার হওয়া প্রয়োজন। পুনর্জাগরণ পর্বের চিন্তাবিদরা গ্রহণ করেছিলেন আপাতভাবে অসম দুটি মত।

প্রকৃতির জগতে মানুষের স্থান সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা। সেখানে ইতিহাসের নিয়ম আর প্রকৃতির নিয়ম এক করে দেওয়া হয়েছিল। অন্য দিকে তাঁরা প্রগতিতেও বিশ্বাস করতেন। কিন্তু প্রকৃতি প্রগতিশীল, সে নিরন্তর এগিয়ে চলেছে কোনও লক্ষ্যের দিকে, এটা ধরে নেওয়ার কি কোনও ভিত্তি ছিল? হেগেল এই অসুবিধার মোকাবিলা করেন ইতিহাস আর প্রগতির মধ্যে সুস্পষ্ট ফারাক করে নিয়ে। তিনি বলেন, প্রথমটি অর্থাৎ ইতিহাস প্রগতিশীল আর দ্বিতীয়টি নয়। প্রগতির সঙ্গ অভিব্যক্তির সমীকরণ ঘটল ডারউইনের বিপ্লবে। সেই বিপ্লবে ইতিহাসের মতন প্রকৃতিকেও প্রগতিশীল বলে জানা গেল। কিন্তু সেখানে একটা সমস্যা থাকল, ‘ জৈব উত্তরাধিকার’ এবং ‘সামাজিক অর্জন’ বলে দুটি জিনিস রইল। জৈব উত্তরাধিকার হচ্ছে অভিব্যক্তির উৎস আর সামাজিক অর্জন হচ্ছে ইতিহাসে প্রগতির উৎস। এশিয়াটিক সোসাইটিতে এসে ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা হয়েছিলেন ভারতের জাতীয় ভাবধারার প্রথম স্ফুলিঙ্গ। সঙ্গে সঙ্গে এশিয়াটিক সোসাইটিই আমাদের জাতীয় চেতনায় প্রথম আঘাত হানল। সেই স্ফুলিঙ্গের আগুন ঠিকরে পড়ল দিক থেকে দিগন্তে। উদ্বুদ্ধ করল শুধুমাত্র ইউরোপীয় পণ্ডিতদের নয়, ভারতীয় পণ্ডিতেরাও এশিয়াটিক সোসাইটির নানান বিদ্যাচর্চার সূত্র ধরে নতুন নতুন দিকের সন্ধান দিতে সক্ষম হলেন। ইউরোপীয় ধাঁচে ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চার সূত্রপাত ঘটল এখানে। প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানচর্চারও সূত্রপাত ঘটল এখানে। সংস্কৃত ভাষার মধ্য দিয়ে প্রাচীন ভারতীয় বিজ্ঞানের কথা জানতে শুরু করল বিশ্ববাসী। প্রখ্যাত জার্মান পণ্ডিত ফ্রেডরিক ম্যাক্সমুলার নিজে স্বীকার করলেন ‘...certain knowledge of India as essential portion of a liberal or an historical education. তিনি আরও বললেন, “Sanskrit has not only widened our view of man but it has imparted to the whole ancient history of man a reality which it never possessed before...’. যাই হোক এশিয়াটিক সোসাইটি এগিয়ে চলল প্রাচ্যবিদ্যার অনুশীলনে।

বিজ্ঞান চেতনার অসাধারণ অবদানকে সঙ্গে নিয়ে এক যুগ থেকে অন্য যুগে। এই সময়কালে ভারতীয় বহু মনীষীর সমন্বয় ঘটেছে নানান প্রসঙ্গে। রাজেন্দ্রলাল মিত্র, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ঈশ্বরচন্দ্র থেকে শুরু করে সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র, আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, চন্দ্রশেখর ভেঙ্কটরমন, সত্যেন বসু—কে নেই তাঁদের মধ্যে। ভাষাচর্চা, দর্শনচর্চা, ইতিহাসচর্চা, বিজ্ঞানচর্চা কিছুই বাদ পড়েনি সেখানে। ভারতীয় জ্ঞানচর্চার নানান ঘরানা তৈরি হয়েছিল। এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে জ্ঞানের আলোকে জাতিকে আন্দোলিত করার কাজটি করেছিলেন তাঁরাই। ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশনে সংগঠিত করলেন এখানে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়। একজন বৌদ্ধ ভাষাবিদ চোমা-ডি-কোরেস রচনা করলেন ত্রিভাষা ব্যাকরণ।

বহু বিদগ্ধ মানুষের গবেষণাধর্মী প্রথম রচনা প্রকাশ পেয়েছিল এশিয়াটিক সোসাইটির অসামান্য পত্রিকা জার্নাল অফ দি এশিয়াটিক সোসাইটিতে। আমরা আগামী দিনে এগিয়ে চলার শপথ নিলাম সেখান থেকে। তা ছিল আমাদের অঙ্গীকার। সারা এশিয়ার নানান জ্ঞানের সম্মিলন ঘটল এখানে। ক্রমে ক্রমে তা পরিচিত হল প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মিলনের এক মহাতীর্থে। ইংরেজ এ কাজটি করেছিল খুব সচেতনভাবেই। ইংরেজি ভাষাকে স্বীকৃতি দিয়ে সেই চর্চাকে আরও ত্বরান্বিত করার চেষ্টা হল। রচিত হল নানান গ্রন্থ ও সন্দর্ভ। এখানে একটি বিখ্যাত গ্রন্থের নাম অনায়াসে স্মরণ করা যায় সেটি হচ্ছে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের The Linguistic Survey of India. ১১টি খণ্ডে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়, গ্রন্থটি ১৮৯৪ থেকে ১৯২৮ সাল পর্যন্ত। এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় ভাষা সমূহের সঙ্গে অন্যান্য দেশের সামাজিক ও ভাষাতাত্ত্বিক সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট মূল্যায়ন চোখে পড়ে। ক্ষণিক যখন চিরন্তনের মর্যাদা পায়, তুচ্ছ যখন অসামান্য হয়ে ওঠে তখন তাতে থাকে শিল্পীর ছোঁয়া। আর শিল্পীর সেই মাধুর্যের মধ্যেই সৃষ্টিশীলতা লুকিয়ে থাকে। মানব সভ্যতার ভিত্তিভূমি এই ভারতবর্ষ। ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, কৃষ্টি যেমন প্রাচীন, তেমন অনুপম ও বিশ্ববন্দিত। সেই সঙ্গে ভারতবর্ষ

হল দর্শনের আদিস্থান। মানবজীবনের ধারক ও বাহক হিসেবে এমনকী মানবজীবনকে চরম উৎকর্ষের উত্তরণে এবং সার্থকতায় দর্শনই একমাত্র আশ্রয়। কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে তার চর্চা অব্যাহত থেকেছে শুরু থেকেই। আর সেটা যেভাবেই হোক না কেন এশিয়াটিক সোসাইটি তার প্রজ্ঞা বিশ্বের সঙ্গে একাত্মভাবে যুক্ত করার একান্ত প্রয়াসী ছিল। সেটা কখনও হয়েছে বিজ্ঞানের আলোকে কিংবা মানবিকী বিদ্যার আলোকে বা দর্শন ইতিহাসচর্চার সুবাদে। আধুনিক ভারতের রসায়নচর্চার জনক আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র (১৮৬১-১৯৪৪) এই এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর গবেষণার মূল্যবান তথ্য প্রথম পরিবেশন করেছিলেন। এই সোসাইটি থেকেই রাজেন্দ্রলাল মিত্র এবং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সংকলিত সংস্কৃত পুঁথির প্রথম তালিকা প্রকাশিত হয়। ১৮৮২ সালে এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে প্রকাশিত হয় রাজেন্দ্রলাল মিত্রের Sanskrit Buddhist Literature of Nepal গ্রন্থটি। আজও সেটি প্রাচ্যবিদ্যার এক অসামান্য দলিল। আরও কত মানুষ তার এই ২৩৪ বছরের যাত্রায় কত ভাবে যুক্ত হয়েছেন এবং ভারতের তথা সারা এশিয়ার জ্ঞান বিজ্ঞানচর্চার জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন তার ইয়ত্তা নেই।

পক্ষান্তরে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও শিক্ষার এই প্রত্যক্ষ প্রভাবে ভারতে রেনেসাঁ বা নবজাগরণ ঘটে । পাশ্চাত্য শিক্ষার সংস্পর্শে এসে ভারতীয়রা পাশ্চাত্য জ্ঞান, বিজ্ঞান, শিক্ষা, সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত হয় । এর অন্যতম ফলশ্রুতিতে ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয় । পাশ্চাত্য শিক্ষার আলোকে আলোকিত হয়ে এই মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় ইউরোপীয় সমাজ, রাজনীতি ও জাতীয়তাবাদী ধ্যানধারণার সঙ্গে পরিচিত হন এবং নিজেরাও জাতীয়তাবোধে উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠেন । পাশ্চাত্য শিক্ষার সূত্রে ভারতীয়রা মিল, রুশো, বেন্থাম, ভলটেয়ার, স্টুয়ার্ট, ম্যাৎসিনি, গ্যারিবল্ডি, কার্লমার্কস প্রভৃতি পাশ্চাত্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদদের প্রগতিশীল চিন্তাধারার সংস্পর্শে এসে তাঁদের উদারনৈতিক ভাবধারার সঙ্গে পরিচিত হন । ফরাসি বিপ্লব, আমেরিকার স্বাধীনতা লাভ, ইটালি ও জার্মানির ঐক্য আন্দোলন, ব্রিটিশ বিরোধী সংগ্রামে আফ্রিকার জাতীয়তাবাদীদের সাফল্য প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনাবলি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ভারতীয়দের গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল । ক্রমশ তাঁদের মধ্যে ইংরেজদের অন্যায়, অবিচার ও বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর স্পৃহা সঞ্চারিত হয় । ফলে ভারতীয়গণ ইংরেজ শাসনের স্বরূপ উপলব্ধি করে একদিকে নানাবিধ ধর্মীয় ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ব্রতী হন, অন্যদিকে জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করেন । এ বিষয়ে পথিকৃৎ হলেন রাজা রামমোহন রায় ।

ভারতীয় সমাজে একটি নীরব বিপ্লব ঘটেছিল। রক্ষণশীল এবং প্রতিক্রিয়াশীল এবং প্রগতিশীল ভারতীয়দের মধ্যে বিরোধের মধ্যে দিয়ে রক্ষণশীলরা পুরাতন ঐতিহ্যবাহী জীবনযাত্রার পক্ষে এবং পশ্চিমী সংস্কৃতির বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন। অন্যদিকে ভারতীয় সমাজের প্রগতিশীল গোষ্ঠীগুলি অস্পৃশ্যতা, অসাম্য, নারীদের পশ্চাৎপদতা, বাল্য বিবাহ, পর্দা প্রথা, নিরক্ষরতা, বহু বিবাহ ও দেবদাসী প্রথা ইত্যাদির মতো বড় বড় সামাজিক ব্যাধি সম্পর্কে মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। আম ভারতীয়দের পশ্চিমের ভাল জিনিস গ্রহণ করতে প্রভাবিত করেন। এরফলে সামাজিক চেতনা বৃদ্ধি পায় এবং মধ্যবিত্তদের বিকাশ ঘটে। তাদের প্রচেষ্টায় অনেকগুলি সামাজিক কুসংস্কার দ্রুত অদৃশ্য হতে থাকে।

পশ্চিমের প্রভাবে ভারতীয় সমাজে নতুন জীবন ও আচরণের সূচনা হয়েছিল। তরুণ প্রজন্ম স্বতন্ত্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করে যা আমাদের সামাজিক বন্ধনকে আলগা করে । যৌথ পরিবারের প্রতিষ্ঠান এবং বর্ণ ব্যবস্থা অসম্ভব ধাক্কা খায়। পাশ্চাত্যের প্রভাব আমাদের সামাজিক কুফলগুলি উপড়ে ফেলতে সাহায্য করেছিল। সামাজিক সংস্কারের অনুপ্রেরণা পশ্চিম থেকে নেওয়া হয়। পশ্চিমী জীবনযাত্রার প্রভাবের কারণে সামাজিক অত্যাচারের বন্ধন থেকে নারীদের মুক্তি সম্ভব হয়েছিল। পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথে ভারতীয়দের যোগাযোগ তাদের

উপলব্ধি করিয়েছিল যে-পশ্চিমের অপূর্ব অগ্রগতির মূলে রয়েছে বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন।তাই সমস্ত সমস্যার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাধ্যমে ভারতীয়রা যৌক্তিকতা ও প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বিচার করতে শেখে।

পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি শিক্ষিত ভারতীয়দের ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান এবং বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে বিজ্ঞানের উন্নত অধ্যয়নের উপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্য প্রভাবিত করেছিল। বৈজ্ঞানিক গবেষণার সাথে সম্পর্কিত বহু উন্নত প্রতিষ্ঠান ভারতের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়। পাশ্চাত্য সংস্কৃতি ভারতীয় মনস্তত্ত্বকে কার্যত প্রশিক্ষণ দিয়েছিল। বাস্তবে কেউ কেউ ভারতের মাটিতে নতুন ইউরোপ গড়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে গিয়েছিল। ভাগ্যক্রমে এই প্রক্রিয়াটি পুনর্জাগরণের বাহিনী [ওরিয়েন্টালিস্ট, রিভাইভালিস্ট] কর্তৃক দ্রুত প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল।

পাশ্চাত্য বিজ্ঞানচর্চার উদ্ভব : পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসারের ফলে আধুনিক জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চার পথ উন্মুক্ত হয়ে পড়ে। ফলে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার এর প্রভাব এযুগে ক্রমশ কমে আসতে থাকে। আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু ছিলেন এই যুগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভারতীয় বিজ্ঞানী।

গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের ধারণার উদ্ভব : ঊনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্য, দর্শন, শিল্প প্রভৃতির চর্চার ফলে ভারতীয়দের মধ্যে গণতন্ত্র ও মানবতাবাদের ধারণার উদ্ভব ঘটে।

জাতীয়তাবাদী চেতনার উন্মেষ : ইংরেজি শিক্ষার মাধ্যমে ভারতবর্ষে শিক্ষিত সমাজের ইউরোপীয় রাজনীতি, সাহিত্য, দর্শন, অর্থনীতির সংস্পর্শে এসে ভারতীয়দের মনে জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটে এবং ভারতীয়দের মধ্যে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও ব্রিটিশ বিরোধী মনোভাব জাগরিত হয়।

আধুনিক ভাবধারার বিস্তার : উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্য ও দর্শন পাঠের প্রভাবে ভারতীয়দের মধ্যে যুক্তিবাদী মানসিকতা গড়ে ওঠে। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয় মানুষজন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনকে পরিশুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর হয়ে ওঠে।

ধর্মসংস্কার আন্দোলন : পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের প্রভাবে প্রবাহিত হয়ে বাংলা তথা ভারতে শুরু হয় বেশ কিছু ধর্মসংস্কার আন্দোলন। আর্যসমাজ, ব্রাহ্মসমাজ ও বিবেকানন্দের নেতৃত্বে এই সময় শুরু হয় ধর্মকে পরিশুদ্ধ করার আন্দোলন।

কুপ্রভাব : ভারতে পাশ্চাত্য শিক্ষাবিস্তারের মধ্যে ছিল (১) ভারতীয় ভাষা ও সংস্কৃতির অবহেলা (২) ভারতীয়দের প্রতি বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি শিক্ষার অবহেলা (৩) অবহেলিত গণশিক্ষা প্রভৃতি।

১১.৫.১৩.৪. সহায়ক গ্রন্থ

১) শরদিন্দু শেখর রায়, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানচর্চা [১৮১৮-৬০], দি এশিয়াটিক সোসাইটি
২) বিনয় ভূষণ রায়, চিকিৎসা বিজ্ঞানের ইতিহাস, সাহিত্যলোক
৩) A.J. Qaisar, Indian Response to European Technology and Culture, OUP

১১.৫.১৩.৫. নমুনা প্রশ্ন

1. Critically investigate the Western influence on Indian Scientific culture
2. Responses of the Indian society towards European Science and Technology

পর্যায়- ৬

BLOCK 6: Science and Indian Nationalism

একক- ১৪, ১৫, ১৬

সূচীপত্র

১১.৬.১৪.১. উদ্দেশ্য
১১.৬.১৪.২. জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার উদ্ভব এবং ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক।
১১.৬.১৫.৩. রাধানাথ শিকদার, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার,প্রমথনাথ বোস, পি সি রায়
১১.৬.১৬.৪. বিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষার ইতিহাস
১১.৬.১০.৫. বিংশ শতকে কারিগরি শিক্ষা সংক্রান্ত কিছু নজির (Case Studies)
১১.৬.১১.৬. বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠানের আত্মপ্রকাশ
১১.৬.১৬.৭. সহায়ক গ্রন্থ
১১.৬.১৬.৬. নমুনা প্রশ্ন

১১.৬.১৪.১. উদ্দেশ্য

বর্তমান পর্যায়ে ছাত্রছাত্রীরা জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার উদ্ভব এবং ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক ও বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের বিষয়ে জানতে পারবে।

১১.৬.১৪.২. জাতীয় বিজ্ঞানচর্চার উদ্ভব এবং ঔপনিবেশিক বিজ্ঞানের সাথে সম্পর্ক

ভারতে ব্রিটিশ শিক্ষাব্যবস্থা মূলত স্থানীয় জন সমাজ থেকে পুর ও প্রশাসনিক চাকরির যোগ্য প্রার্থী তৈরী করার উদ্দেশ্যে চালু হলেও, এর ফলে ভারতীয় ছাত্রদের কাছে বিদেশি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের দরজা খুলে যায়। স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু (১৮৫৮–১৯৩৭), আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায় (১৮৬১-১৯৪৪), সত্যেন্দ্রনাথ বসু (১৮৯৪–১৯৭৪), মেঘনাদ সাহা (১৮৯৩–১৯৫৬), প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ (১৮৯৩–১৯৭২), স্যার চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রামন (১৮৮৮ ১৯৭০), সুব্রহ্মণ্যন চন্দ্রশেখর (১৯১০–১৯৯৫), হোমি জাহাঙ্গীর ভাবা (১৯০৯–১৯৬৬), শ্রীনিবাস রামানুজন (১৮৮৭–১৯২০), উপেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী (১৮৭৩–১৯৪৬), বিক্রম সারাভাই (১৯১৯–১৯৭১), হর গোবিন্দ খোরানা (১৯২২–২০১১), হরিশ চন্দ্র (১৯২৩–১৯৮৩), এবং আবদুস সালাম (১৯২৬-১৯৯৬) হলেন এই সময়ের কিছু উল্লেখযোগ্য কৃতি বিজ্ঞানী। ১৯২৮ সালে সিভি রমন কর্তৃক রমন প্রভাব [Raman Effect] আবিষ্কারের দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে ২৮ ফেব্রুয়ারি জাতীয় বিজ্ঞান দিবস হিসাবে পালিত হয়। ১৯৩০ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেয়েছিলেন যা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের প্রথম নোবেল পুরস্কার ছিল।

ঔপনিবেশিক আমলে স্থানীয় ও ঔপনিবেশিক বিজ্ঞান গবেষণার গভীর আদান-প্রদান ছিল।পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রভাবকে শুধুমাত্র ঔপনিবেশিক সত্তা হিসাবে দেখা হত না বরং ভারতীয় জাতি গঠনে এর উপযোগিতা বিশেষ করে কৃষি ও বাণিজ্যে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের অবদান অনস্বীকার্য ছিল। ভারতীয় বিজ্ঞানীরাও সারা ইউরোপে ছড়িয়ে পড়েন। ভারতের স্বাধীনতার সময় ঔপনিবেশিক যুগে গড়ে ওঠা ভারতীয় বিজ্ঞান সারা বিশ্বে সমাদৃত হতে শুরু করে।ফরাসি জ্যোতির্বিদ, পিয়ের জ্যানসেন ১৮ই আগস্ট ১৮৬৮ সালের সূর্যগ্রহণ

নিরীক্ষা করে হিলিয়াম গ্যাস আবিষ্কার করেন ব্রিটিশ ভারতের মাদ্রাজ রাজ্যের গুন্টুর থেকে। ১৮৯৭ সালে স্যার রোনাল্ড রস প্রথমে সেকেন্দ্রাবাদে ও পরে কলকাতায় গবেষণা করে আবিষ্কার করেন ম্যালেরিয়ার সংক্রমণ মশক-বাহিত।এই কাজের জন্য তিনি নোবেল পুরষ্কার লাভ করেন।

ভারতীয় প্রজাতন্ত্রে উচ্চশিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের বিষয়ে প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু (কার্যকাল: ১৫ অগস্ট, ১৯৪৭ – ২৭ মে, ১৯৬৪)। ১৯৫১ সালে ১৮ অগস্ট পশ্চিমবঙ্গের খড়গপুর ভারতের তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী মৌলানা আবুল কালাম আজাদ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত হয় প্রযুক্তিবিদ্যার প্রসারের লক্ষ্যে গবেষক ও সংগঠকদের একটি ২২ সদস্য দলের ভাবনার ফসল ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি। ১৯৬০-এর দশকের গোড়ার দিকে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সহযোগে ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হয়। এই প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য ছিল ভারতের মহাকাশ কর্মসূচির দ্রুত অগ্রসরণ তথা ভারতের পারমাণবিক শক্তির বৃদ্ধি ঘটানো। এমনকি ১৯৭৪ সালের ১৮ মে পোখরাণে ভারতের প্রথম পারমাণবিক অস্ত্রপরীক্ষার পরেও এই কর্মসূচি অব্যাহত থাকে।

এশিয়ায় গবেষণা ও উন্নয়ন ক্ষেত্রে ভারত ১০% অর্থ খরচ করে থাকে। বিগত পাঁচ বছরে বিজ্ঞান সংক্রান্ত প্রকাশনার পরিমাণ ৪৫% অবধি বৃদ্ধি পেয়েছে। যদিও দেশের প্রাক্তন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রী কপিল সিবালের মতে উন্নত দেশগুলির তুলনায় ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ছে।প্রতি দশ লক্ষ মানুষে ভারতে গবেষকের সংখ্যা ১৪০ জন; অন্যদিকে এই সংখ্যা যুক্তরাষ্ট্রে ৪,৬৫১। ২০০২-০৩ সালে ভারত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৩.৭ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বিনিয়োগ করে। অন্যদিকে চিন এর চারগুণ অর্থ এবং যুক্তরাষ্ট্র ৭৫ গুণ অর্থ বিনিয়োগ করেছিল। তা সত্ত্বেও দেশের পাঁচটি আইআইটি *এশিয়াউইক* পত্রিকার রেটিং অনুসারে এশিয়ার ১০টি সর্বশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের তালিকাভুক্ত হয়। একটি সমীক্ষা অনুযায়ী, ভারতীয় বিজ্ঞান অর্থাভাবে ভোগে না। বরং যা তার ক্ষতিসাধন করে তা হল অপেশাদার অনুশীলন, কালো টাকা আয়ের প্রবণতা, ক্ষমতার অপব্যবহার, হালকা প্রকাশনা ও কাঁচা গবেষণাপত্র, পদোন্নতির ভ্রান্ত নীতি, ম্যানেজমেন্টের দুর্নীতির বিরুদ্ধে মুখ খুললে দাবিয়ে রাখার প্রবণতা, উন্নাসিকতা ও মস্তিষ্ক পাচার। যদিও ভারতীয় বৈজ্ঞানিকদের প্রকাশনা সংখ্যার বৃদ্ধির হার কয়েকটি প্রধান দেশের মধ্যে অত্যন্ত দ্রুত বর্ধনশীল।

বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে, ভারতীয় সমাজ ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য প্রথম আলোড়ন শুরু করেছিল। যদিও তাদের রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষাগুলি স্বশাসনের দাবিতে পরিচালিত হয়েছিল-, অর্থনৈতিক গণ্ডগোলের ফলস্বরূপ হতাশাগুলি কেবল ভারতে তৈরি পণ্য ব্যবহারের প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যয় প্রকাশ করেছিল। স্বদেশী আন্দোলন এর জন্য আরও গতি প্রদান করেছিল :i) বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির বিশেষ উল্লেখ সহ জাতীয় পর্যায়ে এবং জাতীয় নিয়ন্ত্রণে শিক্ষার প্রচার, ii) দেশের শিল্পায়ন। 1904 সালে, ভারতীয়দের বৈজ্ঞানিক ও শিল্প শিক্ষার জন্য অগ্রসর হওয়ার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়েছিল। আপত্তি ছিল বিজ্ঞান ভিত্তিক শিল্প অধ্যয়নের জন্য যোগ্য শিক্ষার্থীদের ইউরোপ, আমেরিকা এবং জাপানে প্রেরণ করা। আগেই বলা হয়েছে যে, ঔপনিবেশিক ভারতে পরিবেশ উচ্চতর গবেষণার পক্ষে অনুকূল ছিল না, গবেষণার চেয়ে বেতন কম ছিল। ভারতীয়দেরই অনুমতি ছিল। অধীনস্থ পদ এবং এমনকি যারা বিদেশে নিজেকে আলাদা করে তুলেছিল তাদেরও একই গ্রেড এবং পদমর্যাদার ইউরোপীয়দের তুলনায় কম বেতন দেওয়া হয়েছিল। বিজ্ঞানের এই 'বর্ণবাদ' ভারতীয়দের তীব্র প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছিল। প্রথম খ্যাতিমান ভারতীয় পদার্থবিজ্ঞানী জে. সি. বোস এই হ্রাসিত বেতনটি তিন বছরের জন্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করেছিলেন। শুধু এটিই নয়, যতক্ষণ পর্যন্ত রয়্যাল সোসাইটি বোসকে স্বীকৃতি দেয় না, কলেজ কর্তৃপক্ষ তাকে কোনও গবেষণা সুবিধা প্রত্যাখ্যান করে এবং তাঁর

কাজকে নিখরচায় ব্যক্তিগত হিসাবে বিবেচনা করে। জে. সি. বোস আরও এক অর্থে নিরপেক্ষ ছিলেন। তিনি অন্তর্দ্বন্দ্বী গবেষণা গ্রহণ মডেম বিজ্ঞানীদের মধ্যে প্রথম একজন। তিনি পদার্থবিজ্ঞানী হিসাবে শুরু করেছিলেন তবে বৈদ্যুতিক প্রতিক্রিয়াগুলির প্রতি তার আগ্রহ তাকে উদ্ভিদ শারীরবিদ্যায় নিয়ে যায়। ব্রিটেনের বৈজ্ঞানিক চেনাশোনাগুলিতে স্থান এবং স্বীকৃতি অর্জনের পক্ষে লড়াই করা কোনও ঔপনিবেশিক সরকারের প্রশাসনিক উদাসীনতার বিরুদ্ধে লড়াই করার চেয়ে কম কঠিন ছিল না। বোস জেদ ধরেন এবং জয়ী হন।

আরেকজন প্রখ্যাত ভারতীয় বিজ্ঞানী, পিসি রায়ও একইভাবে ভোগ করেছিলেন। ১৮৮৮ সালে রসায়নে ডক্টরেট নিয়ে ইংল্যান্ড থেকে ফিরে আসার সময়, তাকে এক বছরের জন্য অয়েন্ডে থাকতে হয়েছিল এবং তাঁকে অস্থায়ী অ্যাকসিস্টিস্ট অধ্যাপক হিসাবে পেশ করা হয়েছিল। সবই তাঁকে প্রাদেশিক চাকরিতে থাকতে হয়েছিল। পি.এন. বোস, পদত্যাগ করতে পছন্দ করেছিলেন, যখন ১৯০৩ সালে তাকে টি-হল্যান্ড তাঁর ভূতাত্ত্বিক জরিপের পরিচালনায় পদ থেকে বরখাস্ত করেছিলেন, যিনি তাঁর থেকে দশ বছরের কনিষ্ঠ ছিলেন। এই সমস্যাগুলি দেশের রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্মে প্রতিফলিত হয়েছিল। তৃতীয় অধিবেশনে (১৮৮৭), ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস প্রযুক্তিগত শিক্ষার প্রশ্নটি নিয়েছিল এবং তার পর থেকে প্রতিবছরই এর উপর প্রস্তাবগুলি পাস করে। । ক. ট. তেলেঙ্গ এবং বি.এন. প্রযুক্তিগত শিক্ষার নামে কীভাবে সরকার নিছক নিম্নতর ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ দিচ্ছিল, তা উল্লেখ করেছিল। ইন্ডিয়ান মেডিকেল সার্ভিসও তীব্র সমালোচিত হয়েছিল। কংগ্রেস সরকারকে বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত পেশা বাড়াতে, মেডিকেল ও বৈজ্ঞানিক কাজে উৎসাহ দেওয়ার জন্য একটি প্রস্তাব পাস করে।

আমরা দেখতে পাই যে, এই যুগের ক্রিয়াকলাপগুলির দুটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। **একটি হল** দেশের প্রায় সমস্ত অভিযাত্রীরা জাপানকে অনুপ্রেরণার একটি প্রধান উৎস বলে মনে করে। এশীয়ার শিল্প শক্তি হিসাবে জাপানের উত্থান এবং ১৯০৪সালে রাশিয়া বিরুদ্ধে সামরিক বিজয় ভারতীয়দের রোমাঞ্চিত করেছিল। **দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য** হল প্রায়শই তারা পুনর্জাগরণমূলক প্রবণতা দেখায়। এটি হতে পারে কারণ দূরবর্তী অতীতটি হারিয়ে যাওয়া স্বর পুনরুদ্ধারের জন্য বা নিজের পরিচয় পুনর্নির্মাণের কাজে আসে। জগদীশ বোস, যেমন কাঞ্চনগ্রাফ এবং শোশনগ্রাফ। অনেক বিজ্ঞান জনপ্রিয়কারীর উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমান করা যে- পশ্চিমী বিজ্ঞানে যা ভাল তা প্রাচীন ভারতেও ছিল। উদাহরণস্বরূপ, ডারউইনের উপর রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদীর আলোচনা । তিনি তাঁর তত্ত্বকে গীতাতে যা লেখা আছে তার সাথে তুলনা করেন। আধুনিক বিজ্ঞানের শিল্প প্রয়োগের জন্য সাংস্কৃতিক প্রতিবন্ধকতাগুলি কাটিয়ে উঠতে ব্যর্থ হন, যা এই প্রচেষ্টার জন্য প্রয়োজনীয় ছিল। তারা যা করার চেষ্টা করেন তা প্রমাণ করার জন্য যে ভারতীয় নীতি ও মূল্যবোধ বিজ্ঞানের মূল্যবোধগুলিকে একত্রিত করে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদের বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের সঠিক বোঝার বিকাশ করা সহজ ছিল না। শিক্ষা এবং সামাজিক জীবনে উভয়ই ঔপনিবেশিক আধিপত্যের কারণে এটি আরও কঠিন হয়ে পড়েছিল। এই প্রচেষ্টাগুলির তবুও, একটি দুর্দান্ত প্রভাব ফেলেছিল।

১৯০৪ সালের বিশ্ববিদ্যালয় আইন ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়গুলিকে কেবল অধিভুক্ত কলেজগুলির পরিবর্তে অধ্যাপনা এবং গবেষণার ব্যবস্থা করার অনুমতি দিয়েছিল, স্যার আশুতোষ কলকাতায় একটি বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয় /কলেজ প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নিয়েছিলেন। বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরা যেমন এস.এন বোস এবং কেকৃষ্ণন সেখানে পড়িয়েছেন। এখান থেকে ওঠে আসা একদল পদার্থবিদ এবং রসায়নবিদ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভ করেছিলেন। বিপরীতে, উচ্চ বেতনভোগী ইউরোপীয়দের দ্বারা নিযুক্ত অনেক সরকারী বৈজ্ঞানিক সংস্থার অবদান কম ছিল। যারা ভারতকে বিশ্বের বৈজ্ঞানিক মানচিত্রে রেখেছিলেন তারা অনেকেই ছিলেন। জে. সি.

বোস দেখিয়েছেন যে প্রাণী এবং উদ্ভিদ টিস্যুগুলি বিভিন্ন ধরণের উদ্দীপনার মধ্যে বৈদ্যুতিন প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করে, যেমন প্রিক্টিং, তাপ ইত্যাদি আমরা তার কাজটি এর আগেও উল্লেখ করেছি। এস রামানুজন, একটি স্বজ্ঞাত গণিত প্রতিভা সংখ্যার তত্ত্বকে অনেক অবদান রেখেছিল। পি.সি. রায় বেশ কয়েকটি বিরল ভারতীয় খনিজ বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস শুরু করেছিলেন, যা দেশীয় রাসায়নিক ও ওষুধ শিল্পের ক্ষেত্রে অগ্রণী ও গতিশীল সংস্থা হিসাবে কাজ করেছে। আলোর ছড়িয়ে পড়া নিয়ে সি. ভি. রমনের গবেষণা ১৯৩০ সালে তাঁর নোবেল জয়ের কারণ হয়। কে.এস .কৃষ্ণন ধাতব বৈদ্যুতিক প্রতিরোধের উপর কাজ করেছিলেন। সত্যেন্দ্রনাথ প্রাথমিক কণাগুলির অধ্যয়নের বিষয়ে আইনস্টাইনের সাথে বোসের সহযোগিতা বাউইনস্টাইন স্ট্যাটিস্টিকস নামে পরিচিত।

অনেকগুলি ইনস্টিটিউট স্থাপন করা হয়েছিল। উদাহরণস্বরূপ, বোস ইনস্টিটিউট -১৯১৭, শীলা ধর ইনস্টিটিউট অফ সোয়েল সায়েন্স -১৯৩৬, বীরবল সাহনি ইনস্টিটিউট অফ পলস্বোটানিজ ইত্যাদি এটি ভারতে বৈজ্ঞানিক কার্যকলাপকে আরও গতি দেয়। বার্ষিক বৈজ্ঞানিক সভার প্রয়োজনীয়তা বরাবরই অনুভূত হয়েছিল, যাতে দেশব্যাপী বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক কর্মী একে অপরের সাথে আরও ঘনিষ্ঠভাবে যোগাযোগে আসতে পারে। এখনও অবধি কেবল স্যানিটারি কনফারেন্স বা কৃষি সম্মেলনের মতো খাঁটি সরকারী ও অনিয়মিত সম্মেলনে এটি সম্ভব হয়েছিল। এইভাবে, ১৯১৪ সালে ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেস অ্যাসোসিয়েশন (আইএসসিএ) আরও দৃঢ় বৈজ্ঞানিক প্রবণতা এবং আরও নিয়মতান্ত্রিক দিকনির্দেশনা দেওয়ার জন্য, দেশের বিভিন্ন অংশে বিজ্ঞান আগ্রহী সমাজ এবং ব্যক্তিদের মিথস্ক্রিয়া প্রচার করতে , খাঁটি এবং প্রয়োগ বিজ্ঞানের কারণগুলির জন্য আরও সাধারণ মনোযোগ পেতে এরপর থেকে লক্ষ্যগুলি খুব বেশি পরিবর্তন হয়নি এবং আইএসসিএ এখন বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমস্ত শাখার প্রতিনিধিত্বকারী ভারতীয় বিজ্ঞানী এবং প্রযুক্তিবিদদের বৃহত্তম সংস্থায় পরিণত হয়েছে।

আমরা যদি বিংশ শতাব্দীর প্রথম কোয়ার্টারের ঘটনাগুলি লক্ষ্য করি তবে আমরা দেখতে পাই যে এই সময়টিকে আরও বিকাশের বিষয়ে বিতর্কের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়েছিল। গান্ধীজী যখন কুটির শিল্পের জন্য প্রচার শুরু করেছিলেন, তখন ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের বার্ষিক অধিবেশনটিতে বিভিন্ন নোট শোনা গিয়েছিল। P.C. উদাহরণস্বরূপ, রায়, প্রাথমিক শিক্ষা এবং ঐতিহ্যবাহী শিল্পের মাধ্যমে সাধারণ অগ্রগতি বৈজ্ঞানিক অগ্রগতির জন্য প্রয়োজনীয় পূর্বশর্ত হিসাবে বিবেচনা করেছিলেন। তবে অনেকেই তাঁর সাথে ভালবেসেছেন। M.N. সাহা এবং তার বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি গোষ্ঠী অর্থনৈতিক উন্নয়নের গান্ধীবদ্ধ পথের বিরোধিতা করেছিল এবং বড় শিল্প স্থাপনে সমর্থন করেছিল। রাশিয়ার সমাজতান্ত্রিক পরীক্ষাগুলি অর্থনীতি এবং বস্তুগত অগ্রগতির ক্ষেত্রে মানুষের জন্য বিজ্ঞানের অপার সম্ভাবনা উন্মোচন করেছিল। জাতীয় নেতৃত্ব ভারী শিল্পায়ন ও সমাজতন্ত্রের দিকে ঝুঁকছিল, উভয়ই আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ভিত্তি স্থাপন করেছিল। সাহার উদ্যোগে তৎকালীন কংগ্রেসের সভাপতি সুভাষ চন্দ্র বসু জাতীয় পরিকল্পনা এবং শিল্পায়নকে জওহরলাল গ্রহণ করতে সম্মত হন। নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় পরিকল্পনা কমিটি গঠন করা হয়। এই কমিটি যার মধ্যে বেশিরভাগই প্রযুক্তি, শিল্প, জনস্বাস্থ্য এবং শিক্ষার মতো প্রযুক্তিগত বিষয় নিয়ে কাজ করে।

সাব কমিটি ও টেকনিক্যাল এডুকেশন এমএন সাহার সভাপতিত্বে কাজ করেছেন। অন্য সদস্যরা হলেন বীরবল সাহনী, জে.সি .ঘোস, জে.এন . মুখাজ্জী, এন.আর .ধর, নাজির আহমেদ, এস.এস.ভট্টনগর এবং এ.এইচ.পাণ্ড্য। পুরুষ ও যন্ত্রপাতিগুলির অবকাঠামোগুলি কতটা প্রযুক্তিগত কর্মী নিযুক্ত করার জন্য পর্যাপ্ত ছিল তা জানতে উপকমিটি বিদ্যমান ইনস্টিটিউট-এর কার্যক্রম পর্যালোচনা করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূত্রপাত (১৯৩৯-৪৫) এবং ভারত-ইংল্যান্ডের মধ্যে সরাসরি সমুদ্রপথের ব্যত্যয় ঔপনিবেশিক সরকারকে ভারতে আরও বৃহত্তর

শিল্পক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে সহায়তা করে তোলে। সুতরাং, কেন্দ্রীয় গবেষণা সংস্থা প্রতিষ্ঠা করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করা হয়েছিল এবং এরপরে ১৯৪২ সালে বৈজ্ঞানিক ও শিল্প গবেষণা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা হয়। যুদ্ধোত্তর পুনর্গঠন পরিকল্পনার অংশ হিসাবে, সরকার এ.ভি .কে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। হিল, রয়্যাল সোসাইটির সভাপতি মো। 1944 সালে, তিনি একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছিলেন যা ভারতে গবেষণার মুখোমুখি বিভিন্ন সমস্যা চিহ্নিত করেছিল। এই উন্নয়নগুলি নীতি নির্ধারণ এবং বৈজ্ঞানিক বিষয়গুলি পরিচালনার ক্ষেত্রে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের কাছে আরও বৃহত্তর সুযোগ সরবরাহ করে। প্রকৃতপক্ষে, মুক্ত ভারত এবং সমগ্র জাতীয় পুনর্গঠনের বিজ্ঞানের নীতির উদ্ভব, এই ক্রিয়াকর্মীর সাথে চিহ্নিত।

১১.৬.১৫.৩. রাধানাথ শিকদার, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার, প্রমথনাথ বোস, পি সি রায়

রাধানাথ শিকদার

তিতুরাম শিকদারের বড় ছেলে রাধানাথ জন্মেছিলেন ১৮১৩ খ্রিষ্টাব্দের অক্টোবর মাসে। সঠিক তারিখ জানা যায় না, মায়ের নামও অজানাই থেকে গেছে। জোড়াসাঁকোর শিকদার পাড়ায় ব্রাহ্মণ বংশে রাধানাথের জন্ম। রাধানাথের ছিল এক ভাই ও তিন বোন। ভাই শ্রীনাথ ছিল দু'বছরের ছোট। শিকদারেরা মুসলমান আমলে প্রধান শান্তিরক্ষক হিসাবে কাজ করত। এই কাজ বংশপরম্পরায় করার জন্য তাদের মধ্যে লেখাপড়ার চর্চা অনেক কমে এসেছিল। প্রথমে রাধানাথ গ্রামেরই পাঠশালায় এবং পরে বাঙালী খৃষ্টান কমল বসুর স্কুলে ভর্তি হন।

রাধানাথ এবং ভাই শ্রীনাথ দু'জনেই ছিলেন কৃতী ছাত্র এবং মাসিক ষোল টাকা করে বৃত্তি পেতেন। রাধানাথের কলেজে পড়বার খরচ না লাগলেও তার অভ্যাস ছিল বই কেনা। অন্য জায়গা থেকে বই যোগাড় করলে সেটা বেশিদিন তিনি নিজের কাছে রাখতে পারতেন না। বইয়ের দামও ছিল খুব বেশি এবং এদেশে ছিল দুষ্প্রাপ্য।বই কিনতেই রাধানাথের বৃত্তির টাকা নিঃশেষ হয়ে যেত। সে সময়ে ডেভিড হেয়ার ছিলেন কলেজের অধ্যক্ষ কমিটির সদস্য, গণিত বিষয়ক অনেক বই দিয়ে তিনি রাধানাথকে সাহায্য করেছিলেন। ইংরাজি ভাষায় রাধানাথের ব্যুৎপত্তি ছিল অসাধারণ। ১৮৩০ খ্রিষ্টাব্দের ১৭ই ফেব্রুয়ারি মাত্র সতের বছর বয়সে কলকাতার টাউন হলে সেক্সপীয়ারের 'অ্যাজ ইউ লাইক ইট' নাটক থেকে ওরল্যান্ডোর সংলাপ আবৃত্তি করে প্রশংসা অর্জন করেছিলেন রাধানাথ। কিছু গ্রীক ও ল্যাটিন ভাষাও তিনি শিক্ষা করেছিলেন। গণিতের শিক্ষক জন টাইটলার ছিলেন সংস্কৃত পাগল লোক। তারই উৎসাহে রাধানাথ সংস্কৃত শিক্ষা করেন এবং এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করেছিলেন। তিনি লিখেছেন –"কালেজ ছাড়িয়া আমার ইংরাজি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিবার ইচ্ছা বলবতী হয়। তজ্জন্য সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ করি।" কিন্তু এ কাজ তার আর হয়ে ওঠে নি। কারণ, সাত বছর দশ মাস পড়াশোনা করে পাঠ অসমাপ্ত রেখেই তিনি কলেজ ছেড়ে দেন। যথেষ্ট উৎসাহী হওয়া সত্বেও কলেজ ছাড়ার পিছনে তার পারিবারিক অর্থকষ্টই দায়ী ছিল বলে মনে করা হয় কারণ, তিনি লিখেছেন –"কলেজে একমনে পড়িতে পাইতাম না, একবার পড়ার কথা মনে পড়িত, পরক্ষণেই বাটিতে ফিরিয়া যাইয়া কি খাইব, মা বুঝি এখনও কিছু খান নাই, এই সকল ভাবনা মনে উত্থিত হইয়া পড়ার ব্যাঘাত ঘটিত।" ১৮৩২ খ্রিষ্টাব্দে রাধানাথ পড়াশোনায় ইতি টেনে কাজে যোগদান করেন। তিনি লিখেছেন –"১৮৩২ খৃঃ আমি Great Trigonometrical Survey of India আফিসে কম্পিউটার (Computor) নিযুক্ত হইয়া আরও গণিত সম্বন্ধীয় গ্রন্থ অভ্যাস করি। এক্ষণে (৭ই অক্টোবর ১৮৩২) আমি Surveyor (সারভেয়ার) নিযুক্ত হইয়া Serunge Base line এ [ভুপাল] কার্য্য করিবার নিমিত্ত কলিকাতা

হইতে ১৫ অক্টোবর যাত্রা করিব। এক্ষণে আমার সংস্কৃত পাঠের ব্যাঘাত হইবে বটে, কিন্তু কলিকাতায় ফিরিয়া আসিয়া পুনর্ব্বার সংস্কৃত পড়িতে আরম্ভ করিব।”

উল্লেখ করা যেতে পারে যে রাধানাথ শিকদার এবং রাজনারায়ণ বসাকই ছিলেন প্রথম দুই ভারতীয় যারা নিউটনের প্রিন্সিপিয়া পড়েছিলেন। রাধানাথের গণিতে ব্যুৎপত্তি এবং মৌলিক চিন্তার পরিচয় মেলে যখন ছাত্রাবস্থাতেই তার দু'টি বৃত্তের ওপর স্পর্শক রেখা (tangent) অঙ্কন করার একটি নতুন পদ্ধতি Gleanings in Science (Vol. III, 1831) পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।

ডিরোজিওর (Henry Louis Vivian Derozio) মুক্তমনের দৃষ্টিভঙ্গী এবং ধর্ম ইত্যাদি বিষয়ে প্রচলিত ধ্যান ধারণার রীতি কাটিয়ে উঠে নিজের মতে অবিচল থাকার দৃঢ়তা ও বিদ্রোহী মনোভাব রাধানাথের মনে প্রভাব বিস্তার করেছিল। ডিরোজিও ১৮০৯ সালের ১৮ই এপ্রিল কলকাতাতেই জন্মেছিলেন। মাত্র ১৭ বছর বয়সে হিন্দু কলেজে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে যোগদান করেন। তার দেশপ্রেম ও ছাত্রদের প্রতি গভীর ভালবাসায় একদল ছাত্র-যুবক তার ভক্ত হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যে ছিলেন রামগোপাল ঘোষ, দক্ষিণারঞ্জন মুখোপাধ্যায়, রাধানাথ শিকদার, রসিক কৃষ্ণ মল্লিক, গোবিন্দচন্দ্র বসাক, অমৃত লাল মিত্র, মাধবচন্দ্র মল্লিক, মহেশচন্দ্র ঘোষ, হরচন্দ্র ঘোষ, শিবচন্দ্র দেব, কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, রামতনু লাহিড়ী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ।

রাধানাথ 'গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে' অফিসে ১৮৩১-এর ১৯শে ডিসেম্বর কাজে যোগদান করেন। Great Trigonometrical Survey (G.T.S.) নিয়ে দু'একটি কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। এটি ছিল 'সার্ভে অব ইন্ডিয়া'র অধীনে একটি প্রকল্প। উদ্দেশ্য ছিল কোম্পানির রাজত্বের সীমানা নির্ধারণ করা। প্রশাসনিক, সামরিক ও রাজনৈতিক কারণেই এর প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। ১৮০৬ খ্রিষ্টাব্দে কর্ণেল উইলিয়াম ল্যামটন (William Lambton) ভারতের দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরে নেপাল পর্যন্ত দ্রাঘিমার কিছুটা অংশের জরিপ ও দূরত্ব নির্ধারণের কাজ শুরু করেন। প্রথমে ভাবা হয়েছিল এটি শেষ করতে সময় লাগবে ৫ বছর, পরে সেটা ৬০ বছরে দাঁড়িয়ে যায়। সমস্ত ভারতেই জরিপের কাজ করার জন্য ল্যামটনের একটি প্রস্তাব কোম্পানীর অনুমোদন পেলে জরিপের কাজটিকে সুপ্রিম কোর্টের অধীনে নিয়ে আসা হয় এবং ১৮১৮ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে প্রকল্পটির নাম হয় 'দি গ্রেট ট্রিগোনোমেট্রিক্যাল সার্ভে' (G.T.S.)। জর্জ এভারেস্ট (George Everest) শুরুতে ল্যামটনের অধীনে কাজ করলেও ১৮২৩ সালের ২০শে জানুয়ারি ল্যামটনের আকস্মিক মৃত্যুর পর তিনিই G.T.S.-এর সুপারিনটেনডেন্ট হন। রাত্রিবেলাও একটি বিশেষ ধরণের বাতি জ্বেলে জরিপের কাজ হত। এ কাজের জন্যই এভারেস্টই উঁচু উঁচু টাওয়ার বা মিনার তৈরি করিয়েছিলেন। এরকম বহু মিনার বিভিন্ন জায়গায় আজও চোখে পড়ে। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে ১৮২৫-এর নভেম্বর মাসে এভারেস্ট ইংল্যান্ডে চলে যান। ১৮৩০-এ ফিরে এসে ভারতের সারভেয়র জেনারেল (Surveyor General) নিযুক্ত হন এবং নতুন উদ্যমে G.T.S. এর কাজে লেগে যান।

ভূপৃষ্ঠের একটি অঞ্চলকে পরস্পর সংলগ্ন কতকগুলি ত্রিভুজে ভাগ করে নিয়ে ত্রিভুজগুলির পরিমাপ ও জরিপ করার পর বিভিন্ন অঞ্চলের ভৌগোলিক বৈশিষ্ট, দূরত্ব ইত্যাদি বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ করে একত্রিত করলেই পৃথিবীর মানচিত্র তৈরির প্রাথমিক প্রস্তুতি শেষ করা যায়। এই ত্রিভুজগুলির বাহুর দৈর্ঘ অনেক বেশি হওয়ায় ভূপৃষ্ঠের বক্রতার জন্য ত্রিভুজের বাহুগুলি সরল রেখা হয় না। এ সংক্রান্ত মাপজোকের জন্য স্কুলের নিম্ন শ্রেণির জ্যামিতির জ্ঞান যথেষ্ট নয়। এর জন্য প্রয়োজন 'স্ফেরিক্যাল ট্রিগোনোমেট্রি' (spherical trigonometry)। পৃথিবীর কেন্দ্র দিয়ে যায় এমন একটি তল (plane) দিয়ে যদি পৃথিবীকে দু'ভাগ করে ফেলা যায়, তবে পৃথিবীর উপরিভাগে যে বৃত্তটি তৈরি হয় সেটাকে বলে গ্রেট সার্কেল (great circle)। এই

বৃত্তের একটি অংশকে গ্রেট আর্ক (great arc) বলে। প্রযুক্তির যে বিষয়টি দিয়ে এই পরিমাপ বা জরিপ করা হয় তাকে বলে জিওডেসি (Geodesy)।

এভারেস্ট দেখলেন এই কাজের জন্য প্রয়োজন একদল লোকের, যাদের পদার্থবিদ্যা ও গণিতে পারদর্শিতা রয়েছে। তিনি উচ্চশিক্ষার পীঠস্থান হিন্দু কলেজের (পরে প্রেসিডেন্সি কলেজ) শরণাপন্ন হলেন। গণিতের শিক্ষক জন টাইটলার রাধানাথের নাম পাঠিয়ে দেন। ১৮৩১ সালের শেষদিকে এভারেস্ট আট জন বাঙালী ছাত্রকে কম্প্যুটার হিসাবে নিয়োগ করেন। প্রাথমিক বেতন ছিল মাসে ৪০ টাকা। কিছু পরে ১৯শে ডিসেম্বর রাধানাথ কাজে যোগ দেন। অল্পকালের মধ্যেই দেখা গেল যে রাধানাথের গণিতের জ্ঞান অনেক উচ্চ মানের। তাকে G.T.S.-এর সাব-অ্যাসিস্ট্যান্ট পদে নিয়োগ করা হয়। অবশ্য এই আটজনের মধ্যে রাধানাথ ছাড়া আর কেউই G.T.S.-এ শেষ পর্যন্ত টিকে থাকেন নি।

জি. টি. এস.-এ দুটি বিভাগ ছিল; একটি জরিপ বিভাগ ও অন্যটি গণনা বিভাগ। জরিপ বিভাগের কর্মীরা তাদের পর্যবেক্ষণ ও তথ্য গণনা বিভাগে পাঠালে সেখানে সেসব তথ্য নির্ভুল কিনা সেটা খতিয়ে দেখা হত। এভারেস্ট রাধানাথের গণিতের জ্ঞান যথেষ্ট উঁচু মানের বলেই মনে করতেন। এভারেস্টের কাছে রাধানাথ জরিপের বেশ কিছু তত্ত্ব ও প্রযুক্তির কাজ শিখে নেন। সাধারণ চেন কাজে লাগিয়ে জরিপের কাজ করলে, লব্ধ দূরত্বের শুদ্ধতা ও সঠিকতা বজায় রাখার জন্য কয়েকটি সংশোধন করার প্রয়োজন হয়। এর মধ্যে একটি হল বিভিন্ন ঋতুতে তাপমাত্রার হ্রাস বৃদ্ধির সঙ্গে লোহার চেনের দৈর্ঘের পরিবর্তনজনিত সংশোধন। এটি দূর করার জন্য যে উন্নত পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়েছিল, সেটি ছিল 'কোলবি বার' (Colby Bar) বা 'কম্পেনসেটিং বার সিস্টেম' (Compensating Bar System)। এই পদ্ধতিতে চেনটি সম্পূর্ণ লোহা দিয়ে তৈরি না করে লোহা ও পিতলের সংযুক্ত পাত দিয়ে তৈরি হয়। তাপমাত্রার পরিবর্তনের সঙ্গে একটি ধাতুর প্রসারণ অন্যটির সঙ্কোচনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাওয়ায় তাপমাত্রা জনিত সংশোধনের প্রয়োজন হয় না। এভারেস্ট ইংল্যান্ডে থাকার সময়েই এই পদ্ধতি আয়ত্ত করে নেন। আয়ারল্যান্ডে এই পদ্ধতি সাফল্যের সঙ্গে ব্যবহৃত হবার পর তিনি ঠিক করেন ভারতে ফিরে তিনি এই পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে জরিপ করবেন। ১৮৩১ সালে একটি নতুন কমপ্যুটিং বিভাগ খোলা হয় ; ডি. পেনিং (de Penning) ছিলেন সেখানে চিফ কম্পিউটার। সে বছরেই এভারেস্টের নেতৃত্বে ব্যারাকপুর ট্রাঙ্ক রোডের উপর দুটি মিনারের দূরত্ব পরিমাপের মধ্য দিয়েই কোলবি বার পদ্ধতির সার্থক প্রয়োগ ঘটে, রাধানাথও এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। নতুন পদ্ধতিটি তিনি ভালই রপ্ত করে নিয়েছিলেন।

এভারেস্ট রাধানাথের নিষ্ঠা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা ও কর্মকুশলতা সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা পোষণ করতেন। এভারেস্টের মুখ থেকে কারো প্রশংসা খুব কমই শোনা যেত, কিন্তু রাধানাথ ছিলেন ব্যতিক্রম। ১৮৩৮ সালে তিনি রাধানাথ সম্বন্ধে বলেছিলেন ভারতে এদেশের বা ইউরোপের এমন কেউ নেই যিনি রাধানাথের সঙ্গে তুলনীয়। গণিত বিষয়ে তার সমকক্ষ এদেশে কেউ নেই, এমন কি ইউরোপেও খুব কমই আছে। রাধানাথের উপর এভারেস্ট এতটাই নির্ভর করতেন যে বাবার সঙ্গে দেখা করার জন্য রাধানাথকে ছুটি দিতেও তার ইচ্ছা ছিল না; বরং এভারেস্ট চাইতেন তার বাবাই এসে যেন রাধানাথের সঙ্গে দেখা করেন। এ প্রসঙ্গে ১৮৪১ সালের ৩রা জুলাই দেরাদুন থেকে রাধানাথের বাবা তিতুরামকে লেখা এভারেস্টের একটি চিঠি ছিল –"I wish I could have persuaded you to come to Dehra Dun for not only it would have given me the greatest pleasure to show you personally how much I honour you for having such a son as Radhanath, but you yourself have, I am sure, been infinitely gratified at witnessing the high esteem in which he is held by his superiors and equals."

রাধানাথের সাহায্য নিয়ে এভারেস্ট হায়দ্রাবাদের বিদর থেকে মুসৌরির ব্যানোগ পর্যন্ত প্রায় ৮৭০ মাইল দূরত্বের গ্রেট আর্কটি জরিপ করে ফেলেন। এই কাজটি সম্বন্ধে হেনরী লরেন্সের অভিমত হল – “a measurement exceeding all others as much in accuracy as in length.” সি. আর. মার্কহ্যামের (C. R. Markham) মতে – “one of the most stupendous works in the whole history of science.” এসব মন্তব্যের মধ্যে অতিশয়োক্তি নেই, কারণ দেশের তৎকালীন অবস্থায় এধরণের জরিপের কাজে অমানুষিক পরিশ্রম করতে হত। রাধানাথ যে শুধু গণিত ও পদার্থবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন তাই নয়, তিনি ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী এবং তার শারীরিক শক্তি ছিল অসাধারণ। এই জরিপের কাজ সম্বন্ধে ‘আর্য্যদর্শন’ পত্রিকা লিখেছে – “...... যখন রাধানাথ এই বিভাগে প্রবিষ্ট হন তখন জরিপ করিবার অনেক প্রথা অনাবিষ্কৃত ছিল। দেশের অবস্থাও অতি অল্পই জানা ছিল। যে যে কারণে গণনা ভুল হইত সে সকলও অজ্ঞাত ছিল। সে আমলে জরিপ করিতে যে কত কষ্ট সহ্য করিতে হইত তাহা কর্ণেল এভারেষ্টের সুবৃহৎ গ্রন্থে বিশেষ করিয়া লেখা আছে। বরফ, হিম, জল, কাদা, বৃষ্টি ভোগ করিয়াও রাত্রি জাগরণ করিয়া প্রফুল্ল চিত্তে কয়জন লোক কাজ করিতে পারে!”

অকৃতদার রাধানাথের ধ্যান জ্ঞানই ছিল তার আরব্ধ কাজ। হয় ত সেজন্যই “রাধানাথই প্রথম বাঙালী যিনি সার্ভে বিভাগে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার পেন্সন গ্রহণের পর আর কোন দেশীয় লোক ইহার কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন নাই।” ১৮৪৩ সালের ডিসেম্বর মাসে জর্জ এভারেষ্ট তার মূল্যবান গ্রন্থ “An account of the measurement of two sections of the meridional arc of India” শেষ করে অবসর নিয়ে দেশে ফিরে যান। ১৮৪৭ সালে তার সে বইটি প্রকাশিত হলে তিনি রাধানাথের কাজের স্বীকৃতি স্বরূপ বইটির এক কপি তাকে পাঠিয়ে দেন, তাতে স্বহস্তে লেখা – “ Babu Radhanath .... in acknowledgement of his active participation in the survey.” জর্জ এভারেষ্ট তখন পৃথিবীতে জরিপের কাজে পয়লা নম্বর প্রযুক্তিবিদ ও বৈজ্ঞানিক বলে স্বীকৃত। তার কাছ থেকে এরকম সম্মান লাভ রাধানাথের কাজের উৎকর্ষ ও অবদানকেই তুলে ধরে।

জর্জ এভারেষ্টের পর সারভেয়ার জেনারেল (Surveyor General) হয়ে আসেন অ্যান্ড্রু ওয়া (Andrew Waugh)। তিনিও রাধানাথের গণিতের জ্ঞান ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা করতেন। ১৮৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল বৃটিশ পার্লামেন্টে ভারতের জি. টি. এস. সম্বন্ধে রিপোর্ট পেশ করার সময় অ্যান্ড্রু ওয়া সাধারণভাবে ভারতীয়দের কাজের কথা তুলে ধরলেও বিশেষ উল্লেখ করেছেন ‘ব্রাহ্মণ বংশীয় নেটিব বাবু রাধানাথ শিকদারের, গণিতে যার জ্ঞান উচ্চ মার্গের।’ ১৯৫১ সালেই রাধানাথকে চিফ কম্পুটার (Chief Computer) পদে উন্নীত করা হয়।

অ্যান্ড্রু ওয়া রাধানাথকে বললেন পূর্ব ভারতের হিমালয়ের চূড়াগুলির দিকে নজর দিতে। হিমালয়ের ৭৯ টি শৃঙ্গের অবস্থান নির্দিষ্ট করা গিয়েছিল, তার মধ্যে ৩১ টির নামকরণও হয়েছিল। বাকি শৃঙ্গগুলি এক একটি সংখ্যা দিয়ে পরিচিত হত। জে. ও. নিকলসন (J. O. Nicholson) জরিপের সময় ১৫ নম্বর চূড়াটি চিহ্নিত করেছিলেন। তার প্রাপ্ত তথ্য কাজে লাগিয়ে জন হেনেসি (John Henesy) চূড়াটির উচ্চতা বের করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সফল হন নি। রাধানাথ এবার এই কাজে হাত লাগালেন। দেড়শ’ মাইল দূর থেকে ছয়টি বিভিন্ন অবস্থান থেকে থিওডোলাইটের (theodolite) সাহায্যে পরিমাপ সংগ্রহ করে গণিতের জটিল পদ্ধতি কাজে লাগিয়ে অবশেষে তিনি শৃঙ্গটির উচ্চতা নির্ণয়ে সফল হন। অন্যান্য সংগৃহীত তথ্যের সঙ্গে তুলনা করে তিনি নিশ্চিত হন যে এটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ। কথিত আছে ১৮৫২ সালে একদিন দেরাদুনের অফিসে অ্যান্ড্রু ওয়ার ঘরে ঝড়ের মত ঢুকে রাধানাথ বলেন “স্যার, আমি হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবিষ্কার করেছি।” পনেরো

নম্বর চূড়াটি চিহ্নিত করে সেটির উচ্চতা বের করার ক্ষেত্রে নিকলসন, হেনেসি ও রাধানাথ – এই তিন জনের ভূমিকা থাকলেও রাধানাথের কৃতিত্বই সর্বাধিক, কারণ তিনিই শৃঙ্গটির উচ্চতা সঠিক ভাবে নির্ধারণ করে এটিই যে পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ সেই সিদ্ধান্তে এসেছিলেন। তবে এ নিয়ে মতভেদ এখনও দূর হয় নি, কারণ রাধানাথের নিজের হাতে গণনা সংক্রান্ত কাগজপত্রের খোঁজ এখনও পাওয়া যায় নি। রাধানাথের পরিমাপ করা উচ্চতার মান বেরিয়েছিল ২৯০০০ ফুট কিন্তু পাছে সংখ্যাটির বিন্যাস দেখে লোকের সন্দেহ হয় যে এটা একটা আনুমানিক সিদ্ধান্ত, তাই এটির মান পরিবর্তন করে করা হয় ২৯০০২ ফুট। ১৮৫৫ সালে অন্য একটি জরিপের দল একই পদ্ধতি অবলম্বন করে চুড়াটির উচ্চতা নির্ণয় করেছিল এবং সেটা বেরিয়েছিল ২৯০২৯ ফুট।

১৫ নং চুড়াটির উচ্চতা পরিমাপ করতে গিয়ে রাধানাথের সব চেয়ে বড় অবদান ছিল বায়ুমন্ডলে আলোর প্রতিসরণের (refraction) জন্য প্রয়োজনীয় সংশোধন নির্ণয় করা। বায়ুমণ্ডলে উচ্চতার সঙ্গে বাতাসের ঘনত্ব বদলে যাওয়ায় আলোর গতিপথ সরলরেখা না হয়ে বেঁকে যায়। এই কারণে, থিওডোলাইট দিয়ে মাপার সময় উচ্চতা যা বেরোয় প্রকৃত উচ্চতা সেটা নয়, আলোর প্রতিসরণের জন্য সংশোধন কাজে লাগিয়ে সঠিক উচ্চতা পরিমাপ করাটাই রাধানাথের মূল কৃতিত্ব। রাধানাথ তার রিপোর্ট পেশ করার পরেও কিন্তু পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ আবিষ্কারের খবর প্রকাশিত হয় নি। হয়ত খোঁজ খবর নেওয়া হচ্ছিল সত্যি এটাই সব চেয়ে উঁচু কি না, নাকি এর চেয়েও উঁচু শৃঙ্গ কোথাও রয়েছে। যাই হোক, এ সম্বন্ধে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা হয় ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে। অবশ্য সেখানে রাধানাথের কোন উল্লেখ ছিল না। স্বনামধন্য বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা 'Progress of Physics in Past Twenty-five Years'-এ লিখেছেন –"১৮৫৪ সালে ট্রিগোনোমেট্রিক সার্ভের মুখ্য গণক ও বিশিষ্ট গণিতবিদ রাধানাথ শিকদার হিমালয়ের একটি লুকিয়ে থাকা শৃঙ্গকে নির্দিষ্ট করে, কয়েক বছর আগে পরিমাপ করা তথ্যের গাণিতিক বিশ্লেষণের দ্বারা দেখিয়েছেন যে এটিই পৃথিবীর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ।"

সর্বোচ্চ শৃঙ্গ তো নির্দিষ্ট হল, কিন্তু নামকরণ কি হবে? জর্জ এভারেস্ট একটি নিয়ম করেছিলেন যে নতুন কোন শৃঙ্গ তার স্থানীয় নামেই পরিচিত হবে, এভাবেই হয়েছে কাঞ্চনজঙ্ঘা, নন্দাদেবী ইত্যাদি নাম। কিন্তু ১৫ নং শৃঙ্গটির একটি অসুবিধা হল এটি নেপাল ও তিব্বতের মাঝে অবস্থিত। এই দুই দেশে শৃঙ্গটির আলাদা আলাদা নাম রয়েছে, কোন একটি জায়গার নাম বেছে নিলে অন্য দেশ ক্ষুব্ধ হতে পারে। দেখে শুনে কর্ণেল ওয়া রয়্যাল জিওগ্রাফিক সোসাইটিকে একটি চিঠি লিখে ১৫ নং শৃঙ্গটির নাম জর্জ এভারেস্টের নামে মাউন্ট এভারেস্ট করার প্রস্তাব পাঠালেন। প্রস্তাবটি গৃহীত হল এবং সর্বোচ্চ শৃঙ্গের নাম হয়ে গেল মাউন্ট এভারেস্ট। শৃঙ্গটির উচ্চতা নির্ণয়ে এভারেস্টের কোন ভূমিকাই ছিল না অথচ তার নামেই নামকরণ হ'ল , রাধানাথ উপেক্ষিতই রয়ে গেলেন।

রাধানাথ শুধু যে জরিপের কাজই করেছেন তা নয়। ১৯২৯ সালে কলকাতার পার্ক স্ট্রীটে সার্ভে অফিস চত্তরেই জর্জ এভারেস্ট একটি পরিকাঠামো সহ আবহাওয়া অফিস খুলেছিলেন। ব্যবসাবাণিজ্যের সুবিধার জন্যই এটির প্রয়োজনীয়তা ছিল। এই অফিসের প্রধান ছিলেন ভি. এন. রীস (V. N. Rees)। তার অবসর গ্রহণের পরে ১৮৫২ সালে রাধানাথ সেই পদে নিযুক্ত হন। একই সঙ্গে তিনি চিফ কম্প্যুটার হিসাবে সার্ভের কাজ এবং সুপারিনটেনডেন্ট পদে আবহাওয়া অফিসের কাজ সামলাতেন। ভার নিয়েই রাধানাথ এই বিভাগটি আধুনিক ভাবে গড়ে তোলার কাজে মন দেন। ১৮৫২ সালেই তিনি দৈনিক আবহাওয়ার পূর্বাভাস প্রকাশ করার ব্যবস্থা করেন। ১৮৫৩ সাল থেকে আবহাওয়া সংক্রান্ত তথ্য নিয়মিত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। জাহাজ চলাচলের ক্ষেত্রে এসবের একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। তবে রাধানাথের সব চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান ছিল বায়ুর চাপ নির্ণয়ে ব্যারোমিটার রিডিং নেবার সঠিক পদ্ধতির উদ্ভাবন। তাপমাত্রার ওঠা নামার সঙ্গে ব্যারোমিটারের সঙ্গে যে

পিতলের স্কেলটি থাকে সেটির দৈর্ঘের পরিবর্তন এবং সেই সঙ্গে ব্যারোমিটারের ভেতরের পারদের সঙ্কোচন-প্রসারণের জন্য আপাত ভাবে যে রিডিং পাওয়া যায় সেটির যথাযথ সংশোধন না করলে গৃহীত মানের শুদ্ধতা বজায় থাকবে না। রাধানাথ এই সংশোধনের জন্য একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন। এ ধরণের তালিকা বিদেশে ছিল, কিন্তু রাধানাথ তার নিজের মত করে এটি প্রস্তুত করেছিলেন। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ তার এই উদ্ভাবনী ক্ষমতার বরাবরই প্রশংসা করতেন।

রাধানাথের গণিত ও পদার্থবিদ্যার জ্ঞান এবং তার উদ্ভাবনী শক্তি ও অসাধারণ কর্মক্ষমতাকে সার্ভে অফিসের সহকর্মীরা এবং ইংরেজ কর্তৃপক্ষ প্রশংসা ও শ্রদ্ধার দৃষ্টিতেই দেখেছেন। ১৮৫১ সালের ১৫ই এপ্রিল বৃটিশ পার্লামেন্টে জি. টি. এস. সম্বন্ধে যে রিপোর্ট পেশ করা হয় তাতে অন্যান্য কর্মীদের মধ্যে রাধানাথকে বিশেষ ভাবে স্বীকৃতি জানানো হয় – “... Among them may be mentioned as most conspicuous for ability, Babu Radhanath Sikdar, a native of India of Brahminical extraction whose mathematical attainments are of the highest order.” জর্জ এভারেস্ট রাধানাথের প্রশংসা করে তার বাবাকে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। অ্যান্ড্রু ওয়াও রাধানাথের কাজের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন। রাধানাথের গণিতের জ্ঞান ও অন্যান্য অবদানের স্বীকৃতি দিয়ে জার্মানীর ব্যাভেরিয়ান শাখার বিখ্যাত ‘ফিলোসফিক্যাস সোসাইটি’ (Philosophical Society) তাকে তাদের সদস্য নির্বাচিত করেন। এদেশীয়দের মধ্যে তিনিই প্রথম এই সম্মান লাভ করেন।

এসব তথ্য হয় ত পুরনো নথিপত্র ঘাঁটলে এখনও পাওয়া যাবে, কিন্তু এসব কে মনে রাখে ? সর্বোচ্চ শৃঙ্গটির নামকরণের সময়ে রাধানাথ উপেক্ষিত রইলেন কেন ? এভারেস্টের সঙ্গেও তো তার নামটি যুক্ত করা যেত। এটাই হল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সরকারের মানসিকতা। কোন আবিষ্কারের সঙ্গে এদেশের কারো নাম জড়িয়ে রাখা বা কোন বিভাগের সর্বোচ্চ পদে এদেশের কাউকে নিয়োগ করতে তাদের অনাগ্রহ ও অনীহা ছিল অপরিসীম। পরোক্ষ ভাবে এর উল্লেখ পাওয়া যায়। যেমন সিডনি জেরাল্ড বুরার্ড (Sidney Gerald Burrard), যিনি ১৯১১ থেকে ১৯১৯ পর্যন্ত ভারতের সার্ভেয়ার জেনেরাল ছিলেন, তিনি তার একটি প্রবন্ধে উল্লেখ করেছেন –“About 1852 the chief computer of the office at Calcutta informed Sir Andrew Waugh that a peak designated XV had been found to be higher than any other hitherto measured in the World. The peak was discovered by the computers to have been observed from six different stations; on no occasion had the observer suspected that he was viewing through the telescope the highest point of the earth”. এখানে কিন্তু রাধানাথের নাম উল্লেখ করা হ’ল না। পরোক্ষ ভাবে বলা হয়েছে ‘the chief computer of the office at Calcutta’, তবু সোজাসুজি রাধানাথের নাম নেই, তবে যাকে বলেছিলেন সেই অ্যান্ড্রু ওয়ার নাম কিন্তু রয়েছে।

নাম মুছে ফেলার চেষ্টার এখানেই শেষ নয়। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে ‘ম্যানুয়াল অফ সারভেয়িং’ (Manual of Surveying) নামে একটি বই প্রকাশিত হয়। বইটি ছিল সারভেয়িং-এর কাজে অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এই বইটির বিজ্ঞান সংক্রান্ত অংশটি রাধানাথের লেখা। বইটি পাঁচটি অংশে বিভক্ত ছিল। বইটির সূচনায় লেখা হয়েছিল – “In Parts III (Surveying) and V, the computers have been largely assisted by Babu Radhanath Sikdar, distinguished head of the computing department of the GTSI. The Chapters 15, 17 up to 21 inclusive of Part III, and the whole of Part V are entirely by his own. Besides he compiled a set of auxiliary tables for the surveying department

which were found to be greatly useful.” বোঝাই যায় বইটি রচনায় মূল কৃতিত্ব রাধানাথের, সেটি স্বীকারও করা হয়েছে। বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৫ সালে, সেখানেও সূচনা অংশটি অপরিবর্তিতই থেকেছে; কিন্তু রাধানাথের মৃত্যুর পরে যে তৃতীয় সংস্করণটি বেরোয়, তাতে রাধানাথের নামের কোন উল্লেখ নেই। এই অনুল্লেখ নিশ্চয়ই অনিচ্ছাকৃত নয়। তবে ইংরেজদের মধ্যেও রাধানাথের গুণগ্রাহী অনেকেই ছিলেন, তারা কিন্তু এই পক্ষপাতিত্ব মেনে নিতে পারেন নি। জি. টি. এস.-এর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট লেফটেন্যান্ট কর্ণেল ম্যাকডোনাল্ড (Lieutenant Colonel Macdonald) দৈনিক ফ্রেন্ড অফ ইন্ডিয়া পত্রিকার ১৭ই ও ২৪শে জুন সংখ্যায় তৎকালীন সারভেয়ার জেনারেল এইচ. এল. থুইলিয়ারের (H. L. Thuillier) কঠোর সমালোচনা করেন। এতে ফল হ'ল বিপরীত। রাধানাথের নাম অন্তর্ভুক্ত হবার বদলে ম্যাকডোনাল্ডের উপরেই শাস্তির খাঁড়া নেমে আসে। তার পদের অবনতি ঘটিয়ে তাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর ডেপুটি সুপারিনটেনডেন্ট নিযুক্ত করা হয়। রাধানাথ অবশ্য তখন আর ইহজগতে নেই। অবশ্য আমরাই বা তেমন আর কি করেছি! তার শেষ বাসস্থান চন্দননগরের একটি ছোট রাস্তা তার নামে চিহ্নিত হয়েছে। ভারত সরকার ২০০৪ সালের ২৭শে জুন তার স্মরণে একটি ডাক টিকিট প্রকাশ করেছেন এবং সম্প্রতি কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারে তার নামাঙ্কিত একটি ফলক স্থাপিত হয়েছে।

তথ্যসূত্র

১। দ্বি-শতবর্ষে রাধানাথ শিকদার – আশীষ লাহিড়ি।
২। আর্য্যদর্শন পত্রিকা (১২৯১ বঙ্গাব্দ)।
৩। Himalayan Journal 33 (1975)।
৪। Radhanath Shikodar-First Scientist of Modern India – Utpal Mukhopadhyay.

Mahendralal Sarkar

উনিশ শতকে আত্মানুসন্ধান প্রিয় যুক্তিবাদী এবং বিজ্ঞানমনস্ক বাঙালীর শীর্ষস্থানীয় প্রতিনিধি ছিলেন ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার। কলকাতা মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় M.D ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার প্রথম ভারতবাসীর জন্য একটি জাতীয় বিজ্ঞানচর্চা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন,যার নাম-ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দ্য কালটিভেশন অব সায়েন্স(IACS)।এদেশে গণমুখী বিজ্ঞানচর্চা শুরু হয়েছিল ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকারের হাত ধরে। সময়ের হিসাবে ১৮৬০-এর দশক। ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞান তখনও বেশ অনগ্রসর। গবেষকও তেমন বিশেষ নেই বললেই চলে। অথচ সারা বিশ্বে তখন পরীক্ষানির্ভর আধুনিক বিজ্ঞান অনেক এগিয়ে। আর উন্নত বিশ্বে গবেষণার জন্য, বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের জন্য তো রয়েছে অনেক বড় বড় নামকরা খ্যাত-বিখ্যাত অসংখ্য সংগঠন, গবেষণাগার। বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের কোনো খ্যাত-অখ্যাত প্রতিষ্ঠানই নেই কেবলমাত্র ভারতীয় উপমহাদেশে। নেই কোনো গবেষণা প্রতিষ্ঠান, নেই বিজ্ঞান শিক্ষার তেমন ভালো কোনো ব্যবস্থা। আর এই যে নেই এর অভাব তা বোধ করি সব থেকে বেশিই অনুভব করেছিলেন একজন বাঙালি চিকিৎসাবিদ। মহেন্দ্রলাল সরকার নাম তার। শুধু যে অভাব বোধ করেছেন এমনটাও নয়, তার সাথে বিজ্ঞানীদের জন্য গবেষণারের কোনো রকম একটি ব্যবস্থা, একটি বিজ্ঞান সংগঠন; একটি দেশের, সমাজের বিজ্ঞান এবং বিজ্ঞানীদের জন্য যে কতটা বেশি প্রয়োজনীয় তা আর একটু বেশিই অনুভব করতে পেরেছিলেন। আর এই প্রয়োজনের তাগিদেই ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন এমন একটি বিজ্ঞান সংগঠন প্রতিষ্ঠার জন্য। উদ্দেশ্য একটাই এই

সংগঠনের মাধ্যমে একদল ভারতীয় বিজ্ঞানীর সৃষ্টি হবে। তৈরি হবে বড় বড় সব নামকরা গবেষক। এখানে তারা নানান প্রকার গবেষণা করবেন, আবিস্কার করবেন। সকল প্রকার কূপমণ্ডুকতার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের মাধ্যমে লড়াই করবেন। উন্নত, আধুনিক এবং বিজ্ঞানভিত্তিক সমাজ উপহার দেবেন পুরো মানবজাতিকে। আর সেই স্বপ্ন নিয়ে ছুটতে থাকলেন দুর্নিবার।

ভারতীয়দের অর্থায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত এবং গবেষণাসহ একটি স্বায়ত্তশাসিত সমিতি প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করলেন সাদা চামড়াওয়ালা ব্রিটিশ শাষকদের কাছে। কিন্তু ব্রিটিশ সরকার সম্পূর্ণ নীরব ভূমিকা পালন করে গেলেন। তারা এদেশে এসেছেন শাসন আর শোষন করতে। তারা তাই করবেন। এদেশের বিজ্ঞান এগুলো কি পড়ে থাকল তাতে তাদের কি ই বা আসে যায়। পরবর্তীতে মহেন্দ্রলাল সরকার সরকারের মুখ আর না চেয়ে দেশীয় শিক্ষাবিদ, বুদ্ধিজীবী, বিজ্ঞানে আগ্রহীদের সহায়তা নিয়ে নিজেই প্রতিষ্ঠা করলেন **'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কালটিভেশন অব সায়েন্স'**। প্রতিষ্ঠাকালীন দপ্তর করা হয় কলকাতার ২১০ বৌ বাজার স্ট্রিটে। তার প্রতিষ্ঠিত এই *ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স*-ই হলো ভারতীয় উপমহাদেশে বিজ্ঞানীদের জন্য প্রথম বিজ্ঞান সমিতি। যার কৃতিত্বস্বরুপ মহেন্দ্রলাল সরকার উপমহাদেশে বিজ্ঞানের জনক বলে খ্যাত হয়েছেন। মহেন্দ্রলাল সরকার এবং তার '*ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর দি কাল্টিভেশন অব সায়েন্স*' সম্পর্কে আর এক মহারথী বিজ্ঞানী প্রফুল্ল চন্দ্র রায় তার আত্মচরিত প্রবন্ধে বলেছিলেন,

"এদেশের কলেজ সমাহে রসায়ন শাস্ত্রের আদর তখনও হয় নাই। একমাত্র প্রেসিডেন্সি কলেজে নিয়মিত ভাবে রসায়ন শাস্ত্রের অধ্যাপনা হইত। লেবরেটরিতে 'এক্সপেরিমেন্ট' (পরীক্ষা) করা হইত। বেসরকারী কলেজের সংখ্যা খুব কম ছিল। এবং তাহাদের তেমন সঙ্গতি না থাকাতে বিজ্ঞান বিভাগ তাহারা খুলিতে পারে নাই। কিন্তু এই সকল কলেজের ছাত্রেরা নামমাত্র "ফি" দিয়া প্রেসিডেন্সি কলেজে বিজ্ঞানের ক্লাসে অধ্যাপকের বক্তৃতা শুনিতে পারিত। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার তাঁহার কতৃক ১৮৭৬ খৃঃ প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Science পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন শাস্ত্রে বক্তৃতার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন এবং সাধারণে ইহাতে নামমাত্র ফি দিয়া যোগ দিতে পারিত। আমার স্মরণ হয়, ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার গভর্ণমেণ্টের নিকট এই মর্মে পত্র লিখেন যে প্রেসিডেন্সি কলেজের বিজ্ঞানের ক্লাশে বেসরকারী কলেজের ছাত্রদের যোগদানের যে ব্যবস্থা আছে তাহা বন্ধ করিয়া দেওয়া হউক নতুবা বিজ্ঞান সমিতির বক্তৃতা-গৃহ শূন্য পড়িয়া থাকিবে। ইহাতে বিজ্ঞান সমিতির উপর কোন দোষারোপ করা হয় নাই, বরং সাধারণ ভারতীয় যুবকদের মনের পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে। পরীক্ষার জন্য যদি কোন পাঠ্য বিষয় নির্দিষ্ট না করা হয়, তবে কোন ছাত্র তাহার জন্য পরিশ্রম করিবে না।গভর্ণমেণ্টেরও শীঘ্রই এইরুপ ব্যবস্থা করিতে হইত, কেন না বিজ্ঞান ক্লাশে ছাত্র-সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছিল এবং "বি" কোর্স (বিজ্ঞান) ক্রমেই ছাত্রদের নিকট অধিক প্রিয় হইয়া উঠিতেছিল। "

বিভিন্ন তথ্য থেকে জানা যায়, মহেন্দ্রলাল সরকারের প্রতিষ্ঠিত Indian Association for the Cultivation of Science বিজ্ঞানের একমাত্র এবং বিংশ শতকের অগ্রবর্তী অন্যতম বিজ্ঞান সমিতি হলেও প্রয়োজনীয় উপাদান, যন্ত্রপাতি এবং আনুকূল্যের অভাবে এই অ্যাসোসিয়েশন রয়্যাল ইনস্টিটিউটের মর্যাদা পায়নি বলে মহেন্দ্রলাল সরকারকে অনেক মানসিক যন্ত্রনা এবং দুঃখ বয়ে নিয়ে বেড়াতে হয়েছে।

সারাজীবন বিজ্ঞান এবং মানবতার চিকিৎসায় উৎসর্গ করা এই চিকিৎসাবিদ ১৮৩৩ সালের ২ নভেম্বর জন্মগ্রহণ করেন হাওড়া জেলার পাইকপাড়া গ্রামে। বাবা তারকনাথ সরকার এবং মা অঘোরমণি। দরিদ্র পরিবারের দুইপুত্র এবং এক কন্যার মধ্যে মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন সবার বড়। মহেন্দ্রলালের বয়স যখন

সবে পাঁচ তখন তার বাবাকে চিরবিদায় জানান অনন্তকালের পথে। দরিদ্র পরিবারে পিতার মৃত্যুতে পুরো পরিবার সমস্ত দিক থেকে বিপর্যস্ত হয়ে পড়লে মহেন্দ্রলালের মা মহেন্দ্রলাল সরকার ও তার ছোটভাইকে লালন পালনের জন্য পাঠিয়ে দেয়া মামার বাড়ি কলকাতায়। আর এখান থেকেই মহেন্দ্রলাল ১৮৪১ সাল ভর্তি হোন কলকাতার হেয়ার স্কুলে। পরবর্তীতে ১৮৪৯ সালে জুনিয়র স্কলারশিপ নিয়ে ভর্তি হোন হিন্দু কলেজে। এখানেই মূলত তার বিজ্ঞানের প্রতি বিশেষ আগ্রহ এবং বিজ্ঞান শিক্ষার মূল ভিত্তি গঠিত হয়। এই হিন্দু কলেজেই তার গাণিতিক, জ্যামিতিক , ত্রিকোণমিতিক এবং জ্যোতির্বিজ্ঞান সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান তৈরি হয়।

অনেকেরই মতে মহেন্দ্রলালের বুদ্ধিমতা এত প্রখর এবং উচ্চাশিক্ষা অর্জনের স্পৃহা এত বেশি ছিল যে তার জ্ঞান পিপাসা মেটাবার সামর্থ্য হিন্দু কলেজের ছিল না। তার এই উচ্চজ্ঞান অর্জনের স্পৃহা থেকেই তিনি তার হিন্দু কলেজের দুইজন প্রফেসর মহেন্দ্রলালকে হিন্দু কলেজে আরও একবছর পড়বার পরামর্শ দিলেও তিনি তার কোনো প্রকার তোয়াক্কা না করেই ১৮৫৪ সালে ভর্তি হোন কলকাতার মেডিকেল কলেজে। কলকাতা মেডিকেল থেকে ১৮৬৩ সালে স্নাতকোত্তর পাশ করেন তিনি। তিনিই ছিলেন এই প্রতিষ্ঠান থেকে এম ডি (ডক্টর এফ মেডিসিন) ডিগ্রি অর্জন করা দ্বিতীয় ব্যাক্তি। কর্মজীবনের শুরুতে অ্যালোপ্যাথকে তার চিকিৎসা সেবার প্রধান পথ করে নিলেও পরবর্তী তিনি একরকম আকস্মিক ভাবেই হোমিওপ্যাথকে বেছে নেন। হোমিওপ্যাথের এই ঘোরবিরোধী (১৮৬৩ সালে ব্রিটিশ সরকার কতৃক প্রতিষ্ঠিত ব্রিটিশ মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এর বঙ্গীয় শাখার উদ্বোধনের বক্তৃতায় তিনি হোমিওপ্যাথকে হাতুরি চিকিৎসা বলে উপহাস করেছিলেন।) মহেন্দ্রলাল আচমকা সেই পথেই গেলেন। উল্লেখ্য যে, মহেন্দ্রলাল সরকার ব্রিটিশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশন এর বঙ্গ শাখার সম্পাদক ছিলেন। বিভিন্ন তথ্য মাধ্যম থেকে বিশেষত, মহেন্দ্রলাল সরকার সম্পাদিত পত্রিকা "ক্যালকাটা জার্নাল অব মেডিসিন" থেকে জানা যায় তার এই চিকিৎসা সেবার পথের মোড় নেবার ইতিহাস।

চিরটা কাল মানব কল্যাণের পথে হাঁটা, তার জন্য পথ তৈরি করে দেয়া এ মানুষটিকেও চিরটাকাল নানান প্রকার প্রতিবন্ধকতা এবং হিংসের বশবর্তী হতে হয়েছে। পেয়েছেন অনেক লাঞ্ছনা ও গঞ্জনা। এ উপমহাদেশে বিজ্ঞান সাধনায় যিনি নিরলস এবং নিঃস্বার্থভাবে কাজ করে গেছেন, যিনিই প্রথম ১৮৭৬ সালে ভারতে বিজ্ঞান সভার আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন; তাকেই কিনা কোনো প্রকার যৌক্তিক কারণ ছাড়াই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সমিতির সিনেট পদ থেকে বিতাড়িত করার চক্রান্ত করা হয়! অবশ্য পরবর্তীতে তিনি নিজেই বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর কে উদ্দ্যেশ্য করে দুটি চিঠি লিখেন এবং পরে ১৮৭৮ সালের এপ্রিলে মহেন্দ্রলাল নিজেই বিজ্ঞান সমিতি থেকে পদত্যাগ করেন। মহেন্দ্রলাল সরকার ১৮৮৮ সালে বঙ্গীয় প্রাদেশিক সম্মেলনের সভাপতিত্ব করেন। এই সম্মেলনে অসমের চা শ্রমিকদের দুরবস্থা সম্বন্ধে প্রস্তাব নেয়া হয়। মহেন্দ্রলাল শ্রমিকদের অপমানসূচক 'কুলি' শব্দ ব্যবহারে আপত্তি করেন। তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফেলো, অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট, কলকাতার শেরিফ (১৮৮৭) এবং বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্য ছিলেন। চিরকাল বিজ্ঞান এবং মানবতার সেবায় নিয়োজিত থাকা এই মানুষটি ১৯০৪ সালে অনন্তকালের পথে পাড়ি জমান। সময়ের পরিক্রমায় নানান চাকচিক্যের ভিড়ে তার চিহ্ন মুছে যাচ্ছে আমাদের স্মৃতির সমস্ত পাতা থেকে।

বাংলা নবজাগরণের এক উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার ছিলেন একাধারে প্রবাদপ্রতিম চিকিৎসক ও এদেশে বিজ্ঞান সাধনার ক্ষেত্রে অন্যতম পথিকৃৎ। তাঁর জন্ম ২ নভেম্বর ১৮৩৩ জগৎবল্লভপুর থানার বর্তমান শংকরহাটী গ্রাম পঞ্চায়েত অন্তর্গত কানা দামোদর তীরবর্তী ছোট গ্রাম পাইকপাড়ায়। তাঁর পিতা

তারকনাথ সরকার, মাতা আতরময়ী দেবী। মাত্র ৫ বছর বয়সে পিতৃহারা বালক মহেন্দ্রকে মা ও এক অনুজ সহ কোলকাতার নেবুতলায় মাতুলালয়ে আশ্রয় নিতে হয়।

পাঠশালার শিক্ষা সমাপ্ত হলে কিছুদিন ইংরাজি শিক্ষার পর তিনি হেয়ার স্কুলে ভর্তি হওয়ার সুযোগ পান। এরপরের শিক্ষা হিন্দু কলেজ এবং সেখান থেকে কোলকাতা মেডিক্যাল কলেজে। এখানে তিনি চিকিৎসাবিদ্যায় প্রথম এল.এম.এস এবং ১৮৬৩ খ্রি:-তে সর্বোচ্চ ডিগ্রি এম.ডি লাভ করেন। ডা. চন্দ্রকুমার দে-র পর তিনিই দ্বিতীয় বাঙালি এম.ডি।

ডা. সরকারের জীবনে অত্যাশ্চর্য ঘটনা এই-যে, যিনি ছিলেন একজন নামজাদা অ্যালোপ্যাথ চিকিৎসক এবং হোমিওপ্যাথির কঠোর সমালোচক, মাত্র কয়েক বছরের মধ্যে তিনিই হয়ে উঠলেন হ্যানিম্যানের বিশেষ ভক্ত এবং তাঁর চিকিৎসা পদ্ধতির অন্যতম প্রবক্তা। সে সময় তাঁকে এজন্য মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন থেকে শুরু করে শিক্ষিত মহল ও সংবাদপত্রের প্রবল বিরোধিতার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু ডা. সরকার নিজস্ব অবস্থানে অবিচল থেকে 'ক্যালকাটা জার্নাল অফ মেডিসিন'-এ দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর মতামত প্রকাশ করে গেছেন।

কালক্রমে ডা. সরকার হয়ে উঠলেন এদেশে চিকিৎসা জগতে এক কিংবদন্তী পুরুষ। ১৮৭৭-এ বৃটিশ সরকার তাঁকে কোলকাতার 'অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট' মনোনীত করেন। এবং ১৮৮৩-তে সি.আই.ই উপাধি প্রদান করা হয়। অতঃপর ১৮৮৭-তে তাঁকে কোলকাতার শেরিফও করা হয়।.... ১৯৯৮-এ কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে 'ডক্টর অফ ল' সম্মানে ভূষিত করেন।

বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে ডা. সরকারের একটি বিশেষ অবদান হ'লো ১৮৭৭-এ মুখ্য উদ্যোগী হিসাবে 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন' প্রতিষ্ঠা। বর্তমানে এটি 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কাল্টিভেশন অফ সায়েন্স' নামে পরিচিত। উল্লেখ্য পরবর্তীকালে সি.ভি.রমণের মতো বিজ্ঞানীও এখানে গবেষণার কাজ করেছেন।

সেকালের অনেক মনীষীর মতো ডা. সরকারের সমাজ-মনস্কতার দিকটিও অতি উল্লেখযোগ্য। বাল্যবিবাহ প্রথার বিরুদ্ধে তিনিই প্রথম মেয়েদের বিবাহের ন্যুনতম বয়স ১৬ বছর ধার্য করার প্রস্তাব দেন। এটি ১৮৭২-এ আইনী স্বীকৃতিও পায়। ১৮৯২-এ কুষ্ঠরোগীদের জন্য স্ত্রী রাজকুমারীর নামে বৈদ্যনাথ ধামে একটি কুষ্ঠাশ্রম প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মৃত্যুর আগে তিনি জীবনের সমস্ত সঞ্চয় 'সায়েন্স অ্যাসোসিয়েশন'-এর কাজে দান করে যান।

২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯০৪ সেকালের এই কিংবদন্তী পুরুষ ডা. মহেন্দ্রলাল সরকারের জীবনাবসান ঘটে।

১৯৮৩-তে ডা. সরকারের সার্ধশততম জন্মবর্ষে 'ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন ফর কালটিভেশন অফ সায়েন্স' তাঁর প্রতি শ্রদ্ধার্ঘ্য জানিয়ে পাইকপাড়া গ্রামে ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করেছেন। হাওড়া জিলা পরিষদ পাইকপাড়া গ্রামে কানা দামোদরের ওপর নির্মিত সেতুটি ডা. সরকারের নামে উৎসর্গ করেছেন। রাজ্য পূর্ত দপ্তরের উদ্যোগে পাঁতিহাল থেকে (ভায়া প্রতাপপুর) মুন্সীরহাট পর্যন্ত পাকা রাস্তাটির নাম হয়েছে 'ডা. মহেন্দ্রলাল সরকার সরণী'। এছাড়া কয়েক বছর আগে রেল দপ্তর দক্ষিণ-পূর্ব রেলের হাওড়াস্টেশন 'মহেন্দ্রলাল নগর' আমতা রেলপথে পাইকপাড়ার কাছেই একটি স্টেশনের নাম দিয়েছেন-

P. N. Bose

আধুনিক যুগে ইউরোপের দেশগুলি বিজ্ঞান চর্চায় অনেক এগিয়ে ছিল।বিশেষ করে বিজ্ঞান চর্চার পরিকাঠামোতে ভারত সেই সময় অনেকটাই পিছিয়ে ছিল। তবে ঔপনিবেশিক যোগসূত্রে ভারতে বিজ্ঞান চর্চায় অনেকে এগিয়ে আসেন। আলোচ্য সময়ে যে কয়েকজন ভারতীয় ইউরোপীয় বিজ্ঞান-প্রযুক্তিতে উৎসাহী হয়ে ওঠেন, তাঁদের

মধ্যে প্রমথনাথ বোস অন্যতম। তিনি ব্রিটেনে গিয়ে ভূ-তত্ত্ব নিয়ে পড়াশোনা করেন। ভূতত্ত্ব বিজ্ঞানী আচার্য প্রমথনাথ বসু [১৮৫৫-১৯৩৪] জন্ম গ্রহণ করেন গোবরডাঙ্গায় । তিনি শৈশবে খাঁটুরা আদর্শ বঙ্গ বিদ্যালয়ে পড়েন । তিনি ছিলেন ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান শাখার প্রথম ভারতীয় স্নাতক । তিনি অসমে প্রথম পেট্রোলিয়াম আবিষ্কার করেন । ভারতে প্রথম সাবান তৈরির কারখানা নির্মাণ করেন । এমনকি প্রথম লৌহ আকরিকের সন্ধান পাওয়া, ১৮৯৪ খ্রীঃ ময়ূরভঞ্জে লৌহ-খনি আবিষ্কার করেন, যার ফলে জামশেদপুরে গড়ে উঠল টাটা স্টিল ফ্যাক্টরি । ষ্টীল নগরীর সেই উজ্জ্বল ব্যক্তিত্বের নাম প্রমথনাথ বসু ।১৮৫৫ খ্রিস্টাব্দের ১২ মে পশ্চিমবঙ্গের চবিবশ পরগনা জেলার গৈপুরে তাঁর জন্ম। ১৮৭২ খ্রিস্টাব্দে তিনি কৃষ্ণনগর কলেজ থেকে এন্ট্রান্স এবং ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে এফএ পাস করে কলকাতার সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হন। এ কলেজে অধ্যয়নকালে ১৮৭৪ খ্রিস্টাব্দে তিনি গিলক্রাইস্ট বৃত্তি লাভ করে ইংল্যান্ড যান এবং ১৮৭৮ খ্রিস্টাব্দে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করেন। পরের বছর রয়্যাল স্কুল অফ মাইনস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তিনি স্বদেশ প্রত্যাবর্তন করেন।

১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে প্রমথনাথ 'জিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়া'-তে উচ্চপদে নিয়োগ পান। কিন্তু বিশেষ কারণবশত ১৯০৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি পদত্যাগ করেন। উক্ত ভূতাত্ত্বিক সংস্থায় চাকরিকালীন সময়ে তিনি মধ্যপ্রদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে খনিজ সমীক্ষা পরিচালনা করেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি হলো ধুল্লী ও রাজাহারা লৌহখনি আবিষ্কার, যার ফলে ভিলাই কারখানা স্থাপিত হয়। তিনি কিছুদিন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজের ভূবিদ্যা বিভাগে অধ্যাপনা করেন।

প্রমথনাথ বসুর শ্রেষ্ঠ কীর্তি হলো জামসেদপুর লৌহখনি আবিষ্কার (১৯০৩-৪)। এরই ভিত্তিতে ভারতের বিখ্যাত টাটা-কোম্পানী লৌহ-ইস্পাত কারখানা স্থাপনে সম্মত হয়। অধিকন্তু তিনি রানীগঞ্জ, দার্জিলিং ও আসামে কয়লা, সিকিমে তামা এবং ব্রহ্মদেশে খনিজ অনুসন্ধান পরিচালনা করেন।

প্রমথনাথ বসু ছিলেন স্বদেশপ্রেমে উজ্জীবিত। তিনি ভারতে বিজ্ঞান ও শিল্পশিক্ষার উন্নয়ন ও বিকাশের লক্ষ্যে বিলেতে 'ইন্ডিয়া সোসাইটি'র কর্মসচিবের দায়িত্ব পালন করেন। একই লক্ষ্যে তিনি স্বদেশে ১৯০৬ থেকে ১৯২০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত জাতীয় শিক্ষা পরিষদের অধীনে স্থাপিত বেঙ্গল টেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটের (বর্তমান যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়) প্রথম অবৈতনিক অধ্যক্ষ হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেন। পরে তিনি এর পরিদর্শক পদে উন্নীত হন।

উপরিউক্ত কাজে পূর্ব থেকেই প্রমথনাথ লেখনী পরিচালনা করেন। বাংলা মাধ্যমে বিজ্ঞান শিক্ষার প্রসারে তিনি ছিলেন দৃঢ় বিশ্বাসী। স্বদেশী আন্দোলনে তাঁর অবদান প্রশংসনীয়। তিনি 'বেঙ্গল একাডেমী অব লিটারেচার' স্থাপন করেন যা পরবর্তীকালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। উক্ত একাডেমীর লক্ষ্য ছিল পাঠ্যপুস্তকের বিষয় নির্বাচনে সহায়তা করা। তিনি কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিরও সদস্য ছিলেন।

প্রমথনাথ অনেক গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনা করেছেন। সেগুলির বিষয়বস্তু শিক্ষা, সংস্কৃতি ও হিন্দু সভ্যতা। শেষ জীবনে ১৯৩২ থেকে ১৯৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি অমৃতবাজার পত্রিকায় নিজের জীবনস্মৃতিমূলক ধারাবাহিক প্রবন্ধ রচনা করেন। ১৯৩৫ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল তাঁর মৃত্যু হয়।

a) Geological mapping in the formation of Nimar (southwestern region of Madhya Pradesh) area
b) Geological mapping in the Vindhya range formation in Central India

c) Geological mapping and mineral exploration in Chhattisgarh Basin (largest of the seven Purana basins in Central India)
d) Exploration in Chhattisgarh coal fields
e) Exploration of manganese ore deposit at Jabalpur and Balaghat districts, Madhya Pradesh
f) Regional geological survey in Central India leading to discovery of a number of mineral deposits
g) Exploration for coal in Tenasserim area, southern part of Burma on the Kra Isthmus
h) Expedition in Kobru Glacier, Sikkim
i) Geological mapping and mineral exploration in Sikkim
j) Exploration for coal in Darjeeling district, West Bengal
k) Exploration of coal area at south of Kalimpong, West Bengal
l) Exploration of metalliferrous deposits in the Eastern Himalayas

References

1. E. William Heinrich, 'The Geology of Carbonatites' (Krieger, Florida, 1980).
2. Sankarksan Roy PRAMATHA NATH BOSE-THE FIRST INDIAN GRADED GEOLOGIST

P.C.Ray

১৮৬১ সালে বাংলা তথা ভারতবর্ষের দুই শ্রেষ্ঠ সন্তান রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং প্রফুল্ল চন্দ্র রায় জন্ম গ্রহন করেন।
২ রা আগস্ট, ১৮৬১ প্রফুল্ল চন্দ্র রায় যিনি পি সি রায় নামেও পরিচিত একজন প্রখ্যাত বাঙালি রসায়নবিদ, বিজ্ঞানশিক্ষক, দার্শনিক, কবির আবির্ভাব হয় বাংলাদেশের রাড়ুলি গ্রামে । তিনি বেঙ্গল কেমিকালের প্রতিষ্ঠাতা এবং মার্কিউরাস নাইট্রাইট-এর আবিষ্কারক। দেশী শিল্পায়ন উদ্যোক্তা। তাঁর জন্ম অবিভক্ত বাংলার খুলনা জেলায় (বর্তমানে বাংলাদেশের অন্তর্গত)। তিনিজগদীশ চন্দ্র বসুর সহকর্মী ছিলেন।

পি সি রায় বাংলাদেশের খুলনা জেলার পাইকগাছা উপজেলার রাড়ুলি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তার মা'র ভুবনমোহিনী দেবী এবং পিতার নাম হরিশচন্দ্র রায় যিনি স্থানীয় একজন জমিদার ছিলেন। তার পরিবার ছিল বনিয়াদি। ছোটবেলা থেকেই প্রফুল্লচন্দ্র অত্যন্ত প্রত্যুৎপন্নমতি ছিলেন।তার পড়াশোনা শুরু হয় বাবার প্রতিষ্ঠিত এম ই স্কুলে। ১৮৭২ সালে তিনি কলকাতার হেয়ার স্কুলে ভর্তি হন, কিন্তু রক্ত আমাশা রোগের কারণে তার পড়ালেখায় ব্যাপক বিঘ্নের সৃষ্টি হয়। বাধ্য হয়ে তিনি নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। গ্রামে থাকার এই সময়টা তার জীবনে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তনে সাহায্য করেছে। বাবার গ্রন্থাগারে প্রচুর বই পান তিনি এবং বইপাঠ তার জ্ঞানমানসের বিকাশসাধনে প্রভূত সহযোগিতা করে। ক্যাপ্টেন ডি এল রিচার্ডসনের লেখা 'ব্রিটিশ কবিগণের জীবনী' বইটি তিনি পান তাঁর পিতার কাছ থেকে। এটাই ছিল তাঁর অমূল্য পৈতৃক সম্পদ। বাঁধাধরা বইয়ের বাইরে, শেক্সপিয়ার, এমার্সন, কার্লাইল, ডিকেন্সের রচনা, নিউটন, গ্যালিলিও, ফ্রাঙ্কলিনের জীবনী, বাংলা সাহিত্য, ইতিহাস ইত্যাদি ইচ্ছেখুশি বই পড়ার আনন্দে মেতে উঠলেন তিনি। স্যর উইলিয়াম জোন্সের প্রশ্নের

উত্তরে জোন্সের মায়ের উক্তি ‘পড়িলেই সব জানিতে পারিবে’ কথাটি প্রফুল্লচন্দ্রের মনে গভীর ভাবে রেখাপাত করে।

১৮৭৩ সালে প্রফুল্লচন্দ্র আবার কলকাতায় ফিরে গিয়ে অ্যালবার্ট স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই ১৮৭৮ সালে তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। এরপর তিনি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মেট্রোপলিটন কলেজে (বর্তমান বিদ্যাসাগর কলেজ) ভর্তি হন। ১৮৮১ সালে সেখান থেকে এফ এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় বিভাগে পাশ করে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে বি এ ভর্তি হন। এখানে তিনি বিখ্যাত প্রফেসর আলেকজান্ডার পেডলারের সান্নিধ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে নিজ গৃহেই ছোট্ট গবেষণাগার গড়ে গবেষণা শুরু করেন। নিজের পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার জন্য এডিনবার্গ ইউনিভার্সিটির গিলক্রাইস্ট বৃত্তি পরীক্ষা দেন এবং উত্তীর্ণ হন। ১৮৮২ সালে প্রেসিডেন্সী থেকে গিলক্রিস্ট বৃত্তি নিয়ে তিনি স্কটল্যান্ডের এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশোনা করতে যান। এই বিশ্ববিদ্যালয় হতে তিনি বি এস সি পাশ করেন এবং ডি এস সি ডিগ্রী লাভের জন্য গবেষণা শুরু করেন। তার সেই গবেষণার বিষয় ছিল কপার ম্যাগনেসিয়াম শ্রেণীর সম্মিলিত সংযুক্তি পর্যবেক্ষণ (Conjugated Sulphates of Copper Magnesium Group: A Study of Isomorphous Mixtures and Molecular Combination)। দুই বছরের কঠোর সাধনায় তিনি এই গবেষণা সমাপ্ত করেন এবং *পি এইচ ডি* এবং *ডি এস সি* ডিগ্রী লাভ করেন। এমনকি তার এই গবেষণাপত্রটি শ্রেষ্ঠ মনোনীত হওয়ায় তাকে হোপ প্রাইজে ভূষিত করা হয়। এডিনবার্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই ১৮৮৫ সালে সিপাহী বিদ্রোহের আগে ও পরে (India Before and After the Sepoy Mutiny) এবং ভারতবিষয়ক বিভিন্ন নিবন্ধ লিখে ভারতবর্ষ এবং ইংল্যান্ডে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেন।

১৮৮৮-তে তিনি ফিরে এলেন কলকাতায়। প্রেসিডেন্সিতে শুরু হয় তাঁর শিক্ষক জীবন। যোগ্যতা থাকা সত্ত্বেও নেটিভ হওয়ার কারণে অপেক্ষাকৃত কম মাইনে ও কম সম্মানের প্রভিন্সিয়াল অধ্যাপক হিসেবে সেখানে যোগদান করেন তিনি। তাঁর সুন্দর বাচনভঙ্গি ও রসবোধ দিয়ে বাংলা ভাষায় বক্তৃতার মাধ্যমে রসায়নের পাঠ ছাত্রদের কাছে সহজবোধ্য ও মনোগ্রাহী করে তুলতেন। বিভিন্ন বিজ্ঞানীদের সফলতার জীবন কাহিনি গল্পের ছলে তুলে ধরতেন ছাত্রদের কাছে। অল্প সময়েই শিক্ষক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ বসু, মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান চন্দ্র ঘোষ, পঞ্চানন নিয়োগী, পুলিন বিহারী সরকার, গোপালচন্দ্র চক্রবর্তী, এ কে ফজলুল হক, রসিক লাল দত্ত তাঁরই ছাত্র ছিলেন। শিক্ষকতার পাশাপাশি চলতে থাকে তাঁর গবেষণা।প্রায় ২৪ বছর তিনি এই কলেজে অধ্যাপনা করেছিলেন। অধ্যাপনাকালে তার প্রিয় বিষয় রসায়ন নিয়ে তিনি নিত্য নতুন অনেক গবেষণাও চালিয়ে যান। তার উদ্যোগে তার নিজস্ব গবেষণাগার থেকেই বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানা সৃষ্টি হয় এবং পরবর্তীকালে ১৯০১ সালে তা কলকাতার মানিকতলায় ৪৫ একর জমিতে স্থানান্তরিত করা হয়। তখন এর নতুন নাম রাখা হয় বেঙ্গল কেমিক্যাল এন্ড ফার্মাসিউটিক্যাল ওয়ার্কস লিমিটেড।

এক দিন হঠাৎই তিনি আবিষ্কার করলেন রসায়নের এক অতি বিষম বস্তু মারকিউরাস নাইট্রাইট। ইউরোপীয় বিজ্ঞানীগণ তাঁকে ***মাস্টার অব নাইট্রাইটস*** আখ্যায় ভূষিত করেন। পরনে ধুতি, কালো কোট, চুল অবিন্যস্ত, তাঁর এমন উদাসীন বেশভূষায় আবৃত ছিল এক দূরদর্শী কর্মচঞ্চল প্রাণ। তিনি বুঝেছিলেন, “একটা সমগ্র জাতি শুধুমাত্র কেরানী বা মসীজীবী” হয়ে টিকে থাকতে পারে না। বাঙালি জাতিকে স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখালেন তিনি। ১৯০১ সালে প্রতিষ্ঠা করলেন বেঙ্গল কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিকল ওয়ার্কস। মূলধন বলতে ছিল, মাত্র আটশো টাকা আর পূর্ণ আত্মবিশ্বাস।

এ ছাড়াও ক্যালকাটা পটারি ওয়ার্কস, বেঙ্গল এনামেল ওয়ার্কস, ন্যাশনাল ট্যানারি ওয়ার্কস প্রতিষ্ঠায় তিনিই ছিলেন প্রধান উদ্যোক্তা। এডিনবার্গে থাকাকালীন সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল সোসাইটির

সদস্য রূপে বিভিন্ন রাসায়নিক কারখানা পরিদর্শন করে রাসায়নিক কারখানা তৈরির প্রাথমিক জ্ঞান অর্জন করেছিলেন তিনি। বিস্মৃতির অতল গহ্বর থেকে তিনিই খুঁজে বের করলেন রসায়ন শাস্ত্রে প্রাচীন ভারতের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস। ধাতু সঙ্কর তৈরিতে ভারত যে পিছিয়ে ছিল না, চরক সংহিতা-সুশ্রুত সংহিতায় উল্লেখিত অস্ত্রোপচারের সূক্ষ্মাগ্র যন্ত্র যেমন স্ক্যালপোল বা ল্যানসেট তার প্রমাণ। ইস্পাত আবিস্কারের প্রথম কৃতিত্বও প্রাচীন ভারতের। প্রাচীন রসায়নে শুধু ইজিপ্ট, সিরিয়া, চিন বা আরব নয় প্রাচীন ভাতরবর্ষও যে কতটা এগিয়ে ছিল,তা তুলে ধরতেই তিনি লিখলেন 'দ্য হিস্ট্রি অব হিন্দু কেমিস্ট্রি'। এ বিষয়ে প্যারিসের বিখ্যাত বিজ্ঞানী মার্সিলিন বের্তেলোর সান্নিধ্য তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। এই কাজের জন্য সংস্কৃত ও পালি ভাষা শিখেছিলেন।

আচার্য দেবের দেশপ্রেম তাকে ইউরোপে থেকে ফিরিয়ে এনেছিল। দেশে এসেও তিনি তার সেই স্বদেশপ্রীতির পরিচয় দিয়েছেন। তিনি ক্লাসে বাংলায় লেকচার দিতেন। বাংলা ভাষা তার অস্তিত্বের সাথে মিশে ছিল। তার বাচনভঙ্গী ছিল অসাধারণ । যার দ্বারা তিনি ছাত্রদের মন জয় করে নিতেন খুব সহজেই। তিনি সকল ক্ষেত্রেই ছিলেন উদারপন্থী।কিছু সূত্র মতে, তিনি অসাম্প্রদায়িকই শুধু ছিলেননা বরং সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারার মূলোৎপাটনের জন্যও চেষ্টা করেছেন সবসময়। ১৯০৫ সালে ড. কুদরত-এ-খুদাকে প্রেসিডেন্সী কলেজে থেকে রসায়নে প্রথম বিভাগ দেয়া হয়। অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও প্রফুল্লচন্দ্র নিজের সিদ্ধান্ত মোতাবেক কুদরত-এ-খুদাকে প্রথম বিভাগ দেন। এরকম ব্যাপার শোনা যায় শেরে বাংলা এ. কে. ফজলুক হকের জীবনী থেকেও।ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনেও তাঁর অবদান ছিল অপরিসীম। তিনি বলেন, "দেয়ার আর অকেশনস্ দ্যাট ডিমানডেড দ্যাট আই সুড লিভ দ্য টেস্ট টিউব টু অ্যাটেন্ড টু দ্য কল অফ দ্য কান্ট্রি। সায়েন্স ক্যান ওয়েট, স্বরাজ কান্ট।" তাঁর অর্জিত আয়ের প্রায় সবটুকুই দেশহিতার্থে দান করে গিয়েছেন। ত্যাগেই ছিল তাঁর তৃপ্তির আনন্দ। ১৯৪৪, ১৬ জুন। শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন অকৃতদার বিশ্ববরেণ্য বিজ্ঞানী।

- নিজের বাসভবনে দেশীয় ভেষজ নিয়ে গবেষণার মাধ্যমে তিনি তার গবেষণাকর্ম আরম্ভ করেন। তার এই গবেষণাস্থল থেকেই পরবর্তীকালে বেঙ্গল কেমিক্যাল কারখানার সৃষ্টি হয় যা ভারতবর্ষের শিল্পায়নে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। তাই বলা যায় বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ভারতীয় উপমহাদেশের শিল্পায়নে তার ভূমিকা অনস্বীকার্য।
- ১৮৯৫ সালে তিনি মারকিউরাস নাইট্রাইট (HgNO2) আবিষ্কার করেন যা বিশ্বব্যাপী আলোড়নের সৃষ্টি করে। এটি তার অন্যতম প্রধান আবিষ্কার। তিনি তার সমগ্র জীবনে মোট ১২ টি যৌগিক লবন এবং ৫ টি থায়োএস্টার আবিষ্কার করেন।
- ১৯১১ সালে কলকাতা বিশ্ববাদ্যালয়ের সিন্ডিকেট হিসেবে তৃতীয়বারের মত তিনি ইংল্যান্ড যান এবং সেখান থেকেই সি. আই. ই. লাভ করেন।
- সম্মানসূচক ডক্টরেট ১৯১১ সালে ডারহাম বিশ্ববিদ্যালয় তাকে সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী দেয়। এছাড়া ১৯৩৬ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং পরবর্তীকালে মহীশুর ও বেনারস বিশ্ববিদ্যালয় থেকেও তিনি ডক্টরেট পান।
- ১৯১৯ সালে তিনি নাইট উপাধি লাভ করেন।
- **তাঁর রচনা সমূহঃ** India Before and After the Sepoy Mutiny,সরল প্রাণীবিজ্ঞান, বাঙ্গালী মস্তিষ্ক ও তার অপব্যবহার,হিন্দু রসায়নী বিদ্যা/History of Hindu Chemistry,মোট গবেষণাপত্রের সংখ্যা ১৪৫

Unit-16

১১.৬.১৬.৪. জগদীশ চন্দ্র বসু,মেঘনাদ সাহা,সত্যেন্দ্রনাথ বসু

J.C Bose

ব্রিটিশ শাসিত ভারতীয় উপমহাদেশে এক বাঙ্গালী সন্তান একশরও বেশি আশ্চর্যজনক যন্ত্র আবিস্কার করে সারা বিশ্বের মধ্যে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। তিনি আর কেউ নন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, যিনি বিশ্ববাসীকে প্রথমবারের মত জানিয়েছিলেন উদ্ভিদের মধ্যে প্রানশক্তি আছে। এটি প্রমাণের জন্যে তিনি 'ক্রেস্কোগ্রাফ' নামক একটি যন্ত্র আবিষ্কার করেন,যা উদ্ভিদদেহের সামান্য সাড়াকে লক্ষগুণ বৃদ্ধি করে প্রদর্শণ করে। তাঁর জন্ম হয়েছিল বাংলাদেশেরই ময়মনসিংহ শহরে ১৮৫৮ সালে ৩০শে নভেম্বের। তাঁর পিতার নাম ভগবান চন্দ্র বসু (জেলার তৎকালীন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট) এবং মায়ের নাম বামা সুন্দরী দেবী।

মায়ের হাতেই শিশু জগদীশের হাতেখড়ি হয়েছিল। ধীরে ধীরে স্কুলে ভর্তি হওয়ার সময় আসলো। তখনকার দিনে সন্তানকে ইংরেজি স্কুলে পড়ানো ছিল উচ্চ সামাজিক মান-মর্যাদার বিষয়। কিন্তু ভগবান চন্দ্র বসু ছিলেন অন্য ধাতুতে গড়া মানুষ, তিনি চাইতেন ইংরেজি শেখার আগে ওনার সন্তান ভালো করে মাতৃভাষা শিখুক আর সন্তানের মধ্যে অল্পবয়সেই দেশপ্রেম গড়ে উঠুক। বাংলা স্কুলে পড়ার ব্যাপারটি জগদীশ চন্দ্রের জীবনে যে কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে তার প্রমাণ বাংলা ভাষায় রচিত জগদীশের বিজ্ঞান প্রবন্ধগুলো পড়লে সহজেই বোঝা যায়। তাঁর পিতার এই চেষ্টা যে বিফলে যায়নি তার প্রমাণ জগদীশ চন্দ্র বসুর পরবর্তী জীবনের নানান ঘটনাবলী।

তাঁর শিক্ষাজীবনের ধাপগুলো শুরু হয় ফরিদপুরে,তারপর ১৮৬৯ সালে হেয়ার স্কুল,সেখান থেকে সেন্ট জেভিয়ার্স স্কুল। তিনি ১৮৭৫ ষোল বছর বয়সে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উর্ত্তীণ হয়ে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজে ভর্তি হোন। সেখান থেকে ১৮৭৭সালে অনার্স এবং ১৮৭৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি .এস.সি ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৮৮০ সালে ভারত ছেড়ে লন্ডনে ডাক্তারি পড়ার জন্য মেডিকেল ইনস্টিটিউটে ভর্তি হলেন। কিন্তু বিলেতের আবহাওয়া আর ডাক্তারী পড়ার অত্যধিক চাপে দুর্বল স্বাস্থ্যের জগদীশ চন্দ্র বসু অসুস্থ হয়ে পড়েন। এই কারণে তা বাদ দিয়ে ১৮৮১ সালে লন্ডন ত্যাগ করে কেম্ব্রিজে যান। ১৮৮৪ সালে কেম্ব্রিজ ক্রাইস্ট কলেজ থেকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ে ট্রাইপোস (কেম্ব্রিজের বিশেষ কোর্স) এবং একই সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি.এস.সি ডিগ্রি নিয়ে দেশে ফিরলেন।

অনেক তো জ্ঞান অর্জন হলো, এবার দেশের মাটিতে ফেরা যাক। এই ভেবে ১৮৮৫ খ্রিষ্টাব্দে জগদীশ চন্দ্র ভারতে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন প্রেসিডেন্সী কলেজ ছিল শীর্ষ শিক্ষাকেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্যতম, কিন্তু এখানে বাঙালী বিজ্ঞানের ছাত্র কিংবা শিক্ষক ছিল হাতেগোনা। তাই তৎকালীন ভারতের গভর্নর-জেনারেলের অনুরোধে স্যার অ্যালফ্রেড ক্রফট বসুকে প্রেসিডেন্সি কলেজে পদার্থবিদ্যার অধ্যাপক নিযুক্ত করেন। তবে এখানেও ঝামেলার শেষ ছিলোনা। প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যক্ষ চার্লস হেনরি টনি ছিলেন অত্যন্ত বাঙালি বিদ্বেষী, তিনি প্রথম থেকেই বাঙালী শিক্ষক নিয়োগের বিপক্ষে ছিলেন। এত আপত্তির পরও জগদীশের নিয়োগ পাওয়ায় তিনি প্রতিহিংসাবশত পদে পদে ঝামেলা করতে লাগলেন। টনি সাহেব জগদীশের বেতন অন্য ইউরোপীয় শিক্ষকের অর্ধেক করে দিলেন, গবেষনার কোনো রকম সুযোগ তাকে দেওয়া হতোনা। আর্থিক অভাব থাকা সত্ত্বেও জগদীশ চন্দ্র বসু এই অপমানের প্রতিবাদে তিন বছর অবৈতনিক ভাবেই অধ্যাপনা চালিয়ে যান। তার এই অহিংস প্রতিবাদের ফলে পরবর্তীতে তাঁর বেতন ইউরোপীয়দের সমতুল্য করা হয়।

এত কিছুর পরেও তিনি নিজের মনোবল হারাননি। ২৪ বর্গফুটের নিজের কক্ষে তিনি একের পর এক গবেষণা করতে থাকেন। সারাদিন ক্লাস নেওয়ার পরেও তিনি নিজের চেষ্টায় অনেক কষ্ট করে অপ্রতুল যন্ত্রপাতি দিয়ে নিজের কাজ করতেন, আর এই সময় যোগ্য সহধর্মিণী হয়ে তাঁকে সঙ্গ দেন স্ত্রী অবলা বসু। তার গবেষণাপত্রগুলো লন্ডনের রয়েল সোসাইটির জার্নালে প্রকাশিত হলে চারিদিকে সাড়া পরে যায়। নুন্যতম জিনিস ব্যাবহার করে ভারতবর্ষের মত এক দেশে বসে তিনি এত গবেষণা করেছেন দেখে পশ্চিমা বিজ্ঞানীদের তাক লেগে যায়। তার কাজের স্বীকৃতি সরূপ লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৯৬ সালের মে মাসে তাকে ডিএসসি ডিগ্রী প্রদান করে।

নিজের কাজ সম্পর্কে বলার জন্য ইংল্যান্ডের লিভারপুলে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন তাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিল। এই বক্তৃতার সাফল্যের পর তিনি রয়েল ইন্সটিটিউশন, ফ্রান্স এবং জার্মানিসহ বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে বক্তৃতা দেন।

তিনি তাঁর মৌলিক গবেষণা কলেজের ল্যাবরেটরিতে শুরু করলেন। প্রথম জীবনে তিনি ইথার তরঙ্গ ও বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গ নিয়ে গবেষণা শুরু করলেন। তাঁর গবেষণার প্রথম সাফল্য ছিল বিদ্যুৎ চৌম্বকীয় তরঙ্গের সাহায্যে সংকেত বা সংবাদ প্রেরণের সম্ভাবনা আবিষ্কার,যা এখন থেকে দেড়শত বছর আগের কথা !

আমরা যে এফএম বা রেডিওতে গানের মূর্ছনায় হারিয়ে যাই তার আবিষ্কারক হিসেবে কিছুদিন আগেও পুরো বিশ্ববাসী ইটালির বিজ্ঞানী মার্কোনিকেই জানত। কিন্তু ১৯৯৮ সালে প্রকাশিত IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers)এর প্রসিডিঙ্গে আমাদের জগদীশ বসুকে রেডিওর প্রকৃত আবিষ্কারক হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। কারণ,মার্কোনি তার আবিষ্কারে অনেক সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করেছিলেন যার মধ্যে একটি হচ্ছে কোহেরার(২টি ধাতব পাতের মাঝে খানিকটা পারদ),যা ছিল রেডিও বা তারহীন সংকেত পাঠানোর প্রক্রিয়ার মূল বিষয়। মজার ব্যপার হচ্ছে এই কোহেরার এর প্রকৃত আবিষ্কারক স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, যা মার্কোনি বা তার সমসাময়িক বিজ্ঞানীরা কেউ স্বীকার করেনি। মার্কোনি বসুর তৈরি কোহেরারটি সামান্য পরিবর্তন করেছিলেন। বসুর কোহেরারটি ছিল U আকৃতির মত আর মার্কোনিরটি ছিল সোজা।

১৮৯৬ সালে জগদীশ চন্দ্র বসু অদৃশ্য আলোক সম্পর্কে লিভারপুলের ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশনের বক্তৃতা দেন। ঐ সময় যদি তিনি নিজের নামে বেতার যন্ত্র পেটেন্ট করতেন,তাহলে মার্কোনি না,তিনিই হতেন বেতার যন্ত্রের সর্বপ্রথম আবিষ্কারক। এরপর লন্ডনে রয়েল ইনস্টিটিউটে তাঁকে বক্তৃতা দেওয়ার জন্যে আহবান করা হয়। তিনি তাঁর কোহেরারটি নিয়ে একটি নিবন্ধ রয়েল সোসাইটিতে পড়েছিলেন। তাঁর এই কোহেরারটি দিয়ে তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে এক মাইল দূরের বাসভবনে সাংকেতিক চিহ্ন প্রেরণ করেছিলেন। ১৮৯৬ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় মৌলিক গবেষণার জন্য তাঁকে ডি .এস.সি উপাধি প্রদান করে।

এখন প্রশ্ন হল জগদীশ চন্দ্র বসু নিজের নামে পেটেন্ট করেননি কেন? ১৯০১ সালে রবীন্দ্রনাথকে লিখা একটি চিঠিতে বলেন যে, 'আমি যদি একবার টাকার মোহে পড়ে যাই তাহলে আর কোনদিন আর বের হতে পারব না।' টাকার প্রতি তাঁর লোভ ছিল না বলেই তিনি পেটেন্ট নিজের নামে করেননি।

১৯৩৭ সালের ২৩ শে নভেম্বর জগদীশ চন্দ্র বসু তাঁর কর্মময় জীবন থেকে চিরবিদায় নিলেন। আমরা তাঁর পরবর্তী প্রজন্ম উত্তরাধিকার সূত্রে পেলাম 'বসু বিজ্ঞান মন্দির।' বিজ্ঞানী জগদীশ চন্দ্র বসু সহজ ভাষায় নিজের গবেষণার কথা ছাপা পক্ষরে লিখে গিয়েছেন। তাঁর লেখা বইয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেঃ রেসপন্সেস ইন দ্য লিভিং অ্যান্ড নন-লিভিং (১৯০২), প্লান্ট রেসপন্সেস এজ এ মিনস অব ফিজিওলজিক্যাল

ইনভেস্টিগেশনস (১৯০৬), কম্পারেটিভ ইলেকট্রফিজিওলজি (১৯০৭), নার্ভাস মেকানিজম অব প্লান্টস (১৯২৫), কালেক্টেট ফিজিক্যাল পেপার্স (১৯২৭), মটর মেকানিজম অব প্লান্টস (১৯২৮) ও গ্রোথ এন্ড ট্রপিক মুভমেন্ট ইন প্লান্টস (১৯২৯)।

ছোটদের জন্যও তার বাংলায় লেখা বই রয়েছে, 'অব্যক্ত' নামের বইয়ে খুব সরলভাবে বিজ্ঞানের অনেক কঠিন কথা বলা হয়েছে।তিনি একজন সাহিত্যিকও ছিলেন তাঁর লেখা 'অব্যক্ত' বাংলা ভাষায় একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এছাড়াও আমরা যে সায়েন্স ফিকশানগুলো পড়ে বিজ্ঞানকে নিয়ে প্রতিনিয়ত নতুনভাবে চিন্তা করি,তার জনক হলেন জগদীশ চন্দ্র বসু। ১৮৯৬ সালে তাঁর লেখা প্রথম সায়েন্স ফিকশানটির নাম ছিল 'নিরুদ্দেশের কাহিনী'। তিনি অত্যন্ত ভাল এস্রাজ বাদক ছিলেন। সুতরাং শুধুমাত্র বিজ্ঞানে নয়, সাহিত্য-সঙ্গীতের জগতেও তাঁর ছিল সমান বিচরণ।

- তিনি ১৯১৬ সালে ব্রিটিশ সরকার থেকে নাইটহুড উপাধি পান, পরে রয়েল সোসাইটির ফেলো হন
- ১৯২০ সালে, ১৯২৮ সালে ভিয়েনা একাডেমি অফ সাইন্স-এর সদস্য নির্বাচিত হন।
- ১৯২৭ ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের ১৪তম অধিবেশনের সভাপতিত্ব করেন এই বরেণ্য বিজ্ঞানী।
- তিনি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অফ সাইন্সেস অফ ইন্ডিয়া-এর ফাউন্ডার ফেলো ছিলেন।
- তিনি ধারাবাহিকভাবে ক্লকওয়ার্ক গিয়ার্স ব্যবহার করে উদ্ভিদের বৃদ্ধি পরিমাপের জন্য ক্রিস্কোগ্রাফ যন্ত্রটি আবিষ্কার করেন।
- প্রথম ওয়্যারলেস সনাক্তকরণ ডিভাইস আবিষ্কারেরও তাঁর কৃতিত্ব।
- জগদীশ চন্দ্র বসু নিজের গবেষণার জন্য জীবদ্দশায় কোনো পেটেন্ট গ্রহণ করেন নি।
- তাঁর মৃত্যুর কিছুকাল আগে তিনি কলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন বসু বিজ্ঞান মন্দির।
- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর 'বনবাণী' কাব্যগ্রন্থ বন্ধু জগদীশ চন্দ্র বোস-কে উৎসর্গ করেন।

ভারতীয়রাও বিজ্ঞান গবেষণার ক্ষেত্রে কোনো অংশে যে কম যায়না, বরং সুযোগ পেলে তারা পাশ্চাত্যের চেয়েও উচ্চ হতে পারে- তা জগদীশ চন্দ্র বসু চোখে আঙ্গুল দিয়ে সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। লন্ডনের বিখ্যাত ডেইলি এক্সপ্রেস পত্রিকা তাকে গ্যালিলিও-নিউটনের সমকক্ষ বিজ্ঞানী বলে স্বীকৃতি দেন। তাঁর সম্পর্কে আইনস্টাইন বলেন-*"জগদীশচন্দ্র যেসব অমূল্য তথ্য পৃথিবীকে উপহার দিয়েছেন তার যে কোনটির জন্য বিজয়স্তম্ভ স্থাপন করা উচিত।"* ১৯৩৭ সালের ২৩ নভেম্বর এই প্রথিতযশা বিজ্ঞানী বিহারের গিরিডিতে মৃত্যুবরণ করেন।

M. N. Saha

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশে নয় – সমগ্র বিজ্ঞানের জগতে আধুনিক জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানের ভিত্তি গড়ে উঠেছে যে ক'জন মানুষের মৌলিক তত্ত্বের ওপর – অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা তাঁদের অন্যতম। ১৯২০ সালে মেঘনাদ সাহার তাপীয় আয়নায়নের সমীকরণ (আয়নাইজেশান ইকুয়েশান) প্রকাশিত হবার পর থেকে ১৯৩৮ সাল পর্যন্ত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানে যত গবেষণা হয়েছে তাদের প্রায় সবগুলোই সাহার সমীকরণ দ্বারা প্রভাবিত। নরওয়ের বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞানী সেভিন রোজল্যান্ড অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি থেকে প্রকাশিত তাঁর বিখ্যাত "থিওরেটিক্যাল এস্ট্রোফিজিক্স" বইতে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন এ'কথা। আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের

পারমাণবিক তত্ত্ব থেকে শুরু করে বিগ-ব্যাং তত্ত্বের পরীক্ষণ পর্যন্ত সহজ হয়ে উঠেছে যে যন্ত্রের উদ্ভাবনের ফলে – সেই সাইক্লোট্রনের উদ্ভাবক নোবেল বিজয়ী আর্নেস্ট লরেন্স সহ অসংখ্য বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানীর শ্রদ্ধা ও ভালবাসা অর্জন করেছেন মেঘনাদ সাহা তাঁর কাজের মধ্য দিয়ে। নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী আর্নল্ড সামারফেল্ড, নীল্স বোর, ম্যাক্স বর্ন, আলবার্ট আইনস্টাইন, আর্থার এডিংটন, এনরিকো ফার্মি, আর্থার কম্পটন প্রমুখ দিকপাল মুগ্ধতার সাথে স্বীকার করেছেন মেঘনাদ সাহার অনন্য প্রতিভার কথা।

ভারতবর্ষের বিজ্ঞানচর্চার সাথে বিশ্বের পরিচয় ঘটিয়ে দেয়ার ব্যাপারে এবং ভারতের বিজ্ঞান-গবেষণাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার ব্যাপারে মেঘনাদ সাহার অবদান অনস্বীকার্য। গবেষণার স্বীকৃতি হিসেবে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পাবার পাশাপাশি মেঘনাদ সাহা নোবেল পুরস্কারের জন্য মনোনয়ন পেয়েছেন চার বার। ভারতীয় উপমহাদেশে বিশ্বমাপের বৈজ্ঞানিক গবেষণা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে মেঘনাদ সাহার অক্লান্ত পরিশ্রমে। দেশে নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞান পড়ানো শুরু হয়েছে মেঘনাদ সাহার হাতে। নিরলস চেষ্টা ও পরিশ্রমে গড়ে তুলেছেন ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স, ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি, ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশান – সবগুলো সংগঠনই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে মেঘনাদ সাহার নেতৃত্বে। ভারতের বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিজ্ঞান শিক্ষার্থীদের প্রায় সবাই মেঘনাদ সাহার *'টেক্সট বুক অব হিট'* বইটা পড়েছেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হচ্ছে মেঘনাদ সাহা মূলত পদার্থবিজ্ঞানের ছাত্র ছিলেন না। তিনি বিএসসি ও এমএসসি পাশ করেছেন মিশ্র গণিতে। সম্পূর্ণ নিজের চেষ্টায় পদার্থবিজ্ঞান শুধু শিখেছেন তাই নয় – ক্রমশঃ পৌঁছে গেছেন এই বিষয়ের শিখরে। উপমহাদেশে প্রথম সাইক্লোট্রন স্থাপিত হয় মেঘনাদ সাহার প্রচেষ্টায়। অধ্যাপক ও বিজ্ঞানী হিসেবে প্রতিষ্ঠা পাবার পরও থেমে থাকেন নি তিনি। সাধারণ মানুষের জন্য কাজ করার লক্ষ্যে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন। বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করে গেছেন তিনি।

ঢাকা থেকে প্রায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে শেওড়াতলী গ্রাম। এ গ্রামের বেশির ভাগ মানুষ হতদরিদ্র। তাঁদের সর্বোচ্চ শিক্ষার দৌড় বড়জোর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দু'একটি শ্রেণী পর্যন্ত। গ্রামের দরিদ্র মুদিদোকানী জগন্নাথ সাহা ও ভুবনেশ্বরী দেবীর ঘরে ১৮৯৩ সালের ৬ই অক্টোবর রাতে মেঘনাদের জন্ম। ভীষণ ঝড়বৃষ্টির মধ্যে জন্মেছিলেন বলে ঠাকুরমা নাম রেখেছিলেন মেঘনাথ। পরে স্কুলে যাবার সময় নাম বদলে মেঘনাদ করা হয়। আট ভাই-বোনের মধ্যে মেঘনাদ পঞ্চম। ছয় বছর বয়সে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করানোর পাশাপাশি মেঘনাদকে দোকানে নিজের পাশে বসিয়ে কাজও শেখাতে শুরু করলেন বাবা জগন্নাথ সাহা। জাত-প্রথার নিয়মনীতির সাথে ইতোমধ্যেই পরিচিত হয়ে গেছে মেঘনাদ। অনন্তবাবুর বাড়িতে মেঘনাদের ছোঁয়া কেউ খান না। এঁটো থালা-বাসন নিজেকেই ধুতে হয় মেঘনাদের। মনে ক্ষোভ থাকলেও তাতে কিছুই যায় আসে না। কবিরাজবাবু যে তাকে বাড়িতে থাকতে দিয়েছেন তাতেই সে কৃতজ্ঞ। মন দিয়ে লেখাপড়া করলো মেঘনাদ। নিম্ন-মাধ্যমিক পরীক্ষায় সমগ্র ঢাকা জেলার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করে সরকার থেকে মাসিক চার টাকা বৃত্তি পেলো মেঘনাদ।

এবার বাড়ি থেকে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার দূরে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তির ব্যাপারে কোন আপত্তি করলেন না মেঘনাদের বাবা। ১৯০৫ সালে বারো বছর বয়সে ঢাকায় এলো মেঘনাদ। কলেজিয়েট স্কুলের হোস্টেলে থাকার ব্যবস্থা হলো। মাসিক চার টাকা সরকারি বৃত্তি ছাড়াও পূর্ব-বঙ্গ বৈশ্য সমিতি থেকে পাওয়া গেলো মাসিক দু'টাকা বৃত্তি। মাত্র ছয় টাকা দিয়ে সারা মাসের থাকা-খাওয়া আর লেখাপড়ার খরচ কীভাবে চালাবে মেঘনাদ? ভেবে অস্থির হয়ে গেলেন মেঘনাদের দাদা জয়নাথ। নিজে জুটমিলে কাজ করে বেতন পান

মাত্র বিশ টাকা। সেখান থেকেই মাসে পাঁচ টাকা করে ভাইয়ের জন্য পাঠাতে শুরু করলেন জয়নাথ। মাসিক এগারো টাকায় ভালোভাবেই চলে যাচ্ছিলো মেঘনাদের। কিন্তু হঠাৎ করে একটা বড় রকমের সমস্যায় পড়ে গেলো মেঘনাদ।

১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু হয়েছে। লর্ড কার্জনের বাংলা ভাঙার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে নানারকম আন্দোলন চলছে দেশব্যাপী। মেঘনাদের মনে বিপ্লবের টান আছে সত্যি, কিন্তু তার চেয়েও বেশি আছে যুক্তিবোধ। পড়ালেখা ছাড়া আর কোন দিকে মন দেয়ার সময় বা ইচ্ছে কোনটাই নেই মেঘনাদের। কিন্তু তার ইচ্ছের বিরুদ্ধেও অনেক কিছু ঘটে গেলো। একদিন স্কুলে যাবার পর অনেকের সাথে মেঘনাদকেও আলাদা করে লাইনে দাঁড় করানো হলো। তাদের অপরাধ – তারা খালি পায়ে স্কুলে এসেছে। মেঘনাদের জুতো কেনার টাকা নেই। সে খালি পায়েই স্কুলে আসে প্রতিদিন। কিন্তু সেদিনটা ছিল অন্যরকম। বাংলার গভর্নর ব্যামফাইল্ড ফুলারের আগমণ উপলক্ষে ঢাকায় ছাত্ররা প্রতিবাদ-মিছিল বের করেছে। পায়ে জুতো না-পরাটাও ছিল প্রতিবাদের অংশ। কলেজিয়েট স্কুলে খালি-পায়ের ছেলেদের ধরে শাস্তির ব্যবস্থা করা হলো। অনেকের সাথে মেঘনাদকেও স্কুল থেকে বহিস্কার করা হলো। বাতিল করা হলো তার বৃত্তি। এখন কোথায় যাবে মেঘনাদ?

তখন ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলছে সারাদেশে। সরকারী স্কুল-কলেজে যে রকম বহিস্কারের ধুম চলছে – সাথে সাথে বেসরকারী স্কুল-কলেজেও চলছে বহিস্কৃত ছাত্রদের ভর্তির ব্যবস্থা। ঢাকার কিশোরী লাল জুবিলী স্কুলে বিনাবেতনে মেঘনাদের ভর্তির ব্যবস্থা হলো। একটা বৃত্তিও দেওয়া হলো থাকা-খাওয়া চালানোর জন্য। স্কুল জীবনের শেষের দিকে ঢাকা ব্যাপ্টিস্ট মিশনের বাইবেল ক্লাসে যোগ দিলো মেঘনাদ। ব্যাপ্টিস্ট মিশন পরিচালিত দেশ-ব্যাপী বাইবেল পরীক্ষায় মেঘনাদ প্রথম স্থান অধিকার করে একশ' টাকা পুরষ্কার পেলো। টাকাটার খুব দরকার ছিল মেঘনাদের। ১৯০৯ সালে সারা পূর্ব-বাংলায় প্রথম স্থান অধিকার করে এন্ট্রান্স পাশ করলো মেঘনাদ।

এবার কলেজের পড়াশোনা শুরু হলো ঢাকা কলেজের বিজ্ঞান বিভাগে। তখন ঢাকা কলেজের প্রিন্সিপাল ছিলেন প্রফেসর আর্চবোল্ড। রসায়ন পড়াতেন প্রফেসর হরিদাস সাহা ও ডক্টর ওয়াট্‌সন। পদার্থবিজ্ঞান পড়াতেন বি এন দাস, গণিতের অধ্যাপক ছিলেন নরেশ ঘোষ ও কে পি বসু। ঢাকা কলেজে পড়ার সময় মেঘনাদ সাহার প্রথম বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয় কলেজ ম্যাগাজিনে – হ্যালির ধুমকেতু সম্পর্কে। তখন কলকাতায় অনেক কলেজে অতিরিক্ত একটা ঐচ্ছিক বিষয় নেয়া যেতো। কিন্তু ঢাকা কলেজে সেরকম সুযোগ ছিল না। মেঘনাদ অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে জার্মান ভাষা নিয়ে প্রাইভেটে পড়তে শুরু করলো। রসায়নের প্রফেসর নগেন্দ্রনাথ সেন ভিয়েনা থেকে ডক্টরেট করে ফিরে এসেছেন, ভালো জার্মান জানেন। তিনি মেঘনাদকে জার্মান ভাষা শেখালেন। উচ্চ-মাধ্যমিকে অতিরিক্ত বিষয় হিসেবে জার্মান ভাষার পরীক্ষা দিলো মেঘনাদ। ১৯১১ সালে উচ্চ মাধ্যমিক পাশ করলেন মেঘনাদ সাহা। পূর্ব-বাংলায় প্রথম স্থান এবং কলকাতা সহ সমগ্র বাংলায় তৃতীয় স্থান অধিকার করলেন মেঘনাদ।

এবার বিএসসিতে ভর্তি হলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ১৯১১ সালে। প্রেসিডেন্সি কলেজে তখন তারার মেলা। পদার্থবিজ্ঞান পড়াচ্ছেন স্যার জগদীশ চন্দ্র বসু, রসায়নের অধ্যাপক আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়। সহপাঠীদের মধ্যে আছেন সত্যেন্দ্রনাথ বসু – যিনি সব পরীক্ষায় প্রথম হয়েছেন। আছেন জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, নীলরতন ধর, নিখিল রঞ্জন সেন প্রমুখ – পরবর্তীতে এঁদের সবাই যার যার ক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়েছেন। প্রশান্ত চন্দ্র মহ্লানবীশ ছিলেন মেঘনাদের এক বছর সিনিয়র। যদিও পদার্থবিজ্ঞান ও রসায়ন পড়াচ্ছিলেন জগদীশ বসু ও পি সি রায় নিজে – মেঘনাদের প্রিয় বিষয় কিন্তু এ'দুটোর কোনটাই নয়।

তাঁর ভালো লাগে গণিত। সত্যেন বসুরও একই অবস্থা। সত্যেন বসু অবস্থাপন্ন ঘরের সন্তান, কলকাতায় নিজের বাড়ি থেকেই কলেজে যাতায়াত করেন। কিন্তু মেঘনাদের অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। থাকেন ইডেন হিন্দু হোস্টেলে। সেখানে জাত-প্রথার প্রচন্ড কড়াকড়ি। ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণদের জন্য আলাদা আলাদা থাকা ও খাবার ব্যবস্থা। শিক্ষিত ছেলেদের মধ্যে জাত-পাতের ক্ষুদ্রতা দেখে মন খারাপ হয়ে যায় মেঘনাদের। কিন্তু কিছুই করতে পারেন না তিনি। কারণ নীচুজাতি বলে তাঁকেও অনেক অপমান সহ্য করতে হয়। হোস্টেলের সরস্বতী পূজায় অঞ্জলি দিতে গেলে কিছু ব্রাহ্মণ সন্তান মেঘনাদকে অপমান করে মন্ডপ থেকে বের করে দেয়। যে ধর্ম-জাতি-বর্ণ মানুষে মানুষে বিভক্তি তৈরি করে সেই ধর্মের প্রতি ক্রমশ বিশ্বাস হারাতে থাকেন মেঘনাদ সাহা। হোস্টেলের পরিবেশ অসহ্য লাগতে শুরু করে মেঘনাদের। হোস্টেল ছেড়ে দিয়ে কলেজ স্ট্রিটের একটা ছাত্র-মেসে গিয়ে উঠলেন ১৯১৩ সালে। সে বছরই গণিতে অনার্স সহ বিএসসি পাশ করলেন মেঘনাদ। পরীক্ষায় মেঘনাদ সাহা প্রথম শ্রেণীতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করলেন, আর প্রথম হলেন সত্যেন বসু।

কলেজ স্ট্রিটের মেসে এসেও ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য ইত্যাদি শব্দাবলী ও তাদের অনুশাসন থেকে মুক্তি পেলেন না মেঘনাদ। এখানেও ব্রাহ্মণরা অব্রাহ্মণদের সাথে বসে খান না। আর মেঘনাদের সাথে তো কেউই খেতে বসেন না। তবে অন্য একটা ব্যাপারে মেঘনাদের মিশ্র অনুভূতি হলো। মেসে আসার পর অনেক তরুণ ছাত্রনেতা ও রাজনৈতিক কর্মীর সাথে পরিচয় হলো তাঁর। নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু ছিলেন মেঘনাদের তিন বছরের জুনিয়র। মেসে যাওয়া আসা ছিল তাঁর। অনুশীলন সমিতির তরুণ নেতা পুলিন দাস, শৈলেন ঘোষ, যুগান্তরের নেতা যতীন মুখার্জি- যিনি নিজের হাতে একটা ভোজালি দিয়ে বাঘ মেরে বাঘা যতীন নামে পরিচিত হয়েছেন – সবার সাথে বন্ধুত্ব হয়ে গেলো মেঘনাদ সাহার। বাঘা যতীন মেঘনাদকে প্রায়ই বলতেন বিপ্লবীদের সাথে একটা দূরত্ব রেখে চলতে। কারণ দেশের কাজে শুধু বিপ্লবীদের নয় মেঘনাদের মত মেধাবী ছাত্রদেরও দরকার আছে – যারা জাতি গঠন করবেন। ব্রিটিশ সরকার বিপ্লবীদের পেছনে গোয়েন্দা লাগিয়ে নজর রাখছে। মেঘনাদ নিজেও বুঝতে পারেন সেটা। সক্রিয় রাজনীতি থেকে নিজেকে যথাসম্ভব দূরে রাখার চেষ্টা করেন। কারণ তিনি জানেন তাঁর ওপর সংসারের অনেক দায়িত্ব। মা-বাবা ভাইবোনদের দেখতে হবে, ছোট ভাইকে লেখাপড়া করাতে হবে। এমএসসি পাশ করে ফাইনেন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার পরিকল্পনা করে রেখেছেন।

১৯১৫ সালে মিশ্র-গণিতে এমএসসি পাশ করলেন মেঘনাদ সাহা। এবারেও তিনি দ্বিতীয় হলেন আর সত্যেন বসু প্রথম। পূর্ব-পরিকল্পনা অনুসারে ইন্ডিয়ান ফাইনেন্সিয়াল সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দেবার জন্য দরখাস্ত করলেন মেঘনাদ সাহা। এদিকে বাড়ি থেকে মেঘনাদের ছোটভাই কলকাতায় চলে এসেছে দাদার কাছে থেকে লেখাপড়া করবে বলে। ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসের চাকরিটা হয়ে গেলে আর কোন সমস্যা থাকবে না। বেতন ভাতা আর অন্যান্য সুযোগ সুবিধা অনেক বেশি এই ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসে। কিন্তু পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেলেন না মেঘনাদ সাহা। ব্রিটিশ গোয়েন্দারা রিপোর্ট দিয়েছে – মেঘনাদ সাহা বিপ্লবীদের সাথে যুক্ত। ব্রিটিশ রাজত্বে সরকারী চাকরির সব সম্ভাবনাই বন্ধ হয়ে গেলো মেঘনাদের। কোন একটা চাকরি পাবার আগপর্যন্ত উপার্জনের একমাত্র রাস্তা হয়ে দাঁড়ালো টিউশনি। সকাল থেকে রাত পর্যন্ত কলকাতার এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত সাইকেল চালিয়ে দিনে তিনটি পর্যন্ত টিউশনি করতেন মেঘনাদ সাহা। অধ্যাপক হবেন, গবেষণা করবেন, বিজ্ঞানী হবেন এরকম কোন পূর্ব-পরিকল্পনা ছিল না তাঁর।

এদিকে বাংলার বিখ্যাত সব মানুষেরা বাংলার উন্নতির জন্য কাজ করে যাচ্ছেন যে যেভাবে পারেন। ১৯০৬ সালে উপাচার্য হবার পর থেকে স্যার আশুতোষ মুখার্জি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য চেষ্টা

করে যাচ্ছেন দিনরাত। ১৯১৪ সালে দু'জন নামকরা উকিল তারকনাথ পালিত ও রাসবিহারী ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য প্রচুর টাকা দিয়েছেন। সেই টাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো বিজ্ঞান কলেজ। বিজ্ঞান কলেজ প্রতিষ্ঠা করার কিছুদিন পর স্যার আশুতোষ মুখার্জির মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট সহ আরো অনেক গুরুত্বপূর্ণ কমিটিতে ছিলেন তিনি। বিজ্ঞান কলেজের জন্য উপযুক্ত শিক্ষক খুঁজে বের করার দায়িত্ব নিষ্ঠার সাথে পালন করেন তিনি। দেশের সেরা ছাত্রদের ডেকে এনে চাকরি দেন বিশ্ববিদ্যালয়ে। স্যার আশুতোষ মুখার্জি ১৯১৫ সালের এমএসসি পরীক্ষায় প্রথম ও দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সত্যেন্দ্রনাথ বোস ও মেঘনাদ সাহাকে ডেকে নিলেন ১৯১৬ সালে। দু'জনেরই চাকরির দরকার ছিল তখন। দু'জনই যোগ দিলেন গণিত বিভাগের প্রভাষক পদে।

তেইশ বছরের তরুণ প্রভাষক মেঘনাদ সাহা মন-প্রাণ দিয়ে কাজ শুরু করলেন গণিত বিভাগে। কিন্তু বিভাগীয় প্রধান গনেশ প্রসাদের অসহযোগিতার কারণে কাজ করা দুরুহ হয়ে পড়লো। অধ্যাপক গনেশ প্রসাদ মেঘনাদ সাহা ও সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে যখন তখন অপমান করেন। বলেন – 'পরীক্ষায় অনেক অনেক নম্বর পেয়ে ফার্স্ট সেকেন্ড হলেই বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানোর যোগ্যতা হয়ে যায় না কারো। আশুবাবু কিছু না বুঝেই দুটো বাচ্চা ছেলে ধরে এনেছেন'। এত অপমান সহ্য করা যায় না। মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ আবার গেলেন স্যার আশুতোষের কাছে। সব শুনে তিনি বললেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে যোগ দিতে। মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ যোগ দিলেন পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে। সেখানে তাঁদের আগে যোগ দিয়েছেন দেবেন্দ্রমোহন বসু ও শিশিরকুমার মিত্র। পরের বছর যোগ দিয়েছেন সি ভি রামন।

পদার্থবিজ্ঞানের অনার্স বা মাস্টার্স না হয়েও পদার্থবিজ্ঞানের প্রভাষক হয়ে বিরাট দায়িত্বের মুখোমুখি পড়ে গেলেন মেঘনাদ। সত্যেন্দ্রনাথেরও একই অবস্থা। প্রেসিডেন্সী কলেজে পড়ার সময় পদার্থবিজ্ঞান পড়েছেন মাত্র এক বছর – বিএসসি'র সাবসিডিয়ারি বিষয় হিসেবে। মেঘনাদের কাছে "জগদীশ বসুর পদার্থবিজ্ঞানের ব্যবহারিক ক্লাসের চেয়েও বেশি ভাল লাগতো প্রফেসর ডি এন মল্লিকের গণিতের ক্লাস"। সাহা পদার্থবিজ্ঞানের উচ্চতর ক্লাসের ছাত্রদের পড়াতে শুরু করলেন – স্পেকট্রোস্কোপি ও থার্মোডায়নামিক্স। নিজে নিজে পড়তে পড়তে শিখতে শিখতে পড়ানো। পড়তে পড়তে পদার্থবিজ্ঞানকে গভীরভাবে ভালবেসে ফেললেন মেঘনাদ সাহা। শক্ত গাণিতিক বুনিয়াদ তো আগেই ছিল – এখন পদার্থবিজ্ঞানে নতুন নতুন তত্ত্বীয় গবেষণা শুরু করতে তেমন কোন অসুবিধে হলো না। অবশ্য পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণাগার বলতে তেমন কিছুই শুরুতে ছিল না। তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় মেঘনাদের সবচেয়ে বড় গবেষণাগার হিসেবে কাজ করেছে প্রেসিডেন্সী কলেজের লাইব্রেরি। পদার্থবিজ্ঞানের নতুন নতুন তত্ত্ব নিয়ে কাজ চলছে ইউরোপে। বিশেষ করে জার্মানিতে। কোয়ান্টাম মেকানিক্সের ভিত্তি রচিত হচ্ছে। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার সার্বিক তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছে ১৯১৬ সালে । ঢাকা কলেজে পড়ার সময় মেঘনাদ যে জার্মান শিখেছিলেন তা কাজে লেগে গেলো। সত্যেন্দ্রনাথও জার্মান শিখেছেন। এর মধ্যে জার্মান প্রফেসর ব্রুলের সাথে বন্ধুত্ব হয়েছে তাঁদের। প্রফেসর ব্রুল শিবপুরের বেঙ্গল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে বোটানির প্রফেসর ছিলেন। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতার কারণে বোটানির ফিল্ডট্রিপে যেতে পারতেন না বলে ফিজিক্স পড়ানো শুরু করলেন । ব্রুল জার্মানি থেকে নিয়ে আসা অনেকগুলো ফিজিক্সের বই দিয়ে সাহা ও বসুকে সাহায্য করেছেন। জার্মানি থেকে ফেরার সময় দেবেন্দ্রমোহন বসুও কিছু বই নিয়ে এসেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদের জন্য । ম্যাক্স প্লাংকের থার্মোডায়নামিক্সের বই, ব্র্যামস্টারলাং এক্স-রে সম্পর্কিত বই, আইনস্টাইনের পেপার ইত্যাদি। ছাত্ররা পদার্থবিজ্ঞানের একেবারে তরতাজা বিষয়গুলো সম্পর্কে জানতে শুরু করলো সাহা ও বসুর কাছ থেকে।

১৯১৭ সালে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ‘পালিত প্রফেসর’ পদে যোগ দিলেন সি ভি রামন। ১৯০৭ থেকে তিনি ইন্ডিয়ান ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসে কাজ করার পাশাপাশি ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশান ফর দি কাল্টিভেশান অব সায়েন্স-এ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছিলেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জির আহ্বানে ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসের এত বড় চাকরি ছেড়ে অর্ধেকেরও কম বেতনের প্রফেসর পদে যোগ দিয়েছেন। মেঘনাদ সাহা ফাইনেন্সিয়াল সার্ভিসের জন্য পরীক্ষা দিতে না পেরে যে কষ্ট পেয়েছিলেন – রামনকে দেখে তা দূর হয়ে গেলো। বুঝতে পারলেন যে তিনি ঠিক জায়গাতেই এসেছেন। পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপনা ও গবেষণায় একনিষ্ঠভাবে কাজ শুরু করলেন সাহা। তবে রামনের মত পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের দিকে না গিয়ে নিজের মত করে তত্ত্বীয় পদার্থবিজ্ঞানের দিকেই এগোলেন।

কোয়ান্টাম মেকানিক্স ও থার্মোডায়নামিক্সের তত্ত্বগুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলেন মেঘনাদ সাহা। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত্ব, সার্বিক তত্ত্ব সহ ১৯০৫ থেকে ১৯১৬ সাল পর্যন্ত প্রকাশিত সবগুলো গবেষণা-পত্র মূল জার্মান থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করার কাজে হাত দিলেন মেঘনাদ ও সত্যেন্দ্রনাথ। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ‘প্রিন্সিপাল্‌স অব রিলেটিভিটি’ নামে বই আকারে প্রকাশিত হয় এ অনুবাদ। বইয়ের ভূমিকা লিখেছিলেন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের এটাই সর্বপ্রথম ইংরেজিতে অনুবাদ শুধু নয়, সারাবিশ্বে এই বইটাই আইনস্টাইনের রচনার প্রথম অনুবাদ। এখানে উল্লেখ্য যে ১৯৭৯ সালে আইনস্টাইনের জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে উল্লেখ করা হয় যে আইনস্টাইনের রচনার প্রথম অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল জাপানে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন নোবেল বিজয়ী পদার্থবিজ্ঞানী চন্দ্রশেখর সুব্রাহ্মনিয়াম। তিনি জানতেন সাহা ও বসুর অনুবাদের কথা। সুব্রাহ্মনিয়ামের চেষ্টায় আইনস্টাইনের রচনার প্রথম অনুবাদের স্বীকৃতি পাওয়া গেলো। সাহা ও বসুর অনুবাদ এখন প্রিন্সটন ইউনিভার্সিটির আইনস্টাইন আর্কাইভে রাখা আছে। এই অনুবাদের মাধ্যমেই আইনস্টাইনের সাথে প্রথম যোগাযোগ হয় সত্যেন্দ্রনাথ ও মেঘনাদের।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতার তত্ত্ব সম্পর্কিত গবেষণাপত্রগুলো পড়ে ম্যাক্সওয়েলের তড়িৎচুম্বক তত্ত্বের ওপর গবেষণা-পত্র প্রকাশ করেন মেঘনাদ সাহা। লন্ডনের ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় সাহার প্রথম গবেষণাপত্র “অন ম্যাক্সওয়েলস স্ট্রেসেস” । একই বছর আমেরিকার ফিজিক্যাল রিভিউতে প্রকাশিত হয় “অন দি লিমিট অব ইন্টারফিয়ারেন্স ইন দি ফ্যাব্রেআপেক্ষিকতার বিশেষ তত্ত । “পেরট ইন্টারফেরোমিটার-্ব প্রয়োগ করে ইলেকট্রনের গতি সম্পর্কিত লিনার্ড-বিকার্ট (Lienard-Wiechert) পটেনশিয়ালের গাণিতিক ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন সাহা। ১৯১৮ সালে ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় এ গবেষণাপত্র ।

১৯১৮ সালে স্থিতিস্থাপকতার নতুন তত্ত্ব প্রকাশ করেন মেঘনাদ সাহা। ‘অন এ নিউ থিওরম ইন ইলাস্টিসিটি’ গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয় এশিয়াটিক সোসাইটির জার্নালে। এই জার্নালের একই সংখ্যায় আলোর চাপের ওপর তাঁর আরেকটি গবেষণাপত্র প্রকাশিত হয়। সহকর্মী এস চক্রবর্তীর সাথে যৌথভাবে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ‘অন দি প্রেসার অব লাইট’ শিরোনামে। কোয়ান্টামে মেকানিক্স নিয়েও কাজ শুরু করেছেন তিনি সত্যেন্দ্রনাথ বসুর সাথে। সাহা ও বসুর প্রথম যৌথ-গবেষণাপত্র ‘অন দি ইনফ্লুয়েন্স অব দি ফাইনাইট ভলিয়্যুম অব মলিকিউল্‌স অন দি নিউ ইকুয়েশান অব স্টেট’ প্রকাশিত হয় ১৯১৮ সালে ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে।

১৯১৭ ও ১৯১৮ সালে প্রকাশিত ছয়টি গবেষণা-পত্রের ওপর ভিত্তি করে ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রির জন্য থিসিস জমা দেন মেঘনাদ সাহা ১৯১৮ সালে। কোন গবেষণা তত্ত্বাবধায়কের সাহায্য ছাড়াই কাজ করতে হয়েছে মেঘনাদকে। তাঁর তড়িৎচুম্বক তত্ত্ব ও বিকিরণের চাপ সংক্রান্ত থিসিসটি পাঠানো হয় প্রফেসর রিচার্ডসন (O.

W. Richardson), ক্যাম্পবেল (N. R. Campbell) ও পোর্টারের (Porter) কাছে। পরীক্ষকরা সবাই প্রতিষ্ঠিত পদার্থবিজ্ঞানী। (রিচার্ডসন থার্মিয়নিক এমিশান আবিষ্কারের জন্য ১৯২৮ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরষ্কার পেয়েছিলেন।) তিনজন পরীক্ষকই ভূয়সী প্রশংসা করেন মেঘনাদের গবেষণার। ১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ডক্টর অব সায়েন্স ডিগ্রি প্রদান করে মেঘনাদ সাহাকে।

মেঘনাদ শক্তির বিকিরণের চাপ (radiation pressure) সংক্রান্ত মৌলিক গবেষণা শুরু করেছিলেন ১৯১৭ সালেই। ১৯১৭ সালের শেষের দিকে 'সিলেকটিভ রেডিয়েশান প্রেসার' শিরোনামে বেশ বড় একটি গবেষণাপত্র রচনা করেন তিনি। সৌর-পরমাণুর ওপর মাধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীতে বিকিরণের চাপের প্রভাব নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছিলেন ওই গবেষণাপত্রে। এস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্রটি পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু জার্নালের সম্পাদক জানালেন গবেষণাপত্রটি প্রকাশের পক্ষে বড় দীর্ঘ হয়ে গেছে। তবে প্রকাশ করা যেতে পারে একটি শর্তে। প্রকাশনার খরচ যদি মেঘনাদ সাহা দিতে পারেন তবে। সেই ১৯১৭ সালে মেঘনাদের পক্ষে শতাধিক ডলার দেয়া কোনভাবেই সম্ভব ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা খাতে কোন টাকা বরাদ্দ নেই। সাহা যা বেতন পান (বছরে মাত্র ১৫০ পাউন্ড) তা দিয়ে মা-বাবাকে সাহায্য করা ছাড়াও ছোট-ভাইয়ের যাবতীয় খরচও সামলাতে হতো। সাহা এস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালের সম্পাদককে জানালেন টাকা দিতে না পারার কথা। এরপর সম্পাদকের কাছ থেকে আর কিছুই জানা যায় নি। পেপারটিও তিনি ফেরৎ পান নি। অনেক বছর পরে ১৯৩৬ সালে সাহা যখন ইয়র্কের মান-মন্দির পরিদর্শন করছিলেন তখন ডক্টর মর্গান সাহাকে তাঁর ১৯১৭ সালের পেপারের পান্ডুলিপিটি দেখান। পেপারটি ১৯১৭ সাল থেকে ওখানকার ড্রয়ারেই পড়েছিল। এস্ট্রোফিজিক্যাল জার্নালে পেপারটির খুবই ছোট্ট একটা টীকা প্রকাশিত হয় ১৯১৯ সালে 'রেডিয়েশান প্রেসার' শিরোনামে । মূল পেপারটির অনেকদিন কোন খবর না পেয়ে অনুলিপিটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান সাময়িকীতে প্রকাশের জন্য পাঠান। সেখানে 'অন সিলেকটিভ রেডিয়েশান প্রেসার এন্ড প্রোবলেম অব সোলার এটমস্ফিয়ার' শিরোনামে গবেষণাপত্রটি প্রকাশিত হয় ১৯২০ সালে । স্বাভাবিক ভাবেই কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ জার্নালের খবর সবার কাছে পৌঁছায় না। ফলে বিকিরণের চাপ সংক্রান্ত মেঘনাদ সাহার মৌলিক গবেষণার কথা প্রায় অজানাই রয়ে গেলো বেশ কয়েক বছর। ১৯২১ সালে নেচার সাময়িকীতে সাহার এ সংক্রান্ত আরেকটি পেপার "দি স্টেশনারি এইচ এন্ড কে লাইন্স অব ক্যালসিয়াম ইন স্টেলার এটমস্ফিয়ার" প্রকাশিত হলে তা অনেকেরই চোখে পড়ে এবং সেখান থেকে অনেকেই নতুন ধারণা হিসেবে গবেষণাপত্র প্রকাশ করেন – যা এক বছর আগেই মেঘনাদ প্রকাশ করেছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জার্নালে।

এমএসসি ক্লাসে থার্মোডায়নামিক্স ও স্পেকট্রোস্কোপি পড়ানোর সময় থেকেই তাপীয় আয়নায়নের ধারণা দানা বাঁধতে থাকে মেঘনাদের মনে। জার্মান বিজ্ঞান সাময়িকীর নিয়মিত পাঠক হিসেবে সাহা জানতেন এ সংক্রান্ত কী কী গবেষণা চলছে। বিজ্ঞানী নার্নস্ট এর তাপীয় তত্ত্ব ইতোমধ্যেই প্রকাশিত হয়েছে। নার্নস্টের ছাত্র এগার্ট ১৯১৯ সালে প্রকাশিত এক গবেষণাপত্রে উচ্চ-তাপমাত্রার কারণে নক্ষত্রের মধ্যে অধিক হারে আয়নায়ন ঘটার কারণ ব্যাখ্যা করেন। সাহা পেপারটিতে কিছু অসংগতি লক্ষ্য করেন। বিশেষ করে তাপীয় আয়নায়নের যে সূত্র এগার্ট দিয়েছেন তাতে পরমাণুর আয়নাইজেশান পটেনশিয়েল নির্ণয়ের ব্যাপারে খুব একটা গুরুত্ব দেন নি। সাহা ঠিক করলেন আয়নাইজেশান পটেনশিয়েল সঠিক ভাবে হিসেব করবেন যেখান থেকে যেকোন তাপে ও চাপে যেকোন পরমাণুর আয়নাইজেশান বা আয়নায়ন সঠিক ভাবে নির্ণয় করা যাবে। ১৯১৯ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে পরপর চারটি গবেষণা-পত্র রচনা করে ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে

প্রকাশের জন্য পাঠালেন। ১৯২০ সালে গবেষণা-পত্রগুলো ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। তাঁর "আয়নাইজেশান ইন দি সোলার ক্রোমোস্ফিয়ার" গবেষণাপত্রে বর্ণিত হয় তাঁর বিখ্যাত তাপীয় আয়নায়নের সূত্র যা 'সাহা থার্মাল আয়নাইজেশান ফর্মূলা' নামে পরিচিতি লাভ করে। একাধিক বিষয়ে গবেষণা করলেও তিনি বিখ্যাত হন তাপজনিত আয়নন বা thermal ionization বিষয়ক তত্ত্বের জন্যে। আপাতদৃষ্টিতে মনে হতে পারে যে মেঘনাদ সাহার বিজ্ঞান গবেষণা নির্ভেজাল পদার্থবিদ্যা ও শুষ্ক গাণিতিক সমীকরণের সমাহার। কিন্তু ছোটবেলা থেকে জাতপাতের ভিত্তিতে তৈরি হওয়া সামাজিক বিভাজনের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ যে সাহার তাপজনিত আয়ননের গবেষণার মূলে নিহিত ছিল, তা পর্যালোচনা করে দেখিয়েছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনলজির (এমআইটি) বিজ্ঞানের ইতিহাসের গবেষক আভা শূর। ২০১১ সালে প্রকাশিত তাঁর 'ডিসপার্সড রেডিয়েন্স— কাস্ট, জেন্ডার অ্যান্ড মডার্ন সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া' বইয়ের ব্যাখ্যা অনুযায়ী মেঘনাদ সাহা সূর্য বা কোনও নক্ষত্রে স্থিত পদার্থগুলির পরমাণুর আয়ননের ঘটনা ব্যাখ্যা করেছিলেন তাঁর জাতপাত বিরোধী সমাজভাবনার প্রেরণায়। নক্ষত্রের মধ্যকার পরমাণুগুলি প্রচণ্ড তাপ ও চাপে যেমনটা ব্যবহার করে, তা তাদের নিজস্ব ধর্ম অনুযায়ী। নিজস্ব ইচ্ছে অনুযায়ী। নক্ষত্রের প্রভাবে নয়। অধ্যাপক সাহার চিন্তাভাবনায় গোটা সমাজটাই একটা নক্ষত্র, যে সব সময়ই তার মধ্যকার পদার্থের পরমাণুগুলিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে যাচ্ছে। কিন্তু পরমাণুগুলি নিজের ইচ্ছে মতোই জীবন কাটাবে, যেমনটা কাটিয়েছিলেন মেঘনাদ। শেওড়াতলির অন্ধকারে ডুবে থাকা গ্রাম থেকে প্রেসিডেন্সি কলেজ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক হওয়া, আন্তর্জাতিক জার্নালে গবেষণাপত্র প্রকাশ করা, আরও পরে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটির সভ্য নির্বাচিত হওয়া— তাঁর নিজের জীবনটাই যেন নক্ষত্রের প্রচণ্ড তাপ ও চাপের সম্মুখীন হওয়া এক পরমাণুর গল্প, যে কিনা চাপিয়ে দেওয়া সামাজিক বিধিনিষেধে প্রভাবিত হয়নি। বরং তাঁর স্বাধীন ইচ্ছে, নিজের ভবিষ্যৎ নিজেই বেছে নেওয়ার প্রত্যয় প্রভাবিত করেছে গোটা সমাজকে। তবে এই সমস্ত কিছুই খুব সহজে হয়েছিল, এমনটা নয়।

১৯১৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিএসসি ডিগ্রির পাশাপাশি 'প্রেমচাঁদ-রায়চাঁদ' ও 'গুরুপ্রসন্ন ঘোষ' বৃত্তি লাভ করেন মেঘনাদ সাহা। এই বৃত্তির টাকায় মেঘনাদ প্রায় দু'বছর ইউরোপে ভ্রমণ ও গবেষণার সুযোগ পেলেন। ১৯১৯ সালের শেষের দিকে লন্ডনে পৌঁছলেন মেঘনাদ সাহা। ইচ্ছে ছিল কেমব্রিজ বা অক্সফোর্ডে গিয়ে কাজ করবেন। কিন্তু সেখানে খরচ এত বেশি যে দুটো বৃত্তি থাকা সত্ত্বেও তা সম্ভব হয়নি মেঘনাদের পক্ষে। মেঘনাদ গেলেন ইম্পেরিয়াল কলেজে। তাঁর কলেজ জীবনের বন্ধু জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখার্জি তখন সেখানে ফিজিক্যাল কেমিস্ট্রিতে পিএইচডি করছেন। এখানেই মেঘনাদের সাথে পরিচয় হয় শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের সাথে। কিছুদিনের মধ্যেই তাঁদের মধ্যে বেশ ভালো বন্ধুত্ব হয়ে যায়। ইম্পেরিয়াল কলেজে শুরুতে সুনির্দিষ্ট কোন অধ্যাপকের সাথে কাজ করার পূর্ব-পরিকল্পনা সাহার ছিল না। প্রথম কয়েকদিন ঠিক বুঝতেও পারছিলেন না কোত্থেকে শুরু করবেন। মেঘনাদের প্রেসিডেন্সি কলেজের সহপাঠী স্নেহময় দত্ত তখন ইম্পেরিয়াল কলেজে পদার্থবিজ্ঞানে পিএইচডি করছেন। তিনি সাহাকে পরামর্শ দিলেন প্রফেসর ফাউলারের সাথে কাজ করতে। প্রফেসর ফাউলারের গবেষণার সাথে মেঘনাদ পরিচিত। বিখ্যাত জ্যোতিঃপদার্থবিদ স্যার নরম্যান লক্ইয়ারের ছাত্র ফাউলার ছিলেন নেচার সাময়িকীর প্রথম সম্পাদক। ফাউলার নক্ষত্রের বর্ণালী নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেসময়।

মেঘনাদ সাহাকে প্রথম দেখে প্রফেসর ফাউলার মনে করেছিলেন যে অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের মত সাহাও পিএইচডি করতে এসেছেন তাঁর কাছে। কিন্তু সাহা যখন বললেন যে তিনি এসেছেন মাত্র কয়েক মাসের জন্য – নিজের তত্ত্ব যাচাই করে নিতে – তখন ফাউলার মোটেও পাত্তা দিলেন না তাঁকে। শুধু বললেন –

“যাও, ল্যাবে গিয়ে কাজ করো। দেখো যা যাচাই করতে এসেছো তা পাও কি না”। কিন্তু কিছুদিন পরই ফিলসফিক্যাল ম্যাগাজিনে সাহার “আয়নাইজেশান ইন দি সোলার ক্রোমোস্ফিয়ার” প্রকাশিত হলে ফাউলারের ব্যবহার আগাগোড়া বদলে যায়। তিনি সাহাকে খুবই গুরুত্ব দিতে শুরু করেন। ফাউলারের সাথে পাঁচ মাস কাজ করেছিলেন মেঘনাদ সাহা। এসময় সাহা স্যার জে জে থমসনের কাছে অনুরোধ করেছিলেন কেমব্রিজের ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবে পরীক্ষা করে সাহার তত্ত্বের সত্যতা যাচাই করে দেখার জন্য। কিন্তু স্যার থমসন জানালেন সাহার পরীক্ষণের জন্য যে উচ্চ-তাপমাত্রার দরকার – সেরকম যন্ত্রপাতি তাঁর ল্যাবে নেই। তিনি পরামর্শ দিলেন বার্লিনে গিয়ে প্রফেসর নার্নস্টের সাথে যোগাযোগ করতে।

জার্মানির প্রতি মেঘনাদ সাহার একটা দুর্বলতা বরাবরই ছিল। জার্মানের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উৎকর্ষতা সবসময়েই মুগ্ধ করেছে মেঘনাদকে। জার্মান ভাষা তাঁর জানা আছে। ১৯২০ সালে তিনি বার্লিনে গেলেন এক বছরের জন্য। লন্ডন থেকে যাবার সময় প্রফেসর ডোনানের কাছ থেকে একটি চিঠি নিয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু একই সময়ে সাহার মত আরো চৌদ্দ জন ছাত্র এরকম চিঠি নিয়ে গেছেন নার্নস্টের কাছে। প্রফেসর ওয়াল্টার নার্নস্ট তখন বিশ্ববিখ্যাত। সে বছরই (১৯২০) নার্নস্ট পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন। নার্নস্ট শুরুতে লন্ডন থেকে আসা কোন ছাত্রকেই তাঁর ল্যাবে ঢুকতে দিতে রাজী হন নি। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে জার্মানির হেরে যাওয়ার কারণে ইংল্যান্ডের ওপর অনেক রাগ নার্নস্টের। পরে অবশ্য তিনি সাহাকে তাঁর ল্যাবে কাজ করতে দিতে রাজী হয়েছেন। কারণ হিসেবে সাহাকে তিনি বলেছেন – *“ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের গালে শেষ চড়টা ভারতই মারবে”* । বার্লিনে থাকাকালীন মেঘনাদ সাহার সুযোগ হয় ম্যাক্স প্ল্যাংক, আর্নল্ড সামারফেল্ড ও আলবার্ট আইনস্টাইনের সাথে ব্যক্তিগতভাবে পরিচিত হবার। আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের প্রথম অনুবাদক সাহা ও বোস। শুধু তাই নয়- ১৯১৯ সালে আইনস্টাইনের সার্বিক তত্ত্বের পরীক্ষামূলক প্রমাণ পাওয়ার পর আইনস্টাইন যখন রাতারাতি বিশ্ববিখ্যাত হয়ে গেছেন , তখন ভারতীয় সংবাদপত্রে আইনস্টাইনের কাজ সম্পর্কিত প্রথম রচনাটিও মেঘনাদ সাহাই লিখেছিলেন। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সাথেও সাহার ব্যক্তিগত পরিচয় হয় বার্লিনে এসে সামারফেল্ডের মাধ্যমে। বার্লিনে বসে মেঘনাদ সাহা জার্মান ভাষায় গবেষণাপত্র রচনা করেন এবং তা জার্মানির বিখ্যাত সাময়িকী Zeitschrift fur Physik-এ প্রকাশিত হয় ১৯২১ সালে।

১৯২০ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রিফিথ মেমোরিয়াল প্রাইজ পান মেঘনাদ সাহা। ছদ্মনামে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ জমা দিতে হতো এই প্রাইজের জন্য। মেঘনাদ ‘হিলিওফিলাস’ ছদ্মনামে ‘অরিজিন্‌স অব লাইন্‌স ইন স্টেলার স্পেক্‌ট্রা’ প্রবন্ধটি পাঠিয়েছিলেন ইউরোপ থেকে। অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু ছিলেন গ্রিফিথ পুরস্কারের অন্যতম বিচারক ।

ইতোমধ্যে স্যার আশুতোষ মুখার্জি আবার উপাচার্য পদে যোগ দিয়েছেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯১৯ সালে তিনি যখন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি ছিলেন তখন খয়রার রাজা কুমার গুরুপ্রসাদ সিং-এর বিরুদ্ধে তাঁর রাণী বাগেশ্বরী দেবীর মামলার নিষ্পত্তি হয় ছয় লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণের মাধ্যমে। রাণী বাগেশ্বরী টাকাগুলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দান করে দেন। স্যার আশুতোষ মুখার্জি ওই টাকা দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ‘খয়রা অধ্যাপক’ পদ সৃষ্টি করেন। মেঘনাদ সাহার গবেষণায় উন্নতির সব খবর তিনি রাখেন। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের ‘খয়রা অধ্যাপক’ পদের জন্য তিনি মেঘনাদ সাহাকে মনোনীত করে টেলিগ্রাম পাঠালেন সাহার কাছে বার্লিনে।

১৯২১ সালের নভেম্বরে কলকাতায় ফিরে এসে অধ্যাপক পদে যোগ দিলেন মেঘনাদ সাহা। স্যার আশুতোষ মুখার্জি বিভিন্ন জনের ব্যক্তিগত অনুদান থেকে অধ্যাপকের পদ সৃষ্টি করে বিভিন্ন বিভাগের সম্প্রসারণ করলেও সরকার থেকে কোন ধরণের সহযোগিতা পাচ্ছিলেন না। ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ক্রমশ

জোরালো হচ্ছে। সরকারের সাথে শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের বিরোধও বাড়ছে। সাহার বন্ধু সত্যেন্দ্রনাথ চলে গেছেন নবপ্রতিষ্ঠিত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। শিশির মিত্র তখন প্যারিসে শিক্ষাছুটিতে। মেঘনাদ গবেষণাগার তৈরি করার কোন সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না। সরকার থেকে প্রতিশ্রুতি দেবার পরও কোন অনুদান পাওয়া যাচ্ছে না। ১৯২২ সালে আড়াই লাখ টাকার একটা রিসার্চ গ্রান্ট মঞ্জুর হবার পরে দেখা গেলো সেই গ্রান্টের সাথে যেসব শর্ত জুড়ে দেয়া হয়েছে তা মানতে গেলে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক হিসেবে কোন ধরনের আত্মমর্যাদা থাকে না। ফলে স্যার আশুতোষ মুখার্জি সিদ্ধান্ত নিয়েছেন ওই টাকা নেবেন না। অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা পড়লেন উভয়সঙ্কটে। তিনি অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ে চলে যাবার সিদ্ধান্ত নিলেন। বেনারস হিন্দু ইউনিভার্সিটি ও আলিগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটি থেকে অফার পেলেন। কিন্তু তিনি দুটো অফারই বাতিল করে দিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে সাহার দু'বছরের সিনিয়র ছিলেন নীলরতন ধর। তিনি তখন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক। তিনি সাহাকে উদ্বুদ্ধ করলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগ দেয়ার জন্য।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পদত্যাগ করার আগে অধ্যাপক সাহা সিন্ডিকেটের কাছে লিখলেন- "আমি এখনো কাজ করতে রাজী আছি যদি আমার বেতন ৬৫০--১০০০ টাকা স্কেলে উন্নীত করা হয় এবং আরো পনের হাজার টাকা আমাকে ব্যক্তিগত গবেষণা খাতে দেয়া হয়"। সিন্ডিকেট সাহার কোন কথাতেই কান দেয় নি। ১৯২৩ সালে কলকাতা ছেড়ে অধ্যাপক সাহা যোগ দিলেন এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে।

এলাহাবাদে যোগ দেবার কয়েক দিনের মধ্যেই সাহা বুঝতে পারলেন এখানের অবস্থাও খুব একটা ভালো নয়। গবেষণাগার, গবেষণার সুযোগ কিছুই তেমন নেই। ডিপার্টমেন্টে এক শ' বিশ জন ছাত্র অথচ মেঘনাদ একাই অধ্যাপক। সাথে আছেন মাত্র একজন সহযোগী অধ্যাপক, একজন প্রভাষক ও দু'জন প্রদর্শক। সবকিছুই একেবারে গোড়া থেকে শুরু করতে হলো। কিন্তু তা করতে গিয়ে কারো সহযোগিতা পাওয়া তো দূরের কথা, বরং পদে পদে বাধার সম্মুখীন হয়েছেন। ডিপার্টমেন্টের প্রায় পরিত্যক্ত লাইব্রেরির জন্য নতুন বই ও জার্নাল কেনার জন্য টাকা চাইলে বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (যিনি আগে এলাহাবাদ কোর্টের বিচারক ছিলেন) খুবই তাচ্ছিল্যের সাথে সাহাকে প্রশ্ন করেন – "লাইব্রেরির সব বই কি পড়া হয়ে গেছে? যদি না হয়ে থাকে তাহলে আরো নতুন বই কিনে কী হবে?" সাহা আশ্চর্য হয়ে খেয়াল করলেন এরকম বুদ্ধি ও মানসিকতার মানুষেরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় বড় পদে বসে আছেন। পরবর্তী পাঁচ বছর ধরে সাহা প্রচন্ড পরিশ্রম ও সংগ্রাম করে এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞান বিভাগকে ভারতের নামকরা ডিপার্টমেন্টে উন্নীত করেন। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে সাহার সহকর্মী ও ছাত্রদের অনেকেই পরবর্তীতে বিখ্যাত হন। তাঁদের মধ্যে আছেন এন কে সুর, পি কে কিচলু, ডি এস কোঠারি, আর সি মজুমদার, আত্মারাম, কে বি মাথুর, বি ডি নাগচৌধুরি, বি এন শ্রীবাস্তব প্রমুখ।

সাহা তাঁর তত্ত্বীয় গবেষণার ফলাফল উন্নতমানের যন্ত্রপাতির অভাবে পরীক্ষা করে দেখতে পারছিলেন না। যন্ত্রপাতি কেনার টাকার জন্য তিনি তাঁর আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলেও হাত পেতেছেন অনেকের কাছে। উইলসন অবজারভেটরির এইচ এন রাসেলের সাথে গবেষণা সংক্রান্ত অনেক আলোচনা হয়েছে সাহার। ১৯২৪ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর প্রফেসর সাহা রাসেলের কাছে লেখা এক চিঠিতে একটা ভালো কোয়ার্টজ স্পেক্ট্রোমিটার কেনার জন্য দুই হাজার পাউন্ড কোন ভাবে জোগাড় করে দেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু কোন সাহায্য পাওয়া যায়নি।

১৯২৫ সালে *ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসে* সাহা ফিজিক্স সেকশানের প্রেসিডেন্ট মনোনীত হন। দেশে বিজ্ঞানীদের শক্তিশালী পেশাগত সংগঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি অনেকদিন থেকেই অনুভব করছিলেন।

দেশকে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে নিয়ে যেতে হলে সবাইকে এক সাথে কাজ করতেই হবে। ১৯২১ সালে পশ্চিম-বঙ্গের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য কাজ করতে গিয়ে সাহা দেখেছেন বৈজ্ঞানিক প্লাটফর্মের কত দরকার। এদিকে লন্ডনে প্রফেসর ফাউলার *রয়েল সোসাইটির* ফেলোশিপের জন্য প্রফেসর মেঘনাদ সাহার নাম প্রস্তাব করেন। কিন্তু ভারতে নিযুক্ত ব্রিটিশ গোয়েন্দারা সাহার নামে রিপোর্ট পাঠালো যে সাহা স্বদেশী আন্দোলন সহ সব ধরনের ব্রিটিশ বিরোধী রাজনৈতিক কার্যকলাপের সাথে যুক্ত। ফেলোশিপ কমিটির মেম্বাররা বিভক্ত হয়ে গেলেন। সিদ্ধান্ত ঝুলে রইলো পরবর্তী দু'বছর। ১৯২৭ সালে রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পেলেন মেঘনাদ সাহা। সাহার রয়েল সোসাইটির ফেলোশিপ পাবার খবর এলাহাবাদের গভর্নরের কাছে পৌঁছালো। গভর্নর ছিলেন ক্যাভেন্ডিশ ল্যাবে লর্ড রাদারফোর্ডের সহপাঠী। তিনি সাহাকে অভিনন্দন জানানোর পাশাপাশি গবেষণার জন্য বছরে পাঁচ হাজার টাকার একটা গ্রান্টেরও ব্যবস্থা করেন। আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে, এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সায়েন্স কংগ্রেসে সাহার সম্মান অনেক বেড়ে গেলো।

একই বছর সাহা ইতালি সরকারের আমন্ত্রণে কোমো কনফারেন্সে যোগ দেন। কলকাতা থেকে অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসুও যোগ দেন এই সম্মেলনে। ইতালি থেকে ফেরার পথে সাহা বার্লিন ও কোপেনহেগেনেও যান। কোপেনহেগেনে সাহার সাথে পরিচয় হলো সাইক্লোট্রনের আবিষ্কারক লরেন্সের সাথে। ১৯২৮ সালে ইউরোপ থেকে এলাহাবাদে ফিরে সাহা স্পেকট্রোমেট্রির যন্ত্রপাতি স্থাপন করে বর্ণালী তত্ত্বের কিছু পরীক্ষা শুরু করেন। প্রায় একই রকম কাজ সি ভি রামন করছিলেন তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯২৮ সালের শেষের দিকে এলাহাবাদে সাহার কাজকর্ম দেখতে আসেন আর্নল্ড সামারফেল্ড। সে সময় তিনি কলকাতায় সি ভি রামনের সাথেও দেখা করেছেন। ইউরোপে ফিরে গিয়ে সামারফেল্ড রামন ও সাহার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ১৯৩০ সালের নোবেল পুরস্কারের জন্য অধ্যাপক মেঘনাদ সাহাকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু ও শিশিরকুমার মিত্র। অবশ্য একই বছর অধ্যাপক সি ভি রামনকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন ডি ব্রগলি, রাদারফোর্ড, উইলসন, বোর প্রমুখ নোবেল বিজয়ী বিজ্ঞানী। রামন পেয়েছেন ১৯৩০ সালের পদার্থবিজ্ঞানের নোবেল পুরস্কার। এরপরে ১৯৩৭ সালে আর্থার কম্পটন, ১৯৩৯ সালে শিশিরকুমার মিত্র এবং ১৯৪০ সালে আবার আর্থার কম্পটন অধ্যাপক সাহাকে মনোনয়ন দিয়েছিলেন পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কারের জন্য ।

১৯৩১ সালে সাহা তাঁর সহকর্মী শ্রীবাস্তবের সাথে যৌথভাবে প্রকাশ করলেন তাঁর বিখ্যাত বই 'এন ইন্ট্রোডাকশান টু হিট'। বইয়ের ভূমিকায় সি ভি রামন বইটার মৌলিকত্ব ব্যাখ্যার পাশাপাশি সাহার কাজের গভীরতা ও উৎকর্ষতার উচ্ছসিত প্রশংসা করেন।

বিজ্ঞান গবেষণার পাশাপাশি বিজ্ঞান সংগঠনেও মনযোগী হলেন মেঘনাদ সাহা। ১৯৩০ সালে ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অব সায়েন্স ব্যাঙ্গালোরের রিভিউ কমিটির সদস্য মনোনীত হন। ১৯০৯ সালে প্রতিষ্ঠিত এই ইনস্টিটিউটের কার্যনির্বাহী পদে এতদিন শুধু ব্রিটিশরাই কাজ করতেন। সাহা হলেন প্রথম ভারতীয় যিনি কমিটিতে স্থান পেলেন। সাহা উপলব্ধি করলেন ভারতীয়দের নিয়েই জাতীয় পর্যায়ের বিজ্ঞান সংগঠন গড়ে তুলতে হবে। ১৯৩১ সালে তাঁর নেতৃত্বে এলাহাবাদে গঠিত হলো ইউনাইটেড প্রভিন্স একাডেমি অব সায়েন্সেস। পরবর্তীতে তা রূপান্তরিত হয় ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্সে। ১৯৩২ সালের ১লা মার্চ থেকে একাডেমির কাজকর্ম শুরু হয়। অধ্যাপক সাহা হলেন একাডেমির প্রথম প্রেসিডেন্ট। ১৯৩৩ সালে সাহার উদ্যোগে কলকাতায় গঠিত হয় 'ইন্ডিয়ান ফিজিক্যাল সোসাইটি'। ফিজিক্যাল সোসাইটি থেকে নিয়মিত প্রকাশিত হতে থাকে 'ইন্ডিয়ান জার্নাল অব ফিজিক্সঅব সায়েন্সেস অব ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট' সাহার উদ্যোগে গঠিত হয় ।'

সালে বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত ইন্ডিয়ান সায়েন্স কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতায় সাহা জাত ১৯৩৪ ।'ইন্ডিয়া ীয় পর্যায়ে সায়েন্স ইনস্টিটিউটের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট হলে ১৯৩৫ সালে এই ইনস্টিটিউটের প্রথম অধিবেশন বসে। পরে অবশ্য এই ইনস্টিটিউটের নাম বদলে 'ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল একাডেমি অব সায়েন্স' করা হয় এবং এর সদর দপ্তর কলকাতা থেকে দিল্লীতে স্থানান্তরিত হয়।

১৯৩০ সালের পর থেকেই সাহা চাচ্ছিলেন এলাহাবাদ থেকে কলকাতায় ফিরে যেতে। ১৯৩২ সালে সি ভি রামন যখন কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে চলে যাবার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন তখন কলকাতার ইন্ডিয়ান এসোসিয়েশান ফর দি কাল্টিভেশান অব সায়েন্সে 'মহেন্দ্রলাল সরকার অধ্যাপক' পদ সৃষ্টি করার প্রক্রিয়া চলছিলো। মেঘনাদ সাহা সেই পদের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে সি ভি রামনকে চিঠি লেখেন। কিন্তু রামন পদটি অধ্যাপক সাহাকে না দিয়ে অধ্যাপক কৃষ্ণানকে দেবার সিদ্ধান্ত নেন। ফলে রামনের ওপর ভীষণ রেগে যান মেঘনাদ সাহা। রামনের সাথে একটা ব্যক্তিগত দ্বন্দ্ব ও ব্যক্তিত্বের সংঘাত দানা বাঁধতে থাকে মেঘনাদের। ১৯৩৩ সালে রামন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'পালিত প্রফেসর' পদ ছেড়ে দিলে সেই পদে যোগ দেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু। ফলে মেঘনাদের কলকাতায় ফেরা হয়ে ওঠে না। এদিকে রামন কলকাতা ছেড়ে ব্যাঙ্গালোরে এসে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব সায়েন্সের প্রথম ভারতীয় পরিচালক হিসেবে যোগ দেন। রিভিউ কমিটির মেম্বার হিসেবে মেঘনাদ সাহা পরিচালক রামনের সাথে কাজ করে খুব একটা আনন্দ পাননি। ১৯৩৮ সালে সি ভি রামনকে যে অনেকটা বাধ্য হয়ে পরিচালক পদ থেকে সরে আসতে হয়েছিলো তার পেছনে অধ্যাপক মেঘনাদের ভূমিকাও ছিল।

১৯৩৫ সালে মেঘনাদ সাহা লন্ডনের 'নেচার' সাময়িকী এবং আমেরিকার 'সায়েন্স' সাময়িকীর আদলে বিজ্ঞানকে সাধারণ মানুষের কাছে সহজবোধ্য করে তোলার জন্য 'ইন্ডিয়ান সায়েন্স নিউজ এসোসিয়েশান' গড়ে তোলেন এবং সেখান থেকে নিয়মিত 'সায়েন্স এন্ড কালচার' জার্নাল প্রকাশের ব্যবস্থা করেন। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে আমৃত্যু তিনি এই জার্নালে নিয়মিত ভাবে লিখে গেছেন।

১৯৩২ সালে নিউট্রন আবিষ্কৃত হলে সাহা নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। তাঁর ছাত্রদের মধ্যে দৌলতরাম সিং কোঠারির সাথে নিয়মিত আলোচনা করতে শুরু করেন কৃত্রিম আইসোটোপের ব্যাপারে। বিটা কণা বিকিরণের ব্যাপারেও অনেকদূর এগিয়েছিলেন – যা এনরিকো ফার্মি আবিষ্কার করে বিখ্যাত হয়েছেন আরো পরে।

১৯৩৬ সালে সাহা এক বছরের জন্য কার্নেগী ফেলোশিপ পান। পুরো এক বছরের জন্য তিনি বৈজ্ঞানিক-ভ্রমণে বের হন। তিনি ইরান, ইরাক, সুইজারল্যান্ড, জার্মানি, নেদারল্যান্ড ও আমেরিকা ভ্রমণ করেন এ সময়। কোপেনহেগেনে নীল্‌স বোরের ইনস্টিটিউশানে কিছুদিন কাজ করেন। সেখানেই সাহার সাথে প্রথম সাক্ষাৎ হয় হোমি জাহাঙ্গীর ভাবার। ইউরোপ থেকে আমেরিকা যান সাহা দু'মাসের জন্য। কাজ করেন হার্ভার্ড অবজারভেটরিতে। ক্যালিফোর্নিয়া ইউনিভার্সিটি বার্কলেতে প্রফেসর লরেন্সের সাথেও কাজ করেন কিছুদিন। সাহা তাঁর ছাত্র বি ডি নাগচৌধুরিকে লরেন্সের ল্যাবে পাঠানোর ব্যবস্থা করে আসেন এ সময়।

১৯৩৭ সালের নভেম্বরে স্যার জগদীশ বসুর মৃত্যুর পর 'বসু বিজ্ঞান মন্দির' এর পরিচালক পদে যোগ দেন অধ্যাপক দেবেন্দ্রমোহন বসু। ফলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'পালিত প্রফেসর' পদটি খালি হয়। ১৯৩৮ সালে সেই পদে যোগ দেন অধ্যাপক মেঘনাদ সাহা। পনের বছর পর আবার কলকাতায় ফিরে এলেন সাহা। নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের সম্ভাবনা দেখে তার প্রতি আগ্রহ বাড়তে থাকে সাহার এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স পড়ানোর ব্যবস্থা করেন। দেশের প্রথম সাইক্লোট্রন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেন তিনি। নিউক্লিয়ার

ফিজিক্সের গবেষণার জন্য একটি আলাদা 'ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স' প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু করেন সাহা।

কলকাতায় ফিরে আসার পর বিজ্ঞানের পাশাপাশি রাজনীতিতেও কিছুটা উৎসাহিত হয়ে ওঠেন অধ্যাপক সাহা। ১৯৩৮ সালে ভারতীয় কংগ্রেস পার্টির সভাপতি নির্বাচিত হয়েছেন নেতাজী সুভাষ বসু। ইডেন হিন্দু হোস্টেলে থাকতে সুভাষ বসুর সাথে পরিচয় ছিলো সাহার। কলেজ স্ট্রিটের মেসেও আসা-যাওয়া ছিল সুভাষ বসুর। সাহা তাঁর 'সায়েন্স এন্ড কালচার' জার্নালে প্রবন্ধ লিখলেন ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করে। নেতাজী সুভাষ বসু মেঘনাদ সাহাকে অনুরোধ করলেন ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি গড়ে তোলার ব্যাপারে কাজ করার জন্য। কাজ শুরু করলেন মেঘনাদ সাহা। জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক নেতা ও শিল্পপতিদের সাথে যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা বাড়তে থাকে মেঘনাদ সাহার। ১৯৩৯ সালে জাতীয় জ্বালানী নীতিতে পারমাণবিক শক্তি ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেন মেঘনাদ। জওহর লাল নেহেরু তাঁকে সমর্থন করেন। ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটির একজন সক্রিয় সদস্য ও দুটো সাব-কমিটির সভাপতি ছিলেন মেঘনাদ সাহা। 'শিক্ষা' এবং 'জ্বালানি ও শক্তি' উপকমিটির সভাপতি হিসেবে অধ্যাপক সাহা দেশের জন্য বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিক্ষা-ব্যবস্থা ও জ্বালানি ও শক্তি সমস্যা সমাধানের বিস্তারিত পরিকল্পনা জাতীয় কমিটিতে পেশ করেন। নৌপরিবহন ও সেচ-প্রকল্পের উপ-কমিটিরও সদস্য ছিলেন মেঘনাদ সাহা। সেচ প্রকল্পের কমিটির সদস্য হিসেবে মেঘনাদ সাহা বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী শাসনে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ব্যবহারের ওপর জোর দেন। আমেরিকার টেনেসি নদীর পানি নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মত করে দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশান গঠন করার জন্য সাহার প্রস্তাব ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে গৃহীত হয়।

কংগ্রেসে সুভাষ বসু ও জওহর লাল নেহেরুর মধ্যে আদর্শগত বিরোধ না থাকলেও পদ্ধতিগত বিরোধ ছিল। সুভাষবসু ছিলেন সরাসরি এবং দ্রুত ফল লাভের পক্ষে, আর নেহেরুর রাজনৈতিক আদর্শ ছিল অনেক বেশি গান্ধী দ্বারা প্রভাবিত। মেঘনাদ সাহা রাজনৈতিক আচার-ব্যবহারে অভ্যস্ত নন। তিনি রেখে ঢেকে কথা বলতে জানতেন না। যা বলার সরাসরি মুখের উপর বলে দিতেন। গান্ধীর যে নীতি কংগ্রেস মেনে চলতো – যেমন বিদেশী বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তি ব্যবহারের বদলে দেশীয় চরকায় সুতো কেটে খদ্দর তৈরি করা – এগুলোর প্রশংসা করা মেঘনাদের পক্ষে কখনোই সম্ভব হয়নি। তিনি সুট-কোট পরাকে অন্যায় মনে করেন নি কখনো। চরকায় সুতো কেটে যে ভারতের উন্নতি ঘটানো যাবে না তা তিনি প্রকাশ্যেই বলতেন। ফলে নেহেরু সহ আরো অনেক কংগ্রেসী নেতার সাথে তাঁর মানসিক দূরত্ব তৈরি হয়। বৃহৎ শিল্পায়নের ক্ষেত্রে দ্রুত পদক্ষেপ নেয়ার জন্য কংগ্রেসের ধীর নীতির সমালোচনা করে প্রবন্ধ লেখেন মেঘনাদ সাহা তাঁর 'সায়েন্স এন্ড কালচার'এর সম্পাদকীয়তে। এসময় পদার্থবিজ্ঞানী হোমি ভাবাও ভারতে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নির্ভর শিল্পায়নের পরিকল্পনা নিয়ে নেহেরুর সাথে কাজ শুরু করেন। এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে নেহেরু ভাবাকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন সাহার চেয়ে বেশি। তবুও নেহেরু কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউট গড়ে তোলার জন্য এবং সাইক্লোট্রন স্থাপন করার জন্য সাহাকে টাটা ও বিড়লা গোষ্ঠীর কাছ থেকে টাকার ব্যবস্থা করে দেন।

অধ্যাপক লরেঞ্জ এর কাছ থেকে সাহার ছাত্র নাগচৌধুরি সাইক্লোট্রনের কাজ শিখে এসেছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে সাইক্লোট্রন প্রতিষ্ঠার কাজ চলছে। তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ছিলেন শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি। তিনি সাইক্লোট্রন স্থাপনের জন্য দোতলা ভবন তৈরি করে দিলেন। নেহেরুর সাহায্যে টাটা শিল্পগোষ্ঠীর কাছ থেকে ষাট হাজার রুপি পাওয়া গেছে। বিড়লা গোষ্ঠীও প্রায় সমপরিমাণ টাকা দিয়েছে। কিন্তু সাইক্লোট্রনের যন্ত্রপাতির যা দাম তাতে এই টাকা খুব সামান্য। তবুও কাজ থেমে থাকলো না। কলকাতায়

স্থাপিত হলো ভারতবর্ষের প্রথম সাইক্লোট্রন। এবং তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হলো ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স। ১৯৪৮ সালের ২১ মার্চ ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি ইনস্টিটিউটের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন। এর দু'বছর পর ১৯৫০ সালের ১১ই জানুয়ারি নোবেল বিজয়ী নিউক্লিয়ার পদার্থবিজ্ঞানী আইরিন কুরি ইনস্টিটিউটের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন। অধ্যাপক সাহা আমৃত্যু পরিচালক ছিলেন এই প্রতিষ্ঠানের। সাহার মৃত্যুর পর এর নাম হয় 'সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স"।

১৯৪৪ সালে এশিয়াটিক সোসাইটির সভাপতি নির্বাচিত হন মেঘনাদ সাহা। একই বছর কাল্টিভেশান সেন্টারের দায়িত্বও নেন তিনি। ১৯৪৫ সালে সোভিয়েত একাডেমি অব সায়েন্সের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উপলক্ষে ভারতের প্রতিনিধি হয়ে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ করেন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজ ব্যবস্থা ও রাষ্ট্রনীতি দেখে মুগ্ধ হন তিনি। সোভিয়েত মডেলকেই তাঁর কাছে শ্রেষ্ঠ মডেল বলে মনে হয়। ১৯৪৭ সালে সোভিয়েত ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বই লিখেন 'মাই এক্সপেরিয়েন্স ইন সোভিয়েত রাশিয়া'।

১৯৪৬ সালের ১০ই মে এটমিক রিসার্চ কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয় হোমি ভাবার সভাপতিত্বে। সিদ্ধান্ত হয় ভারত সরকার পারমাণবিক গবেষণাকে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেবে এবং এ সংক্রান্ত সব কাজ ও গবেষণা নিয়ন্ত্রিত হবে একটি মাত্র প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে। অধ্যাপক সাহা চেয়েছিলেন তাঁর নিউক্লিয়ার ফিজিক্স ইনস্টিটিউটই হবে সেই প্রতিষ্ঠান। কিন্তু যখন দেখা গেলো সেই নিয়ন্ত্রণকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে হোমি ভাবার প্রতিষ্ঠা করা বোম্বের 'টাটা ইনস্টিটিউট অব ফান্ডামেন্টাল রিসার্চ'-কে ঠিক করা হয়েছে – সাহা ভীষণ অপমানিত বোধ করলেন। তিনি এর বিরোধিতা করলেন। কিন্তু কোন কাজ হলো না।

১৯৪৭ সালে ভারতের স্বাধীনতার পর দেখা গেলো রাষ্ট্রীয় নীতি-নির্ধারণী কোন কমিটিতেই অধ্যাপক সাহাকে রাখা হয়নি। কিন্তু সাহা থেমে থাকেন নি। স্বাধীনতার পর হাজার হাজার শরনার্থীকে পুনর্বাসনের জন্য তিনি 'বেঙ্গল রিলিফ কমিটি' গঠন করলেন। 'সায়েন্স এন্ড কালচারে' সরকারের কাজের আলোচনা ও সমালোচনা চলতেই থাকলো। হোমি ভাবাকে প্রেসিডেন্ট করে যখন এটমিক এনার্জি কমিশন গঠন করা হলো – সাহা তার তীব্র বিরোধিতা করলেন। তিনি যুক্তি দিলেন দেশে প্রয়োজনীয় পরমাণু-জনশক্তির অভাব যেরকম রয়েছে, তেমনি এখনো কোন সুষ্ঠু শিল্পনীতি গড়ে ওঠেনি। এ অবস্থায় পরমাণু শক্তি কমিশন গড়ে তোলার কোন দরকার নেই। সাহার বিরোধিতা কমিশন গঠনে কোন বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারেনি বরং সাহা-ই অনেকটা একঘরে হয়ে গেছেন তাঁর সোজাসাপ্টা কথার জন্য।

রাজনৈতিক দায়বদ্ধতা অনুভব করে সরাসরি রাজনীতিতে প্রবেশের সিদ্ধান্ত নিলেন অধ্যাপক সাহা ১৯৫১ সালে। কংগ্রেসের রাজনীতির কঠোর সমালোচক তিনি। ১৯৫১ সালে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে লোকসভার নির্বাচনে দাঁড়ালেন। কংগ্রেসের প্রার্থীকে বিপুল ভোটে পরাজিত করে উত্তর-পশ্চিম কলকাতা আসনে লোকসভার সদস্য নির্বাচিত হলেন অধ্যাপক সাহা। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে লম্বা ছুটি নিলেন। লোকসভায় তিনি সক্রিয় সদস্য হিসেবে ভূমিকা রাখেন শিক্ষায়, শিল্প-নীতিতে, নদী ও বন্যা নিয়ন্ত্রণে এবং বিশেষ করে পারমাণবিক শক্তি সংক্রান্ত নীতিতে।

১৯৫২ সালে ভারত সরকারের সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাস্ট্রিয়াল রিসার্চ কাউন্সিলের অধীনে পরিচালিত দিনপঞ্জিকা সংস্কার কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন অধ্যাপক সাহা। সারা ভারতে তিরিশ রকমের ক্যালেন্ডার প্রচলিত ছিল সেই সময়। বিভিন্ন ধর্মের, সংস্কৃতির এবং রাজনৈতিক মতাদর্শের প্রতিফলন ছিল এই দিন-বিচার বিশ্লেষণ করে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য দিন পঞ্জিকাগুলোতে। এগুলোকে-পঞ্জিকা তৈরি করার দুরুহ কাজ সফল ভাবে সম্পাদনা করেছিলেন অধ্যাপক সাহা ও তাঁর কমিটি।

সরকারের যেকোন ভুল-সিদ্ধান্তের কঠোর সমালোচনা করে সায়েন্স এন্ড কালচারে সাহার প্রবন্ধ অব্যাহত ভাবে প্রকাশিত হতে থাকলো। প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু সাহার সমালোচনায় খুব একটা খুশি ছিলেন না। শুধু সমালোচনা করেই থেমে থাকেন নি প্রফেসর সাহা। তিনি নেহেরুকে ব্যক্তিগত ভাবেও চিঠি লিখেছেন অনেক ব্যাপারে। কোন কোন চিঠিতে কারো কারো ব্যাপারে সাহার ব্যক্তিগত মনোভাবও গোপন থাকেনি। যেমন ১৯৫৪ সালের ৩১শে ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী নেহেরুকে লেখা ব্যক্তিগত চিঠিতে প্রফেসর সাহা লিখেছেন, "রামন, ভাটনগর, ভাবা, কৃষ্ণন এরা সবাই কোন না কোন অজুহাতে আপনাকে এড়িয়ে চলেছে। কিন্তু যেই আপনি ক্ষমতায় এলেন সাথে সাথে তারা সবাই মধুর চাঁকে মৌমাছির মত আপনার চারপাশে ঘুরঘুর করতে শুরু করেছে" । একই চিঠির আরেক জায়গায় লিখলেন, "আমাকে একের পর এক অপমানজনক পরিস্থিতিতে ফেলা হচ্ছে। আমাকে ভাটনগরের আদেশ মেনে চলতে হচ্ছে – যে ভাটনগরকে আমি বিজ্ঞানী হিসেবে খুব একটা ভালো বলে মনে করি না। ভাবার আদেশ আমাকে মানতে হচ্ছে – ভাবা যদিও একজন ভাল বিজ্ঞানী – কিন্তু সে আমার চেয়ে আঠারো বছরের ছোট"। এই চিঠিগুলো মেঘনাদ সাহার ব্যক্তিত্বকে কিছুটা হলেও ম্লান করে দেয়।

নিজের কৈশোরের অভিজ্ঞতা দিয়েই তিনি বুঝেছিলেন, জাতিভেদ, অসাম্য আসলে সমাজের এক গভীর অসুখ। জাতিভেদ প্রথার কদর্য দিকটা আরও ভাল ভাবে বুঝতে পেরেছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়তে এসে। তিনি তখন শহরের এ-প্রান্ত থেকে ও-প্রান্ত সাইকেলে চড়ে গৃহশিক্ষকতা করে বেড়ান। বাকি সময়টা ডুবে থাকেন গণিতে। মেধা বৃত্তি পাওয়ায় তখন সহপাঠীদের সম্ভ্রমের পাত্র মেঘনাদ।

কিন্তু এক বার সরস্বতী পুজোর দিন বদলে গিয়েছিল সব কিছু। পুজোমণ্ডপে অঞ্জলি দেওয়ায় মেঘনাদের উপস্থিতি নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিল ব্রাহ্মণ ছাত্ররা। ব্যাপারটা এ রকম যে, তুমি যতই মেধাবৃত্তি পাও, আসলে তো ছোট জাত। তাই ব্রাহ্মণদের সঙ্গে এক আসনে বসার যোগ্যতা অর্জন করতে পারো না। মেঘনাদের ব্রাহ্মণ সহপাঠীদের ভাবগতিক এমনই ছিল। এই ঘটনাই জাতিভেদের বিরুদ্ধে আজীবন লড়াই করার বারুদ ভরে দিয়েছিল মেঘনাদের বুকে, যার ছাপ পড়েছিল তাঁর বিজ্ঞান গবেষণা থেকে শুরু করে রাজনৈতিক মতাদর্শে। সেই সঙ্গে গড়ে উঠেছিল বৈদিক ধর্মের প্রথা, প্রতিষ্ঠান এবং সেগুলিকে ব্যবহার করে হাজার হাজার বছর ধরে চলতে থাকা সামাজিক বিভেদের প্রতি বিদ্বেষ। সেই বিদ্বেষ এমনই জায়গায় পৌঁছেছিল যে তিনি পিতৃদত্ত নাম পর্যন্ত বদলে নিয়েছিলেন। ১৯৯০ সালের ১৪ জানুয়ারি, স্মিথসোনিয়ান ন্যাশনাল এয়ার অ্যান্ড স্পেস মিউজিয়ামের কিউরেটর ডেভিড ডিভরকিনকে লেখা এক চিঠিতে মেঘনাদ সাহার বড় ছেলে অজিত সাহা জানিয়েছিলেন, যে দিন তাঁর বাবা জন্মেছিলেন, সারা দিন ধরেই প্রচণ্ড ঝড়-জলের তাণ্ডব। আকাশ ভেঙে পড়ার অবস্থা। হিন্দু পুরাণ অনুযায়ী ঝড়-জলের দেবতা দেবরাজ মেঘরাজ ইন্দ্র। তাই দেবরাজ ইন্দ্রের নামানুসারে নবাগত শিশুর নাম রাখা হয়েছিল মেঘনাথ। কিন্তু বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হিন্দুদের বৈদিক ধর্মীয় আচরণের গোঁড়ামি মেঘনাথকে এতটাই বিরক্ত করে তুলেছিল যে, তিনি নিজের নাম পাল্টে রেখেছিলেন মেঘনাদ। যিনি ইন্দ্রজিৎ। দেবতা নন, রাক্ষসদের প্রতিনিধি। সেই থেকে গোটা বিশ্বের কাছে তিনি মেঘনাথ নন, মেঘনাদ নামে পরিচিত হন। তাঁর চোখে মেঘনাদ ইন্দ্রজিৎ সমাজের অপমানিত অংশের প্রতিনিধি, যাঁকে অন্যায় ভাবে বধ করেছিল ব্রাহ্মণ সমর্থিত এক ক্ষত্রিয় রাজপুত্র। শুধু বিজ্ঞান বা রাজনৈতিক মতাদর্শ নয়, নিজের নাম বদলেও মেঘনাদ প্রমাণ করেছিলেন তিনি আসলে ডেমোক্র্যাটিক ক্লাসের প্রতিনিধি, যাদের পিছিয়ে পড়া বলা হয়, জোর করে পিছিয়ে রাখা হয়।

অনেক দিন থেকেই উচ্চ রক্তচাপে ভুগছিলেন মেঘনাদ সাহা। শরীরের জন্য বিশ্রামের দরকার হলেও তিনি বিশ্রাম নেন নি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কাজ করেছেন। ১৯৫৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি দিল্লিতে প্ল্যানিং কমিটির অফিসে যাবার পথে হার্ট অ্যাটাকে মারা যান মেঘনাদ সাহা।বিজ্ঞানে ব্যক্তিগত সাফল্যের উর্ধ্বে মেঘনাদ স্থান দিয়েছিলেন দেশকে, জাতিকে, দেশের অর্থনীতিকে। কিন্তু তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ট্র্যাজেডি ছিল, তিনি সময়ের আগে জন্মেছিলেন। তাঁর কর্মকাণ্ডের উপযুক্ত হয়ে উঠতেই পারেনি তৎকালীন ভারত। তাই বিজ্ঞান বা রাজনীতি, সব ক্ষেত্রেই তিনি প্রতিষ্ঠানবিরোধী। একটা বিষয় লক্ষ করার মতো, ভারতীয় বিজ্ঞানের তিন নক্ষত্র প্রফুল্লচন্দ্র রায়, জগদীশচন্দ্র বসু, সত্যেন্দ্রনাথ বসুকে আচার্য হিসেবে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মেঘনাদ সাহা আজও শুধুই অধ্যাপক সাহা। এ ক্ষেত্রেও তিনি ডেমোক্র্যাটিক ক্লাসের প্রতিনিধি, যাদের ‘পিছিয়ে পড়া’ বলা হয়, জোর করে পিছিয়ে রাখা হয়।

Reference :
‘ডিসপার্সড রেডিয়েন্স, কাস্ট, জেন্ডার অ্যান্ড মডার্ন সায়েন্স ইন ইন্ডিয়া’: আভা শূর
‘মেঘনাদ সাহা: দ্য সায়েন্টিস্ট অ্যান্ড দ্য ইনস্টিটিউট বিল্ডার’: শান্তিময় চট্টোপাধ্যায়
ইন্ডিয়ান জার্নাল অব হিস্ট্রি অব সায়েন্স,
Chitra Roy, Life with Meghnad Saha

S. N. Bose

হিগস বোসন কণার জনক এই কিংবদন্তী বিজ্ঞানী ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের ১ লা জানুয়ারী উত্তর কলকাতার গোয়া বাগান অঞ্চলে স্কটিশ চার্চ কলেজিয়েট স্কুলের পাশে ২২ নম্বর ঈশ্বর মিত্র লেনে জন্মগ্রহণ করেন । তাঁর পরিবারের আদি নিবাস ২৪ পরগণার কাঁড়োপাড়ার সন্নিকটে বড়োজাগুলিয়া গ্রামে । তাঁর পিতা সুরেন্দ্রনাথ বসু ছিলেন পূর্ব ভারতীয় রেলওয়ের হিসাবরক্ষক এবং মাতা আমোদিনী দেবী ছিলেন আলিপুরের খ্যাতনামা ব্যবহারজীবী মতিলাল রায়চৌধুরীর কন্যা । যে সময়টাতে সত্যেন বসু জন্মেছিলেন সেই সময়টাতেই জন্মেছিলেন বিজ্ঞানের আরও চার কিংবদন্তি, পরমাণু বিজ্ঞানী লিস মিটনার, অটোহ্যান, আলবার্ট আইনস্টাইন ও ম্যাক্সভন লুএর মতো প্রতিভাবান বিজ্ঞানীরা। সময়ের সেই সুবর্ণ ধারায় এ উপমহাদেশে রামানুজন-, মেঘনাদ সাহা, আচার্য জগদীশচন্দ্র বসু এবং রবীন্দ্রনাথেরও জন্ম হয়ে ছিল সেই শতকেই।

“যাঁরা বলেন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চা হয় না, তাঁরা হয় বাংলা জানেন না, নয় বিজ্ঞান বোঝেন না।” এই অমর উক্তিটির করেছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ বসুর । বিজ্ঞানসাধক এই মানুষটি শুধু মন্তব্য করেই থামেননি।বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রবল সমর্থক এই মানুষটি সারা জীবন ধরে বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার ধারাটিকেও পুষ্ট করে গেছেন। তাই তখন বাংলায় বিজ্ঞানচর্চার প্রসারের উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান পরিচয় নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করতেন। বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান চর্চ্চার ক্ষেত্রে তার অমূল্য অবদান রয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে কলকাতায় ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ গঠিত হয়। এই পরিষদের মুখপাত্র হিসাবে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান পত্রিকা জ্ঞান ও বিজ্ঞান প্রকাশিত হয়। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে জ্ঞান ও বিজ্ঞান এ কেবলমাত্র মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ নিয়ে-” রাজশেখর বসু সংখ্যা” প্রকাশ করে তিনি দেখান, বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের মৌল নিবন্ধ রচনা সম্ভব।

মাতৃভাষায় বিজ্ঞান চর্চার ক্ষেত্রে সত্যেন্দ্রনাথ বসু একটি বিশেষ অবদান অবশ্যই বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছ থেকেও তিনি বাংলা ভাষায় বিজ্ঞানের বই লিখিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। সত্যেন বসুর প্রত্যক্ষ

উৎসাহেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁর বিজ্ঞান বিষয়ক বই ‘বিশ্ব পরিচয়’ লেখেন ১৯৩৭ সালে। রবীন্দ্রনাথ সত্যেন বসুকেই উৎসর্গ করেছিলেন ‘বিশ্ব পরিচয়’। এ প্রসঙ্গে সত্যেন বসু অবশ্য বলেন, “নোবেল পুরস্কার লাভ করলেও আমি এতটা কৃতার্থ বোধ করতাম না”।

ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথ কর্মজীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন বৃহত্তর বাংলার তিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন কলকাতা, ঢাকা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। সান্নিধ্য পেয়েছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মাদাম কুরী মতো মণীষী। আবার অনুশীলন সমিতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক ও স্বাধীনতা আন্দোলনের সশস্ত্র বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগও রাখতেন দেশব্রতী এই মানুষটি।বহুমুখী প্রতিভাধর সত্যেন্দ্রনাথ ব্যক্তিজীবনে নিরলস, কর্মঠ ও মানবদরদী মণীষী। বিজ্ঞানের পাশাপাশি সঙ্গীত ও সাহিত্যেও ছিল তাঁর আন্তরিক আগ্রহ ও বিশেষ প্রীতি। অন্নদাশঙ্কর রায় তাঁর জাপানে ভ্রমণরচনা ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর অর্কেস্ট্রা কাব্যগ্রন্থ উৎসর্গ করেছিলেন।

বিদেশে গিয়ে পড়ালেখা করার ইচ্ছে সত্যেন বসুর ছোটবেলা থেকেই ছিল। এমসি-এস-’তে রেকর্ড পরিমাণ নম্বর পাবার পর তাঁর শিক্ষক প্রফেসর ডি এন মল্লিক সস্নেহে ডেকে বললেন, “এত বেশি নম্বর পেয়েছ পরীক্ষায়, বড় বেমানান লাগছে হে”। সত্যেন্দ্রনাথ ভাবলেন এবার মনে হয় সুযোগ এলো বিদেশ যাবার। কিন্তু হলো না। সে বছর পদার্থবিদ্যা বা গণিতের জন্য কোন বৃত্তি দেয়া হলো না। সবগুলো বৃত্তি পেলো রসায়নের শিক্ষার্থীরা। এত ভালো রেজাল্ট করার পরেও ভালো কোন চাকরির ব্যবস্থা হলো না। কিংবা বলা যায় এত ভাল রেজাল্টের কারণেই কোন চাকরি পাওয়া গেলো না। এত ভাল ছাত্রকে কেউ সাধারণ চাকরি দিতে চান না। তাঁর বাবা রেলওয়ের বড় অফিসারদের ধরে রেলওয়েতে একটা চাকরির ব্যবস্থা করতে চাইলেন। কিন্তু সত্যেন্দ্রনাথ রাজী হলেন না। তিনি বাবার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে আসামে চলে গেলেন। সেখানে গৌরীপুরের জমিদারের ছেলেকে প্রাইভেট পড়ানোর দায়িত্ব নিলেন।

এর অনেক পরে সত্যেন বসু এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, *“পাশ করার পর প্রথম একটা বছর আমি টিউশনি করে কাটিয়েছি। এই এক বছরে বাইরের দু’একটা কলেজে ও অন্যান্য সরকারি অফিসেও চাকরির চেষ্টা করেছিলাম। হয়নি। যাকে প্রাইভেট পড়াতাম সে এখন সিনেমা জগতের দিকপাল কুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। পাটনা কলেজে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। উইলসন সাহেব তখন সেখানকার প্রিন্সিপাল। স্যার যদুনাথ সরকার তখন সেখানে অধ্যাপনা করতেন। কিন্তু সেখানেও আমার চাকরি হলো না। তাঁরা জানালেন তাঁদের দরকার একজন সেকেন্ড ক্লাস এমসি। তখন ভাবলাম ফার্স্ট ক্লাস না পেয়ে সেকেন্ড ক্লাস পেলেই বুঝি -এস-ভালো ছিল। আর একবার বাবার বন্ধুর কথামত আলিপুর আবহাওয়া অফিসে একটা দরখাস্ত পাঠিয়েছিলাম। জবাব এলোঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্রের উপযুক্ত কোন চাকরি এখানে খালি নেই। প্রার্থী অন্য কোথাও দরখাস্ত করলে ভালো হয়।”*

চাকরির জন্য দরখাস্ত করতে করতে ক্লান্তি এসে গেল। নিজের পড়াশোনাটা আবার শুরু করার কথা ভাবছেন। এ সময় কলকাতার সায়েন্স কলেজে রসায়নে গবেষণা করছেন আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়, ডঃ প্রফুল্ল মিত্র প্রমুখ। সত্যেন বসু কেমিস্ট্রি পড়েন নি। ভাবছেন কী করা যায়। এদিকে জগদীশ বসু তখন পদার্থবিদ্যার গবেষণা থেকে সরে গিয়ে উদ্ভিদবিদ্যার দিকে ঝুঁকেছেন। উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির আহবানে সায়েন্স কলেজে ফলিত গণিতের অধ্যাপক পদে যোগ দিয়েছেন ডঃ গণেশ প্রসাদ। উনি জার্মানি থেকে ডঃ কাইনের কাছে গবেষণা করে এসেছেন। সত্যেন বসু একদিন হাজির হলেন ডঃ গণেশ প্রসাদের কাছে। সত্যেন বসুর এমসি থিসিসের পরীক্ষক ছিলেন ডঃ প্রসাদ। পরীক্ষার খাতায় অত্যন্ত কম নম্বর দে-এস-ওয়া এবং পরে কম নম্বর পেয়েছে বলে ছাত্রদের খোঁচা দেয়া ছিল তাঁর স্বভাব। কিন্তু সত্যেন বসুর থিসিসে খুব কম নম্বর দেওয়া

সম্ভব হয়নি তাঁর পক্ষেও। তাই ডঃ প্রসাদ তাঁর স্বভাবখোঁচাটা দিতে পারলেন না সত্যেন বসুকে। কিন্তু তাঁর - আরেকটি অভ্যাস ছিলো– অন্যের বদনাম করা। প্রেসিডেন্সি কলেজের ভালো ভালো শিক্ষকের বদনাম করতেন তিনি প্রেসিডেন্সি কলেজের ছাত্রদের পেলেই। ছাত্ররা, বিশেষ করে গবেষক ছাত্ররা ভয়ে কোন প্রতিবাদ করতো না। কিন্তু স্পষ্টভাষী সত্যেন বসু গুরুনিন্দা শুনে চুপ করে থাকতে পারলেন না। প্রতিবাদ করলেন। তাতে ডঃ প্রসাদ ভীষণ রেগে গেলেন। বললেন, "তুমি পরীক্ষায় যতই ভাল কর না কেন, তোমার দ্বারা গবেষণা হবে না"। কী আর করা। ব্যর্থ মনোরথে ফিরে এলেন। ভাবলেন নিজেই যা পারেন করবেন। তত্ত্বীয় কিছু কাজও শুরু করে দিলেন।

এর কয়েকদিন পর বিহার সরকার কয়েকটি পদে নতুন শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি দিলো। সত্যেন বসু প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রিন্সিপাল জেম্‌স, ডঃ মল্লিক প্রমুখ বিশিষ্টজনের প্রশংসাপত্র সংগ্রহ করে দরখাস্ত পাঠালেন। মনে মনে আশা করলেন যে এবার নিশ্চয় কিছু হবে। কিন্তু তাঁর চাকরি হলো না এখানেও। ডঃ মল্লিক একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, "বিহারের ডি আই আমাকে লিখেছেন-পি-- আপনার ছাত্র সত্যেন্দ্রনাথ বসু এত ভাল যে আমাদের ঠিক দরকারে লাগবে না"। আশার বাতি আবারো নিভলো।

একদিন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখার্জির কাছ থেকে ডাক এলো। শুধু সত্যেন বসু নয়, তাঁর মত আরো সব কৃতী ছাত্রদের ডেকেছেন তিনি। খাড়া সিঁড়ি বেয়ে লাইব্রেরি ঘরের পাশে স্যার আশুতোষের খাস কামরায় হাজির হলেন সত্যেন বসু, মেঘনাদ সাহা, শৈলেন ঘোষ। সবাই কৃতী ছাত্র, কিন্তু পরিপূর্ণ বেকার। স্যার আশুতোষের বিরাট ব্যক্তিত্বের সামনে ভয়ে ভক্তিতে সকলেই বিনীত, নম্র। স্যার আশুতোষ শুনেছেন এই নবীন ছাত্রদের দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানের নতুন নতুন বিষয় পড়ানো হোক। তিনি সরাসরি জিজ্ঞেস করলেন, "তোরা পড়াতে পারবি?" সত্যেন বসু উত্তর দিলেন, "আজ্ঞে, যা বলবেন তাই - যথাসাধ্য চেষ্টা করবো"। স্যার আশুতোষ সস্নেহে হাসলেন।

তখন পদার্থবিজ্ঞানে নানারকম নতুন নতুন আবিষ্কার শুরু হয়েছে। বেশির ভাগই জার্মানিতে। ম্যাক্স প্ল্যাংক, আলবার্ট আইনস্টাইন, নিল্‌স বোর – এঁদের নামই শুধু শুনেছেন সত্যেন বসু। জানতে গেলে পড়তে হবে জার্মান ভাষায় লেখা বই, গবেষণাপত্র এবং আরো সব বিজ্ঞান পত্রিকা। কিন্তু যুদ্ধের মধ্যে তখন সে সব ভারতে আসে না। শেষ পর্যন্ত নতুন পথে প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাঁদের জন্য বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করা হলো কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে মাসিক ১২৫ টাকা। মেঘনাদ সাহার উপর ভার পড়লো কোয়ান্টাম থিওরি নিয়ে পড়াশোনার। সত্যেন বসুকে পড়তে হবে আইনস্টাইনের রিলেটিভিটি থিওরি। স্যার আশুতোষের কাছে তাঁরা স্বীকার করে এসেছেন যে এক বছরের মধ্যে পড়াশোনা করে নিজেদের তৈরি করে নেবেন এবং তারপর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ানো শুরু করবেন। বলে তো এলেন, কিন্তু বই পাবেন কোথায়! রিলেটিভিটির কিছু ইংরেজি বই পাওয়া গেলো। শিবপুর কলেজের ইংরেজ অধ্যাপক ডঃ ব্রাউলের ব্যক্তিগত লাইব্রেরি থেকে পাওয়া গেল ম্যাক্স প্ল্যাংক, লুডবিগ বোল্‌টজম্যান (Ludwig Boltzman) ও উইলহেল্‌ম বিন (Wilhelm Wien) – এর জার্মান বই। মেঘনাদ সাহা জার্মান শিখলেন এবং বইগুলো ইংরেজিতে অনুবাদ করলেন। কিছু প্রয়োজনীয় বই পাওয়া গেল ফরাসী ভাষায়। সত্যেন বসু ফরাসী ভাষা শিখলেন বইগুলো পড়ার জন্য।এর পরই শুরু হলো এক বছরের মাথায় ১৯১৭ সাল থেকেই সায়েন্স কলেজে স্নাতকোত্তর পর্যায়ে পড়ানো শুরু হলো ফলিত গণিত, পদার্থবিদ্যা ও রসায়ন। পদার্থবিদ্যা পড়ানোর দায়িত্ব পেলেন শৈলেন ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, সত্যেন বসু, যোগেশ মুখার্জি, জ্ঞান ঘোষ প্রমুখ।ছাত্রজীবনে অত্যন্ত মেধাবী সত্যেন্দ্রনাথ কর্মজীবনে সম্পৃক্ত ছিলেন বৃহত্তর বাংলার তিন শ্রেষ্ঠ শিক্ষায়তন কলকাতা, ঢাকা ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে। সত্যেন বসুর কর্মজীবন শুরু হয় ঐ সমকালেই সদ্য প্রতিষ্ঠিত কলকাতা বিজ্ঞান কলেজে ১৯১৫ সালে প্রভাষক পদে যোগদানের মধ্য দিয়ে। সেখানে তিনি বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহার সঙ্গে মিশ্র গণিত ও

পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে গবেষণা শুরু করেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হলে তিনি সেখানে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে রিডার হিসেবে যোগদান করেন তখন মাসিক বেতন ছিল চারশ' টাকা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসু তত্ত্বীয় পদার্থ বিজ্ঞান ও এক্সরে ক্রিস্টোলোগ্রাফির ওপর কাজ শুরু করেন। এছাড়া তিনি শ্রেণী কক্ষে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা পড়াতেন। ক্লাসে একদিন আলোকতড়িৎক্রিয়া ও অতিবেগুনি বিপর্যয় পড়ানোর সময় তিনি শিক্ষার্থীদের বর্তমান তত্ত্বের দূর্বলতা বোঝাতে এই তত্ত্বের সঙ্গে পরীক্ষালব্ধ ফলফলের ব্যতয় তুলে ধরেন। সে সময় তিনি ঐ তত্ত্ব প্রয়োগ করতে গিয়ে একটি ভুল করেন। পরে দেখা যায় তার ঐ ভুলের ফলে পরীক্ষার সঙ্গে তত্ত্বের অনুমান মিলে যাচ্ছে! বসু পরবর্তীতে তার ঐদিনের লেকচারটি একটি ছোট নিবন্ধ আকারে Planck's Law and the Hypothesis of Light Quanta নামে প্রকাশ করেন চার পৃষ্ঠার এই প্রবন্ধটি পাঠালেন ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত বিজ্ঞান সাময়িকী ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে। কিন্তু সেখানে লেখাটি প্রকাশের যোগ্য বিবেচিত হলো না। এতে দমে গেলেন না সত্যেন বসু। তিনি লেখাটি পাঠিয়ে দিলেন জার্মানিতে খোদ আইনস্টাইনের কাছে। সত্যেন বসু আইনস্টাইনকে লিখলেন, *"Respected Sir, I have ventured to send you the accompanying article for your perusal and opinion"*

বিশ্ববন্দিত বিজ্ঞানী আইনস্টাইন সত্যেন বসুর প্রতিভাকে চিনতে ভুল করলেন না। তিনি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে প্রবন্ধটি জার্মান ভাষায় অনুবাদ করে *'সাইটশ্রিফ্‌ট ফ্যুর ফিজিক'* (Zeits Fur Physik) জার্নালে নিজের মন্তব্য সহ প্রকাশের ব্যবস্থা

কেননা ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত প্রবন্ধটিতে প্লাঙ্কের কোয়ান্টাম তেজস্ক্রিয়তা নীতি ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞানের সাহায্য ছাড়াই প্রতিপাদন করা এবং সদৃশ কনার সাহায্যে দশার সংখ্যা গণনার একটি চমৎকার উপায় বর্ণনা করেন এছাড়াও এই নিবন্ধটি ছিল মৌলিক এবং কোয়ান্টাম পরিসংখ্যানের ভিত্তি রচনাকারী।বসুর ভুল এখন বোস-আইনস্টাইন সংখ্যাতত্ত্ব নামে পরিচিত। আইনস্টাইন এই ধারণাটি গ্রহণ করে তা প্রয়োগ করলেন পরমাণুতে। এই থেকে পাওয়া গেল নতুন প্রপঞ্চ যা এখন বোস-আইনস্টাইন কনডেনসেট নামে পরিচিত। সত্যেন বসুর কয়েকটি গবেষণা দেখে আইনস্টাইন প্রশংসা করে কয়েকটি চিঠি লেখেন। তার কর্মকে আইনস্টাইন 'ইটস আ বিউটিফুল স্টেপ ফরোয়ার্ড' বলে আখ্যায়িত করেন।

সত্যেন বসুর কাছে লেখা আইনস্টাইনের চিঠির সূত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সত্যেন বসুর জন্য দুই বছরের শিক্ষাছুটি মঞ্জুর করলো। ১৯২৪ সালে সত্যেন বসু গেলেন ইউরোপে। জার্মানিতে গিয়ে দেখা করলেন আইনস্টাইনের সাথে। খোলামেলা বৈজ্ঞানিক আলোচনা করলেন আইনস্টাইন ও সত্যেন বসু। জার্মানি থেকে প্যারিসে গিয়ে মাদাম কুরির সাথে দেখা করলেন। মাদাম কুরির ল্যাবোরেটরিতে কিছু কাজ করারও সুযোগ পেলেন সত্যেন বসু। দ্য ব্রগলির ল্যাবেও কাজ করেছিলেন কিছুদিন। ১৯২৪ থেকে ১৯২৬ সাল পর্যন্ত ইউরোপের বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানীদের সাথে বৈজ্ঞানিক সাক্ষাৎ সত্যেন বসুর গবেষণা ক্ষেত্রে ব্যাপক প্রভাব ফেলে। দেশে ফেরার পর ১৯২৭ সালে সত্যেন বসু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থবিদ্যার প্রধান অধ্যাপক এবং সায়েন্স ফ্যাকাল্টির ডিন নির্বাচিত হন।

সম্প্রতি সার্নের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত হয়েছে 'ঈশ্বর কণা', যার পারিভাষিক নাম *হিগসবোসন-* কণা। আর সেই বোসন যাঁর নাম অনুসারে হয়েছে তিনি বাঙালি জাতীয় বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পদার্থবিজ্ঞানে এ বারের নোবেল পুরস্কারের সাথে জড়িয়ে আছে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির অতিসূক্ষ্ম কারণ অনুসন্ধানের ফলাফল এবং একজন বাঙালি বিজ্ঞানী। বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টির বা পদার্থকে 'ভর'দান করার নেপথ্য কণাটির সাধারণ অনুধাবনযোগ্য নাম 'ঈশ্বরকণা', তত্ত্বগতভাবে 'হিগসবোসন কণা-'। এই কণা নিয়ে গবেষণার জন্য ২০১৩ সালের পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার অর্জন করেন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী পিটার হিগস ও বেলজিয়ামের ফ্রাঁসোয়া

আঁগলার। আর তার সাথে পরোক্ষভাবে স্মরণীয় হয়ে আছেন বাঙালি বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু, যাঁর পদবীর নামানুসারে কণাটির নামের সাথে রয়েছে 'বোসন' শব্দটি। বসুআইনস্টাইন পরিসংখ্যান-, বসুআইনস্টাইন - ঘনীভবন, বোসনের উপর গবেষণা করে ১৯৮৪ সালে পদার্থবিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার লাভ করেন Carlo Rubbia এবং Simon van der Meer, ১৯৯৬ সালে David M. Lee, Douglas D. Osheroff, Robert C. Richardson, ১৯৯৯ সালে Martinus J. G. Veltman ও Gerardus 't Hooft, ২০০১ সালে Eric Allin Cornell, Carl Edwin Wieman এবং Wolfgang Ketterle) নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন, কিন্তু দুঃর্ভাগ্যজনকভাবে বোসকে নোবেল পুরস্কার প্রদান করা হয়নি।

সত্যেন্দ্রনাথের আর এক পরিচয় ছিল, দেশব্রতী সত্যেন্দ্রনাথ। ইংরেজ শাসনের সেই প্রচন্ড দাপটের কালেই অনুশীলন সমিতির সঙ্গে ছিল তাঁর প্রত্যক্ষ সম্পর্ক। বিপ্লবীদের সঙ্গে গোপনে যোগাযোগ এবং এই উদ্দেশ্যেই সমাজ সেবার নানা ক্ষেত্রের সঙ্গে তাঁর সক্রিয় সংযোগ। তিনি বলেছিলেন,'আমাদের জাতীয় পতাকা জীবনের সর্বক্ষেত্রে উচ্চে তুলে ধরার জন্য যদি আমরা মিলিতভাবে চেষ্টা করি তাহলে ছোটখাটো ভুল বোঝাবুঝি ও নির্বোধ ঈর্ষা নিশ্চিতই সহজে দূর করা যাবে।' ১৯৭৪ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কলকাতায় মৃত্যুবরণ করেন।

১১.৬.১৬.৭. সহায়ক গ্রন্থ

১) Zaheer Baber, The Science of Empire: Scientific Knowledge, Civilization, and Colonial Rule in India (SUNY series in Science, Technology, and Society), State University of New York Press

২) প্রশান্ত প্রামানিক, বিজ্ঞানী মেঘনাদ সাহা, জ্ঞান বিচিত্রা

৩) শ্যামল চক্রবর্তী, বিজ্ঞানের অগ্রপথিক, দে'জ পাবঃ

১১.৬.১৬.৬. নমুনা প্রশ্ন

1. Conribution of M.N. Saha in Science and society
2. Write a note on emargence of National science
3. 'Science is a tool of imperialism'- Justify this line with your own view on colonial science in India.

ইতিহাস

দ্বি-বার্ষিক সেমেস্টার ভিত্তিক স্নাতকোত্তর পাঠক্রম
এম এ তৃতীয় সেমেস্টার

ঐচ্ছিক পাঠ - ১২

দ্বাদশ পত্র

Women's History in India

পাঠ সহায়ক গ্রন্থ

ডাইরেক্টরেট অফ ওপেন এ্যান্ড ডিস্ট্যান্স লার্নিং

কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

কল্যাণী, নদীয়া - ৭৪১ ২৩৫

পশ্চিমবঙ্গ

পাঠ-পুর্নগঠক

বর্তমান গ্রন্থটি পুর্নগঠনে মুখ্য ভূমিকা গ্রহণ করেছেন
শ্রী সুকৃত মুখার্জী (চুক্তিভিত্তিক সহকারী অধ্যাপক, ডি ও ডি এল, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়)

ডিসেম্বর, ২০১৯

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়

মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয় দ্বারা প্রকাশিত ও

নিউ স্কুল বুক প্রেস, ২ ডিক্সন লেন, কলকাতা - ৭০০ ০১৪

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত। মুক্ত ও দূরবর্তী শিক্ষা অধিকরণ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়-এর অনুমতি ব্যতীত বর্তমান পাঠ সহায়ক উপাদানের অন্তর্ভুক্ত কোনো অংশের অন্যত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ।

কপিরাইট আইনানুসারে পাঠ-সহায়ক উপাদানের লেখক/পাঠ-প্রণেতা সংশ্লিষ্ট বিষয়ের জন্য সম্পূর্ণভাবে দায়ী থাকবেন।

DISCLAIMER

This Self Learning Material (SLM) has been compiled using material from authoritative books, journal articles, e-journals and web sources.

Director's Note

Open and Distance Learning (ODL) systems play a threefold role- satisfying distance learners' needs of varying kinds and magnitudes, overcoming the hurdle of distance and reaching the unreached. Nevertheless, this robustness places challenges in front of the ODL systems managers, curriculum designers, Self Learning Materials (SLMs) writers, editors, production professionals and other personnel involved in them. A dedicated team of the University of Kalyani under the leadership of Hon'ble Vice-Chancellor has put its best efforts, professionally and in unison to promote Post Graduate Programmes in distance mode offered by the University of Kalyani. Developing quality printed SLMs for students under DODL within a limited time to cater to the academic requirements of the Course as per standards set by Distance Education Bureau of the University Grants Commission, New Delhi, India under Open and Distance Mode UGC Regulations, 2017 had been our endeavour and we are happy to have achieved our goal.

Utmost care has been taken to develop the SLMs useful to the learners and to avoid errors as far as possible. Further suggestions from the learners' end would be gracefully admitted and to be appreciated.

During the academic productions of the SLMs, the team continuously received positive stimulations and feedback from Professor (Dr.) Sankar Kumar Ghosh, Hon'ble Vice- Chancellor, University of Kalyani, who kindly accorded directions, encouragements and suggestions, offered constructive criticism to develop it within proper requirements. We gracefully, acknowledge his inspiration and guidance.

Due sincere thanks are being expressed to all the Members of PGBOS (DODL), University of Kalyani, Course Writers- who are serving subject experts serving at University Post Graduate departments and also to the authors and academicians whose academic contributions have been utilized to develop these SLMs. We humbly acknowledge their valuable academic contributions. I would like to convey thanks to all other University dignitaries and personnel who have been involved either at a conceptual level or at the operational level of the DODL of University of Kalyani.

Their concerted efforts have culminated in the compilation of comprehensive, learner-friendly, flexible texts that meet the curriculum requirements of the Post Graduate Programme through Distance Mode.

Self Learning Materials (SLMs) have been published by the Directorate of Open and Distance Learning, University of Kalyani, Kalyani-741235, West Bengal and all the copyright reserved for University of Kalyani. No part of this work should be reproduced in any from without permission in writing from the appropriate authority of the University of Kalyani.

All the Self Learning Materials are self writing and collected from e-book, journals and websites.

Date: 24.03.2018

Director
Directorate of Open & Distance Learning
University of Kalyani,
Kalyani, Nadia, West Bengal

Two-Year

Post Graduate Degree Progarmme

Syllabus

HISTORY

SEMESTER III

PAPER - 12

Women's History in India

BLOCK 1

Survey of approaches and sources

Unit-1 : Liberal, Marxist psychoanalytical, socialist, existential, radical, post-modern approaches.

Unit-2 : Sources: 1) Archival and governmental files, official reports, census, private papers, etc. and Non-archival sources: sacred and non-sacred texts, epigraphs, diaries, memories, autobiography, fiction, songs, folklore, photographs, paintings, oral evidence.

BLOCK 2

Religion and women

Unit-3 : Brahmanical and Non-Brahmanical religions--Jainism, Buddhism.

Unit-4 : Islam, Sikhism, Christianity.

BLOCK 3

Reform movements and women

Unit-5 : Bhakti Movements and Virasaivism.

Unit-6 : Brahma Samaj, Aryasamaj. Theosophical Movements.

Unit-7 : Aligarh Movement, Satya Shodhak Samaj. Sri Narayana Movement, Self Respect Movements.

BLOCK 4

Customary and legal status of women

Unit-8 : Colonial India, Post-Independence India, Tribal Societies.

BLOCK 5

Women and Work

Unit-9 : Household, Agriculture, Industry-formal and informal sectors.

Unit-10 : Profession, wages, Property rights.

BLOCK 6

Education of women & Women organisation in 19th and 20th century India

Unit-11 : Ancient India, Medieval India, Colonial India, Post Independence.

Unit-12 : a) Colonial-local, provincial, national. b) Post Independence.

BLOCK 7

Women in Indian struggle for independence.

Unit-13 : Gandhian satyagraha, Revolutionary movements,Peasant and worker movement,Feminist Movement.

Unit-14 : Panchayet and Municipal council, State legislative and parliament, Feminist movement.

BLOCK 8

Women and Culture

Unit-15 : Women's representation and participation in

i) Literature

ii) Art and Sculpture.

iii) Music

iv) Dance

Unit-16 : Women's representation and participation in

i) Films

ii) Theatre.

CONTENTS

Paper VII	Unit	Author	Title	Page
1	1.	Sri Soumitra Kumar Sinha	Approaches i) Liberal, ii) Marxist, iii) Psychoanalytical iv) Socialist, v) Existential, vi) Radical vii) Post-modern	১–২৩
	2.	Prof. Souvik Mukhopadhyay	a) Sources i) Archival — Government fils, Official reports, Census, Private papers, etc. ii) Non-archival—sacred and non-sacred texts, epigraphs, diaries, memories, autobiographies, fiction, songs, folklore, photographs, paintings, oral history.	২৪–৪১
2	3.	Dr. Nupur Dasgupta	Religion and Women a) Brahmanical and non-Brahmanical b) Jainism. c) Buddhism	৪২–৫৭
	4.	Dr. Amit Dey	Religion and Women *a) Islam.* b) Sikhism c) Christianity	৫৮–৭০
3.	5.	Dr. Souvik Mukhopadhyay	Reform Movements and Women a) Bhakti movements b) Vira Saivism	৭১–৮২
	6.	Dr. Souvik Mukhopadhyay	Reform Movements and Women a) Brahma Samaj b) Arya Samaj c) Theosophical movement	৮৩–৯৪
	7.	Dr. Souvik Mukhopadhyay	Reform Movements and Women a) Aligarh movement b) Satys Shodhak Samaj c) Sri Narayan movement d) Self-respect movement	৯৫–১০৫

4.	8.	Dr. Souvik Mukhopadhyay	Customary and Legal Status a) Colonial India b) Post-Independence c) Tribal societies	১০৬ থেকে ১১৬
5.	9.	Dr. Souvik Mukhopadhyay	Women and Work a) Household b) Agriculture c) Industry — formal and informal sectors	১১৭ থেকে ১৩০
	10.	Dr. Souvik Mukhopadhyay	Women and Work a) Professions b) Wages c) Property rights	১৩১ থেকে ১৪০
6.	11.	Dr. Ishita Chattopadhyay	Education and Women & Women's Organisations a) Ancient India b) Medieval India c) Colonial India d) Post Independence	১৪১ থেকে ১৬৫
	12.	Dr. Rupkumar Barman	Education and Women & Women's Organisations a) Colonial — local, provoncial, national b) Post-Independence	১৬৬ থেকে ১৭৫
7.	13.	Dr. Nibedita Pal	Political Participation a) Gandhian Satyagraha b) Revolutionary movements c) Peasant and Worker's movements d) Tribal movements	১৭৬ থেকে ১৮৯
	14.	Dr. Subhas Chandra Sen	Political Participation a) Panchayats and municipal councils. b) State Legislatures and Parliament. c) Feminist movement.	১৯০ থেকে ২১৪
8.	15.	Prof. Mahua Sarkar	Women's representation and participation in i) Art and Sculpture ii) Music iii) Dance	২১৫ থেকে ২২৩
	16.	Prof. Barun Kumar Chakraborty	Women's representation and participation in i) Films ii) Theatre	২২৪ থেকে ২৩৩

পর্যায় গ্রন্থ - ১

SURVEY OF APPROACHES AND SOURCES

একক - ১

নারীবাদের তত্ত্ব অথবা নারীবাদী আন্দোলনের তত্ত্ব

বিন্যাসত্র(ম ঃ

১২.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

১২.১.১.১ ঃ উদারতান্ত্রিক নারীবাদ

১২.১.১.২ ঃ মার্কস এবং ডুয়াল সিস্টেম্স্ তত্ত্ব

১২.১.১.৩ ঃ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও নারীবাদ

১২.১.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১২.১.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্র(াবলী

১২.১.১.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১) উদারতান্ত্রিক নারীবাদের তত্ত্ব, নানা বৈশিষ্ট্য এবং নারীবাদী আন্দোলনে এর গুরুত্ব।

২) সমাজতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি কেন্দ্রিয় আমূল সংস্কারপন্থী বা র‍্যাডিকাল নারীবাদীগণ কর্তৃক উদারতান্ত্রিক নারীবাদের তত্ত্ব সমালোচনার প্রকৃতি বা ধরন-ধারণ।

৩) উদারতান্ত্রিক নারীবাদের উদ্ভবের প্রেক্ষাপট।

৪) মার্কসীয় নারীবাদের ডুয়াল সিস্টেমস্ তত্ত্বের ব্যাখ্যা।

৫) মার্কসীয় নারীবাদ ও ধ্রুপদী মার্কসবাদ ও মার্কসীয় নারীবাদের পার্থক্য।

১২.১.১.১ ঃ উদারতান্ত্রিক নারীবাদ (Liberal Feminism)

উনবিংশ শতাব্দীর ইংল্যান্ড ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উদারতান্ত্রিক নারীবাদের বা Liberal Feminist দের কাছে সমাজে নারীদের অবস্থানের প্রশ্নটি একটি বিতর্কিত বিষয় হয়ে দাঁড়ায়। একটি রাজনৈতিক দর্শন রূপে liberalism বা উদারতন্ত্রবাদের কয়েকজন প্রবক্তা ছিলেন থমাস্ হবস্ (Thomas Hobbes), জন লক (John Locke), জেরেমি বেস্থাম (Jeremy Bentham) এবং জেমস স্টুয়ার্ট মিল (James Stuart Mill)। হবস্ ও লক উভয়েই এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছিলেন যে Civil Society তথা নাগরিক সমাজ বা সুশীল সমাজ হচ্ছে এমন একটি ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল যেখানে জনগণ ব্যক্তিগত রূপে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে তাদের অধিকারসমূহের স্বাধীনভাবে প্রয়োগ করতে পারে।

তাঁরা মনে করতেন যে নাগরিক সভ্যসমাজ (Civil Society) ও রাষ্ট্রের (State) উদ্ভবের পূর্বে মানুষ একটি প্রকৃতির রাজ্যে বা 'State of Nature' -এ বাস করত। তাদের জীবন সম্পত্তি ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নিরাপত্তা বিধানার্থে মানুষই একটি সামাজিক চুক্তি বা Social Contract দ্বারা স্বেচ্ছায় নাগরিক সভ্য সমাজ (Civil Society) ও রাষ্ট্র (State) প্রতিষ্ঠা করে, যেখানে স্বাধীনতা ভোগ করার জন্যই তারা তাদের কিছু অধিকারসমূহ স্বেচ্ছায় ত্যাগ করে।

অর্থনীতির ক্ষেত্রে অ্যাডাম স্মিথ (Adam Smith) ন্যূনতম রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের স্বপক্ষে প্রচার করেন। অ্যাডাম স্মিথের মতে যদি ব্যক্তিগত সুখ (individual happiness) বৃদ্ধি পায় তাহলে সামগ্রিক সামাজিক সুখও (total societal happiness) বৃদ্ধি পাবে। এটা কেবলমাত্র তখনই সম্ভব হতে পারে যখন রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ ব্যতিরেকে প্রত্যেক ব্যক্তিই সর্বাধিকতম ব্যক্তিগত লাভ (maximum private profit) -এর জন্য বিনিয়োগ করবার অধিকার পাবেন। এইরূপে দেখা যায় যে ইংল্যান্ডে ধনতন্ত্রবাদের / পুঁজিবাদের (Capitalism) উত্থানের সঙ্গে একই সঙ্গে রাজনৈতিক উদারতন্ত্রবাদেরও (Political Liberalism) উত্থান ঘটেছিল। Feminist Theorist বা নারীদের তাত্ত্বিক হোয়েলহ্যান (Whelehan) বলেছেন, প্রায়ই একথা বলা হয় যে ধনতন্ত্রবাদের উত্থানের সঙ্গে উদারতন্ত্রবাদী রাজনৈতিক দর্শনের (Liberal Political

Philosophy) উত্তবসমূহ সংশ্লিষ্ট, যাতে করে স্বশাসন (autonomy) ও স্ব-উন্নয়ন (self-improvement) এর ধারণাসমূহ মধ্যবিত্তশ্রেণীর সম্পত্তির স্বার্থসমূহের (property interests) সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত হতে পারে।

ইংল্যান্ডে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদারতন্ত্রবাদের প্রেক্ষাপটে উদারতান্ত্রিক নারীবাদ বা Liberal Feminism -এর আবির্ভাব হয়। দার্শনিক দৃষ্টিকোণ থেকে উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকল মানুষের অন্তর্নিহিত প্রকৃতিগত স্বাভাবিক যুক্তির আলোকের সার্বিক কর্তৃত্বের ধারণা গ্রহণ করে, যার দ্বারা নারীপুরুষ নির্বিশেষে ব্যক্তি হিসাবে মানুষ কোনরূপ বহির্বিষয়ক কর্তৃত্ব / কর্তৃপক্ষর (External Authority) সহায়তা ব্যতীত বিশ্বজনীন নিরপেক্ষ পক্ষপাতহীন অখণ্ডনীয় বিচার-বিশ্লেষণে উপনীত হতে পারে। উদারতান্ত্রিক নারীবাদীদের মতে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিদের নারীপুরুষ নির্বিশেষে রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকার থাকা উচিত। উক্ত মতানুযায়ী নারীদের ভোটাধিকার, তাদের স্বামীদের ন্যায় সমান আইনগত অধিকার, শিক্ষা গ্রহণের অধিকার এবং প্রতিনিধিত্ব করার মাধ্যমে রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অঙ্গীভূত হবার অধিকার থাকা উচিত।

এছাড়া উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা আবহমান কাল ধরে নারীদের স্বাভাবিক স্থানরূপে ব্যক্তিগত গার্হস্থ্য-কেন্দ্রিক পরিমণ্ডলের (private domestic sphere) মধ্যে অবনত করে রাখবার প্রবণতারও সমালোচনা করেন। হোয়েলহ্যান (Whelehan) বলেছেন সার্বজনীন বা সর্বসাধারণের পরিমণ্ডল ও ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের ধারণাকে (The concept of public and private sphere) ব্যক্তিগত জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের পরিসীমা চিহ্নিত করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা হয়েছে। এক্ষেত্রে সর্বসাধারণের বা সার্বজনীন পরিমণ্ডল (public sphere) অর্থে সামাজিক জীবনযাত্রা (social life) কে বোঝানো হয়েছে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপ বৈধ; অপরদিকে ব্যক্তিগত পরিমণ্ডল (private sphere) বলতে বিমূর্ত ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যবাদের (abstract individulism) জগৎকে বোঝায় - যেখানে 'man' বা মানুষ রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের বন্ধনমুক্ত হয়ে নিজের অস্তিত্ব বজায় রাখে। এখানে 'man' বা মানুষ প্রতিশব্দ / সংজ্ঞাটি সুস্পষ্টভাবে লিঙ্গকেন্দ্রিক করা হয়েছে। এর কারণ সাধারণতঃ পুরুষকে তার বিভিন্ন দোষ, ত্রুটি-বিচ্যুতি, অক্ষমতা, কর্তব্যে অবহেলা বা অনুপস্থিতি সত্ত্বেও সামাজিক মিথস্ক্রিয়ার (social interaction) দৃষ্টান্ত বলে ধরে নেওয়া হয়। অপরদিকে নারীকে প্রকৃতিগতভাবে গৃহকোণের গণ্ডীর মধ্যে ও মানব প্রকৃতির (human nature) অযৌক্তিক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত বলে ধরে নেওয়া হয় যার সঙ্গে সন্তান প্রতিপালন ও আবেগের বিষয়টি জড়িত।

উনবিংশ শতকের একজন নারীবাদী মেরী ওলস্টোনক্র্যাফট (Mary Wollstonecraft) নারীর ভোটাধিকার আন্দোলনের একজন প্রবক্তা ছিলেন। তিনি এমন একটি অপরিহার্য মানবিক প্রকৃতিতে বিশ্বাসী ছিলেন যা প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যে সাধারণভাবে উপস্থিত ও যা নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিশ্বজনীন (Universal) প্রকৃত যুক্তিবাদী সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সাহায্য করে। ওলস্টোনক্র্যাফটের মতে নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রত্যেক ব্যক্তিরই সমাজে স্বাভাবিক অধিকারসমূহ রয়েছে। তাঁর 'A Vindication of the Right of Women' নামক গ্রন্থে তিনি বলেছেন যে যতক্ষণ পর্যন্ত নারীরা ভোটাধিকার না পায় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন গণতন্ত্রই প্রকৃত গণতন্ত্র হতে পারেনা।

এছাড়া ওলস্টোনক্র্যাফট সর্বসাধারণের পরিমণ্ডলের বাইরে ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের মধ্যে নারীদের আবদ্ধ করে রাখবার প্রবণতারও নিন্দা করেছেন। তাঁর মতে নারীর প্রকৃত মর্যাদা কেবলমাত্র শিক্ষালাভের মাধ্যমে ও গৃহকোণের গণ্ডীর বাইরে সর্বসাধারণের কাজের মধ্যে প্রবেশাধিকারের মাধ্যমে আসতে পারে। ফ্রান্সেস রাইট (Frances Wright) উনবিংশ শতকের নারীবাদী ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানসমূহ, সামাজিক প্রথা, ঐতিহ্য, আচার-ব্যবহার, রীতিনীতি প্রভৃতির সহায়তা ব্যতীত প্রকৃত সত্যে উপনীত হবার জন্য নারীদের যুক্তিবাদ ও সমালোচনামূলক চিন্তাধারার উপর গুরুত্ব আরোপ করার কথা বলেন। রাইটের মতে ধর্ম ও সামাজিক প্রতিষ্ঠানসমূহ নারীদের অবদমিত করে রাখবার জন্য তৈরী করা হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর আরেকজন নারীবাদী সারা গ্রিমকে (Sarah Grimke) এই মত প্রকাশ করেছেন যে নারীদের সামাজিক অবস্থার উন্নতির জন্য তাদের সমানাধিকার লাভ করা ছাড়াও সামাজিক পরিবর্তন সমূহ আনয়নেরও প্রয়োজনীয়তা রয়েছে; এর কারণ পুরুষগণ একটি শ্রেণীরূপে নারীদেরও একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে নিজেদের অধীনস্থ করে রেখেছে। এছাড়া গ্রিমকে নারীদের ভোটাধিকারেরও একজন প্রবক্তা ছিলেন ও মনে করতেন যে নারীগণ নির্বাচিত প্রতিনিধিত্বকরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়েও কর প্রদানজনিত বাধ্যবাধকতার শিকার। তিনি আরও মনে করতেন যে নারীদের পুরুষদের সমতুল কাজের জন্য সমতুল বেতন পাওয়া উচিত এবং তাদের বৌদ্ধিক ও সমালোচনামূলক দক্ষতার বৃদ্ধিকরণের জন্য যথাযথ শিক্ষালাভের অধিকার পাওয়া উচিত। এছাড়া তিনি নারীদের গৃহকোণের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ করে রাখবার প্রবণতারও সমালোচনা করেন। এ প্রসঙ্গে ডোনাভ্যান (Donavan) লিখেছেন যে নারী ও পুরুষদের যথাক্রমে সর্বসাধারণের পরিমণ্ডল (Public Spheres) ও ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের (Private Spheres) মধ্যে সমর্পণের বিষয়টি গ্রিমকের মতে একটি স্বেচ্ছাচারমূলক প্রথা (arbitrary matter of custom), এর কারণ যেহেতু নারী ও পুরুষ নৈতিক ও বৌদ্ধিক দিক থেকে সমতুল (moral and intellectual equals), সেহেতু তাদের সমতুল অধিকার ও দায়িত্বসমূহ থাকা উচিত।

এলিজাবেথ কেডী স্ট্যানটন (Elizabeth Cady Stanton) নামক উনবিংশ শতকের একজন আমেরিকান নারীবাদী মত প্রকাশ করেছেন যে নারীদের ভোটাধিকার তাদের স্বাভাবিক অধিকার। তিনি নারীদের ভোটাধিকারের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেছেন যে ভোটাধিকারহীন নারীরা প্রতিনিধিত্বকরণের সুযোগ ব্যতীত বাধ্যতামূলক করপ্রদান (taxation without representation) জনিত অসুবিধার সম্মুখীন হয়। এছাড়া তিনিও নারীদের ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলে আবদ্ধ রাখবার প্রবণতার সমালোচনা করেছেড়। এই প্রসঙ্গে ডোনাভ্যান (Donavan) বলেছেন যে স্ট্যানটনের (Stanton) উদারনৈতিক নারীবাদের মুল প্রতিপাদ্য তত্ত্ব হচ্ছে এই যে ব্যক্তি হিসাবে নারীদের তাদের নিজেদের পায়ে দাঁড়াবার অর্থাৎ স্ব-নির্ভর হবার জন্য অধিকার লাভ করা আবশ্যক। তিনি চেয়েছিলেন যে নারীদের ন্যূনতম মৌলিক অধিকারসমূহ দেওয়া হোক যাতে তারা নিজেরাই তাদের নিজের সম্পত্তি, সন্তানদের ও বাড়ীঘর দেখাশোনা করতে পারে। লক (Locke) এর দার্শনিক ঐতিহ্যানুসারী স্ট্যানটন সরকারকে (পুরুষতান্ত্রিক) স্বৈরতন্ত্রের (tyranny) বিরুদ্ধে একটি রক্ষাকর্তা রূপে দেখেছিলেন যা ব্যক্তিগত রূপে নারীদের স্বাধীনভাবে কার্যকলাপের অধিকার প্রদানপূর্বক তাদের স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করতে দেবে। স্ট্যানটনের অচলায়তন সৃষ্টিকারী ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের

উদাহরণস্বরূপ ১৮৫১ সালের সম্মেলনে প্রেরিত তার একটি পত্রের কথা বলা যায় যেখানে তিনি মেয়েদের সাহসিকতার ও স্বনির্ভরতার সঙ্গে শিক্ষা প্রদানের বিষয়টির উল্লেখ করেছেন ও তাঁর চূড়ান্ত বক্তব্য ছিল নারীদের স্বীয় স্বাতন্ত্র্য (solitude of self)। নারীদের স্বীয় স্বাতন্ত্র্য (solitude of self) সম্পর্কে তিনি তাঁর এই দৃঢ় বিশ্বাস ব্যক্ত করেছেন যে যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই পৃথক, স্বতন্ত্র ও বিচ্ছিন্ন (isolated) সুতরাং একজন নারীর নিজের দায়িত্ব নিতে শেখা উচিত। স্ট্যানটন সঠিকভাবেই নির্দেশ করেছেন যে প্রত্যেক মানবিক সত্তার (human soul) ব্যক্তিত্ব, প্রোটেস্টান্ট ধর্মমতের আদর্শ, ব্যক্তিগত বিবেক ও বিচার বিশ্লেষণের অধিকারের (the right of individual conscience and judgment) মধ্যে আংশিকভাবে নিহিত।

আর একজন উনবিংশ শতকের নারীবাদী সুজান বি. অ্যান্থনী (Susan B. Anthony) এই বক্তব্য পেশ করেছেন যে নারীদের স্বাভাবিক ভোটাধিকার থাকা উচিত যা লিঙ্গকেন্দ্রিক অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক কতিপয় ব্যক্তিভিত্তিক একচেটিয়া শাসনতন্ত্রের (oligarchy of sex) এবং নারীদের দাসত্বজনিত পরিস্থিতির অবসান ঘটাবে। আর একজন উদারতান্ত্রিক দার্শনিক জন স্টুয়ার্ট মিল (John Stuart Mill) সমাজে নারীদের অধঃস্তন মূলক / অধীনতা মূলক অবস্থানের (subordinate position) অবসান ঘটানোর জন্য নারীদের আইনগত ও রাজনৈতিক অধিকারের স্বপক্ষে বক্তব্য রাখেন। তিনি নারীদের প্রকৃতিগত কতকগুলি বৈশিষ্ট্য (women's nature) যেমন স্নায়বিক দুর্বলতা (nervousness)। যষ্ঠ ইন্দ্রিয়কেন্দ্রিক অনুভূতি প্রবণতা / অনুমান প্রবণতা (intuitive), প্রণয়োদ্দীপক প্রবণতা (amatory propensities) প্রভৃতির দরুন পুরুষদের থেকে হীনতর (inferior) বলে ধরে নেবার কোন কারণ নেই বলেছেন। এর কারণ কিছু পুরুষদের মধ্যেও উক্ত প্রবণতাসমূহ বিদ্যমান। মিলের মতে সমাজে নারীদের অধীনতামূলক অবস্থান কোনরূপ স্বাভাবিক কারণসমূহের পরিবর্তে সামাজিক প্রথা ও আইনগত পদ্ধতির দরুন হয়েছে। তিনি বলেছেন যে পুরুষেরা নারীদের অধীনস্থ করে রাখবার জন্য তাদের শিক্ষালাভের অধিকার ও সমতুল রাজনৈতিক ও আইনগত অধিকারসমূহ প্রদান করেনি যার দরুন তাদের বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে বিবাহিত জীবন যাপন করা ছাড়া আর কোন উপায় থাকেনা ও তারা নিজের পছন্দমত পথে চলতে / যেতে পারে না।

মিল বলেছেন প্রথম বর্তমান পদ্ধতির অনুকূলে মতামত বা অপেক্ষাকৃত দুর্বলতর লিঙ্গ (weaker sex) অর্থাৎ নারীদের অপেক্ষাকৃত শক্তিশালী লিঙ্গ (stronger sex) অর্থাৎ পুরুষদের নিকট সম্পূর্ণরূপে অধীনস্থ করে রাখে, তা কেবলমাত্র তত্ত্বের উপর নির্ভরশীল, কারণ সেগুলির কোনটিরই কোনরূপ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়নি। সুতরাং উক্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিহীন তথাকথিত অনুমান-নির্ভর অভিজ্ঞতা যা সেই অর্থে চূড়ান্তভাবে তত্ত্ব-বিরোধী, তার কোনরূপ বিচারের রায় দেবার অধিকার নেই। দ্বিতীয়তঃ উক্ত অসমতার নীতি গ্রহণের বিষয়টি কোনরূপ সুচিন্তিত মতামত বা পূর্বচিন্তা বা কোনরূপ সামাজিক মতাদর্শ বা কোনরূপ ধ্যানধারণা যা মানবতার কল্যাণে বা সমাজের শৃঙ্খলার প্রয়োজনে ব্যবহৃত হবে তার ফলাফল কখনই ছিলনা। এর উদ্ভব কেবলমাত্র এই কারণে হয়েছিল যে সমাজব্যবস্থার উষালগ্ন থেকে প্রত্যেক নারীই পুরুষসৃষ্ট মূল্যবোধ তার উপর আরোপিত হবার দরুন ও পুরুষের শারীরিক শক্তির তুলনায় তার হীনতার কারণে কোন না কোন পুরুষের নিকট দাসত্বের বন্ধনে আবদ্ধ ছিল। সুতরাং আইনশাস্ত্র ও রাজনৈতিক পদ্ধতির সূচনা সর্বদাই নারীপুরুষের মধ্যে ইতোমধ্যেই বিদ্যমান উক্ত পূর্ব আরোপিত পারস্পরিক সম্পর্কের স্বীকৃতি প্রদানের মাধ্যমে ঘটতো। সেগুলি কেবলমাত্র একটি জৈবিক ও শারীরিক সত্যকে আনিগত অধিকারে রূপান্তরিত

করে সমাজের অনুমোদন দিত এবং সমাজব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার পূর্বে যে সামাজিক অনুশাসনহীন অনিয়মিত শারীরিক শক্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাত নারীর উপর পুরুষের অধিকারকে কেন্দ্র করে ঘটতো, তার পরিবর্তে নারীর উপর পুরুষের অধিকারসমূহ প্রতিষ্ঠার ও সংরক্ষণের জন্য একটি সর্বসাধারণ কর্তৃক স্বীকৃত ও সংগঠিত সামাজিক অনুশাসন উদ্ভাবনেই মূলতঃ লক্ষ্যায়িত হত। ইতোমধ্যেই যে সকল নারীরা পুরুষের বশ্যতাস্বীকারে বাধ্য হয়েছিল, তারা উক্ত সামাজিক অনুশাসন উদ্ভাবনের দরুন তা মানতে বাধ্য হয়েছে।

নারীদের আইনগত সমতার সমর্থনে মিল এই হিতবাদী বা ইউটিলিটারিয়ান্ (Utilitarian) বক্তব্য ব্যবহার করেছিলেন যে একটি প্রক্রিয়াকে তার বিকল্পের উপর স্থান দিয়ে তখনই বাছাই করা উচিৎ যদি তার ফলাফল সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের জন্য সর্বাধিকতম কল্যাণ (greatest good of the greatest number) আনয়ন করে। উক্ত মতানুযায়ী মিলের মতে নারীদের পুরুষদের সঙ্গে রাজনৈতিক ও আইনগত সমতার আসনে অধিষ্ঠিত করার অর্থ ছিল সর্বাধিক সংখ্যক জনগণের জন্য সর্বাধিকতম কল্যাণ সাধন।

মিল বলেছেন নারীদের যা কিছু পরিষেবাই সর্বাপেক্ষা কাম্য হোক না কেন, অবাধ প্রতিযোগিতার মধ্যে তা উন্মুক্ত করাই তাদের উক্ত কাজে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী উদ্দীপনামূলক / উৎসাহদায়ক হবে। যে সকল কাজের জন্য তারা সর্বাপেক্ষা যোগ্য, সেই সকল ক্ষেত্রেই তারা সর্বাপেক্ষা আকাঙ্খিত। উপরোক্ত কাজের অংশ তাদের মধ্যে ভাগ করে দেবার মাধ্যমেই, সামগ্রিকভাবে নারী-পুরুষ উভয়েরই যৌথ কর্মশক্তিকে সর্বাপেক্ষা অধিকভাবে মূল্যবান ফলাফলের জন্য প্রয়োগ করা যাবে।

এছাড়া মিল আরও বলেছেন যেহেতু প্রত্যেক ব্যক্তিই আধুনিক সমাজে রাজতন্ত্র অথবা ঈশ্বরের প্রভাব ব্যতীত যুক্তিবাদী সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম, সেহেতু নারী-পুরুষ নির্বিশেষে তাদের নিজ নিজ পেশা বেছে নেবার অথবা সাংসদীয় প্রতিনিধিত্ব প্রেরণ করবার অধিকার থাকা উচিত। যেহেতু নারীও একজন ব্যক্তি (person) সুতরাং তারও সংসদে নিজ পছন্দমত প্রতিনিধিত্ব নির্বাচনের অধিকার থাকা উচিত। সর্বোপরি মিল নারীদের শিক্ষালাভের অধিকার দিয়েও পুরুষদের নিকট রাজনৈতিক ও আইনগত ভাবে অধীনস্থ করে রাখবার প্রবণতার অসারতার দিকে আমাদের দৃষ্টি নির্দেশ করেছেন।

Criticism of Liberal Feminism by Socialist and Radical Feminists সমাজতান্ত্রিক (Socialist) এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী (Radical) নারীবাদীগণ কর্তৃক উদারতান্ত্রিক সমাজতান্ত্রিক এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতি কেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী (Radical) নারীবাদীগণ কর্তৃক উদারতান্ত্রিক নারীবাদের সমালোচনা (Criticism of Liberal Feminism by Socialist and Radical Feminists) তুলে ধরা হচ্ছে। নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী (Radical) এবং সমাজতান্ত্রিক (Socialist) নারীবাদীরা উদারতান্ত্রিক নারীবাদীদের নারীদের ক্ষেত্রে সর্বসাধারণের পরিমণ্ডল (public sphere) এবং ব্যক্তিগত তথা গৃহকোণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ পরিমণ্ডল (private sphere) – এই দুই বিপরীতধর্মী শ্রেণীকেন্দ্রিক (dichotomy) পরিমণ্ডলের বিষয়টি ধরে রাখবার এই কারণে সমালোচনা করেছেন যে এর দরুন ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের ক্ষেত্রটি সামগ্রিক পরিবর্তনকামী তাত্ত্বিক সুবিবেচনার আওতার বাইরে রাখা হয়েছে। হোয়েলহ্যান (Whelehan) বলেছেন যে বিষয়টি ধ্রুপদী উদারতান্ত্রিক নারীবাদী (Classical Liberal Feminists) এবং সমাজতান্ত্রিক ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী নারীবাদীদের (Socialist and Radical Feminists) মধ্যে অবধারিত

বিরোধিতার সৃষ্টি করেছিল - তা হচ্ছে অলঙ্ঘনীয় ব্যক্তিগত পরিমণ্ডলের ধারণাটি। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে উক্ত বিষয়টি তাদের বিবাহকেন্দ্রিক ধর্ষণ অর্থাৎ বিবাহিতা নারীদের সম্মতিব্যতীত স্বামীকর্তৃক যৌনমিলনে বাধ্যতাকরণের (marital rape) এবং গার্হস্থ্য হিংসার (domestic violence) ন্যায় সমস্যাবলীসহ গৃহকেন্দ্রিক পরিবেশে নারীদের অস্তিত্বের প্রশ্নটির কোনরূপ সামগ্রিক পরিবর্তনকামী তাত্ত্বিক সুবিবেচনার আওতার বাইরে রাখছে।

ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে বেটী ফ্রীডেন্ (Betty Freiden) -এর ন্যায় নারীবাদী সমালোচকগণ লিঙ্গকেন্দ্রিক এবং যৌনতাকেন্দ্রীক অসমতার (Gender and sexual inequality) বিষয়টি সম্মুখে আনয়ন করবার জন্য নারীদের গার্হস্থ্য জীবন ও যৌনজীবনের (domestic and sexual lives) চাপা উত্তেজনার বিষয়গুলি (tensions) প্রদর্শনের পক্ষপাতী। যাইহোক কতদূর পর্যন্ত উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা ব্যক্তি হিসাবে নারীদের ব্যক্তিগত সামাজিক পছন্দ / যৌনতাকেন্দ্রিক পছন্দর (private social / sexual choices) ক্ষেত্রে উঁকিঝুঁকি মারবে বা অন্যায় কৌতূহল দেখাবে তার একটি সীমা রয়েছে; উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে মতপ্রকাশের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে তাদের প্রতিশ্রুতির দরুন (commitment) অশ্লীলরচনা / চিত্র (pornography) প্রভৃতির ক্ষেত্রে কোনরূপ কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা তাদের পক্ষে সম্ভবপর নয়।

এছাড়া যেহেতু উদারতান্ত্রিক নারীবাদ মুক্ত বাজার (free market) এর উদারতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ধ্যানধারণাপ্রসূত, সুতরাং তা বহু নারীর নিকট চাপা উত্তেজনার সৃষ্টি করেছিল যাদের নিকট অর্থনীতিতে স্বাধীনভাবে অংশগ্রহণ সফলতাযোগ্য বলে বিবেচিত হয়নি। হোয়েলহ্যান (whelehan) বলেছেন, জনগণের জীবনযাত্রার রাষ্ট্রীয় হস্তক্ষেপের ক্ষেত্রে উদারতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সমস্যা বহুল বলে প্রমাণিত হয়, এর কারণ যেহেতু বহু নারীর জীবনযাপনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উক্ত পরিষেবার কোনরূপ সংকোচন . হ্রাসমানতার অর্থ ছিল তাদের জীবনযাত্রার মানদণ্ডর অবনতি। এক্ষেত্রে অধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল এই যে উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা নারীর ব্যক্তিত্ব বিকাশের অধিকারের প্রতি আবেদন রাখার সাথে সাথে উক্ত অধিকারের স্বীকৃতি ক্রমাগত বিঘ্নিত করার বিষয়ে নারীপুরুষের জৈবিক পার্থক্যসমূহ থেকে আহরিত পুরুষের আধিপত্যবাদী ভূমিকা প্রকটিত করবার প্রচেষ্টায় ও একইসাথে রত ছিল।

সর্বোপরি, সমাজতান্ত্রিক (socialist) ও নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী (র‍্যাডিকাল / Radical) নারীবাদীরা নির্দেশ করেছেন যে যেহেতু উদারতান্ত্রিক নারীবাদ উদারতন্ত্রবাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত যা ধনতন্ত্রবাদ / পুঁজিবাদকে সমর্থন করে; যেহেতু উদারতান্ত্রিক নারীবাদ স্থিতাবস্থা বজায় রাখার লক্ষ্যে ধাবিত হয় এবং কোনরূপ বৈপ্লবিক পরিবর্তনসমূহ আনয়ন করবার প্রচেষ্টায় রত হয়না। হোয়েলহ্যান (Whelehan) বলেছেন যে যেহেতু উদারতন্ত্রবাদীরা সর্বদাই ব্যক্তি হিসাবে মানুষের আত্ম-উন্নয়নের / স্বীয় অগ্রগতির (self-advancement) অধিকারকে দৃঢ়ভাবে সুরক্ষিত করেছে, সুতরাং উদারতান্ত্রিক নারীবাদীরা সাধারণত দৃঢ়ভাবে বলে থাকে যদি নারীরা পুরুষ নাগরিকদের ন্যায় সমান সামাজিক ও আইনগত মর্যাদা ও অবস্থান লাভ করে সেক্ষেত্রে প্রতিভাতন্ত্র (meritocracy) অর্থাৎ নারীপুরুষ নির্বিশেষে প্রতিভার ভিত্তিতে বাছাই করার বিষয়টিকে লিঙ্গকেন্দ্রিক বলা যায়না। অপরিহার্যরূপে ফ্রীডেন (Freiden) এর রচনায় দেখানো হয়েছে যে উদারতান্ত্রিক নারীবাদ মূলত মধ্যবিত্ত শ্রেণীর নারীদের প্রয়োজনীয়তাকেন্দ্রিক এবং সম্ভবত নারীদের স্বীয় অগ্রগতির (self-advancement) পথে প্রতিবন্ধকতাস্বরূপ শ্রেণীগত অথবা জাতিগত পার্থক্যকে

স্বীকার করবে না।

১২.১.১.২ ঃ মার্কস এবং ডুয়াল সিস্টেম্‌স্ তত্ত্ব (Marx and the dual Systems Theory)

কার্ল মার্কস -এর মতে যে মৌলিক পদ্ধতিতে মানুষ (human) তার মানবিক প্রকৃতির (non-human nature) সঙ্গে সম্পর্কিত তা হচ্ছে খাদ্য (food) এবং আশ্রয় (shelter) এর ন্যায় অপরিহার্য্য বস্তুগুলির উৎপাদনের মাধ্যমে। যে কোন সমাজের উৎপাদন পদ্ধতি (production system) উক্ত সমাজের অর্থনৈতিক অথবা বস্তুগত ভিত্তি (material base) অথবা পরিকাঠামো (structure) গঠন করে। প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদনের জন্য মানুষ প্রকৃতির (nature) সহিত বোঝাপড়া করে প্রকৃতপক্ষে একে অপরের সঙ্গে সামাজিক সম্পর্কে (social relations) নিয়োজিত হয়ে উৎপাদনের সম্পর্ক (the relations of production) গঠন করে। উক্ত উৎপাদনের সম্পর্ক (the relation of production) আবার একটি সমাজের অ-পার্থিব / অ-বস্তুগত ভিত্তি (non-material base) গঠন করে যার উপর একটি নির্দিষ্ট সমাজের রাজনৈতিক - আইনগত পদ্ধতি (politicolegal system) মতাদর্শ (ideology), দর্শন (philosophy), ধর্ম (religion) এবং সংস্কৃতি (culture) নিয়ে গঠিত সামগ্রিক উপরিকাঠামো (the entire super-structure) নির্ভরশীল।

মার্কস -এর মতে ইতিহাসের গতি সমাজের পরিকাঠামো (structure) এবং উপরিকাঠামোর (super structure) মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য (contradictions) দ্বারা আবর্তিত হয়। মার্কস মানবসভ্যতার বিকাশের ইতিহাসকে কয়েকটি যুগ বা পর্যায়ে বিভক্ত করেছেন। এর প্রথম পর্যায় বা যুগ ছিল শিকার এবং ফলমূল আহরণের (hunting and gathering) আদিম পর্যায়ে (primitive stage), যখন উৎপাদন প্রক্রিয়া বা প্রণালী (modes of production) সামাজিক মালিকানার (socially owned) মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। এরপর নূতন শক্তিসমূহ (new forces) বা উৎপাদনের উপকরণসমূহের (tools of production) আবিষ্কারের সঙ্গে উৎপাদন (production) এবং উৎপাদনের সম্পর্কের (relations of production) মধ্যে দ্বন্দ্ব বা বৈপরীত্য (contradictions) দেখা দেয় যার ফলে কৃষিজ উৎপাদন প্রক্রিয়া প্রণালীর উদ্ভব হয়, যেখানে মানুষ ভূমি কর্ষণ ও বীজ বপনের মাধ্যমে মূলত কৃষিজ দ্রব্য উৎপাদন করত। সুতরাং সেখানে অনুরূপ উৎপাদনের সম্পর্ক (relations of production) বিকশিত হয়। মার্কস এর মতে ইতিহাসের পরবর্তী দুটি পর্যায় হল সামন্ততান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি (feudal mode of production) এবং ধনতান্ত্রিক উৎপাদন পদ্ধতি (capitalist mode of production)। উৎপাদন পদ্ধতির প্রত্যেকটি পর্য্যায়ে যারা উৎপাদনের উপকরণকে (means of production) নিয়ন্ত্রণ করে এবং যারা করে না, তার ভিত্তিতে শ্রেণী বিভাজন (class division) ছিল। পুরাতন সমাজব্যবস্থা থেকে শ্রেণী সংগ্রামের (class struggle) মাধ্যমে একটি নূতন সমাজের জন্ম হয় যেখানে উৎপাদন পদ্ধতির (system production) নিয়ন্ত্রণকারী শ্রেণীকে ক্ষমতাচ্যুত করে একটি নূতন শ্রেণী উৎপাদন পদ্ধতির নিয়ন্ত্রণ অধিকার করে।

মার্কস এর মতে ধনতান্ত্রিক পদ্ধতি (capitalist systems) হচ্ছে প্রথম উৎপাদন পদ্ধতি যেখানে

পণ্যদ্রব্যসমূহ (commodities), শ্রমের মজুরী (wage labour), পণ্যের ব্যবহারমূল্য এবং বিনিময় মূল্যের স্বতন্ত্রীকরণ (the separation of use value and exchange value) এবং ব্যবহার মূল্যের (use value) উপরে বিনিময় মূল্যের (exchange value) অগ্রাধিকার – প্রভৃতির উদ্ভব দেখা যায়। মার্কস বলেছেন একটি বস্তু তখনই পণ্যদ্রব্যে (commodity) রূপান্তরিত হয় যখন তাকে বিক্রয়ের জন্য বাজারে আনা হয়। প্রত্যেকটি পণ্যদ্রব্যের ব্যবহারমূল্য (use value) আছে, উদাহরণস্বরূপ বলা যায় কোন একজনের কাছে টেবিলের ব্যবহারমূল্য (use value) তার বইগুলি রাখবার জন্য রয়েছে, এছাড়া এর একটি বিনিময়মূল্য (exchange value) ও আছে – যার মূল্য অর্থ বা টাকাকড়ির মাধ্যমে নির্ধারিত হয়। মার্কস এর মতে পুঁজি গঠনের (capitalist accumulation) স্ব-উৎপাদনশীল প্রকৃতির চাবিকাঠি সর্বহারার শ্রম (proletariate labour) থেকে অতিরিক্ত শ্রমসময় (extra labour time), যা মজুরীর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত নয়, তাকে বলপূর্বক ধার করে শ্রমের উদ্বৃত্ত মূল্য (surplus value of labour), যা সঞ্চিত হতে থাকে এবং যাকে পুঁজিপতি (capitalist) আরও অধিক লাভের জন্য অন্যত্র বিনিয়োগ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজন পুঁজিপতি যে ঝুড়ি (baskets) বিক্রয় করে লাভ করেছে সে এরপর জুতা তৈরি ও বিক্রয় করার ক্ষেত্রে বিনিয়োগ করবে। এইরূপে দেখা যায় যে উদ্বৃত্তমূল্য (surpluse value) শ্রম শক্তির (labour power) শোষণের (exploitation) মাধ্যমে পুঁজি বৃদ্ধি করে তাকে বহুগুণ বাড়াতে সাহায্য করে। পুঁজিবাদ / ধনতন্ত্রবাদে (capitalism) শ্রেণীগুলি (classes) অধিকতর মাত্রায় মূলত দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত হতে থাকে – যথাক্রমে বুর্জোয়া (bourgeois) এবং সর্বহারা (proletariate)। এক্ষেত্রে শেষোক্ত শ্রেণীটি বৈপ্লবিক শক্তিতে (revolutionary force) পরিণত হয়। মার্কস -এর মতে ইতিহাসের চূড়ান্ত পর্যায়ে সর্বহারা শ্রেণী (proletariate class) পুঁজিবাদী / ধনতন্ত্রবাদী ব্যবস্থাকে (capitalist system) উৎপাটিত করে উৎপাদনের উপকরণের (means of production) উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে যার পরিণতিক্রমে একটি শ্রেণীহীন সমাজব্যবস্থা (a classloss society) প্রতিষ্ঠিত হয়।

নারীবাদের তাত্ত্বিকরা যাঁরা ডুয়াল সিস্টেম তত্ত্ব (Dual systems theory) প্রচার করেছিলেন, তাঁরা মার্কসীয় তত্ত্বের আদলে (model) পিতৃতন্ত্রের (patriarchy) একটি ভিত্তি (base) ও উপরিকাঠামো (super-structure) নির্মাণ করেছিলেন, যদিও তা বিষয়বস্তুর দিক থেকে তার থেকে (মূল মার্কসবাদী তত্ত্ব) আলাদা ছিল। তাঁদের মতে নারীদের প্রতি শোষণের উদ্ভব সমাজের বস্তুগত অর্থনৈতিক ভিত্তি (material economic base) এবং পিতৃতান্ত্রিক ভিত্তির (patriarchal base) থেকে হয়েছে। যার কোনটির উপরই নারীদের কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। হেইডি হার্টম্যান (Heidi Hartmann) তাঁর 'The Unhappy Marriage of Marxism & Feminism নামক বলিষ্ঠ রচনায় পিতৃতন্ত্রর (patriarchy) বস্তুগত ভিত্তির কথা বলেছেন, যা আবার অর্থনৈতিক ভিত্তির থেকে আলাদা এবং যা সর্বসাধারণের পরিমণ্ডলে (public sphere) নারীর যৌনতা (sexuality) এবং শ্রমশক্তিকে (labour power) নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে এবং ব্যক্তিগত গৃহমধ্যস্থ পরিমণ্ডলে (private sphere) লিঙ্গভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে গঠিত হয়।

সর্বসাধারণের পরিমণ্ডলে (public sphere) নারীরা কম মজুরীর কাজ করে এবং ব্যক্তিগত গৃহমধ্যস্থ পরিমণ্ডলে (private sphere) তারা গার্হস্থ্য শ্রমদান (domestic labour) করে থাকে যা বিনিময় মূল্যর (exchange value) পরিবর্তে কেবলমাত্র ব্যবহার মূল্য (use value) উৎপাদন করে থাকে।

সুতরাং সমাজে নারীর অবস্থান অনেকটা সর্বহারার (proletariate) ন্যায়, যার শ্রম যারা উৎপাদনের উপকরণ (means of production) নিয়ন্ত্রণ করে, তাদের দ্বারা ব্যবহৃত হয়। হার্টম্যানের (Hartmann) মতে, পিতৃতন্ত্র (patriarchy) এবং পুঁজিবাদ / ধনতন্ত্রর (capitalism) মধ্যে অংশীদারিত্ব (partnership) পারিবারিক মজুরীর (family wage) মাধ্যমে বৃদ্ধি পায়, যেখানে একজন পুরুষকে তার পরিবার প্রতিপালনের জন্য যথোপযুক্ত মজুরী দেওয়া হয় যার দরুন তার নারী অর্থাৎ স্ত্রী গৃহে থেকে রান্না, ঘরদোর পরিষ্কার, সন্তান পালনের ন্যায় গার্হস্থ্য শ্রমের কাজ করতে পারে যা উক্ত সর্বহারা (proletariate) পুরুষটিকে বাঁচিয়ে রাখে। সুতরাং অপ্রদত্ত / অপ্রদেয় গার্হস্থ্য শ্রম হচ্ছে লুক্কায়িত উদ্বৃত্ত মূল্য (hidden surplus value) যা সর্বহারার (proletariate) পুনরুৎপাদনে সাহায্য করে শেষ পর্যন্ত পুঁজি পুনরুৎপাদনে ও গঠনে সাহায্য করে।

পিতৃতন্ত্র (patriarchy) কর্তৃক নারীর শ্রমের আত্মসাৎকরণের দ্বারা সঞ্চারিত কাঠামো পুঁজিবাদ / ধনতন্ত্রে একটি অনুরূপ মতাদর্শ সৃষ্টি করে যাতে নারীদের পুরুষদের উপর নির্ভরশীল বলে দেখা হতে থাকে। হার্টম্যান (Hartmann) বলেছেন সামন্ততান্ত্রিক সমাজে (feudal societies) নারীদের নির্ভরশীল (dependent) কথার কোন অর্থ ছিলনা। যেহেতু শ্রমের বিভাজন (division of labour) সুনিশ্চিত করে যে নারীরা স্ত্রী এবং মা রূপে পরিবারে গার্হস্থ্যকর্মজনিত শ্রমের ব্যবহার মুল্যের (use value) উৎপাদনের সঙ্গেই কেবলমাত্র জড়িত থাকে, সুতরাং উক্ত গার্হস্থ্য কর্মের হেয় করায় যেমন একদিকে সামাজিক নির্ধারক প্রয়োজন (socially determined need) মেটানোর ক্ষেত্রে পুঁজির অক্ষমতার বৈশিষ্ট্যহীনতাকে প্রকাশ করে, তেমনই একই সঙ্গে তা পুরুষদের নারীদের উপর আধিপত্যকে প্রতিষ্ঠা করবার অন্য একটি যৌক্তিকতা উপস্থাপিত করে। নারীরা সাধারণতঃ শিক্ষিকারূপে, সমাজকল্যাণ কর্মীরূপে এবং স্বাস্থ্য পরিষেবায় নিযুক্ত কর্মীবৃন্দের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশরূপে কর্মরত থাকে। উক্ত চাকুরীর ক্ষেত্রে নারীরা যে প্রতিপালনকারী ভূমিকা পালন করে থাকে তা সমাজে নিম্ন মর্যাদার পেশারূপে ধরা হয়। কারণ পুঁজিবাদ সামাজিক প্রয়োজনীয়তা মেটানোর ক্ষেত্রে ব্যক্তির স্বাধীনতা এবং ব্যক্তিগত উদ্যোগের দক্ষতার উপর গুরুত্ব আরোপ করে; যে আরোপিত গুরুত্ব যৌথভাবে প্রদত্ত সামাজিক পরিষেবাসমূহের প্রয়োজনীয়তাকে অস্বীকার করে।

যতদিন পর্যন্ত প্রতিপালনকারী কার্যাবলীর সামাজিক গুরুত্বকে নারীদের পরিষেবা প্রদানজনিত কারণের জন্য হেয়জ্ঞান করা যাবে, ততদিন পর্যন্ত গার্হস্থ্য শ্রমের ব্যবহারমূল্যের দাবির সঙ্গে বিনিময়মূল্য কেন্দ্রিক শ্রমের উপর পুঁজির অগ্রাধিকার প্রদানের বিষয়টির সংঘাত এড়ানো যাবে। হার্টম্যানের (Hartmann) মতে এইরূপে বলা যায়, নারীবাদের (Feminism) পরিবর্তে লিঙ্গবাদ (Sexism) তথা লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনই শ্রমিক শ্রেণীকে বিভক্ত এবং দুর্বল করে থাকে।

হার্টম্যানের উপরোক্ত তত্ত্ব ফার্গুসন এবং ফোলবার (Ferguson and Folbre) এর ন্যায় তাত্ত্বিকদের নিকট কিছুটা সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। ফার্গুসন এবং ফোলবার মনে করেন যে নারীদের প্রতিশোষণের কারণস্বরূপ হার্টম্যান যে সকল উপাদানসমূহকে লিপিবদ্ধ করেছেন তা অপ্রতুল। প্রথমতঃ, এতে দেখানো হয়েছে যে পুরুষদের নারীদের নিয়ন্ত্রণ করবার একটি মৌলিক আগ্রহ রয়েছে এবং উক্ত উদ্দেশ্যে তাঁরা যেকোন পদ্ধতি যথা বাড়ির কাজে নারীদের সীমাবদ্ধ রাখা, মানুষের অর্থাৎ এক্ষেত্রে পুরুষদের নারীদের

প্রতি অকারণ আতঙ্ক / বিতৃষ্ণা / ঘৃণা (homophobia), নারীদের যৌনতার প্রতি নিয়ন্ত্রণ – প্রভৃতিকে ব্যবহার করে থাকে। পুনরায় হার্টম্যানের দৃষ্টিভঙ্গি / মতামত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন এবং পরিষেবার মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্পষ্ট বা দুর্বোধ্য করে তুলেছিল। ফার্গুসন এবং ফোলবার যেরূপ বলেছেন নারীদের নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে পুরুষদের বিভিন্ন উদ্দেশ্য আছে; সুতরাং নারীদের ক্ষেত্রে পিতৃতান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতি ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন ধরণের ছিল।

এছাড়া ফার্গুসন এবং ফোলবার এর মতে হার্টম্যানের নারীবাদের তত্ত্বে সামাজিক পরিষেবা এবং মাতৃত্বর (mothering) কোনরূপ বিশ্লেষণ অন্তর্ভুক্ত নেই। শুধু তাই নয়, মার্কসীয় উৎপাদন পদ্ধতির ধ্যানধারণা যার মধ্যে সন্তান প্রসব, সন্তানকে মানুষ করা, প্রতিপালন করা, আবেগ বা অনুভূতি, স্নেহ বা অনুরাগ, যৌনতৃপ্তি – প্রভৃতির কোনটাই অন্তর্ভুক্ত ছিল না; হার্টম্যান তার কোন সমালোচনা উপস্থাপিত করেননি। ফার্গুসন এবং ফোলবার হার্টম্যানের পারিবারিক মজুরী (family wage) সম্পর্কে মতামতেরও বিরোধিতা করেছেন। তাঁদের মতে যদিও ধনতন্ত্র এবং পিতৃতন্ত্র উভয়ই নারীদের প্রতি শোষণ থেকে লাভ করেছে, কিন্তু উভয়ের ক্ষেত্রে সময় (time), শ্রম (labour), অর্থ (money) প্রভৃতির তাৎপর্য এক ছিল না। পুনরায় শিশু শ্রমিক আইন শিশুদের অর্থনৈতিক দিক থেকে স্বয়ম্ভর হতে বাধাদান করত এবং এইরূপে পুঁজিবাদ তথা ধনতন্ত্র ছোট পরিবারগুলিকে উদ্দীপনা (incentive) দিয়ে নারীদের কম শ্রম সময় (less labour time) প্রদান করেছিল।

ফার্গুসন এবং ফোলবার (Ferguson & Folbre) একটি লিঙ্গ-প্রভাবিত পদ্ধতি (sex-affected system) পিতৃতন্ত্রের কাঠামোগত ভিত্তি বলে বর্ণনা করেছেন যা মার্কসীয় অর্থনৈতিক ভিত্তি হতে পৃথক। ইতিহাসে সবযুগে পরিবার একটি নির্দিষ্ট উৎপাদন পদ্ধতির স্থান যার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সন্তান প্রসব, সন্তানকে মানুষ করা এবং স্নেহ, ভালবাসা সংক্রান্ত মানবিক প্রয়োজনের পরিপূরণ এবং যা বস্তুগত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন অপেক্ষা পৃথক। তাঁরা বলছেন এটা একটি লিঙ্গ-প্রভাবিত কাঠামো (sex-affected structure) সৃষ্টি করেছে যার নিজস্ব উপরিকাঠামো (super-structure) রয়েছে এবং যা বস্তুগত পণ্যদ্রব্যের উৎপাদনের মাধ্যমে সঞ্চারিত উৎপাদনের সম্পর্ক (the relations of production) হতে পৃথক। লিঙ্গ প্রভাবিত পদ্ধতির (sex-affective system) উপরিকাঠামোগত উপাদান (super-structural component) নিম্নলিখিত তথ্য থেকে প্রতীয়মান যে প্রথমত শিশু তার জীবনের প্রথম পর্বে তার মায়ের উপর মূলত নির্ভরশীল। দ্বিতীয়তঃ, লিঙ্গকেন্দ্রিক সত্তার (gender identity) সৃষ্টি, যেখানে নারীরা আদর্শ মাতৃত্বের (ideal motherhood) দিকে পরিচালিত হয়। তৃতীয়ত, সর্বসাধারণের কার্যাবলী এবং ব্যক্তিগত কার্যাবলীর বিভাজন (the division of 'public' and 'private' work) বা পুরুষদের নারীদেহের উপর অধিকতর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠার অনুমোদন দেয় প্রভৃতি। শেষোক্ত বিষয়টির আবার নারীর লিঙ্গ প্রভাবিত পদ্ধতির (sex affected system) উপর নিয়ন্ত্রণের এবং লিঙ্গ প্রভাবিত এবং অন্যান্য ধরণের উৎপাদন পদ্ধতির মধ্যে সম্পর্কের দ্বারা তারতম্য হতে পারে।

এইরূপে ফার্গুসন এবং ফোলবার বলেছেন যে গড়ে বৃহদায়তন পরিবার ও উচ্চ জন্মহার ইউরোপে প্রাক্-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার ন্যায় অচলায়তন কৃষিভিত্তিক সমাজব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল। পিতৃতন্ত্রের (patriarchy) প্রতিশব্দ বা সংজ্ঞার শব্দতাত্ত্বিক উৎসর (etymological) অর্থ ছিল পিতার

শাসনতন্ত্র ('Rule of the fathers') ইউরোপীয় প্রাক্-ধনতান্ত্রিকগ উৎপাদন পদ্ধতিভুক্ত সমাজব্যবস্থায় পরিবারের পুরুষ গৃহকর্তা তাঁর সন্তানদের উপর যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ জারি করতেন যে নিয়ন্ত্রণ আইনগত ও অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলি দ্বারা বর্দ্ধিত হত। পরিবারস্থ জমি তাঁর নিয়ন্ত্রণাধীন থাকার দরুন গৃহকর্তা পিতা (Patriarch) সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন কখন এবং কাকে তার সন্তানরা বিবাহ করবে এবং কখন ও কোন পরিস্থিতিতে তারা ঘর ছাড়বে। যেহেতু সন্তানেরা প্রায় সময়েই তাদের শারীরিক সাবালকত্ব অর্জনের পরেও গৃহের নিয়ন্ত্রণাধীনে কাজ করত, সুতরাং পিতৃতান্ত্রিক পরিবারে তাদের অর্থনৈতিক অবদান বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

উক্ত পরিপ্রেক্ষিতে লিঙ্গ-প্রভাবিত উৎপাদন (sex-affective production) ব্যবস্থা ও অন্যান্য উৎপাদন ব্যবস্থার মধ্যে সন্তান প্রতিপালনকারী উপাদানের পারস্পরিক সম্পর্ক সুস্পষ্ট ছিল। নারীরা সন্তান প্রতিপালনে যে সময় ব্যয় করত তা গৃহমধ্যস্থ পরিবারের ভবিষ্যৎ উৎপাদন প্রক্রিয়ায় একধরণের বিনিয়োগের প্রতিনিধিত্ব করত বলা যায়। এটা ছিল এমন একটি বিনিয়োগ যা উচ্চ নৈতিকতাপূর্ণ পরিস্থিতিতে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। একথা অনুমান করা যায় যে তখন নারীরা তাদের অধিকাংশ উদ্যমসমূহকে সন্তান প্রস্রাব ও সন্তান প্রতিপালনে ব্যয় করা, স্বেচ্ছায় পছন্দ করত। যাইহোক বিষয়টি ঠিক সেরূপ ছিল মনে হয় না। এর কারণ ইউরোপ ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে প্রাক-ধনতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক (pre-capitalist modes of production) সাধারণতঃ সামাজিক সম্পর্কসমূহ দ্বারা বিশেষায়িত হত যা সন্তান উৎপাদনকারী সিদ্ধান্তসমূহের ক্ষেত্রে নারীর নিয়ন্ত্রণকে দারুণভাবে সীমাবদ্ধ করে রাখত।

জুলিয়েট মিচেলের (Juliett Mitchell) মতে নারীদের প্রতি শোষণকে সম্পূর্ণরূপে একটি সমাজের উৎপাদন পদ্ধতির সহিত পুরোপুরি ভাবে জড়িয়ে রাখা যায় না। মার্কসীয় পদ্ধতিকেন্দ্রিক উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের মাধ্যমে ঐতিহাসিক পরিবর্তনসমূহ আনয়নের বিষয়টি আন্তঃ সংস্কৃতিগতভাবে (cross-culturally) নারীদের প্রতি শোষণের ব্যাখ্যা করেনি। অর্থাৎ কৃষিভিত্তিক সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় অথবা ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কেন নারীরা শোষিত হয় যদিও সেই শোষণের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য থাকে, তার কোন ব্যাখ্যা মার্কসীয় পদ্ধতিতে পাওয়া যায় না। মিচেল এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন যে নারীদের প্রতি শোষণের একটি মতাদর্শগত উপাদানরূপে পিতৃতন্ত্র আন্ত-সংস্কৃতিগত (cross-cultural) ভাবে বিদ্যমান। উৎপাদন প্রক্রিয়া (production process) এবং পিতৃতন্ত্র (patriarchy) নামক দুটি উপাদান নারীদের প্রতি শোষণের বিষয়টি পারস্পরিক মিথস্ক্রিয়ার (interact with each other) মাধ্যমে সৃষ্টি করে থাকে। মিচেল বলেছেন যে পুরুষেরা শ্রেণীগত আধিপত্যকেন্দ্রিক কাঠামোর মধ্যে ইতিহাসে প্রবেশ করে, অপরদিকে নারীরা প্রকৃত উৎপাদন প্রক্রিয়ায় তাদের কাজ যাই থাকুক না কেন, জ্ঞাতিকেন্দ্রিক সংগঠন পদ্ধতির (Kinship pattern of organization) দ্বারা সংজ্ঞায়িত থাকে। শ্রেণীগত, ঐতিহাসিক যুগের পরিপ্রেক্ষিত, নির্দিষ্ট সামাজিক পরিস্থিতি নারীত্ব (Femininity) বহিঃপ্রকাশের পরিবর্তন ঘটালেও পিতৃতন্ত্রের আইন সংক্রান্ত সম্পর্কের ক্ষেত্রে উক্ত বিভিন্ন পরিস্থিতি নারীদের অবস্থান একটি তুলনাযোগ্য বিষয়।

ইয়ং (Young) সকলরূপের ডুয়াল সিস্টেমস্ তত্ত্বের (Dual systems theory) সমালোচনা করেছেন। ইয়ং এর মতে হার্টম্যান (Hartmann) এবং তত্ত্বের প্রধান দুর্বলতা হল পিতৃতন্ত্র (patriarchy)

এবং ধনতন্ত্র (capitalism) নামক দুই ক্ষেত্রের স্বতন্ত্রীকরণ। ইয়ং বলেছেন হার্টম্যানের মতে যদি সমসাময়িক ধনতন্ত্রবাদে পিতৃতান্ত্রিক সামাজিক সম্পর্ক পরিবারের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে ধনতান্ত্রিক কর্মস্থলে এবং পরিবারের বাইরে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানগুলিতেও বিদ্যমান থাকে; তাহলে এটা বোঝা কঠিন যে কিরূপ নীতিতে আমরা উক্ত পিতৃতান্ত্রিক সম্পর্কসমূহকে ধনতন্ত্রবাদের সামাজিক সম্পর্কসমূহ থেকে পৃথক করতে পারবো? হার্টম্যান মেনে নিয়েছেন যে সমতুল বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন শ্রমের বিভাজন অনেক সময় পিতৃতন্ত্র এবং ধনতন্ত্র উভয়কেই শক্তিশালী করে এবং একটি পুরোপুরি পিতৃতান্ত্রিক ধনতান্ত্রিক সমাজে পিতৃতন্ত্রের কার্যসাধারনের বন্দোবস্ত (mechanism) বিচ্ছিন্ন করা দুরূহ। তা সত্ত্বেও তিনি জোর দিয়ে বলেছেন যে আমাদের পিতৃতন্ত্রকে স্বতন্ত্র করা অবশ্য প্রয়োজন। যাইহোক মনে হয় এটা স্বীকার করা যুক্তিসঙ্গত যে যদি পিতৃতন্ত্র এবং ধনতন্ত্রে অভিন্ন সামাজিক এবং অর্থনৈতিক কাঠামো স্পষ্টতঃ প্রতীয়মান হয়, তাহলে তারা দুটি পদ্ধতির পরিবর্তে একটি পদ্ধতির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।

ফার্গুসন এবং ফোলবার (Ferguson & Folbre) এর তত্ত্ব সম্পর্কে ইয়ং বলেছেন যে যেহেতু তাঁরা মূলতঃ পরিবারের অভ্যন্তরে নারীদের প্রতি শোষণকে নিয়ে চিন্তিত; সুতরাং তাঁদের তত্ত্ব পরিবারের গণ্ডীর বাইরে নারীদের নির্দিষ্ট ধরণের শোষণকে ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ভোগ্যপণ্যের প্রসারের জন্য নারীদের যৌনতার প্রতীকরূপে (as sexual symbols) ব্যবহার যা একচেটিয়া ধনতন্ত্রবাদের (monopoly capitalism) অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তা থেকে পৃথক কিছু স্বতন্ত্র ক্ষেত্রের ক্রিয়াকলাপ। আরও পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে বলা যায় যে সমসাময়িক কর্মস্থলে (Contemporary workplace) নারীদের প্রতি যে যৌনতাকেন্দ্রিক শোষণ / নিপীড়ন (Sexist oppression) ঘটে থাকে তার সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিগুলি চিহ্নিত ও বিশ্লেষণ করার তাত্ত্বিক উপকরণ (theorietical equipment) ডুয়াল সিস্টেম্‌স্ তত্ত্বের আছে বলে মনে হয়না।

ইয়ং (Young) জুলিয়েট মিচেল (Juliett Mitchell) এর তত্ত্বের এই জন্যে সমালোচনা করেছেন কারণ তা নারীদের প্রতি শোষণের তত্ত্বের নির্মাণকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখিয়েছে যে নারীরা একটি বিশ্বজনীন পিতৃতান্ত্রিক পদ্ধতির (Universal system of patriarchy) বিভিন্ন ধরণের বহিঃ প্রকাশের সম্মুখীন হয় যা একটি সমাজের বস্তুবাদী পরিস্থিতির সহিত আদান প্রদান করে এবং এইরূপে নারীদের প্রতি শোষণের গভীরতা ও জটিলতাকে তুচ্ছ করে দেখানোর দরুন তা নারীদের প্রতি শোষণে অব-ঐতিহাসিক প্রতিরূপ (de-historicizes) ঘটিয়েছে।

ইয়ং নির্দেশ করেছেন যে ডুয়াল সিস্টেম্‌স্ তত্ত্ব কেবলমাত্র পিতৃতন্ত্রের সহিত ধনতন্ত্রের সংযুক্তি ঘটিয়েছে এবং তা base and superstructure অর্থাৎ ভিত্তি ও উপরিকাঠামোয় মার্কসীয় মডেল অর্থাৎ মতাদর্শকে প্রশ্ন করেনি। বিপরীতভাবে বলা যায় যে শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন সংক্রান্ত তাঁর তত্ত্বর মাধ্যমে ইয়ং দেখিয়েছেন যে পিতৃতন্ত্রকে ধনতন্ত্রের সহিত সংযুক্ত করবার প্রয়োজন নেই, বরং ধনতন্ত্র স্বয়ং পুরুষদের মুখ্য ভূমিকায় রেখে নারীদের গৌণ ভূমিকায় সংস্থাপিত করে শ্রমের লিঙ্গ ভিত্তিক বিভাজনের মাধ্যমে লিঙ্গকেন্দ্রিক স্তরবিভাজনের (gender hierarchy) উপর প্রতিষ্ঠিত। ইয়ং বলেছেন লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজন (gender division of labour) বলতে তিনি সমাজব্যবস্থায় সকল সামাজিক কাঠামো কেন্দ্রিক লিঙ্গভিত্তিক শ্রমের পার্থক্যকরণের (all structured gender differentiation of labour

in society) বিষয়টির উল্লেখ করেছেন। শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন প্রত্যেকে সমাজের অর্থনৈতিক উপাদান সহ কাঠামো গঠন করে। ইয়ং এর মতে সমাজে একমাত্র উপাদানরূপে অর্থনীতিকে লিঙ্গ (gender) থেকে বিচ্ছিন্ন করে মার্কস ভুল করেছেন।

ইয়ং এর মতে ধনতন্ত্রবাদের মধ্যে সুনির্দিষ্টভাবে নারীরা উপাদানের উপকরণের উপর সকল প্রকারের নিয়ন্ত্রণ হারানোর দরুন গৃহকোণের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে; যার ফলে গার্হস্থ্য পরিমণ্ডল (domestic sphere) নারীর পরিমণ্ডল (women's sphere) রূপে, মাতৃত্ব (motherhood) নারীর প্রকৃত কাজ বলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং নিরীহ ঘরণী (docile house wife) নারীত্বের বহিঃপ্রকাশ (as expression of femininity) বলে প্রচারিত হয়েছে।

লিণ্ডা নিকলসন (Linda Nicholson) এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন যে নারীদের উপর বিশ্বজননী শোষণ (universal oppression of women) ব্যাখ্যা করানোর জন্য আমাদের এখন একটি তত্ত্ব প্রয়োজন যা অর্থনীতিকে জ্ঞাতিত্বর পরিকাঠামোর (kinship structure) মধ্যে অঙ্গীভূত করবে। নিকলসনের ঘরে প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় বিবাহ এবং যৌনতা (Marriage and sexuality) সংক্রান্ত নিয়মাবলী অর্থনীতি বেং উৎপাদন পদ্ধতির সহিত ঘনিষ্টভাবে জড়িত ছিল। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে একজনের জমির সঙ্গে অন্যজনের জমি সংযুক্ত করার অথবা ঋণশোধ করার জন্য বিবাহগুলির বন্দোবস্ত করা হত। এছাড়া যেহেতু অর্থনীতি তখন বাজার কেন্দ্রিকতার পরিবর্তে গৃহকেন্দ্রিক ছিল। সুতরাং উৎপাদন (production) এবং পুনরুৎপাদন (reproduction) জন্য শ্রমের লিঙ্গভিত্তিক বিভাজন (sexual division of labour) পারিবারিক পরিকাঠামোর (family structure) মধ্যে একত্রিভূত / একত্রিত হয়ে উঠেছিল। ওই ধরণের সংস্কৃতির মধ্যে লিঙ্গই (gender) শ্রেণীর রূপ ধারণ করেছিল। যেরূপ বাজারকেন্দ্রিক পদ্ধতির বিকাশ ঘটেছিল উদাহরণস্বরূপ ইউরোপে, সেখানে গৃহকেন্দ্রিক অর্থনীতি তার অর্থনৈতিক ভিত্তি হারায় ও তার স্থলে বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতির সৃষ্টি হয়। এইরূপে উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং জ্ঞাতিত্বর বন্ধনের স্বাতন্ত্রীকরণ এবং জ্ঞাতিত্বর বন্ধনকেন্দ্রিক কাঠামো (kinship structures) থেকে ছিন্ন করে একটি অপরিবর্তনীয় ভিত্তিরূপে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ইতিহাসে সর্বযুগে অবস্থান নির্দেশ করা ছিল এমন একটি ভ্রান্তি যা উদারনৈতিক অর্থনীতিবিদরা এবং মার্কস – উভয়েই করেছেন। বাজারকেন্দ্রিক পদ্ধতির প্রবর্তনের পূর্বে উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং জ্ঞাতিত্বর বন্ধন সর্বদাই সমাজের পরিকাঠামোগত ভিত্তিরূপে কার্যকরী ছিল। পরবর্তী প্রণালীতে (latter system) বিনিময় পদ্ধতি (exchange) অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার প্রধান মাধ্যম হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে জ্ঞাতিত্বর বন্ধন অর্থনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়। লিণ্ডা নিকলসনের মতে উক্ত স্বাতন্ত্রীকরণের বিষয়টি একটি স্বাভাবিক অথবা অ-ঐতিহাসিক (ahistorical) ঘটনার পরিবর্তে ঐতিহাসিক সত্যর (historical fact) ফলাফল ছিল।

নিকলসনের মতে জ্ঞাতিত্বর বন্ধন (kinship) নামক একটি উপাদান হতে অর্থনীতি নামক আর একটি উপাদানে স্বাতন্ত্রীকরণের বিষয়টির একটি ঐতিহাসিক উৎস ছিল। নারীদের তত্ত্বের কাছে উপরোক্ত দুটি উপাদানের স্বাতন্ত্রীকরণের ওইরূপ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গির অপরিসীম গুরুত্ব ছিল, কারণ তা লিঙ্গকেন্দ্রিক তত্ত্ব সৃষ্টি করেছিল। প্রাক-ধনতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ (gender) কে একটি শ্রেণী হিসাবে ধরা যায়, যদি আমরা শ্রেণীর সংজ্ঞাকে শ্রমের সামাজিক বিভাজনের উপর নির্ভরশীল বলে মনে করি। এর কারণ

জ্ঞাতিত্বের বন্ধন (kinship) সেই যুগে সমাজব্যবস্থার পরিকাঠামোগত এবং গঠনমূলক নীতি ছিল।

নিকলসন বলেছেন লিঙ্গকে (gender) সুনিশ্চিতভাবে সংগঠিত সমাজগুলিতে এবংসম্ভবত বিভিন্ন মাত্রায় পরবর্তীকালের সমাজগুলিতে এমনকি শ্রেণী সংক্রান্ত চিরাচরিত উপলব্ধিবোধ অনুসারে ও একটি উল্লেখযোগ্য শ্রেণীবিভাজন (class division) হিসাবে দেখা উচিৎ। অন্যভাবে বলা যায় যে খাদ্য এবং বস্ত্র প্রস্তুতকরণ সংক্রান্ত কার্যাবলী উল্লেখ করার ক্ষেত্রে এমন কি যদি আমরা চিরাচরিত মার্কসীয় দৃষ্টিভঙ্গি মেনেও নিই, তাহলেও দেখা যায় যে যেহেতু ঐতিহাসিকতার দিক থেকে লিঙ্গকেন্দ্রিক সম্পর্ক উক্ত কার্যাবলীকে নিয়ন্ত্রণ করার বিষয়ে বিভিন্ন পথ নির্দেশিত করে, যাতে শ্রেণী সম্পর্ক গঠিত হয়।

উক্ত প্রতিপাদ্য বিষয়টি আমাদের মার্কসবাদের চিরাচরিত সংশোধনাত্মক বক্তব্যকে অতিক্রম করে অন্য বিন্দুতে পৌঁছে দেয় এই কারণে যে তা উৎপাদন তত্ত্বকেই একমাত্র কেন্দ্রবিন্দু করেছিল। উক্ত সংশোধনাত্মক বক্তব্যের আংশিক সীমাবদ্ধতা ছিল এই যে তা মার্কসবাদীদের সঙ্গে উৎপাদনশীল (productive) এবং পুনরুৎপাদনশীল (reproductive) স্বতন্ত্রকরণতা (separability) বিশ্বাসে অংশীদার ছিল। কিন্তু যদি আমরা উক্ত স্বতন্ত্রকরণতাকে (separability) এমন একটি সামাজিক সংগঠনের সঙ্গে ঐতিহাসিকভাবে সম্পৃক্ত বলে স্বীকৃতি দিই, যার বিনিময় নীতি (the principle of exchange) জ্ঞাতিত্বর বন্ধন (the principle of kinship) নীতিকে পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন ও বন্টনের সংগঠিত করবার একটি মাধ্যমরূপে কিছু পরিমাণ বিকল্পস্বরূপ উপস্থাপিত করে, তাহলে মার্কসবাদের সীমাবদ্ধতা সম্পর্কে আমাদের উপলব্ধির ক্ষমতা (comprehension) গভীরতর হয়।

নিকলসনের মতে লিঙ্গ (gender) একটি গুরুত্বপূর্ণ শ্রেণী নির্দেশক (class indicator) কি না তাকে প্রত্যেকটি উদাহরণ সহযোগে পরীক্ষামূলকভাবে (empirically) অবশ্যই নির্দ্ধারণ করতে হবে এবং আমরা অনেক মার্কসবাদীদের মত ধরে নিতে পারিনা যে লিঙ্গ (gender) এবং শ্রেণী (class) সহজাতভাবে স্বতন্ত্র। এর পরিবর্তে প্রাপ্ত তথ্যানুযায়ী মনে হয় যে বহু প্রাচীন সমাজব্যবস্থায় লিঙ্গ (gender) একটি মৌলিক শ্রেণী নির্দেশক; যে সত্যটি পরবর্তীকালের ইতিহাসে সর্বযুগে প্রতিধ্বনি হয়েছে, যদিও তা অন্যান্য ক্ষেত্রগুলির সঙ্গে একত্রিত হয়ে বা কোন কোন সময় তাদের অধীনস্থ হয়ে প্রতিফলিত হয়।

যদিও জ্ঞাতিত্বর বন্ধনকেন্দ্রিক অর্থনীতির পরিকাঠামো থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বাজারকেন্দ্রিক পদ্ধতির অভ্যন্তরে অর্থনীতি মানবিক কার্যাবলীর (human activity) একটি স্বশাসিত উপাদান (autonomous component) রূপে ক্রিয়াশীল, তথাপি উভয়ের মধ্যে পরিপূর্ণ স্বতন্ত্রীকরণ কৃত্রিম, এর কারণ প্রত্যেক সমাজের মধ্যে তার পূর্বতন সমাজের পদচিহ্ন বিদ্যমান থাকে। নারীবাদের তত্ত্বর কাছে এটা গুরুত্বপূর্ণ যে একটি অত্যধিক আধিপত্য বিস্তারকারী পিতৃতন্ত্র যা বিভিন্ন উৎপাদনপদ্ধতিকেন্দ্রিক সমাজব্যবস্থার মধ্যেও অপরিবর্তনীয় ছিল, তার কথা না বলে পিতৃতন্ত্র একটি সমাজব্যবস্থার কাঠামোকেন্দ্রিক নীতি পালনের দায়িত্ব থেকে যে রূপে বাজারকেন্দ্রিক অর্থনীতি সমাজে আধিপত্য বিস্তারের সহিত কিরূপে পিতৃতন্ত্রের প্রকৃতি একটি উপরিকাঠামোকেন্দ্রিক উপাদানে (a superstructural element) পরিবর্তিত হয় তার ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিশ্লেষণের প্রচেষ্টা নারীবাদের তাত্ত্বিকদের করা উচিৎ।

সুতরাং নিকলসনের মতে, মার্কসবাদ ও নারীবাদের তত্ত্বের মধ্যে 'অসুখী বিবাহ' (unhappy marriage) জনিত সমস্যা সমাধানের জন্য দুটি পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। প্রথমতঃ মার্কস এর এই

দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে হবে যে মানবিক কার্যাবলীর (human activity) প্রত্যেকটি অংশই প্রত্যেক অপরাংশর সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সম্পর্কিত। দ্বিতীয়ত একই সঙ্গে নারীবাদের তত্ত্বর মধ্যে মার্কস এর এই তত্ত্বের প্রতিফলন ঘটাতে হবে যে ইতিহাসে সর্বযুগে সমাজের কাঠামো অথবা ভিত্তি অর্থনীতি অথবা উৎপাদনব্যবস্থার মধ্যে এমনভাবে ক্রিয়াশীল থাকে যেখানে অন্যান্য মানবিক কার্যাবলীর (other human activities) সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকেনা।

১২.১.১.৩ ঃ উত্তর আধুনিকতাবাদ ও নারীবাদ (Post Modernism and Feminism)

উত্তর আধুনিকতাবাদ (Post-Modernism) সাধারণত আধুনিকতাবাদ (Modernism) এর একটি বৌদ্ধিক সংকটের (intellectual crisis) সঙ্গে জড়িত। আধুনিকতাবাদের চাবি দার্শনিক ধারারূপে ষোড়শ শতাব্দীর ইউরোপে জ্ঞানদীপ্তিবাদের (Enlightenment) প্রসারের সঙ্গে উত্থান ঘটে। উক্ত আন্দোলন অনুযায়ী যুক্তি (reason) অথবা যুক্তিবাদ (rationality) মানবিক জ্ঞানের প্রধান সূত্র। একটি ব্যক্তিগত সত্তার মধ্যে অঙ্গীভূত হলেও জিজ্ঞাসু ব্যক্তি যুক্তি প্রয়োগ করে বস্তুকেন্দ্রিক বিশ্বজনীন মুক্ত বিচার বিশ্লেষণে উপনীত হতে পারে যার উপর বৈজ্ঞানিক ও সামাজিক জ্ঞানের সামগ্রিক স্তম্ভ নির্ভরশীল। উত্তর আধুনিকতাবাদের মতে যেহেতু ব্যক্তিগত বিষয়কেন্দ্রিকতা (individual subjectivity) ভিত্তির পরিবর্তে ঐতিহাসিক পরিবর্তনশীল বুদ্ধিগত প্রক্রিয়া যেমন জাতি (race), নৃজাতিগত / জাতিতত্ত্বমূলক (ethnic), লিঙ্গ (gender) প্রভৃতি বিষয়ের ফলাফল ছিল; সুতরাং যা আপাতদৃষ্টিতে বিশ্বজনীন বস্তুগত বিচার বিশ্লেষণ বলে প্রতীয়মান হয়,তা বিশ্লেষণ বলে প্রতীয়মান হয়, তা প্রকৃতপক্ষে সামাজিক-ঐতিহাসিক বিষয়াবলী যথা শ্রেণী (class) জাতি (race) নৃজাতিগত / জাতিতত্ত্বমূলক (ethnic), লিঙ্গ (gender) কেন্দ্রিক বাসস্থানের ভিত্তিতে আংশিক এবং পক্ষপাতদুষ্ট বিচার বিশ্লেষণ। এর ফলাফলস্বরূপ উত্তর আধুনিকতাবাদ বিভিন্ন চিন্তাধারা যথা পার্থক্য, বহুত্ববাদ, অ-সামগ্রিকতা নান্দনিক স্ব-প্রচলিত প্রথা / রীতি (aesthetic self fashioning) অনিশ্চিত সম্ভাবনা (contingency) এবং যে কোন ধরণের চিন্তাধারার বহিঃপ্রকাশ প্রণালী প্রভৃতির উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

যেহেতু প্রতিনিধিত্ব (agency) অথবা নির্ভরশীলতা / নিয়ন্ত্রণাধীনত্ব / শাসনাধীনত্বর ধারণা (notion of agency or subjecthood) উত্তর-আধুনিকতাবাদ কর্তৃক সমালোচিত সুতরাং নারীদের নির্ভরশীল অথবা প্রতিনিধিত্বকারীরূপে নারীবাদের তত্ত্ব অথবা রাজনীতির নারীদের মূল / অপরিহার্য অবস্থানকেন্দ্রিক ধ্যানধারণা যা এমনকি নারীদের মধ্যে সকল পার্থক্য মুছে দিচ্ছে – তা স্বয়ং সংকটে। এর কারণ একটি নিশান (banner) এর পরিবর্তে নারীদের বহুমুখী নিশান বা প্রতীক (multiple banners) – যথা উচ্চশ্রেণীর মহিলা (upper class women), নিম্নজাতির নারী (lower caste women), বিকাশশীল নারী (women in development), উপজাতীয় নারী (tribal women) প্রভৃতি। ডি স্টেফানো (Di Steffano) এর মতে নারীদের মধ্যে ও অভ্যন্তরে বহুমুখী পার্থক্যসমূহের বিদ্যমানতার দরুন একটি নির্দিষ্ট শ্রেণী

(category) কেন্দ্রিক ভ্রমাত্মক ধ্যানধারণা দ্বারা পীড়িত। কিন্তু লেখকগণের মতে (gender) বা লিঙ্গ নারীদের জীবনে দারিদ্র্য, শ্রেণী নৃজাতিত্ব (ethnicity), জাতি (race) যৌনতাকেন্দ্রিক সত্বা (sexual identity) এবং বয়স অপেক্ষা তার মূল বিষয় নয়, এর কারণ নারীরা মনে করেন যে তাঁরা শ্বেতাঙ্গ – অশ্বেতাঙ্গ, বুর্জোয়া - প্রোলেটারিয়েট (সর্বহারা) অথবা অ্যাংলো (Anglo) অথবা অন্যান্য জাতি এবং বিপরীত লিঙ্গর প্রতি স্বাভাবিক যৌন-আকর্ষণপূর্ণ নারীপুরুষদের (heterosexual) মধ্যে বিভাজন অপেক্ষা পুরুষদের থেকে নারীরা নিজেরা কম বিভক্ত। (Hooks, Jordan, Lorde) এক্ষেত্রে বক্তব্য হচ্ছে এই যে লিঙ্গ সংক্রান্ত ধ্যানধারণা একটি মৌলিক তত্ত্বরূপে নারী পুরুষের আরোপিত কিংবদন্তীমূলক পার্থক্যকে সমালোচনামূলক প্রতিদ্বন্দ্বিতা, রূপান্তর সাধন অথবা তার থেকে নিষ্কৃতি লাভের পরিবর্তে যখন কেবলমাত্র তাকে বাস্তবায়িত করবার চেষ্টা করে, অপরদিকে যখন তা উক্ত পার্থক্যসমূহের গুরুত্বপূর্ণ ও আয়ত্বাধীন ক্ষেত্রগুলিকে অবহেলা করে।

যদি নারীদের একটি অভিন্ন শ্রেণী (identical class) রূপে ভাবনার বিষয়টি কেবলমাত্র একটি ভাষাতাত্ত্বিক নির্মাণ (a linguistic construction), একটি সর্বাত্মকভাবে অলীক কাহিনী হয়, তাহলে কিরূপে আমরা নারীদের প্রতিনিধিত্ব নির্মাণ করব, যার থেকে বিশ্বজনীন পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা যায়। অ্যালকফ (Alcoff) বলেছেন যদি নারীরই স্বতন্ত্র অস্তিত্ব না থাকে, তাহলে কিরূপে আমরা নারীদের নাম দাবী করব এবং তাদের নামে দাবী করার অর্থ হল কেবলমাত্র এই কিংবদন্তীকে পুনরায় শক্তিশালী করা যে নারীদের পৃথক অস্তিত্ব বিদ্যমান। এছাড়া যদি একটি স্বতন্ত্র শ্রেণীরূপে নারীদের অস্তিত্বের বিষয়টি একটি অলীক ধারণা হয় তাহলে কিরূপে আমরা বলব যে লিঙ্গবাদ (sexism) নারীদের স্বার্থের প্রতিবন্ধক? এখন আমরা দেখব যে কিরূপে বহু নারীবাদী উক্ত সমস্যাটিকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন।

নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী বা র‍্যাডিকাল (Radical) নারীবাদীরা gender বা লিঙ্গকে একটি মৌলিক শ্রেণী (fundamental category) রূপে গ্রহণ করেছেন যার থেকে তাঁরা পিতৃতান্ত্রিক শোষণের বহিঃপ্রকাশরূপে মানবিক সংস্কৃতির একটি চমৎকার বর্ণনা (a grand narrative) নির্মাণ করেছেন। উক্ত দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে মানবিক মুক্তিকে পিতৃতান্ত্রিক শোষণের অবসানের সহিত সমার্থক ধরা হয়েছে যে বিষয়টি আমরা শুলাস্মিথ ফায়ারস্টোন (Shulasmith Firestone) এর মধ্যেও দেখেছি। ওয়াঘ (Waugh) এর মতে উক্ত বিষয়ে নারীর প্রকৃতি অথবা নারীত্বর অভিজ্ঞতা (Feminine experience) সম্পর্কে সকল অপরিহার্য সত্যের দাবির মধ্যে লুক্কায়িত থাকে ও যা নারীদের নিজ গোষ্ঠী / জাতি / সমাজ সম্পর্কে শোষণমূলক শ্রেষ্ঠত্বর ও অন্যান্য অনুরূপ গোষ্ঠী / জাতি / সমাজ অর্থাৎ পুরুষদের প্রতি অনুরূপ আনন্দ, ভুল বোঝাবুঝিজনিত বিভিন্ন অবস্থান কেন্দ্রিকতার প্রতি নারীবাদের তাত্ত্বিকদের অন্ধ করে। পুনরায় ওয়াঘ (Waugh) এর মতে নারীদের প্রতি শোষণের রাজনৈতিক ব্যাখ্যার পদ্ধতি হিসাবে আন্তঃ-ঐতিহাসিক কাঠামোসমূহকে (trans-cultural structures) যে কোনভাবে অবলম্বন করার অর্থই হল কেবলমাত্র বিপরীত প্রক্রিয়ায় উক্ত শোষণমূলক পদ্ধতিসমূহের পুনরাভিনয় অনুষ্ঠিত করা।

নারীবাদী রাজনীতি অনুসরণ করার ক্ষেত্রে আমাদের নারীর একমুখী বাস্তব বা কণ্ঠস্বর (one universal objective voice of women) সংক্রান্ত ধ্যানধারণা বিসর্জন দিয়ে নারীদের বহুমুখী কণ্ঠস্বর / ধ্বনি

(multiple women's voices) গ্রহণ করা উচিৎ। উত্তর-আধুনিক নারীবাদীদের নিকট নারী একটি অ-প্রাসঙ্গিক / প্রসঙ্গ বহির্ভূত বিশ্বজনীন মৌলিক শ্রেণী নয়, বরং একটি নির্দিষ্ট প্রাসঙ্গিক শ্রেণী, অর্থাৎ জাতি এবং শ্রেণী নির্দিষ্ট। ('women' for post-modern feminists is not a decontextualized universal essential category but contextual category i.e. will be race and class specific) বহুমুখীনতার স্থান সুনির্দিষ্ট করতে গিয়েও আমরা যুক্তিবাদের আলোকপ্রাপ্ত মতাদর্শের (Enlightenment models of rationality) প্রতিশ্রুতি প্রদান করতে পারি যাকে আমাদের অন্বেষণসমূহ একটি বিশ্বাসমূহ এবং কল্পিত আদর্শ রাজ্য বা ইউটোপিয়া (Utopia) অর্থাৎ প্রগতির পথে আমাদের নিয়ন্ত্রণকারী নীতি ও চালিকাশক্তিকে নারীবাদী রাজনৈতিক পদ্ধতির একটি অনুপ্রেরণারূপে ব্যবহার করা যেতে পারে। উক্ত পথ অনুসরণ করতে গিয়ে আমাদের অব্যবহিত প্রসঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বেনহাবিব (Benhabib) যেরূপ দেখিয়েছেন সেরূপ একজন যুক্তিবাদী দার্শনিকের ন্যায় আন্তঃসংস্কৃতিগতভাবে (cross-culturally) তুলনামূলক বিশ্লেষণ করতে হবে এবং আমাদের মতাদর্শের মধ্যে তার প্রতিফলন ঘটাতে হবে।

অ্যালকফ (Alcoff) এর মতে গাইনোসেন্ট্রিস্ট (Gynocentrist) অর্থাৎ নারীরচিত বস্তুকেন্দ্রিক নারীবাদের তত্ত্ব ও রাজনীতি মূলত নারীদের পুরুষদের থেকে পৃথক / ভিন্ন (other of man) বলে মনে করে। নারীকে পুরুষ থেকে ভিন্ন / পৃথক বলে বিবেচনা করবার মুখ্য উদাহরণ মেরী ডালি (Mary Daly) অ্যাড্রিয়েন রিচ (Adrienne Rich) এর সংস্কৃতি নারীবাদের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। ডালি নারীর কর্মশক্তি (feminine energy) ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করেছেন যা পুরুষতান্ত্রিক শক্তি (Male Power) নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছে। অ্যালকফ রে মতে যেহেতু ডালি এবং রিচ উভয়েই মূলত নারীদের পুরুষদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর (superior) বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, সেহেতু তাঁরা লোগোসেন্ট্রিজম (logocentrism) বা প্রতীককেন্দ্রিকতার ফাঁদে পড়ে যাচ্ছেন। নারীদের মূল প্রকৃতিকে শান্তিপূর্ণ প্রতিপালনকারী (mutinant) এবং মানবিক (humane) বলে সৃষ্টি করতে গিয়ে – গাইনোসেন্ট্রিক ফেমিনিজম (gynocentric feminism) অর্থাৎ নারী রচিত / গঠিত বস্তুকেন্দ্রিক নারীবাদীরা নারীদের অন্যান্য ভিন্ন বা পৃথক গোষ্ঠীর নারীদের বাদ দিয়েছেন। অ্যালকফ জোর দিয়ে বলেছেন যে অপরদিকে উত্তর কাঠামোতন্ত্র / গণতন্ত্রবাদ (Post-structuralism) পুরুষদের দ্বৈত বিরোধিতার্থে নারীদের উক্ত মূলগত দিক থেকে স্বতন্ত্রতার বিষয়টিকে এবং ক্রিস্টোভা (Kristova) -এর ন্যায় দেখিয়েছে যে নারী যা নয়, সে প্রকৃতপক্ষে তাই। পুনরায় এই বিষয়টি যে কোন ধরণের রাজনৈতিক আন্দোলন চালনার ক্ষেত্রে নারীদের সর্বপ্রকার প্রতিনিধিত্ব করাকে অন্যায় ভাবে ও বলপূর্বক বঞ্চিত করেছে।

ডি লরেটিস্ (De Lauretis) এর মতে নারীদের নির্দিষ্ট প্রতিনিধিত্বর বিষয়টি ইতিহাস বহির্ভূত কিছু বিশ্বজনীন নিরপেক্ষ স্থানের পরিবর্তে সামাজিক পদ্ধতির মধ্যে আবিষ্কার করতে হবে। ডি. লরেটিস্ (De Lauretis) বলেছেন যে এটাই হচ্ছে সেই স্থান যেখানে একটি নারীবাদী তত্ত্বের নির্দিষ্টতাকে অন্বেষণ করতে হবে। উক্ত নির্দিষ্ট নারীত্ব / নারীসুলভ কমনীয়তা যাকে নারীর প্রকৃতির সহিত বিশেষ সুবিধাভোগী নৈকট্যের মধ্যেও যেমন অন্বেষণ করলে চলবে না তেমনই তাকে নারীর শরীর অথবা অবচেতন মন বা অপরিহার্য বৈশিষ্ট যা নারীর মধ্যে অন্তর্নিহিত বলে ধরে নেওয়া হয়। কিন্তু যার প্রতি বর্তমানে পুরুষরাও দাবি পেশ করে

থাকে, তার মধ্যেও অন্বেষণ করলে চলবে না অথবা তাকে নারীকেন্দ্রিক ঐতিহ্য (female tradition) যাকে সাধারণভাবে, ব্যক্তিগত, প্রান্তিক এবং তথাপি ইতিহাস বহির্ভূতরূপে বিদ্যমান বলে ধরা হয়। কিন্তু যাকে অসম্পূর্ণরূপে সেখানেই অর্থাৎ ইতিহাসের মধ্যে আবিষ্কার অথবা পুনরুদ্ধার করতে হবে – তার মধ্যেও অন্বেষণ করলে চলবে না। পুনরায় চূড়ান্তভাবে তাকে পৌরুষত্বের (Masculinity) ছোটখাট ফাটলের মধ্যে (with chinks and cracks of Masculinity) অথবা পুরুষ সত্তার (male identity) সাধারণত দীর্ঘ এবং সংকীর্ণ মুক্তস্থানের (fissure) মধ্যে অন্বেষণ না করে এবং তাকে রাজনৈতিক তাত্ত্বিক – আত্ম-বিশ্লেষণী পদ্ধতি যার দ্বারা সামগ্রিক বাস্তবতার উক্ত বিষয়ের সম্পর্কসমূহকে নারীদের ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার পুনর্নির্মাণ করা যেতে পারে – তার মধ্যে অন্বেষণ করতে হবে। এ সম্পর্কে অনেক কিছু এখনও করা বাকি।

উত্তর-গঠনতাত্ত্বিকতত্ত্ব (Post-structuralist theory) অর্থাৎ নারীদের প্রতি শোষণের অধিকাংশ বিষয়ই ভাষার অভ্যন্তরে (in language) নারীর ভূমিকা নির্মাণের মধ্যে নিহিত, তার সঙ্গে একমত হয়ে অ্যালকফ্ (Alcoff) ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে ভাষাই লিঙ্গবাচক অর্থের (meaning) অবস্থান নির্দেশ করার একমাত্র স্থান নয়। কোন একজনের লিঙ্গের (gender) অর্থ অথবা সত্তা (identity) সামাজিক পদ্ধতির মধ্যে অন্বেষণ করা যেতে পারে। পুনরায় অ্যালকফের মতে নারীরা তাদের সত্তার বিচ্ছিন্ন এলাকাসমূহকে (pockets of identity) আবিষ্কার করতে পারে যেখানে তাদের ভূমিকা এখনও নির্দ্ধারণ করা হয়নি এবং তারপর ওই সব স্থানসমূহ এবং আলোচনাসমূহকে (discourses) চ্যালেঞ্জ জানাতে পারে। ওইরূপ ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ স্থানসমূহে নারীরা প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

কিছু আভ্যন্তরীণ নির্দ্ধারিত বৈশিষ্ট্যসমূহের মাধ্যমে নারীদের একটি নির্দ্ধারিত সত্তা বলে ধারণা করার পরিবর্তে আমরা বলতে পারি যে নারীদের সত্তা, জাতি, শ্রেণী ও জাতীয়তা (race, class and nationality) কেন্দ্রিকতার বাহ্যিক বহির্বিষয়ক অবস্থানের মাধ্যমে সতত পরিবর্তনশীল। উক্ত পরিবর্তনশীল সত্তাসমূহের মধ্যে প্রত্যেক গোষ্ঠীর নারীরা একটি নারীবাদী বা নারী বলতে কি বোঝায় তার অবস্থান নির্ণয় করতে পারে। সুতরাং একটি নারী অথবা নারীত্ব সম্পর্কে পূর্ব-প্রদত্ত অর্থ অথবা সত্তা প্রদানের পরিবর্তে নারীদের তার বিশেষ জাতিগত (racial), নৃজাতিগত (ethnic), জাতীয় (national) অথবা শ্রেণী (class) কেন্দ্রিক অবস্থানের ভিত্তিতে উক্ত অর্থকে আবিষ্কার করা প্রয়োজন। অ্যালকফ (Alcoff) বলেছেন যে উক্ত সম্পর্কসমূহের বন্ধনী শৃংখলের অভ্যন্তরে (within this network of relations) যদি নারীদের তার স্থানকে চিহ্নিত করা সম্ভবপর হয়, তাহলে নারীদের অন্তস্থঃ ক্ষমতাসমূহের অগ্রগতির গতিরূদ্ধ করা হয়েছে এই দাবির পরিবর্তে তাদের জন্য এই নারীবাদী অভিমত প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব পর হবে যে উক্ত বন্ধনীশৃংখল (network) এর সম্পর্কসমূহের অভ্যন্তরে তাদের অবস্থানে ক্ষমতা ও চলমানতার (power and mobility) অভাব রয়েছে যার আসল সংস্কারমূলক পদ্ধতিকেন্দ্রিক সামাজিক পরিবর্তন প্রয়োজন।

ন্যান্সি ফ্রেজার (Nancy Frazer) -এর মতে নারীবাদের তত্ত্বের একটি আলোচনামূলক তত্ত্বের (theory of discourse) প্রয়োজন। এর পূর্বে আমরা দেখেছি যে মার্কস -এর মতে প্রত্যেকটি উৎপাদন পদ্ধতির সঙ্গে একটি উৎপাদনের সম্পর্ক অথবা মতাদর্শ পদ্ধতি (system of ideology) উৎপাদিত হয়

যার মাধ্যমে শাসকশ্রেণী জনগণকে শোষণ করে। এই রূপে শ্রমিক পুঁজির উৎপাদন ও পুনরুৎপাদন করতে থাকে যাতে সে নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে এই কাজ করে। এর কারণ সে উৎপাদনের উপকরণের (means of production) মালিক শাসকশ্রেণী কর্তৃক সঞ্চারিত ছদ্মচেতনার (false consciousness) অধীনে থাকে।

অ্যালথুজার (Althussar) এই তত্ত্ব উপস্থাপিত করেছেন যে, কোন উৎপাদন পদ্ধতির (production system) থেকে স্বাধীনভাবে মতাদর্শসমূহ (ideologies) বিদ্যমান থাকতে পারে। তাঁর মতে রাষ্ট্রের মাধ্যমে, বিদ্যালয় পদ্ধতির তথা শিক্ষাব্যবস্থার ও পরিবারের মাধ্যমে মতাদর্শসমূহ সঞ্চারিত হয় এবং এইরূপে তা শ্রমশক্তির (labour power) পুনরুৎপাদন করে। একটি সমাজব্যবস্থায় উৎপাদন পদ্ধতির পরিবর্তনের সঙ্গে শোষণের অপসারণ ঘটে না; এর পরিবর্তে আলোচনাকেন্দ্রিক পরিবর্তন (change in the discourse) অথবা মতাদর্শজনিত পরিবর্তনই কেবলমাত্র সামাজিক পরিবর্তনসমূহ আনয়ন করতে পারে। নারীবাদী তাত্ত্বিকরা ধরে নেন যে নারীদের প্রতি শোষণ পিতৃতান্ত্রিক আলোচনা (patriarchal discourse) মধ্যে নিহিত যা সমাজের, রাষ্ট্রের, শিক্ষার ও পরিবারের মাধ্যমে সঞ্চারিত হয়। সুতরাং প্রচলিত ব্যবস্থাকে অতিক্রম করার জন্য নারাবাদী তত্ত্বের একটি বিপরীতমুখী / প্রতিরোধমুখী আলোচনা (counter-discourse) উৎপাদন করা উচিত।

ন্যান্সি ফ্রেজার (Nancy Frazer) -এর মতে ওইরূপ বিপরীতধর্মী প্রতিরোধমূলক আলোচনার তত্ত্ব গড়ে তোলার জন্য আমাদের একটি গঠনতন্ত্রমূলক / কাঠামোতন্ত্রমূলক (structuralist) অথবা একটি বাস্তববাদী (pragmatist) অবস্থান গ্রহণ করতে পারি। একটি গঠনতন্ত্রমূলক (structuralist) অবস্থানের মধ্যে ব্যক্তিগত কথিত অথবা লিখিত শব্দাবলীর কোনই অর্থ থাকে না। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে ইংরাজী শব্দ 'cut' জার্মান শব্দ, স্প্যানিশ শব্দ Katz' বাস্তব দিক থেকে পৃথক হলেও তাদের একই অর্থ। আমরা অপরিবর্তনীয় অ-বস্তুগত সমকালীন কাঠামো অথবা ভাষার (in the unchanging non-physical synchronic structure or language) মধ্যে তার অর্থ (meaning) অন্বেষণ করতে পারি। কাঠামো গঠন (structure) একটি প্রতীকধর্মী ব্যবস্থা (symbolic order) যেখানে প্রত্যেকটি প্রতীক এর অবস্থানের দ্বারা এবং একে অপরের সঙ্গে পার্থক্য দ্বারা কেবলমাত্র অর্থ (meaning) অনুভূত হয়।

জ্যাকুই ল্যাকান (Jacque Lacan) সস্যুর (Sasuarre) -এর গঠনতান্ত্রিক / কাঠামোতন্ত্রবাদ (structuralism) -এর উপর নির্ভর করে একটি মনোবিশ্লেষণীতত্ত্ব (psychoanalytic theory) ব্যাখ্যা করেছেন। ল্যাকান (Lacan) -এর মতে প্রতীকধর্মী ব্যবস্থা / শৃঙ্খলা (the symbolic order) অথবা ভাষা ব্যবস্থা / শৃঙ্খলা (the order of the language) স্বয়ং লিঙ্গকেন্দ্রিক (Phallocentric) অর্থাৎ পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবাধীন যেখানে মানুষ ভাষার দীক্ষা পায় যখন শিশু প্রাক্-অয়েডিপাল (pre-oedipal) পর্যায়ে থেকে অয়েডিপাল পর্যায়ে (Oedipal stage) উপনীত হয় ও যেখানে পিতার অনুশাসন (the law of the Father) কাজ করতে শুরু করে। সুতরাং ল্যাকান এর মতে ভাষা (language) স্বয়ং পিতৃতান্ত্রিক (patriarchal)।

ল্যাকান (Lacan) কে অনুসরণ করে বহু নারীবাদী তাত্ত্বিক দৃঢ়তার সঙ্গে বলেছেন যে পিতৃতন্ত্রকে

ধ্বংস বা পরাভূত করবার জন্য নারীবাদের তত্ত্ব অথবা রাজনীতির প্রয়োজন, সব পিতৃতান্ত্রিক আলোচনা এবং ভাষাকে (all discourse and language) সমালোচনা করা। ফ্রেজার (Frazer) -এর মতে গঠনতন্ত্রবাদ / কাঠামোতন্ত্রবাদ (structuralism) -এর উপর নির্ভরশীল একটি সমালোচনার তত্ত্ব (a theory of discourse) অত্যন্ত বিমূর্ত কারণ তা একটি বিমূর্ত কাঠামোর (an abstract structure) মধ্যে অর্থ (meaning) অন্বেষনের চেষ্টা করে। সুতরাং বাস্তববাদের (pragmatics) সহিত সাযুজ্যপূর্ণ একটি আলোচনার তত্ত্ব গুরুত্বপূর্ণ যা নারীদের জীবনযাত্রার প্রকৃত রীতিনীতি, প্রথা পদ্ধতির যথাযথ বর্ণনা প্রসঙ্গে অর্থ অন্বেষণের চেষ্টা করে, যে বিষয়টি নারীবাদী আলোচনার জন্য প্রয়োজনীয় ফ্রেজার (Frazer) বলেছেন যে বাস্তববাদী মতাদর্শসমূহ (pragmatic models) সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা এবং যোগাযোগের সামাজিক পদ্ধতির উপর জোর দেয়, কিন্তু তারা বহুসংখ্যক ঐতিহাসিক দিক থেকে পরিবর্তনশীল অ-প্রাসঙ্গিক স্থানসমূহ ও রীতিনীতিসমূহের পর্যালোচনা করে। এর ফলাফলস্বরূপ উক্ত মতাদর্শকেন্দ্রিক পদ্ধতিসমূহে সামাজিক সত্তাগুলিকে জটিল, পরিবর্তনশীল এবং অ-প্রাসঙ্গিকভাবে নির্মিতরূপে ধারণা করবার সম্ভাবনা উপস্থাপিত করে। সুতরাং বাস্তববাদী মতাদর্শের উপর নির্ভরশীল আলোচনা তত্ত্ব একদিকে যেমন মূলত নারী বলতে কি বোঝায়, সেই প্রশ্ন ব্যতীত নারী কি প্রতীকের প্রতিনিধিত্ব করে তার সংজ্ঞা দেবার চেষ্টা করবে অথবা অন্যদিকে নারী নামক সামগ্রিক শ্রেণীর স্বতন্ত্র অস্তিত্বর অস্বীকৃত প্রদান বা বিলুপ্তি সাধন করে নারীবাদী রাজনীতিকেই অসম্ভব করে তুলবে।

১২.১.১.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

Liberal Feminism

1. Whethan, I, Modern Feminist Thought, New York, New York University Press, 1995.
2. Donavan, J. Feminist Theory : The Intellectual Traditions of American Feminism, New York.
3. Jaggar, A & Rothenberg, P (Ed.), Feminist Frameworks : Alternative Accounts of the Relations Between Women & Men, New York : McGraw Hill, 1993.
4. Nicholson, L. (Ed.) The Second wage : A Reader in Feminist Theory, New York, Routledge, 1997.
5. Jackson S & Jones, J (Ed.) Contemporary Feminist Theory, New York Univerisity Press, New York, 1998
6. Mazumder, Rinita, A short Introduction to Feminist Theory, Anustup, Calcutta, 2001.

Marxist Feminism : Marx & the Dual Systems Theory :

1. Nicholson, L (Ed.) The Second Wave : A Reader in Feminist Theory, New York, Routledge, 1997.
2. Jackson, S. & Jones, J (Ed.) Contemporary Feminist Theory, New York :

New York University Press, 1998.

3. Young, I. M. 'Beyond the Unhappy Marriage : A critique of the Dual systems theory, in Sargent, L, Women & Revolution, Boston, South End Press, 1981.
4. Hartmann, H, 'The Unhappy Marriage of Marxism & Feminism' in Nicholson, L, (Ed.) The Second Wage : A Reader in Feminist Theory, 1997.
5. Ferguson, A & Folbre, 'The Unhappy Marriage of 'Patriarchy & Capitalism in Surgent, L. (Ed.) Women & Revolution, Boston, South End Press, 1981.
6. Mitchell, Juliett, 'Women : The Longest Revolution', in New Left Review, 1966.
7. Nicholson, L. 'Marxism & Feminism : Integrating Economy & Kinship, in Nicholson, L. (Ed.) The Second Wave : A reader in Feminist Theory, 1997.
8. O Brien, M, 'Reproducing Marxist Man' in The sexism of social & Political Theory, eds. Lorenne M. G. Clark & Lynda Lange, Toront : UTT Press.

Feminism and Post Modernism :

1. Waugh, P. 'Post-Modernism and Feminism', in Jackson, S. and Jones, J (ed.) contemporary Feminist Theories, New York, New York University Press, 1998.
2. Di Stefano, C. 'Dilemmas of Difference : Feminism, Modernity and Post-Modernism' in Nicholson L. (Ed.) Feminism / Post-Modernism, New York, Routledge, 1990.
3. Alcoff, L. 'The Feminist Standpoint' in The Second Wave : A Reader in Feminist Theory, (Ed.) Nicholson, New York, Routledge.
4. Traser, N. "Structuralism or Pragmatics? : On Discourse Theory and Feminist politics" in 'The Second Wave : A Reader in Feminist Theory' (Ed.) Nicholson, L. New York, Routledge.

১২.১.১.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

Liberal Feminism

1. Analyse the features of Liberal Feminism. Explain its importance in the Feminist movement.
   উদারতান্ত্রিক নারীবাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ বিশ্লেষণ কর। নারীবাদী আন্দোলনে এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
2. What do you understand by the theory of Liberal Ferminism. How has this theory been criticised by the Socialist & Radical Feminists?
   উদারতান্ত্রিক নারীবাদের তত্ত্ব বলতে কি বোঝ? সমাজতান্ত্রিক (Socialist) এবং নিয়মতান্ত্রিক পদ্ধতিকেন্দ্রিক আমূল সংস্কারপন্থী বা র‍্যাডিকাল (Radical) নারীবাদীগণ কর্তৃক কিরূপে

উদারতান্ত্রিক নারীবাদের তত্ত্ব সমালোচিত হয়েছিল?

3. Do you agree with the view that Liberal Feminism sprang within the context of economic & political liberalism in England?
তুমি কি এইমত মেনে নেবে যে ইংল্যাণ্ডের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক উদারতন্ত্রবাদের প্রেক্ষাপটে উদারতান্ত্রিক নারীবাদের উদ্ভব হয়েছিল?

Marxist Feminism : Marx & the Dual Systems Theory :

1. Do you agree with the view that the feminist theorists propagating the Dual systems theory, draw the Marxian model although deviate from the latter.
2. Explain the Dual systems theory of the Marxist Feminism as propounded by Hartmann, Fergusson, Folbre and Juliet Mitchell.
3. What do you understand by the term Marxist Feminism? Is there any difference between the classicial Marxism and Marxist Feminism?

১। তুমি কি এই দৃষ্টিভঙ্গির সহিত একমত যে ডুয়াল সিস্টেম্‌স্ তত্ত্ব প্রচারকারী নারীবাদী তাত্ত্বিকরা মার্কসীয় মডেল অনুসরণ করলেও তার থেকে বিচ্যুত হয়েছে?
২। হার্টম্যান, ফার্গুসন, ফোলবার এবং জুলিয়েট মিচেল কর্তৃক উত্থাপিত মার্কসীয় নারীবাদের ডুয়াল সিস্টেম্‌স্তত্ত্ব ব্যাখ্যা কর।
৩। মার্কসীয় নারীবাদ বলতে তুমি কি বোঝ? ধ্রুপদী মার্কসবাদ ও মার্কসীয় নারীবাদের মধ্যে কি কোন পার্থক্য আছে?

Feminism and Post Modernism :

1. Explain the linkage between Post-Modernism and Feminism. Explain the resultant crisis in Feminism in this contest.
উত্তর আধুনিকতাবাদ এবং নারীবাদের মধ্যে সম্পর্কসমূহ ব্যাখ্যা কর। উক্ত প্রসঙ্গে নারীবাদের সংকটজনিত ফলাফল ব্যাখ্যা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ১

SURVEY OF APPROACHES AND SOURCES

একক - ২

Sources

(i) Archival — Government files, Official reports, Census, Private papers, etc.

(ii) Non-archival — sacred and non-sacred texts, epigraphs, diaries, memoirs, autobiographies, fiction, songs, folklore, photographs, paintings, oral history

---

বিন্যাসক্রম ঃ

১২.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

১২.১.২.১ ঃ মহাফেজখানার সাক্ষ্য

১২.১.২.২ ঃ মহাফেজখানা/অভিলেখ্যাগার বহির্ভূত—পবিত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থসমূহ

১২.১.২.৩ ঃ শাসন (প্রস্তর বা তাম্র) / লেখগুলির সাক্ষ্য

১২.১.২.৪ ঃ চিত্রকলা -- Non-archival

১২.১.২.৫ ঃ তথ্যসূত্র হিসাবে Photograph (ফটোগ্রাফ)

১২.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১২.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.১.২.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) মহাফেজখানার সাক্ষ্য

(২) ইতিহাস রচনার উপাদান -- মহাফেজখানা/অভিলেখ্যাগার বহির্ভূত -- পবিত্র ও ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থসমূহ -- প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিকযুগ

(৩) শাসন (প্রস্তর বা তাম্র) লেখগুলির সাক্ষ্য

(৪) লেখ্যাগার বহির্ভূত উপাদান -- চিত্রকলা ও Photograph -- তথ্যসূত্র হিসেবে এর গুরুত্ব।

১২.১.২.১ ঃ মহাফেজখানার সাক্ষ্য

মেয়েরা সাধারণভাবে ইতিহাসের তথ্য থেকে মুছে গেলেও, কোথাও কোথাও অশর্চর্যজনকভাবে তাদের সম্পর্কে তথ্য খুঁজে পাওয়া যায়। মহাফেজ খানায় আধুনিককালে নতুন ধরনের গবেষণায়/ মানবীচর্চার তাগিদে তথ্য বেরিয়ে আসছে। এখানে আমরা একটি বিশেষ বিষয়ের উপর নজর দেব :

ঊনবিংশ শতকের ষাট ও সত্তর দশকে ব্রিটিশ সরকার সৈন্যবাহিনীর বিশেষতঃ শ্বেতাঙ্গ সৈন্যদের স্বাস্থের ব্যাপারে চিন্তিত ছিল। সৈন্যদের মধ্যে অধিকাংশ ছিলেন অবিবাহিত ফলে শারিরিক চাহিদা মেটাতে অধিকাংশই 'লালবাজারে' যেতেন। সৈন্যদের যাতে যৌন রোগ না হয় তার জন্য সরকার থেকে গনিকাদের উপর নজরদারী রাখতে এই ধরনের 'লালবাজার' সব বড় বড় সেনাছাউনীতেই খুলতে হয়েছিল। শেষে এল 1868 'চৌদ্দ আইন' যার পোষাকী নাম হল 'Contagious Diseases Act' বা Act XIV। এতে পতিতাবৃত্তির উপর নানারকম বিধিনিষেধ আরোপিত হয় এবং ডাক্তারী পরীক্ষার নামে গরীব যৌনকর্মীদের উপর নানারকম নির্যাতন করা হয়। এখানেই শেষ নয়, 70র দশকে পতিতাবৃত্তি নিবারণের প্রথম ধাপ হিসাবে পতিতাদের হেফাজতে থাকা কম বয়সী মেয়েদের নাম/বয়স নথীভুক্তির কথাও ভাবা হয়েছিল। এর প্রস্তুতি হিসাবে পতিতারা কোথা থেকে আসে (তাদের সামাজিক অবস্থান) এবং অন্যান্য তথ্য সংকলনের জন্য একটি প্রশ্নমালা তৈরী করে জেলাশাসকদের কাছে পাঠান হয়েছিল।

প্রশ্নগুলি নিম্নরূপ :

(ক) জেলায় বৃত্তিটি (দেহব্যবসা) যথেষ্ট ব্যাপক কি না ?

(খ) বৃত্তিটি রদ করতে গেলে বড়সড় বাধার সম্মুখীন হতে হবে কি না ?

(গ) পতিতাদের হেফাজতে থাকা মেয়েদের জাত/ধর্ম কি ?

(ঘ) তারা কিভাবে পতিতাদের হেফাজতে আসে ?

(ঙ) এই মেয়েগুলির জীবনে শেষপর্যন্ত কি ঘটে ?

(চ) পতিতারা মূলতঃ কোন জাতির ? বংশানুক্রমিক কোন পতিতা শ্রেণী আছে কিনা ? তাদের উদ্ভব কিভাবে হয়েছে ?

(ছ) এর সঙ্গে অপহরণের ঘটনা জড়িত কি না ?

এর উত্তরে জেলাশাসকরা যে প্রতিবেদন পাঠিয়েছিলেন তার থেকে (ক) কুলীন প্রথা ও তার কুফল (খ) হিন্দু বিধবাদের করুণ অবস্থা (গ) দারিদ্র (ঘ) কিছু কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায় এর ভূমিকা সম্পর্কে একটি অনবদ্য ছবি পাওয়া যায়।

এই ছবিটি আরো বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে যখন আমরা সমসাময়িক সাহিত্য বিশেষতঃ উপন্যাস গুলির সাক্ষ্যের সাথে তাকে মেলাই।

এইভাবে মহাফেজখানার সাক্ষ্য আমাদেরকে নতুন তথ্য দেয় বা দিতে পারে।

❑ Census Report

আজকের মানবী চর্চায় একটি জ্বলন্ত সমস্যা হল 'নিরুদ্দিষ্ট নারী'। সর্বশেষ জনগণনায় দেখা যাচ্ছে যে একমাত্র কেরালা বাদ দিলে ভারতের আর প্রায় সব প্রদেশে প্রতি হাজার পুরুষ পিছু নারীর সংখ্যা কম (যদিও স্বাভাবিক পরিস্থিতিতে এটা উল্টো হয় — প্রতি হাজারে মেয়েদের সংখ্যাই একটু বেশী হবার কথা) অবস্থা সবচেয়ে খারাপ পাঞ্জাব, হরিয়ানার মত প্রদেশগুলিতে যেখানে প্রতি হাজারে মেয়েদের সংখ্যা 700 র কিছু বেশি। এই লাখ লাখ মেয়ে তাহলে গেল কোথায় ? ঘটনাটা ঘটেছে কন্যাভ্রুণ হত্যার মাধ্যমে এবং এর ফলে ভারতে অদূর ভবিষ্যতে এক সাংঘাতিক সামাজিক সমস্যা দেখা দেবে। এছাড়াও Census আরো কিছু বিস্ময়কর তথ্য দেয় বিশেষতঃ মেয়েদের কাজ সংক্রান্ত (দ্রষ্টব্য নারীশ্রম সংক্রান্ত unit টি)।

ইতিহাস রচনার উপাদান

১২.১.২.২ ঃ মহাফেজখানা / অভিলেখ্যাগার বহির্ভূত — পবিত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষ গ্রন্থসমূহ

নারীর ইতিহাস লেখার ক্ষেত্রে সাহিত্যিক উপাদান একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সবক্ষেত্রে সরাসরি ঐতিহাসিক ঘটনা না হলেও বিগত দিনের সামাজিক জীবন পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে এর গুরুত্ব সর্বজনস্বীকৃত। নারীদের ইতিহাসে অবহেলিত হবার একটা কারণ ছিল গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ঘটনা, পটপরিবর্তন বা বিপ্লবের ক্ষেত্রে নারীদের অকিঞ্চিৎকর উপস্থিতি (আধুনিক সময়ের আগে) তাদেরকে,

তাদের কণ্ঠস্বরকে ইতিহাসে অপাঙ্‌ক্তেয় করে রেখেছিল। সামাজিক ক্ষেত্রে অন্ততঃ তত্ত্বগতভাবে সেটা হবার কথা নয়। আর তাই সাহিত্যিক উপাদানের সাহায্যে সামাজিক ইতিহাস রচনা করলে নারীদের অস্তিত্বহীনতা অন্ততঃ কিছুটা হলেও কমত। কিন্তু সাহিত্যেও নারীদের এই অনুপস্থিতি ঘোচেনি। পিতৃসূত্রী (Patriarchy) মতাদর্শ যেমন সমাজে নারীদের কণ্ঠরুদ্ধ করেছে, একই প্রক্রিয়া চলেছে সাহিত্যের আঙ্গিনাতেও। তবে সাহিত্যের সাক্ষ্য আমাদেরকে বুঝতে সাহায্য করে কিভাবে এই নারীদের অবদমনের প্রক্রিয়া চলেছে। ফলে ধর্মশাস্ত্রই হোক বা লোকজ উপাদানই হোক সেগুলির পর্যবেক্ষণ নারীদের ইতিহাস নির্মাণের বা অনস্তিত্বের কারণ অনুসন্ধানে সহায়ক।

এছাড়া বিগত শতকের মাঝামাঝি সময়ে যখন থেকে নারীমুক্তি আন্দোলন জোরালো হয়ে উঠল তখন থেকে মানবী চর্চার চৌহদ্দিতে সাহিত্যক্ষেত্রে অশ্রুত নারীকণ্ঠের খোঁজ শুরু হয়। সাধারণভাবে নারীকণ্ঠ কম হলেও একেবারে ছিল না তা নয়। ঘোষা বা লোপামুদ্রার মত ব্যতিক্রম ছাড়াও ছিল বৌদ্ধ থেরীদের রচিত গীত **থেরীগাথা**, মধ্যযুগীয় ভক্তিসাহিত্যে মীরা বা লাল্লার মত সাধিকা কবিদের গীতে আমরা নারী কণ্ঠের ছবি পাই। তার মধ্য দিয়েও পিতৃসূত্রী মতাদর্শের বিরুদ্ধে নারীদের স্বাধিকার, স্বাতন্ত্র্য কিভাবে রক্ষিত হয়েছে তা প্রতিভাসিত হয়ে ওঠে।

James Mill এর সময় থেকেই এই ধারণা বদ্ধপরিকর হয় যে — যেহেতু একটি সংস্কৃতি বা সভ্যতার উৎকর্ষ/অপকর্ষের মাপকাঠি হল সমাজে নারীর স্থান এবং ভারতীয় সভ্যতা এই বিষয়ে পিছিয়ে রয়েছে তাই এটি খারাপ সংস্কৃতি। কিন্তু পাশাপাশি প্রাচ্যবাদী গবেষকদের/চিন্তাবিদ্‌দের রচনা থেকে যে মতটি ক্রমশঃ শক্তিশালী হয়ে ওঠে তা হল ঋগ্বেদের যুগে সমাজে নারীর স্থান ছিল উচ্চে কিন্তু পরে এর ক্রমাবনতি ঘটে। বিশেষতঃ মুসলমান আক্রমণের ফলে পর্দা প্রথা থেকে শুরু করে অন্যান্য ক্ষতিকর অনুশাসন মেয়েদেরকে সামাজিক নিগড়ে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলেছে। এই বিশ্লেষণের উদ্দেশ্য, তার পেছনে সাম্রাজ্যবাদী প্রনোদনার অনুসন্ধান বেশ কিছুটা হয়েছে এবং ভবিষ্যতে আরো হবে, তবে বিশেষতঃ প্রাচীন ভারতের ভারতীয় সাহিত্যের সাক্ষ্য এই ধারণাকে কিছুটা প্রমাণ করে।

প্রাচীন যুগ

ঋগ্বেদের রচনাকাল নিয়ে ঐতিহাসিক বিতর্কের মধ্যে না গিয়ে বলা যায় যে ঋগ্বেদের প্রথম পর্যায়ে অর্থাৎ “পরিবার মণ্ডলে” (২-৭ম) নারীদের মুক্ত জীবনের ছবি দেখতে পাই। নারীর শরীর, যৌনতা নিয়ে এই পর্যায়ে রচিত ঋক্ গুলির মধ্যে অসংকোচ উক্তি দেখা যায়। দেবী উষাকে কখনো কুমারী কখনো সূর্যের বধু হিসাবে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে সূর্যের পশ্চাতে নয়, তার স্থান সূর্যের আগে। নাভানেদিষ্ট সুক্তে পিতাপুত্রীর এবং যমযমী সুক্তে ভাইবোনের অবৈধ প্রণয় চিত্রিত হয়েছে।

নারীর গৃহকর্ম সম্পর্কে তথ্য ঋগ্বেদে নেই। ঋগ্বেদে কোথাও কোথাও যোদ্ধী নারীর উল্লেখ পাওয়া যায় যেমন মুদগলিনী [নামের আক্ষরিক অর্থ যিনি মুগুর ব্যবহার করতে পারেন] তবে শিক্ষায় নারীর

অধিকার সম্ভবতঃ প্রাগার্য, আর্য সংমিশ্রণের যুগেই হরণ করা হয়েছিল কারণ এই সময় নারীদের উপনয়নের অধিকার চলে যায়। আর যেহেতু উপনয়নই বেদপাঠের দ্বার স্বরূপ তাই উপনয়নের অধিকার চলে গেলে শিক্ষার অধিকার মেয়েরা হারিয়ে ফেলে। তবে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক অধিকার হারালেও কোন সদয় পিতা, সহানুভূতিশীল ভ্রাতা বা স্বামীর সাহায্যে মেয়েদের কেউ কেউ শিক্ষা অধিগত করে 'আচার্যা', 'উপাধ্যায়া' পদ সিদ্ধ করেন। যাজ্ঞবল্ক্য মুনি তাঁর পত্নি মৈত্রেয়ীর সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন। ঋগ্বেদে বিশ্ববারা, শাশ্বতী, ঘোষা, অপালা, গার্গী ইত্যাদি 'ঋষিকা' বা নারী ঋষির নাম পাওয়া যায়। 'সোহহম্' তত্ত্বের প্রথম প্রবক্তার নাম অম্ভৃণ মুনির কন্যা বাক্। তবে সমাজে স্ত্রীশিক্ষা যে খুব প্রশস্ত ছিল না তা প্রমাণিত হয় যখন সেই যাজ্ঞবল্ক্যই গার্গীর প্রশ্নবাণে জর্জরিত হয়ে তাঁকে হুমকি দেন যে প্রশ্ন করলে তাঁর মাথা খসে পড়বে।

বেদ থেকে মহাকাব্যের যুগে নারীরা প্রধানতঃ বধু বা জননী হিসাবেই চিত্রিত হয়েছেন। ঋগ্বেদে অবিবাহিতা নারীর উল্লেখ কিছু কিছু ক্ষেত্রে পাওয়া যায় — যেমন জরৎকুমারী, বৃদ্ধকুমারী ইত্যাদি কিন্তু পরে মহাকাব্যের যুগে মেয়েদের বিবাহ আবশ্যিক হয়ে পড়ে। বৃদ্ধা তপস্বিনী কুনিগর্গের কন্যাকে বলা হয় যে বিবাহ না করলে তাঁর সারা জীবনের সমস্ত তপশ্চর্যা ব্যর্থ হবে তাই তিনি একরাতের জন্যে হলেও বিবাহ করতে বাধ্য হন।

মনুসংহিতায় বলা হয়েছে যে 'নারীর পক্ষে বিবাহই হল উপনয়ন, পতি সেবা বেদাধ্যায়ন এবং পতিগৃহে বাসই গুরুগৃহে বাস।' অর্থাৎ নারীর পক্ষে বিবাহ, স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির পরিচর্যাই হল শিক্ষার বিকল্প। গৃহকর্ম ও কিছুটা বাদ্য গীতে শিক্ষা ছাড়া নারী মোটের উপর অশিক্ষিতই থেকে যেতেন ফলে স্বাধীন কোন বৃত্তিতে অধিকার না জন্মানোয় তিনি সম্পূর্ণভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। একমাত্র গণিকাকেই রাষ্ট্র নিজ খরচে চৌষট্টি কলায় শিক্ষিত করে তুলত।

গৃহ্যসূত্র গুলিতে বধূকে সম্পূর্ণভাবে গৃহকর্মে নিবেশিত পতির ইচ্ছার অনুবর্তিনী হিসাবে চিত্রিত করা হয়েছে। এছাড়াও পুরুষের বহুবিবাহের অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নারীর ক্ষেত্রে একজন পুরুষই বিধেয়। একদিকে ব্যক্তি মালিকানার উৎপত্তির ফলে একগামীতার, নিজ ঔরসজাত সন্তান (অবশ্যই পুত্রসন্তান) এর চাহিদা, অন্যদিকে নারী স্বাধীন বৃত্তিহীন, নিজ দেহ রক্ষার কৌশল জানা নেই, ফলে যখন একের পর এক যবন, শক, পহ্লব বা হুন আক্রমণ হয়েছে তখন এই একান্ত পুরুষনির্ভর নারীর যৌনশূচিতা রক্ষায় যৌবনের পূর্বেই বিবাহ দেওয়া আবশ্যিক হয়ে পড়ে এবং তাকে দৃঢ় অবরোধে রুদ্ধ করে রাখা শুরু হয়। নারী হয়ে ওঠে নরকের দ্বার —

শতপথ ব্রাহ্মণ এ বলা হয়েছে "নারী, কুকুর, কালো পাখী — এদের প্রতি দৃষ্টিপাত করা উচিত নয় ; নইলে আলো ও অন্ধকার, শুভ ও অশুভ সব একাকার হয়ে যাবে।" নারী শুধু যে নিজে মন্ত্রোচ্চারণ করতে পারত না তাই নয়, তার সম্পর্কে অনুষ্ঠানগুলিতেও কোনো মন্ত্রোচ্চারণ নেই। শুধু গর্ভাধান, পুংসবন ও সীমন্তোন্নয়ন ছাড়া তার নিজস্ব কোনো অনুষ্ঠানও নেই — অনুষ্ঠানগুলির একটিই উদ্দেশ্য জাতকটি যেন কন্যা না হয়ে পুত্র হয়।

মহাভারতে দেখতে পাই শরশয্যায় শায়িত ভীষ্ম উপদেশদান করে যুধিষ্ঠিরকে বলেন "নারীর চেয়ে অশুভ আর কিছুই নেই, পুত্র, পুরুষের উচিত সর্বদা নারীর সঙ্গ পরিত্যাগ করা।" আপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে বলা হয়েছে "কালো পাখি, শকুনি, বেজি, ছুঁচো, কুকুর, শুদ্র ও নারী" হত্যার জন্য একদিনের প্রায়শ্চিত্তই যথেষ্ট। নারী পণ্যের মতই বিনিময়যোগ্য পদার্থ — শাঙ্খায়ন শ্রৌতসূত্র অনুযায়ী সারস্বতানাময়ন যজ্ঞের দক্ষিণা হল একটি মাদি ঘোড়া ও সন্তানবতী একটি নারী।

তবে এক্ষেত্রে বলা উচিত যে মহাকাব্য দুটিতে নারী চিত্রনে দুটি স্তর লক্ষ্য করা যায়। প্রথম স্তরটিতে নারী তুলনায় স্বাধীন — সাবিত্রী একাই স্বামী সন্ধান করতে বেরিয়েছিলেন, অম্বা নিঃসঙ্কোচে নিজের নির্বাচিত বরের নাম ভীমকে প্রকাশ করে এবং তার আপত্তি স্বীকৃতও হয়। শকুন্তলাও সন্তান সমেত দুষ্মন্তের রাজসভায় উপস্থিত হন এবং তাঁকে বিস্তর কটুবাক্য বর্ষণ করেন। দ্রৌপদী কীচককে পদাঘাত করেন। কিন্তু দ্বিতীয় স্তরটিতে নারীর অবমাননা চরমে উঠেছে — ব্রহ্মচারী গালব রাজা যযাতির কাছে গুরুদক্ষিণা চাইলে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাবে যযাতি তাঁকে নিজের সুন্দরী তরুণী কন্যা মাধবীকে দেন। গালব মাধবীকে তিন বছরে তিনজন রাজাকে ভাড়া দিয়ে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করেন। পরে মাধবী তপশ্চারিণী হয়ে যান। যখন স্বর্গারোহণকালে যযাতি আবিষ্কার করলেন যে তাঁর পুণ্যে কিছু কম পড়েছে তখন তিনি মাধবীরই সঞ্চিত পুণ্যের কিছু অংশ নিয়ে স্বর্গে যান। ফলে নারীর দেহ, মন বা আধ্যাত্মিক কোন স্বাধীনতাই ছিল না।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে যখন ব্রহ্মণ্যবাদী যাগযজ্ঞভিত্তিক ধর্মের বিরুদ্ধে একটি ধর্ম আন্দোলনের সূচনা হয়। তখনও সামগ্রিকভাবে এই অভিমতই জোরালো ছিল। গৌতম বুদ্ধ প্রৌঢ়া গৌতমীকেও দীক্ষা [illegible] 522 টি পংক্তি, যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছেছে, বলা যায় নারীদের নিজস্ব রচনার প্রাচীনতম সংকলন। এই রচনার সাথে সংযুক্ত **পরমত্ত দিপনী** - তে থেরীগাথার রচয়িত্রীদের জীবন বৃত্তান্তও রয়েছে। এর থেকে বা গানগুলি থেকে দেখা যায় সন্ন্যাসিনীরা তেল নুন লকড়ির প্রাত্যহিকতায় বা স্বামীর জ্বালায় বা অন্তরের কোন গোপন তাড়নায় ব্যথিত হয়ে পাগলিনীর মত ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে এই যন্ত্রণার থেকে মুক্তিদাতার সন্ধান পেয়েছেন এবং সংসার ত্যাগ করে জীবনের বৃহত্তর সার্থকতার সন্ধান করেছেন।

বৌদ্ধ/জৈন ধর্মের প্রাধান্য খর্ব করেই গুপ্তযুগ থেকে আবার নবরূপে ব্রহ্মণ্য অভিমত জোরদার হয়েছে। এই সময়কালে রচিত স্মৃতিশাস্ত্রগুলিতে পিতৃসূত্রি মতাদর্শকে জোরদার হতে দেখা যায়। এর মধ্যেই আসে ইসলাম এবং এমন এক ঐতিহাসিক অভিমত দেওয়া হয়ে থাকে যে এর ফলে সামাজিক অনুশাসনের নিগড় মেয়েদের উপর আরো চেপে বসে। কিন্তু এই সময়ে আঞ্চলিক সংস্কৃতির যে বিকাশ ঘটছিল ভারতের প্রায় সর্বত্র তাতে একটি প্রক্রিয়া বিভিন্ন রুপে প্রায় সর্বত্র প্রতিয়মান — আগেকার উপজাতি সমাজের দেবীদের ব্রহ্মণ্য দেবদেবীর গোষ্ঠীতে স্থান দেওয়া শুরু হয়। অন্যদিকে দক্ষিণে যে ভক্তি আন্দোলনের উৎপত্তি এবং পরে বিভিন্ন রুপে সারা ভারতে বিকাশ ঘটল সেখানেও সমাজে নারীর ঐতিহ্যগত অবস্থান বড় সড় প্রশ্ন চিহ্নের মুখে পড়ল। এই দিক পরিবর্তন আঞ্চলিক সাহিত্যগুলিতে খুবই স্পষ্ট।

❑ মধ্যযুগ

মধ্যযুগের ভক্তি সাধিকাদের একটি বড় অংশই হল নারী যারা তাঁদের সাধনার কথা, ঐশ্বরিক প্রেমাষ্পদের প্রতি ব্যাকুলতার কথা অপূর্ব কাব্যে বা গানে লিখে গেছেন। এই ভক্তিগীতি তৎকালীন সামাজিক ইতিহাস বিশেষতঃ মানবীচর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ আকর। কাশ্মীরে লাল্লা বা লাল বৈদ তাঁর গানে শাশুড়ির গঞ্জনা বা ঘরকন্নার কাজের তুচ্ছতাকে তুলে ধরেছেন। মহারাষ্ট্রের ভক্তি সাধিকা বহিনাবাঈ ও সংসারের প্রাত্যহিকতায় পিষ্ট হতে হতে তুকারামের স্বপ্নাদেশে কিভাবে 'মুক্তি' ঘটল তার বর্ণনা দেন। মীরাবাঈ ও সংসার। পিতৃসূত্রী মনোভাব এর চাপ সয়েছেন। এঁদের রচনায় তাই খাঁচায় বন্দী নারী মনের যন্ত্রণা ও তার থেকে মুক্তির আস্বাদ পাওয়া যায়। এছাড়াও মনে রাখতে হবে যে দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে যে হস্তশিল্পের বিপুল বিকাশ ঘটেছিল, ভক্তি আন্দোলনের বস্তুগত ও সামাজিক ভিত্তি ছিল সেই বিপুল হস্তশিল্পী শ্রেণী। এই পরিবারগুলিতে — গৃহশ্রমভিত্তিক হস্তশিল্প উৎপাদনে মহিলাদের শ্রম ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান তাই এই সমাজের নারীরাও তুলনায় যথেষ্ট আত্মসচেতন (ব্যতিক্রমও আছে — অন্যান্য দিকে কবীরের দূরদৃষ্টি — তাঁর আলোকপ্রাপ্ত মনের তুলনা না থাকলেও তাঁর মধ্যে পিতৃসূত্রী মানসিকতা সুস্পষ্ট — তিনি ছিলেন জুলাহ্ বা তাঁতি)।

বাংলায় মধ্যযুগের সাহিত্যও নারী ইতিহাস, রচনার গুরুত্বপূর্ণ আকর। **ব্রতকথা** গুলিতে ব্রহ্মণ্যধারা বহির্ভূত ব্রাত্য স্ত্রীলোকেদের উৎপাদন ও প্রজনন সম্পর্কিত পূজাপদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মণ্যধারার দেবতাদের বদলে যুয়া-ভাদালি, ধাতা-কাতা, সেঁজুতি, ইতু প্রভৃতি মেয়েদের দ্বারা সৃষ্ট দেবী/দেবতাদেরই পূজা করা হয়েছে। এই প্রাচীন নারীদের দ্বারা সংরক্ষিত কাহিনীগুলিই পরে হিন্দু-মুসলমান যৌথ উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছে। চন্দ্রাবলীর পুঁথি, মধুবালার কেচ্ছা (কিস্‌সা), মালঞ্চকন্যার কেচ্ছা ইত্যাদিতে কথক বা গায়ক মুসলমান, শ্রোতা নারী। এই ধরনের সাহিত্যে মেয়েদের অনেক রকমের স্বাধীনতা ভোগ করতে দেখা যায়। এই লোকধারার আরেকটি উপাদান হল নাথপন্থী সাহিত্য যার অন্যতম শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হল **ময়মনসিংহ গীতিকা**। এখানে প্রধান চরিত্র ময়নামতী হাড়িসিদ্ধা, তিনি তাঁর স্বামীর গুরুপদ লাভের অভিলাষী এবং পতিহন্তারিকা বা ব্যাভিচারিণী হবারও ইঙ্গিত রয়েছে। তথাপি তিনিই এই রচনার শ্রেষ্ঠ নায়িকা। এই ধরনের রচনায় পৌরাণিক মতাদর্শের প্রভাব বড় একটা দেখা যায় না এবং নারী ভাবনাও অধিক মানবিকতাবোধসম্পন্ন। তবে এই সাধনার গুহ্যপদ্ধতি ধীরে ধীরে এদের সাধারণ মানুষের অগম্য করে তোলে। এই লৌকিক সম্প্রদায়গুলি পরবর্ত্তীকালে বৈষ্ণব ধর্মের উত্থানের সাথে বিশেষতঃ নিত্যানন্দের পরবর্ত্তী সময়ে মূলধারায় মিশে যায় — অষ্টাদশ শতকের বাংলায় লৌকিক ধর্মচর্চার যে বিস্ময়কর বিস্ফোরণ ঘটে — আউল, বাউল, ফকিরী, নেড়ানেড়ি, বলাহারি, সাহেবধণা ইত্যাদির মধ্যে এদের গুহ্যসাধনা বিকশিত হয়। এই লৌকিক সম্প্রদায়গুলির জীবনচর্যা, ধর্মমার্গ ব্রহ্মণ্যবাদের মানদণ্ডে ভ্রষ্টাচারের লক্ষণ হলেও মানবিক চেতনায় বিশেষতঃ নারীর প্রতি দৃষ্টি ভঙ্গীতে উন্নত ছিল যা এই সম্প্রদায়গুলির সাহিত্যে প্রতিফলিত হয়েছে।

আমরা আগেই বলেছিলাম যে মধ্যযুগে লৌকিক দেবদেবী বিশেষতঃ দেবীদেরকে পৌরাণিক দেবতাগোষ্ঠীতে স্থান দিয়ে উপজাতিদের সমাজে আত্মীকরণ একটি সর্বভারতীয় প্রক্রিয়ার অঙ্গ এবং এর প্রতিফলন সাহিত্যে ঘটেছে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের একটি বিশেষ ধারা হল মঙ্গলকাব্য — মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল বা ধর্মমঙ্গলের মধ্যে এই আত্মীকরণ এর প্রক্রিয়া স্পষ্ট প্রতীয়মান। এর ফলে এই সাহিত্যে একটি মিশ্র ধারা গড়ে ওঠে। মঙ্গলকাব্যের বেহুলা চরিত্রে একদিকে দৃঢ়চেতা স্বাধীন রমণীর সব বাধা বিপত্তি অতিক্রম করবার মধ্যে আর্যেতর কৌম জীবনের ছাপ। অন্যদিকে সতীত্ববোধ এবং বিবাহিত স্বামীর প্রতি একনিষ্ঠায় পৌরাণিক আদর্শের মিশ্রণ দেখতে পাওয়া যায়।

পুরুষের একাধিক বিবাহের ফলে সতীনের প্রতি বিদ্বেষ, স্বামীকে স্ববশে রাখার জন্য মারণ, উচাটন, বশীকরণ জাতীয় জিনিষ যেমন ছিল তেমনি মেয়েদের কিছু কিছু স্বাধীনতার আভাসও মেলে।

লৌকিক ধারায় **বারমাস্যা** গুলিতে মেয়েদের সুখদুঃখের রোজনামচা পাওয়া যায় — চণ্ডীমঙ্গলে ফুল্লরা ও ফুল্লরার বারমাস্যা, বিদ্যাসুন্দরে বিদ্যার বারমাস্যা, আলাওলের পদ্মাবতীতে নাগমতীর বারমাস্যা ইত্যাদি।

সেন বংশের সময়তে কৌলিন্য প্রথা প্রবর্ত্তিত হলে বা পরে স্মার্ত রঘুনন্দনের নিয়মকানুন এর ফলে নারীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। রঘুনন্দন খাদ্যাখাদ্য বিচার, নিরম্ব উপবাস ইত্যাদির ব্যবস্থা করে সহমরণে প্রাণত্যাগ না করলে বিধবাদেরকে জীবন্মৃত করে রাখবার ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই নিঃসীম অন্ধকারের মধ্যেই এলেন চৈতন্যদেব। তাঁর সংকীর্তনে পরিচয় অপরিচিতের ভেদ ভুলে নারী-পুরুষ নির্বিশেষে নগরবাসী অংশগ্রহণ করেছেন — 'বুলে স্ত্রী-পুরুষ সর্বলোক প্রভুর সঙ্গে / কেহ কাহ নাহি জানে পরমানন্দ রঙ্গে।' ফলে মেয়েরা ধর্মীয় কারণে হলেও কিছুটা গতানুগতিকতা ভুলতে পেরেছিলেন বলে মনে হয়। এই সময় রচিত মহাপ্রভুর জীবনী বা বৈষ্ণব সাহিত্যে আমরা এর ছাপ দেখতে পাই। তত্বগতভাবে নারী-পুরুষ সম্পর্ক বিচারে বৈধী প্রেমকে (স্বকীয়া) রাগানুগা প্রেম এর (পরকীয়া) পরে স্থান দেওয়া হয়েছে। পরে মহাপ্রভু নীলাচল থেকে নিত্যানন্দকে বৈষ্ণবমত প্রচারের জন্য পাঠাচ্ছেন এই নির্দেশ দিয়ে — 'যতেক অস্পৃশ্য, দুষ্ট, যবন, চণ্ডাল / স্ত্রী, শুদ্র, আদি যত অধর্ম রাখাল' — কে উদ্ধার করতে হবে। ফলে নারীদের অন্তত ধর্মক্ষেত্রে গুণগত পরিবর্ত্তন ঘটেছিল। এটি অন্ততঃ গৌড়ীয় মতের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

আধুনিকযুগ

ঔপনিবেশিক শাসনে বাংলা তথা ভারতবর্ষের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে কিছু বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। আগেই দেখেছি James Mill এর মতে সামাজিক উন্নতির মানদণ্ড সমাজে নারীর স্থান ফলে সংস্কারপন্থী উপযোগিতাবাদী এবং ঐতিহ্যপন্থী প্রাচ্যবিদ্‌দের মধ্যে বা রামমোহন রায়ের মত পরিবর্তনকামী বা রাধাকান্ত দেবদের মত স্থিতাবস্থার সমর্থকদের মধ্যে নারী হয়ে ওঠে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দু। এর প্রতিফলন সাহিত্যেও পড়েছে ঔপনিবেশিক আধুনিকতার একটি চরিত্রলক্ষণ হল Novel

(বাংলায় উপন্যাস)। প্যারীচাঁদ মিত্র বা কালীপ্রসন্ন সিংহের হাতে এই সাহিত্য-রূপটির আদলটি কিছুটা তৈরি হলেও পরিপূর্ণতা পায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-এর হাতে। সাহিত্যের এই নবতম সংযোজনের সাথে প্রথম থেকেই নারী সমাজের অঙ্গাঙ্গী যোগাযোগ ছিল প্রথমত পাঠিকা হিসাবে ও পরে স্রষ্টা হিসাবে। উপন্যাসের উৎপাদন ও বণ্টনের সাথে প্রথম থেকেই মেয়েদের যোগাযোগ থাকায়, প্রগতি ভাবনার সাথে নারীর প্রশ্নটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত থাকায় উপন্যাসে নারীর সামাজিক অবস্থান বা নারী সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় সাহিত্যের উপজীব্য হয়ে ওঠে।

ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকে নগর কলকাতার সামাজিক বিকাশ, নবজাগরণ বা বাবু সংস্কৃতি সবের সাথে জড়িয়ে থাকে বিধবাদের অসহনীয় কষ্ট, পতিতাবৃত্তি ইত্যাদি নানা প্রশ্ন। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় (নববাবুবিলাস) বা কালীপ্রসন্ন সিংহ (হুতোম প্যাঁচার নক্সা) বলছেন যে নব্যবাবুদের একটা বড় চরিত্র লক্ষণ হল বেশ্যাবাড়ী যাওয়া।

> "বেশ্যাবাজীটি আজকাল এ শহরের বাহাদুরির কাজ ও বড় মানুষের এলবাত পোশাখের মধ্যে গণ্য অনেক বড় মানুষ বহুকাল হল মরে গ্যাচেন কিন্তু তাঁদের রাঁড়ের বাড়িগুলি আজও মনিমেন্টের মত তাঁদের স্মরনার্থে রয়েছে ...... কলকেতা সহর এই মহাপুরুষদের জন্য বেশ্যাশহর হয়ে পড়েচে ...."

ইংরেজ সরকার নিজের গোরা পত্তনদের যৌন ব্যাধি থেকে মুক্ত রাখতেই মূলতঃ 1868 সালে Contagious Disease Act বা Act XIV বাংলায় 'চৌদ্দ আইন' চালু করে। এমনকি ঊনবিংশ শতকের সত্তরের দশকে পতিতাবৃত্তি নিবারণের কথাও ভাবতে থাকেন। এতে সামিল হন পাশ্চাত্যশিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। এই সময়ে তাই পতিতাদেরকে নিয়ে ভাবনাচিন্তার পাশাপাশি তারা কোথা থেকে আসে এ নিয়েও আলোচনা হয় এবং দেখা যায় অল্পবয়সী হিন্দু বিধবারা বিরাট সংখ্যায় দেহব্যবসায় লিপ্ত হচ্ছেন। বঙ্কিম থেকে শরৎচন্দ্র পর্যন্ত বাংলা উপন্যাসে নারী বিশেষতঃ বিধবা নারীদের অবমাননা এবং সবশেষে পতিতাবৃত্তি অবলম্বনে বাধ্য হওয়ার কাহিনী ফুটে উঠেছে।

'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল' বা 'শ্রীকান্ত', 'চরিত্রহীন' এর মত উপন্যাসে কুলীনপ্রথা, কুলীনদের বহুবিবাহ, বিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এবং পতিতা বৃত্তির মধ্যে কার্যকারণ সূত্রগুলি বিভিন্নভাবে ফুটে উঠেছে।

> 'বিষবৃক্ষ' উপন্যাসে দেখতে পাই —
>
> "শ্রীমতি বিশেষ রূপবতী ছিল, সুতরাং অচিরাৎ বিশদে পতিত হইল। গ্রামস্থ একজন দুশ্চরিত্র ধনী ব্যক্তির চক্ষে পড়িয়া সে সূর্যমুখীর পিতার গৃহত্যাগ করিয়া গেল। কোথায় গেল, কেহ জানিতে পারিল না। কিন্তু শ্রীমতি আর ফিরিয়া আসিল না।"
>
> 'শ্রীকান্ত' উপন্যাসে দেখা যায় স্বামী পরিত্যক্তা মা সুরলক্ষ্মী ও রাজলক্ষ্মীকে বিরিঞ্চি দত্তের পাচক এক ভঙ্গ কুলীনের সাথে বিয়ে দিলেন (বা দিতে বাধ্য হলেন)। বিয়ের দিন সত্তর টাকা বরপণ

নিয়ে লোকটি সেই যে গেল আর ফিরল না। এই পরিস্থিতিতেই পরিস্থিতির তাড়নায় শেষ পর্যন্ত রাজলক্ষ্মী দেহোপজীবিনীতে রূপান্তরিত হয়।

❑ আত্মজীবনী

উপন্যাস ছাড়াও মেয়েরা অনেকেই নিজেরাই কলম ধরেছেন। একাধারে দেহব্যবসায় জড়িত, আবার অন্যদিকে গিরিশ চন্দ্র ঘোষ-এর শিষ্যা হিসাবে রঙ্গমঞ্চের সফল অভিনেত্রী বিনোদিনী দাসী বা 'নটী বিনোদিনী' লিখেছেন 'আমার কথা'। এছাড়া প্রসন্নময়ী দেবীর 'পূর্বকথা', কৈলাসকামিনী দেবীর 'জনৈকা গৃহবধুর ডায়েরী', হেমন্তবালা দেবীর 'নিজের কথা', সুধীর গুপ্তার 'আমার সেদিনের কথা' ইত্যাদি আত্মজীবনীগুলিতে মেয়েদের নিজের জবানীতে তাদের কথা জানা যায়।

মেয়েদের লেখা উপন্যাসও সমাজ জীবনের একটা ছবি তুলে ধরেছে। গিরিবালা দেবীর 'রায়বাড়ি' বা আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রথম প্রতিশ্রুতি' যৌথ পরিবারের হই চৈ এর মধ্যেও কিভাবে নারী জীবনে শৃঙ্খল পরিয়েছে তার বর্ণনা পাওয়া যায়। গিরিবালা দেবীর বিমু বা আশাপূর্ণা দেবীর সত্যবতী শেষপর্যন্ত এই অর্গল খুলে বাইরে বেরনোর চেষ্টা করেছে।

ধর্মীয় বা কাব্য অথবা কথাসাহিত্যের বিভিন্ন ধারায় মহিলারা যে ভাবে চিত্রিত হন তা ঘটে সমাজ বাস্তবতা, সামাজিক মতাদর্শের এক জটিল মিথষ্ক্রিয়ার ফলে। এই সাহিত্যিক উপাদান মেয়েদের না বলা ইতিহাস পুনর্গঠনে নব উন্মেষ ঘটানোর ক্ষমতা রাখে।

১২.১.২.৩ ঃ শাসন (প্রস্তর বা তাম্র) / লেখগুলির সাক্ষ্য

আমরা দেখেছি যে ভারতীয় ধর্মীয় সাহিত্যে বলা হয়েছে যে, মহিলাদের ধর্মক্ষেত্রে জনসমক্ষে ভূমিকা ছিল খুবই নগন্য। **ধর্মশাস্ত্র** গুলিতে হিন্দু রমণীদেরকে মূলত পিতৃতান্ত্রিক পারিবারিক গণ্ডীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, অর্থনৈতিক স্বাধীনতা না থাকায় ধর্মীয় অংশগ্রহণ বা দান ধ্যানের ক্ষেত্রে তারা ছিলেন স্বামী বা পরিবারের উপর নির্ভরশীল। ধর্মশাস্ত্রে বা **আগম** সাহিত্যে পুরুষদের ক্ষেত্রে যাজ্ঞিক, পুরোহিত সন্ন্যাসী বা শাস্ত্রী হবার (নৈতিক বা সামাজিক) মানদণ্ড বেঁধে দিলেও মহিলাদের ক্ষেত্রে সর্বজনসমক্ষে পালনীয় ভূমিকার ব্যাপারে এই কেতাবগুলি নিরব। জৈন বা বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলিতে মহিলাদের সংসারত্যাগী সন্ন্যাসিনী হবার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা না থাকলেও সুস্পষ্ট ভাবে বলা হয়েছে যে (বৌদ্ধধর্মে) সন্ন্যাসিনীরা সন্ন্যাসীদের অধিনেই থাকবে। তাদের কার্যকলাপ, গতিবিধির উপর কিছু গণ্ডী টেনে দেওয়া হয়েছিল।

তবে এই ধরনের নীতিমূলক বই (normative text) থেকে আমরা সমাজে মহিলাদের অবস্থান বিষয়ে যে ছবি পাই তা অবশ্যই একপেশে। অন্ততঃ দক্ষিণ ভারতে মন্দিরের গায়ে খোদাই যে প্রস্তরলিপি পাওয়া যায় তার অধ্যয়ন করলে সমাজে বিশেষতঃ ধর্মীয় ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ

সম্পর্কে সাবেক ধারণা অনেকটাই বদলে যাবে।

দক্ষিণ ভারতে হিন্দু মন্দির বা জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মক্ষেত্রগুলিতে দান বা দক্ষিণা দেবার কথা মন্দির গাত্রে বা ধর্মীয় স্থানে উৎকীর্ণ লিপিগুলিতে ফলাও করে বলা আছে। বস্তুতঃ এই লিপিগুলি দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস — সামাজিক, অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক ইতিহাস রচনার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ আকর উপাদান ইদানিংকালে একটি ঐতিহাসিক অভিমত ক্রমেই জোরদার হচ্ছে যে নীতি গ্রন্থ (normative text) গুলি, যার উপর ভিত্তি করে এতদিন ভারতীয় সমাজপদ্ধতির ইতিহাস লেখা হয়েছে, সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নয়। এগুলিতে যে আদর্শায়িত সমাজের ছবি দেখা যায় ভারতীয় সমাজ ছিল বাস্তবে তার থেকে অনেকটাই আলাদা। এই অভিমতের প্রবক্তারা তাদের অভিমত প্রমাণের জন্য বেছে নিয়েছেন এই লেখ বা শাসন যার মধ্যে সমাজের বাস্তব ছবি ফুটে ওঠে। Cynthia Talbot বা Leslie orr এর মত গবেষিকারা বর্ণ/জাতি বা নারীর স্থান নিয়ে যে প্রথাসিদ্ধ ধারণা ছিল তার পুনর্লিখন করতে চাইছেন লেখ - এর সাক্ষ্য প্রমাণের উপর দাঁড়িয়ে।

দক্ষিণ ভারতে যেহেতু এই সাক্ষ্যের পরিমাণ প্রচুর (প্রায় ২০,০০০ লেখ এখনো পর্যন্ত পাওয়া গেছে) তাই এই বিপুল তথ্যরাজির ভিত্তিতে সামাজিক সম্পর্কের ইতিহাস নতুন করে দেখাই যেতে পারে। এই লেখ গুলিতে কি বলা থাকত ? মূলত ধর্মীয় স্থান গুলিতে পুণ্যার্থে দান বা ধর্মীয় স্থানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য গৃহীত ব্যবস্থার কথা মন্দির / ধর্মীয় স্থানগুলিতে উৎকীর্ণ থাকত। কারা এই দান করতেন ? মূলতঃ সমাজের উঁচুতলার মানুষ — রাজা, রাজন্যবর্গ, জমির মালিক, বণিক, রাজমহিষি বা রাজপরিবারের মহিলারা এবং অবশ্যই সাধারণ মহিলারাও এই প্রক্রিয়ায় অংশ নিতেন। Leslie Orr তাঁর গবেষণায় দেখেছেন যে মন্দির এর মহিলারা — যারা দেবদাসী নামে পরিচিত তারাও বিভিন্নভাবে বিভিন্ন জিনিষ দান করেছেন। জৈন বা বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রেও মহিলাদের দান অকিঞ্চিৎকর নয়। বস্তুতঃ অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে দানের ক্ষেত্রে রাজ পরিবারের মহিলাদেরকে বাদ দিলেও মহিলাদের উপস্থিতি উল্লেখযোগ্য।

এই অনুসন্ধান কিভাবে আমাদের নারীর সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে ধারণা বদলাতে পারে ? গতানুগতিক চিন্তায় দান সাধারণতঃ সন্ন্যাসী বা সংসারত্যাগী ধর্মসাধনায় লিপ্ত ব্যক্তিদেরকেই করার কথা ধর্মশাস্ত্র বা জৈন, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে দান এর উপলক্ষ মন্দির বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান। দ্বিতীয়তঃ মহিলাদের উপস্থিতি অকিঞ্চিৎকর নয়। এদের অনেকেই অর্থনৈতিক ভাবে যথেষ্ট স্বচ্ছল ছিলেন।

দান সম্পর্কে আলোচনায় অনেকেই একে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করেছেন — যাদের পক্ষে সন্ন্যাস বা ত্যাগের কঠিন পথে পুণ্যার্জন সম্ভব নয় (মহিলাদের ক্ষেত্রে কিছু বিধি নিষেধও ছিল) তারাই কিছু কাঞ্চনমূল্যে সহজ রাস্তায় পুণ্যার্জনে নেমেছেন এমন একটা ধারণা কখনো কখনো দেবার চেষ্টা করা হয়। এই প্রসঙ্গে বলা যায় বেশ কিছু ক্ষেত্রে দাতা দান করেছেন অন্য কোন ব্যক্তির পুণ্যাভিলাষে কাজেই স্বার্থপরতার দাবি ধোপে টেঁকে না। দ্বিতীয়তঃ মধ্যযুগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে দান একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

লেখ এর সাক্ষ্য পূর্ণাঙ্গ নয়। সমাজের উচ্চবর্গীয়দের ক্ষেত্রে কিছু কথা বললেও লোকজ উপাদান সম্পর্কে এই উপাদান তুলনায় কম কথা বলেছে। তথাপি ধর্মশাস্ত্র বা সাহিত্যিক উপাদানগুলিতে সাধারণতঃ যে ছবি ভেসে ওঠে, লেখমালার সাক্ষ্য তাকে আংশিকভাবে হলেও বদলাতে পারে। বিশেষতঃ মধ্যযুগে মন্দির বা ধর্মস্থান গুলিতে মহিলাদের উপস্থিতি একেবারে অকিঞ্চিৎকর নয় বলেই মনে হয়।

১২.১.২.৪ ঃ NON-ARCHIVAL – চিত্রকলা

❑ Paintings

চিত্রকলায় নারীর রূপ চিত্রণে যুগে যুগে যে পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় তার মধ্য দিয়ে আর্টের সংজ্ঞা, তার পৃষ্ঠপোষকতা, শিল্পী ও শিল্পের সমঝদার উভয় পক্ষেরই দৃশ্য মতাদর্শ (visual ideology) -র পরিবর্তন প্রতিফলিত হয়েছে। স্বাভাবিকভাবেই ছবি নারীদের ইতিহাস রচনার এক গুরুত্বপূর্ণ আকর।

প্রথাগতভাবে নারীর চিত্রণে— তা সে দেবীর রূপই হোক বা প্রেমের প্রতীক রাধাই হোক, কতগুলি type তৈরি করা হত। এর পেছনে বিভিন্ন শাস্ত্রের নির্দেশিত বিধি কাজ করেছে। সংস্কৃত সাহিত্যে — যেমন **কামশাস্ত্র**, নারী, পুরুষকে তাদের দৈহিক গড়ন, চরিত্র লক্ষণ অনুযায়ী কতগুলি টাইপ-এ ভাগ করা হত। যেমন 'শঙ্খিনী', 'পদ্মিনী' ইত্যাদি এবং চিত্রশিল্পেও এই চরিত্র লক্ষণগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। সাহিত্যে নারীর রূপ বর্ণনায় যেমন প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য চিত্রকল্প হিসাবে উঠে এসেছে — যেমন মৃণাল গ্রীবা, বা পটলচেরা চোখ ইত্যাদি, ছবিতেও তেমনি সেগুলি ফুটিয়ে তোলা হয়েছে শিল্প শাস্ত্রের নিয়ম মেনে।

আদি মধ্যযুগে তন্ত্রের প্রভাবে নারীর চিত্রণ করা হয়েছে শক্তিরূপিনী হিসাবে। তন্ত্রে নারী ছিলেন পুরুষের আধিদৈবিক ক্ষমতা উপার্জনের 'যন্ত্র' স্বরূপা। বৌদ্ধ সহজিয়ারাও মোক্ষ অর্জনে যে বিভিন্ন যৌন-যৌগিক ক্রিয়াকলাপ চালাতেন নারী সেখানেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতেন। বামাচারী তান্ত্রিকরা নিচুজাতের মেয়েদের (ডোমনী, চণ্ডালিনী) এই কাজে নিয়োগ করেছেন। এই যুগের শিল্পে এই প্রভাবশালী মতাদর্শের ছায়া পড়েছে।

মধ্যযুগে চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতক নাগাদ তন্ত্র-এর প্রভাব কাটিয়ে দেখা দিল ভক্তির প্রভাব। মতাদর্শগত এই পরিবর্তন দৃশ্য মতাদর্শ (visual ideology) পরির্তনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল যার প্রভাব আমরা 'নায়িকা'-র চিত্রণে দেখতে পাই। বাংলা তথা পূর্ব ভারতে এই সময়ে চৈতন্য ও তার পর বৃন্দাবনের গোস্বামীদের প্রভাবে 'যুক্তি' ও 'জ্ঞান' এর উপর স্থান পেল 'ভক্তি'। ভক্ত এক অতিপ্রিয় উপলব্ধির মধ্য দিয়ে নিজের ভিতর ঈশ্বরকে অনুভব করেন যার বিভিন্ন রূপ হল 'দাস্য', 'সখ্য' 'বাৎসল্য' ও 'মাধুর্য্য' ইত্যাদি। চৈতন্য নিজে রাধাভাবে ঈশ্বরকে অনুভব করেন। এর প্রভাবে দেখা যায় পদাবলী সাহিত্যে 'অভিসারিকা' রাধা একটি প্রধান চরিত্র। কীর্তন এবং বাউল গানের মধ্য

দিয়ে রাধার অভিসারকেই ভক্তের ভগবৎ উপলব্ধির প্রধান দ্যোতক হিসাবে উপস্থাপন করা হয়।

এই ভাবনার প্রভাবে 'নায়িকা'র বিভিন্ন ভাব উপস্থাপনার ক্ষেত্রে কতগুলি টাইপ তৈরি হল — যেমন 'বিপ্রলব্ধ' (হতাশাগ্রস্ত), 'উৎকষিষ্ঠতা', 'খণ্ডিতা' (কুপিত) ইত্যাদি। এই সময়ে আঁকা **রাগমালা** বা **বারমাস্যা** বা 'পাহাড়ী' অনুচিত্রে (miniature বা painting) ছবিতে সেইভাবে সময় এবং পারিপার্শ্বিকের তারতম্য অনুযায়ী 'নায়িকা'র রূপ উপস্থাপন করা হয়েছে।

অষ্টাদশ শতকে মুঘল সাম্রাজ্য উত্তর যে সমস্ত উত্তরাধিকারী (successor) রাষ্ট্রগুলি তৈরি হল যেমন মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রিক বাংলার নবাবী, সেখানকার দরবারে এই ধ্রুপদী 'নায়িকা' চরিত্রের সাথে, বৈষ্ণব ভক্তি ও সুফী ধর্মভাবনার মেলবন্ধনে তৈরি হল আরেকটি নতুন শিল্পভাষা। শিল্পীদের মডেল ছিলেন দরবারের বারাঙ্গনারাই। কিন্তু ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণবিযুক্ত এক আদর্শ নারীর খোঁজ শুরু হল। মোটিফ উঠে এল কৃষ্ণলীলা বা নল দময়ন্তির মত উপকথাগুলি থেকে। মুর্শিদাবাদ শৈলীর একটি ছবিতে দেখি যে 'পাহাড়ী' মিনিয়েচার-এর আদলে আঁকা রাধাকে মুর্শিদাবাদ-এর নবাবী প্রাসাদ-এর পরিসরে (space) উপস্থাপিত করা হয়েছে। নবাব সিরাজউদদৌলাকেও এইভাবে **রাগমালা** (ভারতীয় শাস্ত্রীয় সঙ্গীতের বিভিন্ন রাগ রাগিণীর চিত্রে উপস্থাপনাকে **রাগমালা** পেইন্টিং বলা হয়), ছবিতে নায়ক বেশে উপস্থাপনা করা হয়েছে। ভারতীয় ধ্রুপদী চিত্রশৈলীকে এইভাবে সমসাময়িক দর্শকের চাহিদা মোতাবেক অদলবদল করা হয়েছিল তবে দৃশ্য মতাদর্শ নারীর অলঙ্করণে খুব বেশি পরিবর্তন করেনি।

ঔপনিবেশিক শাসনের সময় 'নায়িকা'-র রূপ নির্মাণের যে প্রথাসিদ্ধ প্রকরণ ছিল বা নারীদের যে ভাবে দেখান হয়েছে তাতে প্রথম জোরালো ধাক্কা লাগে। শুধু তাই নয় ঔপনিবেশিক শাসনের সময় ইউরোপীয় শিল্পীরা যে সমস্ত নতুন ধারণা এবং প্রকরণ কৌশল (technique) আমদানি করলেন — অবয়বের বাস্তবতার (reality) ধারণা বা তেলরঙ (oilpainting), তাতে 'প্রথাগত' এবং 'আধুনিক', 'ধ্রুপদী' ও 'বাজারী' শিল্পের ফারাক গড়ে উঠল।

1780 র দশক থেকে যে সমস্ত ইউরোপীয় চিত্রশিল্পী খোদাই শিল্পী (etching) -বা ভারতে এসেছেন ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রের প্রভাবে তাঁরা আমদানি করলেন আরেক ধরনের চিত্রভাষা, দৃশ্য মতাদর্শের। অন্যদিকে মুর্শিদাবাদসহ অন্যান্য রাজনৈতিক কেন্দ্রের পতনে/অবসানে দরবার আশ্রিত শিল্পীদের মর্যাদার অবনতি হল। তারা রূপান্তরিত হল 'কারিগর' এর স্তরে। এরা সৃষ্টি করল 'বাজার' (bazzar) এর চিত্রশৈলী যা দেশজ উৎপাদনকে টিঁকিয়ে রাখল। এদেরকে দিয়েই ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র বিভিন্ন জাতি / বর্ণের নারী পুরুষদের টাইপ / ছাঁচে ঢালা কিছু ছবি আঁকিয়ে নথি নির্মাণের (documentation) এর কাজে লাগালেন।

অন্যদিকে ব্রিটিশ শিল্পীরা এক অবক্ষয়ী সমাজের বিলাসজর্জর নবাব, বাদশাহদের প্রতিকৃতি অঙ্কনের পাশাপাশি নর্তকী বা ইংরেজ সাহেবদের 'দেশী' বিবিদের চিত্র নির্মাণের মাধ্যমে রহস্যসঙ্কুল, কামনা মদির 'প্রাচ্যে'র প্রতিরূপ নির্মাণের কাজে লাগলেন — তৈরি হল 'নাচ গার্ল' (nautch girl) এর টাইপ। অন্যদিকে জোফানী বা অন্যান্য শিল্পী অঙ্কিত ইউরোপীয় পরিবারগুলির চিত্রে ভারতীয় নারী পরিচারিকা হিসাবে চিত্রিত — সামাজিক ব্যবধান যথেষ্ট স্পষ্ট।

ভারতীয় 'কারিগর'-দেরকে দিয়ে যে 'কোম্পানী পেইন্টিংস' আঁকানো হল তাদের দক্ষতা বা সম্মান উপরোক্ত শিল্পীদের থেকে কম ছিল। স্বাভাবিকভাবেই তার ছাপ পড়ল এই প্রতিকৃতিগুলিতে। রেনাল্ডী বা টিলি-র ছবিতে 'প্রাচ্য নারী'র কমনীয়তা বা নারীত্ব (femininity) এই সব ছবিতে অন্তর্হিত। ভারতীয় সমাজের বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত — যেমন ধোপা, নাপিত ইত্যাদি, এইসব ছবিতে ফুটে উঠেছে।

এর পাশাপাশি উঠে এল কালিঘাটের পটুয়ারা। এরা জাতিভিত্তিক সংহতি (caste solidarity) বা বেরাদরী নিয়মে আবদ্ধ এবং পট আঁকার প্রকরণকে ব্যবহার করে কলকাতা শহুরে সমাজের নীতি, নৈতিকতাকে ছবিতে ব্যাঙ্গ করেছেন। পরে ছাপাই ছবির প্রযুক্তি এলে বটতলার ছাপাখানার দৌলতে এই শৈলীর ছবি সাধারণের মধ্যে প্রচুর জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। একদিকে দ্রুত হারিয়ে যাওয়া সামন্ততান্ত্রিক মূল্যবোধ, অন্যদিকে ইঙ্গ ভারতীয় কলকাতার সামাজিক বাস্তবতার মধ্যে দাঁড়িয়ে কালিঘাট শৈলীতে আঁকা হয়েছে বেশ্যার প্রতিকৃতি যাঁরা পুরুষ মানুষকে বশ করেছে। নব্যধনী 'বাবু'র ফোতোয়ানী যদি কালিঘাটের পটুয়াদের ব্যঙ্গের লক্ষ্য হয়ে থাকে তেমনি সামাজিক মূল্যবোধের অধঃপতন এবং ধ্বংসের প্রধান কেন্দ্রবিন্দু হয়েছিল অধঃপতিত নারী (ধ্রুপদী শিল্পের 'নায়িকা'র অল্টার ইগো alter ego)। বাবুবেশি পুরুষের বুকের উপর নৃত্যরত বেশ্যারূপী নারীর ছবি এই উল্টে যাওয়া সামাজিক সম্পর্কের প্রতিফলন। কালিঘাটের পট-এ আগেকার নান্দনিকতার বদলে মূল্যবোধের ওপর বেশি জোর দেওয়া হয়েছে। আগেকার ছবিতে 'নায়িকা' পুরুষ দৃষ্টি (male gaze)-এর আজ্ঞাবহমাত্র। বটতলা বা কালিঘাটের ছবিতে কিন্তু নারী পুরুষের এই আজন্মলালিত সম্পর্কের ছাঁচটাই সম্পূর্ণ বদলে গেল।

উনবিংশ শতকের মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদ-এর প্রভাবে বাংলায় শিল্পে আবার সেই ধ্রুপদীরূপকে কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনসাপেক্ষে ফিরিয়ে আনার প্রচেষ্টা চালানো হয়। ইউরোপীয় সভ্যতার 'প্রগতিশীল' উপাদানকে আত্মস্থ করে এবং 'বাজার' শিল্পের অবক্ষয়ী উপাদানগুলি থেকে নিজেদের সচেতন ব্যবধান সৃষ্টি করে এই নতুন শৈলী নিজেদের আলাদা শিল্প ভাষা তৈরি করতে চাইলেন। একদিকে যেমন ব্রিটিশ আর্ট স্কুলের শিক্ষায় 'বাস্তবতা' (reality) আত্মস্থ করলেন তেমনি ব্যক্তিসত্ত্বার, সৃষ্টিশীলতার নতুন মূল্যবোধকে রপ্ত করতে হল। এখানেই ভারতীয় শিল্পীর মধ্যে এক তীব্র আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, লক্ষ্য করা যায়। একদিকে ঔপনিবেশিক শিল্পের 'বাস্তবতা' অন্যদিকে 'বাজার' শিল্পের স্থূলত্ব অশ্লীলতাকে অস্বীকার করে যে নতুন নান্দনিকতার মূল্যবোধ গড়ে তোলার চেষ্টা চলল তাতে নারীত্বের নতুন প্রতিমা নির্মাণই হল প্রধান মাধ্যম।

জাতীয়তাবাদী শিল্পের প্রথম পর্যায়ে এই নতুন ভারতীয় ধ্রুপদী শিল্পের উপাদান সংগৃহীত হয় পশ্চিমী নব্য-ধ্রুপদী ঐতিহ্য থেকে। এর উদাহরণ হল 1880-90 এর দশকে ত্রিবাঙ্কুরের রবি বর্মার ছবি। 'হংস-দময়ন্তি' বা 'শকুন্তলার' ছবিতে এই নতুন শৈলীর ছাপ পাওয়া যায়। এই ছবিগুলিতে ভারতীয় মিথ গুলির সাথে ইউরোপীয় শৈলীকে মেশানো হয়েছে। দময়ন্তিকে প্রতীক্ষারত অবস্থায় একটি ইউরোপীয় ছাঁদের দালান বাড়িতে অপেক্ষারত অবস্থায় দেখা যায়। এছাড়াও রবি বর্মার প্রভাবে আরেক ধরনের শৈলী তৈরি হচ্ছিল যেখানে উপকথার আঙ্গিকের বাইরে প্রাত্যহিকতার গণ্ডীতে ঘরকন্নার কাজে ব্যাপৃত

'ভারতীয় নারীর' আরেক প্রতিরূপ নির্মাণের কাজ চলছিল। রবি বর্মার ঘরানার ছবি নকল তেলছবি - (oleograph) র মাধ্যমে ক্যালেণ্ডার এর পাতায় জনসাধারণের মধ্যে খুব জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল।

বিংশ শতকের গোড়ায় স্বদেশী আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে, অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর অনুপ্রেরণায় যে আরেকটি 'ভারতীয় ঘরানার' ছবি উঠে এল তাতে রবি বর্মার শৈলীকেও সম্পূর্ণ নাকচ করে 'ভারতীয় নারীর' প্রতিমা রূপটির যথেষ্ট পরিবর্তন সাধিত হয়েছে।

নারী প্রতিমার চিত্রণে / চিত্রায়নে পশ্চিমী প্রাকরণিক শিক্ষা প্রভাবিত বাস্তবতা থেকে সরে আসার কারণে শরীরী অবয়ব ও যৌনতার অভিব্যক্তি পরিত্যাগ করে নারীকে ক্রমেই সূক্ষ্মদেহী অতিন্দ্রিয় ভাব-এর বহিঃপ্রকাশ হিসাবে উপস্থাপিত করাটা এই নতুন 'ভারতীয় ঘরানার' প্রতীক হয়ে উঠেছে।

এই ধারার অন্যতম উজ্জ্বল উদাহরণ হল অবনীন্দ্রনাথ অঙ্কিত 'অভিসারিকা'। এই কালিদাস বিরচিত ঋতুসংহার-এর একটি উপস্থাপনা। এখানে ভারতীয় শিল্পের অভিসারিকা নায়িকার আদর্শকে 'পাহাড়ী' শৈলীর পেইন্টিং-এর ধারায় আঁকা হয়েছে। ছবির পরিসরে (space) চরিত্রটি যে নিরালম্ব অবস্থায় দোলায়মান। এখানে রবি বর্মার শকুন্তলা বা দময়ন্তির সাথে তফাৎটা স্পষ্ট। দুর প্রাচ্যের উত্তরাধিকার বিশেষতঃ ওয়াশ প্রকরণ (wash technique) -কে রপ্ত করে এই ভাবে নারীকে এক নিগুঢ় রহস্যময় ধোঁয়াটে / দুর্জ্ঞেয় রহস্যময় অস্তিত্বের প্রতীক করে তোলা হয়েছে। নন্দলালের আঁকা ছবিতেও একই শৈলী দেখা যায়। এইভাবে নারীকে পুরুষের কামনার বস্তু থেকে কামনা রহিত একটি অবয়বে / প্রতিমাতে রূপান্তর ঘটানো হয়েছে। নারীর এই উপস্থাপনা তৎকালীন জাতীয়তাবাদী আলোচনায় বিম্বিত হয়েছে সর্বংসহা জগজ্জননীরূপে। 1905 এ অবনীন্দ্রনাথের আঁকা 'ভারতমাতা' এমনই এক ছবি যাকে সিস্টার নিবেদিতা বর্ণনা করেছেন জাতীয়তাবাদের ধারণার রক্তমাংসের চেহারা হিসাবে। এই ছবি আঁকার সময় অবনীন্দ্রনাথ নিজের মেয়ের মুখ মাথায় রেখেছিলেন। এইভাবে দেবী, মাতা কন্যা সব মিলে মিশে একাকার হয়ে 'ভারতীয় নারী'কে নতুন আঙ্গিকে উদ্ভাসিত করেছে।

১২.১.২.৫ ঃ তথ্যসূত্র হিসাবে Photograph (ফটোগ্রাফ)

ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে Her story, His story র চাইতে উহ্যই থেকেছে এই বক্তব্য 'এহ বাহ্য'। অন্য সমস্যা হল তথ্য হিসাবে দৃশ্য শ্রাব্য উপাদান-এর চাইতে লিখিত উপাদানের গুরুত্ব বেশি মাত্রায় স্বীকৃত। ফলে মেয়েদের ইতিহাস রচনার উপাদান হিসাবে Photograph/ ক্যামেরায় তোলা ছবি বা আঁকা ছবি / Painting -এর গুরুত্ব ছিল লিখিত উপাদানগুলির সহায়ক হিসাবে, কিন্তু ইদানিংকালে Photograph বা Painting এর স্বাতন্ত্র্য ধীরে ধীরে উপলব্ধির মধ্যে আসছে।

ছবি তোলার ক্ষেত্রে ফরাসী নাগরিক ডাগুরে আবিষ্কৃত পদ্ধতি daguerreotype একটি বিপ্লব সৃষ্টি করবার কয়েক মাসের মধ্যেই কলকাতা ও মুম্বইতে এই প্রাকরণিক কৌশল পৌঁছে যায়। প্রাথমিক ভাবে ঔপনিবেশিক কর্তৃপক্ষ উপনিবেশ বাসীদের উপর তথ্যসংগ্রহের জন্যেই এই পদ্ধতি ব্যবহার

করলেও খুব তাড়াতাড়ি নতুন বৃত্তিজীবী মধ্যবিত্ত শ্রেণী এই পদ্ধতি রপ্ত করে নেয়। ভারতীয়দের কাছে ফোটোগ্রাফি ছিল, একাধারে আধুনিকতা ও যন্ত্র সভ্যতার মূর্তপ্রতীক। সুকুমার রায়ের মত ব্যক্তি এই শিল্পে নতুন পদ্ধতি রপ্ত করেন। ধনী অপেশাদাররা অত্যাধুনিক দামী যন্ত্রপাতি আমদানি করে এই শিল্পে হাত পাকান, বিভিন্ন ফোটোগ্রাফি সোসাইটি গড়ে উঠতে থাকে। অন্যদিকে Bourne and Shepherd বা Edna Lorenz -এর মত স্টুডিওগুলিতে মধ্যবিত্ত শ্রেণী তাদের পরিবারের বিশেষ মুহূর্তগুলিকে ধরে রাখার জন্য ছবি তোলাতে শুরু করে।

সাধারণভাবে বলা যায় যে এই ফোটোগ্রাফগুলি আজন্মলালিত পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ গুলিকেই জোরদার করতে ব্যবহৃত হয়েছিল। যেমন বিবাহযোগ্যা মেয়ে, পাত্রপক্ষকে দেখানোর জন্য ছবি তোলার রেওয়াজ শুরু হয় উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে। এই ছবি বা এমন অনেক পারিবারিক মুহূর্তের ছবি এই সময় থেকে মধ্যবিত্ত বাড়িগুলির নিজস্ব 'অভিলেখ্যাগারে' জমা হয়েছে। একটি বা দুটি ছবি বড় করে বাঁধিয়ে রাখা হলেও তুলনায় উচ্চবিত্তদের বাড়িতে ছবির Album রক্ষিত হয়ে এসেছে। সাধারণভাবে ছবিগুলির ছবির বাক্সে বন্দী থেকেছে।

ছবি কোন একটি বিশেষ মুহূর্তকে বন্দী করবার প্রচেষ্টা হলেও ছবিগুলির কুশিলবদের প্রত্যেকের একটা নিজস্ব কাহিনী থাকে বা বলা যায় কুশিলবরা প্রত্যেকে নিজের মত করে ছবিটির সঙ্গে আত্মিক সম্পর্ক স্থাপন করেন এবং অনেক ক্ষেত্রেই অপরিচিত ব্যক্তিকে ছবিটি / ছবিগুলি দেখানোর সময়তে সেই অকথিত কাহিনীগুলি বেরিয়ে আসতে থাকে ফলে ছবিগুলি আর স্থানু না হয়ে বাঙ্ময় / চলমান জীবনের প্রতিচ্ছবি হয়ে ওঠে। এই বিশেষ মুহূর্তগুলিতে পুরুষতান্ত্রিক মতাদর্শের জাঁতাকল থেকে মেয়েরা নিজেদের স্বাতন্ত্র্য খুঁজে পান। এ প্রসঙ্গে বলা যায় যে প্রথাগত অভিলেখ্যাগারগুলির ছবির তুলনায় পারিবারিক অ্যালবামগুলির ছবি এ বিষয়ে অনেক সহায়ক কারণ অনেক সময়তেই প্রথমোক্ত ছবিগুলি তোলার স্থান এবং সময় থেকে বিচ্ছিন্ন কিন্তু শেষোক্ত ছবিগুলি অনেক ব্যক্তিগত স্মৃতি উসকে দেয়, গল্পের ঝাঁপি খুলে বসে যেগুলি আনন্দ বিষাদের এমন এক জগতের চাবিকাঠি যার ঐতিহাসিক মূল্য সবে আমাদের উপলব্ধির মধ্যে আসছে।

তাই ছবি নিজে কথা বলে না, তাকে কথা বলতে হয়। এই কথা বলানোর ক্ষেত্রে ছবির ব্যক্তিত্বটির সঙ্গে ব্যাক্তিগত আলাপচারিতার বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। এ বিষয়ে যাঁদের গবেষণা পথিকৃত তাদের একজন Jeraldine Forbes দেখিয়েছেন যে ছবিগুলির না বলা কথা কতটা গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে। এমন একটি উদাহরণ হলেন লতিকা ঘোষ। ইনি ছিলেন বিশিষ্ট অনুবাদক ও কবি মনমোহন ঘোষ -এর কন্যা এবং অগ্নিযুগের বিপ্লবী অরবিন্দ ঘোষ এর ভাইঝি। বিদেশে পড়া শেষ করে দেশে ফিরে যখন তিনি রাজনৈতিক কাজে ধীরে ধীরে জড়িয়ে পড়ছিলেন তখন 1928 সালে কলকাতায় কংগ্রেসের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। অভ্যর্থনা সমিতির পক্ষে সুভাষ চন্দ্র বসু একটি সামরিক কুচকাওয়াজ এর ব্যবস্থা করেন। লতিকা ঘোষ এর উপর একটি মহিলা বাহিনী সংগঠনের দায়িত্ব বর্তায়। সুভাষচন্দ্র মেয়েদের জন্যেও সামরিক পোষাক পছন্দ করলেও ঐতিহ্যগত ধারণায় আঘাত লাগবার ভয়ে / ভাবনায় লতিকা ঘোষ লাল পাড় সবুজ শাড়ির সাথে সাদা ব্লাউজ পরিয়ে মহিলা বাহিনীকে গড়ে তোলেন। পরে বাসন্তীদেবীর সমর্থন নিয়ে শরৎ বসু মেয়েদের কুচকাওয়াজ বন্ধ করে দিতে পরামর্শ দেন কারণ এতে

কংগ্রেস নেতাদের রক্ষণশীল অংশের মনে আঘাত লাগার সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু লতিকা ঘোষ রুখে দাঁড়ান। তিনি কংগ্রেস অধিবেশনের অন্যান্য সমস্ত কাজ থেকে মহিলা সেচ্ছাসেবকদের প্রত্যাহার করার হুমকি দেন এবং শেষপর্যন্ত শরৎ বসু নতি স্বীকার করতে বাধ্য হন। এর ফলে অধিবেশনের দিনে 300 মহিলা সেচ্ছাসেবী দৃপ্ত ভঙ্গীতে পুরুষদের পাশে কুচকাওয়াজ করে। পরবর্তী কালে আজাদ হিন্দ ফৌজের নারী বাহিনী ঝাঁসীর রানী রেজিমেন্টের অধিনায়িকা লক্ষ্মী সেহগাল (স্বামীনাথন) ব্যক্তিগত আলাপচারিতায় সেই কুচকাওয়াজের স্মৃতি রোমন্থন করেছেন। অধিবেশনের ছবিতে বিশেষতঃ অধিবেশনের সভাপতি মতিলাল নেহেরুর অভিবাদন গ্রহণরত অবস্থার ছবিতে একদম বামপার্শ্বে দণ্ডায়মান দুই মহিলার ছবি ছাড়া মেয়েদের আর কোন দৃশ্যমান উপস্থিতি নেই (এই ঘটনার যে ছবি সাধারণতঃ দেখা যায় তাতে মেয়েদেরকে বাদ দিয়েই ছবিটি develop করা হয়েছে) কিন্তু লতিকা ঘোষের সাক্ষাৎকার, তাঁর প্রতিবাদ সেদিনের ঘটনার পেছনে সুভাষচন্দ্র বসুর অবদান এর পাশাপাশি মেয়েদের নিজস্ব কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করে তোলে। এইভাবে যদি ছবিকে 'কথা বলানো' যায় তাহলে নিত্য নৈমিত্তিক জীবনের সাদামাটা পারিবারিক ছবিগুলিও মেয়েদের প্রাত্যহিক সংগ্রামের কথা বলবে।

এই কাজে ব্যক্তিগত উদ্যোগ ছাড়াও কিছু প্রতিষ্ঠান উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। মূলতঃ C.S. Lakshmi, Neera Desai এবং Maitreyi Krishnaraj এর উদ্যোগে বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) তে তৈরি হয়েছিল Sound and Picture Archives for Research on Women সংক্ষেপে SPARROW। এরা একদিকে যেমন সাধারণ মানুষ থেকে মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার-এর ভিত্তিতে একটি 'মুখের কথায় ইতিহাস' এর সংগ্রহশালা তৈরি করেছেন তেমনি বিভিন্ন আন্দোলন সংগ্রামে মেয়েদের অংশগ্রহণ করবার ছবি থেকে মহিলা ছবি তুলিয়েদের তোলা বিভিন্ন ছবিতে সেজে উঠেছে এই অনন্য অভিলেখ্যাগার। এছাড়া রয়েছে শিল্পের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নামী এবং তুলনায় অনামী মহিলা শিল্পীদের ছবির সংগ্রহ।

এই ধরনের উদ্যোগগুলির মধ্য থেকেই ছবির মাধ্যমে মেয়েদের না বলা ইতিহাস রচনার এক অসাধ্যসাধন প্রক্রিয়া চলছে।

১২.১.২.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১। বিদিশা চক্রবর্ত্তী, সরকারী নথিতে উনিশ শতকে বাংলার নারী, কলকাতা, ২০০২

২। [illegible], **'প্রাচীন ভারতে নারী ঃ বেদ থেকে মহাকাব্য যুগ'** দ্রষ্টব্য **ভারত ইতিহাসে নারী** (সম্পাদনা) রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, গৌতম নিয়োগী, কলকাতা, 1989

৩। রীণা ভাদুড়ী, **'মধ্যযুগে বাংলায় নারীভাবনা ও নারীর স্থান'** দ্রষ্টব্য ঐ

৪। যশোধরা বাগচী, **'নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে আধুনিক বাংলা কথা সাহিত্য ঃ দু চারটি কথা'** দ্রষ্টব্য ঐ

৫। Susie Tharu, K. Lalitha, *Women Writing in India,* Vol I, *600 BC to*

Early Twentieth Century. 'Introduction'

৬। Leslie Orr, 'Women's Wealth and Worship ; Female Patronage of Hinduism, Jainism, and Buddhism in Medieval Tamilnadu in Mandakranta Bose (ed), *Faces of the Feminine in Ancient, Medieval and Modern India,* OUP, 2000 pp. 124-147.

৭। Ratnabali Chattapadhyay and Tapati Guha Thakurta, 'The Woman Perceived ; The Changing visual Sconography of the Colonial and Nationalist Period in Bengal' in Jasodhara Bagchi (ed.) *Indian Women ; Myth and Reality*, Hydrabad, 1995 pp. 147-167.

৮। রত্নাবলী চট্টোপাধ্যায়, 'নায়িকা থেকে নচ গার্ল ঃ ঔপনিবেশিক দৃষ্টিতে রাজনর্তকী' শেখর ভৌমিক (সম্পাদিত) **সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা**, কলকাতা, 2005 পৃঃ 189-196.

৯। Jiraldine Forbes, 'Small Acts of Rebellion : Women Tell their Photographs.' in Anindita Ghosh (ed.), *Behind the Veil ; Resistance, Women and the Everyday in Colonial South Asia*. Permanent Black Delhi. 2007. pp. 58-82.

১০। *Sound and Picture Archives for Research on Women* (SPARROW website.)

১২.১.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। আধুনিককালে নতুন ধরনের গবেষণায় কিভাবে নারী জাতি সম্পর্কে তথ্য বেরিয়ে আসছে?

২। নারী জাতির ইতিহাস রচনার উপাদান হিসেবে মহাফেজখানার বিভিন্ন তথ্যের গুরুত্ব আলোচনা কর।

৩। শাসন (প্রস্তর বা তাম্র) লেখগুলির সাক্ষ্য থেকে মহিলাদের ভূমিকা সম্পর্কে কি কি জানা যায়?

৪। নারীর রূপ চিত্রণে চিত্রকলার গুরুত্ব আলোচনা কর।

৫। নারী জাতির তথ্যসূত্র হিসেবে Photograph-এর মূল্যায়ণ কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

RELIGION AND WOMEN

একক - ३

(a) Brahmanical and non-Brahmanical

(b) Jainism

(c) Buddhism

বিন্যাসক্রম ঃ

২২.২.३.০ ঃ উদ্দেশ্য

২২.২.३.১ ঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সাহিত্য সূত্রে নারী

২২.২.३.২ ঃ গণিকা

২২.২.३.३ ঃ মাতৃ-আরাধনা

২২.২.३.৪ ঃ জৈন ধর্মে নারী

২২.২.३.৫ ঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারী

২২.২.३.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

২২.২.३.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.২.৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সাহিত্যসূত্রে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা।

২। ভারতীয় ধর্মচেতনায় নারীত্বের স্বরূপ।

৩। জৈন ধর্মে নারীর স্থান কিরূপ।

৪। বৌদ্ধ ধর্মে নারীর সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল।

১২.২.৩.১ ঃ ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ও সাহিত্য সূত্রে নারী

প্রাচীন ভারতের ধর্মীয় সংস্কৃতি নানান ধর্ম তথা দর্শন চিন্তার মতাদর্শগত দ্বন্দ্বের একটি জটিল সংমিশ্রণ হিসাবে সামাজিক জীবনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। ধর্ম হল আচার আচরণ, নানান মিথ ও সর্বোপরি সাংস্কৃতিক উপাদান দ্বারা সৃষ্ট এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা সামাজিক স্তরে বহুক্ষেত্রেই নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা পালন করে। Durkveim বলেছেন সামাজিক ক্রিয়াকলাপ ও অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই ধর্মের সূত্রপাত হয়, অপরদিকে Levi Strauss নানান ধরণের আদিম প্রথা ও মিথের মধ্য দিয়ে এর সূত্র সন্ধান করেছেন।

১৮০৫ খ্রীষ্টাব্দে Henry Thomas Colebrooke প্রাচীন ভারতের বৈদিক ধর্মের উপর প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। Adulbest Kunu ১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে "Redic Mythology" সংক্রান্ত গবেষণাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করেন। ওপনিবেসিক ঐতিহাসিকরা পরবর্তীকালে প্রাচীন ভারতের সমাজ জীবন তথা ধর্ম সম্পর্কে যে আলোচনার অবতারণা করেন সেখানে মহিলাদের অবস্থান তথা ধর্মীয় জীবনে তাদের অংশগ্রহণের উল্লেখ পরিলক্ষিত হয়। তবে এই আলোচনা ছিল একান্তভাবে পুরুষকেন্দ্রিক। হপকিন্‌স ও জোহান জেকব মেয়রের মতো ঐতিহাসিকরা মূল ধর্মশাস্ত্র, সংস্কৃত গ্রন্থ ও মহাকাব্যের আলোকেই তৎকালীন নারীর অবস্থানকে ব্যাখ্যা করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য আচার আচরণগুলি ছিল মূলত পুরুষ সর্বস্ব, যেখানে সহধর্মিনী হিসাবে নারী ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারলেও তার সামাজিক জীবনের ধারা স্বেচ্ছাধীনভাবে প্রবাহিত হতে পারত না। এজন্য ব্রাহ্মণ সমাজে বহু নীতিও নির্ধারিত হয়েছিল। এই সময় থেকে স্ত্রী হিসাবে নারীর ভূমিকাই সমাজে সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে, ঋগ্বেদে বিবাহ নামক প্রতিষ্ঠানটিকে গার্হস্থ্য জীবন প্রবেশের দ্বার রূপে বর্ণনা করা হয়। শিক্ষার উপরেও ধীরে ধীরে পুরুষের (বলা শ্রেয় উচ্চবর্ণের পুরুষের) একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। যদিও বৈদিক যুগের প্রথমদিকে নারীও সমানভাবে শিক্ষা লাভের অধিকারিনী ছিলেন এবং সে যুগে গার্গী, লোপামুদ্রা, অপালা প্রমুখরা জ্ঞানচর্চার প্রথিকৃৎ হয়ে উঠেছিলেন, কিন্তু সমাজে এঁদের সংখ্যা ছিল যথেষ্ট কম। পরবর্তী ঋগ্বৈদিক যুগে নারীর সামাজিক অধিকারগুলি সীমিত হয়ে পড়ে ও সে কোন না কোনভাবে পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। তাই বৈদিক ধর্মসূত্র থেকে শুরু করে পুরাণে বারংবার যে বিষয়টি উচ্চারিত হয়েছে তা হল, ''পিতা রক্ষাতি কৌমারে, ভর্তা রক্ষত যৌবনে। রক্ষন্তি স্থবিরে পুত্র ন স্ত্রী স্বাতন্ত্রমর্হতি"।

মনুসংহিতায় এক জায়গায় বলা হয়েছে – ''নারীর পক্ষে বিবাহই হল উপনয়ন, পতিসেবা বেদাধ্যায়ন এবং পতিগৃহে বাসই হল গুরুগৃহে বাস।'' শতপথ ব্রাহ্মণ উল্লিখিত আছে কয়েকটি যজ্ঞে স্বামী-স্ত্রী উভয়েরই উপস্থিতি গুরুত্বপূর্ণ। তবে পরবর্তীকালে যাগযজ্ঞে পুরোহিতদের ভূমিকা অধিক বৃদ্ধি পায় এবং বৈদিক ধর্মে যাগযজ্ঞের প্রাধান্য বৃদ্ধি পাওয়ার ফলে নারীর অবস্থানগত অবনয়ন লক্ষ্য করা যায়। ধর্মসূত্র ও ধর্মশাস্ত্রেও নারীর পক্ষে বিবাহের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। মনুর প্রবচন থেকে জানা যায় পুরুষের পক্ষে বংশরক্ষা, ধর্মীয় ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ, মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ ও পূর্বপুরুষকে সন্তুষ্ট করার জন্য দার পরিগ্রহ করা প্রয়োজন। যাজ্ঞবল্ক্যেও এই একই বক্তব্য লক্ষ্য করা যায়, যেখানে বলা হয় সন্তান সন্ততির জন্মদানের মধ্য দিয়েই যথার্থ স্বর্গলাভ সম্ভব, এবং নারী সেখানে সন্তানকে গর্ভে ধারণের মাধ্যম। সুতরাং নারীর পক্ষে বিবাহ একান্ত আবশ্যিক ছিল। থেরিগাথায় কিন্তু এর বিপরীত চিত্রই পাওয়া যায়। বহু অবিবাহিত নারী বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করতে পারত।

প্রাচীন ভারতে বিবাহের ক্ষেত্রে ধর্মীয় দিকটিকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হত এবং বিবাহের আচার, মন্ত্রচ্চারণের মধ্য দিয়ে নারীর সাংসারিক কর্তব্যগুলিক্কেই তুলে ধরা হত। গুহ্যসূত্রেও বিবাহকে ধর্মীয় আচার হিসাবেই চিহ্নিত করা হয়েছে। ঋগ্বৈদিক যুগে নারী নিজের সঙ্গী নির্বাচন করতে পারলেও পরবর্তীকালে ধর্মের অনুমোদনক্রমে তার সেই অধিকারও সংকুচিত হয়ে আসে ও ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা হিসাবে 'কল্যাদানে'র রীতি বৈবাহিক আচার আচরণের সাথে একান্তভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। এই সমস্ত ধর্মাচরণেও উল্লিখিত আছে আদর্শ স্ত্রী হিসাবে নিজ ধর্মপালন ছাড়াও নারীর অপর প্রকৃষ্ট কর্তব্য হল পুত্রোৎপাদন করা। অপস্তম্ব ধর্মসূত্রে তাই উল্লিখিত আছে 'পুত্র সন্তানের জন্ম দেওয়াই নারীর প্রধান কর্তব্য'। আবার শতপথ ব্রাহ্মণ অনুযায়ী পুত্র সন্তানের জন্ম দিতে না পারলে স্বামী অনায়াসেই স্ত্রীকে ত্যাগ করতে পারে। বিবাহের ক্ষেত্রে নিজের জন্য পাত্র খোঁজার অধিকার নারীর জন্য সামাজিকভাবে স্বীকৃত ছিলনা। ধর্মশাস্ত্রে বিবাহের নিয়ম স্পষ্ট করে বলা আছে, যেমন – 'সপিন্ড' বিবাহ নিষিদ্ধ বলে বর্ণিত আছে। যাজ্ঞবল্ক্যে এই ধরণের একই পারিবারিক সম্পর্কের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ বলে উল্লেখ করা হয়েছে। মনুর প্রবচনে এই ধরণের বিবাহ শুধু নিষিদ্ধই নয় শাস্তিযোগ্যও বটে। ধর্মশাস্ত্রে উল্লিখিত আছে নারীর পক্ষে বিবাহের রীতি আবশ্যিক তো বটেই, তাকে সামাজিক অনুশাসন মেনেও হতে হবে। বৈদিক ধর্মে আট প্রকার বিবাহের কথা বলা হয়েছে – ব্রহ্ম, প্রজাপত্য, আর্স, দৈব, গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ। লক্ষ্যণীয় বিষয় হল প্রথম চারপ্রকার বিবাহই কেবল সমাজ সিদ্ধ কারণ এই বিবাহের রীতিগুলি ধর্ম দ্বারা অনুমোদিত ছিল এবং বিবাহকালে ধর্মীয় যাগযজ্ঞের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। অপরদিকে শেষ চার প্রকার বিবাহের ধর্মের কোন ভূমিকা ছিল না, যেমন – গান্ধর্ব বিবাহ সংঘটিত হল নারী ও পুরুষের সম্পতিক্রমে একটি চুক্তির মাধ্যমে। তাই ধর্মশাস্ত্রে পরিষ্কার উল্লেখ আছে যদি কোন নারীকে গান্ধর্ব, অসুর, রাক্ষস ও পৈশাচ মতে বিবাহ করা হয় তবে তা সমাজসিদ্ধ হিসাবে পরিগণিত হবেনা। এই চারপ্রকার বিবাহের দ্বারা নারী তার স্বামীর গোত্রে প্রবশাধিকার পাবেনা। অর্থাৎ বিবাহের ক্ষেত্রে নারীর সম্মতির বিষয়টি ছিল গৌণ। এক্ষেত্রে ধর্ম ও কন্যার পিতার অনুমোদনকেই সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হত।

দৈব বৈবাহিক পদ্ধতির সাথে 'দক্ষিণা' প্রদানের বিষয়টি ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিল। বৌধায়ন ধর্মসূত্র দৈব বিবাহের যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করেছে সেখানে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে যজ্ঞের সময়ে কন্যাকে দক্ষিণা বা

দান হিসাবে পুরোহিতকে প্রদান করা হত। বিশ্বরূপের মতে যেহেতু ব্রাহ্মণরাই কেবলমাত্র যজ্ঞানুষ্ঠান পরিচালনা করতে পারতেন সেহেতু এই ধরণের বিবাহ ব্রাহ্মণদের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। তবে একথা সত্য যে ব্রাহ্মণকে 'দক্ষিণা' হিসাবে কন্যাদানের রীতি বৈবাহিক আচারের সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। তবে ধর্মশাস্ত্রে উল্লেখ আছে কন্যা বা পুত্রের ক্রয় বিক্রয় ধর্মসাপেক্ষ নয়। বৌধায়ন উল্লেখ করেছে যে নারীকে ক্রয় করা হয়েছে তাকে কখনোই সহধর্মিনীর মর্যাদা দেওয়া যায়না। কাশ্যপের মতে এই নারী দাসী। বৈদিক ধর্ম গান্ধর্ব বিবাহকে যথেষ্ট সমালোচনা করেছে, কারণ এই ধরণের বিবাহে অভিভাবকের ভূমিকাটিকে কোনভাবেই গুরুত্ব দেওয়া হতনা। একমাত্র কামসূত্রেই এই বিবাহ পদ্ধতিকে আন্তরিকভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। নারী পুরুষ উভয়েই বিবাহে ইচ্ছুক হওয়া সত্ত্বেও তাদের অভিভাবকরা আপত্তি জানালে যে হরণ করার প্রথা প্রচলিত ছিল তার উপর ভিত্তি করে দাঁড়িয়ে ছিল রাক্ষস ধরনের বিবাহ। মনুর মতে ক্ষত্রিয়দের মধ্যে গান্ধর্ব ও রাক্ষস ধরণের বিবাহ ধর্মসাপেক্ষ।

অধ্যাপক এ. এস আলতেকর সমাজ তথা বৈদিক ধর্মের পরিকাঠামো নারীর অবস্থান বিশ্লেষণ করতে গিয়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রথার উপর আলোকপাত করেছেন। ঋগ্বৈদিক যুগের পরবর্তী সময়ে সতীদাহ প্রথাটি সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়ে ওঠে। তবে আলতেকরের মতে, সহমরণ বা সতীদাহ প্রথার সূচনা সম্ভবতঃ প্রাগার্য সময় থেকেই। তিনি বর্ণনা করেছেন আর্যদের মধ্যে প্রথমদিকে এই প্রথার অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়না। ঋক্‌বেদে এই সংক্রান্ত কোন মন্ত্র উচ্চারিত হয়নি। তবে অথর্ববেদে সতীদাহ, বহুপতিত্ব ইত্যাদি বেশ কিছু অপ্রচলিত রীতি নীতির উল্লেখ পাওয়া যায়। সম্ভবত অর্য-প্রাগার্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের শেষ পর্বে অথর্ববেদ রচিত হয়। ফলতঃ এই প্রথাগুলির অস্তিত্ব প্রাগার্য সমাজেই লক্ষ্য করেছিল অথর্ববেদ। ৫০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় সমাজে এই প্রথাটি প্রচলিত ছিলনা, কারণ মেগাস্থিনিস ও কৌটিল্যের রচনায় এর কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়না। যদিও মহাভারতে এই প্রথা সম্পর্কিত কিছু উল্লেখ আছে। কিন্তু তখনো পর্যন্ত এই প্রথায় অংশগ্রহণ করা বা না করা ছিল নারীর স্বেচ্ছাধীন, তখনো পর্যন্ত এই প্রথা নারীর পক্ষে বাধ্যতামূলক হয়ে ওঠেনি। ৪০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে সতীদাহ প্রথাটির অস্তিত্ব প্রকট হয়ে ওঠে। 'স্মৃতি রচয়িতারাও এর উল্লেখ করেন। ক্রমে নারীর পক্ষে সহমরণ হয়ে ওঠে স্বামীর চিতায় আত্মনিবেদনের একটি গৌরবান্বিত পথ। প্রকৃতপক্ষে সমাজে সম্পত্তির ধারণা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠার ফলে সতীদাহ প্রথাটি স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ থেকে সামাজিকভাবে স্বীকৃত কঠোর ধর্মীয় রীতিতে পরিণত হয়। স্মৃতি রচয়িতারা উল্লেখ করেন বিধবাদের সম্মুখে দুইটি পথই খোলা, স্বামীর চিতায় আত্মহুতি দানের মধ্য দিয়ে চিরসতীত্ব লাভ অথবা বহুবিধ আচার আচরণ পালনের মধ্য দিয়ে কঠোর সংযমের ব্রত পালন। অথচ ঋগ্বেদে স্পষ্ট উল্লেখ ছিল স্বামীর মৃত্যু হলে সেই নারী স্বামীর ভ্রাতা বা জ্ঞাতি সম্পর্কিত কাউকে বিবাহ করতে পারে। অর্থাৎ পরবর্তীযুগে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির অবনয়ন ঘটিয়ে নারীর উপর নানাবিধ ধর্মীয় অনুশাসন চাপানো হয়। ২০০ খ্রীষ্টাব্দ থেকে বিধবা বিবাহের বিষয়টি সমাজে হ্রাস পায় ও বিষ্ণু বিধবাদের জন্য কঠোর সংযম পালন করতে বলে। মনুতে উল্লিখিত আছে স্বামীর মৃত্যুর পর বিধবাদের পক্ষে দ্বিতীয়বার বিবাহের বিষয় সম্পর্কে ভাবাও উচিত নয়। নারদ স্মৃতিতে বলা হয় নারী একবারই বিবাহের উপযোগী। যদিও এক্ষেত্রে নারদ স্মৃতিতে উল্লেখ করা হয় ব্রাহ্মণদের মধ্যে বিধবা বিবাহের দৃষ্টান্ত হ্রাস পেলেও, অন্যান্য বর্ণের মধ্যে এর

প্রচলন আছে। উদাহরণ হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের (৩৭৫ - ৪১৪ খ্রীঃ) কথা, যিনি জন্মসূত্রে বৈশ্য ছিলেন, তিনি জ্যেষ্ঠভ্রাতার মৃত্যুর পর তাঁর বিধবা পত্নীকে বিবাহ করেন। কুমারগুপ্ত ছিলেন তাঁদের সন্তান এবং তাঁর সিংহাসনে আরোহন ধর্মের অনুমোদনক্রমেই ঘটেছিল।

পুরুষের বহুবিবাহের অধিকার বৈদিক ধর্মের স্বীকৃতি লাভ করলেও নারীর ক্ষেত্রে তা ছিল না। মহাভারতেই কেবলমাত্র দ্রৌপদীর উপাখ্যানে পঞ্চপতির উল্লেখ পাওয়া যায়। যদিও সেখানে অনেক ক্ষেত্রে দ্রৌপদী দ্বারা পঞ্চপতী গ্রহণের বিষয়টি নিন্দিত হয়েছে। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ পর্বে দুঃশাসন দ্রৌপদীকে 'সাধারণী' বা গণিকার সাথে তুলনা করেছেন। অপস্তম্ভ ধর্মসূত্রে প্রথাটির সূত্র সন্ধান করতে গিয়ে 'নিয়োগ' প্রথাটি করা হয়েছে, যেখানে সন্তান উৎপাদনের জন্য নারীকে কোন ব্যক্তির কাছে পাঠানো হত। মহাভারতেও নিয়োগ উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়। যদিও মনু ও যাজ্ঞবল্ক্যের সমগ্র রচনায় এর কোন উল্লেখ নেই। সম্ভবত আর্য সমাজের এই অচিরাচরিত প্রথাগুলি তখন বিলুপ্তির পথে, কারণ যৌনতাকে ইতিমধ্যেই বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মধ্য দিয়ে নিজস্ব প্রচেষ্টা সূচিত হয়েছে। কালক্রমে নারীর ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের অধিকারও সীমিত হয়ে আসে। সমাজে শুচি, অশুচি ইত্যাদি বিষয়গুলি মুখ্য হয়ে ওঠে। ঋগ্বেদের সময় থেকেই ঋতুকালীন অবস্থায় নারীরা অস্পৃশ্য বলে বিবেচিত হত। পরবর্তীকালে অপরিচ্ছন্নতা অস্পৃশ্যতা ইত্যাদি বিষয়গুলি আরো প্রকট হয়ে গর্ভবতী মহিলারাও কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণে অধিকারী ছিলেন না। এই প্রকার বিবিধ ধর্মীয় রীতিকে কেন্দ্র করে নারী সমাজের মূলস্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

প্রাচীন ভারতের পটভূমিকায় নারীর সামাজিক জীবন যে কেবলমাত্র ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত তাই নয়, ধর্মের সাথে যুক্ত নানান প্রতিষ্ঠান ও রীতিনীতি নারীকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার করার অধিকারীও ছিল। এই বিষয়টি সম্ভবতঃ প্রাচীন ভারতে 'দেবদাসী' প্রথার বিকাশ ঘটিয়েছিল। ধর্মগ্রন্থে দক্ষিণা প্রদানের যে উল্লেখ বারংবার পাওয়া যায়, সেখানে বস্তুসম্ভারের তারিসায় হস্তী, অশ্ব, রথ, ভূমি ও নানাবিধ অলংকারের সাথে নারীর উল্লেখও পরিলক্ষিত হয়। যজ্ঞের পুরোহিতকে এই দক্ষিণা প্রদান করা হত। এই নারীরা সকলেই ছিলেন ভোগ্যা। সুকুমারী ভট্টাচার্য্যের মতে এঁদের বেশীরভাগেরই স্থান হত গণিকালয়ে। অথবা এরা ক্রীতদাসী হিসাবে জীবন নির্বাহ করত। পূণ্যার্জনের জন্য সুন্দরী নারী কিনে দেবালয়ে দান করা হত। এরা দেবদাসী হিসাবে ঈশ্বর ও মন্দিরে আগত উচ্চবর্ণের পুরুষদের সেবায় নিয়োজিত থাকতেন। দুঃস্থ পিতামাতার কন্যাদের ক্রয় করে দেবতার উদ্দেশ্যে মন্দিরে দান করা হত। আবার অনেক সময়ে দেবদাসীদের কন্যারাই বংশপরম্পরায় মন্দিরের সাথে যুক্ত থাকতেন। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র, কালিদাসের রচনায় এদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এরা নৃত্যগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে মন্দিরে একটি স্বতন্ত্র সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল রচনা করেছিলেন। দক্ষিণভারতে ভারতনাট্যম নৃত্যের সূচনা হয়েছিল সম্ভবত এই দেবদাসী প্রথাকে কেন্দ্র করেই। এই দেবদাসীদের আকর্ষণে মন্দিরে বহু লোক সমাগম হত। ধর্মের বকলমে এই প্রকার একটি প্রথাকে সমাজ পরিপুষ্ট করে তুললেও, ব্রাহ্মণ্যধর্ম কখনোই এই গণিকাদের সামাজিক পরিকাঠামোয় আস্থস্থ করেনি, বরং ধর্মশাস্ত্রকারগণ গণিকাসংসর্গে পাপের উল্লেখ করেছেন (বিষ্ণুপুরাণ, অত্রিসংহিত পরাশর সংহিতা)। অথচ প্রাচীন ভারতে এই দেবদাসীদেরই মন্দির তথা দেবতার উদ্দেশ্যে ভূমিসহ অন্যান্য সম্পত্তি দান করতে দেখা যায়।

১২.২.৩.২ ঃ গণিকা

গণিকা প্রথাটি ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে একটি অতিপ্রাচীন পেশা হলেও, সমাজ বা ধর্ম বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই নিজের প্রয়োজনে এর সাথে যুক্ত নারীদের ব্যবহার করেছে, কিন্তু এদের সামাজিক মর্যাদার প্রশ্নে ভারতীয় সমাজ হয় নিশ্চুপ অথবা সমাজের মূলস্রোত থেকে এদের বিচ্ছিন্ন করার বিধান দিয়েছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্মে ভারতীয় সমাজকে যে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল সেখানে গণিকাদের প্রবেশাধিকার নিষিদ্ধ ছিলনা। এই পেশার সাথে যুক্ত অনেকেই তার বৌদ্ধধর্মের আশ্রয়ে সামাজিক মর্যাদার সন্ধানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। বৈশালির প্রখ্যাত গণিকা আম্রপালি, বারাণসীর সামা, সিরিমা, সুলসা, সালবতী এই প্রকার অসংখ্য গণিকার উল্লেখ পাওয়া যায় বৌদ্ধসাহিত্যে, যাঁরা এই ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। চৌষট্টি কলায় পারদর্শী এই নারীরা সামাজিকভাবে সর্বজনের দ্বারা গ্রহণীয় না হলেও, এদের জীবন ছিল ধন ও ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ। কিন্তু শেষ জীবনে বহুক্ষেত্রেই এরা সমস্ত ঐশ্বর্য ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মের প্রতি আত্মনিবেদন করেন ও সম্পত্তির একটি বড় অংশ দান করেন বৌদ্ধ মঠ ও সংঘগুলিকে।

১২.২.৩.৩ ঃ মাতৃ-আরাধনা

প্রাচীনকাল থেকেই ভারতবর্ষে অন্যান্য প্রাচীন সংস্কৃতির মতো যে মাতৃ আরাধনার গৌরবজ্জ্বল ঐতিহ্য ছিল তার উপর আলোকপাত করেন। প্রকৃতি ও পুরুষের মিলনের মধ্যেই লুকিয়ে সৃষ্টির আদিম রহস্য, যা তান্ত্রিকতাবাদের মূল নির্যাস, তার মধ্য দিয়েই সম্ভবত অনুধাবন করা যায়, ভারতে মাত আরাধনার স্বরূপটি। ভারতীয় দর্শন, সাহিত্য, শিল্প ও সর্বোপরি ধর্ম -এর প্রভাব মুক্ত নয়। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে কৃষিজ অর্থনৈতিক অবস্থা প্রাথমিক স্তরে এখানে মাতৃতান্ত্রিক পরিকাঠামোর অস্তিত্ব থাকলেও, বৈদিক যুগের পশুচারী যাযাবর সম্প্রদায়ের সমাজ ছিল প্রধাণত পুরুষতান্ত্রিক। এই মাতৃপ্রধান সমাজ ক্রমেই অবদমিত হয় পুরুষ প্রাধান্যের দ্বারা, বৈদিক দেবলোকও একান্তভাবে হয়ে ওঠে পুরুষ প্রধান। নারী কেবলমাত্র তখন দেবতাদের সঙ্গিনী মাত্র, (আনি প্রত্যয় যোগে ইন্দ্রাণী বরুণানী) তার নিজস্ব কোন পরিচয় নেই। ঋগ্বেদে উল্লেখযোগ্য দেবী বলতে অদিতি এবং ঊষা। অদিতি ঋগ্বেদে প্রায় সর্বত্রই আদিত্যজননী হিসাবে বর্ণিত। অপরদিকে কোশাম্বির মতে উষা মাতৃদেবী হলেও "তার স্থান বৈদিক দেবলোকে নয়" — বরং তিনি হলেন সিন্ধু সভ্যতার মাতৃদেবী। ঋগ্বেদের চতুর্থ মণ্ডলের একটি সূক্তে ইন্দ্রের দ্বারা উষার আক্রান্ত ও ধর্ষিত হওয়ার যে কাহিনী বর্ণিত আছে তা আমাদের এই সিদ্ধান্তে আসতে সাহায্য করে পুরুষ প্রধান বৈদিক ধর্মের দ্বারা সিন্ধু সভ্যতার মাতৃপ্রধান ধর্মবিশ্বাস আক্রান্ত ও অবদমিত হয়েছিল ও 'মাতৃ' রূপটি সুপ্তভাবে উপজাতিক বিশ্বাসের মধ্যে কোনক্রমে টিকে ছিল। পরবর্তীকালে এই মাতৃত্বের ভাবমূর্তি নানারূপে নানাধর্মের মধ্য দিয়ে প্রকটিত হয়েছে।

বহু ঐতিহাসিকের মতে এই মাতৃ আরাধনার বিষয়টি বহুক্ষেত্রেই উর্ব্বরতা, উৎপাদন ইত্যাদি বিষয়ের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত। দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় এক্ষেত্রে হরপ্পার সীলে শাকম্ভরীর উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে দেবী বলতে এখানে বসুমাতা বা পৃথিবী। শাকাদি বা উদ্ভিদ মার গর্ভপ্রসূত। নারী এক্ষেত্রে উৎপাদনের

একটি মাধ্যম হিসাবে কল্পিত হলেও পরবর্তীকালে তার অবস্থানের যে অবনয়ন ঘটে তা বৈদিক যুগের সামাজিক ও ধর্মীয় পরিকাঠামোর দ্বারা পরিস্ফুট হয়। এমনকি দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের মতে ঋগ্বেদের "দেবীসুক্ত" অনেক পরবর্তীযুগে রচিত হলেও একে কৃত্রিমভাবে ঋগ্বেদের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। এখানে মূলতঃ শক্তির আরাধনা করা হয়েছে। বলা যায় আকস্মিকভাবে কোন একদিন দেবী মাহাত্ম্যের ধারণাটি গড়ে ওঠেনি। এটি আর্য ও প্রাগার্য সংস্কৃতির মিশ্রণ ও সামাজিক ক্রমবিবর্তনের একটি ফসল।

বৈদিক যুগে অপর দুই প্রকার মা -এর সন্ধান আমরা পাই। একদিকে সরস্বতী বা যিনি জ্ঞানের দেবী হিসাবে বর্ণিত। অপরদিকে ঐশ্বর্য সমৃদ্ধির দেবী লক্ষ্মী। অর্থাৎ বৈদিক সমাজে পুরুষ স্বীকৃত হলেও নারীর বিভিন্ন রূপ ও তার প্রকাশ তারা একেবারে অস্বীকার করতে পারেনি।

বৈদিক ধর্ম ছাড়া ও অন্যান্য অপ্রধান ধর্মীয় ও লৌকিক বিশ্বাসে মাতৃ আরাধনা প্রচলিত হয়। বৌদ্ধ রচনায় 'সিরি লক্খী" -র উল্লেখ পাওয়া। অপরদিকে প্রজ্ঞাপারমিতার ধারণাটি জ্ঞানের সাথে নারীত্বের সংযোগের বিষয়টিকেই আরো গভীরভাবে প্রথিত করতে সচেষ্ট হয়েছিল এই বিভিন্ন ধরণের সাংস্কৃতিক অভিঘাত ও চাহিদার মধ্য দিয়ে মহিষাসুরমুর্দিনী অসুর ঘাতিনী দেবীরূপটির আত্মপ্রকাশ ঘটে। শুধু দেশীয় ও বৈদেশিক ধর্মীয় উপাদানও এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। তবে দেবীর এইরূপ যে সমাজে চরম আদরণীয় সে বিষয়ে সহজ সিদ্ধান্তে আসা কঠিন। দেবী, মানবীর ভাবনা থেকে সম্পূর্ণ পৃথক স্তরে চিন্তনীয় এমনকি ব্রাহ্মণ্য শৈব বা বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনাতেও দেবী অলৌকিক এবং মানবী সম্পর্কে সমাজের শাস্ত্রানুগ ধারণার প্রায় বিপ্রতীপ বললেও চলে।

প্রকৃতপক্ষে ভারতবর্ষে মাতৃদেবীর ধারণার যে বিকাশ তা ছিল একটি জটিল পদ্ধতি। বহু যুগের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক সংঘর্ষ দ্বারা লালিত ধর্মবিশ্বাস ও সামাজিক নৈতিকতা দ্বারা সম্পৃক্ত হয়ে এই ধারণাটি বিকাশ লাভ করেছিল। সময়ের অভিঘাত ও সামাজিক ক্রমবিবর্তন নারীত্বের এই ধারণাটিকে কখনো নিয়ে গেছে বিলয়ের পথে, কখনো আবার নতুন রূপে তাকে প্রতিষ্ঠা করতে তৎপর হয়েছে।

বর্তমানে আমরা আঞ্চলিক ও লৌকিক দেবী আরাধনার মধ্য দিয়েও এর আভাস পাই। যেমন – সন্তোষীমাতা, মা শীতলা, বনবিবির আরাধনার মধ্য দিয়ে প্রাকৃতিক বা সামাজিক প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই -এর প্রচেষ্টাই পরিলক্ষিত হয়। অর্থাৎ ভারতীয় ধর্মচেতনায় নারীত্বের এইরূপগুলির বিকাশের ধারাকে পর্যালোচনা করতে হলে তৎসম্পর্কিত সমাজ বিকাশের ধারা সম্পর্কেও অবহিত হওয়া প্রয়োজন, কারণ এই সংক্রান্ত ঐতিহাসিক পর্যালোচনা ভারতীয় ধর্মচেতনায় নারীত্বের সংজ্ঞা নির্ধারণের পাশাপাশি, ভারতীয় সভ্যতার নানা পর্যায়ে নারীর অবস্থান সম্পর্কেও আমাদের সচেতন করে তোলে, যার গুরুত্ব অপরিসীম।

১২.২.৩.৪ ঃ জৈন ধর্মে নারী

জৈন ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে শাস্ত্র ও চর্যাগত বিতর্কের সূত্রপাত ঘটেছিল সম্ভবত মহাবীরের মৃত্যুর কিছুকাল পর থেকেই। কিন্তু শেষ অবধি খ্রীষ্টপূর্ব-তৃতীয় শতকে দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের উদ্ভব ঘটেছিল জৈন ধর্মের মধ্যে বিভাজন ঘটিয়ে। ঘটনাটি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের শাসনকালে ঘটেছিল এবং মহামতি ভদ্রবাহু তখন জৈন ধর্মের প্রধান তাত্ত্বিক ছিলেন। এই বিভাজনের প্রথম সাহিত্যিক উল্লেখ পাওয়া যায়

খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে প্রাকৃত ভাষায় রচিত কুণ্ডুকুণ্ডের **'সুত্তপাহুদা'** গ্রন্থে। এই দুই সম্প্রদায় একে অপরের তত্ত্বগত অবস্থান ও শাস্ত্র ব্যাখ্যার সিদ্ধতা অস্বীকার করে এবং এদের মধ্যে দ্বন্দ্বের মূল বিষয় ছিল দীক্ষিত জৈন শিষ্যদের বস্ত্রপরিধানের প্রশ্নকে ঘিরে। স্বাভাবিকভাবেই যেহেতু সে সময়ে ভিক্ষুণীরাও জৈন ধর্মে প্রবেশ করেছেন বস্ত্র পরিধান এবং তার সাথে সাথে স্ত্রী-নির্বাণ অথবা স্ত্রী-মোক্ষ বিষয়টি নিয়ে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। বস্তুত এই বিতর্ক সংক্রান্ত নানা বিষয় ও মতামত যেভাবে জৈন সাহিত্যে ব্যাখ্যাত হয়েছে সেই সূত্র ধরেই জৈন ধর্মের চোখে নারীর অবস্থান সম্পর্কে চিন্তাধারা সম্বন্ধে জানতে পারা যায়।

প্রথমত বস্ত্র পরিধানের ক্ষেত্রে বিতর্কটি যেভাবে এগিয়েছিল তা লক্ষ্য করা যাক। এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে একটি বিষয়ে সিদ্ধান্ত একই ছিল – সে মহাবীর নিজে অচেলক বা চেলিহীন অবস্থাতেই থাকতেন। কিন্তু শ্বেতাম্বর মতে সে সময়েও বস্ত্র পরিধান বা নগ্নভাব গ্রহণ সম্পর্কে শিষ্যদের নিজস্ব বিচারই বহাল থাকত শারীরিক চর্যা বা উপবাস সম্পর্কেও শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় এই মতামতেই বিশ্বাসী ছিলেন। অন্যদিকে দিগম্বর সম্প্রদায় নগ্নতা ও মুনি-লিঙ্গ উন্মুক্ত রাখাই ধর্মচর্যার মুখ্য বৈশিষ্ট্য রূপে গ্রহণ করেছেন। তাঁরা মহাবীরের 'নগ্নভাব' সংক্রান্ত ধর্মাদর্শের প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত সামনে রেখে তাকেই মোক্ষলাভের মূল উপায় রূপে স্বীকৃতি দিয়েছেন। শ্বেতাম্বর মতে মহাবীরের সময়কালে যে চর্যা সম্ভব ছিল তা সমকালীন সময়ে (খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতক) পালন করা সমীচীন নয়। তাঁদের শাস্ত্রে এও দাবী করা হয় যে মহাবীরের মৃত্যুর পরে পরেই নগ্নতা চর্যা অপ্রচলিত হয়ে গিয়েছিল এবং পরিবর্তিত সময়ে, নতুন সমাজ ব্যবস্থায় সেই চর্যার পুনঃপ্রচলন যথাযথ নয়। এই ব্যাখ্যায় – বরং দিগম্বর জৈনরা যে 'নগ্নভাব' কে পুনরায় প্রচলিত করলেন তা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলে দাবী করা হল।

স্পষ্টতই 'নগ্নভাব' চর্যার এই বিষয়টি ভিক্ষুণী বা শ্রবিকা'র ধর্মীয় স্বীকৃতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ছিল। দিগম্বর জৈনরা ভিক্ষুণীদের বস্ত্রাবৃত থাকার কড়া নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং এর অবশ্যম্ভাবী ফলস্বরূপ তাঁদের মতে ভিক্ষুণীগণ মোক্ষলাভের অনুপযুক্ত প্রমাণিত হলেন। ভিক্ষুণীদের যদিও আর্যিকা, সাধ্বী ইত্যাদি নানা সম্মানজনক অভিধা দেওয়া হত কিন্তু তাঁরা ভিক্ষু সম্প্রদায়ের গুরুত্বপূর্ণ অংশের অন্তর্ভুক্ত বলে স্বীকৃতি পাননি। কেবলমাত্র কুমারী এবং সাধনার পথগামী উৎকৃষ্ট শ্রবিকা রূপেই তাঁরা মর্যাদা পেতেন। শ্বেতাম্বর ভিক্ষুদের প্রতিও একই কারণে দিগম্বর ধর্মাবলম্বীগণ এই মত পোষণ করতেন। কি স্ত্রী কি পুরুষ - বস্ত্র পরিত্যাগ না করতে পারলে দেহ ও মনের মধ্যে অন্তর্নিহিত যৌনতা যা কিনা লজ্জার মধ্য দিয়ে প্রকাশ পায় – দূর হয় না।

অন্যদিকে শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় যেহেতু বস্ত্রকে সাংসারিক সম্পদ বলে গণ্য করেনি বরং ধর্ম উপকরণ বলেই গ্রহণ করেছে তাই ভিক্ষুণীদের বস্ত্রপরিধানের নির্দেশ দিলেও তাঁদের ভিক্ষুদের মত একইরকমভাবে মর্যাদা দেওয়া হত এবং মোক্ষলাভের পূর্ণ অধিকার ও স্বীকৃত হয়েছে।

আদিতে মোক্ষলাভের ক্ষেত্রে নিগ্রন্থি চর্যা প্রধান বিধিরূপে গণ্য হওয়ায় নারীর মোক্ষলাভ সংক্রান্ত বিষয়টি আলোচনাতেই আসেনি। কিন্তু নারী সম্পর্কে মতামত ব্যক্ত হয়েছে নানাভাবে। মহাবীরের বক্তব্য অনুযায়ী সমাজে নারীর নগ্নতা স্বীকার্য নয় সুতরাং নারীর মোক্ষলাভও সম্ভব নয়। মহাবীর এও বলেছেন যে নারী পৃথিবীর সবচাইতে বড় মোহের কারণ এবং জৈন ভিক্ষুগণের প্রতি তাঁর কঠিন নির্দেশ ছিল নারীর সাথে বাক্য বিনিময়, তাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত বা সম্পর্ক স্থাপন অথবা তাঁদের জন্য কোনরূপ কর্মসাধন

থেকে বিরত থাকার। নারীর সংশ্রব সাধনার পথে চরম বিপত্তিরূপে গণ্য করেছেন বৌদ্ধ ও জৈন – এই দুই ধর্মেই। তার সবচাইতে বড় কারণ হিসাবে ব্রহ্মচর্যার উপর গুরুত্ব আরোপের প্রথাকেই চিহ্নিত করা যায়। এই বিশেষ কারণেই বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মে নারী এবং বিশেষত নারীদেহের প্রতি তীব্র ঘৃণা ও অনীহা সৃষ্টির প্রয়াস লক্ষ্য করা যায়। দিগম্বর জৈন মতে নারী স্বভাবতই ক্ষতিকারক। নারীর রজস্বলা অবস্থার প্রতি ঘৃণাজনিত নানা বক্তব্য জৈন শাস্ত্রীয় সাহিত্যে পাওয়া যায়। কুণ্ডকুণ্ড রচিত সুত্তপাহুদাতে নারীদেহের অপবিত্রতা সম্পর্কে স্পষ্ট মতামত ব্যক্ত হয়েছে। বলা হয়েছে নারীর যৌনাঙ্গ, নাভি ও বক্ষদেশে নানা জীবাণুর জন্ম হওয়ার কারণে নারীর মধ্যে চিত্তচাঞ্চল্য ও যৌনভাবের উদ্রেক হয়। তাঁরা প্রতি মাসে রজস্বলা হন এবং সাধনার ক্ষেত্রেও পরিপূর্ণভাবে ভীতিমুক্ত হতে পারেন না। সুত্তপাহুদার এই মত মূলত দিগম্বর সম্প্রদায়ের দৃষ্টিভঙ্গিই তুলে ধরেছে।

সাহিত্যিক সূত্র ধরে দেখলে দিগম্বর সম্প্রদায়ের এই ধরণের মতামতের বিরোধীতা সর্বপ্রথম লক্ষ্য করা যায় – শ্বেতাম্বর নয় – জপনীয় নামক একটি স্বল্প মত সম্প্রদায়ের শাস্ত্রীয় ব্যাখ্যায়। সম্ভবত এই সম্প্রদায়টির উদ্ভব ঘটেছিল খ্রীষ্টিয় শ্লোক ও স্বোপজ্ঞাবৃত্তি টীকা সম্বলিত ''স্ত্রী নির্বাণ প্রকরণ'' নামক শাস্ত্রীয় গ্রন্থে। এই সম্প্রদায়ের মতে যৎসামান্য বস্ত্রাবরণ মোক্ষলাভের অন্তরায় নয় – যদিও ভিক্ষুদের ক্ষেত্রে নিরাবরণতাই সাধারণ রীতি রূপে প্রচলিত। নারীরা একবস্ত্রাবৃত থাকবেন এবং তার জন্য তাঁরা মোক্ষলাভ থেকে বঞ্চিত হবেন না।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের সাথে জপনীয় সংঘের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল এবং দেখাই যাচ্ছে পরবর্তীকালে দিগম্বর সম্প্রদায়ের সাথে পরিব্রজ্যালাভের ক্ষেত্রে 'নগ্নভাব' এর বিরোধীতায় তাঁরা বক্তব্য রেখেছিলেন জপনীয় সম্প্রদায়েরই অনুসরণ করে। শ্বেতাম্বর দার্শনিক যথা হরিভদ্র (৭৫০ খ্রীষ্টাব্দ), অভয়দেব (১০০ খ্রীঃ), শান্তিসুরি (১১২০ খ্রীঃ), মলয়গিরি (১১৫০ খ্রীঃ), হেমচন্দ্র (১১৬০ খ্রীঃ) প্রমুখ এই বিতর্ক জারী রেখেছিলেন, তাঁদের রচনায় তার প্রমাণ রয়েছে। অপরদিকে দিগম্বর তাত্ত্বিকদের মধ্যে ছিলেন বীরাসন (৮০০ খ্রীঃ), দেবসেন (৯৫০ খ্রীঃ), নেমিচন্দ্র (১০৫০ খ্রীঃ), প্রভাবচন্দ্র (৯৮০ - ১০৬৫ খ্রীঃ), জয়সেন (১১৫০ খ্রীঃ) প্রমুখ নারী জন্মগতভাবে পুরুষের থেকে হীন অর্থাৎ 'হীনত্বৎ'। তাঁরা পুরুষের মত তাঁদের বস্তু সম্পদ তথা বস্ত্র ত্যাগে অসমর্থ বিতর্ক ইত্যাদি নানা বিদ্যায় পারদর্শীতাহীন; ধর্মীয় শাস্ত্র ও সামাজিক বিধিমতে মর্যাদাহীন এবং সর্বোপরি নিকৃষ্টতম পাপকর্মজনিত অপরাধে অপারগ, এই শেষ কারণে তাঁরা সবথেকে নিকৃষ্ট সপ্তম নরকলোকে কখনোই গমন করতে পারেন না। দিগম্বর সম্প্রদায়ের অদ্ভুত বিচারে এই একই যুক্তিতে নারীর এই অক্ষমতার অপরদিকে তাঁদের চরম উৎকৃষ্ট পুণ্য অর্জনে অক্ষমতার কথাও বলা হয়েছে, এবং তার ফলে সৎকর্মজনিত কারণে সর্বার্থসিদ্ধি স্বরূপ উত্তর স্বর্গলাভ থেকেও তাঁরা 'যুক্তিপূর্ণভাবেই' বঞ্চিত।

শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় দিগম্বর দার্শনিকদের মতোই বিশ্বাস করেন যে নারী স্বভাবগতভাবেই হীনতম পাপকর্মে লিপ্ত হতে অক্ষম সুতরাং তাঁরা সবথেকে নিম্নে অবস্থিত সপ্তম নরকলোকে গমন করেন না। কিন্তু তাঁদের মতে নারী স্বর্গের পুণ্য সাধনে সক্ষম এবং ফলত সর্বার্থসিদ্ধি রূপ উৎকৃষ্ট সাধনালভ্য স্বর্গে গমন করতে পারেন। তবে এই দুই সম্প্রদায়ের বিচারেই নারী পুরুষের মধ্যে নীতিবোধ গত অসামঞ্জস্য স্বীকৃত। এই যুক্তি ধরেই দিগম্বর সম্প্রদায়ের তাত্ত্বিকগণ শ্বেতাম্বর মতকে খণ্ডনে উদ্যত হয়েছেন। তাঁদের

বক্তব্য শ্বেতাম্বর মতে যখন স্বীকার করা হচ্ছে যে নারী চূড়ান্ত পাপ সংগঠনে অসমর্থ এবং সপ্তম নরকলোকে গমন করেন না তখন একই যুক্তিতে এও মেনে নিতে হবে যে চূড়ান্ত পুণ্য অর্জনেও তাঁরা অসমর্থ। সুতরাং নারী সর্বার্থসিদ্ধি ও মোক্ষও অর্জন করতে পারেন না। চূড়ান্ত নৈতিক অবস্থান থেকে চূড়ান্ত উৎকর্ষ ও অপকর্ষ লাভ করা যায়। নারীরা কোন ক্ষেত্রেও এই অবস্থানে পৌঁছন না।

ধর্মীয় বাদানুবাদের সাথে সাথে সাধারণভাবে নারীর চরিত্র ও দেহ সংক্রান্ত নানা ধারণার ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। **কুণ্ডকুণ্ডের** দ্বারা ব্যক্ত নারীদেহ, জীবাণু ও যৌনতা সংক্রান্ত পূর্বে আলোচিত বিষয়টির রেশ টেনে পরবর্তীকালে শ্বেতাম্বর তাত্ত্বিকেরাও বক্তব্য রেখেছেন। খ্রীষ্টয় সপ্তদশ শতকে শ্বেতাম্বর উপাধ্যায় মেঘবিজয় তার রচিত 'যুক্তি প্রবোধ' এ লিখেছেন যে দেহের ঐ সব অংশে জীবাণু জন্মানোর কারণেই নারীরা ঐ অংশ সম্পর্কে সজাগ হন ও পরে সামনা বোধ করেন। মেঘবিজয় দিগম্বর সম্প্রদায়ের নানা মতামত ব্যক্ত করলেও তা খণ্ডনে অনেক ক্ষেত্রেই বিরত থেকেছেন। তবে পুরুষদেহে সাধ্বী তীর্থঙ্কর মল্লি'র বিগ্রহ পূজার সে প্রচলন শ্বেতাম্বর সম্প্রদায় করেছিল – তা সমর্থন করেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় যে মল্লি'র বিগ্রহ পূজার পিছনে শাস্ত্রীয় ও সাধারণ মতামত কাজ করেছিল। শ্বেতাম্বর সম্প্রদায়ের যুক্তি ছিল যে শাস্ত্রমতে নারীর উন্মুক্ত বক্ষদেশ প্রদর্শন বৈধ নয়। সুতরাং দেহ সংক্রান্ত নিষিদ্ধতা দুই সম্প্রদায়ের চোখেই নারী পুরুষের সাম্য স্বীকারের অন্তরায় ছিল। মানবিক ও আধ্যাত্মিক দিক থেকে শ্বেতাম্বররা নারী এগারোটি অতি প্রয়োজনীয় প্রতিম সংস্কারে অঙ্গীকারের সামর্থ্য স্বীকার করেছেন।

সাধারণভাবে প্রাচীন ভারতে সর্বধর্ম মতেই নারীর রজস্বলা অবস্থা অপবিত্র গণ্য হয়েছে। জৈন মতে মনে করা হত যে নারীর মাসিক রক্ত ক্ষরণের ফলে দেহের মধ্যেকার জীবাণুর মৃত্যু ঘটে। চরম অহিংসবাদী জৈনধর্মে নারীদেহের এই জৈবিক প্রক্রিয়াগত হিংস্রতার লক্ষণ নারীর মোক্ষলাভের চরম অন্তরায় রূপে দৃষ্ট, তবে অন্য একটি অপেক্ষাকৃত কুসংস্কার-মুক্ত যুক্তিপূর্ণ মত অনুযায়ী নারী সংসারধর্ম ও শিশুদের লালন পালনের সাথে নিবিড়ভাবে যুক্ত থাকার ফলে সংসার ত্যাগ ও মোক্ষলাভের পথ তাঁদের ক্ষেত্রে যথাযোগ্য নয়।

১২.২.৩.৫ ঃ বৌদ্ধ ধর্মে নারী

খ্রীষ্ট পর্ব ষষ্ঠ শতকের পর থেকে প্রাচীন ভারতের সামাজিক তথা ধর্মীয় ক্ষেত্রে এক বিপুল পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রতিক্রিয়া তথা সামাজিক চাহিদার মধ্য দিয়ে যে অপ্রচলিত ধর্মীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে তা কেবলমাত্র সমাজের প্রান্তিকগোষ্ঠী, যেমন - গণিকাদের প্রতিই নয়, সমাজে নারীর প্রতি স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। উপনিষদের গূঢ়তত্ত্ব যা কখনোই লিঙ্গ বৈষম্যের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠেনি, বরং এক্ষেত্রে জ্ঞান ও ভক্তিকেই পথ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছিল তাতে নতুন মাত্রা যুক্ত করে ভারতে জৈন ও বৌদ্ধধর্মের বিকাশ। বিশেষতঃ বৌদ্ধ ধর্ম কেবলমাত্র নারীকে স্বতন্ত্র সামাজিক মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিতই করেনি, ধর্মীয় জীবনে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণকেও নিশ্চিত করেছিল।

গৌতম বুদ্ধকে "the first urban man" হিসাবে বর্ণনা করা যায়। প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ ঘটেছিল এমন একটি সময়ে যখন ভারতে 'দ্বিতীয় নগরায়ণের' সূচনা হয়েছিল। রাজগৃহ বৈশালি ইত্যাদি

নগরকে কেন্দ্র করে এইসময়-স্বতন্ত্র একটি সাংস্কৃতিক পরিগুল বিকাশ লাভ করে, যেখানে নতুন মাত্রা যুক্ত করে বৌদ্ধধর্মের বিকাশ। প্রাচীন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম থেকে সরে এসে বৌদ্ধধর্ম নারীর প্রতি অনেক বেশী উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। হরনারের মতে বিক্ষিপ্তভাবে হলেও নারী তার কণ্ঠস্বরকে নানাভাবে ধ্বনিত করতে পেরেছিল। এই সময় থেকে কন্যাসন্তানের জন্মকে আর দুঃখের কারণ হিসাবে বর্ণনা করা হত না। সমাজে "মাতা" হিসাবে নারীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, তা কেবলমাত্র সন্তানের জন্মদানের মধ্যে সীমিত ছিলনা। গার্হস্থ্য জীবনে পুরুষের পাশাপাশি সক্রিয়ভাবে নানা কর্তব্য পালন করতে দেখা যায় নারীকে। এমনকি অবিবাহিত মহিলারাও গৃহে ও সমাজে মর্যাদাপূর্ণ ব্যবহার লাভ করতেন। হরনারের মতে বিবাহে ইচ্ছুক ধনী পরিবারের মহিলারা নিজেদের জন্য পাত্র নির্বাচন করার অধিকারী ছিলেন। এই সময় সাধারণের মধ্যে একাধিক বিবাহের প্রচলন ছিলনা। তবে স্ত্রী সন্তানের জন্মদানে অক্ষম হলে স্বামী বহুক্ষেত্রেই দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করতেন। বৌদ্ধধর্ম মহিলাদেরও বিবাহ বিচ্ছেদের অধিকার প্রদন করেছিল। ইসিদাসীর কাহিনিতে বিবাহ বিচ্ছেদের উল্লেখ লক্ষ্য করা যায়।

ভারতবর্ষে নগর সভ্যতার বিকাশ তথা বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তন যে সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ঘটিয়েছিল, তা নারীর সামাজিক অবস্থানকে যথেষ্ট প্রভাবিত করেছিল। তবে এই সময় থেকেই মূলতঃ পুরুষের পাশাপাশি নারীও বৌদ্ধ মঠ সংঘে প্রবেশের মাধ্যমে সংগঠিতভাবে ধর্মীয় জীবনে অংশগ্রহণের অধিকার লাভ করে। সমাজের নানা অংশের প্রতিনিধিত্বকারী মহিলারা সতঃস্ফূর্তভাবে মঠের সংঘজীবনে প্রবেশ করেছিলেন, যেমন – রাজপরিবার ও অভিজাত বংশের মহিলারা, ধনী বণিক পরিবারের মহিলারা, প্রথিতযশা ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলারা, সাধারণ ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলারা দরিদ্র ব্রাহ্মণ পরিবারের মহিলারা অন্যান্য বর্গের অন্তর্ভুক্ত মহিলাগণ ও সর্বোপরি গণিকা পেশার সাথে যুক্ত একটি অংশ এই ধর্মের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। মহিলাদের সংঘজীবনে প্রবেশকে কেবলমাত্র ধর্মীয় আধারে বিচার করলে ভুল হবে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে অনেকের কাছেই এটি ছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজ জীবনের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত হয়ে জ্ঞানের জগতে প্রবেশ, যার উপর এক সময়ে উচ্চবর্ণের পুরুষদের একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত ছিল। সুতরাং বৌদ্ধ ধর্মের হাত ধরে বৌদ্ধ সংঘের ভিক্ষুণীরা একটি স্বয়ংক্রিয় সম্প্রদায় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করে, যদিও তা সম্পূর্ণভাবে পুরুষ নিয়ন্ত্রণ বর্জিত ছিলনা।

এর পূর্বে জৈনধর্মের প্রবর্তক মহাবীরও মহিলাদের জন্য সংঘের দ্বারা উন্মোচিত করেছিলেন। তিনি মহিলাদেরকে তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণের অধিকার প্রদান করেন। কিন্তু পরবর্তীকালে জৈনরা দিগম্বর ও শ্বেতাম্বর এই দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে যায়। দিগম্বরদের দৃষ্টিভঙ্গী ছিল এক্ষেত্রে যথেষ্ট রক্ষণশীল এবং তাঁরা নারীদের সংঘজীবনে প্রবেশাধিকার দেননি, তাঁরা মনে করতেন নারীরা মোক্ষ লাভের উপযোগী নয়। তবে শ্বেতাম্বররা পুরুষের পাশাপাশি নারীকেও সংঘজীবনে স্বাগত জানায় এবং ছত্রিশ হাজার মহিলা জৈন সংঘভিত্তিক জীবনে প্রবেশ করেছিল যা ছিল সংখ্যাগত দিক থেকে পুরুষ শ্রমণদের প্রায় দ্বিগুণ। এই বিষয়টিই প্রমাণ করে অপ্রচলিত ধর্মসংস্কার আন্দোলন তৎকালীন সমাজ জীবনের চাহিদা অনুযায়ী যে বিকল্প পরিকাঠামো নির্মাণ করেছিল তা নারী সমাজকে মুক্তির পথ দেখিয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের আবেদন ছিল এক্ষেত্রে আরো বেশি।

এই ধর্ম যে কতটা সময়োপযোগী ছিল তার সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হল বৌদ্ধধর্ম নারীর শ্রমের অধিকারকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। তাই বোধহয় এই ধর্ম উচ্চবর্গের পরিসীমার মধ্যে আবদ্ধ না থেকে আকৃষ্ট করেছিল সমাজের দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর অংশকে। এই জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ জুড়ে ছিল নারী, যারা গ্রামজীবন থেকে নগরজীবন – এই যে আর্থসামাজিক পরিবর্তন তার সাথে মানিয়ে নেওয়ার ও নিজেদের অস্তিত্বকে কোনক্রমে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা চালাচ্ছিলেন। এরা বৌদ্ধধর্মের দ্বারা সহজেই আকৃষ্ট হন। নানান পেশার সাথে যুক্ত মহিলারা, যেমন – নর্তকী, সংগীত পরিবেশক, গণিকা ও সর্বোপরি দাসীবৃত্তির সাথে যুক্ত শূদ্র মহিলাদের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম যথেষ্ট জনপ্রিয়তা অর্জন করে।

গৌতম বুদ্ধ আস্থা প্রকাশ করেন যে পুরুষের মত নারীও সম্পূর্ণ জ্ঞান লাভে সক্ষম। পুরুষের মত নারীও যদি মুক্তির পথ অনুসরণ করে কঠোর ব্রত পালনের মধ্য দিয়ে তবে সে জ্ঞানদীপ্তির লক্ষ্যে পৌঁছতে পারে। বৌদ্ধ নথিতে এই ধারণার সবিস্তার উল্লেখ পাওয়া যায় –

"Straight' is the name that Road is called, and 'free from fear' the Quarter written thou art bound. *They Chariot* is the 'Silent Runner' named, with wheels of Righteous Effort filled well, conscience the Learning - board; the Drapery is Heedfulness, the Driver is the Dharma, I say, and Right views, they that run before. And be it woman, or be it man for whom such a chariot doth wait, by that same car into Nirvana's presence shall they come".

সুতরাং নারী এক্ষেত্রে শুধুমাত্র জ্ঞান লাভে সমকক্ষই নয়, সে একই পথে মুক্তি লাভের আস্বাদও লাভ করতে পারে। এই কারণেই সম্ভবত বুদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণীদের উভয়ের জন্যই সংঘের দ্বারা উন্মুক্ত করেন। তিনি ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয়কেই নিজের জ্ঞানের দ্বারা সমৃদ্ধ করেছিলেন। এই কারণে অচিরেই তাঁর মহিলা শিষ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়।

তবে পালি সাহিত্য থেকে জানা যায় সংঘ জীবনে প্রবেশের পথটি - নারীদের পক্ষে তত সহজ ছিলনা। যদিও বুদ্ধ স্বয়ং বলেন যে নারীও সন্ন্যাস গ্রহণে সক্ষম, কিন্তু তাঁর বিমাতা প্রজাপতি ও বহু নারীকে তিনি প্রাথমিকভাবে সংঘে প্রবেশের অনুমতি দেননি। কিন্তু তাঁর প্রধান শিষ্য আনন্দ-র আবেদনে তিনি সাড়া দিতে বাধ্য হন। বহু ঐতিহাসিক এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন, তাঁদের মতে এই ঘটনাটিকে পরবর্তীকালে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। বৌদ্ধধর্মে ভিক্ষুণীদের অবস্থানগত অবনয়ঙ্কে যথার্থতা প্রদানের জন্য। সাধারণভাবে বলতে গেলে বুদ্ধ স্বয়ং নারী ও পুরুষকে সমমর্যাদায় স্থাপিত করেছিলেন –

"they are capable" (অনুত্তর নিকয়)। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর বৌদ্ধ সংঘে নারীর মর্যাদা হ্রাস পায় এবং সমাজের নানান নিয়ম তথা বিধানের সাথে সঙ্গতি রেখে সংঘজীবনেও এমন কিছু রীতি নীতি প্রণয়ন করা হয়, যেখানে ভিক্ষুদের প্রতি ভিক্ষুণীদের আনুগত্যকে আবশ্যিক করে তোলা হয়। এই কারণেই হয়তো নানা কাহিনিকে পরবর্তীকালে অন্তর্ভূক্ত করা হয়, কারণ বুদ্ধের মৃত্যুর প্রায় চারশ বছর পর বৌদ্ধ নথিগুলি লিখিত আকারে প্রকাশ হয়। ফলে এই ব্যাপক সময়ের মধ্যে নারীর অবস্থানগত বহু পরিবর্তনকেই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল।

ঐতিহাসিকদের একাংশ এই কাহিনীটিকে সর্বোতভাবে সত্য আখ্যা দিয়েছেন। তাঁদের মতে স্বাধীন প্রতিষ্ঠান হিসাবে ভিক্ষুণীদের সংঘকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে সমাজের সীমাবদ্ধতার বিষয়টি সম্পর্কে তিনি অবগত ছিলেন। এই কারণেই তিনি ভিক্ষুণীদের জন্য স্বতন্ত্র কিছু নিয়ম প্রচলন করেন যেগুলি পালনের মধ্য দিয়ে ভিক্ষুণীদের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রিত হয়েছিল এবং তাঁর বাস্তবক্ষেত্রে ভিক্ষুদের আনুগত্য স্বীকার করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

মহা প্রজাপতি এবং অন্যান্যরা যখন সংঘজীবনে প্রবেশ করার আগ্রহ প্রকাশ করেন তখন বুদ্ধ বলেন যে কেবলমাত্র আটটি প্রধান নিয়ম (Eight Chief Rules) বা Garudharma পালন করলেই তাঁরা সংঘজীবনে প্রবেশাধিকার লাভ করবে। এইভাবে সংঘজীবনে কেবলমাত্র মহিলাদের উপর কিছু বাধ্যবাধকতা বা শর্ত আরোপ করা হয়। কুল্লভগ্য বিনয়ে (Cullavagga Vinaya) উল্লিখিত এই নিয়মগুলি হল –

১। একজন ভিক্ষুণীর পক্ষে ভিক্ষুদের যথাযথভাবে মাথানত করে সম্মান প্রদর্শন একান্তভাবে আবশ্যিক। সে ভিক্ষুদের প্রতি সমস্ত প্রকার ধর্মীয় কর্তব্য প্রতিপালনে বাধ্য।

২। ভিক্ষুদের অনুপস্থিতিতে কোন ভিক্ষুণী একা কোন স্থানে বর্ষাকালে (Vassa) অতিবাহিত করলে, তা গর্হিত অপরাধ হিসাবে বিবেচিত হবে।

৩। অর্ধমাসিকভাবে (arvaddhamasam) যে ধর্মীয় উপাচারগুলি হবে তা পালনের জন্য ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের অনুমতি ও উপস্থিতি প্রার্থনা করবেন। ভিক্ষুদের অনুমোদন ব্যতিত উপসথ আচার (Uposatha Ceremony) পালন সঙ্গত নয়। অপরদিকে Ovada-র মত ধর্মীয় আচরণ পালন ভিক্ষুণীদের প্রতি আবশ্যিক, যেখানে তাঁরা প্রধান আটটি নিয়ম মেনে চলেছেন কিনা তা ভিক্ষুদের দ্বারা বিশ্লেষিত হবে। অর্থাৎ ভিক্ষুক ভিক্ষুণীদের সমালোচনা করতে পারবে। এই ধরণের আচারগুলি পালনের জন্য ভিক্ষুরাই সময় ঠিক করে দেবে।

৪। Vassa বা বর্ষাকালের পর Pavarana নামক আচারটি মধ্য দিয়ে যাচাই করা হবে যে ভিক্ষুণীরা সমস্ত নিয়ম সঠিকভাবে মান্য করেছেন কিনা। সংঘে ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী উভয় সভার সামনে এর বিশ্লেষণ হবে।

৫। কোন ভিক্ষুণীর পক্ষে গর্হিত অপরাধ প্রমাণিত হলে তাকে অপরাধ স্বীকার করতে হবে এবং ('Mannatha') 'মান্যতা' বিধানটি অনুসরণ করতে হবে।

৬। Six Rules বা ষষ্ঠ বিধানের যথাযথ অনুশীলনের মধ্যে দুই দিয়ে বছর পরই ভিক্ষুণীরা উপসম্পদা (Upasampada initiation) -এর উপযুক্ত হয়ে উঠতে পারবে।

৭। ভিক্ষুণীরা ভিক্ষুদের কোন দোষে অভিযুক্ত করতে পারবে না।

৮। ভিক্ষুদের সংঘ পরিচালনায় ভিক্ষুণীদের হস্তক্ষেপ নিষিদ্ধ হলেও, ভিক্ষুণীদের সংঘ পরিচালনায় ভিক্ষুরা হস্তক্ষেপ করতে পারবেন।

অর্থাৎ উপরোক্ত বিধানগুলিই প্রমাণ করে সংঘজীবনেও ভিক্ষুদের তুলনায় ভিক্ষুণীদের অবস্থান নিম্নে ছিল এবং ভিক্ষুদের মত তাঁরা অনিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা ভোগ করতে পারত না। তবে বুদ্ধ কখনোই নারীর জ্ঞান অর্জনের সম্ভাবনার দ্বারা রুদ্ধ করে দেননি, তিনি নারীকেও একটি বিকল্প জীবনের সন্ধান দিতে চেয়েছিলেন। সেক্ষেত্রে তিনি সামাজিক রীতি নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিকে একেবারে অস্বীকার করে দেননি, বরং

তাকে সময়োপযোগী করে তুলে সামাজিক ও ধর্মীয় পরিসরে নারীর যে 'স্থান' তাকে নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত করতে চেয়েছিলেন। এই কারণেই বহু সংখ্যক মহিলা ''শ্রমণা" হিসাবে বৌদ্ধ সংঘে যোগদান করেন। আগুওর নিকযতে উল্লিখিত আছে দুইজন দেবতা বুদ্ধের সম্মুখে আভির্ভূত হয়ে বলেন যে কয়েকজন নারী সমপূর্ণভাবে মুক্তি তথা নিধান (anupadisesa, suvimutta) লাভ করেছেন। সংযুক্ত নিকযতেও নারীর মুক্ত লাভের সপক্ষে যথেষ্ট বক্তব্য পরিলক্ষিত হয়। নারী সম্পর্কে বুদ্ধের দৃষ্টিভঙ্গী আরোও স্পষ্ট হয় জাতকের একটি উপাখ্যানে। যেখানে বর্ণিত আছে পুনর্জন্ম ও দীর্ঘ ক্লেশ ভোগের মধ্য দিয়ে নারী পুরুষ উভয়েই মুক্তি লাভ করে এবং দেবলোকে প্রবেশ করে। সেখানে তারা পরম গৌরব লাভ করে। বাস্তবক্ষেত্রে তৎকালীন নারীর কাছে সংঘজীবনে প্রবেশই ছিল মুক্তি স্বরূপ। সমাজের অন্যত্র যে কোনো জায়গার তুলনায় এখানে তাঁরা অনেক বেশী স্বাধীনতা ভোগ করতেন। তাঁরা নিজেদের সম্প্রদায়ের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতেন। সংঘজীবনে প্রবেশ ছিল তাদের কাছে (Samsara) সংসার থেকে মুক্তির পথ।

মূলতঃ বিনয় পিটক ও মুত্ত বিটক থেকে বৌদ্ধ ধর্মে নারীর অবস্থান বিষয়ক তথ্যগুলি পাওয়া যায়। বিনয় পিটকে ভিক্ষুণীবিভাঙ্গ (Bhikkhunivibhanga) এবং ভিক্ষুনিখন্ডক (Bhikkhunikhandak) -তে শ্রমণাদের যে সমস্ত রীতি নীতি মেনে চলতে হত। সেই সমস্ত বিধান নির্দিষ্টভাবে বর্ণিত আছে। এছাড়া সংযুক্ত নিকয়-র একটি অংশ ভিক্ষুণীসংযুক্ত (Bhikkhuni-Samjukta) এই বিষয়গুলির উপর আলোকপাত করতে সাহায্য করে।

ভিক্ষুণী ব্যতিত সাধারণ নারীর প্রতি বৌদ্ধধর্ম অনেক ক্ষেত্রেই উদার দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল। এই ধর্মে নারীর পক্ষে বিবাহ আবশ্যিক ছিল না। বহু অবিবাহিত নারী পরবর্তীকালে সংঘে যোগদান করেছিল। বৌদ্ধধর্মেও মাতৃত্বের ধারণাকে গৌরবান্বিত করা হয়েছিল। শুধু তাই নয় এই সময় গণিকা পুত্রদের হত্যার ঘটনাও হ্রাস পায়, অর্থাৎ তারাও সামাজিকভাবে যথেষ্ট স্বীকৃতি লাভ করে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় আম্বপালী গণিকার কথা মিরি অভয়ের মাতা হিসাবেও পরিচিত হন। বিবাহ পরবর্তী জীবনে স্বামী-স্ত্রীর সমান মর্যাদার কথা বলা হয় বৌদ্ধধর্মে। তবে বহুক্ষেত্রেই এমন অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যায় যেখানে সংঘে প্রবেশকালে স্ত্রীর পক্ষে স্বামীর অনুমতি গ্রহণের বিষয়টি পরিলক্ষিত হয়।

এই সমস্ত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বলা যায় বৌদ্ধধর্ম নারীর প্রতি কিছুটা স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিল, যেমন – রাণী মল্লিকা কন্যাসন্তানের জন্মদান করেছেন শুনে বুদ্ধ রাজা প্রসেনদিকে বলেন –

"A woman child, O Lord of men, may prove Even a better of spring that a male" কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে বৌদ্ধধর্ম পুরুষতান্ত্রিকতার প্রভাব মুক্ত ছিল। Navey Folk তাঁর প্রবন্ধ "An Image of Women in Old Buddhist Literature : the Daughters of *Masa*" -তে উল্লেখ করেছেন বৌদ্ধ সাহিত্যের আবির্ভাবের সময় থেকে নারীর অবস্থানগত অবনয়ন লক্ষ্য করা যায়।

আসুত্তর নিকয়তে পাওয়া যায় –

"Womenfolk are uncontrolled, Ananda. Womenfolk are envions, Ananda. Womenfolk are greedy, Ananda, Womenfolk are *neeak* in Wisdom, Ananda".

পলি গ্রন্থ আসুত্তর নিকয়তে আরোও উল্লেখ লক্ষ্য করা যায় যে, একজন নারী কখনোই যোগ্য রাজা হতে পারে না। তবে কোনো পুরুষের পক্ষে তা সম্ভব "Monks it is impossible that a woman

can be a wheet turning king; this status can not be found. But monks it is possible that a man can be a wheet - turning king" বৌদ্ধ সংঘের পুরুষতান্ত্রিক পরিকাঠামোর সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বুদ্ধের পরবর্তী সমস্ত দলাই লামারাই ছিলেন পুরুষ এবং তাঁরাই প্রধান হিসাবে সংঘ পরিচালনা করেন।

১২.২.৩.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ঃ

R. M. DAs, Women in Manu and his seven Commentators, Varanasi, 1962.

Shakuntala Rao Shastri, Women in the Vedic Age, Bombay, 1952.

David Kinsley, Hindu Goddesses : Visions of the Divine Feminine in the Hindu Religious Tradition, Berkeley : University of California Press, 1986.

Uma Chakrabarty, "Conceptualizing Brahmanical Patriarchy in Early India, Gender, Caste, Class and State", Economic and Political Weekly 28 : 579 - 85.

বৌদ্ধ ধর্ম ঃ

Bimala Churu Law, ed., Women is Buddhist Literature, Varanasi, 1927, reprint 1994.

I. B. Horner, Women under Primitive Buddhism : Laywomen and Alms Women, London, reprint Delhi, 1975.

Uma Chakravarti, "The Rise of Buddhism as Experienced by Women", Manushi, 8, 6-10.

Kathryan R. Blackstone, Women in the Footsteps of the Buddha, Delhi, 2000.

Diana Y. Paul, Women in Buddhism : Images of the Feminine in Mahayana Tradition, Berkeley, 1979.

Nupur Dasgupta, "Toils untold : An Appraisal of the Attitude Towards Women and Their Work in Early Pali Buddhist Literature", in Anuradha Chanda, Mahua

Sarkar, Kunal Chattopadhyaya, eds, Women in History, Kolkata, 2003, 1943.

জৈন ধর্ম ঃ

Padmanabha S. Jaini, The Jaina Path of Purification, Berkeley, 1981.

Padmanabha S. Jaini, Gender and Salvation : Jaina Debates on the Spiritual Liberation of Women, Berkeley, 1991.

প্রাচীন ভারতে নারী; সাধারণ তালিকা।

১২.২.৩.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা কিরূপ ছিল তা আলোচনা করা।

২। প্রাচীন ভারতে নারীর সামাজিক জীবন কি কেবল ধর্মীয় অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হত?

৩। ভারতীয় ধর্মচেতনার নারীত্বের বা মাত-আরাধনার স্বরূপটি ব্যাখ্যা কর।

৪। জৈন ধর্মে নারীর সামাজিক মর্যাদা কেমন ছিল?

৫। বৌদ্ধ ধর্মে নারীর সামাজিক মর্যাদা কিরূপ ছিল? এই ধর্মে পুরুষের পাশাপাশি নারীর অংশগ্রহণ কেমন ছিল তা আলোচনা কর।

পর্যায় গ্রন্থ - ২

RELIGION AND WOMEN

একক - ৪

Islam, Sikhism and Christianity

বিন্যাস ক্রম ঃ

১২.২.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

১২.২.৪.১ ঃ খ্রীষ্টধর্ম ও নারী

১২.২.৪.২ ঃ ইসলাম ও নারী

১২.২.৪.৩ ঃ শিখ ধর্ম ও নারী

১২.২.৪.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.২.৪.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.২.৪.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই পর্যায় গ্রন্থটি থেকে আপনি জানতে পারবেন ঃ

১। খৃষ্ট ধর্মে নারীর ভূমিকা ও অধিকার।

২। ইসলাম ধর্মে নারীর ভূমিকা।

৩। শিখ ধর্মে নারীর মর্যাদা ও অধিকার।

১২.২.৪.১ ঃ খ্রীষ্টধর্ম ও নারী

অন্যান্য যে কোন ধর্মের মতো খ্রীষ্ট ধর্মেও মহিলাদের স্থান তথা ভূমিকা নিয়ে অনেক তর্ক-বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। অনেকের মতে বাইবেলে মহিলাদের মর্যাদা স্বীকৃত। এবং আজ আমরা খ্রীষ্টধর্মের যেই রূপ দেখি বা খ্রীষ্ট ধর্মান্দোলনকে যেই পর্যায়ে দেখি, তার পেছনে মহিলাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। তবে অনেক ক্ষেত্রে খ্রীষ্টধর্ম মহিলাদের এই অসামান্য অবদানের কথা বিস্মৃত হয়েছে। আধুনিক যুগে অনেক নারী ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে একটি নূতন দৃষ্টিকোণ থেকে খ্রীষ্ট-ধর্মশাস্ত্রকে পাঠ করেছেন ও বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁরা দেখিয়েছেন যে, শাস্ত্র যেখানে যেখানে মহিলাদের মর্যাদা দিয়েছে, খুব সুপরিকল্পিতভাবে কিছু স্বার্থান্বেষী পুরুষ, গীর্জার পঠন পাঠন থেকে শাস্ত্রের সেই অংশগুলিকে বাদ দিয়ে দিয়েছেন। বিশেষ করে ক্যাথলিক চার্চের ক্ষেত্রে এই প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। (Fox, 1996) বিশিষ্ট খ্রীষ্টধর্ম গবেষক King (1998) মন্তব্য করেছেন যে New Testament পাঠ করলেই বোঝা যায় যে যীশু খ্রীষ্টের একেবারে আদি ভক্তদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন মহিলা। যেই মহিলাগণ যীশুকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন মেরী ম্যাগ্ডালিন, জোয়ানা, এবং সুজানা (Susanna)। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে কেবল খ্রীষ্টধর্ম নয়, অন্যান্য ধর্মেও নারীকে আদিপর্বে বা শাস্ত্রে মর্যাদা দেওয়া হয়েছে। পরে পুরুষশাসিত সমাজের কিছু স্বার্থান্বেষী মানুষ শাস্ত্রকে এমনভাবে ব্যাখ্যা অথবা পরিবর্ত্তন করেছে যাতে করে মহিলাদের আর্থ-সামাজিকভাবে শোষণ করা যায়। ইসলাম ও শিখ ধর্মে নারীর স্থান সংক্রান্ত আলোচনায় সে প্রসঙ্গে প্রবেশ করার অবকাশ থাকবে। তবে হিন্দুধর্ম প্রসঙ্গে একটি উদাহরণ দেওয়া প্রয়োজন মনে করি। রাজা রামমোহন রায় বহুভাষাজ্ঞানী ছিলেন। তিনি সংস্কৃতও ভাল জানতেন। তিনি কুখ্যাত সতীদাহ প্রথা নিরসন কল্পে আন্দোলন চালাতে গিয়ে শাস্ত্র পাঠকালে লক্ষ্য করেন যে বিধবাদের 'অগ্রে' স্থান দেওয়ার কথা বলা আছে। কিন্তু স্বার্থাণ্বেষী কিছু ব্রাহ্মণ 'অগ্র' কথাটিকে বাতিল করে সেইস্থানে 'অগ্নি' কথাটি ব্যবহার করছে। আবার খ্রীষ্ট ধর্মে ফেরা যাক। যীশু যেখানেই গমন করেছেন, মহিলাদের দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। ব্যক্তিগত জীবনে এবং বৃহত্তর সামাজিক পটভূমিতে, নারীসমাজের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে তাঁর বিভিন্ন বিষয়ে জ্ঞান সঞ্চয় হয়েছিল। এমনকি মৃত্যুর পরও তিনি নারীসমাজে সম্মান অর্জন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে খ্রীষ্টীয়

প্রথম শতকে মহিলাদের অবদান ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই সময়ে খ্রীষ্টান সম্প্রদায়ে মহিলাগণ ছিলেন সংখ্যাগরিষ্ঠ। Stark তাঁর গবেষণায় (1996) দেখিয়েছেন যে আদি উপাদানগুলি পাঠ করে জানা যায় যে খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ঘটনা পুরুষদের থেকে মহিলাদের মধ্যে অধিকতর ছিল। অনেক নারী তাঁদের স্বামী বা ভ্রাতার সঙ্গে স্থানান্তরে গমন করে মিশনারী হিসেবে কাজ করেছিলেন। এই সমস্ত মহিলাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছিল। তাঁদের কারারুদ্ধ করা হয়েছিল। নানা অত্যাচার করা হয়েছিল, কখনও বা হত্যাও করা হয়। যীশু সম্বন্ধে সাধারণ মানুষকে জ্ঞান দিতে গিয়ে কখনও কখনও তাঁরা নিজেদের পরিবারের সদস্যদেরও বিরাগভাজন হয়েছিলেন। পল, যিনি যীশুর প্রধান বারজন অনুগামীর অন্যতম, খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকের মাঝামাঝি কিছু পত্রে উল্লেখ করেছেন যে খ্রীষ্ট ধর্মের আদি পর্বে মহিলাগণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন এমনকি গীর্জাও স্থাপনের পেছনে তাঁদের অবদান আছে। রোমান দুনিয়ায় খ্রীষ্টধর্ম অনুমোদন পায়নি। ঐ সময়ে ঐ সমস্ত মহিলাগণ নিজেদের গৃহকে প্রার্থনার স্থান হিসেবে ব্যবহার করতে দিয়েছেন। নিউ টেষ্টামেন্টে এমন অনেক উদাহরণ আছে যে মহিলাগণ প্রার্থনায় নেতৃত্ব দিচ্ছেন, deaconess (যাজকের নীচের পদ) এবং ধর্মান্তরকরণে প্রয়াসী ব্যক্তি হিসেবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। এছাড়া খ্রীষ্টধর্ম সম্বন্ধে বক্তৃতাদানের ক্ষেত্রেও মহিলাদের এগিয়ে আসতে দেখা গেছে যদিও এই সমস্ত কাজ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য অনুমোদন ছিলনা।

খ্রীষ্টধর্মে আদিপর্বে এবং মধ্যযুগে মহিলাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে এই ধর্মে মহিলাদের ভূমিকা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। এর একটি কারণ সম্ভবতঃ এই যে খ্রীষ্ট-ধর্মাবলম্বীদের আধুনিক যুগে অত্যাচারিত হতে হয় না। তবে একটি দুঃখজনক প্রবণতা আজকাল দেখা যাচ্ছে, তা হল যেই সমস্ত দেশে খ্রীষ্টানগণ সংখ্যালঘু। সেখানে মাঝে মধ্যে খ্রীষ্টানদের, যার মধ্যে নানান সেবামূলক কাজে নিযুক্ত খ্রীষ্টান মহিলাগণও আছেন। অন্যান্য ধর্মের উগ্র মৌলবাদীদের হাতে অত্যাচারিত হতে হচ্ছে। আজকাল গীর্জা পরিচালনার ক্ষেত্রে মহিলাদের ভূমিকা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে এমনকি প্যাস্টর (Pastors) এবং চ্যাপলেইন (Chaplain) পদও তাঁরা অলংকৃত করছেন। কেউ কেউ একে গত কয়েক দশকের নারীবাদী (feminist) আন্দোলনের প্রভাব হিসেবে দেখছেন।

কারও কারও মতে খ্রীষ্টধর্ম সমাজে নারীদের উপর পুরুষের প্রভুত্বকে ত্বরান্বিত করে। অনেক আধুনিক মহিলা মনে করেন যে গতানুগতিক সমাজে তাঁদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবে দেখা হয়। তাঁদের সম্বন্ধে পুরুষদের গতানুগতিক তথা অযৌক্তিক কিছু ধারণা তাঁদের সমাজে একটি প্রান্তিক অবস্থানের দিকে ঠেলে দেয়। অযৌক্তিক ধারণার বশবর্তী পুরুষ সমাজ মহিলাদের আশা আকাঙ্খা বা সমস্যা, সম্ভাবনা ও ক্ষমতাকে অনুধাবন করতে ব্যর্থ হয়েছে। Doug Groothuis মনে করেন যে খ্রীষ্টানদের এই ধরনের অভিযোগ সম্বন্ধে সংবেদনশীল হওয়া উচিৎ। (http://www.ivpress.com/groothuis/doug/archives/000134.php) তাঁর মতে ঈশ্বর সকলকে সমানভাবে শ্রদ্ধা করতে শেখান (Genesis 1 : 28) তা সত্ত্বেও খ্রীষ্টধর্মের বিরুদ্ধে উপরোক্ত অভিযোগ আনা হয়েছে। অনেক অ-খ্রীষ্টান নারীবাদী অভিযোগ করেন যে

বাইবেল এর ঈশ্বর হল পুরুষ এবং সেক্ষেত্রে পুরুষদের সঙ্গে ঈশ্বরের অধিকতর সাদৃশ্য থাকবে। অর্থাৎ ঈশ্বর যেভাবে তাঁর সৃষ্টির উপর কর্তৃত্ব জাহির করেন, পুরুষ মানুষও সেইভাবে মহিলাদের উপর নিজ কর্তৃত্ব বজায় রাখার চেষ্টা করে। এই সমস্ত অভিযোগ খণ্ডনে উদ্যোগী Doug ধর্মশাস্ত্র ব্যাখ্যা করে বলেছেন যে বাইবেলের ঈশ্বর কোনভাবেই পুরুষ নন। এই ঈশ্বরের কোন লিঙ্গ নেই। (John 4 : 24)

Doug বলছেন যে যেই ধরনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে বাইবেল আবির্ভূত হয়েছিল সেখানে মহিলাদের তুলনায় পুরুষের কর্তৃত্ব অধিক ছিল। তবে তার অর্থ এই নয় যে বাইবেল নারীর উপরে পুরুষের কর্তৃত্বকে বৈধতা দিতে চেয়েছিল। যীশু কখনই একটা পুরুষ শাসিত সমাজের কথা ভাবেননি। তাঁর অনুগামীদের অবাক করে দিয়ে যীশু মহিলাদের ধর্মশাস্ত্র শিক্ষা দিয়েছিলেন। (Luke 10 : 38-42)। নিজের নবজাগরণের (resurrection) পরে যীশু আবির্ভূত হয়েছিলেন মেরীর সম্মুখে এবং জগৎ পরিবর্ত্তনের যে ঘটনা যীশু ঘটাচ্ছিলেন তার সাক্ষী রেখেছিলেন মেরীকে। এটি একটি অভূতপূর্ব ঘটনা কারণ সেই যুগে মহিলাদের সাক্ষ্য দানের মর্যাদা দেওয়া হতো না (John 20 : 17-18; Matthew 28 : 5-10, Doug এর প্রবন্ধে উল্লিখিত) নিজের বক্তব্যের সমর্থনে Doug একটি গুরুত্বপূর্ণ উক্তি উদ্ধৃত করেছেন ঃ "There is neither Jew nor Greek, slave nor free, male nor female, and you are all one in Christ Jesus" (Galatians 3 : 26-28)

Doug আলোচনা করেছেন যে যীশুর গুরুত্ব তাঁর পৌরুষের জন্য নন, তাঁর সামাজিক গুরুত্ব নিহিত আছে তাঁর পবিত্র মানবতার মধ্যে এবং সমগ্র মানব জাতির সঙ্গে নিজেকে এক করে ভাবার ক্ষমতার মধ্যে।

এবার বর্তমান ভারতবর্ষের প্রেক্ষাপটে খ্রীষ্টান মহিলাদের অবস্থান তথা ভূমিকা সম্বন্ধে দুই এক কথা বলে আমাদের আলোচনার প্রথম পর্ব শেষ করবো। নোবেল পুরষ্কার প্রাপ্ত মাদার টেরেসা কলকাতাকে কেন্দ্র করে তাঁর সমাজ সেবামূলক কার্যকলাপ বজায় রেখেছিলেন। তিনি হয়ে উঠেছিলেন বহু দুস্থ তথা নিরাশ্রয় শিশুর আশ্রয়। অনাথ শিশুদের ধমান্তরীত করার অভিযোগ তাঁর বিরুদ্ধে যারা এনেছিলেন তাঁরা মাদারের সমাজসেবামূলক কার্যকলাপের গুরুত্ব উপলব্ধি করতে পারেননি বা চাননি। ভারতবর্ষের মতো দরিদ্র দেশে, যেখানে শিক্ষার আলো সর্বত্র পৌঁছায়নি সেখানে বিভিন্ন শিক্ষা ও সেবাপ্রতিষ্ঠানে বহু খ্রীষ্টান মিশনারী মহিলা শিক্ষা ও সেবার মাধ্যমে সমাজে তাঁদের গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। প্রখ্যাত ঐতিহাসিক সুমিত সরকার, তনিকা সরকার প্রমুখ তাঁদের গ্রন্থ *Christian conversions* এ দেখিয়েছেন যে আমাদের দেশের অনেক সেবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় মিশনারীদের দ্বারা। অনেক প্রথম সারির বালিকা বিদ্যালয় পরিচালিত হয়ে থাকে মিশনারী মহিলাদের দ্বারা। সুমিত সরকার যুক্তি দিয়ে দেখিয়েছেন যে সমস্ত খ্রীষ্টান সমাজসেবীদের ধর্মান্তরকরণের অধিকার থাকে না। যেমন কয়েকবছর আগে ওড়িষ্যায় ধর্মান্তরকরণের অভিযোগ যেই অষ্ট্রেলীয় সমাজসেবীকে এক ধর্মীয় মৌলবাদী পুড়িয়ে মেরেছিল, তাঁর ধর্মান্তরকরণের অধিকারই ছিল না। তাঁর দোষ হয়েছিল যে তিনি চিরবঞ্চিত কুষ্ঠরোগীদের সেবায় নিয়োজিত ছিলেন। তাঁর স্ত্রীও একজন নিরলস সমাজসেবী। তিনি তাঁর স্বামীর হত্যাকারীকে মার্জনা করেছিলেন। কতটা মহানুভবতা থাকলে একজন মহিলা এই সিদ্ধান্ত

নিতে পারেন তা আমরা অনুমান করতে পারি। ভারতের গ্রামাঞ্চলে আদিবাসী মহিলাদের মধ্যে এবং দরিদ্র বঞ্চিত অন্যান্য মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য চেতনা বৃদ্ধির ক্ষেত্রে খ্রীষ্টান মিশনারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা আছে। ১৯ শতকের বাংলায় ভদ্রমহিলাদের অন্দর মহলে শিক্ষার যে ব্যবস্থা ছিল তাতে শিক্ষয়ত্রী হিসেবে খ্রীষ্টান মহিলাদের ভূমিকা সকলেরই জানা আছে। M. Borthwick তাঁর Changing Role of Women in Colonial Bengal এ এই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। এই শিক্ষিত খ্রীষ্টান মহিলাগণ তৎকালীন সমাজে হিন্দু, ব্রাহ্ম ও মুসলমান সমাজসেবীদের স্ত্রীশিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবনে সহায়ক হয়েছিলেন। এখানে একটি কথা মনে রাখা দরকার যে ১৯ শতকের বঙ্গদেশে উপরোক্ত খ্রীষ্টান মহিলাগণ যাঁরা অন্দরমহলে শিক্ষয়ত্রী হিসেবে কাজ করতেন তাঁদের অনেকক্ষেত্রে সন্দেহের চোখেও দেখা হতো। মনে করা হতো যে অন্দরমহলে প্রবেশের সুযোগ পেয়ে তাঁরা ভারতীয় মহিলাদের শিক্ষিত করার সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের প্রচার কার্যও করতে পারেন। (Amit Dey, *The Image of the Prophet*, Chapter V)

১২.২.৪.৩ ঃ ইসলাম ও নারী

মুসলিম দুনিয়ার অন্যান্য দেশের মতো ভারতীয় উপমহাদেশেও মুসলিম মহিলাদের অবস্থা ছিল শোচনীয়। একবিংশ শতকে ঐ অবস্থার উল্লেখযোগ্য পরিবর্ত্তন হয়েছে একথা বলা যাবে না। বিভিন্ন যুগে, বিভিন্ন মুসলিম রাষ্ট্রে মুসলিম মহিলাদের অবস্থা কেমন ছিল তা আলোচনার প্রয়োজন আছে, কেননা তা আমাদের ভারতবর্ষ তথা বাংলায় মুসলিম মহিলাদের অবস্থা বোঝার সহায়ক হবে। সহস্র বছর ধরে সমাজে তথা পারিবারিক জীবনে পুরুষতন্ত্রের প্রভাবে মহিলাদের পুরুষের তুলনায় খাঁটো করে দেখা হতো। মনে করা হতো প্রকৃতির নিয়মে সবদিক থেকেই পুরুষের তুলনায় মহিলাগণ সীমিত ক্ষমতা বা দক্ষতার অধিকারী। মনে করা হতো যে পুরুষের কাছে মহিলার শর্তহীন আনুগত্যই পারিবারিক জীবনে শান্তি আনে। হজরত মহম্মদের আবির্ভাবের পূর্বে আরবদেশে বিরাজ করতো অজ্ঞানতা। সেই অজ্ঞানতার যুগকে পরিভাষায় বলা হয় **জাহিলিয়া**। সেই যুগে মহিলাদের অবস্থা ছিল জন্তু জানোয়ারের মতো। কোনো আইনের অধিকার তাঁদের ছিল না। কন্যা সন্তানের অনেক ক্ষেত্রে জীবন্ত সমাধি হতো। একই পুরুষের অসংখ্য স্ত্রী থাকতো। কন্যা সন্তানের জন্মকে দুর্ঘটনা মনে করা হতো। কন্যা সন্তানের যখন সাত বা আট বছর বয়স থাকতো তখনই জোর করে তাদের বিবাহ দিয়ে দেওয়া হতো। যুদ্ধবিগ্রহের প্রাচুর্য্য ও মদ্যপানের রেওয়াজ, সমাজে মহিলাদের দুরবস্থা বৃদ্ধি করেছিল। আরব সমাজে, সেই **জাহিলিয়ার** পটভূমিতে লুণ্ঠন বা ক্রয় করে বালিকাদের বিয়ে করার রেওয়াজ ছিল। মহিলাদের পুরুষের সম্পত্তি ছাড়া আর কিছু মনে করা হতো না। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা দরকার যে **জাহিলিয়ার** পটভূমিতে অর্থাৎ প্রাক-ইসলামীয় আরবদেশে অবস্থা শোচনীয় ছিল এই তত্ত্ব অনেক গবেষক বিশ্বাস করেন না। তাঁদের মতে ইসলামের আবির্ভাবের অন্ততঃ একশত বছর আগে থেকে আরব সমাজে মহিলাদের মর্যাদার চোখে দেখা হতো। তাঁদের কিছু কিছু অধিকারও ছিল এবং তাঁরা সীমিতভাবে কিছুটা স্বাধীনতাও ভোগ করতেন। (Ashaf Ali Fyzee, *Outlines of Muhammadan*

Laws, New Delhi : Oxford University Press, 1974, pp.5-6. Anowar Hossain লিখিত *Muslim Women's Struggle for Freedom in Colonial Bengal*, *1873-1940*, তে উল্লিখিত)

কোন কোন আধুনিক চিন্তাবিদ মনে করেন যে প্রাক-ইসলামীয় আরব দুনিয়ার ধর্মীয় ক্ষেত্রেও মহিলাদের একটা মর্যাদা ছিল। প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করা যায় যে আরব জগতে সেই সময়ে বেশ কয়েকজন **কাহিনাহ্** বা মহিলা পুরোহিত ছিলেন। এছাড়া স্ত্রী দেবতার ধারণাও সেই প্রাক মুসলিম আরবসমাজে ছিল। (Asghar Ali Engineer, *The Rights of Women in Islam*, New Delhi : Sterling Publishers, 1992, pp. 34-36, Anowar Hossain এর গ্রন্থে উল্লিখিত)

অনেক গবেষক আলোচনা করেছেন যে হজরত মহম্মদ তথা ইসলামের আবির্ভাবের পর যে ধর্মীয় সংস্কার-এর সূত্রপাত হয় তা সমাজে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছিল। পবিত্র কোরাণ পুরুষ ও নারী, উভয়কেই সমানভাবে আহ্বান করে ধর্মের পথে চলার জন্য ঃ "Lo ! men who surrender unto Allah and women who surrender, and men who believe and women who believe ..... and men who guard their chastity and women who guard it and men who remember Allah and women who remember Allah has prepared for them forgiveness and a mighty reward." (পবিত্র কোরাণের এই অংশটি Asghar Ali Engineer এর গ্রন্থের 44 পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হয়েছে।)

ইসলামে নারীর অধিকার সংক্রান্ত প্রশ্নে গবেষকদের মধ্যে বিতর্ক আছে। একটি মত অনুযায়ী সম্পত্তির উপর মুসলিম নারীর অধিকার নিরঙ্কুষ কারণ স্ত্রী যদি প্রচুর সম্পত্তির মালিকও হন এবং স্বামী যদি দরিদ্রও হন, স্বামীর দায়িত্ব হল স্ত্রীকে ও সন্তানাদিকে নিজের ক্ষমতায় লালন করা। একজন মুসলিম নারী নিজ সম্পত্তির কোন অংশ স্বামী তথা সন্তানাদিকে পালন করতে ব্যয় করতে বাধ্য নন। (Zenab Banu লিখিত প্রবন্ধ "Muslim Women's Right to Inheritance", Asghar Ali Engineer সম্পাদিত *Problems of Muslim Women in India*, Bombay, Orient Longman 1995, p-34) উপরোক্ত বক্তব্যের যারা সমর্থক তারা মনে করেন যে হজরত মুহম্মদ সমাজের নারীর মর্যাদা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হন। এই প্রসঙ্গে হজরত মুহম্মদের কয়েকটি পদক্ষেপের উল্লেখ করা হয় যেমন ঃ বহুবিবাহের ক্ষেত্রে স্ত্রীর সংখ্যা মাত্র চাঁরজনে সীমাবদ্ধ রাখার ব্যবস্থা, কন্যা সন্তান হত্যাকে অপরাধ বলে ঘোষণা করা, সম্পত্তির উত্তরাধিকার প্রসঙ্গে নারীর অধিকার সুনিশ্চিত করতে প্রয়াসী হওয়া, মেহের (*mehr*) বা বিহের পণকে নববধূর পুরস্কার হিসেবে ঘোষণা করা এবং বিবাহ ও বিবাহ বিচ্ছেদের সময় নারীর অধিকারকে স্বীকৃতি দিতে আরবদেশীয় আইনে নূতন মাত্রা সংযোজন করা ইত্যাদি। সমাজে নারীর মর্যাদা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে হজরত মুহম্মদ অনেক ক্ষেত্রে নিজের পারিবারিক জীবনকে উদাহরণ হিসেবে ব্যবহার করেছেন। নিজের দুধমাতা বিবি হালিমার প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা প্রদর্শন এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। **সীরাত** (হজরত মুহম্মদের

জীবনী) সাহিত্যে এর প্রতিফলন আছে। বৃহৎ জনজীবনে বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদ অলংকৃত করার অধিকারও নারীকে দেওয়া হয়েছে। এছাড়া বিবাহ বিচ্ছেদের পরে একজন মুসলিম নারীর পুনর্বিবাহেরও অধিকার আছে। বিদ্যার্জনের ক্ষেত্রেও মুসলিম নারীকে উৎসাহ দান করা হয়েছে। (Amit Dey, *The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety*, নারী বিষয়ক অধ্যায়, Anowar Hossain এর গ্রন্থের ভূমিকা)। এটা মনে রাখা দরকার যে ইসলামের আবির্ভাবের পর আরব সমাজে মহিলাদের পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছিল, এই তত্ত্ব সকল গবেষক গ্রহণ করেন না। সমালোচকগণ মনে করেন যে, মুসলিম সমাজে নারীকে খুব সীমিত অধিকার দেওয়া হয়েছে। তাঁরা বলেন যে গতানুগতিক পুরুষতান্ত্রিক মুসলিম সমাজে ছেলেরা পিতার সম্পত্তির সিংহভাগ অধিকার করেন। এই সমালোচকগণ মনে করেন যে হজরত মহম্মদের প্রয়াস সত্ত্বেও মুসলিম সমাজে নারীকে সমানাধিকার দেওয়া সম্ভব হয় নি। (Malladi Subbamma, *Islam and Women*, New Delhi, Sterling Publishers, 1988, p.128. Anowar Hossain কর্তৃক উদ্ধৃত)। স্যার উইলিয়াম ম্যুর (William Muir ১৯ শতক) মনে করেন যে হজরত মুহম্মদ মহিলাদের জন্য ইসলামে যেই স্থান নির্দিষ্ট করেছেন তা পুরুষের তুলনায় নিকৃষ্ট এবং পুরুষের সেবায় জীবন অতিবাহিত করা ছাড়া নারীর আর কোনো ভূমিকা নেই। পুরুষ ইচ্ছামতো অনায়াসে এবং নিঃশব্দে নিজের জীবন থেকে বিতাড়িত করতে পারে নারীকে। (Anowar Hossain এর গ্রন্থে উদ্ধৃত)। এই প্রসঙ্গে একটি কথা মনে রাখা দরকার তা হল উইলিয়াম ম্যুর ১৯ শতকে বসে যখন লিখছিলেন সেই সময় থেকে আরম্ভ করে এই একবিংশ শতকের প্রাক্ বেলায় গঙ্গা দিয়ে অনেক জল বয়ে গেছে। বর্ত্তমান সময়কে বলা হয় media তথা সংবাদ মাধ্যমের যুগ। এই সময়ে সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দে কোনো নারীকে বঞ্চিত করা সহজসাধ্য নয়। এই প্রসঙ্গে আমরা প্রাক্তন আই. এ. এস. অফিসার S. M. Murshed-এর একটি ছোট প্রবন্ধে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখবো। প্রবন্ধটির নাম "What the Koran says about the veil," প্রবন্ধটি দ্য স্টেট্‌ম্যান পত্রিকায় (ইংরেজী) সতেরো নভেম্বর, ২০০৬ সালে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধটি প্রখ্যাত চিত্রাভিনেত্রী ও সমাজসেবী শাবানা আজমীর পর্দা প্রথা সংক্রান্ত মন্তব্যকে কেন্দ্র করে দিল্লীর জামা মসজিদের ইমাম বুখারীর প্রতিক্রিয়া সংক্রান্ত, শাবানা মন্তব্য করেছিলেন যে কোরাণ নারীর পর্দা বা হেজাবের কথা বলে না। ইমাম বুখারী, স্বীকার করেন না যে শাবানার কোরাণ ব্যাখ্যার অধিকার আছে। ইমাম বলছেন যে কোরাণ পর্দা বা হেজাব অবলম্বনের কথা বলে। এখানে S M Murshed বলছেন শাবানার মতো শিক্ষিতা মহিলার কোরাণ ব্যাখ্যার অধিকার আছে এবং তাঁর পর্দা বা হেজাব সংক্রান্ত মন্তব্য গ্রহণযোগ্য। Murshed-এর ঐ প্রবন্ধে একটি গুরুত্বপূর্ণ ছবিও ছাপা হয়েছে তা হল প্রখ্যাত টেনিস তারকা সানিয়া মিরজা ইসলামী পোষাকে মায়ের সঙ্গে মক্কা ভ্রমণ করছেন। আমরা সকলেই জানি ধর্মীয় মৌলবাদীগণ টেনিস খেলার সময় সানিয়ার পোষাক-কেও শরিয়ত বিরোধী বলে নিন্দা করেছেন। যদিও সকল মুসলিম তা মনে করেন না। বরং টেনিসে সাফল্যের মাধ্যমে ভারতবর্ষের গৌরব বৃদ্ধি করেছেন ও করছেন সানিয়া এটাই অনেকে মনে করেন। শাবানা বা সানিয়া কেউই ধর্মীয় মৌলবাদীদের কটাক্ষকে পাত্তা দিচ্ছেন না, এবং সংবাদ মাধ্যমে দেখা যাচ্ছে বহু মানুষ তাঁদের সপক্ষে আছেন। আমরা একটা বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে পর্দা বা

হেজাব সম্পর্কে শাবানার মন্তব্যকে আলোচনা করতে পারি। শাবানার মতো শিক্ষিত মহিলার কোরাণ ব্যাখ্যার অধিকার আছে। এইজন্য তাঁর কোন ইমামের বা মৌলবীর কাছে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। কোন কোন মৌলবী বা উলামা এই পরিস্থিতিকে সহজভাবে নেবেন না কারণ এটা চলতে থাকলে সমাজে তাঁদের প্রতিপত্তি কমে যাবে। জ্ঞানী ব্যক্তির শাস্ত্র বা কোরাণ ব্যাখ্যার অধিকারকে বলে ইজ্‌তেহাদ। এটা একটা গণতান্ত্রিক অভ্যাস। প্রাক ঔপনিবেশিক যুগে, যখন পাশ্চাত্ত্য তথা ইওরোপের নিরঙ্কুষ সামরিক ও রাজনৈতিক কতৃত্ব স্থাপিত হয়নি, যখন পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে ইসলাম রাজশক্তি, হিসেবে তার বিজয় পতাকা উড্ডীন রাখতে সক্ষম হয়েছিল, সেই পটভূমিতে মুসলিম সমাজে ইজতেহাদের মর্যাদা ছিল। ভারতে সুলতানী তথা মোঘল যুগেও এর মর্যাদা ছিল। তাই মুসলিম রাজশক্তি অন্যান্য অমুসলিম সম্প্রদায়কে সঙ্গে নিয়েই তাঁর সাম্রাজ্যকে বজায় রাখতে ও শক্তিশালী করতে সক্ষম হয়েছিল। কিন্তু ১৯ শতক থেকে যখন পাশ্চাত্ত্যের সামরিক শক্তি তাঁদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে তখন মুসলিম রাজশক্তির বিপর্যয়ের প্রেক্ষাপটে ইসলাম ধর্ম নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষাকে আর তেমন উৎসাহ দিতে উলেমা প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের আশংকা হল যে বিজয়ীর ধর্ম খ্রীষ্টধর্ম এবং অন্যান্য ধর্ম (ভারতের প্রেক্ষাপটে হিন্দুধর্ম, ব্রাহ্ম মতবাদ ইত্যাদি) সেক্ষেত্রে প্রভাব বিস্তার করতে পারে। ঐ পেক্ষাপটে ইজতেহাদের গুরুত্বও কমে গেল কারণ ইজতেহাদ যুক্তিবাদ ও পরীক্ষা নিরীক্ষাকে গুরুত্ব দেয়। এই রকম একটা পরিস্থিতিতে মুসলিম মহিলাদের আক্ষরিক অর্থে শাস্ত্র মেনে চলার কথা উলেমা বলেছিল। ইজতেহাদের পথ আংশিকভাবে রুদ্ধ করে দেওয়ার ফলে মুসলিম মহিলাদের সার্বিক বিকাশের পথ, স্বতন্ত্র্য ও স্বাধীন ব্যক্তিত্ব হিসেবে গড়ে ওঠার পথও অনেকটাই সঙ্কুচিত হয়েছিল বলা যায়। খিলাফৎ আন্দোলনের সময় থেকে ভারতীয় মুসলিম সমাজে উলামার প্রতিপত্তি ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পায়। এর প্রভাব সব সময়ে মুসলিম মহিলাদের পক্ষে ভাল হয়নি। সঙ্গীত, পোষাক ইত্যাদি নানা বিষয়ে ক্রমাগত ফতোয়া জারি করে মুসলিম মহিলাদের কোনঠাসা করার প্রয়াস একশ্রেণীর উলামার মধ্যে দেখা যায়। এই সময়ে, অর্থাৎ বিংশ ও একবিংশ শতকে মুসলিম মহিলার স্বাধীনতা রক্ষার্থে ভারতীয় উপমহাদেশে একাধিক জ্ঞানী গুণী ও শাস্ত্রজ্ঞ পুরুষ নিরন্তর সংগ্রাম করে গেছেন। বিভিন্ন N. G. O. ও মুসলিম নারীর উপর কোনো অবিচার হলে সোচ্চার হয়েছে। তবে তাদের আন্তরিক প্রয়াস কতটা কার্যকর হল ভবিষ্যতে তার উত্তর পাওয়া যাবে। বিংশ শতকের ঠিক সূচনায় **বেহেস্তী জেওয়ার** (স্বর্গীয় অলংকার) নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ উর্দু বই লেখেন দেওবন্দের দার-উল-উলুম মাদ্রাসার প্রখ্যাত আলিম মৌলানা আশরফ আলী থানওই (Ashraf Ali Thanawi)। এখানে কোরাণ, হাদিস অক্ষরে পালন করে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষিত করার কথা বলা হয়েছে। উপমহাদেশে বিভিন্ন ভাষায় বইটির অনুবাদ হয়েছে। পাকিস্তানের প্রাক্তন সেনা শাসক জিয়া-উল-হক, যিনি বল প্রয়োগে অর্জিত ক্ষমতা বৈধতা দিতে ধর্মীয় মৌলবাদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন, তিনি উলমাকে তুষ্ট করতে পাকিস্তানী মহিলাদের মধ্যে উপরোক্ত **বেহেস্তী জেওয়ার** গ্রন্থটিকে জনপ্রিয় করতে প্রয়াসী হন। শিক্ষায় অগ্রসর ও সমাজ সচেতন এক শ্রেণীর পাকিস্তানী মহিলাগণ জেনারেল জিয়ার ঐ প্রয়াসের বিরোধীতা করেছিলেন। অর্থাৎ আমরা দেখতে পাচ্ছি (পাকিস্তান, বাংলাদেশ ইত্যাদির উদাহরণ থেকে) যে ধর্মীয় মৌলবাদ, ও সামরিক শাসন অনেক সময়েই পরস্পরের উপর নির্ভরশীল হয়ে

শক্তি সঞ্চয় করে এবং ঐ পরিস্থিতি শিক্ষিত ও গণতন্ত্র প্রেমী মহিলাদের অনুকূল হয় না।

জ্ঞানী, গুণী মুসলিম যাঁরা Sir William Muir-এর নারী সংক্রান্ত বক্তব্য, অর্থাৎ ইসলাম মহিলাদের হেয় করে, এই তত্ত্ব স্বীকার করেন না তাঁরা ইসলামের ইতিহাস থেকে উদাহরণ দিয়ে দেখান যে ইসলামের ধ্রাপদী যুগে মহিলাগণ রাষ্ট্রনীতি, যুদ্ধ, কবিতা, বিদ্যাচর্চা ইত্যাদি সকল বিষয়েই তাঁদের দক্ষতা প্রদর্শন করেছিলেন। বিশেষতঃ হজরত মহম্মদের পরিবারের মহিলাদের আদর্শ হিসেবে তুলে ধরা হয়। এই প্রসঙ্গে ১৯ শতকের বিখ্যাত পণ্ডিত সৈয়দ আমীর আলি বিরচিত The Spirit of Islam-এর উল্লেখ করা যায়।

আরেকটি কথা বলে ইসলাম ও নারী সংক্রান্ত আলোচনাটি শেষ করবো, কারণ সেই প্রসঙ্গটি আমাদের 'শিখধর্মে নারী' আলোচনাটি বুঝতে সাহায্য করবে। তা হল এই যে, ভারতীয় মধ্যযুগে অনেক মহিলা সুফী প্রভূত মর্যাদার অধিকারী হয়েছিলেন। এই আলোচনা আমার গ্রন্থে (Amit Dey, *Sufism in India*) আমি করেছি। এটাও দেখা গেছে যে জনৈক মহিলা সুফী, রওশান বিবির দরগাহকে কেন্দ্র করে কিভাবে হিন্দু-মুসলিম সমন্বয়ী সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে। অর্থাৎ অনেক ক্ষেত্রে সুফী আন্দোলন মহিলাদের রক্ষণশীল তথা শাস্ত্রানুসারী ইসলামের থেকে অধিক মর্যাদা দেয় ও ধর্মীয় উদারতার কথা বলে। বিশ্বের শান্তি ও সৃজনশীলতা নির্ভর করে ধর্মীয় ঔদার্য্যবোধের মধ্যে ও **ইজতেহাদ** কেন্দ্রীক যুক্তিবাদের মধ্যে।

১২.২.৪.৩ ঃ শিখ ধর্ম ও নারী

ইসলাম ও নারী প্রসঙ্গে আমরা ইতি টেনেছিলাম সুফীবাদের কথা বলে। বিখ্যাত মধ্যযুগীয় চিস্তী সুফী বাবা ফরিদ উদ্দীন গঞ্জ-ই-শক্কর হিন্দু, মুসলমান ও শিখ সকলের কাছেই সমান শ্রদ্ধেয়। তিনি অত্যন্ত মধুর কবিতা রচনা করতেন তাই তিনি গঞ্জ-ই-শক্কর নামেও পরিচিত। গঞ্জ-ই-শক্কর কথাটির অর্থ হল মিছ্‌রির ভাণ্ডার। তিনি গুরু নানকের প্রজন্মের অনেক আগে জন্ম গ্রহণ করায় দুজনের সাক্ষাৎ হয়নি। তবে পাঞ্জাবের ঐ সুফীর কাব্যের দ্বারা গুরুনানক গভীরভাবে প্রভাবিত হন এবং শিখদের পবিত্র গ্রন্থ গুরুগ্রন্থসাহেবেও বাবা ফরিদের কাব্য অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। দেশ ভাগের পর বাবা ফরিদের দরগাহ্ যা পশ্চিম পাঞ্জাবের পাকপাট্টানে অবস্থিত, তা পাকিস্তানে চলে যায়। তা সত্ত্বেও ধর্মপ্রাণ শিখ তীর্থ যাত্রীগণ যখন পাকিস্তানে অবস্থিত গুরুদ্বার ভ্রমণ করেন তখন বাবা ফরিদের দরগাহ্ এ গমন করে তাঁকেও শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। বাবা ফরিদের নাম উল্লেখ করার কারণ হল এই যে তাঁর কবিতায় নারী প্রসঙ্গ আছে যা অনুধাবন করতে পারলে শিখ ধর্মে মহিলাদের স্থান কোথায় বুঝতে সুবিধা হতে পারে। বাবা ফরিদের কাব্যে যে নারীকণ্ঠ আছে তা নূতনত্বের দাবি করে না বরং প্রাচীন ভারতীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে তার মিল আছে। এখানে প্রেমময় ভক্তি প্রকাশ পাচ্ছে আদর্শ স্ত্রীর মাধ্যমে যাকে সোহাগণ বলা হয়েছে। তবে পারস্পরিক ভালবাসায় যে সমতার চেতনা থাকে তা এখানে রক্ষিত হয় নি। এখানে ঈশ্বর রূপ স্বামী সকল ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের অধিকারী। এখানে প্রেক্ষময়

মিলন স্বামীর মর্জির উপর নির্ভরশীল। এখানে ফরিদ যেন পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোকে শক্তিশালী করেই মহিলাদের জন্য একটু জায়গা সৃষ্টি করছেন। এই হেঁয়ালিটি মাথায় রাখতে হবে। অর্থাৎ বাবা ফরিদের নারী আধ্যাত্মিকতার স্বাদ পেতে পারেন তবে তা পারিবারিক সীমান্তের মধ্যেই। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ সংক্রান্ত চেতনা কিভাবে একটি বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায় তা বুঝতে গেলে ফরিদের কাব্যের সঙ্গে পাঞ্জাবের আরেক সুফী কবি শাহ হোসেনের কাব্যের তুলনা করা যেতে পারে। হোসেনের কবিতায় নারী সরাসরি ঈশ্বরকে সম্বোধন করছেন। ঈশ্বর এর সঙ্গে সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষ হোসেনের কাব্যে একই স্থানে অবস্থান করে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজের কাঠামোকে স্বীকার করে নিলেও হোসেনের কাব্যে এই কাঠামোকে প্রান্তিক অবস্থান দেওয়া হয়েছে। তাঁর কাব্যে নারী একজন ব্যক্তি হিসেবে ঈশ্বরকে সম্বোধন করে। পাঞ্জাবের এই ঐতিহ্য শিখ ধর্মে নারীর অবস্থান বুঝতে সাহায্য করবে। [J. S. Grewal — "Female Voice in Punjabi Sufi Poetry" in Mansura Haidar edited *Sufi, Sultans and Feudal Order* New Delhi, 2004]

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে ভারতে, বিশেষতঃ উত্তর ভারতে সামাজিক রক্ষণশীলতা বৃদ্ধি পায় যা সমাজে নারীর অবস্থা আরও শোচনীয় করে তোলে। মুসলিম ধর্মীয় আইন ধর্ম তথা বিশ্বাসের ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের বিভেদ করে না। সম্পত্তির অধিকার, বিবাহ বিচ্ছেদ তথা পুনর্বিবাহের ক্ষেত্রে মুসলিম নারীর অবস্থা তাত্ত্বিকভাবে উন্নততর। ভারতে মুসলিম রাজনৈতিক শক্তি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কিন্তু মুসলিম আইনের এই সুবিধা হিন্দু সমাজের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়নি, অর্থাৎ হিন্দু নারীর শোচনীয় অবস্থার কোন পরিবর্ত্তন হয়নি। এই পটভূমিতে গুরু নানকের আবির্ভাব ঘটে যিনি শিখ ধর্মমতের প্রবক্তা। সমাজে রারা মহিলাদের হীন চোখে দেখতো তাঁদের সমালোচনা করে নানক প্রশ্ন করেন ঃ "যাঁরা মহাপুরুষদের জন্মদান করেন তাঁদের কেন হীন বলা হবে ?" (**আদি গ্রন্থ**, রাগ আম আ, পৃ: ৪৭৩, cited in Sunita Puri, *Advent of Sikh Religion, A Socio-Political Perspective*, New Delhi, 1993) সেই যুগে যে সমস্ত যোগী একদিকে নিজেদের ব্রহ্মচারী বলতো আরেক দিকে লালসার দৃষ্টিতে মহিলাদের দেখতো তাদের তিনি কঠোর সমালোচনা করেন। শিখ ধর্ম ব্রহ্মচর্যের কথা বলে না। স্বাভাবিক বিবাহিত জীবন শিখ ধর্মে গ্রহণযোগ্য। নানকের মতে বিবাহ মানবিক দুর্বলতার পরিচয় বহন করে না বরং সস্থ বৈবাহিক জীবন আধ্যাত্মিক উন্নতির সোপান। আদিগ্রন্থে স্পষ্ট উল্লেখ আছে যে বিবাহ কেবল দৈহিক মিলন নয়। আধ্যাত্মিক মিলনও বটে। শিখ একেশ্বরবাদ বিবাহিত নর-নারীর দুই আত্মার মিলনের কথা বলে। নানকের উপদেশে এক পুরুষের সঙ্গে এক নারীর সম্পর্কে জোর দেওয়া হয়েছে। বিভিন্ন নারী বা একাধিক স্ত্রী গ্রহণকে উৎসাহ দেওয়া হয়নি। ব্যাভিচারকে নিন্দা করা হয়েছে। সাবেকী সমাজে বৈবাহিক জীবনে কেবলমাত্র মহিলাদের কাছেই আনুগত্য প্রত্যাশা করা হতো। নানক বললেন এই আনুগত্য দুই তরফেই থাকা প্রয়োজন অর্থাৎ সুস্থ দাম্পত্য জীবনে নারী-পুরুষ উভয়েই পরস্পরের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করবে। এইভাবে নারীর মর্যাদা স্থাপনে নানক প্রয়াসী হলেন। পরিবারকে সমাজের একটি গুরুত্বপূর্ণ একক হিসেবে দেখা হয়েছে শিখ ধর্মে এবং বলা হয়েছে যে পরিবারের সদস্যদের নৈতিক ও জাগতিক উন্নতির ক্ষেত্রে স্বামী-স্ত্রী উভয়েই সমান দায়িত্ব

নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। নানক মহিলাদের শাস্ত্র পাঠে উৎসাহিত করেছেন এবং প্রার্থনা সভায় পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে অংশগ্রহণ করার কথা বলেছেন। এটা অবশ্যই একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ কেননা হিন্দু নারীর বেদ পাঠের অধিকার ছিল না এবং তাদের শুদ্ধ মনে করা হতো না বলে মন্দিরের বিভিন্ন আবার অনুষ্ঠানেও অংশ গ্রহণ করতে দেওয়া হতো না।

সতীদাহ বা বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে গুরুনানক নীরব। তবে পরবর্তী শিখ গুরুগণ নানক কর্তৃক নারীর মর্যাদা রক্ষার প্রয়াসে অনুপ্রাণিত হয়ে শিশুকন্যা হত্যা বা সতীদাহকে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তৃতীয় শিখ গুরু অমর দাস বলেছেন ঃ “প্রকৃত সতী হলেন সেই নারী যিনি স্বামীর মৃত্যুর পর সৎ ও পবিত্র জীবন যাপন করেন। প্রকৃত সতী স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় ঝাপিয়ে পড়েন না .....” (আদি গ্রন্থ, রাগ সূহি, সুনীতা পুরী কর্তৃক উদ্ধৃত)। শিখ ধর্মে বিধবা বিবাহে অনুমোদন আছে অবশ্য বিধবাদের যদি তাতে সম্মতি থাকে। অর্থাৎ তাত্ত্বিকভাবে হিন্দু বিধবার তুলনায় শিখ বিধবা অধিক স্বাধীনতা ভোগ করে। গুরু অমর দাসের আরেকটি কৃতিত্ব হল এই যে তিনি যোগ্য শিখ মহিলাদের ধর্মপ্রচার কার্যেও নিয়োগের অনুমতি দেন এবং সাবেকী ধর্মীয় ও সামাজিক সীমাবদ্ধতা থেকে মহিলাদের যুক্ত করার কথা ভাবেন। শিখ ধর্মশাস্ত্রে নারী পুরুষের সমতার কথা বলা হয়েছে। গুরু নানক এই সমতার উপর গুরুত্ব দিলেও মনে রাখা দরকার যে সেই যুগে নারী স্বাধীনতা বলে যা বোঝাতো তা বর্ত্তমান যুগের স্বাধীনতার ধারণার থেকে পৃথক। নানকের চেতনায় আদর্শ নারীর যে ভাবমূর্তি তার সঙ্গে গতানুগতিক সমাজে নারীর ভাবমূর্তির মৌলিক পার্থক্য নেই। নারী যদি রূপে, গুণে অসামান্যাও হন তবু তাঁর কাছে বিনম্রতা এবং স্বামী তথা পরিবারের প্রতি শর্তহীন আনুগত্য প্রত্যাশা করা হয়েছে। তবু মনে রাখতে হবে যে মধ্যযুগের পটভূমিতে নানক নারীকে আধ্যাত্মিক ও পার্থিব ক্ষেত্রে যে মর্যাদা দিয়েছেন তা উপেক্ষা করার মতো নয়। হিন্দু সমাজে যখন নারীকে সমস্ত পাপের উৎস হিসেবে দেখা হতো, সেই পরিস্থিতিতে নানক কর্তৃক নারীকে মর্যাদা দানের মধ্য দিয়ে একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ জীবনে অন্তর্ভুক্ত করার প্রয়াস যথেষ্ট প্রশংসার দাবী রাখে।

১২.২.৪.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Douglas R. Groothuis, *Unmasking the New Age : Is There a New Religious Movement Trying to Transform Society*? (Inter Varsity Press, 1986)

২। Rebecca Merrill Groothuis, *Women Caught in the conflict : The Culture War Between Traditionalism and Feminism* (Baker Books, 1994)

৩। Rebecca Merrill Groothuis, *Good News For Women*, (Baker Books, 1997)

৪। প্রবন্ধ ঃ Alister McGrath, "*In what way can Jesus Be a Moral Example for Christians* ?" Journal of Evangelical Theological Society, vol. 34, no. 3 (September 1991) : p. 295.

৫। Website : http://www.ivpress.com/groothuis/doug/archives/000134.php

৬। Meredith Borthwick, *The Changing Role of Women in Bengali, 1849-1905*, Princeton, 1984.

৭। Sonia Nishat Amin, *The World of Muslim Women In Colonial Bengal, 1876-1939*, Leiden, 1996.

৮। Anowar Hossain, *Muslim Women's Struggle For Freedom In Colonial Bengal* (1873-1940), Kolkata, 2003.

৯। Amit Dey, *Sufism in India*, Kolkata, 1996.

১০। Amit Dey, *The Image of the Prophet in Bengali Muslim Piety, 1850-1947*, (Chapter V), Kolkata, 2005.

১১। Gail Minault edited, *The Extended Family*; *Women and Political Participation In India and Pakistan*, Delhi, 1981.

১২। Asghar Ali Engineer edited, *Problems of Muslim Women in India*, Bombay, 1995.

১৩। Shahida Lateef, *Muslim Women in India*, *Political and Private Realities* : 1890-1980s, New Delhi, 1990.

১৪। Sunita Puri, *Advent of Sikh Religion* ; *A Socio-Political Perspective*, New Delhi, 1993.

৭.২.৪.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। খ্রীষ্টধর্মে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে আলোচনা কর।

২। ভারতবর্ষে খ্রীষ্টান মহিলাদের ভূমিকা নিয়ে একটি প্রবন্ধ রচনা কর।

৩। ধর্মীয় তথা সামাজিক ইতিহাসে খ্রীষ্টান মহিলাদের কি কোন ইতিবাচক ভূমিকা আছে ?

৪। ইসলাম ধর্মে নারীর অধিকার সংক্রান্ত বিতর্ক নিয়ে আলোচনা কর।

৫। আধুনিক ভারতে ধর্মীয় রক্ষণশীলতা বৃদ্ধির প্রেক্ষাপটে কি মুসলিম নারীর মর্যাদা হ্রাস পেয়েছে ?

৬। ঔপনিবেশিক ও উত্তর-ঔপনিবেশিক ভারতে মুসলিম নারী সংক্রান্ত বিতর্কের কয়েকটি দিক আলোচনা কর।

৭। শিখ ধর্মে নারীর মর্যাদা নিয়ে একটি প্রবন্ধ লেখ।

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

REFORM MOVEMENTS AND WOMEN

একক - ৫

(a) Bhakti Movements

(b) Vira Saivism

বিন্যাসক্রম ঃ

১২.৩.৫.০ : উদ্দেশ্য

১২.৩.৫.১ : ভূমিকা

১২.৩.৫.২ : ভক্তি আন্দোলনে নারী

১২.৩.৫.৩ : বীরশৈব ধর্মে নারী

১২.৩.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.৩.৫.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৩.৫.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে ভক্তি আন্দোলন কি প্রভাব ফেলেছিল?

(২) ভারতীয় নারীর অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষত্বগুলি কি?

(৩) বীরশৈব ধর্ম বলতে কি বোঝায়?

১২.৩.৫.১ : ভূমিকা

ধর্ম বিশেষতঃ প্রতিবাদী ধর্ম এবং সংস্কার আন্দোলনগুলি নারীকে কি চোখে দেখেছিল তার বিশ্লেষণ ভারতবর্ষে নারীর ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক। কারণ ধর্ম সব দেশে সবকালে সমাজে নারীর আদর্শায়িত অবস্থা (normative situation) নির্দেশ করে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবাদী আন্দোলন ঐতিহ্যগত, অবস্থার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন সাধন করে — ধর্মশাস্ত্র অনুসারে মহিলাদের সন্ন্যাস গ্রহণ নিষিদ্ধ হলেও জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের ক্ষেত্রে কিছু শর্ত সাপেক্ষে এমন নিষেধ তুলে দেওয়া হয়েছিল। ফলে সামান্য অংশের মধ্যে হলেও এই ধর্ম আন্দোলন নারীর অবস্থানে কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছিল। হিন্দু ধর্মে যে সংস্কার আন্দোলন দেখা যায় — যাকে সাধারণভাবে 'ভক্তি আন্দোলন' হিসাবে চিহ্নিত করা হয়ে থাকে, নারীর সামাজিক অবস্থানের ক্ষেত্রে তার প্রভাব ছিল সূদূর প্রসারী।

হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্য বিশেষতঃ ধর্মশাস্ত্র অনুযায়ী হিন্দু রমণী শৈশবে পিতা, যৌবনে স্বামী এবং বার্ধক্যে পুত্রের অধীন। শুধু তাই নয় 'পতি পরম গুরু' অন্য কোন পুরুষ সে যদি দেবতাও হয়, তার চিন্তা পাপ। হিন্দু রমনী দেবতার আরাধনা করে এসেছে স্বামী, পুত্রের নিজের 'মুক্তি' বা অধ্যাত্মসাধনার জন্য নয় কল্যাণ কামনায়। সেখানে 'ভক্তি' মানে 'পরমাত্মায়' 'জীবাত্মা-'র নিমজ্জন — 'তাঁকে' আপন করে পাবার আকুতি। এর ফলে 'ভক্তি' আন্দোলনে বিশেষতঃ নারী এক অদ্ভুত দোলাচলে ভোগে — বিবাহিত স্বামী আগে না জগৎস্বামীর অগ্রাধিকার এই টানাপোড়েন লাল্লা বা মীরাকে ঘর থেকে 'বাইরে' ফেলেছে।

ভারতের ইতিহাসে নারীর অধ্যাত্মসাধনায় তাকে প্রচুর বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। বহিনাবাঈ (ষোড়শ শতকের মহারাষ্ট্রের ভক্তিসাধিকা) বা মীরাবাঈকে গঞ্জনা আর অপমান সহ্য করতে হয়েছে কারণ অধ্যাত্মসাধনা আর লিঙ্গ সম্পর্কের (gender relation) মধ্যে বিরোধভাষ রয়েছে। অন্তরের ডাকে সাড়া দিয়ে ঘুমন্ত স্ত্রীকে ফেলে রেখে বুদ্ধ বা চৈতন্য সংসার ছাড়ালে তারা নন্দিত হন, অন্যদিকে লাল্লা বা মহাদেবী আক্কা (লক্ষনীয় যৌনতা গন্ধ এড়াতে 'আক্কা' বা বড় দিদি নাম ধারণ করতে হয়েছে) নিন্দিত

হন তাঁদের নির্লজ্জতার জন্য। মীরা ঘোষণা করেন পায়ে ঘুঙরু বেঁধে কৃষ্ণের জন্য নাচতে তিনি লজ্জা বিসর্জন দিয়েছেন যেখানে আজো প্রতি মুহূর্তে ভারতীয় নারীকে শেখানো হয় 'লজ্জাই নারীর ভূষণ'! তাই ভারতীয় সাধিকারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'পাগলিনী' 'উন্মাদিনী' যাঁরা সমাজ সংসারের নিয়ম ভঙ্গ করেছেন। পক্ষান্তরে ভক্তিসাধক অধিকাংশ সময়তেই নিজের সাথে লড়াই করেছেন — জাত বা বর্ণের আগল কাটাতে।

ভারতীয় নারীর অধ্যাত্ম সাধনার বিশেষত্বগুলি নিয়ে আলোচনার আগে সাধারণভাবে ধর্ম ও অধ্যাত্মসাধনার সম্পর্কে কয়েকটি কথা বলে নেওয়া দরকার। 'ধর্ম' বলতে প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাস বা আচরণ বোঝায়, যার যোগ সমাজের সাথে এবং বর্হিঅঙ্গের। সেটি সংস্কৃতি — অনুষ্ঠান, অঞ্চল অনুযায়ী পৃথক হয়ে থাকে। সেখানে অধ্যাত্ম সাধনা আত্মমুখী বা অন্তর্মুখী। দ্বিতীয়তঃ অধ্যাত্মসাধনার অনেক রকমফের রয়েছে। উচ্চস্তরের সাধক-সাধিকারা অনেক সময়েই ভাবের প্রাবল্যে 'সমাধি' প্রাপ্ত হন (রামকৃষ্ণ পরমহংসের এমন একটি সমাধি গ্রস্ত ছবি আমরা অনেকেই দেখেছি) আবার ওঝা গুণিনদের অনেকের উপরে 'দেবতা' বা 'অপদেবতা' ভর করেন। এই 'সমাধি' এবং 'ভর' এর মধ্যে তফাৎ খুবই সুক্ষাতিসুক্ষ এবং অধ্যাত্মসাধনায় কাকে 'ভাবসমাধি' বলব (Loss-ecstative possession) আর কাকে 'ভর' (afflictive possession) বলব সেটা অনেক ক্ষেত্রেই বোঝা দুস্কর। সমাজও এদেরকে নিয়ে দ্বিধায় ভুগতে থাকে। সাধিকাদের অনেক ক্ষেত্রেই 'ভাবসমাধি' হতে দেখা যায়।

এরপর আসে স্রষ্টার সাথে মিলনের প্রশ্ন। হিন্দু ধর্মে পরম স্বত্তা যদিও সময়, স্থান ও পাত্র নিরপেক্ষ (time, space and gender) 'তাঁকে পরম পুরুষ' হিসাবে অনুধাবন করা হয়েছে। যা মোটের উপর পুরুষ (male) চরিত্র লক্ষণ দ্বারা কল্পিত। অন্যদিকে বস্তু জগৎ কে চিহ্নিত করা হয়েছে 'প্রকৃতি' হিসাবে যার মধ্যে রয়েছে নারীর গুণ। যেহেতু 'নারী' জন্ম দেয় তাই 'নারী' = 'প্রকৃতি' মধ্যে জগৎ সংসার ত্যাগ করে তুরীয় (transcendence) অবস্থা প্রাপ্তি অসম্ভব কারণ তাহলে জগৎ সৃষ্টি নষ্ট হয়ে যাবে। অর্থাৎ 'প্রকৃতি'র পক্ষে জগৎসৃষ্টির কারণ পরম পুরুষকে উপলব্ধী অসম্ভব। কাজেই অধ্যাত্মবাদও প্রচলিত লিঙ্গ সম্পর্কেরই প্রতিফলন ঘটায় — পিতৃসুত্রী (patriarchal/male epistemological) জ্ঞানতত্ত্ব মেনে চলে। নারী জন্ম দেয় বলে সংসার ছাড়লে জগৎ/সৃষ্টি ধ্বংস হয়। তাই নারীকে মায়ের উচ্চ আসনে বসিয়ে যতই পুজা করা হোক না কেন তা বস্তুতঃ পিতৃসুত্রী সমাজ এরই সাজান চেহারা।

যেহেতু জগৎ সৃষ্টির কারণকে 'পুরুষ' হিসাবে কল্পনা করা হয়েছে তাই তাকে নিজের করে পেতে, নিজের মধ্যে পেতে ভক্তি সাধক সাধিকারা নারী-পুরুষের যৌন সম্পর্কের রূপক দিয়ে নিজেদের মরমিয়াঁ অভিজ্ঞতাকে বর্ণনা/ব্যাখ্যা করেছেন। দেশে কালে ভিন্ন ভিন্ন জায়গায় তাই বধু বেশে/রূপে মরমিয়াঁ সাধনা করতে দেখা যায় (bridal mysticism) নারী সুফি সাধিকা রাবিয়া বা পুরুষ সুফি সাধক বসরার হাসান এর রচনা ঈশ্বর সাধনার প্রকাশ ঘটে কামজ প্রেম গীতিকায়। খ্রীষ্টান ধর্মেও ম্যাগ্‌ডেবুর্গের মেথিল্ড ঐশ্বরিক 'স্বাথী'র সাথে তাঁর প্রেমজ সাক্ষাৎকারের পর্ণনা দিয়েছেন। সিয়েনার ক্যাথরিন যিশুর দেওয়া বিয়ের আভাটি দেখাদেন। 'ভক্তি' ধর্মেও অন্ডাল মীরা বা মহাদেবী আক্কার রচনায় এই 'বধু বেশী

মরমিয়া আকুতি দেখা যায়। কেবল নারীরা নয় পুরষ সাধকরাও নিজেদেরকে নারী হিসাবে কল্পনা করেছেন। কবীর বা দক্ষিনের মনিকুভাসাগার নারীকে ছলনাময়ী, প্রলুব্ধকরিনী হিসাবে চিত্রিত করলেও পরমেশ্বরের সাথে মিলনাকাঙ্খায় নিজেদেরকে কখনো নারী হিসাবেই চিত্রিত করেছেন। ফলে যে নারী 'প্রকৃতি' জন্মদাত্রী হিসাবে জগৎ সৃষ্টির আধার হবার কারণে 'পরমাত্মা' বা 'পরম পুরুষের স্বত্তা উপলব্ধীর তুরীয় আনন্দ (transcindental joy) অপারগ সেই নারীই শারীরিক কারণেই 'পুরুষ'কে নিজের শরীরে 'ধারণ' করেছেন বলে ভক্তিবাদীরা মনে করেন। ফলে নারীর 'দুর্বলতাই' হয়ে দাঁড়ায় তাঁর বিশেষ শক্তির উৎস।

তবে এটাও মনে রাখতে হবে যে বধুঁয়া হিসাবে আত্মোপলব্ধীই মরমিয়া সাধনার একমাত্র পথ নয়। বধু বেশী সাধনার পাশে অর্ধনারীশ্বর এর ধারণা যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে অদ্বৈত মরমিয়াবাদ (monotheistic mysticism)। অন্ডাল বা মীরা নিজেদেরকে কৃষ্ণের সঙ্গিনী হিসাবে গোপিনীরূপে 'মধুর' ভাবে প্রেয়কে উপাসনা করলেও করাইক্কাল অম্মাইয়র নিজেকে প্রেয়সী হিসাবে উপস্থাপিত করেন নি। এই লোলচর্মা, কঙ্কালসদৃশা 'সাধিকা' শ্মশান বাসিনী যেখানে তিনি (ভূত প্রেতের সাথে) শিবের তান্ডব নৃত্য উপভোগ করেন।

এখানে মনে রাখতে হবে যে সাধিকারা সাধারণভাবে 'পাগলিনী' 'উন্মাদিনী' (deviant) হিসাবে পরিগণিত হয়েছেন। আবার কোথাও তাদের সঙ্গে দেহপোজীবীনীদের এক করে দেখা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতে দেবদাসীদের ছোটবেলাতেই মন্দিরের দেবতাদের সাথে 'বিবাহ' দেওয়া হত। যেহেতু দেবতা অবিনশ্বর তাই এই দেবদাসীরাও চির এঁয়োস্ত্রী থাকতেন — এদের বলা হত 'নিত্য সুমঙ্গলী', যাদের মঙ্গল চিহ্ন বা শাখা সিঁদুর অক্ষয় হত। অন্যদিকে নগর বধুদের ও নিত্যনতুন গ্রাহক ছিল ফলে তাঁরাও এক অর্থে চির এঁয়োস্ত্রী। বলা যায় ঈশ্বরের প্রতি একনিষ্ঠ সাধিকাদের কে নারীর কোন নির্দিষ্ট ছাঁচে ফেলা সম্ভব নয় বলে তাঁদের কে বা তাঁদের প্রথা বহির্ভূত আচরণকে এইভাবে সমাজ প্রান্তিক করে রেখেছিল।

১২.৩.৫.২ : ভক্তি-আন্দোলনে নারী

এবার আসা যাক ভারতের নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে 'ভক্তি' আন্দোলনের আলোচনায়। শাস্ত্রে বলা হয়েছে 'ভক্তি উৎপনানা দ্রাবিড়ে' অর্থাৎ ভক্তি দ্রাবিড় বা দক্ষিন দেশে জন্মায়। ভারতের অন্যত্র যেমন, দক্ষিনেও খ্রীষ্টিয় শতকের গোড়ায় বৌদ্ধ এবং জৈনধর্মের রমরমা ছিল। পাথরের গায়ে বা গুহায় অঙ্কিত তামিল ব্রাহ্মী লেখমালার সাক্ষ্যই হোক বা 'শিলবদিকারম' অথবা 'মনিমেগলঈ' এর মত কাব্যের সাক্ষই হোক উভয়ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে এই প্রতিবাদী আন্দোলনের চাপে দক্ষিনে যজ্ঞকেন্দ্রিক ব্রহ্মণ্যধর্ম কোনঠাসা হয়ে পড়েছিল। এই পরিস্থিতির পরিবর্ত্তন ঘটল ষষ্ঠ-নবম শতকে যখন শৈব-বৈষ্ণব ভক্তি সাধক বা সাধিকারা, যারা যথাক্রমে নায়নার-আলভার নামে পরিচিত, তাদের পাথর গলানো গানে এবং অচিন্তনীয় কাজের মধ্য দিয়ে সাধারণের মধ্যে আবার শৈব ও বৈষ্ণব ধর্মকে জনপ্রিয় করে তুললেন।

এঁদের রচনায় জাতি নির্বিশেষে ঈশ্বরের সাথে ভক্তের পূর্ণ মিলনের আকাঙ্খা ফুটে উঠেছে। রামানুজ এর শ্রীবৈষ্ণব আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বৈষ্ণব ভক্তি তামিল ভাষী এলাকা ছাড়িয়ে অন্ধ্র কর্ণাটক অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়ে। অন্যদিকে দ্বাদশ শতকে কর্ণাটক-মহারাষ্ট্রে কল্যান অঞ্চলে বীরশৈব ধর্ম শুরু হবার পর কর্ণাটক-অন্ধ্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এই ধর্মের প্রভাব ছড়িয়ে পড়ে। রামানুজের অনুকারীদের মাধ্যমেই এই আন্দোলন উত্তরভারতেও প্রসারিত হয়েছিল।

দক্ষিনে যে শৈবভক্তির সুত্রপাত তার 63টি জন 'তোন্ডার' বা ভক্তদের জীবনা পাওয়া যায় 'পেরিয়পুরাণম' গ্রন্থে। এর মধ্যে কেবল তিনজন ছিলেন নারী। এরা হলেন করাইককাল অমমাইযার, মঙ্গাইয়ার ককারাসিয়র এবং ইসাইনাবিয়র যিনি ছিলেন বিশিষ্ট শিবভক্ত সুন্দরমুর্ত্তি নায়নার এর মা। অন্যদিকে 63টি জন বিষ্ণু ভক্তের মধ্যে কেবল অন্ডালই নারী। ইনি 'চুডিকোডুত্তা নাচ্চিয়র' নামে পরিচিত। এই নামের পেছনে গল্প আছে। অন্ডাল এর পিতা বিশিষ্ট বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুসিত্তর ছিলেন শ্রীরঙ্গম মন্দিরের কর্মী। ইনি প্রতিদিন ফুল গেঁথে মালা তৈরী করে সকালে শ্রীরঙ্গম মন্দিরে অধিশ্বর শ্রী রঙ্গ নাথকে সকালে স্নান করানোর পর পড়াতেন। বালিকা অন্ডাল হলেন বিষ্ণুসিত্তর এর আদরের মেয়ে। ইনি বাবা মারা গেঁথে স্নানে গেলে তার অজান্তে ওই মালা নিজের গলায় পড়ে দেখতেন মালা ঠিক হয়েছে কিনা। একদিন তাঁর এই কাজ ধরা পড়ে গেল। তাঁর স্পর্শে 'কলুষিত' মালা ফেলে দিয়ে সেদিন বিষ্ণুসিত্তর নতুন করে কলুষ মুক্ত মালা গেঁথে শ্রীরঙ্গনাথকে পড়ালেন। কিন্তু রঙ্গনাথ সেদিন সেই পরিচিত সুগন্ধ না পেয়ে সারাদিন অস্বস্তিতে কাটালেন। সেই থেকে অন্ডাল এর নাম হল 'চুডিকডুত্তা নাচ্চিয়র — যে কন্যা দেবমাল্য প্রথম নিজে পড়ে দেবতাকে পরান। মালাবদলের মধ্যে ঈশ্বর বা শ্রীরঙ্গ নাথ এর সাথে অন্ডাল এর দৈববিবাহও ঘটে গেল। ঈশ্বর - ভক্তের এই 'মধুর' লীলা অন্ডালকে বিখ্যাত করেছিল। পরে কথিত আছে যে তিনি রঙ্গনাথের দেবমুর্ত্তিতে বিলীন হয়ে যান যেভাবে প্রায় আটশো বছর বাদে মীরাও দেবমুর্ত্তিতে বিলীন হয়ে গিয়েছিলেন। অন্ডাল এর দুটি রচনা পাওয়া যায়। একটি হল 'তিরুপ্পাডাই' (30টি স্তোত্র) এবং 'নাচ্চিয়র তিরুমোলী' (143টি স্তোত্র)। 'তিরুপ্পাডাই'তে সঙ্গম সাহিত্যে বর্ণিত একটি প্রাচীন ব্রত-র **নোনবু** উল্লেখ রয়েছে। ভাল স্বামী পেতে অবিবাহিত মেয়েরা এই **প্পাভাই নোনবু** বা ব্রত রাখতো। এই রচনায় অন্ডাল মায়োন বা কৃষ্ণের স্ত্রী নাপ্পিনাইকে অনুরোধ করছেন তিনি যেন মায়োন কে তাঁর বাহুপাশ থেকে মুক্তি দেন যাতে অন্ডাল তাঁর ব্রত সম্পূর্ণ করতে পারেন। তবে এই মিলনের পরেই আছে বিচ্ছেদ আর 'নাচ্চিয়র তিরুমোলী'র অধিকাংশ জুড়েই আছে 'বিরহের' হাহাকার। সহগম সাহিত্যে 'কাইক্কিলাই' হল একতরফা প্রেম এর অবস্থা (অবশ্যই মানবিক প্রেম)। এখানে এই সাহিত্যিক রূপটিকে ব্যবহার করে অন্ডাল মায়োন এর প্রতি তাঁর একতরফা, প্রতিদান হীন তীব্র ভালবাসাকে চিত্রিত করেছেন।

নাচ্চিয়র তিরুমোল্লীর ছত্রে ছত্রে আমরা সেই তীব্র হাহাকার শুনতে পাই :

'তিনি হলেন বেদের সারাৎসার তবু তিনি আমার শরীরের সব মানেটুকু শুষে নিয়েছেন'।

না তি স্তোত্র নং : 6

'শঙ্খ তোমার কত সৌভাগ্য
যে কৃষ্ণের অধর অমৃত তোমার স্পর্শ করে
অন্ডাল এর প্রশ্ন হল তার/তাদের স্বাদ কেমন
তাতে কি কস্তুরীর সৌরভ নাকি
পদ্মের গন্ধের মতই মিষ্ট ঘ্রাণ ?
ওই সমুদ্রনীল সুন্দর ঠোঁটের স্বাদই বা কেমন?
যে মাধব হাতির দাঁত ভেঙ্গে ফেলেন
সেই মাধবের অধর সৌন্দর্য জানতে
আমি পাগল হয়েছি।'

না তি স্তোত্র নং : 5

'তিনি তো কই আমার খোঁজ নেন না।
আমার যে দীর্ণ ভগ্ন অবস্থা তাতে তাঁর কিছু যায় আসে না'
আমি তবে আমার স্তন দুটি ছিড়ে ফেলব
ছুড়ে দেব ওই প্রতারকের বুকে
কারণ তারা ত সেই গোবর্ধনের
সঙ্গ সুখ বঞ্চিত।'

করাইক্কাল অম্মাইয়ার অন্যদিকে তপস্যায় নিজেকে কঙ্কাল সদৃশ করে তোলেন যাতে তাঁকে দেখে কেউ কোন ইন্দ্রিয়জ আকর্ষণ অনুভব না করেন। তিনি নিজেকে 'পেয়' (pay) বা প্রেত রূপে রূপান্তরিত করেন। তাঁর এই রূপান্তরে তাঁর স্বামী তাঁকে প্রণাম করেছিলেন।

অম্মাইয়র এর নিজের সম্পর্কে বর্ণনা নিম্নরূপ :

'তাঁর স্তন শুকিয়ে গেছে
শিরাগুলো ফুটে বেরিয়েছে
দাঁতের জায়গাগুলো খালি
চুলে জটা, কোটরগ্রস্ত পেট
শ্বদন্ত গোড়ালীর হাড় বেরিয়ে আছে
নির্জন শ্বশ্মানে সেই প্রেত নারী কেঁদেই চলেছে
যেখানে
আগুনের মধ্যে জটাজুট শিব
নৃত্যরত
যার বাস আলাঙ্গাতুতে।।'

কাশ্মীরে তেমনি ছিলেন সাধিকা লাল্লা। তিনি উলঙ্গিনী হয়ে গান গেয়ে বেড়াতেন যাকে 'বাক' বলা হয়। তিনি গেয়েছেন :

'লাল্লা, যা বহির্ভূত তার সম্পর্কে কেন চিন্তা কর
মনকে নিজেতে বিবেশ কর
এইভাবে মন দ্বিধাশূণ্য হবে
বাতাস আর আকাশ এর চেয়ে সুন্দর আভরণ আর কি ?
বস্ত্রাবরণ, তা কি তত আরামের ?'

লাল্লার শ্বশুর তাঁকে পরপুরুষের সামনে তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে পরামর্শ দিতে গেলে লাল্লা বলেছিলেন 'আমি ত কই পুরুষ দেখছি না। সবই ত ভেড়া।'

বীরশৈব ধর্মের একজন বড় সাধিকা মহাদেবী আক্কাও একই ভাবে উলঙ্গিনী হয়ে ঘরে বেড়াতেন। তিনি বলেছেন

'নিলজ্জ মেয়েটা মল্লিকার্জুনের আলো মেখে গায়।

রে মুর্খ ওর বস্ত্র আভরণের প্রয়োজনটা কোথায়।'

মধ্যযুগে উত্তর ভারতের অন্যতম প্রধান ভক্তি সাধিকা হলেন মীরাবাঈ যার ভক্তিগীতি আজো আমাদের উদ্বেলিত করে। আজ মীরার কাহিনী সিনেমায়, উপন্যাসে এমন কি অমরচিত্র কথার মত শিশুদের পাঠ্য কমিকস্ট্রি গুলিতে সহজলভ্য হলেও সমসাময়িক সূত্রে মীরাবাঈ প্রায় অনুপস্থিত। তাঁর অনুপস্থিতি এতটাই যে কোনো কোনো গবেষক মীরাবাঈ এর ঐতিহাসিকত্ব নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন। মোটামুটি ভাবে যে ছবিটা উঠে আসে তা হল মীরা ছিলেন মেরতার (বর্তমানে মারোয়াড়) বাসিন্দা এবং ছোট বেলা থেকেই কৃষ্ণ ভক্ত। মেবার এর রাণা (কেউ কেউ রাণা সঙ্গ বা সংগ্রাম সিং বললেও সম্ভবতঃ রানা সঙ্গের ছেলে ভোজরাজের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয় 1516 খ্রীঃ সূত্রঃ সপ্তদশ শতকে যোধপুরের রাণা যশবন্ত সিংহের কর্মচারী মুহনোৎ **নয়নসীর নয়নসী রি খয়াৎ**) - র মানে তাঁর আপত্তি স্বত্ত্বেও বিয়ে হলে তিনি সাথে করে নন্দলাল এর মুর্ত্তি নিয়ে আসেন। তিনি বিভিন্ন ধরণের সন্ন্যাসীদের সাথে সাধুসঙ্গ ও চালিয়ে যেতে থাকেন। পরপুরুষের সাথে তাঁর এই মেলামেশা শ্বশুরবাড়ীর পছন্দসই ছিল না বলাই বাহুল্য। ননদ এসে তাঁকে বোঝাবার চেষ্টা করে ব্যার্থ হন। রেগো রাণা তাঁকে বিষ দিলে দৈব অনুগ্রহে তা পবিত্র বারীতে রূপান্তরিত হয়। বন্ধ ঘরে কার সঙ্গে মীরা কথা বলেন সেটা জানতে চর লাগান হয়, ঘরে নন্দলালের মুর্ত্তি ছাড়া আর কিছুই না পাওয়ায় বিভ্রান্তি চরমে ওঠে। সুযোগ সন্ধানী কেউ কেউ তাঁর ভাবোন্মত্ততার সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন। একবার সাধুবেশী এক কপটাচারী এসে ওঁকে বলেন যে কৃষ্ণ তাঁর সাথে শারিরিক সম্পর্কে লিপ্ত হতে আদেশ দিয়েছেন। মীরা বলেন ঈশ্বরের আদেশ যখন তখন সেটা সর্বসমক্ষে পালনীয় — এতে সেই কপটাচারী পিছু হটে, এবং তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এমনও কথিত আছে যে সম্রাট আকবর এবং গায়ক তানসেন তাঁর সাথে দেখা করেছিলেন। বাইরের লোকের সঙ্গে বিশেষতঃ বিধর্মীর সাথে তাঁর এই মেলামেশার কারণে তাঁর শ্বশুরকুলে সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া তৈরী

হয় এবং মেবার ছেড়ে তিনি প্রথমে বৃন্দাবন ও পরে বেনারসে এসেছিলেন। শেষে তিনি দ্বারকায় কৃষ্ণমূর্ত্তিতে বিলীন হন। ইদানিংকালে কিছু নৃতাত্বিক গবেষণায় দেখা গেছে যে মীরার ঐতিহ্যের ব্যাপারে রাজস্থানে বিপরীত ধর্মী মানসিকতা কাজ করেছে। লোকসাহিত্যে মীরার ভজন ও তাঁর একরকম 'বক্তব্য' রক্ষিত হয়েছে। অন্যদিকে রাজপরিবারের মধ্যে বেশরম, পায়ে ঘুঙরু বেঁধে নাচা মীরা সম্পর্কে পুরুষতন্ত্রী বিদ্বেষই কাজ করেছে।

মহারাষ্ট্রে একাধিক সাধিকা দেখা যায়, যাদের মধ্যে অনেকেই ছিলেন গৃহবধু। এমনই একজন মক্তাবাই। তাঁর রচনায় সাংকেতিক ভাষায় ঈশ্বর উপলব্ধীর কথা পাওয়া যায় :

চাঁদ গিলে খেল সূর্যকে
বাঁজা মেয়ের পেটে
হল ছেলে
কাঁকড়াবিছে গেল মাটির তলায়
শেষনাগ হাজার মাথায় কুর্ণীশ করে
পোয়াতি মাছির
পেটে জন্ম হল বাজ পাখির
এসব কান্ডকারখানা দেখে
আর মুক্তা হাসে।

আরেকজন সাধিকা হলেন জনাবাঈ। অনাথ এই মহিলা সন্ত তুকারামের বাড়িতে কাজ করতেন। তাঁর একটি রচনা

'আমি ঈশ্বর যাই
আমি ঈশ্বর পান করি
আমি তাঁর উপর শুই
আমি ঈশ্বর কিনি
আমি ঈশ্বর গুনি
ঈশ্বর এখানে
শুন্যতা ও ঈশ্বর ময়।
ঈশ্বর হৃদমাঝারে
বাইরেও তিনি বিরাজমান
আবার সব দিয়ে থুয়েও
কিছুটা ভাগ বাকি থেকে যায়'

এমন আরেকজন হলেন অন্ত্যজ সাধক চোকামেলার স্ত্রী সয়রাবাঈ। তাঁরও অনেক রচনা রয়েছে। আর রয়েছেন সপ্তদশ শতকের রচয়িত্রী বহিনাবাঈ। তাঁর অনেক রচনায় (মহারাষ্ট্রে এমন ভক্তিগীতিকে বলে অভঙ্গ) এক দুঃসহ জীবনের ছবি রয়েছে।

বেদ চিৎকার করে পুরাণ হাঁকে
মেয়ে মানুষ ভাল কিছু করে না।
আমার নারীর দেহে জনম হল —
কি করে আমি মুক্তি পাব ?
মেয়েরা বোকা, দেয় ধোঁকা
তাদের সংস্পর্শে ক্ষতি
বহিনা বলে মেয়েরা এত খারাপ হলে
তার মুক্তি হবে কেমনে ?

পূর্বজন্মের কোন পাপে আমার এই দশা ? ....

বহিনাবাঈ এর জন্ম উচ্চ বর্ণে, তাই কি তিনি আরো বেশি নির্যাতিতা — আমরা জানিনা, তবে গার্হস্থ ধর্ম পালন করলেও দিনগত পাপক্ষয়ের মধ্যেও তুকারামের আশ্রয়ে তিনি 'মুক্তি' পান।

বাংলাতেও চৈতন্য পরবর্ত্তী যে বৈষ্ণব ধর্মের বিকাশ ঘটে বিশেষতঃ নিত্যানন্দের নেতৃত্বে সেখানে কোন কোন নারী সাধিকা গুরুর মর্যাদা পেয়েছেন যেমন জাহ্নবা দেবী।

এই আলোচনায় দেখা গেল যে ভক্তি আন্দোলনের মধ্যে নারী-পুরুষ সম্পর্কের যে ছাঁচ সমাজ তৈরী করেছিল অনেক সময় মেয়েরা সেই ছাঁচ ভেঙ্গে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছে। লাল্লা বা মীরা বা মহাদেবী আক্কা ছিলেন বিদ্রোহী কখনো আবার প্রেয়সী বধুর বেশে ঈশ্বর সাধনা মেয়েদের আজন্মলালিত সংস্কারকে ব্যবহার করলেও আদলটার উল্লেকযোগ্য পরিবর্ত্তন ঘটানো হয়েছে — আগে ছিল নারী নরকের দ্বার। তার শরীর 'প্রকৃতি' জন্ম, মৃত্যুর প্রাত্যহিকতায় বন্দী। এখন সেই শরীরও দেহ এবং দেহাতীত প্রেমে 'পুরুষের' কামনায় উন্মুখ। কখনো আবার নারী হয়ে উঠেছেন দেহাতীত প্রেমে উন্মুখ কেমন করাইক্কাল অম্মাইয়র। প্রেয়সীর পরকিয়া প্রেম বা প্রেতরূপ ছাড়াও গার্হস্থ ধর্মে স্থিত সাধারণ মহিলারাও গৃহধর্মের আগল ভেঙ্গে ফেলেছেন যেমন বহিনাবাঈ। শেষে বলাই যায় যে ভক্তিধর্মের মধ্যে লিঙ্গ সম্পর্কের (gender relations) আমূল পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনা থাকলেও তা বাস্তবে সব সময় রূপান্তরিত হয় নি।

১২.৩.৫.৩ : বীরশৈব ধর্মে নারী

বীরশৈব ধর্ম ভক্তি আন্দোলনের একটি সুনির্দিষ্ট রূপ। ভক্তি আন্দোলনের বিভিন্ন রূপ বা ধরণ আছে — প্রধানতঃ একে **নির্গুন** ও **স্বগুন** ভক্তি এই দুই ভাগে ভাগ করা যায়। নির্গুন ভক্তি হল

নিরাকার, নিরাবয়ব ঈশ্বর এর ভজনা। যদিও শিব বা বিষ্ণুর নাম থাকে কিন্তু যে পৌরাণিক শিবের কান্ডকারখানার সাথে আমাদের পরিচয় ইনি তার থেকে আলাদা। অন্যদিকে স্বগুণ ভক্তি হল নির্দিষ্ট আকার বিশিষ্ট দেবমুর্ত্তির প্রতি প্রেম — যেমন রাম বা কৃষ্ণ। বীরশৈব ধর্ম নির্গুন ভক্তির প্রকাশ যেমন উত্তর ভারতে আমরা কবীর এর রচনায় দেখতে পাই।

বীরশৈব ধর্মের সাথে দক্ষিণে উৎপন্ন ভক্তির অনেকাংশে মিল দেখতে পাওয়া যায়। উভয়েই জৈনদের কর্মবাদী মতাদর্শকে অগ্রাহ্য করেছিলেন। কর্মবাদী মত অনুযায়ী জীবস্বত্তা কর্মফলের চক্রে, বন্দী। সে তার কর্মের মধ্য দিয়েই জন্ম-মৃত্যুর চক্রাবর্ত্তন থেকে মুক্তি পেতে পারে। এক অর্থে এটা নিরিশ্বরবাদী দর্শন — কারণ জীবের নিজস্ব কর্মফলেই তার থেকে মুক্তির সম্ভাবনা নিহিত। কিন্তু ভক্তিবাদীরা মনে করেন কর্মবাদ মিথ্যা। সৎ কর্মপ্রচেষ্টাতেই মুক্তি আসবে না যদি না ঈশ্বর এর **কৃপা** না থাকে আর ঈশ্বর কার উপর কৃপা করবেন তার সিদ্ধান্ত কর্মের দ্বারা নয় **লীলা** বা খামখেয়াল দ্বারা নির্ধারিত হয়।

একদিকে যেমন মনে হতে পারে যে এই মতাদর্শ অন্ধ নিয়তিবাদের জন্ম দেবে তেমনি কর্মফল তো কেবল বৈষয়িক কাজে সীমিত নয় — আধ্যাত্মিক জীবনেও দেবপূজা, তীর্থযাত্রা, ভজন পূজনের পেছনে বৈষয়িক উদ্দেশ্য থাকে — দেবতাকে সন্তুষ্ট করে বা ঘুষ দিয়ে শেষ পারানীর কড়ি সংগহ করা। এও এক ধরণের 'দুর্নীতি'। ভক্তিবাদী বিশেষতঃ বীরশৈবরা মনে করেন ঈশ্বর ভক্তি কারণ 'মুক্তি' বা বৈষয়িক উন্নতি নয়, ঈশ্বরকে জানা বা তাতে লীন হওয়াই ভক্তিবাদীর লক্ষ্য। তাঁরা '**অনুভব**' ও 'অনুভাব' এর মধ্যে সুস্পষ্ট তফাৎ করেন। প্রথমোক্ত অভিজ্ঞতা জীবের নিজস্ব প্রচেষ্টায় সম্ভব কিন্তু **অনুভাব** — ঈশ্বরোপলব্ধী একমাত্র ঈশ্বর এর কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়।

যদি তাই হয় তাহলে ভজন পূজন, মন্দিরে মন্দিরে দেবারতি। তীর্থযাত্রা, জাত-পাতের ভেদ সবই মিথ্যে হয়ে যায়। এখানেই হল ভক্তি তথা বীরশৈব ধর্মের বৈপ্লবিক উপাদান।

বীরশৈব ধর্মের সাথে বাসভান্নার নাম ওতপ্রোতভাবে জড়িত তিনি 1106 অব্দে মর্ণিগাভল্লী নামে একটি জায়গায় (কর্ণাটকে) জন্মগ্রহণ করেন এবং 1167 বা 1168 তে দেহান্ত হয়। তিনি কল্যানী চালুক্য রাজ বিজ্জলের 'ভান্ডারী' (বিত্তআধিকারিক) ছিলেন। তবে তাঁর আরাধ্য ছিলেন কুড়াল সঙ্গম দেব (কুড়াল — কন্নড়ভাষায় দুটি নদীর সঙ্গমমুল বোঝায়) এবং তাঁর নেতৃত্ব বীরশৈবধর্ম খুবই জোরাল হয়ে ওঠে। বীরশৈবরা সমস্ত ধরনের আনুষ্ঠানিকতা বর্জন করেছিলেন (যদিও তাঁরা নিজস্ব পাল্টা অনুষ্ঠান শুরু করেছিলেন)। তাঁদের কাছে প্রধান আরাধ্য 'গুরু', 'লিঙ্গ' এবং 'জঙ্গম'। গুরু-ঈশ্বর, বীরশৈবরা শরীরে একটি লিঙ্গ ধারন করতেন আর 'জঙ্গম' হলেন ভ্রাম্যমান ধর্মীয় যোগী। কল্যানে একবার এক প্রাক্তন অন্ত্যজ ছেলে (বীরশৈব ধর্ম গ্রহণ করলে আর জাতি বৈষম্য থাকতো না) এবং এক ব্রাহ্মণের মেয়ের মধ্যে বিবাহ স্থির হয়। উভয়েই বীরশৈব সমাজের সদস্য। কল্যানের ঐতিহ্যপন্থীরা এই 'অনাচার' সহ্য করতে না পেরে বর বধুর মা বাবাকে নৃশংসভাবে প্রাণদন্ড দেন। এর প্রতিবাদে বীরশৈবদের মধ্যে উগ্রপন্থীরা বিজ্জলকে হত্যা করেন যদিও বামভন্না তা চান নি। এর পর তিনি কল্যান ছেড়ে কাপ্পাডিসঙ্গমে চল যান এবং সেখানেই প্রাণত্যার্গ করেন। অন্যদিকে রাষ্ট্রিয় সন্ত্রাস সহ্য করতে না পেরে বীরশৈবরা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে পড়েন।

মহাদেবী আক্কা

মহাদেবী আক্কা (বড়দিদি) ছিলেন বাসভান্না বা আল্লমার সমসাময়িক, শিবমোপ্পার অন্তর্গত উড়ুতাড়ি গ্রামে তাঁর জন্ম। উড়ুতড়িতে শিব মল্লিকার্জুনের রূপে পূজিত হতেন এবং মহাদেবী ছিলেন তাঁর একনিষ্ঠ ভক্ত। এলাকার রাজা কৌশিক এর সাথে তাঁর বিবাহ হলেও মনে মনে তাঁর অনুরূপ ছিল শুধু শিবের প্রতি তাই তিনি সংসার ছেড়ে ঘুরতে ঘুরতে কল্যানে এসে পৌঁছন। এর মধ্যেই তিনি বস্ত্রাভরণ ত্যাগ করেছিলেন। এখানে তাঁকে বিশিষ্ট বীরশৈব সাধক অল্লামার প্রশ্নবানের সম্মুখীন হতে হয় — যেমন অল্লামা তাঁর উলঙ্গবেশ সম্পর্কে প্রশ্ন করেন। বস্ত্রাবরণ ত্যাগ করলেই কি মায়ার বন্ধন কাটান যায় ? তবে তুমি কেশাবরণে নিজেকে সাজিয়েছ কেন ? মহাদেবীর উত্তর ছিল নিজের কাছে সৎ : তিনি বলেন —

'ফল না পাকলে কি
খোসা ছাড়ান যায় ?'

অল্লামা তাঁকে দিক্ষিত করেন কিন্তু তাতে তাঁর কষ্ট তো মিটল না। ঈশ্বর মিলনে আকুল, সমাজে নারীর যে শিকল তার নিষ্মেষনে কাতর মহাদেবী তাই আবার বেরিয়ে পড়েন এবং কথিত আছে তিনি চেন্নামল্লিকার্জুনে 'বিলীন' হয়ে যান। যে সমাজ কেমন করে নারীকে বাঁধে তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মহাদেবীর এই 'বচন'

'আমার শ্বাশুড়ি হল মায়া
জগৎ হল শ্বশুর
তিন দেওর ভামুর যেন বাঘ
স্বামীর মনে অন্য নারীর চিন্তা
ননদের চোখ এড়িয়ে কেমন
করে তাঁর সাথে মিলন হবে' ?

এখানে প্রেমিকের সাথে পরকীয়া মিলনে উৎসুক এক অভিমারিকার রূপকের মধ্যে ঈশ্বর ভক্তির কথাই ফুটে উঠেছে : মায়া হল মোহাঞ্জন, তিন দেওর ভাসুর হল তিন **গুণ** - সত্ত্ব রজ ও তম। স্বামী হল কর্ম আর ননদ হল **বাসনা**। এদের পার হয়েই অভিমারিকাকে ঈশ্বর মিলনে যেতে হয়।

১২.৩.৫.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Vijaya Ramaswamy, *Walking Naked; Women, Society, Sprituality in South India. IIAS,* simla, 1997.

২। Nancy Martin-Kershaw, Mirabai in the Academy and the Politics

of Identity' in *Faces of the Feminine in Ancient, Medieval and Modern India,* (ed.) Mandakranta Bose, Oxford, 2000. pp 162-182.

৩। Eleanor Zelliot, Women Saints in Medieval Maharashtra', ibid pp 192 - 200.

৪। A.K. Ramanujan, *Speaking of Siva*.

১২.৩.৫.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ভক্তি ধর্মে সাধিকাদের সঙ্গে আজন্মলালিত লিঙ্গ সম্পর্কের (gender relation) দ্বান্দিকতার চরিত্র বিশ্লেষণ কর।

২। বীরশৈব ধর্ম সম্পর্কে যা জান লেখ। এই ধর্মের সাথে ভক্তি ধর্মের মিল খুঁজে পাওয়া যায় কি?

———

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

REFORM MOVEMENTS AND WOMEN

একক - ৬

(a) Brahma Samaj (b) Arya Samaj (c) Theosophical Movement

বিন্যাসক্রম ঃ

১২.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

১২.৩.৬.১ ঃ ভূমিকা

১২.৩.৬.২ ঃ ব্রাহ্মসমাজ

১২.৩.৬.৩ ঃ আর্য সমাজ

১২.৩.৬.৪ ঃ থিওসফিক্যাল আন্দোলন (Theosophical Movement)

১২.৩.৬.৫ ঃ উপসংহার

১২.৩.৬.৬ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.৩.৬.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৩.৬.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে নারীর ভূমিকা।

(২) অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব।

(৩) আর্য সমাজে ও থিওসফিক্যাল আন্দোলন-এ নারীর ভূমিকা।

১২.৩.৬.১ : ভূমিকা

উনিশ শতকের সাম্রাজ্যবাদী শাসন এবং তারফলে যে সামাজিক পরিবর্ত্তন ঘটেছে তাঁর কারণে নারী বা সমাজে নারীর অবস্থান একটি প্রধান আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। জেমস মিল ছিলেন একজন গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাবিদ এবং তার লেখা History of British India (প্রথম প্রকাশ 1826) ছিল শিক্ষানবিস ICS দের অন্যতম প্রধান পাঠ্যগ্রন্থ। এতে তিনি এই মত ব্যাক্ত করেন যে সমাজে নারীর স্থান হল একটি সমাজ বা সভ্যতার উন্নতির মাপকাঠি। তিনি একটি সরল সুত্রও তৈরী করেন — বর্বর জাতির মধ্যে সাধারণতঃ মহিলাদের অবস্থান নিচু, অন্যদিকে উন্নত বা সভ্য মানুষের মধ্যে মহিলারা যথেষ্ট সম্মান পেয়ে থাকেন। তাঁর মতে সমাজ যত উন্নত হবে মহিলাদের অবস্থানও উন্নত হবে, যতদিন পর্যন্ত না তারা পুরুষের সমকক্ষ হয়ে তাদের সেচ্ছামূলক অংশিদার হয়ে ওঠে। মিল কোনোদিন ভারতে পদার্পন করেন নি। ভারতীয় বিশেষতঃ হিন্দু আইন সম্পর্কে তাঁর ধারণা তৈরী হয় Halhed কৃত 'মনুস্মৃতি'র অনুবাদ Code of Gentoo law এবং কিছু করতে আসা বিদেশী পর্যটকদের লেখা পড়ে। সেই অনুযায়ী ভারতীয় সমাজ সম্পর্কে তাঁর, সিদ্ধান্ত ছিল যে মহিলা জাতির প্রতি হিন্দুদের অবজ্ঞার মনোভাব তাদের মজ্জাগত। মিলের এই বক্তব্যের সাথে খ্রীষ্টান মিশনারীদের অভিমতের সাজুজ্য রয়েছে। এই অভিমতগুলি থেকে এই ধারণা দানা বাঁধে যে ভারতীয়দের সামরিক দুর্বলতার কারণ ছিল নারীর প্রতি তাঁদের অবজ্ঞার মনোভাব। পরবর্ত্তীকালে সামাজিক ডারউইনবাদ বা প্রত্যক্ষবাদী মতাদর্শের (Positivist ideology) র প্রভাবে দেখানো শুরু হয় যে সামাজিক অবস্থা বিশেষতঃ নারীর অবস্থা বৈগুন্যে ভারত পশ্চিম ইউরোপ বা মধ্য এশিয়ার দেশগুলির থেকে অনেকটাই পিছিয়ে রয়েছে। যদিও এই অবস্থা থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভের উপায় নেই বললেই চলে। তথাপি সংস্কারের মাধ্যমে নারীর অবস্থায় তারতম্য এলে কিছুটা হলেও পরিবর্ত্তন আসতে পারে। এইভাবে নারীর অবস্থা বিশেষতঃ সংস্কার উনিশ শতকের সরকারী ভাষ্যে প্রধান উপজীব্য হয়ে উঠল।

এই বিচার এর ক্ষেত্রে ভারতীয়দের মতামত ও সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। প্রাথমিকভাবে দুটি প্রধান অভিমত বেরিয়ে আসে। প্রথমতঃ কারোর কারোর মতে ভারতীয় নারীর অবস্থা ইউপোপীয় নারীর তুলনায় খুব খারাপ ছিল না। অন্যদিকে কেউ কেউ মনে করতেন যে সংস্কার অবশ্য প্রয়োজনীয়। রামমোহন, বিদ্যাসাগর বা দয়ানন্দ সরস্বতীর মত সমাজ সংস্কারকরা দেখাবার চেষ্টা করেছেন যে ভারতে প্রাচীনকালে মহিলা উচ্চ সম্মানের অংশীদার ছিলেন, তাঁরা শিক্ষা ও সামাজিক মর্যাদায় গরীয়ান ছিলেন। বিশেষতঃ বেদের আমলে। কিন্তু স্মৃতিশাস্ত্রর রচনার কালে এই মর্যাদা অবলুপ্ত হয়। একদিকে এই বক্তব্য মিল এর অভিমতকে কিছুটা হলেও নস্যাৎ করল — কারণ সব সময় মহিলাদের খারাপ অবস্থা ছিল তা নয়, অন্যদিকে সংস্কারের প্রয়োজনীয়তাকেও মেনে নেওয়া হয় যদিও তার উদ্দেশ্য ছিল কোন লুপ্ত 'স্বর্ণযুগের পুনরুদ্ধারকরণ। সব মিলিয়ে ঊনবিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী মতাদর্শের উত্থানের ক্ষেত্রেও নারীর অবস্থা নিয়ে চর্চা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠল। তবে এই ক্ষেত্রে কোনো কোনো আধুনিক পর্যবেক্ষক মন্তব্য করেছেন যে জাতীয়তাবাদ 'ঘর' এবং 'বাহিরে'র মধ্যে একটা সীমারেখা টেনে দিয়েছিল। জাতীয়তাবাদ ও 'ঘর' মানে অন্তরমহল (যেটা মহিলামহল বা জেনানা হিসাবেই সাধারণভাবে চিহ্নিত) এর পবিত্রতা রক্ষার ক্ষেত্রে সোচ্চার ছিল অর্থাৎ জাতীয়তাবাদের প্রকল্প (Nationalist project) ভারতীয় নারীকে ঘরের আঙিনায় ঐশী মর্যাদায় ভূষিত করে লিঙ্গ সম্পর্কের বৈষম্যকে চোখের আড়াল করতে চেয়েছে। তাই লিঙ্গ সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভারতীয় সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে দ্বিধা বা দোলাচল দেখা যায়।

এই সাধারণ পেক্ষাপটে ঊনিশ শতকের সংস্কার আন্দোলন ও নারীর অবস্থা/পরিস্থিতি নিয়ে আমাদের আলোচনা করতে হবে। মৃত স্বামীর চিতায় সদ্যবিধবার সহমরণ — 'সতী', কুশীল প্রথা বা বহুবিবাহ, বিধবাদের অবর্ণনীয় দুঃখকষ্ট এবং স্ত্রী শিক্ষার মত বিষয়গুলি সমাজসংস্কারকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল এবং এই পরিস্থিতির প্রতিকারকল্পে তাঁরা উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন।

১২.৩.৬.২ : ব্রাহ্মসমাজ

পৌত্তলিকতার বিরোধীতা এবং একেশ্বরবাদের সাধনা ছাড়াও 'সতীদাহ' এবং অন্যান্য সামাজিক কুপ্রথার বিরুদ্ধে সক্রিয় বিরোধিতা করে রামমোহন রায় সমাজ সংস্কার আন্দোলনের সুত্রপাত করেন। 1803 সালে তিনি ধর্ম বিষয়ে তাঁর অভিমত একটি ফার্সী গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেন। গ্রন্থটি হল **'তোহফাৎ উল মুযাহিদিন'**। 1814 থেকে তিনি কলকাতায় এসে বসবাস শুরু করলে 1815 সালে প্রতিষ্টা করেন 'আত্মীয় সভা'। এই সভার সদস্যরা রামমোহনের বাড়িতে সাপ্তাহিক অধিবেসনে মিলিত হতেন যেখানে স্তোত্রপাঠ ছাড়াও ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়ে আলোচনা করতেন। সতীদাহ বিষয়ে তাঁর ব্যক্তিগত মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতা থেকেই রামমোহন এই প্রথার অবলুপ্তিতে উদ্যোগী হন। 1818 সালে এই মর্মে তিনি একটি দীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করেন — 'A

Conference between an Advocate for and an Opponent of the practice of Burniong Widows Alive.' এতে বিভিন্ন হিন্দু শাস্ত্র উদ্ধৃত করে তিনি দেখান যে সতীদাহ হিন্দুশাস্ত্র অনুসারে অপ্রয়োজনীয় এবং এই প্রথা পরবর্ত্তীকালের সংযোজন। এই প্রসঙ্গে তিনি উদ্যোগী হয়ে সাক্ষর সংগ্রহ করেন এবং শেষ পর্যন্ত 1829 সালে সতীদাহ 'বেআইনী' ঘোষিত হয়। উনবিংশ শতকের যে তিনটি ঘটনা কে নারীমুক্তি বিষয়ে মাইল ফলক বলে চিহ্নিত করা হয়েছে (সতীদাহ নিবারণ 1829, বিধবা বিবাহ 1856 এবং স্বেচ্ছায় সহবাস বিষয়ক আইন 1891) তার প্রথমটির সাথে ব্রাহ্ম সমাজের প্রতিষ্ঠাতা এইভাবে ওতোপ্রোত ভাবে জড়িত ছিলেন। 1819 এই আত্মীয় সভার সাপ্তাহিক অধিবেসনগুলি বন্ধ হয়ে যায়। এর ন'বছর বাদে 20 আগষ্ট 1828 সালে রামমোহন 'ব্রাহ্মসভা' প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতি শনিবার সন্ধ্যে সাতটা থেকে ন'টা পর্যন্ত এর অধিবেশন চলত। উপনিষদের বাছাই মন্ত্র প্রথমে সংস্কৃতে ও পরে তার বাংলা অনুবাদ পাঠ করা হত। এর সাথে চলত গান। এই সভার সদস্য হবার জন্য কোন নিয়মকানুন বা বিধিনিষেধ না থাকলেও সমাগত ব্যক্তিরা অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মণ শ্রেণীর। 1830 সালের 23 জানুয়ারী এই সভা তার নতুন সভাগৃহে স্থানান্তরিত হয়। ট্রাস্ট ডিড অনুযায়ী সদস্যেরা পৌত্তলিকতা বা বলীদান জাতীয় বিষয়গুলি থেকে দূরে থাকবেন বলে স্থির হয়ে তবে রামমোহন নিজে 1830 এর নভেম্বর মাসে বিলাত উদ্দেশ্যে রওনা হলে এবং 1833 সালে ইংলন্ডেই তাঁর দেহান্ত হওয়ায় ব্রাহ্মসভা প্রায় উঠেই যায়।

এর পরবর্ত্তী পর্যায়ে 1838 সালে আবার এই সভার পুনর্জন্ম ঘটে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের হাতে। 1838এ দেবেন্দ্রনাথ ব্যক্তিগত জীবনে ধর্মসঙ্কটের মুখোমুখী হন। তিনি 1839 এ 'তত্ত্ববোধিনী সভার প্রতিষ্ঠা করেন। রামমোহনের মতই বেদান্তের শ্রেষ্ঠতা মেনে নিলেও দেবেন্দ্রনাথ এবং সহযোগীরা খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ বিরোধীতা করে হিন্দু ধর্মের শ্রেষ্ঠতা প্রমাণ করার চেষ্টা করেন। 1842 সালে দেবেন্দ্রনাথ তাঁর বন্ধুদের সাথে 'ব্রাহ্মসভায়' যোগ দেন। পরের বছর তিনি ব্রাহ্ম সমাজের নিয়মকানুন (Covenant) নির্ধারণ করেন। ওই বছরই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাও প্রকাশিত হতে শুরু করে। 1850 এ ব্রাহ্ম ধর্ম নামে একগুচ্ছ শাস্ত্রের সংকলন প্রকাশিত হয় যার মাধ্যমে দেবেন্দ্রনাথ সর্বসমক্ষে এবং একান্তে ধর্মাচরনের নিয়মকানুন নির্ধারণ করে ছিলেন। অবশেষে 1861 সালে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যুর জন্য পালনীয় বিশেষ আচার অনুষ্ঠানের ধরণ নিরুপিত হয়। এই কার্যকলাপের মাধ্যমে ব্রাহ্ম সমাজ আবার প্রানবন্ত হয়ে ওঠে এবং শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মধ্যে তার প্রভাব বাড়ে।

1857 তে কেশবচন্দ্র সেন ব্রাহ্ম ধর্মে দিক্ষা নেন এবং দ্রুত তাঁর প্রভাব বাড়ে 1859 এ প্রতিষ্ঠিত হয় **'সঙ্গত সভা'** তিনি এবং তাঁর সহযোগীরা সমাজ সংস্কার বিশেষতঃ জাত পাত বা নারীর অধিকার এর প্রশ্নে অধিকতর সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তাঁদের সামাজিক সক্রিয়তার কারণে প্রবীন এবং নবীনের মধ্যে বিভেদ বেড়েই চলে। 1862 তে কেশবচন্দ্র এবং তাঁর সহযোগী গোপনে একটি অসবর্ণ বিবাহ সম্পাদন করেন। 1864 তে একাদারে অসবর্ণ এবং একই সাথে বিধবা বিবাহের অনুষ্ঠান করেন। 1864

তেই কেশবচন্দ্র বোম্বাই, মাদ্রাজ সহ অন্যান্য জায়গায় পরিভ্রমণ করেন এবং তার ফলে ব্রাহ্ম সমাজ চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। এই বছরই ব্রাহ্ম সমাজের ধর্মীয় অধিবেশন গুলিতে ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণ আচার্যের প্রশ্ন নিয়ে দ্বন্দ দেখা দেয়। 1864 তেই ব্রাহ্ম সমাজের সদস্যদের স্ত্রীদের উন্নতিকল্পে 'ব্রাহ্মিকা সমাজ' নামে একটি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। 1866 র মাগোৎসবে উপাসনাস্থলে মহিলারাও পর্দার পেছনে বসবার অনুমতি পান। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই প্রথম মহিলারাও পুরুষদের সাথে উপাসনাস্থলে জায়গা পেলেন। শেষপর্যন্ত আর নবীন প্রবীনের বিভাজন রোখা গেল না। নবীনরা কেশবচন্দ্রের নেতৃত্বে "ভারতবর্ষীয় সমাজ" নামে একটি পৃথক সংগঠন গড়ে তুললেন। দেবেন্দ্রনাথের নেতৃত্বে রক্ষনশীল অংশ 'আদি ব্রাহ্মসমাজ' নামে আলাদা হয়ে যায়। কেশবচন্দ্র সেন যে কেবল সমাজ সংস্কারের প্রশ্নেই আলাদা ছিলেন তাই নয়, ধর্মীয় ক্ষেত্রেও সুস্পষ্ট তফাৎ তৈরী হচ্ছিল। যিশু খ্রীষ্টকে 'মহৎ ব্যক্তি হিসাবে মান্যতা প্রদান ছাড়াও ভক্তির প্রাবল্য ছিল এই সময়কার নতুনত্ব। কিছুদিন গান সহযোগে নগর সংকীর্তন ও হয়। তার বক্তব্য ছিল।

"নরনারী সাধারণের সমান অধিকার,
যার আছে ভক্তি, পাবে মুক্তি, নাহি জাত বিচার।"

1871 এ ব্রাহ্মবিবাহ বিধিবদ্ধ করবার আন্দোলন শুরু হয়। আদি ব্রাহ্মসমাজ তার বিরোধীতা করলে 1872 এ Act III নামে একটি Civil Marriage Act চালু হয়। 1856 এ নারী স্বাধীনতা বিষয়ে কিছু কাজকর্ম শুরু হয়। ইতিমধ্যে ব্রাহ্মদের মধ্যে আবার নতুন করে বিভাজনের সম্ভাবনা তৈরী হয়। 1817 এর গোড়ায় 'সমদর্শী' নামে একটি দল ব্রাহ্ম প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্টা করবার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। শেষ পর্যন্ত যখন ব্রাহ্ম বিবাহের নিয়মকানুন সম্পূর্ণ অস্বীকার করে কেশবচন্দ্র তাঁর নিজের নাবালিকা মেয়েকে কোচবিহারের রাজপরিবারে পাত্রস্থ করতে উদ্যোগী হলে ব্রাহ্মসমাজে দ্বিতীয় বিভাজন দেখা দেয়। শিবনাথ শাস্ত্রীর মত যুবকদল "সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ" নামে একটি পৃথক দল গঠন করলেন। তার কিছুদিনের মধ্যে কেশবচন্দ্র সেন তাঁর অনুগামীদের কে নিয়ে "নববিধান" নাম আলাদা হয়ে যান। এই উপর্যুপরী বিভাজন ব্রাহ্মসমাজকে দুর্বল করে দেয়। কিন্তু লক্ষনীয় হল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিভূরা প্রথম থেকেই নারীর সমানাধিকার অসবর্ণ বিবাহ, বাল্যবিবাহ ইত্যাদি প্রশ্নে সুনির্দিষ্ট অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। মূলতঃ এই প্রশ্নেই তাদের মধ্যে বিভাজন ও দেখা দিয়েছিল।

স্ত্রীশিক্ষা

এছাড়াও ব্রাহ্মসমাজ স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। বাংলায় স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা অবশ্য গ্রহণ করেন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত মেয়েদের স্কুলে বাড়ির মেয়েদেরকে আনবার জন্য ঘোড়ার গাড়ির দরজায় লেখা থাকত 'কন্যাপেবং পালনীয়া শিক্ষনিয়াতিযত্নতঃ'। কিন্তু মেয়েদের শিক্ষাদানের এই প্রচেষ্টা সাংঘাতিক বাধার সন্মুখীন হয়। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত স্ত্রীশিক্ষা প্রসঙ্গে ব্যাঙ্গ কবিতা রচনা করলেন :

"যত ছুঁড়ীগুলো তুড়ী মেরে কেতাব হাতে নিচ্চে যবে
A, B শিখে, বিবী সেজে, বিলাতী বোল কবেই কবে;
আর কিছুদিন থাকরে ভাই! পাবেই পাবে দেখতে পাবে,
আপন হাতে হাঁকিয়ে বর্গী, গড়ের মাঠে হাওয়া খাবে।"

সামাজিক প্রতিকূলতার মুখে দাঁড়িয়েই ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষা কল্পে একের পর এক মেয়েদের স্কুল প্রতিষ্ঠা করে চলেন। ব্রাহ্মসমাজেও স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। কেশবচন্দ্র যখন ব্রাহ্ম পরিবারের আদর্শ প্রদর্শনকল্পে Community living এর জন্য 'ভারতাশ্রম' নামে একটি আশ্রম প্রতিষ্ঠা করেন তখন আশ্রমস্থ বয়স্কা মহিলাদের শিক্ষার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় যেখানে আশ্রমবাসী ও বাইরের ব্রাহ্মদের বাড়ির মেয়েদের শিক্ষাদান করা হত। এখানে ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি সেলাই বা বিভিন্ন সামাজিক বিষয়ে শিক্ষাদান করা হত। 1866 তে কেশবচন্দ্র সেনের আহ্বানে স্ত্রী শিক্ষার প্রসারে কুমারী মারী কার্পেন্টার (Miss Mary Carpenter) ভারতে আসেন। তিনি লক্ষ্য করেন যে স্ত্রী শিক্ষার অন্যতম প্রধান বাধা হল উপযুক্ত শিক্ষকের অভাব। তিনি তাঁর পর্যবেক্ষন এবং অভিমত পড়লাটের সামনে উপস্থিত করেন। 1872 এ Carpenter, কেশবচন্দ্র এবং Annette Akroyd নামে আরেকজন ইংরাজ মহিলার সাথে একটি Normal School প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে Akroyd 'সাধারণ ব্রাহ্ম সমাজে'র সাথে মিলে হিন্দু মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। 1878 এ স্কুলটি বেথুন স্কুলের সাথে মিলে বেথুন কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়। 1883 তে বেথুন কলেজ থেকে কাদম্বিনী বসু এবং চন্দ্রমুখী বসু পথম স্নাতক হিসাবে বেথুন কলেজ থেকে পাশ করেন।

অন্যান্য প্রদেশে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাব

আমরা আগেই দেখেছি যে কেশবচন্দ্র সেন 1864 তে বোম্বাই, মাদ্রাজ সহ বহু স্থান ভ্রমণ করেন ব্রাহ্ম ধর্ম প্রচার এর কারণে। পরে 1867 তে তিনি আর একবার বোম্বাই গিয়েছিলেন। এই সময়ে তাঁর বাগ্মীতার করণে, বহু যুবক তাঁর এবং ব্রাহ্ম মতাদর্শের প্রতি আকর্ষন অনুভব করেন। এমনই কিছু মানুষ মহারাষ্ট্রে তৈরী করেন। 'প্রার্থনা সমাজ' যার মধ্যে ছিলেন মহাদেব গোবিন্দ রানাডের মত ব্যাক্তিত্ব। এঁরা বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ বা স্ত্রী শিক্ষার মত বিষয়গুলি নিয়ে চর্চা করেছেন এবং গুরুত্বপূর্ণ সংস্কার এর কাজ চালিয়েছিলেন। পরে এঁদের কারুর কারুর উপর দয়ানন্দ সরস্বতীর ও প্রভাব পড়েছিল। তিনি যখন 1875 এ গুজরাট ও মহারাষ্ট্র সফরে আসেন তখন S. P. Kelkar এর মত ব্যক্তি তাঁর আর্যতত্ত্বে আকৃষ্ট হয়ে প্রার্থনা সমাজ থেকে বেরিয়ে আসেন এং কিছুদিনের জন্য বোম্বাই এ ব্রাহ্মসমাজ তৈরী করেছিলেন। পরে এই উদ্যোগ ব্যর্থ হলে 1882 সালে তিনি আবার প্রার্থনা সমাজে ফিরে আসেন কিন্তু মহারাষ্ট্রের এই সমাজ সংস্কারকদের উপর ব্রাহ্ম সমাজের প্রাথমিক অভিমত অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়।

1860 এর দশকে ব্রাহ্ম মতাদর্শের কথা দক্ষিণেও অজানা ছিল না। কুড্ডালোরের এক ব্রাহ্মণ শ্রীধরালু নাইডু ব্রাহ্ম সমাজের কথা জানতে পেরে সম্পত্তি বেচে দিয়ে কলকাতা পাড়ি দেন। সেখানে একবছর থেকে বাংলা শিখে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করেন এবং দক্ষিনে ফিরে গিয়ে তিনি ব্রাহ্ম ধর্ম প্রসারে ব্রতী হন। কিন্তু তাঁর খুব একটা প্রভাব পড়ে নি। পরে যখন কেশবচন্দ্র সেন 1864 তে দক্ষিনে সফরে যান। তিনি বিপুল সাড়া পান। কিন্তু পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে তাঁর সর্বাত্মক প্রচার দক্ষিণের মানুষদেরকে অস্বস্তিতে ফেলেছিল। তাই সেন এর প্রচার এর ফল হল বেদ সমাজের প্রতিষ্ঠা। কিন্তু 60 এর শেষে শ্রীধরালু নাইডু মাদ্রাজ গেলে বেদ সমাজের নাম ও চরিত্র বদলে ব্রাহ্ম সমাজের মত গড়ে তোলা হয়। বাংলার মত দক্ষিনেও ব্রাহ্ম সমাজ বা বেদ সমাজ জাতপাত বিরোধী, স্ত্রী শিক্ষা প্রসারে উদ্যোগী হতে দেখা যায় তবে দক্ষিনে এই আন্দোলন ছিল কিছু উজ্জ্বল ব্যাক্তিত্ব নির্ভর। তাঁরা সরে গেলেই আবার আন্দোলন দুর্বল হয়ে পড়ে।

সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা বা নেতৃত্ব সতীদাহ, বাল্যবিবাহ অসবর্ণ বিবাহ বা স্ত্রী শিক্ষার মত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি নিয়ে সক্রিয় ছিলেন। অসবর্ণ বিবাহ বা সামাজিক বিবাহ আইনের মত বিষয়েও তাঁরা প্রগতিশীল চিন্তা ভাবনার পরিচয় দিয়েছিলেন। তবে ঊনবিংশ শতকের শেষভাগে আভ্যন্তরীন দ্বন্ব এবং পরিবর্ত্তনশীল মতাদর্শগত পরিমন্ডলে ব্রাহ্ম সমাজের প্রভাব ক্রমেই ফিকে হয়ে আসে।

১২.৩.৬.৩ : আর্য সমাজ

আর্য সমাজের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দয়ানন্দ স্বরস্বতী (1824-83)। বাল্যে পিতামাতার ঠিক করা পাত্রীর সাথে নিশ্চিত বিবাহ অস্বীকার করে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং সরস্বতী দন্ডীদের কাছে দীক্ষা নিয়ে ভ্রাম্যমান যোগী হিসাবে ঘুরে বেড়াতে থাকেন। শেষে 1860 এর নভেম্বর মাসে স্বামী বিরজানন্দের কাছে প্রায় তিন বছর অবস্থানকালে তাঁর কর্তব্য বিধেয় নির্ধারিত হয়। তাঁর লক্ষ্য হয়ে দাঁড়ায় হিন্দু ধর্মের পরিশুদ্ধিকরণ। এই লক্ষ্যে তিনি একটি পদ্ধতি আবিষ্কার করেন — বেদে লিখিত মন্ত্রগুলি সঠিক ব্যাকরণ ও উচ্চারণ পদ্ধতি অনুসরণ করে প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করলে পরবর্ত্তীকালে যে সমস্ত অযৌক্তিক, অন্যায় আচার অনুষ্ঠান হিন্দুধর্মে অনুপ্রবেশ করেছে তাকে কাটান সম্ভব হবে। এই লক্ষ্যে তিনি হিন্দু ধর্মীয় সাহিত্যকে দুটি ভাগে ভাগ করেন — বেদ এবং বেদের সঠিক ব্যাখ্যা যে সমস্ত গ্রন্থে রয়েছে তাকে উনি **আর্শ** বলে চিহ্নিত করেন। বাদবাগি সমস্ত সাহিত্য - বিশেষত মহাভারত উত্তর কাহিনীগুলি হল **অনআর্শ** অর্থাৎ যেগুলি পালনীয় নয়। দয়ানন্দ যে পরিশুদ্ধ হিন্দুধর্মের কথা প্রচার করতে শুরু করেন সেখানে পুরাণ, বহু দেবতার পূজা, পৌত্তলিকতা ব্রাহ্মণ পূজারীর ভূমিকা, তীর্থযাত্রা, প্রায় সমস্ত রকমের আচার অনুষ্ঠান, বিধবা বিবাহে নিষেধ ইত্যাদি বিষয়ের নিন্দা করা হয়। তখনো পর্যন্ত তিনি সন্ন্যাসীর বেশে, সংস্কৃতে কথা বলতেন। 1872

এ তিনি কলকাতায় আসেন এবং দেবেন্দ্রনাথ সহ অন্যান্য ব্রাহ্ম নেতাদের সাথে আলাপ আলোচনা করেন। কলকাতা থেকে ফেরার পর তিনি সন্ন্যাসীর কৌপীন পরিত্যাগ করেন এবং সাধারণ হিন্দি ভাষায় প্রচার করতে থাকেন। এর ফলে মধ্যবিত্ত বিশেষতঃ শিক্ষিত হিন্দুদের মধ্যে তাঁর প্রচার ক্রমেই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। 1875 এ তিনি তাঁর চিন্তা ভাবনার সারসংগ্রহ 'সত্যার্থ প্রকাশ' সম্পন্ন করেন। এতে তিনি ঐতিহাশ্রয়ী হিন্দুধর্ম, খ্রীষ্টধর্ম, ইসলাম, বৌদ্ধধর্ম, জৈনধর্ম বা শিখ ধর্মের নিন্দা করেন। তাঁর কাছে বৈদিক হিন্দুধর্মই ছিল একমাত্র সত্য।

1874 এ দয়ানন্দ গুজরাট ও বোম্বাই সফর করেন। 1875 এর 10ই এপ্রিল বোম্বাইতে আর্য সমাজ (আর্য শব্দের প্রকৃত অর্থ সুভদ্র মানুষ) প্রতিষ্ঠা করেন। 1877 এর জানুয়ারী মাসে তিনি দিল্লি পৌঁছান সেখানকার হিন্দুনেতা বিশেষতঃ তাঁকে লাহোর সফরের জন্য অনুরোধ করেন। দিল্লিতে অবস্থানকালে 1877 এর 10ই এপ্রিল তিনি পৌত্তলিকতা, বাল্যবিবাহ, হিন্দুধর্মে ব্রাহ্মণ পুরোহিতের প্রাধান্য ইত্যাদি বিষয়কে তীব্র নিন্দা করেন। সর্বোপরী তিনি বেদের অভ্রান্ততার কথা জোরের সাথে প্রচার করেন। স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর অভিমত ঐতিহ্যাশ্রয়ী হিন্দুদের পক্ষে মেনে নেওয়া কষ্টকর ছিল। এমনকি ব্রাহ্মরা, যাঁরা বেদান্তে আস্থা রেখেছিলেন তাঁদের পক্ষেও তাঁর এই শুদ্ধবাদী প্রচার আদ্যন্ত স্বীকার করা সম্ভবপর ছিল না। এখান থেকে তিনি পাঞ্জাব ও পরে উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সফর করেন। ওই সময় লাহোর সহ অন্যান্য অঞ্চলে আর্য সমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। পরে তিনি গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে তাঁর মত প্রচার করেন। 1881 থেকে তিনি রাজস্থানে সেখানকার রাজপরিবারের লোকেদেরকে তাঁর মতের সপক্ষে নিয়ে আসার আপ্রাণ চেষ্টা চালান যাতে তিনি তেমনি সাফল্য পান নি। শেষ পর্যন্ত 1883 তে 30 অক্টোবর তিনি আজমীরে দেহ রাখেন।

প্রতিষ্ঠাতার মৃত্যুর পরে আর্য-সমাজ স্তিমিত হয় নি বরং নতুন উদ্যমে কাজ শুরু করে। সাংগঠনিক ভাবে স্থানীয় আর্য-সমাজগুলি ছিল স্ব স্ব প্রধান অর্থাৎ কোন কেন্দ্রীয় উদ্যোগ সেভাবে ছিল না। সমস্ত আর্য সমাজগুলিই বর্দ্ধমান খ্রীষ্টান প্রভাব থেকে হিন্দু ধর্মকে রক্ষা করবার জন্য একটি স্কুল প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। সেইমত 1886 সালের 1লা জুন দয়ানন্দ অ্যাংলো-বেদিক স্কুল ও পরে কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

Dayananda Anglo-Vedic Trust এবং Management Society ই ছিল বিভিন্ন আঞ্চলিক আর্য সমাজগুলির মধ্যে প্রথম কেন্দ্রীয় সংগঠন যেখানে আঞ্চলিক সমাজগুলির প্রতিনিধি থাকতেন। পরে, আর্য প্রতিনিধি সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই আর্য সমাজের মধ্যে দুটি বিরোধী মত দেখা দেয়। কট্টরপন্থীদের নেতা ছিলেন পন্ডিত গুরু দত্ত। এছাড়াও ছিলেন পন্ডিত লেখ রাম এবং লালা মুন্সী রাম। তাঁরা চেয়েছিলেন প্রাচীন হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের আদর্শে বৈদিক স্কুল তৈরী করতে যেখানে সংস্কৃত ভাষায় বৈদিক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হবে। অন্যদিকে নরমপন্থীরা চেয়েছিলেন খ্রীষ্টধর্মের ছোঁয়াচ এড়িয়ে ইংরাজী শিক্ষা দিতে যা হিন্দুদেরকে ঔপনিবেশিক সামনের উপযোগী শিক্ষা দিতে পারবে।

পরে কট্টরপন্থীদের প্রধান কাজ হয়ে ওঠে **শুদ্ধি** এবং বেদপ্রচার। 1890 এর গোড়ায় লালা মুন্সি রাম (যিনি পরে স্বামী শ্রদ্ধানন্দ হিসাবে পরিচিত হন), লালা দেবরাজ এবং অন্যান্য **আর্য সমাজীরা আর্য কন্যা পাঠশালা** প্রতিষ্ঠা করেন জলন্ধারে। পরে মেয়েদের জন্য। **কন্যা আশ্রম** নামে হস্টেল ও প্রতিষ্ঠিত হয়। মেয়েদের স্কুল ও হস্টেল অনেকেই মেনে নিতে পারে নি। তবে স্কুল ও হস্টেল এর সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে 1896 এর 14ই জুন **কন্যা মহাবিদ্যালয়** (কলেজ) প্রতিষ্ঠিত হয়। 1906 সালে মহাবিদ্যালয়ে পাঠরত মেয়েদের সংখ্যা ছিল 203 জন আর কন্যা আশ্রমের আবাসিকদের সংখ্যা দাঁড়ায় 105 জন। পরবর্ত্তীকালে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি মেয়েদের শিক্ষা আন্দোলনের একটি কেন্দ্রবিন্দু হয়ে দাঁড়ায় কারণ এই প্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনীরা অনেকেই এর ছাঁচে বিভিন্ন জায়গায় স্কুল খুলতে থাকে। এছাড়া স্ত্রী শিক্ষার প্রসারের জন্য একটি হিন্দি মাসিক পত্র **প্রাঞ্চল পন্ডিতা** প্রকাশিত হতে থাকে। শিক্ষা দানের মাধ্যমে তারা এক আদর্শ-হিন্দু রমণীর জন্ম দিতে চেয়েছিলেন।

বিধবা বিবাহ প্রসঙ্গে আর্য সমাজের উদ্যোগ

কট্টরপন্থীরা মেয়েদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলার পাশাপাশি বিধবা বিবাহ বিষয়ে জনমত সংগঠিত করতে থাকে। এক দশকের বেশি সময় আলাপ আলোচনার ফলে পাঞ্জবী সমাজে বিধবা বিবাহ অনেকটাই গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। তবে এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে বিধবাদের মধ্যে যারা অক্ষতযোনী অর্থাৎ যারা স্বামী মহবাস করেন নি তাঁদের পুনর্বিবাহ যতটা গ্রহণযোগ্য ছিল, সন্তাবতী বিধবাদের পুনর্বিবাহ ততটা গ্রহণযোগ্য ছিল না। বিধবা বিবাহ বিষয়ে হিন্দু সমাজের একটা বড় অংশ থেকেই সমর্থন মিললেও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন মূলত কট্টরপন্থী আর্য সমাজীরাই।

১২.৩.৬.৪ : থিওসফিক্যাল আন্দোলন (Theosophical Movement)

থিওজফী আন্দোলনের প্রেরণা ছিল ইউরোপ ও আমেরিকার 'আধুনিক জীবন ও সমাজ সম্পর্কে একটি সমালোচনামূলক মনোভাব থেকে এই আন্দোলনের সূচনা। 1875 সালে অতীন্দ্রিয় বিষয়ে উৎসুক দুই ব্যক্তি Helena Petrovna Blavatsky এবং Henry Steel Olcott একত্রে এই আন্দোলনের সুত্রপাত করেন। মাদাম ব্লাভাটস্কির জন্ম ইউগ্রেনে। তিনি মিশর থেকে আমেরিকায় গেলে অতীন্দ্রিয়বাদীদের এক সম্মেলনে অধুনা সামরিক বাহিনী থেকে অবসরপ্রাপ্ত হেনরী ওলকট এর সাথে পরিচয় ঘটে এবং তাঁরা একত্রে কাজ করতে থাকেন। 1877 এ প্রকাশিত হয় ব্লাভাটস্কির গ্রন্থ Isis Unveiled। এর প্রথম খন্ডে অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা এবং পরাবাস্তব অবস্থার বিভিন্ন দিক এবং দ্বিতীয় খন্ডে সামগ্রিকভাবে খ্রীষ্টধর্মের সমালোচনা ও হিন্দু এবং বৌদ্ধধর্মের সাথে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে। এই বইটি অধ্যত্মবাদীদের প্রশংসা অর্জন করলেও

খ্রীষ্টানরা তীব্র সমালোচনা করেন। এই সময়তেই তাঁরা মূলজী থ্যাকারসার মাধ্যমে ভারতে আর্যসমাজী এবং ব্যক্তিগতভাবে দয়ানন্দ সরস্বতীর সাথে যোগাযোগ করেন। উভয়পক্ষের মধ্যে চিঠিপত্রের আদান প্রদান চলতে থাকে এবং তারা একযোগে কাজ করতে সম্ভব হন।

ওলকট এবং ব্লাভাটস্কি ভারতে এসে পৌঁছন 1879 এর 16ই ফেব্রুয়ারী। বোম্বাইতে তাঁদের অভ্যর্থনা জানাতে হাজির ছিলেন বোম্বাই আর্য সমাজের প্রেসিডেন্ট হরিশ্চন্দ্র চিন্তামণি সহ অন্যান্য ব্যক্তি। ওলকট এবং ব্লাভাটস্কি এরপর দয়ানন্দের সঙ্গে দেখা করেন কিন্তু তাঁদের মধ্যে এই সখ্য বেশীদিন স্থায়ী হয়নি। 1882তেই দয়ানন্দ থিওসফিস্টদের পদ্ধতি প্রকরণ সম্বন্ধে তীব্র সমালোচনা করেন। একারণেই দুই সংগঠনের মধ্যে সম্পর্কের অবনতি হয়।

ওলকট ভারতবর্ষের বিভিন্ন এলাকায় অধ্যাত্মবাদ, অতীন্দ্রিয় অভিজ্ঞতা ইত্যাদি বিষয়ে বক্তৃতা দিয়ে ঘুরতে থাকেন। অন্যদিকে মাদাম ব্লাভাটস্কি ছিলেন তাঁদের আন্দোলনের মুখপত্র **থিওসফিস্ট** এর প্রকাশনার দায়ীত্বে। শিক্ষিত ভারতীয় এবং কিছু ইউরোপীয়দের মধ্যে ফিওসফিকাল সোসাইটির প্রভাব বাড়তে থাকে। অ্যালেন অক্টাভিয়ান হিউম (যিনি কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন সংগঠিত করবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন।) বা মেজর জেনারেল মর্গান অথবা গোপাল কৃষ্ণ গোখেল এর মত ব্যক্তিত্ব এই আন্দোলনে আকৃষ্ট হন। 1881 সালের অক্টোবর মাসে ওলকট এবং ব্লাভাটস্কি দক্ষিন ভারতে সফরে যান যেখানে তাঁরা হিন্দু নেতাদের কাছে সাদর অভ্যর্থনা এবং খ্রীষ্টান মিশনারীদের কাছে ভয়ঙ্কর প্রতিরোধের সম্মুখীন হন। শেষ পর্যন্ত 1882 সালের ডিসেম্বর মাসে তাঁরা তাঁদের মূল কর্মকেন্দ্র দক্ষিনে স্থানান্তর করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মাদ্রাজ শহরের দক্ষিনে আডেয়ার এর কাছে জমি কিনে সেখানে প্রধান কেন্দ্র গড়ে ওঠে।

পরে একটি আভ্যন্তরীণ সংকটে ব্লাভাটস্কি পত্রিকা সম্পাদনার দায়ীত্ব ছেড়ে ইংলন্ডে ফিরে যান। 1888 তে 15000 পৃষ্টার The Secret Doctrine প্রকাশ করেন ব্লাভাটস্কি। Isis Unveiled এবং The Secret Doctrine ছিল থিওসফি মুভমেন্টের মূল গ্রন্থ। থিওসফিস্টরা পুনর্জন্ম বা আধ্যাত্মিক উন্নতির যে পরিকল্পনা সাথে হিন্দুধর্মের কর্মবাদী চিন্তাধারার মেলবন্ধন ঘটিয়েছিলেন।

ব্লাডাটস্কির শূন্যস্থান পূরণ করেন Annie Wood (Besant)। তিনি Secret Doctrine পড়ে ভীষণভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েন এবং এই আন্দোলনে যোগ দেন। ওলকট এর নেতৃত্ব সমালোচনার মুখোমুখি হলে তিনি (বেশান্ত) থিওসফিকাল আন্দোলনের নেত্রীপদে ব্রতি হন। তিনি 1893 তে ভারতে এসে পৌঁছন এবং 1933 এ মৃত্যু পর্যন্ত এই আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তাঁর সময়ে এই আন্দোলনে কিছু পরিবর্ত্তন দেখা যায়। প্রাথমিক পর্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ পদ্ধতি এবং অধ্যাত্মবাদের মাহাত্মের কথা প্রচার করলেও Madras Social Reform Movement, প্রাচীন ভারতের অবিমিশ্র প্রশংসা করবার জন্য বেশান্তকে

সমালোচনা করেন। এরপর 1908 থেকে Theosophic Order of Service তৈরী করা হয় যার লক্ষ্য ছিল মানবতাবাদী কার্যকলাপ যেমন জাতীয় শিক্ষার প্রমান বা বাল্যবিবাহ রোধের চেষ্টা। এরপর হোমরুল আন্দোলনের মধ্য দিয়ে কিছুদিনের জন্য। হলেও বেশান্ত জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ১৯১৭ সালে তিনি ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতি নির্বাচিত হন।

থিওসফি আন্দোলনের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা মাদাম ব্লাভাটস্কি মনে করতেন যে বাল্যবিবাহ এবং বাল্যবিধবাত্ব হল প্রকৃত হিন্দু মতাদর্শের বিকৃতি। অ্যানি বেশান্ত থিওসফি আন্দোলন সম্বন্ধে আকৃষ্ট হবার আগে (1889) সাম্যবাদী আন্দোলন সম্পর্কে আকৃষ্ট হয়েছিলেন এবং এই পর্যায়ে 1874 সালে একটি বক্তৃতায় (The Political Status of Women) তিনি মেয়েদের ভোটাধিকার-এর দাবী তুলেছিলেন। থিওসফি আন্দোলনে যুক্ত হবার পর ভারতে এসে তিনি প্রাথমিক ভাবে প্রাচীন ভারতীয় সভ্যতার গুণকীর্তন করলেও পরবর্তীকালে তিনি সুনির্দিষ্ট সমস্যার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 1901 সালে Indian Ladies Magazine পত্রিকায় 'Education of Women' শীর্ষক একটি নিবন্ধে বেশান্ত এই বলে সতর্ক করেন যে স্ত্রীশিক্ষার অগ্রগতি না হলে ভারতবর্ষের ভবিষ্যত অন্ধকার। তবে পশ্চিমী শিক্ষার নকলনবিসি ভারতীয় নারীর 'নারীত্ব' ভুলণ্ঠিত করবে। ভারতীয়দেরকে নারীত্বের আদর্শ নিজের সংস্কৃতির মধ্যেই অনুসন্ধান করতে হবে — তাঁদের কাছে আদর্শ হওয়া উচিত দশভুজা দুর্গা। এই নীতির রূপায়ন করবার জন্য তিনি একটি মহিলা কলেজও প্রতিষ্ঠা করেন।

১২.৩.৬.৫ : উপসংহার

ঊনবিংশ শতকের গোড়া থেকেই ঔপনিবেশিক শাসনে অভিঘাতে এবং আভ্যন্তরীন পরিবর্ত্তনের তাগিদে সমাজ সংস্কার আন্দোলন দেখা গিয়েছিল। ঔপনিবেশিক প্রশাসককুল বা খ্রীষ্টান নিশনারী, যারা হিন্দু সমাজের দুরবস্থা নিয়ে সোচ্চার ছিলেন তাদের অন্যতম প্রিয় লক্ষ্যবস্তু ছিল ভারতীয় নারীর অবস্থান। Mill বা অন্যান্য প্রভাবশালী চিন্তাবিদরা এই প্রশ্নেই বারতীয় সমাজকে বিঁধেছেন, তাকে পশ্চাদ্পদ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজেও নারীর অবস্থা পরিবর্ত্তনে তৎপর হয়ে ওঠে। যে তিনটি আন্দোলন নিয়ে আমরা আলোচনা করলাম — ব্রাহ্মসমাজ, আর্যসমাজ এবং থিওসফিকাল আন্দোলন, প্রতিটির নেতৃত্ব এবং অনুগামীদের গরিষ্ট অংশ উঠে এসেছিল এই শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্য থেকেই এবং অধিকাংশই ছিলেন উঁচু জাতের লোক। এঁদের মধ্যে সতীদাহ, বিধবা বিবাহ, বাল্য বিবাহ বা স্ত্রীশিক্ষা ছিল আন্দোলনের ক্ষেত্র। এই অংশ অনেকক্ষেত্রেই ঔপনিবেশিক প্রশাসন যন্ত্রের সাথে হাত মিলিয়ে বা তাকে প্রভাবিত করে ওই বিষয়গুলিতে প্রগতিশীল আইন প্রণয়নে উদ্যোগী হন। এতে একদিকে যেন মেয়েদেরকে ঘুঁটি হিসাবে ব্যবহার করে তাঁদের মূল লক্ষ্য ছিল ভারতীয় সমাজের অনপনেয় কলঙ্ক মোচন। নারীর শরীর

এর উপর এ যেন ঔপনিবেশিক প্রশাসক এবং তার বিরোধী বা সমাজ সংস্কারকদের এক দড়ি টানাটানি খেলা। একথা বলার অর্থ অবশ্যই এই সমস্ত অগ্রণী ব্যক্তিত্বের অবদানকে অস্বীকার করা নয়, খালি এটুকুই মনে করিয়ে দেওয়া যে নারী নিজে এই বিরাট প্রেক্ষাপটে কোথাও যেন নিজেই হারিয়ে গেছে।

১২.৩.৬.৬ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। শিবনাথ শাস্ত্রী, **রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালিন বঙ্গসমাজ**

২। Geraldine Forbes, *Women in Modern India*, The New Cambridge History of India IV.2 Indian (ed.) 1996.

৩। Kenneth W. Jones, *Socio-Religious Reform Movements in British India*, The New Cambridge History of India III.1.Cup 1989.

১২.৩.৬.৭ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। উচ্চবর্ণীয় ধর্ম-সংস্কারকরা সমাজে নারীর অবস্থানকে কি দৃষ্টিতে দেখতেন উদাহরণ সহযোগে আলোচনা কর।

২। স্ত্রীশিক্ষা প্রশ্নে সামাজিক ভূমিকা কেমন ছিল ?

৩। ব্রাহ্মসমাজে নারীর ভূমিকা ও অবস্থান আলোচনা কর।

৪। আর্য সমাজে নারীর অবস্থান আলোচনা কর।

৫। থিওজফিকাল আন্দোলন নারীর মর্যাদা বৃদ্ধিতে কতখানি সফল হয়েছিল?

———

পর্যায় গ্রন্থ - ৩

REFORM MOVEMENTS AND WOMEN

একক - ৭

(a) **Aligarh Movement** (b) **Satya Shodhak Samaj**

(c) **Sri Narayan Movement** d) **Self-respect Movement**

বিন্যাসক্রম ঃ

১২.৩.৭.০ ঃ উদ্দেশ্য

১২.৩.৭.১ ঃ আলিগড় আন্দোলন

১২.৩.৭.১.১ ঃ মুসলমান সমাজে প্রথাগত শিক্ষা

১২.৩.৭.১.২ ঃ স্যার সৈয়দ আহমেদ

১২.৩.৭.১.৩ ঃ সর্বভারতীয় মহামেডান শিক্ষা সম্মেলন

১২.৩.৭.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১২.৩.৭.৩ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৩.৭.৪ ঃ সত্যশোধক সমাজ

১২.৩.৭.৫ ঃ শ্রী নারায়ণ আন্দোলন

১২.৩.৭.৬ ঃ স্ব-মর্যাদা আন্দোলন

১২.৩.৭.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.৩.৭.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৩.৭.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন;

১। মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আলিগড় আন্দোলনের ভূমিকা।

২। নিপীড়িত জনজাতির মুক্তি আন্দোলন কিভাবে নারীমুক্তির নানা বিষয়কে তুলে ধরেছে।

১২.৩.৭.১ ঃ আলিগড় আন্দোলন

ভারতের ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত ধারণাগুলির একটি হল, ভারতীয় মুসলিম মহিলারা শিক্ষাদীক্ষায় অনগ্রসর এবং তাদের মধ্যে সমাজ সংস্কার আন্দোলনের প্রভাবও সামান্য ই পড়েছে। সাধারণভাবে এই অনগ্রসরতার (উনবিংশ শতকের পরিপ্রেক্ষিতে তথাকথিত হিন্দু সমাজের মধ্যে প্রচলিত আন্দোলনগুলির তুলনায় বেশ দৃষ্টিকটু) কারণ হিসাবে একটি ব্যাখ্যা সামনে আসে। তা হল ভারতে ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল মুসলমান শাসকদেরকে সরিয়ে। – স্বাভাবিক ভাবেই এই নতুন শাসকদের সাথে মুসলিম জনগণ বিশেষতঃ শাসনশ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত বা চাকুরীজীবী সম্প্রদায়ের একটা বৈরিতামূলক সম্পর্ক তৈরী হয়। এছাড়া ঐশ্লামিক ও খ্রীষ্টান সভ্যতা / সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের পারস্পরিক হানাহানির সম্পর্কও ছিলই। এর ফলে সাধারণভাবে মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে পাশ্চাত্য শিক্ষা বা সংস্কৃতি একধরণের সন্দেহ বা অনীহা কাজ করেছে যা শেষবিচারে মুসলমান সমাজ তথা মেয়েদের পিছিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু এই ব্যাখ্যায় মুসলমান সমাজের আভ্যন্তরীণ স্তর বিভাজন বা বিভিন্ন স্তরগুলির ব্রিটিশ শাসন তথা পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রতি পরস্পর বিরোধী দৃষ্টিভঙ্গির ধরণধারণ পড়ে না। হিন্দু কেরাণী সম্প্রদায়ের মতই মুসলমান শিক্ষিত সম্প্রদায় বা চাকুরীজীবিদের ইংরাজ ঔপনিবেশিক শাসনের পথে বোঝাপড়ায় আসতে হল। এর একটি বহিঃপ্রকাশ হল মুসলমান অভিজাত সংস্কৃতিতে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন। শরাফৎ (একবচনে শরীফ, বহুবচনে আশরাফ – শরাফৎ শরীফের বৈশিষ্ট্য, বলা যায় ভদ্রতার সমার্থক) এর চরিত্র লক্ষণগুলির ক্ষেত্রে লক্ষ্যণীয় পরিবর্তন দেখা যায়। মুঘল বা নবাবী আমলে বেহিসাবী খরচ এবং আমোদ প্রমোদ তথা বংশপরিচয় অভিজাত জীবনের আবশ্যিক প্রয়োজনীয়তা হলেও ঔপনিবেশিক আমলে সৎচরিত্র, শিক্ষিত এবং মার্জিত জীবনযাপনের মধ্য দিয়েই যে কেউ শরাফৎ অর্জন করতে পারত, বংশমর্যাদার উপর পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিলনা। বস্তুত উনবিংশ শতকে মুসলমান সমাজসংস্কারকদের অনেকেই মুঘল বা নবাবী আমলের আমোদপ্রিয়তাকে, নৈতিক অধঃপতনকে মুঘল পতনের মূল কারণ হিসাবে চিহ্নিত করেছেন।

কাজেই কম খরচে ভদ্রজীবন যাপন করবার প্রয়োজনীয়তা এবং গৃহস্থালী চালাবার ক্ষেত্রে মহিলাদের গুরুত্ব, নারী শিক্ষাকে সংস্কারকদের আলোচনার গণ্ডীতে নিয়ে এল। অশিক্ষিত স্ত্রীরা অধুনা / নব্য শিক্ষিত মুসলমান তরুণদের বুদ্ধিদীপ্ত সাহচর্য্য দিতে অক্ষম ছিলেন। এটাও ছিল সংস্কারকদের চিন্তার বিষয়। চিন্তার তৃতীয় কারণ ছিল প্রকৃত শিক্ষার অভাবে মুসলিম রমণীদের মধ্যে বিভিন্ন ধরণের কুসংস্কার। মুসলমান পুনরুজ্জীবনবাদীদের দৃষ্টিতে ইসলাম বিরোধী এই সমস্ত কুসংস্কার দূর করতে হলে স্ত্রীজাতির শিক্ষা ছিল

আবশ্যিক। এই সব কারণে মুসলমান সমাজসংস্কারকদের চোখে স্ত্রী শিক্ষাই হয়ে উঠেছিল প্রধান উপজীব্য। তবে এ বিষয়ে বিভিন্ন প্রজন্মের সংস্কারকদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়।

প্রথম প্রজন্মের যাকে প্রাক বলে ১৮৫৭ বলে চিহ্নিত করা যায়, নেতৃত্ব দিয়েছিলেন স্যার সৈয়দ আহমেদ (১৮১৭ - ৯৮)। ১৮৭৫ খ্রীষ্টাব্দে আলিগড় কলেজের প্রতিষ্ঠাতা এই মহাপ্রাণ ব্যক্তিটি ছিলেন উত্তর ভারতীয় আশরাফ সমাজে সমাজ তথা শিক্ষা সংস্কার আন্দোলনের পথিকৃত। স্যার সৈয়দের বাড়ির বাইরে বিদ্যালয় অঙ্গনে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে আপত্তি থাকলেও তাঁর নিজের মা ছিলেন এক বিরল ব্যক্তিত্বের অধিকারিণী আলোকপ্রাপ্ত এক নারী এবং স্যার সৈয়দের নারীদের বিষয়ে ধারণা তৈরী হয়েছিল এমনই কিছু অসামান্য নারীদেরকে আদর্শ হিসাবে সামনে রেখে। বলা যেতে পারে প্রথম প্রজন্মের মুসলমান সমাজ সংস্কারকদের কাছে, গৃহশিক্ষিত পর্দানশিন মহিলারাই ছিলেন আদর্শ। উনবিংশ শতকের শেষ ভাবে বা বিংশ শতকের প্রথম দিকে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারক যেমন, আলিগড়ের আবদুল্লাদের মত ব্যাক্তিত্বরা কিন্তু মেয়েদের বিদ্যালয়ের আঙ্গিনায় নিয়ে যেতে তৎপর ছিলেন। এছাড়া ছিল বিভিন্ন ধরণের 'আঞ্জুমান' বা সংগঠন যারা প্রকাশ্যে নারী শিক্ষাকে তাদের প্রধান লক্ষ্য বলে ঘোষণা করেছিল। কাজেই নারীর অধিকারের প্রশ্নে প্রথম দুই প্রজন্মের মধ্যে তফাৎ যথেষ্টই স্পষ্ট।

১২.৩.৭.১.১ ঃ মুসলমান সমাজে প্রথাগত শিক্ষা

মুসলমান সমাজে শিশুদের শিক্ষা শুরু হত ৪ বছর ৪ মাস ৪ দিনের মাথায় 'বিসমিল্লাহ' অনুষ্ঠানের মাধ্যমে (অনেকটা 'হাতে খড়ির' মত) ওই দিন তাকে তাদেরকে নিয়ে কোরানের কোন সুরা পড়ানো হত এবং তারপর থেকে ছেলে / মেয়েটি 'ওস্তাদ' বা গুরুর কাছে শিক্ষা নিতে শুরু করত। এই পর্যায়ে বাচ্চা মেয়েরাও শিক্ষা প্রাপ্ত হত। মূলত কোরাণ বা প্রধান ধর্মগ্রন্থটি মুখস্থ করার পাশাপাশি কিছু ব্যাকরণ ও 'আদাব' শিক্ষা দেওয়া হত যা ছিল মূলত গুলিস্তাঁ বা বোস্তাঁ -র কিছু গল্পের মাধ্যমে সহবৎ শিক্ষা। এর উদ্দেশ্য মূলত মুসলমান ব্যবহারজীবীদের নীতিশিক্ষা দেওয়া হলেও মেয়েরা একেবারে অপাংক্তেয় ছিলনা। ছোটবেলায় দাদা, ভাইয়ের সাথে কোন পুরুষ, 'ওস্তাদে'র কাছে শিক্ষা গ্রহণের ক্ষেত্রে তাদের বাধা ছিলনা। কিন্তু মেয়েদের বয়স নয় / দশ পেরোলে পর্দা প্রথার কারণে তাঁদের আর পুরুষ 'উস্তাদের' কাছে শিক্ষাগ্রহণ সম্ভবপর হতনা। অনেক ক্ষেত্রে মৌলবীদের বিধবা স্ত্রী বা মহিলা আত্মীয়ারা 'উস্তানী' (মহিলা শিক্ষা গুরু) -র কাজ করলেও এই শিক্ষার মান কখনোই খুব উঁচু ছিলনা। আর তারপরে মুসলমান বালকেরা মক্তব্য এবং পরে মাদ্রাসা অথবা কোন বিশেষ গ্রন্থে পারদর্শী বিদ্বানের কাছে শিক্ষাগ্রহণের মাধ্যমে উচ্চ শিক্ষার পাঠ শেষ করলেও মেয়েদের কাছে উচ্চ শিক্ষার দরজা চিরতরে বন্ধ ছিল। তাই উনবিংশ শতকের শরীফ পরিবারগুলিতে পড়তে জানা মহিলার সংখ্যা ছিল অল্প, আর লিখতে জানতেন কিছু বিরল সংখ্যক মহিলা।

এমনকি এই প্রথাগত শিক্ষাদান পদ্ধতিও উনবিংশ শতকে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে পড়েছিল। এই শিক্ষার অধিকাংশই ছিল রাষ্ট্রীয় আনুকুল্যের বাইরে মূলত ধর্মীয় দান বা ওয়াকফ এর দ্বারা পরিচালিত। কিন্তু উনবিংশ শতকে সরকার যত বেশী ওয়াকফগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করবার চেষ্টা করতে লাগলেন ততই

প্রথাগত শিক্ষা – উস্তাদ, উস্তানী দ্বারা পরিচালিত শিক্ষার গোড়ায় টান পড়ল। অর্থাৎ ঠিক যে সময়টাতে নারী শিক্ষার গুরুত্ব মুসলমান বিশেষতঃ শরীফ সমাজে অনুভূত হতে থাকল তখনই শিক্ষাদানের উপযুক্ত লোকের অভাব প্রকট হয়ে উঠল।

১২.৩.৭.১.২ ঃ স্যার সৈয়দ আহমেদ

স্যার সৈয়দের বাবা ছিলেন একজন মরমিয়াঁ সুফী সাধক – নক্সবন্দী মুজাদিদি খিলখিলার গোলাম আলীর শিষ্য এবং সৈয়দের শিশুকাল তাঁর মামা বাড়িতেই কেটেছে। সৈয়দের মা আজিজুন্নিশা বেগম এই প্রথাগত মুসলমান শিক্ষা পেলেও এক অসামান্য রমনী ছিলেন এবং স্যার সৈয়দের চরিত্র ও মতাদর্শ গঠনে তাঁর প্রচণ্ড প্রভাব ছিল। বস্তুতঃ নারীদের পর্দা বা শিক্ষা সম্বন্ধে মা-ই ছিলেন সৈয়দ আহমেদের আদর্শ। তিনি বলেছেন যে 'একজন আদর্শ মা হাজার শিক্ষকের থেকে বেশী কার্যকরী'।

স্যার সৈয়দ নিজেও প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত হবার পর কোম্পানীর অধীনে কাজে নিযুক্ত হন এবং ইংরাজদের সাথে মুসলমান সমাজের সুসম্পর্ক স্থাপনে প্রয়াসী হন। এমনকি ১৮৫৭ -র মহাবিদ্রোহের সময়েও তিনি ইংরাজপক্ষ ত্যাগ করেননি। বস্তুতঃ তাঁর মা দিল্লির অবরোধের সময়ই মারা যান যার ব্যথা সৈয়দ আহমেদের মনে বড়ই লেগেছিল। পরে তিনি ১৮৫৭ -র মহাবিদ্রোহের কারণ দর্শিয়ে একটি বই রচনা করেন যেখানে তিনি সরকার পক্ষকে ভারতীয় অভিজাত সম্প্রদায়ের কথা শুনতে পরামর্শ দিয়েছেন। অন্যদিকে ভারতীয় অভিজাত মহলকে তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষাকে অনুধাবন করতে আবেদন জানিয়েছেন। এই উদ্দেশ্যেই তিনি ১৮৬৪ সালে পশ্চিমী বিজ্ঞানের বইপত্র উর্দুতে অনুবাদের জন্য Scientific Society প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর মতে ইসলাম একটি যুক্তিনির্ভর ধর্ম আর তাই পশ্চিমী বিজ্ঞানচর্চা ইসলাম বিরুদ্ধ হতে পারে না।

নারী প্রসঙ্গে স্যার সৈয়দ ছিলেন পর্দাপ্রথার সমর্থক। তাঁর মতে মেয়েরা ছেলেদের থেকে শারীরিক ও বুদ্ধিবৃত্তির দিক থেকে নিকৃষ্ট, তার কারণ মেয়েরা স্বভাবগত ভাবে বেশি আবেগনির্ভর। স্বাভাবিক ভাবেই মহিলারা বিভিন্ন ধরণের বিচিত্র, হাস্যকর চিন্তাভাবনার দ্বারা তাড়িত হয় বেশী। এর ফলে পুরুষদের জীবনটাই বিষময় হয়ে ওঠে। মেয়েরা সারা জীবন খাঁচাতে বন্দী থাকার ফলে উড়তেই ভুলে গেছে। মনে হতে পারে যে স্যার সৈয়দ নারীদের পশ্চাদ্পদতার পেছনে পর্দা প্রথাকেই দায়ী করেছেন। উল্টে তাঁর মতে মানসিকভাবে দুর্বল নারীজাতির সম্মান রাখবার জন্যই পর্দা প্রথার প্রয়োজন।

তবে পাশাপাশি এটাও বলা দরকার যে স্যার সৈয়দ মনে করতেন যে ভারতে পর্দা প্রথার কঠোরতা বড্ড বেশী। ইসলামের গোড়ার দিকে মেয়েরা সম্পত্তির অধিকার পেতেন এবং তার রক্ষণাবেক্ষণও ছিল তাঁদের দায়িত্ব। ফলে মহিলাদের শিক্ষাদান করা হত। তাঁদের লিখতে পড়তে জানতে হত। ইসলামের অধঃপাতে যাবার ফলে মহিলাদের এই অধিকারও সংকুচিত হয়েছে।

এক অর্থে একাধারে পর্দা প্রথাকে সমর্থন, আবার সাথে সাথে পর্দা প্রথার কারণেই নারীদের অধিকার বা শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হবার কথা বলাটা স্ববিরোধী মনে হলেও আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এটা ছিল প্রথাগত ইসলামের দায়বার মধ্যে থেকে তাকে পরিবর্ত্তন / পরিশীলিত করবার এক কৌশলী পদক্ষেপ যা অন্য সংস্কারকরাও গ্রহণ করেছিলেন।

১২.৩.৭.১.৩ ঃ সর্বভারতীয় মহামেডান শিক্ষা সম্মেলন (All India Muhammedan Educational Conference)

১৮৮৬ সালে ভারতীয় সংগ্রেস প্রতিষ্ঠার পরের বছরই এর পাল্টা হিসাবে স্যার সৈয়দ উপরোক্ত প্রতিষ্ঠানটির জন্ম দেন। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এটি একটি বার্ষিক সম্মেলন ছিল এবং স্যার সৈয়দ, যিনি তীব্র ভাবে কংগ্রেস বিরোধী মানসিকতা সম্পন্ন ছিলেন চাননি যে এই প্রতিষ্ঠানটি কোনভাবে রাজনৈতিক কার্যকলাপে জড়িয়ে পড়ুক। পরে ১৮৯৮ তে স্যার সৈয়দের মৃত্যুর পর MEC কে অন্যান্য অংশের মধ্যে ছড়িয়ে দেবার সচেতন প্রয়াগ করা হয়। এই সম্মেলনের ১৮৯১ -এ আলিগড়ে অনুষ্ঠিত বার্ষিক অধিবেশনে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারকল্পে একটি সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এর পেছনে অবশ্য আলিগড় কলেজের নব নিযুক্ত আইনের অধ্যাপক সৈয়দ কারামৎ হোসেন এর উদ্যোগ বিশেষ ভাবে স্মরণীয়। লণ্ডনে আইন পড়বার সময়তেই সৈয়দ কারামৎ, আলিইমাস, মজরুহুল হক, মিঁয়া শাহ দীন প্রমুখ ১৮৮৮ তে ঐশ্লামিক দুনিয়ার / সমাজের সমস্যার আলোচনা ও তার নিরসন কল্পে অঞ্জুমান-ই-ইসলাম প্রতিষ্ঠা করেন, যার আলোচ্যসূচীতে স্ত্রীশিক্ষা ছিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ। পরে দেশে ফিরে এলাহাবাদে আইন ব্যবসায় নিযুক্ত থাকবার সময় স্যার সৈয়দের ছেলে জাস্টিস সৈয়দ মাহমুদ তাঁকে আলিগড়ে আইনের অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত হতে আবেদন জানালে কারামৎ প্রাথমিকভাবে স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে তাঁর নিজের ও স্যার সৈয়দের মতানৈক্যের কথা ভেবে দ্বিধান্বিত থাকলেও পরে সেটা কেটে যায়। ১৮৯১ তে সম্মেলনে যোগ দিয়ে তিনি স্ত্রীশিক্ষা বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণে উদ্যোগী হন। পরে ১৮২৬ তে মূলত তাঁরই উদ্যোগে MEC -র মধ্যে Women Education Section বা স্ত্রীশিক্ষা বিভাগ -এর গোড়াপত্তন হয়।

এর প্রথম সম্পাদক ছিলেন সৈয়দ মুমতাজ আলি কিন্তু তাঁর আমলে বিশেষ কিছু উন্নতি না হলে পরে কারামৎ হুসেন -এর ছাত্র শেখ মুহম্মদ আবদুল্লাহর উপর স্ত্রী শিক্ষা বিস্তার এর দায়িত্ব অর্পিত হয়। মুহম্মদ আবদুল্লাহ ছিলেন কাশ্মীর এর পণ্ডিত বংশজাত ধর্মান্তরিত মুসলমান। পরে তিনি আলিগড়ে আইন শিক্ষা করেন। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ওয়াহিদ জাঁহা বেগম আলিগড়ে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে দৃষ্টান্তমূলক কাজ করেছেন।

১৯০২ সালে স্ত্রী শিক্ষা বিভাগ (Women Education Section) -এর সম্পাদক হবার সময় তাঁর উপর দায়িত্ব বর্তেছিল। মেয়েদের জন্য একটি শিক্ষক শিক্ষণ কেন্দ্র বা নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠার। কিন্তু তিনি পরে একটি মেয়েদের প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করেন। মুসলমান সমাজে স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে জনমত গঠন করবার লক্ষ্যে তিনি তাঁর স্ত্রী খাতুন (ভদ্রমহিলা) নামে একটি পত্রিকা চালু করেন। ১৯১৪ সাল পর্যন্ত যতদিন এই পত্রিকা প্রকাশ চলেছে ততদিন স্ত্রীশিক্ষার বিষয়ে জনমত গঠনে এই পত্রিকা যোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থসংগ্রহ করবার জন্য একদিকে ভোপালের মহিলা শাসক সুলতান জাহা বেগম এর মত বিদ্যোৎসাহীদের কাছে দরবার করা, অন্যদিকে বোম্বাই তথা অন্যান্য জায়গার লব্ধপ্রতিষ্ঠা মুসলমানদের কাছে আবেদন এবং সর্বোপরি সরকারকে বুঝিয়ে আবদুল্লা উপযুক্ত অর্থ-সংগ্রহে সফল হন। ১৯০৬ সালে ১৭ জন ছাত্রী নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় আলিগড় বালিকা বিদ্যালয়। কড়া পর্দা প্রথার

আড়ালে মেয়েদের শিক্ষা শুরু হয়। আবদুল্লাহ অর্থ সংগ্রহের কাজে সাফল্যের সাথে করলেও বিদ্যালয়ে শিক্ষা তথা ছাত্রীদের দেখভাল করবার ক্ষেত্রে ওয়াহিদ জাহা বেগম -এর ভূমিকার কোন তুলনা নেই। শরীফ পরিবারের লোকেরা যাতে তাঁদের মেয়েদের এই স্কুলে পড়তে পাঠান তার জন্য বিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে ধর্মশিক্ষা বা প্রথাগত শিক্ষার পাশাপাশি মুসলমান নৈতিকতাকে উর্দ্ধে তুলে ধরা হয়েছিল। ১৯১৪ সালে শুরু হয় আবাসিক বিদ্যালয়। সেখানেও ওয়াহিদ জাহাঁ বেগম -এর ভূমিকা সবরকম প্রশংসার উর্ধ্বে। এই স্কুলটি ১৯২৫ -এ ইন্টারমিডিয়েট কলেজে বেং ১৯৩৭ -এ ডিগ্রী কলেজ -এ রূপান্তরিত হয়। তখন তার ছাত্রী সংখ্যা ২৫০ জন।

আবাসিক স্কুলের প্রাত্যহিক রোজনামচা ছিল ভোরে ঘুম থেকে ওঠা, সকালে পাঠ, দুপুরে পাঠান্তে বিশ্রাম, এছাড়া শরীরচর্চা এবং খেলাধূলা ছাড়াও ছিল পাঁচ ওয়াক্ত নমাজ। পাঠ্যসূচীতে উর্দু পড়া এবং লেখা ছাড়াও ছিল অঙ্ক এবং কোরাণ। মেয়েদের জন্য সূচীশিল্প এবং রান্নার ক্লাস নেওয়া হত। তৃতীয় শ্রেণী থেকে দিনে ১ ঘন্টা ইংরেজী ক্লাস হত, পাশাপাশি ভারতীয় ভূগোল এবং ইতিহাস এবং ঐশ্লামিক ধর্মতত্ত্ব বিষয়ে তাদের শিক্ষাদান করা হত।

স্কুলটা আবদুল্লাহ পরিবারের একটি সম্প্রসারিত অংশ হয়ে উঠেছিল। প্রথম দিকে ঘরকন্নার কাজ সামলে বেগম আবদুল্লাহ স্কুলে চলে আসতেন তত্ত্বাবধানের জন্য, গরীব মেয়েদের সঙ্গে দুপুরের খাবার ভাগ করে খেতেন। পরে আবাসিক স্কুল চালু হলে, এবং সেখানে তাঁর তিন মেয়ে ভর্ত্তি হলে তিনি নিজেও হস্টেলে থাকতে শুরু করেন। কাজেই আবাসিকদের শারীরিক এবং নৈতিক উন্নতি বিধানে তাঁর সবসময় সতর্ক দৃষ্টি থাকত। এমনকি আবাসিকদের লেখা চিঠি পত্রও তিনি দেখে রাখতেন। মেয়েদের কাছে তিনি ছিলেন 'আলাবাঈ' আর শেষ আবদুল্লাকে তারা ডাকত 'পাপা মিঁয়া' নিজেদের মধ্যে বড় জনকে তারা 'আপা' (দিদি) সম্বোধন করত। মোটের উপর স্কুলটা একটা পরিবারের মতই বড় হয়ে উঠেছিল।

এখান থেকে পাশ করে অনেকেই উচ্চপদে আসীন হয়েছেন। আবদুল্লাহদের দুই মেয়ের মধ্যে একজন – খাতুন জাহাঁ পরে এম.এ. পড়তে ইংলণ্ডে যান। আরেকজন মুমতাজ জাঁহা ইসাবেলা থোবার্ন কলেজে থেকে পড়াশুনা করে লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম.এ. পাশ করেন। উভয়েই আলিগড় মহিলা মহাবিদ্যালয় -এর প্রিন্সিপাল ছিলেন। আবদুল্লাহদের জ্যেষ্ঠা কন্যা রশীদ জাঁহা লেডী হার্ডিঞ্জ কলেজ থেকে চিকিৎসাশাস্ত্রে পড়াশুনা করে লক্ষ্ণৌতে সরকারের চিকিৎসা বিভাগে কর্মরত ছিলেন।

কিন্তু মোটের উপর আলিগড় নারী শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ছিল নারীকে আরো সুচারু ভাবে তাঁর সাংসারিক ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রে দক্ষ করে তোলা; যাতে সে তার স্বামীকে মানসিক সাহচর্য্য দানে সমর্থ হয়ে ওঠে তার শিক্ষা দেওয়া। কাজেই নারীকে তার সাংসারিক গণ্ডীতেই আরো মর্যাদামণ্ডিত করে তোলা হল। এর ফলে আলিগড় মহিলা মহাবিদ্যালয়ের আবেদন মুসলমান সমাজের একটি নির্দিষ্ট অংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থেকে গেল, সামাজিক এবং বৌদ্ধিক পুনরুজ্জীবনের কেন্দ্র হয়ে উঠতে পারল না।

তবে তা সত্ত্বেও তাদের অবদান কম ছিলনা। এই কলেজের প্রাক্তনীদের মধ্যে অনেকে যেমন রশীদ জাহাঁ বা ইখসৎ চুখতাঈ সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে মুসলমান সমাজের নারী মনের অবদমিত কামনা বাসনাকে ভাষা দিয়েছেন। স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার হলে মেয়েদের পত্রিকা বা নারী সংগঠন (অঞ্জুমান-ই-খোয়াতিন-ই-ইসলাম

এবং অন্যান্য) গুলির গ্রাহক বা সদস্য সংখ্যা বাড়তে থাকে যেখানে পর্দাসহ অন্যান্য সামাজিক বিষয়গুলি নিয়ে খোলামেলা তর্ক বিতর্ক শুরু হয়। এছাড়া শরাফতের দায়রার মধ্যে থেকেও মেয়েদের উচ্চশিক্ষা, চিকিৎসা বা রাজনীতি এবং সমাজসেবায় অংশগ্রহণটা আস্তে আস্তে মুসলমান সমাজে মেনে নেওয়া হল। স্ত্রী শিক্ষার পথিকৃতদের এ ব্যাপারে সরাসরি উদ্যোগ না থাকলেও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে এগুলি দেখা গিয়েছিল।

১২.৩.৭.২ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Gail Minault, Secluded Scholars; Womens Education and Muslim Social Reform in Colonial India, OUP, 1998.

১২.৩.৭.৩ ঃ সম্ভাব্য গ্রন্থাবলী

১। মুসলমান সমাজে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে আলিগড় আন্দোলনের কি ভূমিকা ছিল?

২। স্ত্রী শিক্ষার প্রশ্নে প্রথম প্রজন্মের সংস্কারকদের সঙ্গে দ্বিতীয় প্রজন্মের সংস্কারকদের তফাৎটা কি? স্ত্রী শিক্ষার ক্ষেত্রে আবদুল্লাহ্ পরিবারের অবদান আলোচনা কর।

১২.৩.৭.৪ ঃ সত্যশোধক সমাজ

উনবিংশ শতকে পাশ্চাত্য শিক্ষার কল্যাণে বা ঔপনিবেশিক শাসনের অভিঘাতে সামাজিক প্রতিসরণ বা পেশাগত ক্ষেত্রে পরিবর্তনের কল্যাণে দেশীয় সমাজব্যবস্থায় পরিবর্তন আনার লক্ষ্যে বিভিন্ন ধরণের সমাজ সংস্কারমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠতে থাকে। আঞ্চলিক ভিত্তিতে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানগুলিকে মূলত তিনটি ভাগে ভাগ করা যায় — কিছু প্রতিষ্ঠান ছিল স্বেচ্ছামূলক যাদের সদস্যপদের জন্য কোন বিশেষ বা বিশেষ বিশেষ বর্ণ বা জাতির অন্তর্ভূক্তি জরুরী ছিলনা। এদের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজ সংস্কার, কোন ধর্মীয় উদ্দেশ্য বা জাতির আত্মপরিচিতি প্রতিষ্ঠা নয়। সমাজে নারীর অবস্থান বা বর্ণ / জাতির কঠোর, অন্যায় অনুশাসন থেকে মানুষকে মুক্ত করাই শুধু নয়, শিক্ষা বিস্তার বা অর্থনৈতিক প্রশ্নেও এই প্রতিষ্ঠানগুলির নির্দিষ্ট বক্তব্য বা অবস্থান ছিল। এই সংস্থাগুলি অনেক ক্ষেত্রেই স্কুল বা বিভিন্ন দাতব্য প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করত। উনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে প্রতিষ্ঠানগুলির ক্ষেত্রে ক্রমশঃই উচ্চবর্ণ সমাজের সমস্যা — যেমন বিধবা বিবাহ বা পাশ্চাত্য শিক্ষা বিস্তারের মত বিষয়গুলি তেকে নিম্নবর্ণের সমস্যার দিকে আকর্ষিত হয়। 'প্রার্থনা সমাজ' যেমন ধর্মীয় ও সামাজিক বিষয়গুলির প্রতি তাদের নজর বজায় রেখেছে যেখানে সাধারণভাবে রাজনৈতিক বিষয়গুলির প্রতি আকর্ষণই ছিল বেশি।

এছাড়া আরো দুই ধরণের প্রতিষ্ঠান দেখা যাচ্ছিল — নিম্নবর্ণের জাতিগুলির অনেকেই আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংঘবদ্ধ হচ্ছিল যেমন 'সত্য শোধক সমাজ'। এছাড়া ছিল 'আর্য সমাজ' বা 'থিওজফিকাল'

সোসাইটির' মত প্রতিষ্ঠান যার মূল লক্ষ্য সামাজিক পরিবর্ত্তনের থেকেও ধর্মীয় সংস্কার – বিভিন্ন সামাজিক প্রথার পরিবর্ত্তনের প্রচেষ্টা যার অনুসারী হতে পারে প্রধান লক্ষ্য তা কখনোই নয়।

মহারাষ্ট্রের জ্যোতিবা গোবিন্দ ফুলে (১৮২৭ - ১৮৯০) ছিলেন উনবিংশ শতকের সমাজ সংস্কারকদের মধ্যে একজন বিরল ব্যক্তিত্ব যার চিন্তা এবং কর্মের মধ্যে তফাৎ ছিল না। হিন্দু ধর্ম / সমাজের অচলায়তনের বিরুদ্ধে যেখানে সাধারণভাবে সংস্কারকদের কাজ মূলতঃ পত্র পত্রিকায় প্রতিবাদ ঘোষণার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকত সেখানে জ্যোতিবা ফুলে ১৮৫০ -এর দশকে পুনায় মেয়েদের জন্য একটি বালিকা বিদ্যালয় এবং অস্পৃশ্যদের জন্য দুটি আলাদা স্কুল প্রতিষ্ঠা করেন। এছাড়াও শিশুহত্যা প্রতিরোধকল্পে তিনি ১৮৬৩ তে একটি অনাথাশ্রম তৈরী করেন যেখানে বিধবাদের অবাঞ্ছিত সন্তানদের দেখভাল করবার ব্যবস্থা করা হয়। আমরা আগেই দেখেছি বহুবিবাহ বা বাল্যবিবাহজনিত কারণে কেন এবং কিভাবে এই সময় অল্পবয়সী বিধবাদের সংখ্যা বাড়ছিল এবং দুষ্টলোকের প্ররোচনায় কিভাবে অবাঞ্ছিত মাতৃত্ব বেড়েই চলেছিল। হিন্দু সমাজের পুনর্গঠনের লক্ষ্যে তিনি বিধবা বিবাহ সমর্থন করেন। বাল্যবিবাহ বা বহুবিবাহ রোধেও তিনি তৎপর ছিলেন। একবার ফুলে প্রশ্ন করেন সদ্যমৃত স্বামীর সাথে স্ত্রী সহমরণে সতী হলে সদ্যমৃতার স্বামী তার সাথে 'সুত্ত' ('সতী'র পুঙ্গলিঙ্গ) হবে না কেন? ১৮৭৩ সালে তিনি 'নীচুবর্ণজাত' মানুষদের ব্রাহ্মণদের ভণ্ডামি থেকে রক্ষা করবার জন্যে 'সত্যশোধক সমাজে'র প্রতিষ্ঠা করেন। ফলে এ বিষয়ে বহু লেখা লিখেছেন যার মধ্যে বিখ্যাত হল সালে লেখা 'গুলামগিরি'। তিনি সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে পাশ্চাত্যশিক্ষার সমর্থক ভূমিকার কথা স্বীকার করেছেন।

তাঁর এই আন্দোলন ছিল মূলতঃ মহারাষ্ট্রের মধ্যমবর্গীয় জাতিবর্গের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে পরিচালিত কিন্তু এক্ষেত্রে একটা কথা স্মরণ করা উচিত, উনবিংশ শতকে জাতি / বর্ণের স্তরগুলিতে উত্থানের ক্ষেত্রে অনেক সময়ই 'আর্যীকরণ' বা 'সংস্কৃতায়ন' (Aryanization / Sanskritization) -এর প্রভাব দেখতে পাওয়া যায়। এই প্রবণতার কল্যাণে উপজাতি / নিচুজাতের মধ্যে নিরামিষ আহার, মদ্যপান বিরোধ কার্যকলাপের পাশাপাশি আগে বিধবা বিবাহ চালু থাকলেও সেগুলি বন্ধ করে দেওয়া হোত। এককথায় সমাজের উচ্চবর্ণের মধ্যে চালু সামাজিক প্রথাগুলিকে অনুকরণ করবার একটা তাগিদ এই সময় অনেক নিম্নবর্গীয় বা উপজাতি শ্রেণীর মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। জ্যোতিবা ফুলের আন্দোলন 'অনুন্নত' জাতিদের উত্থানের জন্য পরিচালিত হলেও কোন পশ্চাদ্‌গামী প্রবণতা আশ্চর্য্যজনক ভাবে জ্যোতিবা ফুলে পরিচালিত আন্দোলনের মধ্যে দেখা যায়না। নিম্নবর্ণের মানুষের আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মহারাষ্ট্র অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে এবং এই প্রসঙ্গে জ্যোতিবা ফুলে অগ্রণী ভূমিকা / পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করেছেন যদিও তাঁর নিজের সময়তেও 'সত্যশোধক সমাজের' আবেদন ছিল সীমিত।

১২.৩.৭.৫ ঃ শ্রী নারায়ণ আন্দোলন

দক্ষিণ ভারতের অন্য অনেক জায়গার মতই কেরালাতে বর্ণ / জাতি বৈষম্য ছিল অত্যাধিক। একদিকে ব্রাহ্মণ সহ অন্যান্য উচ্চবর্ণের লোকেরা প্রচুর সুযোগ সুবিধা ভোগ করত – ব্রাহ্মণদের অপরাধের মধ্যে যাইহোক না কেন তাঁদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা যেত না। অন্যদিকে নীচবংশজাত লোকেদেরকে কারণে

অকারণে অন্যায় এবং কঠোর শাস্তির সম্মুখীন হতে হোত। বিচারকেরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ব্রাহ্মণ হওয়ায় অব্রাহ্মণদের প্রতি অবিচারও কম হত না। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বৈষম্য ছাড়াও সামাজিক অন্যায় কিছু কম হত না। এলাভা (Ezhava, z টা ল hard consonant হওয়ায় ইংরাজীতে হয় l বা z হিসাবে লেখা হয়) বা নায়ার সহ অন্যান্য অব্রাহ্মণদের প্রতি বিভিন্নরকম বৈষম্যমূলক প্রথা প্রচলিত ছিল। এলাভা বা নায়ার মহিলারা ব্রাহ্মণ বা উচ্চবংশের কাছ উর্দ্ধাঙ্গ অনাবৃত রাখতে বাধ্য থাকতেন – বস্তুতঃ এই বিষয়কে কেন্দ্র করে উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই নিম্নবর্ণের লোকেরা – যেমন শানার (তালের রস থেকে তাড়ি বানায় এমন শুঁড়ি সম্প্রদায়) বা তামিলনাড়ুতে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামে লিপ্ত হতে বাধ্য হয়েছেন। ঔপনিবেশিক শাসনে অর্থনৈতিক পরিবর্ত্তনের পাশাপাশি পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রত্যক্ষ প্রভাব ইত্যাদির কারণে দক্ষিণ ভারতে বর্ণবৈষম্য বিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন শুরু হলে কেরালাও তার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকেনি।

শ্রী নারায়ণ গুরু ত্রিবাঙ্কুরে এক এলাভা পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সংস্কৃতে পাণ্ডিত্য অর্জনের পর এলাভাকের সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। কেরালায় বিভিন্ন মন্দিরে অব্রাহ্মণ বিশেষত অব্রাহ্মণ, বিশেষত অস্পৃশ্যদের প্রবেশের ক্ষেত্রে বিধিনিষেধ ছিল। তিনি বিভিন্ন জায়গায় এলাভা মানুষদের জন্য মন্দির নির্মাণ করেন যেখানে পুলায়া বা অন্যান্য আরো নীচু বংশজাত, অস্পৃশদের প্রবেশের ক্ষেত্রে কোন বিধিনিষেধ ছিলনা। কেউ কেউ তাঁর এই কাজে বিরোধিতা করলে তিনি সোচ্চার হয়ে জানাতেন তিনি এলাভা শিবের জন্য মন্দির বানিয়েছেন, ব্রাহ্মণ শিবের জন্য নয়। এছাড়াও তিনি এলাকার নারীর পক্ষে অসম্মানজনক অলিকেট্টুকল্যানম বা তিরান্দুকুলী -র মত প্রথার বিরুদ্ধে জনমত সংগঠিত করতে থাকেন।

১৯০৩ এর ১৫মে শ্রী নারায়ণ গুরুর প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায় শ্রী নারায়ণ ধর্ম পরিপালন যোগম (SNDP) -র প্রতিষ্ঠা হয়। এর প্রথম বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয় আরুভিপুরম্ এ। প্রথম দিকে ডঃ পল্পু বা কুমারণ আসন এর মত ব্যাক্তিত্ব এই প্রতিষ্ঠানটির সাথে যুক্ত ছিলেন। কিছুদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠানটি এলাভাদের প্রতিনিধিত্বকামী সংগঠন হয়ে ওঠে। এর প্রধান লক্ষ্য ছিল এলাভা সহ অন্যান্য অনগ্রসর জাতিগুলির সামাজিক ও আত্মিক উন্নতিকল্পে শ্রী নারায়ণ গুরুর মতাদর্শকে প্রচার করা। এই সংগঠনের একজন নেতা কে. আয়াপ্পান ১৯১৭ তে চিরাই নামে একটি জায়গায় এলাভাদের সাথে অন্যান্য অন্তজ শ্রেণীর একই সাথে পংক্তিভোজ 'মিশ্রভোজনম' -এর ব্যবস্থা করেন।

১৯২৮ শে ভরকলা নামে একটি জায়গায় শ্রী নারায়ণ গুরুর দেহান্ত হয়। সাধারণভাবে সমগ্র এলাভা সহ অন্যান্য অনগ্রসর, নিপীড়িত জাতির উন্নতিতে কাজ করলেও মহিলারা – যারা বিভিন্ন ভাবে সামাজিক প্রথার কারণে অপমাণিত হতেন, শ্রী নারায়ণ গুরু তাদেরকে সম্মান পুনরুদ্ধারের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

১২.৩.৭.৬ ঃ স্ব-মর্যাদা আন্দোলন

দক্ষিণ ভারত বিশেষত বর্তমান তামিলনাড়ুতে বিংশ শতকের গোড়ার দিকে ব্রাহ্মণ্য একাধিপত্যের

বিরুদ্ধে অব্রাহ্মণ উচ্চবর্গীয় বর্ণ এবং অস্পৃশ্য জাতিদের যে আন্দোলন জাস্টিস পার্টি প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে শুরু হয়েছিল তার নবরূপ এই Self Respect আন্দোলন বা তামিল ভাষায় স্বমর্যাদা ইয়াক্কিয়ম। স্বমর্যাদা প্রতিষ্ঠার এই আন্দোলন কে অনুধাবন করতে হবে উনবিংশ এবং বিশ শতকের তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিকে জানতে হবে। তামিলনাড়ুতে 'ছোট রাজা'দেরকে (পালাইয়াক্কারর পালিগার) পরাজিত করে যে ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় তার ফলে ক্ষত্রশক্তিকে নির্বীজ করে শাস্ত্রজীবী বা ব্রাহ্মণ একাধিপত্যের সূত্রপাত হয়। সামাজিক ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের অগ্রাধিকারের পাশাপাশি সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণদের প্রায় একচেটিয়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু উনবিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় থেকেই সামাজিক প্রতিসরণ বেশ কিছু তথাকথিত 'নীচুজাত' -এর লোকের আর্থিক অবস্থার পরিবর্ত্তন ঘটায়। শানার বা শুঁড়ি সম্প্রদায়ের লোকেরা তাদের জাতের মহিলাদের প্রতি অসম্মানজনক প্রথার প্রতিবাদ করলে জাতিদাঙ্গাও বেঁধে গেছে। ইতিমধ্যে ধ্রুপদী তামিল সাহিত্যের সাক্ষ্য প্রমাণ মিলতে শুরু করলে সাহিত্যকেন্দ্রিক এক জাতীয়তাবাদের প্রসার ঘটতে শুরু করে।

এই সমস্ত উপাদান সংগঠিত হবার ফলেই ১৯১৬ তে প্রতিষ্ঠিত হয় জাস্টিস পার্টি। লক্ষ্যণীয় যে এই সময়তেই অ্যানি বেশান্তের হোম রুল আন্দোলন ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করে। ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনের পুরোভাগে ছিলেন ব্রাহ্মণরাই যাতে অব্রাহ্মণ রাজনীতিবিদ্দের মনে হতে থাকে যে এর পলে যদি ব্রিটিশ সরকার ক্ষমতা হস্তান্তর করে তাহলে সেই ক্ষমতা যাবে ব্রাহ্মণদেরই হাতে। এই কারণে জাস্টিস পার্টি প্রথম থেকেই জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বিরোধিতা করে এসেছে এবং শেষ পর্যন্ত ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের বিরোধিতায় কাউন্সিল নির্বাচনে অংশগ্রহণ করে। কিছু ক্ষমতার স্বাদ পেলেও জাস্টিস পার্টির নেতৃবৃন্দ নিজেদেরকে অস্পৃশ্যদের দাবী দাওয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেবার ফলে তাদের সমর্থনের ভিত্তি দ্রুত ক্ষয় পেতে থাকে। এই সময় আরেকজন অব্রাহ্মণ নেতা দ্রুত জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলেন – তিনি হলেন রামস্বামী নাইকার যিনি পরবর্ত্তীকালে পেরিয়ার হিসাবে সমধিক পরিচিত। ইরোধে এক আইনজীবী পরিবারের সন্তান রামস্বামী খুব অল্প বয়সেই জাতিবৈষম্যের শিকার হন এবং ব্রাহ্মণ্যবাদের বিরুদ্ধে তীব্র বিদ্বেষী হয়ে ওঠেন। প্রথমদিকে তিনি কংগ্রেসেই ছিলেন যখন প্রথম ভাইকোম সত্যাগ্রহ ও পরবর্ত্তীকালে গুরুকুলম এর ঘটনায় জনপ্রিয়তা লাভ করেন। ১৯২৪ এ ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যে অবস্থিত ভাইকোম মন্দিরের প্রবেশদ্বার সংলগ্ন এলাকায় অস্পৃশ্যদের গতিবিধির উপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহারের দাবীতে যে সত্যাগ্রহ শুরু হয় রামস্বামী নাইকার ছিলেন তাঁর অগ্রভাবে। শেষপর্যন্ত এই বিধিনিষেধ উঠে যায়। ১৯২৫ -এ ত্রিচিনোপল্লীর কল্লিডাই কুরিচিতে অবস্থিত একটি আবাসিক বিদ্যালয়ে (গুরুকুলম) -এ ব্রাহ্মণ ও অব্রাহ্মণ ছাত্রদের পৃথক পংক্তিভোজনে -র বিরুদ্ধে আবার রামস্বামী নাইকার সরব হন। শেষ পর্যন্ত স্কুলের পরিচালক V.V.S.Iyer (একজন প্রাক্তন সন্ত্রাসবাদী নেতা) পদত্যাগ করতে বাধ্য হন। এ হেন পরিস্থিতিতে রামস্বামী কংগ্রেসের অভ্যন্তরে অব্রাহ্মণদের জন্য পৃথক ভোটাধিকার দাবী করলে কংগ্রেসের মধ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। পরিশেষে আরো কয়েকজন অব্রাহ্মণ নেতাদের সঙ্গে নিয়ে তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন। প্রথমদিকে তিনি অব্রাহ্মণ জাতিদের অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে জাস্টিস পার্টির কিছু পদক্ষেপকে সমর্থন জানালেও শেষ পর্যন্ত সামাজিক প্রশ্নে জাস্টিস পার্টির কালক্ষেপের নীতির বিরুদ্ধেও সরব হন।

এই প্রেক্ষাপটেই স্বমর্যাদা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রামস্বামী নাইকার 'পেরিয়ারের' নেতৃত্বে স্বমর্যাদা আন্দোলন শুরু হয় যার মূল উদ্দেশ্য ছিল দ্রাবিড় গৌরবের এর উপর ভিত্তি করে আত্মমর্যাদার পুনঃপ্রতিষ্ঠা যেখানে পৌরাণিক ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের অগ্রাধিকারকে সচেতনভাবে অস্বীকার করা হয়েছে। জাতিভিত্তিক বংশমর্যাদাকে অমান্য করবার জন্য পৌরাণিক অতিকথা বা কাহিনীগুলিকেও অস্বীকার করা হয়েছে কারণ এর মাধ্যমেই ব্রাহ্মণরা নিরক্ষর বা সহজ সরল মানুষদের বোকামির সুযোগ নেয়। দক্ষিণ ভারতীয় সমাজে বৈষম্যের জন্য ব্রাহ্মণদের সম্পূর্ণ দায়ী করে শুভ কাজে ব্রাহ্মণদের আবশ্যক ভূমিকাকেও অস্বীকার করা হয় যেমন বলা হল যে বিবাহের কাজে ব্রাহ্মণের উপস্থিতিতে মন্ত্রোচ্চারণের কোন প্রয়োজন নেই। ব্রাহ্মণ এবং আনুষ্ঠানিকতা ব্যতিরেকে কেবলমাত্র সমাজের লোকজনের উপস্থিতিতে এই ধরণের বিবাহকে স্বমর্যাদা মানিয়ম (বিবাহ) বলা হত। পরে এই ধরণের আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত বিবাহকে আইনী স্বীকৃতিও দেওয়া হয়। স্বাভাবিক ভাবেই বলা যায় যে স্বমর্যাদা আন্দোলন ছিল একটি বৈপ্লাবিক আন্দোলন যার সীমানা প্রাথমিক ভাবে সামাজিক পরিধির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও এর রাজনৈতিক গুরুত্ব ছিল প্রচণ্ড। বস্তুত আজকের দ্রাবিড় মুন্নেত্র কালাঘম (DMK) বা আন্না দ্রাবিড় মুন্নেত্র কালাঘম (AIDMK) সবাই এই সমমর্যাদা আন্দোলনেরই উত্তরসুরী।

রামস্বামী নাইকার আনুষ্ঠানিকতা বর্জিত বিবাহ ছাড়াও, সম্পত্তিতে নারী পুরুষ সমানাধিকার দাবী করেন এবং রাজনীতি বা সমাজকর্মের আঙ্গিনায় নারীদেরকে নিয়ে আসেন। এমনকি তিনি অসবর্ণ বিবাহকেও সমর্থন করেন। এই সমস্ত দিক থেকে বলাই যায় যে স্বমর্যাদা আন্দোলন নারীদের অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে কিছু সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিল। এছাড়াও নারী শিক্ষার ক্ষেত্রেও তার ভূমিকা ছিল অনস্বীকার্য। নারীদের কারিকরী শিক্ষাদানের জন্য পলিটেকনিক প্রতিষ্ঠা এমনই একটি ঘটনা।

তবে পরিশেষে বলাই যায় যে আজকের তামিলনাড়ুকে দেখলে মনে হয় না যে একটি ঐতিহ্যশাসিত সমাজে রামস্বামী নাইকারের আদর্শ কোন স্থায়ী ছাপ ফেলতে পেরেছে।

১২.৩.৭.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Charles H. Heimsath, *Indian Nationalism and Hindu Social Reform*, Princeton, New Jersey, Princeton University Press, 1964.
2. A Sreedhara Menon, *A Survey of Kerala History, Kottayam*, 1967.
3. Eugene F. Irschick, *Politics and Social Conflict in South India, The Non-Brahman Movement and Tamil Seperatism*, 1916 - 1929, OUP, 1969.

১২.৩.৭.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। নিপীড়িত জনজাতির মুক্তি আন্দোলন কিভাবে নারীমুক্তির বিষয়গুলিকে সামনে এনেছে?

পর্যায় গ্রন্থ - ৪

CUSTOMARY AND LEGAL STATUS

একক - ৮

(a) Colonial India

(b) Post-Independence

(c) Tribal Societies

বিন্যাসক্রম :

১২.৪.৮.০ : ভূমিকা

১২.৪.৮.১ : ভারতীয় নারীর অধিকার : ঔপনিবেশিক আমল

১২.৪.৮.২ : স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর আইনগত অধিকার

১২.৪.৮.৩ : উপজাতি সমাজে নারীর অবস্থান

১২.৪.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.৪.৮.৫ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৪.৮.০ : ভূমিকা

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার অর্ধাংশ তথা মানব সমাজের মূল ধারক 'নারীদের নিয়ে আজকের সমাজ বিজ্ঞান ও ইতিহাসে আলাদা করে আলোচনা করার প্রয়োজনীয়তার মধ্যেই লুকিয়ে আছে তাদের স্বাভাবিক ও প্রয়োজনীয় অধিকার লংঘনের অমোঘ সত্য। সারা বিশ্বের বহু জাতি, বর্ণ, ভাষা ও অর্থনৈতিক শ্রেণীর সমন্বয়ে গঠিত 'নারী সমাজকে' কয়েকটি সাধারণ সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। অঞ্চল ও দেশ ভেদে তাদের প্রথাগত প্রচলিত অধিকার (customary rights) এবং আইনগত অবস্থান ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির। ভারতের মত বিস্তৃত এবং সাংস্কৃতিক বহুত্বতা (Cultural Plurality) - র দেশে নারীর প্রচলিত অধিকার ও আইনগত অধিকারে বিভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। এই ভিন্নতার মূল চালিকা শক্তি হল ভারতের সাংস্কৃতিক বহুত্বতা বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্কৃতির বৈচিত্র্য। ফলে ভারতীয় নারী যুগ যুগ ধরে তাদের ধর্মীয় পরিচিতির ভিন্নতার জন্য আইনগতভাবে ভিন্ন ভিন্ন মর্যাদা ভোগ করে আসছে। পাশাপাশি ভারতের উপজাতীয় সমাজে হিসাবে পরিচিত জনগোষ্ঠীর (Tribal Communities) নারীর নিজস্ব কতগুলি প্রচলিত নিয়মকানুন আছে যা ঐ সমাজের নারীদের তথা কথিত ভারতীয় সমাজের মূল সংস্কৃতির (Main Stream Culture) নারীদের থেকে আলাদা (Other) হিসাবে চিহ্নিত করেছে। আলোচ্য এককে ভারতীয় নারীর প্রথাগত অধিকার ও আইনগত মর্যাদা নিয়ে ইতিহাসের দৃষ্টিতে ঔপনিবেশিক আমল থেকে শুরু করে বর্তমানকাল পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে আলোচনা করা হয়েছে। পাশাপাশি ভারতীয় উপজাতি নারীর (Tribal Women) অধিকারের উপরেও আলোকপাত করা হয়েছে।

ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর প্রথাগত ও আইনগত অধিকার নিয়ে আলোচনা করার পূর্বে প্রাক ঔপনিবেশিক আমলের ভারতীয় নারীর অবস্থান একটু পর্যালোচনা করা দরকার। বেশীরভাগ ঐতিহাসিক প্রাক্ ঔপনিবেশিক Pre-colonial ও ঔপনিবেশিক আমলের ভারতীয় নারীর অবস্থান আলোচনা করেছেন ঐ সমাজের বস্তুগত সম্পত্তি (Material Culture) ও সামাজিক গঠনের Forms of the society প্রেক্ষিতে। ভারতীয় নারী সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে অনেকেই আবার অর্থনৈতিক উন্নয়ন (Economic Development) এর মাপকাঠির উপর আলোকপাত করেছেন। সুবিরা জয়সওয়াল মনে করেন যে বৈদিকযুগে ভারতীয় জনগোষ্ঠীগুলি ছিল মূলত পশুচারণের উপর নির্ভরশীল এবং তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে ঘুরে বেড়াত। ফলে ঐ সময় অধিক পরিমাণে উদ্বৃত্ত উৎপাদন (Surplus generation) সম্ভব ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই বিভিন্ন সামাজিক স্বত্তার (Social Categories) প্রথাগত অধিকার ছিল অপেক্ষাকৃত উন্নত। বৈদিকযুগে তাই শিক্ষা ও ধর্মাচরণে নারীর অধিকার ছিল সুরক্ষিত যা বর্ণ ব্যবস্থার হাত ধরে শ্রেণীভিত্তিক সমাজ (caste based social classes) বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে অরক্ষিত হতে থাকে। নারীর প্রথাগত অধিকারের এই অবনতি মোটামোটিভাবে খীষ্ট্রপূর্ব ৫০০ অব্দ থেকে ১৪০০ খ্রীষ্টাব্দ পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

প্রাচীনকালে রচিত স্মৃতিশাস্ত্র (Law books) গুলো নারীসহ বিভিন্ন সামাজিক সত্তা বিশেষ করে নিম্নজাতিয় সম্প্রদায়ের (Lower caste communities) অবদমিত অবস্থানের স্বাক্ষ্য বহন করছে। এই শাস্ত্রগুলো মুলত পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃকুলানুশারী (Patriarchal patrilinial) সমাজ, পরিবার বয়জ্যোষ্ঠ পুরুষ ব্যক্তির কর্তৃত্ব এবং নারী ও জাতির অবদমনের ব্যবস্থাকে বহুমুখী ব্যাখ্যার দ্বারা বৈধ বলে ঘোষণা করেছে। এমনকি *শ্রীমদ্ভাগবত গীতায়* বৈশ্য ও শুদ্রজাতি এবং নারীকে সামাজিক মর্যাদায় সমগোত্রীয় হিসাবে ব্যাখ্যা করে ঐ কুল সমূহে মানুষের জন্মকে পূর্বজন্মের পাপের পরিণতি হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। *পরাশর* স্মতিতেও নারী ও শুদ্রকে হত্যা করার শাস্তি সমান বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় ভারতীয় সমাজে নারীর স্বাভাবিক অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে কতগুলো বাধা ছিল। কন্যা সন্তানের জন্ম বৈদিকযুগে অসম্মানীয় না হলেও পরবর্তী বৈদিক যুগে তা পিতা মাতার শংকার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। শিক্ষায় নারী ক্রমশ সংকুচিত হতে থাকে। উপনয়ন অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে প্রথাগত শিক্ষালাভ করার সূচনা নারী ও শুদ্রের ক্ষেত্রে বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এক সময় দেখা যায় যে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নারীর আর প্রবেশাধিকার ছিল না। অন্যদিকে অষ্টম শতকের মধ্যে মেয়েদের বিয়ের বয়স ৯ থেকে ১০ এর মধ্যে নেমে আসে। যার ফলে নারীর শিক্ষালাভের সুযোগ নষ্ট হওয়ার পাশাপাশি প্রাক্-বয়োসন্ধি (Prepuberty) বিয়ের প্রথা নারীর স্বাস্থ্যের স্বাভাবিক বিকাশের পথও বন্ধ হয়েছিল।

তবে অভিজাত ও শাসক পরিবারের মেয়েরা প্রথাগত শিক্ষা ও সামরিক শাসন সহ শিল্প চর্চার কিছু অধিকার ভোগ করতেন। তাই প্রাচীন কালে গার্গী, মৈত্রেয়ী, আত্রেয়ী বা অম্রাপলীর মতো স্বনামধন্যা নারীর অস্তত্বের সন্ধান পাওয়া যায়। একইভাবে মধ্যযুগীয় ভারতীয় নারী মীরা বিখ্যাত হয়েছিলেন। কিন্তু এরা ছিলেন ব্যতিক্রম। প্রকৃতপক্ষে উচ্চবর্গীয় নারী মূলত পরিবারের চার দেওয়ালের মধ্যেই বন্দী ছিলেন। স্বাধীন স্বত্ত্বা হিসাবে নারীর অধিকার ভোগ করার অধিকার প্রায় ছিলনা বললেই চলে। **মনুসংহিতার** বিধানে স্পষ্টই বলা হয়েছে যে নারী কন্যা হিসাবে তার পিতা, স্ত্রী হিসাবে স্বামী ও বিধবা হিসাবে তার পুত্রের অধীন থাকে।

পিতৃতান্ত্রিক ও পিতৃকুলানুশারী সমাজে নারীকে কূল রক্ষার প্রধান বাহন হিসাবে দেখা হতো। জাতি ব্যবস্থার পবিত্রতা রক্ষায় নারীর ভূমিকাকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। তাই অপ্রাপ্ত বয়সে বিয়ের পাশাপাশি স্বজাতি (own caste) ও অনুলোম বিবাহ প্রথা নারীর স্বাভাবিক অধিকার লংঘনের স্পষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি প্রতিলোম বিবাহ প্রথা নারীর স্বাভাবিক অধিকার লংঘনের স্পষ্ট উদাহরণ। পাশাপাশি প্রতিলোম বিবাহ অর্থাৎ উচ্চবর্ণের নারীর নিম্নবর্গীয় পুরুষের সঙ্গে বিবাহের প্রথা নিষিদ্ধ ছিল। উচ্চবর্গীয় বিধবা নারীর অবস্থা ছিল সবচেয়ে করুণ। তার পুনঃ বিবাহের অধিকার ছিল না। জীবনের সবরকম আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে তাকে পরিবারের দুর্ভাগ্য হিসাবে দেখা হতো।

নারীর সামাজিক ও সংস্কৃতিক অধিকার অবনমন ঘটলেও কিছু কিছু ক্ষেত্রে নারীর সম্পত্তির অধিকার স্বীকৃত ছিল। বিশেষ করে **স্ত্রীধনে** নারীর অধিকার সপ্তম শতকের পরবর্তীকালে পরিবারের সম্পত্তি করার সমতুল বলে ব্যাখ্যা করেছেন শাস্ত্রকারগণ। কিন্তু সম্পত্তির অধিকারে শাস্ত্রের আইনগণ ব্যাখ্যা বাস্তবে কতটুকু ছিল সে সম্পর্কে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন রামশরণ শর্মা, রোমিলা থাপার ও সুবিরা জয়সওয়াল।

প্রাচীন যুগের নারীর অধিকার আলোচনা করার সময় আমাদের মনে রাখতে হবে যে হিন্দু ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের বিকাশ নারীর অধিকার ভোগ করার ক্ষেত্রে কিছুটা হলেও ইতিবাচক ভূমিকা পালন করেছিল। স্ত্রী ও মা হিসাবে নারীর অবস্থান বৌদ্ধ সাহিত্যে অসম্মানীয় ছিল না। নর্তকী ও ভিক্ষুণী হিসাবেও বৌদ্ধ নারীর অবস্থান সম্মানীয় ছিল। তবে বৌদ্ধ সংঘে ভিক্ষুণীর অধিকার পিতৃতান্ত্রিক তা থেকে সুরক্ষিত ছিল না।

কিন্তু নারীর অধিকার খানিকটা প্রশস্ত হয়েছিল মধ্যযুগে ভক্তি আন্দোলনের বিকাশের ফলে। ভক্তিবাদের প্রচারকগণ ইহজগতের বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির জন্য মধ্যবর্তী কোন সত্তা পুরোহিত বা পণ্ডিতের প্রয়োজনীয়তাকে স্বীকার করেননি। এমনকি সংস্কৃত (দেবভাষা) ভাষার পরিবর্তে মানুষের ভাষার মাধ্যমে ভক্তিরস প্রচারে জোর দিয়েছিলেন তারা। তাই উত্তর ভারতে মীরা ও লাল্লা, দক্ষিণ ভারতে অন্দল ও অক্কা মহাদেবী ও পশ্চিম ভারতে বহনবাঈ -এর মতো কবির প্রচার অনেক সহজ হয়েছিল। কিন্তু এরা কেউই নারীর অধিকার লংঘনের বিষয়ে প্রশ্ন তোলেননি।

১২.৪.৮.১ : ভারতীয় নারীর অধিকার ঃ ঔপনিবেশিক আমল

পঞ্চদশ শতকের শেষ দশক থেকে ব্যবসাবাণিজ্যের সূত্র ধরে ক্রমাগত ইউরোপীয় জাতিসমূহের ভারতে আগমন ভারতীয় নারীর সামাজিক ও আইনগত অধিকার অর্জন করার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। 1498 খ্রীষ্টাব্দে কালিকটে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কো দা গামার জাহাজ নোঙর করার পর ভারতের পশ্চিম-দক্ষিণ অঞ্চলে পর্তুগীজ আধিপত্য স্থাপিত হয়। একে একে দিনেমার, ফরাসী, ওলন্দাজ ও ইংরেজরাও ভারতে উপস্থিত হয়। তবে ইংল্যাণ্ডে শিল্প বিপ্লবের ফলে ভারতে ইংরেজ শক্তির দ্রুত সম্প্রসারণ ঘটে। ভারতে ঔপনিবেশিকতা বাদের ও পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটানোর পাশাপাশি মুদ্রা ব্যবস্থার আধুনিকিকরণ, কৃষির বাণিজ্যিকিকরণ ও শিল্পজাত পণ্যের ব্যবহার ইত্যাদি ভারতীয় সমাজে বিশেষ পরিবর্তন সূচিত করে। কিন্তু প্রাক্ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সামাজিক প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ জাতি ব্যবস্থার (Caste system) বিলুপ্তি ঘটেনি। তবে এখানে উল্লেখ্যনীয় যে ভারতে ইংরেজ শক্তির বিস্তার নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনের পাশাপাশি ভারতীয়দের নতুন আদর্শ বিশেষ করে মুক্তিবাদ (rationalism)-এর পরিচিত করে।

ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার ও পাশ্চাত্য ভাবাদর্শের প্রতি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ভারতীয়দের আকর্ষণ বিশেষত উদারনীতিবাদ (Liberalism) সাম্য (equality), স্বাধীনতা (Liberty), ধর্মনিরপেক্ষতা (secularism), ইত্যাদি ভারতীয় নারীর অধিকার ভোগ ও সমতা অর্জনের ক্ষেত্রে সহযোগী হয়েছিল। তাছাড়া উনবিংশ ও বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় নেতৃবর্গের সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও স্বাধীনতা অর্জনের জন্য জাতীয়তাবাদী ও অন্যান্য রাজনৈতিক আন্দোলন নারীর সমানাধিকার (equal rights) ভোগের বিষয়টকে ঔপনিবেশিক সরকার তথা ভারতীয় জনগণের সম্মূখে তুলে ধরে।

উনবিংশ শতকে সতীদাহ (সহমরন), বিধবাদের প্রতি অবিচার, বিধবা বিবাহের প্রতি নিষেধাজ্ঞা, বহুবিবাহ, বাল্যবিবাহ, সম্পত্তি ও শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চনা প্রভৃতি দূর করার জন্য ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ আন্দোলন শুরু করেন। রাজা রামমোহন রায়, কেশব চন্দ্র সেন, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহাদেব গবিন্দ রানাডে, মহাত্মা জ্যোতিরাও ফুলে, লোকহিতবাদী, দূর্গারাম ও আরো অনেকই ভারতে নারী অধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়েছিলেন যদিও দয়ানন্দ সরস্বতী বা অ্যানি বেশান্তের মত আরো অনেকেই বৈদিক যুগের আদর্শে ফিরে যাওয়ার কথা বলতেন।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের একটি ইতিবাচক ফল ছিল বহুকাল ধরে উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের মধ্যে চলতে থাকা অমানবিক *সতীদাহ* বা সহমরণ প্রথার প্রতি আইনগত নিষেধাজ্ঞা (1829)। উচ্চবর্ণের হিন্দুদের মধ্যে বিক্ষিতভাবে চলতে থাকা সতীদাহ বন্ধে প্রথম পদক্ষেপ নিয়েছিলেন মুঘল সম্রাট আকবর (1556-1605) ও ঔরঙ্গজেব (1658-1707)। গোয়ার পর্তুগীজ শাসকগণ 1515 খ্রীষ্টাব্দেই সতীদাহ প্রথা বন্ধ করেছিলেন যদিও গোয়াতে সতীদাহ প্রথা আদৌ ছিল কিনা সে সম্পর্কে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। ওলন্দাজ ও ফরাসীগণ তাদের অধিকৃত অঞ্চল বিশেষ করে চুঁচুড়া ও পণ্ডিচেরিতে সতীদাহ প্রথা নিবারণ করেছিলেন। তবে শ্রীরামপুরের দিনেমার অধিকৃত অঞ্চল ও প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষব্যাপী ব্রিটিশ ঔপনিবেশে সতীদাহ প্রথা উনবিংশ শতক পর্যন্ত বিদ্যমান ছিল।

ব্যক্তিগতভাবে অনেক ব্রিটিশ অধিকারিকই সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য সোচ্চার ছিলেন। ব্রিটিশরা সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য প্রথম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন 1778 খ্রীষ্টাব্দে ঐবছর কলকাতা শহরে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করা হয়। তবে উনবিংশ শতকের গোড়া থেকে খ্রীষ্টান মিশনারী William Carry ও William Wilberfarce সতীদাহ প্রথা বন্ধের জন্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর উপর চাপ সৃষ্টি করেন। ফলে 1813 খ্রীষ্টাব্দ থেকে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী Bengal Presidency তে সতীদাহের ঘটনার পরিসংখ্যান শুরু করে। অন্যদিকে রাজা রামমোহন রায় (1772-1833) 1812 খ্রীষ্টাব্দ থেকে সতীদাহ প্রথা নিবারণের জন্য তার আন্দোলন শুরু করেন। শেষ পর্যন্ত 1829 খ্রীষ্টাব্দের 4ঠা ডিসেম্বর বাংলার গভর্ণর Lord William Bantinc বাংলায় সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করেন। এই আইনের বিরুদ্ধেও পাল্টা আক্রমণ শুরু হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত লণ্ডনের Privy Council এই আইনের পক্ষে মত দেয়। ধীরে ধীরে অন্যান্য

Presidency গুলোতেও সতীদাহ প্রথা নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ভারতের বিভিন্ন দেশীয় রাজ্যে (Native state) সতীদাহ প্রথা চালু ছিল। শেষ পর্যন্ত 1846 সালে জয়পুরে সতীদাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য আইন গ্রহণ করা হয় যা ভারতীয় নারীর বঞ্চনার এক অংশের আইনগত অবসান ঘটায়। তবে ভারতীয় মনন থেকে সতীদাহ চিরতরে বিলুপ্ত হয়নি।

সতীদাহ নিবারণের পাশাপাশি নারীর সামাজিক অধিকারের স্বীকৃতি আদায়ের আরেকটা পদক্ষেপ ছিল। 1856 খ্রীষ্টাব্দে গৃহিত বিধবা বিবাহ আইন (Widow Remarriage Act 1856)। এই আইন গ্রহণের ক্ষেত্রে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টা ছিল অতুলনীয়। এই আইনের দ্বারা হিন্দু বিধবা নারীর পুনঃ বিবাহ আইনগত স্বীকৃতি লাভ করে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে উচ্চবর্গীয় (Higher Caste) বিধবা নারীর পুনঃ বিবাহের জন্য আইনের প্রয়োজন হলেও তথাকথিত নিম্নজাতি (Lower Caste) বা অন্ত্যজ জাতির মধ্যে বিধবাদের পুনঃবিবাহের সামাজিক অধিকার লংঘিত হয়নি। কিন্তু নিম্নজাতি সমূহের মধ্যে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ও উচ্চবর্গীয় হিন্দুদের সামাজিক রীতিনীতি গ্রহণ করার প্রবণতা বা সংস্কৃত্যায়ন ঊনবিংশ শতকের শেষদিকে তাদের মধ্যে সামাজিক আচার আচরণে পরিবর্তন ঘটায়। ফলে উচ্চবর্গীয় নারীর সামাজিক বঞ্চনা তাদের মধ্যেও প্রবেশ করেছিল।

ভারতীয় নারীর স্বাভাবিক অধিকার লংঘনের সবচেয়ে অভিশপ্ত দিক ছিল জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে বাল্যবিবাহের বহুল প্রচলন। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে বয়ঃসন্ধির পূবেই কন্যা সন্তানের বিবাহের ব্যবস্থা করার শাস্ত্রীয় বিধান ঔপনিবেশিক আমলেও তার সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা হারায়নি। তাই বাল্যবিবাহ বন্ধ করার আইনগত প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। 1872 খ্রীষ্টাব্দে ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেনের একান্ত প্রচেষ্টায় গৃহিত The Brahma Swamaj Marriage Act বা Act III of 1872 অনুযায়ী ব্রাহ্ম সমাজের অনুগামীগণ বিবাহযোগ্য পাত্রীর বয়স 14 হিসাবে স্বীকার করে নেন। কিন্তু Brahma Marriage Act অব্রাহ্মণদের উপর প্রযোজ্য ছিল না। কিন্তু এই আইনটি 1955 সালের Special Marriage Act এর পথিকৃত ছিল।

1891 সালে B. M. Malabari র নেতৃত্বে Age of Consent Bill উপস্থাণিত হলে অনেক ভারতীয় নেতা এর বিরোধিতা করেন। এক্ষেত্রে বাল গঙ্গাধর তিলকসহ আরো অনেকেরই যুক্তি ছিল যে ভারতীয় সমাজের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে ব্রিটিশ সরকারের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা জাতীয়তাবাদী কর্ত্তব্য। যাইহোক 1929 খ্রীষ্টাব্দে The Child Marriage Restraint Act 1929 গ্রহণ করার মাধ্যমে বিবাহযোগ্য পাত্রীর বয়স ন্যুনতম 14 ঠিক করা হয়। এই আইনকে সারদা আইনও বলা হয়।

সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পাশাপাশি বিংশ শতকের গোড়া থেকে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের দ্রুত বিকাশ ও রাজনৈতিক আন্দোলন ভারতীয় নারীর অংশ গ্রহণ তাদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে নতুন মাত্রাযোগ করেছিল। সমাজ সংস্কার আন্দোলন, বঙ্গ ভঙ্গ আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন, বৈপ্লবিক আন্দোলন এবং মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ, আইন অমান্য ও

ভারতছাড়ো আন্দোলনের সময় অসংখ্য ভারতীয় নারী অংশ গ্রহণ করেন। এগুলি নারী সচেতনতা বৃদ্ধির যোগান হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এক্ষেত্রে ভিকাজি কামা, সাবিত্রী বাই (ফুলে), পণ্ডিতা রামাবাই মহারাণী সুনীতি দেবী, প্রিতিলতা ওযাদ্দেদার, বিজয়লক্ষী পণ্ডিত, রাজকুমারী অমৃত কাউর, অঞ্জলী, অরুণা আসফ আলী, সুচেতা কৃপালনী, মুতুলক্ষী রেড্ডী, দূর্গাবাই দেশমুখ, লক্ষী সায়গল, সবোজিনি নাইডু, মাতঙ্গিনী হাজরা, রাণী গুইদিলিও (মনিপুর, নাগাল্যাণ্ড), প্রভৃতি স্বনামধন্যা নারীর নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সমাজ সংস্কার ও জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ফলস্বরূপ নারীর শিক্ষার অধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করে। তাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই পুণরুজ্জীবিত করে। তাই ভারতের স্বাধীনতা লাভের পূর্বেই একাধিক পেশায় নারীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

নারীমুক্তি আন্দোলনের ফলস্বরূপ কতিপয় মহিলা সংগঠনেরও জন্ম হয় বিংশ শতকের প্রথমার্ধে 1917 খ্রীষ্টাব্দে ভারতের একদল মহিলা রাজনৈতিক অধিকারের দাবীতে Secretary for state -এর সঙ্গে দেখা করেন। অন্যদিকে 1927 খ্রীষ্টাব্দে পুনেতে অনুষ্ঠিত All India Women Eduction ভারতীয় নারীর রাজনৈতিক ও শিক্ষা সংক্রান্ত অধিকারকে উদ্দিপিত করেছিল। ঔপনিবেশিক শাসনের শেষ পর্যায়ে নানাবিধ কারণে নারী সচেতনতা বৃদ্ধি পেলেও এবং মহিলাদের আইনগত অধিকারে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি ঘটলেও কতগুলো মৌলিক সমস্যা থেকেই যায়। বিশেষ করে কন্যা সন্তানের প্রতি অভিবভাকদের অসম আচরণ ও অবহেলা, পণপ্রথা, বহুবিবাহ ইত্যাদি নারীর স্বাভাবিক বিকাশের পরিপন্থী ছিল।

১২.৪.৮.২ : স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর আইনগত অধিকার

1947 খ্রীষ্টাব্দের 15ই আগষ্ট ঔপনিবেশিক শাসনের কবল থেকে মুক্তি পেয়ে নতুন ভারতের জন্ম ভারতীয় নারীর সামাজিক মর্যাদা ও আইনগত অধিকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায়ের সূচনা করেছে। স্বাধীন ভারতের সূচনা পর্ব থেকেই সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নারীর উল্লেখযোগ্য পরিমাণে অংশ গ্রহণ তাদের মর্যাদা বৃদ্ধির সহায়ক হয়েছে। এই মর্যাদা বৃদ্ধির পেক্ষাপট হিসাবে ভারতীয় সংবিধান, রাষ্ট্র সংঘের Universal Declaration of Human Rights (1948), বিভিন্ন International Convention, ভারতের নারী প্রগতি বিষয়ক আইনগত পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে।

দীর্ঘ আলোচনা ও তর্ক-বিতর্কের পর রচিত ভারতের সংবিধান গৃহিত হয় 1950 খ্রীষ্টাব্দের 26শে জানুয়ারী। সংবিধানের প্রস্তাবনায় সকল ভারতীয় নাগরিকের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায়বিচার , (justice) চিন্তাভাবনা, মতপ্রকাশ ও ধর্মাচরণের স্বাধীনতা (Liberty) এবং সৌভাতৃত্বের (Fraternity) বিকাশের কথা বলা হয়েছে।এই মহৎ উদ্দেশ্যগুলিকে বাস্তবায়িত করার জন্য

সংবিধানে কতগুলি মৌলিক অধিকার (Fundamental) ও স্বাধীনতা (Liberty) বিধিবদ্ধ করা হয়। পুরুষ নাগরিকের পাশাপাশি ভারতীয় নারীও এই সমস্ত অধিকার ভোগ করার সুযোগ লাভ করে।

সংবিধানের 14 নং ধারায় জাতি ধর্ম, বর্ণ, ভাষা ও লিঙ্গ নির্বিশেষে সকল ভারতীয়কে আইনের চোখে সমান (Equality before law) বলে চিহ্নিত করা হয়। অন্যদিকে 15 নং ধারায় বলা হয় যে the state shall not discriminate any citizen on the ground of sex. এই ধারার 3 নং উপধারা (1513)য় বলা হয় যে নারীসমাজের উন্নয়নের জন্য রাষ্ট্র ইচ্ছা করলে বিশেষ ব্যবস্থা (affirmative action) গ্রহণ করতে পারে। এমনকি নারী প্রগতির জন্য সরকারকে আলাদাভাবে আইন প্রনয়ণের অধিকারও দেওয়া হয়। পাশাপাশি 16 নং ধারায় নিশ্চয়তা প্রদান করা হয় যে কেবলমাত্র লিঙ্গ পরিচিতির জন্য চাকরীতে নিয়োগের ক্ষেত্রে সরকার কোনরকম বৈষম্য মূলক নীতি গ্রহণ করতে পারবে না। একইভাবে 42 নং ধারায় কর্মক্ষেত্রে কর্মোপযোগী পরিবেশ বজায় রাখা এবং নারীর মাতৃত্বের জন্য ছুটি (Maternity leave)-র কথা বলা আছে। সর্বাপরি নারীর সম্মান বজায় রাখা সকল নাগরিকের মৌলিক কর্তব্য বলে 15A (C) নং ধারায় বলা হয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনা ও মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি তার Directive Principles of the State Policy জনকল্যানকারি ভারতীয় রাষ্ট্রের মূখ্য উদ্দেশ্যগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছে। 14 বৎসর বয়স পর্যন্ত সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, নারীপুরুষ নির্বিশেষে সকলের জীবন ধারণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীর ব্যবস্থা করা, সমান কাজের জন্য সমান বেতন ইত্যাদি কতগুলি নির্দেশমূলক নীতি নারী সচেতনতা বৃদ্ধির কতগুলি সাংবিধানিক রক্ষা কবচ।

ভারতীয় সংবিধান একদিকে যেমন ভারতীয় নারীকে আইনগতভাবে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে তেমনি আন্তর্জাতিক গ্রহণ করা হয়েছে নারী প্রগতির জন্য। 1948 খ্রীষ্টাব্দে রাষ্ট্র সংঘ (The united Nations Organisations) কর্তৃক গৃহিত Universal declaration of Human Rights এ বলা হয়েছে- all human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and eonscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood. এই UNDHR এ নারী পুরুষ, জাতি ধর্ম নির্বিশেষে সমস্ত বিশ্ববাসীর কতগুলি মৌলিক অধিকারের কথা স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে। অন্যদিকে 1966 সালে আরো দুটো International Codes of Human Rights গ্রহণ করা হয়েছে। এ দুটি কোড্ হল - International covenant on Economic, social and cultural rights & ICESCR) এবং International cevenant on civil and political rights (ICCPR) এই দুটি কোড নারী পুরুষের সমানাধিকারকে আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি দিয়েছে। তবে নারীর অধিকার আইনগতভাবে সুরক্ষিত হলেও তাদের বিরুদ্ধে নানারকম বৈষম্যমূলক আচরণ UNO কে চিন্তিত করে তোলে। আরো পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য। ফলে 1993 সালে UNO -র সাধারণ সভা UN declaration on the Elimination of violence Against women (UN DEVW) গ্রহণ করে। এর ৩নং ধারায় বলা হয়েছে যে Women are entitled to the equal enjoyment and protection of all

human rights and fundamental freedoms in the political economic, social, cultural, civil or any other feild. এই UNDEVW এ আরো বলা হয়েছে যে সকল রাষ্ট্রই নারীর বিরুদ্ধে ঘটিত হিংসা বা তাদের বঞ্চনার অবসান ঘটাবে এবং প্রয়োজনে আইনগত ও শাসনতান্ত্রিক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে।

UNO নারী প্রগতির জন্য আরো কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। 1956 সালে গৃহীত The supplementary slavery convention (SSC) নারীর সম্মতি ব্যতীত তাদের নিয়ে কোন রকম ব্যবসা করার প্রতি নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়েছে। SSC 1950 সালে UNO কর্তৃক গৃহিত UN convention for the suppression on Traffic in Persons and Exploitation of Praotitution of others (UNCSTPEPO) দ্বারা UNO বেশ্যাবৃত্তি ও নারী পাচার বন্ধের জন্য সমস্ত রাষ্ট্রকেই নির্দেশ দেয়।

SSC এর প্রতিক্রিয়া হিসাবে 1956 র 9ই আগষ্ট ভারত The suppression of Immoral traffic in Women and Girls Act (1956) গ্রহণ করেছে। পরবর্তী কালে 1978 ও 1986 খ্রীষ্টাব্দে এই আইন সংশোধন করে শিশু, অপ্রাপ্তবয়স্ক ও পুরুষদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য বলে ঘোষণা করা হয়। 1986 সালে এই আইনটির নাম হয় Immoral traffic (Prevention) Act 1956. এই আইনটির মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে জোর করে কাউকে যৌন ব্যবসার কাজে (Sexual exploitation or abuse of persons for commercial purpose) নিয়োগ করাকে বন্ধ করা। অন্যদিকে কর্মক্ষেত্রে বা অন্যকোন স্থানে যেকোন রকমের যৌন লাঞ্ছনা বন্ধ করার জন্য আন্তর্জাতিক ও জাতীয় স্তরে আইনগত ও প্রসাশনিক ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা হয়েছে।

কন্যা সন্তানের প্রতি অবহেলা বন্ধ করার জন্য ভারতে কতগুলি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। পরিবার পরিকল্পনা তথা জন্ম নিয়ন্ত্রণের জন্য গর্ভপাত (abartion) স্বীকৃত থাকলেও লিঙ্গ নির্ধারনের পর কন্যা ভ্রূণের গর্ভপাত (Prenatal abortion of females by sex ditermination) আইনত দন্ডনীয় অপরাধ। এই উদ্দেশ্যে গৃহীত The Prenatal Diagnestic Techniques prevention of Misure Act 1994 বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই আইনটিকে 2003 সালে সংশোধিত করে আরো সম্প্রসারিত করা হয়েছে। ফলে On vitro Fertilization (ITV) পদ্ধতিতে গর্ভসঞ্চরের পূর্বেই পুত্রভ্রূণ তৈরী করার প্রচেষ্টাকে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে। এই আইনগুলিকে ভারতীয়দের genetic demand for male child কে বন্ধ করার প্রয়াস বলা যেতে পারে।

ভারতীয় নারীর অধোগতির একটা জলন্ত সূচক হচ্ছে পণপ্রথার ধারাবাহিকতা। পণের দাবীতে বধূনির্যাতন, বধূহত্যা তথা পণ ছাড়া বিয়ে না হওয়া ভারতীয় নারীর অতি পরিচিত বিষয়। এই অবস্থাকে কাটিয়ে উঠার জন্য ভারত Dowry Prohibition Act. 1961 গ্রহণ করেছে। এই আইনে পণ দেওয়া ও নেওয়াকে শাস্তি যোগ্য অপরাধ হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে। বিয়ের সাত বছরের মধ্যে পণের দাবীতে বধূ নির্যাতনকে কঠোর শাস্তিযোগ্য হিসাবে চিহ্নিত করেছে এই আইন যা জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

ভারতে সমান কাজের জন্য সমান বেতন প্রদানের পাশাপাশি The Maternity Benifit Act 1961, চাকরীতে নিযুক্ত বিবাহিত মহিলাদের Advance stage of pregnancy ও সন্তান প্রসবের পরে সবেতন ছুটির ব্যবস্থা করেছে। গর্ভপাতের ক্ষেত্রে আইনাটি প্রযোজ্য। পাশাপাশি Employees State Insurance Act 1948, The Factorin Act 1948, Apprentic Act 1956, Mines Act 1952 ও Plantation labour Act. 1951. ও মহিলাকর্মীদের সহায়ক কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। এছাড়া *The Hindu Succession Act* হিন্দুদের নারী- পুরুষ নির্বিশেষে সবাইকেই সম্পত্তির উত্তরাধিকার দান করেছে।

নারীর মযার্দার পক্ষে অসম্মানজনক কিন্তু প্রাচীনকাল থেকেই প্রচলিত বহুবিবাহ (poligamy) কে Special Marriage Act 1955-এর দ্বারা বন্ধ করা হয়েছে। এই আইন বিয়ের বয়স, মানসিক ইচ্ছা ইত্যাদিকে বিশেষগুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি The Hindu Adoption and Maintenance Act 1956-এ পুরুষকে তার স্ত্রী ও সন্তানদের ভরণপোষণ দায়িত্ব নিতে বাধ্য করা হয়েছে। Indian Penal Code (IPC) এক্ষেত্রে বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। তবে Muslim code of conduct বহুবিধানকে স্বীকার করে। Muslim personal law তাই ভারতীয় মুসলিম নারীর ভাগ্য নির্ধারণ করেছে।

IPC ভারতীয় নারীর বিরুদ্ধে সংঘটিত অপরাধকে দমিয়ে রাখার জন্য কতগুলি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বিভিন্ন, অবৈধ উপায়ে মহিলাদের সম্মানহানি ও অপহরণ সম্পর্কে IPC তে বিস্তৃত আলোচনা করা হয়েছে যেমন—

(i) কোন মহিলাকে অপহরণ করে জোরপূর্বক বিয়ে করা বা অবৈধ যৌন সংযোগ স্থাপন করা।

(ii) ১৮ বছরের চেয়ে কম বয়সী কোন কিশোরীকে ফুসলিয়ে অন্য কোন স্থানে নিয়ে যাওয়া বা বিয়ে করা।

(iii) ২১ বছরের নীচে কোন মহিলাকে ভারতে নিয়ে এসে যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য করা।

(iv) ১৮ বছরের নীচের কাউকে কেনা বেচা করা বা যৌন ব্যবসায় নিযুক্ত করা ইত্যাদি। উল্লিখিত কারণে ঘটিত অপরাধ IPC ধারামতে কঠোর শাস্তিযোগ্য। IPC-র Section 312, 313, ও 316 অবৈধ সম্পর্কস্থাপন করে গর্ভপাত করানোর শাস্তির কথাও বর্ণনা করা হয়েছে।

১২.৪.৮.৩ : উপজাতি সমাজে নারীর অবস্থান

তথাকথিত মূল ভারতীয় সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন ভারতীয় উপজাতীয় (Tribal society of India)

সমাজেও নারীর প্রথাগত অধিকার ও সামাজিক অবস্থানে ভিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। ভারতের বিভিন্ন উপজাতির মধ্যে যেমন পিতৃকুলানীশারী (Patrineal) ও পিতৃতান্ত্রিক (Patriarchal) প্রথার প্রচলন লক্ষ্য করা যায় তেমনি মাতুকূলানুশারী (Matrilineal) উপজাতির সংখ্যাও কম নয়। মাতৃকুলানুশারী উপজাতি সমাজে নারীর সামাজিক অবস্থান কোন ভাবেই অবদমিত বলা যায় না। সামগ্রিকভাবে ভারতীয় উপজাতি সমাজে প্রচলিত প্রথা ও নিয়মকানুন নারীর স্বাভাবিক অধিকারকে স্বীকার করে।

কিন্তু উপজাতি সমাজে প্রচলিত নানাবিধ কুসংস্কার বিশেষ করে ডাইনি সন্দেহে হত্যা (Witch Hunting), বাল্যবিবাহ, ধর্মীয় বিধি অনেক ক্ষেত্রেই নারীর স্বাভাবিক অধিকারকে লংঘন করে। তবে Poliandry, bride money ও Matrileneal tradition উপজাতি নারীকে তথাকথিত অউপজাতির ভারতীয় মূল সংস্কৃতির নারীর থেকে অপেক্ষাকৃতভাবে উন্নত আসন দান করেছে। কিন্তু উপজাতি সমূহের ব্যপকহারে সংগঠিত ধর্ম (হিন্দু, বৌদ্ধ, ইসলাম, খ্রীষ্টান ইত্যাদি) গ্রহণ করার ফলে ঐ সমস্ত ধর্মীয় ব্যবস্থায় প্রচলিত নারী অবদমনের প্রথা সমূহ ব্যপকহারে প্রবেশ করেছে ভারতীয় উপজাতি নারীর মধ্যেও। তবে ইতিপূর্বে আলোচিত নারী প্রগতির ব্যবস্থাসমূহ ভারতীয় উপজাতিয় নারীর ক্ষেত্রেও প্রয়োজ্য। তাছাড়া Scheduled tribe হিসাবে সংরক্ষণ সহ তপশীল এলাকায় (Scheduted area 5th and 6th Schedule) নানা রকম উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা ভারতীয় উপজাতি নারী সমাজ ভোগ করেছে।

১২.৪.৮.৪ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। Basham A. L. : The Wonder that was India.

২। Chopra P.N., Puri B.N., Das M.N. : A Social Cultural and Economic History of India, Vol. II (Delhi), 1924.

১২.৪.৮.৫ : সম্ভব্য প্রশ্নাবলী

১। ঔপনিবেশিক আমলে ভারতীয় নারীর অধিকার আলোচনা কর।

২। স্বাধীনোত্তর ভারতে নারীর আইনগত অধিকার বৃদ্ধির ক্ষেত্রে কি নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়েছিল?

৩। উপজাতি সমাজে নারীর অবস্থান কি রকম ছিল?

————

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

WOMEN AND WORK

একক - ৯

(a) Household, (b) Agriculture, (c) Industry — formal and informal sectors

বিন্যাসক্রম :

১২.৫.৯.০ : উদ্দেশ্য

১২.৫.৯.১ : নারী ও শ্রম

১২.৫.৯.২ : গৃহশ্রম ও নারী : ঔপনিবেশিক বাংলার প্রেক্ষিত

১২.৫.৯.৩ : শিল্পশ্রম এবং নারী : সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত

১২.৫.৯.৪ : শিল্প অসংগঠিত ও সংগঠিত ক্ষেত্র -- বাংলার প্রেক্ষিত

১২.৫.৯.৫ : অসংগঠিত শিল্প

১২.৫.৯.৬ : সংগঠিত শিল্প

১২.৫.৯.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.৫.৯.৮ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৫.৯.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

১। নারী ও শ্রমের অন্তসম্পর্ক।

২। গৃহস্থ হিসেবে নারীর শ্রমের ভূমিকা।

৩। সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে শিল্পে নারীর শ্রম।

৪। যন্ত্রচালিত শিল্পে নারীর শ্রম।

১২.৫.৯.১ : নারী ও শ্রম

নারী এবং শ্রমের আন্তঃসম্পর্ক সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় ইদানিং কালে একটি চর্চার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে যদিও এখনো এই চর্চার গণ্ডী অনেকটাই ধোঁয়াটে। এর প্রাথমিক কারণ হল পিতৃতান্ত্রিক সমাজে লিঙ্গভিত্তিক শ্রমবিভাজনের বৈষম্যের কারণে মেয়েদের শ্রমপ্রক্রিয়ায় অংশিদারীত্ব অনেকটাই ঢাকা পড়ে যায়। এমনকি জনগণনার আধুনিক প্রকরণেও এই বৈষম্য সম্পূর্ণ দূর করা যায়নি। অর্থনৈতিক তথ্য ও পরিসংখ্যানে যে মেয়েদের শ্রমিক হিসাবে গণ্য করা হয়নি তার একটা কারণ হল শ্রমিকদের শ্রম সম্পর্কে স্বাধীন সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা থাকলেও লিঙ্গভিত্তিক শ্রম বিভাজনের ক্ষেত্রে অধিকাংশ সময় মেয়েদের এই বাছবিচারের সুযোগটাই থাকে না। অধিকাংশ সমাজেই ঘরের কাজের প্রাথমিক দায়ীত্ব — রান্না করা, ঘরদোর পরিস্কার করা, বাচ্চা তথা অসুস্থদের দেখাশোনা বা পরিবারের বৃদ্ধদের সেবা করা ইত্যাদি মেয়েরাই পালন করে থাকে। মেয়েদের এই কাজগুলোকে ছেলেদের কাজের চাইতে ছোট করে দেখা হয়। তাই মেয়েদের কাজের ধরনগুলির পেশাদারী স্বীকৃতি কম হয় বা এই কারণে মেয়েরা ছেলেদের থেকে কম মাইনে পেয়ে থাকে। মেয়েদের কাজটা খুচরো বা অনিয়মিত শ্রম হবার ফলে, স্বীকৃতি না পাবার ফলে, নথিভুক্ত হয়েছে কম। শ্রমপ্রক্রিয়ায় নারীর অবদান নিয়ে আলোচনার ক্ষেত্রে তাই তথ্যের অপ্রতুলতা একটি বড় বাধা।

কোন একটি অঞ্চলে জনসংখ্যার মধ্যে শ্রমপ্রক্রিয়ায় অংশিদারীত্বের হার (work participation rates), বিভিন্ন পেশায় কে কতটা অংশগ্রহণ করল এগুলি সবই আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের গুরুত্বপূর্ণ সূচক হিসাবে পরিগণিত হচ্ছে। এই বিষয়ে ইদানিং বহু চর্চা হলেও এর খামতি হল — সাধারণতঃ এগুলি সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে কিছু কথা বললেও অঞ্চলভিত্তিক বিশেষত্বগুলি অনেকক্ষেত্রেই দৃষ্টিগোচর হয় না। নারীশ্রমের ক্ষেত্রে আঞ্চলিক চর্চার গুরুত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না কারণ জেণ্ডারিং (Gender লিঙ্গ নির্মান) একটি সামাজিক প্রক্রিয়া যা অঞ্চল ও সময়ভেদে আলাদা।

আঞ্চলিক বিশেষত্ব মাথায় রেখে আলোচনাটিকে কতগুলি বিশেষ অঞ্চলে কিছু নির্দিষ্ট পেশার উপর নিবদ্ধ রাখা হয়েছে। তথাপি কয়েকটি সাধারণ সূত্র প্রতিভাত হয়েছে। ঔপনিবেশিক আমলেই ভারতে আধুনিক শিল্পের বিস্তার ঘটেছে। আধুনিক শিল্প আবার গ্রামীণ হস্তশিল্পের অবশিল্পায়ন, গ্রামীণ কৃষি অর্থনীতিতে ভাঙ্গন ইত্যাদির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ওই সমস্ত কুটির শিল্পের অবক্ষয় হওয়ায়

একদিকে গ্রামীণ অর্থনীতিতে যে ধাক্কা এল সেগুলি গরীব পরিবারগুলির সদস্য হিসাবে মহিলাদেরকেও ভুগতে হল। তথাপি কোন কোন ক্ষেত্রে যেমন চা, পাট বা কয়লা উত্তোলনের মত শিল্পে, কিছুটা হলেও মহিলারা কাজ পেলেন। কিন্তু অচীরেই দেখা গেল যে মহিলাদেরকে এই সমস্ত কাজেও সরিয়ে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। কারখানা এবং শ্রমিক বস্তিতে অকল্পনীয় রকমের অস্বাস্থ্যকর পরিস্থিতি, নিরাপত্তার অভাব নারীদেরকে শ্রমপ্রক্রিয়ায় ব্রাত্য করে তুলল। অন্যদিকে আধুনিক শিল্প যেমন চালকলগুলি কিছু বিশেষভাবে মেয়েলী শিল্প যেমন ঢেঁকীতে ধান ভাঙ্গার কাজ মেয়েদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিতে লাগলো। কয়লাখনির অভ্যন্তরে কয়লা উত্তোলনের কাজে নারীদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ হয়ে গেল। বিভিন্ন পেশায় একদিকে যখন মেয়েদেরকে ধীরে ধীরে সরিয়ে দেওয়া হচ্ছিল ঠিক তখনই জাতীয়তাবাদী মতাদর্শে মেয়েদের জন্য সবথেকে আদর্শ জায়গা বলে অন্তঃপুরে পাঠানোর প্রক্রিয়াও হাত ধরাধরি করে চলছিল। গৃহশ্রম এমনিতে অর্থনীতিতে একটি উপেক্ষিত বিষয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতকের মাঝামাঝি সময় পর্যন্ত শ্রমপ্রক্রিয়ায় নারীদের উপস্থিতিতে বুঝতে হলে গৃহশ্রম একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যখন অন্যান্য পেশায় মেয়েরা পিছু হটছে সেই সময় জনগণনার নিরিখে বাড়িতে কাজের লোক হিসাবে মেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বাড়ছে।

পশ্চিমবঙ্গে কৃষক পরিবারের মেয়েদের কাজের পরিধি

- কৃষি সংক্রান্ত কাজ
  - ফসল উৎপাদন
    - ধান
      - ১. বীজ বোনা
      - ২. ধান রোয়া
      - ৩. আগাছা তোলা
      - ৪. ধান কাটা
      - ৫. ধান ঝাড়া
      - ৬. ধান পরিষ্কার
      - ৭. ধান শুকোনো
      - ৮. ধান সেদ্ধ করা
      - ৯. ধান ভাঙ্গা
      - ১০. ধান, চাল গুছিয়ে রাখা
  - অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাজ
    - ১. খড় কাটা
    - ২. পশুখাদ্য সংগ্রহ
    - ৩. বাড়ির লাগোয়া বাগান দেখাশোনা
    - ৪. চিড়ে, মুড়ি, গুড় তৈরী ও খাদ্য সংরক্ষণ
    - ৫. মাছ ধরার জাল মেরামত
  - পশুপালন
    - মুরগী, হাস, ছাগল গোরু, মহিষ, মাছ চাষ।
- কৃষি বহির্ভূত কাজ
  - গৃহস্থালী
    - ১. রান্না
    - ২. শিশুপালন
    - ৩. ঘরদোর পরিস্কার
    - ৪. জ্বালানী সংগ্রহ
    - ৫. পানীয় জল সংগ্রহ
    - ৬. ঘুঁটে দেওয়া
    - ৭. বয়স্ক ও অসুস্থদের দেখাশোনা
    - ৮. বাড়িঘর যত্ন করে ঠিক করে রাখা
  - অন্যান্য
    - ১. বাঁশের বেতের কাজ
    - ২. তাঁত বোনা
    - ৩. তৈরী জিনিস বিক্রি করা

তথ্যসূত্র : মুকুল মুখোপাধ্যায়, উইমেন অ্যান্ড ওয়ার্ক ইন ইন্ডিয়া' — নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবার কাজ ও মেয়েরা, কলকাতা, ২০০৭, পৃ. ২৩ এ উদ্ধৃত।

মেয়েরা যে সমস্ত কাজ করে তাকে সাতটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১। কৃষিক্ষেত্রে বা শিল্পক্ষেত্রে মজুরী (wage) এবং মাইনে (salary) পাওয়া যায় এমন অর্থকরী কাজ।

২। কৃষিতে বা গৃহকেন্দ্রিক শিল্পে অর্থকরী স্ব-নিযুক্তি (self-employment)।

৩। অন্যান্য গৃহকেন্দ্রিক অর্থকরী কাজ।

৪। নিজের প্রয়োজন মেটানোর জন্য কৃষিতে স্বনিযুক্তি।

৫। নিজেদের প্রয়োজন মেটাবার জন্য কৃষি সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কাজকর্ম - যেমন গোরু-মহিষ পালন, মুরগী পালন, মাছ চাষ ইত্যাদি।

৬। পরিবারের রসদ জোগানোর জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রয়াস - যেমন বিনামূল্যে খাদ্যবস্তু, জ্বালানী, জল, পশুখাদ্য ইত্যাদি সংগ্রহ ও বাসস্থান মেরামতি।

৭। গৃহস্থালী সংক্রান্ত নানান কাজকর্ম - যেমন পরিবারের শিশুদের, বয়স্কদের এবং অসুস্থদের পরিচর্যা, কাপড়জামা, বাসনপত্র ইত্যাদি পরিষ্কার করা, রান্না করা ইত্যাদি।

লক্ষণীয় বিষয় হচ্ছে যে প্রথমোক্ত তিনটি ক্ষেত্রকেই সরকারী নথিতে 'উৎপাদন মূলক' বা উপার্জনমূলক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। বাকি চারটি বাজারের সাথে বা অর্থ উপার্জনের সাথে সরাসরি যুক্ত না থাকায় প্রায় সবসময়ই সরকারী পরিসংখ্যানের বাইরেই থেকে যায়।

তথ্যসূত্র : ঐ

মেয়েদের কাজ নথিবদ্ধ করার ক্ষেত্রে দৃষ্টিকটু বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ায় বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন ওঠে। ন্যাশনাল স্যাম্পেল সার্ভে অর্গানাইজেশন এই তথাকথিত অশ্রমিকদের নথিবদ্ধ করাবার জন্য **কোড ৯৩** নামে একটি নতুন বর্গ-চালু করেন-এতে যাঁরা পরিবারের প্রকৃত আয় বাড়ানোর জন্য বা আর্থিক স্থিতি আনবার জন্য বিভিন্ন কাজ করেন কিন্তু শ্রমিক হিসাবে স্বীকৃতি পাননা তাদের নথিভুক্ত করার কাজ শুরু হয়েছে।

১২.৫.৯.২ : গৃহশ্রম ও নারী : ঔপনিবেশিক বাংলার প্রেক্ষিত

একজন গৃহবধু ঘরগেরস্থালীর কাজে দ্বিবিধ ভূমিকা পালন করে থাকে। প্রথমতঃ সে সন্তানের জন্ম দিয়ে ভবিষ্যত শ্রমিকের জোগান অব্যাহত রাখে। অন্যদিকে একজন শ্রমিক যাতে পরের দিন প্রফুল্ল মনে সুস্থ শরীরে কাজে যেতে পারে তার জন্য তাকে শারিরিক ও মানসিকভাবে সাহায্য করে। ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে যে মেয়ে কাজ করছে আর যে ছেলে ঘরের বাইরে কাজ করছে - উভয়েই শ্রমশক্তি ব্যয় করছে। কিন্তু মেয়েরা ঘরে যে কাজ করে তার কেবল ব্যবহারিক মূল্য রয়েছে ফলে কোনোরকম

বিনিময়ের মধ্যে না গিয়ে তাকে সরাসরি ভোগ করে ফেলা হয়। অন্যদিকে পুরুষদের শ্রম বাজারে — তা সে কলে, কারখানায়, অফিসে কাছারীতে যেখানেই হোক না কেন, বাজারে বিক্রয় করে একটা বিনিময় মূল্য তৈরী হয়। এই কারণে সমাজে মেয়েদের গৃহশ্রম উপেক্ষিতই থেকে যায়।

মেয়েদের গৃহশ্রম নিয়ে আলোচনায় গত শতকের ষাঠের দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতির (Neo classical economy) প্রভাবে গ্যারী বেকার 'নয়া গৃহস্থালীর অর্থনীতি'র ধারা প্রবর্ত্তন করেন। সত্তরের দশক থেকে মার্কসবাদী বা সমাজতন্ত্রী নারীবাদীরাও গৃহশ্রমের তত্ত্ব নির্মাণে হাত লাগিয়েছেন।

বেকারের মতে পুরুষরা যেহেতু শ্রমের বাজারে সবসময়েই মেয়েদের থেকে বেশী রোজগার করবে তাই তাঁরা বাজারের কাজে বা উপার্জনে বেশী সময় দেবে। অন্যদিকে মেয়েরা ছেলেদের উপার্জনে বেশী করে মনোনিবেশ করতে রাস্তা করে দেবে। নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতিতে প্রত্যেকটি কর্তা (এজেন্ট) নিজের উপযোগিতা বা তৃপ্তিকে সর্ব্বোচ্চ করতে সচেষ্ট থাকে। তাহলে পরিবারের ক্ষেত্রে কি হবে? নয়া গৃহস্থালীর অর্থনীতি মনে করে যে পরিবার সম্মিলিত উপযোগিতাকে বাড়ানোর প্রচেষ্টা চালায়। কিন্তু প্রশ্ন হল যে ব্যক্তির রুচি, চাহিদা না মেলায় একই বস্তুর উপযোগিতা বিভিন্ন লোকের কাজে বিভিন্ন। তাই সবার উপযোগীতা যোগ দেওয়া সম্ভব নয়। এই সমস্যার একটা সমাধান বাতলেছেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ্ স্যামুয়েলসন, তাঁর মতে পরিবারে সবাই একে অপরের ভাল চায়-যাকে বলা যায় পরহিতাকাঙ্খা বা অলট্রুইজম (altruism)। কিন্তু নয়া ধ্রুপদী অর্থনীতির ছকে, যেখানে সবাই নিজের উপযোগিতাকে সর্বাধিক করতে চায় সেখানে পরহিতাকাঙ্খা কি আদৌ যুক্তিযুক্ত? বেকারের মতে পরিবারে যাদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত থাকে তারা সর্বদাই পরহিতাকাঙ্খী।

মার্কসবাদী বিশ্লেষণ যেহেতু দ্বন্দ্ব। অসাম্য এবং শোষণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত তাই সেখানে পরিবার ও গৃহশ্রম সম্পর্কে কোন স্বপ্নময় চিত্রণ থাকবে না এটাই কাঙ্খীত। কিন্তু ধ্রুপদী মার্কসবাদ ও সেই প্রত্যাশা পুরোপুরি পূরণ করে না। মার্কসের মতে পুঁজিবাদের ভিত্তিই হল শ্রমিক শোষণ যার শিকড় নিহিত আছে উদ্বৃত্ত মূল্য বা surplus value উৎপাদনের মধ্যে। উদ্বৃত্ত মূল্য হল মূল্যের সেই অংশ যা শ্রমিক উৎপাদন করে কিন্তু ভোগ করেনা। শ্রমিকের শ্রমের মূল্যকে তার উৎপাদিত মূল্যের থেকে বাদ দিলে এই উদ্বৃত্ত মূল্য পাওয়া যায়। শ্রমিকের শ্রমের মূল্য নির্ধারিত হয় শ্রমের পুনরুৎপাদন মূল্যকে খেয়াল রেখে। সোজা কথায় শ্রমের পুনরুৎপাদন মূল্য হল, শ্রমের জোগানকে অব্যাহত রাখার জন্য শ্রমিকের যে সমস্ত জিনিষের প্রয়োজন তার যোগফলের সমান। এতদসত্ত্বেও মার্কস শ্রমের পুনরুৎপাদনে পারিবারিক শ্রমের ভূমিকাকে বাদ দিয়েছিলেন।

গত শতকের সত্তরের দশকের উত্তাল নারী আন্দোলন আবার গৃহশ্রম ও নারীর শ্রমের মূল্য নিয়ে প্রশ্ন তুলল। মারিয়া রোজা ডেলা কস্টা আর মেলমা জেমস বললেন (১৯৭০) যে শ্রমের পুনরুৎপাদন মূল্য নির্ধারণে মেয়েদের গৃহশ্রমের কোনো ভূমিকা স্বীকার করা হয় না যদিও তারা শ্রমের জোগান অব্যাহত রাখতে সাহায্য করে। একই সাথে শ্রমিকের শ্রমের যে মূল্য হওয়া উচিৎ নারীর গৃহশ্রম তাকে অনেকটাই কমিয়ে দেয়।

গৃহকর্মের মূল্যকে জাতীয় আয়ের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করবার দুটি স্বীকৃত পদ্ধতি হল (ক) আরোপিত মূল্য (Shadow pricing) এবং (খ) বিকল্পব্যয় বা সুযোগ মূল্য পদ্ধতি। প্রথম পদ্ধতিতে বাড়ির মেয়েরা যে সমস্ত কাজ করে সেই কাজগুলি বাইরের লোকদিয়ে করালে বা পেশাদারদেরকে দিয়ে করালে কত খরচ হতে পারে তার একটা হিসাব করে নারী গৃহশ্রমিকের কাজের মূল্য নিরূপণ করা হয়। দ্বিতীয় পদ্ধতিতে বাড়ীর মেয়েরা বাড়ীর কাজ না করে বাইরে কাজ করলে যত মজুরী পেতে পারতো তার ভিত্তিতে ঘরের কাজের মূল্যায়ন করা হয়ে থাকে।

তবে সামগ্রিক ভাবে তৃতীয় বিশ্বে মেয়েদের গৃহশ্রম নিয়ে আলোচনা করবার সময় মাথায় রাখা দরকার যে শিল্পায়ন সীমিত বলে এখানে অধিকাংশ পরিবারই কৃষির উপর নির্ভরশীল। আর এমন কৃষক পরিবারে ঘরের কাজের বাইরেও সাশ্রয় হয় এখন কাজ যেমন ঘুঁটে দেওয়া বা ধান ভানা বা তাঁতের সুতো গোটানোর মত কাজও গৃহশ্রমের আওতায় পড়ে যদিও মেয়েরা এর থেকে বিশেষ টাকাপয়সা কিছুই পায় না।

গৃহশ্রমের চৌহদ্দিতে আরেকটি সম্পূর্ণ ভিন্ন সম্পর্ক হল গৃহদাসী বা বাড়ির কাজের লোক এর ধারণা। ঊনবিংশ শতকের ঔপনিবেশিক ভারতে সামাজিক ক্ষেত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল মধ্যবিত্ত বাঙালী শ্রেণীর আবির্ভাব। এই শ্রেণী তার শক্তিশালী আধিপত্যকামী (legemonic) চিন্তার কল্যাণে নিজের সম্পর্কে একটি ছবি জনমানসে প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হল। এই ছবিটির লক্ষণীয় বিশেষত্ব ছিল নিজের সাথে অন্যের তফাৎ নিরূপণ করা—এককথায় 'ভদ্রলোক' এর সাথে ছোটলোকের ফারাক গড়ে তোলো। আর এই প্রকল্পে 'ঘর' এবং 'বাহির' হয়ে উঠল স্বাতন্ত্র্য নির্ণয়ের ক্ষেত্র। গৃহের কর্ত্রীর দায়দায়িত্ব যত বাড়ল তার সাথে পাল্লা দিয়ে বিশেষতঃ ঊনবিংশ শতকের শেষ দুই শতকে বেড়ে চলল গৃহভৃত্য নিয়োগের গতি। গৃহভৃত্য নিয়োগ হয়ে দাঁড়াল ভদ্রলোক পরিবারগুলির সামাজিক সম্মানের চিহ্ন।

প্রাথমিক ভাবে কলকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে নতুন গড়ে ওঠা কলকারখানায় মেয়েরা নিযুক্ত হলেও দ্রুত তাদের সংখ্যা কমতে থাকে। শ্রমক্ষেত্রে মেয়েদের অংশগ্রহণ ১৯০১ সালে ছিল মোট শ্রমশক্তির ২৯% ১৯১১ তে ১৭% এবং ১৯২১ সে কেবল ১২ শতাংশ। অবশ্য ছেলেরাও অনেকে তাদের বংশানুক্রমিক কাজ ছেড়ে তুলনায় নগণ্য গৃহভৃত্যের কাজ নিতে বাধ্য হচ্ছিল। গৃহভৃত্যের কাজে ছেলেদের অংশগ্রহণ ঔপনিবেশিক ভারতের বৈশিষ্ট্য। পশ্চিমী দুনিয়ায় এর উদাহরণ কম। এর পেছনে সম্ভবতঃ দুটি কারণ ছিল-কৃষিসঙ্কটের কারণে কৃষি শ্রমিকদের উৎখাত করার ফলে তারা গৃহশ্রমের চৌহদ্দিতে পা রাখে। একই ভাবে বিদেশী দ্রব্যের চাপে দেশজ শিল্প মার খাওয়ায় দেশজ শিল্পীরাও অনেকে কাজ হারিয়ে গৃহভৃত্য হয়ে যায়। ১৯১১-র জনগণনায় দেখা যায় কলকাতায় গৃহকর্মে নিযুক্ত গৃহভৃত্যের সংখ্যা মোট শ্রমজীবীর ১২% এই সেন্সাসে আরো বলা হয় যে পুরুষরা মোট গৃহভৃত্যের দুই তৃতীয়াংশ। তখনো পর্যন্ত পরিবারের দুস্থ মহিলা, বিধবারাই মেয়েদের মধ্যে এই কাজে লিপ্ত থাকতো। গৃহকর্মী হিসাবে মহিলাদের সংখ্যা ৯৮৭, ৮৫৬, সেখানে পুরুষের সংখ্যা ছিল ১,৫৮৭,৬১৫।

১৯৩১র জনগণনায় গৃহকর্মীর সংখ্যা বিপুল বাড়ে-বস্তুতঃ শ্রমে নিযুক্ত জনসংখ্যার ৫% ই গৃহকর্মী ছিলেন। বৃটিশ শাসিত বাংলার, বিভিন্ন জেলাগুলিতে গৃহকর্মীর সংখ্যা ১৯২১ সালে ৪৫০,১১৩ থেকে বেড়ে ১৯৩১ এ পৌঁছায় ৮০৩,৯৯৬ এ। পুরুষের সংখ্যা ১৯২১ এ ছিল ৩৩৪,৩৪৯ আর ১৯৩১ এ হল ৩৮৪,০৪৩। মহিলাদের সংখ্যা ১১৫, ৭৬৪ থেকে বেড়ে ১২৩১ এ হোল ৪১৯, ৯৫৩ অর্থাৎ ২৬% থেকে ৫২% এ পৌঁছল। আর পুরুষ গৃহকর্মীর সংখ্যা ৭৪% থেকে কমে হল ৪৮% তবে গৃহকর্মী

পুরুষের সংখ্যার সর্বোচ্চ শিখরেও এই পেশায় নিযুক্ত পুরুষের সংখ্যা আধুনিক পরিষেবা শিল্পের বিভিন্ন পেশায় কর্মরত পুরুষের এক তৃতীয়াংশের বেশী কোন দিন ওঠেনি। কিন্তু মেয়েদের ক্ষেত্রে পরিষেবা ক্ষেত্রে নিযুক্তদের সংখ্যা প্রায় ৭০% গৃহকর্মে নিযুক্ত ছিল। বিশেষতঃ ১৯৩৯ এর পর (যখন শিল্পে মন্দার কারণে ব্যাপক বেকারীত্বের ফলে পুরুষের মজুরী কমে গেলে মেয়েরা যে সমস্ত কাজ করত সেগুলি ছেলেদের হাতে চলে যায়) মেয়েদের শিল্পে শ্রমিকের কাজ হারাতে হলে গৃহকর্মই হয়ে ওঠে তাদের কৃষি ব্যাতীত একমাত্র নির্ভরযোগ্য পেশা। এক্ষেত্রে মাইনে যে খুব বেশী ছিল না তা বলাই বাহুল্য অনেকেই ছিলেন দুঃস্থা, কেউ বা স্বামী পরিত্যক্তা। আবার কখনো শহরে কর্মরত শ্রমিকদের স্ত্রীরাও এই পেশায় নিযুক্ত হতেন, গৃহকর্মে নিযুক্ত মহিলাদের "ঝি" সম্বোধন করা হত। যার অর্থ মেয়ে। আবার ১৯২০ এবং ৩০ এর দশকেই তৎকালীন সাহিত্যে সময়ের গৃহকর্মী বা 'ঠিকে ঝি' নিয়োগের তথ্য পাওয়া যায়।

তথ্যসূত্র : শাশ্বতী ঘোষ, অর্ধেক অর্থনীতি

নির্মলা বন্দ্যোপাধ্যায়, পরিবার কাজ ও মেয়েরা, কলকাতা, ২০০৭

Swapna Banerjee, Men, Women & Domestics; articulating middle class Identity in Colonial Bengal, OUP 2004

১২.৫.৯.৩ : শিল্পশ্রম এবং নারী : সর্বভারতীয় প্রেক্ষিত

ভারতে আধুনিক যন্ত্রশিল্পের সূত্রপাত 1850 এর দশকে যখন তূলা এবং পাটশিল্প গড়ে উঠতে থাকে। 1911র আগে মহিলা শ্রমিকদের ক্ষেত্রে সঠিক তথ্য না পাওয়া গেলেও 1890 এর দশকে আনুমানিক 100,000 শ্রমিক বোম্বাই (অধুনা মুম্বই) তুলা শিল্পে কর্মরত ছিল। এর মধ্যে ২০—২৫% ছিল নারী শ্রমিক যার মধ্যে অংশ [illegible] অংশ স্থায়ী কর্মী হিসাবে এবং বাকি [illegible] অস্থায়ী বা বদলী কর্মী হিসাবে কাজ করত। শিল্পে তেজী ভাব এলে শ্রমিকদের সংখ্যা বাড়ত। মন্দা দেখা দিলেই এই অস্থায়ী অংশকে ছাঁটাই করে দেওয়া হত। এরা তুলা পরিষ্কার বা সুতা গোটানোর মত অদক্ষ কাজেই বেশি থাকত। একই সময়ে চটকল গুলিতে প্রায় ১৪,০০০ নারী শ্রমিক কাজ করত। এরাও বেশিরভাগ অদক্ষ শ্রমিক হিসাবে খুচরো কাজেই ব্যাপৃত থাকত।

ঊনবিংশ শতকের শেষ অধ্যায়ে মেয়েদের বা নারী শ্রমিকদের কাজের পরিবেশ উন্নত করবার জন্য আইন প্রণয়নের উদ্যোগ শুরু হয়। মেজর মুর বোম্বাই এর তুলা দপ্তর সম্পর্কে একটি প্রতিবেদন লেখেন জে এ ব্যালার্ড, বোম্বাই এর মিন্ট (Mint) মাস্টার (টাকশালের অধিকর্তা) ভারতীয় শিল্পে মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের দুরবস্থা, বিষয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরী করেন, এর পর 7 সদস্যের একটি কমিশন তৈরী হয়। যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ কোন শ্রম আইন তৈরীর প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেননি। তবে বাধা সত্ত্বেও (কমিশনের ভারতীয় সদস্যরা মনে করতেন এহেন পদক্ষেপে ইংলণ্ডের শিল্পের তুলনায় ভারতীয় শিল্পের প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে পড়বে) 1881 সালে প্রথম শিল্প আইন চালু হয়। 1891 সালে এই আইন সংশোধন করা হয়। এই আইনে মেয়েদের কাজের সময় এগারো ঘন্টা বেঁধে দেয়। 1911-র আইনে মেয়েদের রাতের শিফ্‌টে কাজ করা নিষিদ্ধ হয়।

আন্তর্জাতিক মহলের চাপে মহিলা শ্রমিকদের কিছু সুবিধা দেওয়ার পদক্ষেপ শুরু হয়। একাধিক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের শেষে 1919 আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (International Labour Organization —সংক্ষেপে ILO) গঠিত হলে মাতৃত্বের ছুটি, স্বাস্থ্যবিধি, কর্মস্থলে নিরাপত্তা ইত্যাদি অন্যান্য সুবিধা বাধ্যতামূলক করবার দাবি ওঠে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনের সাথে একই সুরে ভারতীয় নারী সংগঠনগুলিও কথা বলতে থাকে।

একদিকে নারীদের ক্ষেত্রে বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেওয়ার ক্ষেত্রে অনিহা (খরচ বাড়বে বলে) অন্যদিকে শ্রম বাঁচানোর বিভিন্ন যন্ত্রপাতির আবিস্কার এর ফলে 1920 র দশকে বিভিন্ন শিল্পে কর্মরত মেয়েদের সংখ্যা কমে যায়। 1911 তে বোম্বাই তুলাশিল্পে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা ছিল 25 % 1920 সালে সেটা কমে দাঁড়ায় 20%। মহিলারা ধর্মঘট বা অন্যান্য প্রতিবাদ করলেও ফল ফলেনি। কম সময়ে কম মাইনেতে কাজ করতে চাইলে ট্রেড ইউনিয়ান গুলি মানতে অপারগ হওয়ায় মেয়েরা কাজ হারাতে থাকে। 1920র দশকে কলকাতা-হুগলী-শিল্পাঞ্চলে 66,000 মহিলা নিযুক্ত থাকলেও 1930 এর দশকে (মন্দাও একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণ) মেয়েদের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে।

স্থায়ী নারী শ্রমিকরা বোম্বাই, আমেদাবাদ এবং কলকাতায় সবচেয়ে ভাল মাইনে পেতেন। 1920 র দশকে স্থায়ী শ্রমিকরা কলকাতায় মাসিক 9-30 টাকা পর্যন্ত রোজগার করতেন। আমেদাবাদ এবং বোম্বাইতে ওই সময়তে মাইনে ছিল মাসিক 12-34 টাকা যেখানে হুগলীর চুঁচুড়ায় মহিলা ডাক্তার এর মাইনে ছিল মাসিক 50 টাকা। তবে বাসস্থান, জল এবং শৌচালয় ইত্যাদির অবস্থা ছিল ভয়াবহ।

খনি অঞ্চলেও প্রচুর নারী শ্রমিক কাজ করতেন— 1920র মধ্যবর্তী সময়ে খনি শ্রমিকদের এক তৃতীয়াংশই ছিলেন মহিলা (আনুমানিক 80,000) এবং এর একটা বড় অংশ মাটির তলায় খনিজ উত্তোলনের কাজে লিপ্ত ছিলেন। সেন্ট্রাল প্রভিন্সের 56.6% খনি শ্রমিক ছিলেন মহিলা যার মধ্যে 47% মাটির নীচে কাজ করতেন। বাংলায় এর পরিমাণ ছিল যথাক্রমে 35% ও 34% বিহার ও উড়িষ্যায় নারীরা ছিলেন শ্রমশক্তির 30.9% এবং মাটির তলায় 39%। মোট শ্রমশক্তির এক তৃতীয়াংশ হলেও নারী খনি শ্রমিকদের ব্যাপারে সংগঠনগুলির বিশেষ কিছুই জানা ছিল না। খনি শ্রমিক জোগাড়ের ক্ষেত্রে খনি অঞ্চলে 'জমিদারীতে' লোক বসানো হত যারা খনিতে খাজনার বদলে শ্রম দান করতেন। অনেক ক্ষেত্রেই labour gang বা শ্রমিকদের মধ্যে আদিবাসীদের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়। এদের মধ্যে মেয়েদের শ্রমের ব্যাপারে কোন ছুঁৎমার্গ না থাকায় প্রায়শঃই স্বামী স্ত্রী এবং শিশুরা - গোটা পরিবার একসাথে কাজ করতেন। পুরুষরা খনিজ কাটার কাজ করতেন আর স্ত্রী শিশুরা সেগুলি খনিগর্ভ থেকে উত্তোলনের কাজে লিপ্ত থাকতেন।

বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশকে খনি শ্রমিকদের ব্যাপারে শ্রম আইন প্রণয়নের তোড়জোড় শুরু হয়। 1923শে খনি আইন প্রণীত হবার আগে Mines Board, Mines Federation এবং আঞ্চলিক প্রশাসনের কাছে তাদের অভিমত জানাবার জন্য প্রশ্নগুচ্ছ পাঠানো হয়েছিল। তার জবাবে অধিকাংশ খনি মালিক বা প্রশাসনের আধিকারিকরা মেয়েদের খনি গর্ভে কাজ করবার পক্ষেই অভিমত ব্যক্ত করেন। তাঁদের যুক্তির সপক্ষে তারা আদিবাসীদের মধ্যে নারী পুরুষের একত্রে কাজ করবার প্রবণতাকে কারণ হিসাবে দর্শান। অন্যদিকে তাঁদের বক্তব্য ছিল মেয়েরা যে কাজ করে সেই কাজগুলি ছেলেদেরকে

দিয়ে করাতে গেলে টন পিছু চার আনা করে কয়লার দাম বেড়ে যাবে। এর ফলে কয়লার চাহিদা কমবে এবং আখেরে ক্ষতি হবে খনি শিল্পের। তা সত্ত্বেও 1929 এ মেয়েদের, কয়েকটি সীমিত ক্ষেত্র বাদ দিলে, খনিগর্ভে কাজ করা নিষিদ্ধ হয়ে যায়। ঠিক হয় যে এর 1939 মধ্যে খনিগর্ভে আর কোন নারী কর্মরত থাকবেন না। এই আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে AIWC (নিখিল ভারত মহিলা সম্মেলন) তিন সদস্যের একটি কমিটি প্রবলভাবে সমর্থন করেন। তবে যুদ্ধের প্রেক্ষাপটে মেয়েদের আরো একবার খনিগর্ভে কাজ করবার অনুমতি দেওয়া হয়, মহিলা সংগঠনগুলির তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও।

তথ্যসূত্র : Geraldine Forbes, Women in Modern India New Cambridge History of India, CUP, 1996.

১২.৫.৯.৪ : শিল্প - অসংগঠিত ও সংগঠিত ক্ষেত্র — বাংলার প্রেক্ষিত

যদি ব্রিটেনের শিল্পবিপ্লবের সময়কার তথ্যের সাথে ঔপনিবেশিক বাংলার শিল্পক্ষেত্রে নারীশ্রমের একটি তুলনামূলক আলোচনা করা হয় তাহলে দুটি ক্ষেত্রের তফাৎ আমাদেরকে নারীশ্রমের সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতটি বুঝতে সাহায্য করবে। ১৮৫১ সালে ব্রিটেনের জনগণনায় দেখা যায় বস্ত্রশিল্পে কর্মরও মেয়েরা ছিল মোট শ্রমজীবী জনসংখ্যার অর্ধেক এবং অ-কৃষি শ্রমের এক পঞ্চমাংশ। বস্তুতঃ মার্কস মন্তব্য করেছেন যে যন্ত্রশক্তি পেশীশক্তির প্রয়োজনীয়তা কমিয়ে দেওয়ায় প্রয়োজন হল নমনীয় হাতের যারা মেশিনগুলিতে সূক্ষহাতে নাড়াচাড়া করতে পারবে আর তাই মিলমালিকদের খোঁজ পড়ল শিশু এবং নারী শ্রমিকদের। আর একটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্ত্তন হল শিল্প বিপ্লবের ফলে একটি কৃষি এবং কারখানায় মজুরীর বাইরে সেবা (service) ক্ষেত্রের বৃদ্ধি। প্রাথমিক স্তরে সেবা ক্ষেত্রে মেয়েরা গৃহকর্মে নিযুক্ত থাকলেও (উনবিংশ শতকে শহুরে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর দ্রুত বিকাশের ফলে এই ক্ষেত্রের বিকাশ ঘটেছিল) ১৯১১ সালের পর থেকে গৃহদাসীর কাজ থেকে তারা ক্রমশঃই অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হয়ে পড়ছিল এবং ১৯৬০-এর দশকে সমস্ত সেবা ক্ষেত্রের অর্ধেক কাজই ব্রিটেনে মেয়েরা করতে থাকে। শ্রমক্ষেত্রে মেয়েদের ক্রমবর্ধমান অংশিদারীত্বের কারণে দেখা যায় ব্রিটেনে গ্রাম থেকে শহরে মেয়েদের অভিবাসন ক্রমেই বেড়েছে। ফলে শহরে মেয়েদের সংখ্যা পুরুষদের থেকে বেশী ছিল।

বাংলায় মেয়েদের অভিজ্ঞতা মূলগত ভাবে আলাদা, এখানে ঔপনিবেশিক শাসন এবং পুঁজিবাদী প্রক্রিয়ায় যে শিল্পায়ন হোল তার চরিত্র ইংলণ্ডের শিল্পবিপ্লবের থেকে পৃথক। বৃহৎ পুঁজি নিবেশের ফলে যে শিল্পগুলি তৈরী হল সেখানে মেয়েদের ভূমিকা সীমিত। সেবামূলক শিল্প বলতে একমাত্র গৃহকর্মের ক্ষেত্রেই যেটুকু বৃদ্ধি দেখা গিয়েছিল। অন্যদিকে যেটুকু যন্ত্রশিল্প এল তার চাপে ঐতিহ্যগত অ-কৃষিজ বা কৃষিনির্ভর শিল্পগুলি সাংঘাতিক মার খেল। মেয়েদের প্রথাগত শিল্পে যে কাজ ছিল তা নষ্ট হয়ে গেল। তাঁরা কৃষিক্ষেত্রে বা গৃহশ্রমের আঙ্গিনায় ভীড় করতে থাকলেন। শহরের জনসংখ্যায় নারীর অনুপাতও কমে গেল। বস্তুতঃ নারী পুরুষের শ্রমে অংশগ্রহণের তুলনামুলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে পুরুষদের তুলনায় নারীরাই অর্থনীতির আধুনিকিকরণের ফলে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। সমাজে মহিলারা সাবেক যে সমস্ত কাজের সাথে জড়িত থাকত সেই কাজগুলি যন্ত্রের আগমনে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হওয়াতেই

এই সমস্যা দেখা দিয়েছিল। ১৮৮১-১৯৩১ এর মধ্যবর্তী সময়ে বাংলার অর্থনীতিকে দেখলে কতগুলি উল্লেখযোগ্য বিষয় চোখে পড়ে।

(ক) ১৮৮৯ র আগে বাংলা ছিল প্রথাগত শিল্পে সমৃদ্ধ একটি অঞ্চল। ঊনবিংশ শতকের গোড়ায় অবশিল্পায়ন ঘটলেও ১৮৮১ তে জনসংখ্যার ২০% কারিগরী শিল্পে বা উৎপন্ন জিনিষের বিকিকিনিতে নিযুক্ত ছিলেন।

(খ) আলোচ্য সময়কালে আধুনিক শিল্পের বিকাশ ঘটে এবং কোনো কোন ক্ষেত্রে তার বিকাশের সর্বোচ্চ স্তরের কাছে পৌঁছে যায়।

(গ) আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সবচেয়ে বড় অংশই নিযুক্ত ছিল বাংলায় (১৯২৯ এ ভারতে আধুনিক শিল্পে নিযুক্ত মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৫.৫ লাখ যার মধ্যে বাংলায় একাই নিযুক্ত ছিল ৫.৯ লাখ)

(গ) বাংলায় মহিলা শ্রমশক্তির বড় অংশই কাজ করত প্রথাগত শিল্পে। খুব কম অংশই (এক তৃতীয়াংশ) কৃষিতে নিযুক্ত ছিল।

(ঙ) শিল্পে আধুনিকিকরণের ফলে বাংলায় মহিলাদের ক্ষতি হয়েছিল। ১৯৬৯ তে পশ্চিমবঙ্গে মেয়েদের শ্রমপ্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের হার ছিল ভারতের মধ্যে সর্বনিম্ন।

উনবিংশ শতকের শেষভাগে বিভিন্ন কমিশনের রিপোর্টে বারে বারে শ্রমিকের অভাবের কথা উঠে এসেছে। শ্রমিকের অভাব মেটাতে উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ, অবধ, বেনারস, ফৈজাবাদ ইত্যাদি এলাকা থেকে শ্রমিক আমদানীর কথা বলা হয়েছে ১৮৯৬ র বেঙ্গল লেবার এনকোয়ারী কমিশনের রিপোর্টে। তারা এমনকি কয়লাখনিতে শ্রমিকের অভাব মেটাতে চীনা শ্রমিক আমদানীর কথাও ভেবেছিলেন। একথা মনে রাখতে হবে যে এই শিল্পায়ন একটি নির্দিষ্ট এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকায় এবং হঠাৎ সাংঘাতিক চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় এমনতর অভাব দেখা দিয়েছিল। বাংলায় এই সময়কালে মূলতঃ তিনটি শিল্প খুব দ্রুত গতিতে বৃদ্ধি পাচ্ছিল — কলকাতা এবং গঙ্গার তীরবর্তী অঞ্চলে পাটশিল্প, পাহাড় অঞ্চলে চা শিল্প এবং বর্ধমানের কয়লাখনি অঞ্চলে কয়লাশিল্প। ১৮৬০ থেকে ১৮৮০-র মধ্যে পাটশিল্পে নিযুক্ত ছিল ২৮,০০০ শ্রমিক। তারপর থেকে প্রতি দশ বছরে এই সংখ্যা দ্বিগুণ বৃদ্ধি পেয়েছিল। কয়লাখনিতে ১৮৯১ থেকে ১৯০১ এর মধ্যে শ্রমিকের সংখ্যা দ্বিগুণ বেড়েছিল আর ১৯০১ থেকে ১৯১১র মধ্যে বৃদ্ধি পেয়েছিল ১৭৫%। চা বাগানে একই সময়ে বৃদ্ধির হার ছিল ২৭০%।

কিন্তু মেয়েদের কাজ কমছিল, পাটশিল্পে ১৯০১ যেখানে নারী শ্রমিক ছিল ২৯%, ১৯১১ তে সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ১৭% এবং ১৯২১ এ ওই সংখ্যা ছিল ১২%। কয়লাখনিতে মেয়েরা যেখানে ১৯০১ এ মোট সংখ্যার ৫০% র বেশি নিযুক্ত ছিল ১৯৩১ এ সেই সংখ্যা কমে দাঁড়ায় ২৫% এর কম। বস্তুতঃ ১৯২৮ থেকে মেয়েদের খাদানে কাজ করা নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। খনি গহ্বরে মেয়েদের কাজ করার ক্ষেত্রে আইনী বিধিনিষেধ আগে থাকলেও প্রযুক্ত হয় অনেক পরে যখন অর্থনীতিতে মন্দার

কারণে মেয়েদের কাজ পুরুষেরা কম টাকায় করতে রাজি হল তখন। এমনকি চা শিল্প, যেখানে নারীশ্রম অত্যাবশ্যক, সেখানেও মন্দার সময় পুরুষদের কাজ এর পরিমাণ বাড়ছিলো।

সেবাক্ষেত্রে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা — রেলপথ বা আধুনিক যানবাহন ইত্যাদি বাড়লেও এই ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ বাড়েনি। বরং কমেছিল। কারণ আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু হলে প্রথাগত যোগাযোগ ব্যবস্থা- যেমন নৌকা পরিবহণ বা গরুর গাড়ীর মত যান কমে যায় এবং এই সকল ক্ষেত্রে কর্মরত মাঝি মাল্লা বা গাড়োয়ানরা কাজ হারায়। সেবাক্ষেত্রে যে পেশা অবিসংবাদী ভাবে বেড়েছিল তা হল বাড়ীর কাজ যা আমরা আগেই দেখেছি।

বাংলায় প্রথাগত শিল্প বা পেশায় নিযুক্ত ছিল সবচেয়ে বেশি। আধুনিক শিল্প ও পেশা ১৮৮১-৩১ এর মধ্যে ভীষণ দ্রুত বৃদ্ধি পেলেও সমগ্র শ্রমশক্তির ১৫% এর বেশি অধিকার করতে পারেনি যার পরিমাণ মোট জনসংখ্যার ৫%এর বেশি কখনই নয়।

প্রথাগত ক্ষেত্রে পরিমাণ ছিল অনেক চমকপ্রদ। জনসংখ্যা বাড়লেও নারী পুরুষ উভয়ের ক্ষেত্রেই কৃষিতে নিযুক্ত মানুষের আনুপাতিক হার বাড়ছিল (শিল্পবিপ্লবোত্তর ইংলণ্ডের পরিস্থিতির থেকে সম্পূর্ণ আলাদা) তবে মেয়েদের উপস্থিতি কৃষিতে ৫৮% যেখানে বিহারে বা উড়িষ্যায় সংখ্যাটা ছিল যথাক্রমে ৮৪ এবং ৭১%। কৃষিতে নারী শ্রমিকের ভীড় বাড়বার অর্থ প্রথাগত ক্ষেত্র— বিশেষত খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণ যেমন ধান ভানা বা সুতা কাটার মত কাজ দ্রুত অবলুপ্তির পথে যাচ্ছিল যেখানে মহিলাদের উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য। প্রথাগত ক্ষেত্রে মেয়েদের পিছু হটার ঘটনায় ধান ভানার ইতিহাস বিশেষ ভাবে। প্রণিধান যোগ্য ঃ—

১২.৫.৯.৫ : অসংগঠিত শিল্প

ঢেঁকিতে চাল ছাটার কাজ গ্রামীণ অর্থনীতিতে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল। এতে যে শুধু বাংলায় উৎপন্ন ধান প্রক্রিয়াকরণ করা হত তাই নয়, বাইরে থেকে যে চাল আমদানী করা হত তারও প্রক্রিয়াকরণও করা হত।

ধান ভানার কাজে মহিলাদের অংশগ্রহণ সারা বাংলাতেই গুরুত্বপূর্ণ হলেও উত্তরবঙ্গ বিশেষতঃ রাজশাহীতে বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল। কারণ রাজশাহী অঞ্চল ছিল প্রথাগতভাবে ধান রপ্তানীকারক অঞ্চল। এমনকি বিংশ শতকের গোড়ার দিকেও বিভিন্ন শিল্পে নিযুক্ত মোট জনসংখ্যার এক পঞ্চমাংশ ধান ভেনেই তাদের রুজি উপার্জন করত।

ঢেঁকিতে ধান ভানার গুরুত্ব নিম্নরূপ :

(ক) বাড়িতে খাদ্যশস্য প্রক্রিয়াকরণে সাশ্রয় হওয়ায় কৃষক পরিবারগুলি ডাল বা দানাশস্য বেশী করে কিনতে পারত।

(খ) যারা বাণিজ্যিকে ভিত্তিতে ধান ভানার কাজ করতেন তাঁরা পরিবারের আয়ে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতেন।

(গ) ঢেঁকিতে ধান ভানলে ধানের খাদ্যগুণ, বিশেষতঃ থায়ামিন সমৃদ্ধ উপরিত্বক রক্ষিত হওয়ায় এই চাল চালকলের চাল-এর থেকে অনেক বেশি স্বাস্থ্যকর।

(ঘ) অনেকক্ষেত্রেই ধান ভানা গ্রামীণ ক্ষেত্রে মহিলাদের উপযোগী একমাত্র কাজ ছিল। অর্থনৈতিক সংকট দেখা দিলে মহিলারা অনেক ক্ষেত্রেই এই কাজ করে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতেন। ১৮৯৬-৯৭ সালে খুলনায় ব্যাপক খাদ্যাভাব দেখা দিলে পুরুষেরা অনেকেই বাইরে কাজে যেতে বাধ্য হয়। মহিলারা গ্রামেই ধান সিদ্ধ করা বা ধান ভানার কাজ করে টিকে ছিলেন। ১৯৫০ এর দশকে বিশ্বভারতীর Agro-Economic Research Centre এর বিভিন্ন ক্ষেত্র সমীক্ষাতেও এই তথ্য বারে বারে উঠে এসেছে যে ধান প্রক্রিয়াকরণ মেয়েদের ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত জরুরী অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ। ১৯২০-র দশক পর্যন্ত ধান ভানার কাজ 'ভীষণভাবেই গুরুত্বপূর্ণ ছিল। এক মণ ধান ভানতে ১৬ ঘন্টা লাগলে আর গড়ে পাঁচ জনার সংসারে বছরে ২০ মণ চাল প্রয়োজন হলে ওই পরিমাণ চাল ছাঁটতে একজন নারীর ৩০০ ঘন্টার কাছাকাছি শ্রম ব্যয় করতে হত। ১৮৮৮ সালে শ্রমজীবীদের অবস্থা সম্পর্কে একটি সমীক্ষায় (লর্ড ডাফরীন-এর সময় এই সমীক্ষা হয় যা Dufferin Enquiry. Report নামে পরিচিত) দেখা যায় যে সারা বছরে ধান ভেনে একজন গড়ে বারো টাকা রোজগার করতেন যা দিয়ে ৫.৫ মণ চাল ক্রয় করা সম্ভব ছিল।

কিন্তু বিংশ শতকের গোড়ায় এই শিল্প যন্ত্রের আমদানীতে ভীষণভাবে মার খায়। দুধরনের যন্ত্র আসে—

ক) শেলার (shuller) মেশিন যা আকারে ছোট, যাকে চালাতে দুজন সহযোগী হলেই চলে। এটাই বর্তমানের husking machine নামে পরিচিত। ঢেঁকিতে যেখানে এক মণ ধান ছাঁটতে ১৬ ঘন্টা লাগে সেখানে হাস্কিং মেশিনে প্রতি ঘন্টায় ৩-৬ মণ ধান ছাঁটা সম্ভব।

(খ) শেলার (sheller) মেশিন যেখানে ছোট ইউনিট চালাতেও কমপক্ষে ১০ জন লোক লাগে এবং প্রতি ঘন্টায় ৫০ মণ ধান থেকে চাল করা সম্ভব।

বাংলার দক্ষিণ পশ্চিমাংশে অবস্থিত বীরভূম জেলার বোলপুর শহরে দেখা যায় যে প্রথম ধানকল তৈরী হয় ১৯১৩ সালে। ১৯২০ তে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ৫ আর ১৯২৮-এ সংখ্যা গিয়ে দাঁড়ায় ১৮টিতে। ১৯৫৪ তে পশ্চিমবঙ্গে হালার মেশিন ছিল ৩৮৮টি আর শেলার মেশিন ছিল ১৫টি। ১৯৬০ এ এই সংখ্যা ছিল যথাক্রমে ৬৭৯৪ এবং ৫৩। বর্তমানে হাস্কিং মেশিন প্রায় প্রত্যেক সম্পন্ন কৃষক পরিবারেই দেখা যায়। হিসাব কষলে দেখা যাবে যে একটি হালার মেশিন ৪০ জন ঢেঁকি শ্রমিকের কাজ করে দেয় আর একটি শেলার মেসিন ৫০০ জন ঢেঁকিশ্রমিক ছাঁটাই করেছে। শুধু তাই নয় শ্রম সম্পর্কেরও পরিবর্তন ঘটে। আগে যেখানে মহিলারা পরিবারের নিভৃত অন্তরালেই এই শ্রম সম্পাদন করতেন সেখানে চালকলে 'চাতাল কুলী' হিসাবে মহিলাদের কাজ করতে হয় প্রকাশ্যে। ফলে সম্ভ্রান্ত কৃষক পরিবারের রমণীরা আর এই কাজে এলেন না— 'চাতাল শ্রমিকের' কাজ করতে লাগলো মূলতঃ

উপজাতি সম্প্রদায়ের মহিলারা যাঁদের গোষ্ঠীতে শ্রম সম্পর্কে উচ্চধারণার কারণে প্রকাশ্যে কাজ করাটাকে নীচু চোখে দেখা হত না।

ঢেঁকি বন্ধ হলে তাই অর্থনীতিতে চাপ পড়ল। বিশেষতঃ প্রান্তিক চাষীদের খাদ্য নিশ্চয়তা (food availability) ক্ষতিগ্রস্ত হল।

এখানে অসংগঠিত ক্ষেত্রে মাত্র একটি পেশা — ঢেঁকিতে ধান ভানা বিষয়ে আলোচিত হলেও অন্যান্য পেশা যেমন সুতো তৈরী বা গোটানোর ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। আধুনিক শিল্পের অনুপ্রবেশের ফলে এইভাবে অর্থনীতিতে নারীদের ভূমিকা গৌণ হয়ে পড়ে। ১৮৮১ তে ১২ লক্ষ নারী কৃষিতে নিযুক্ত ছিলেন যেখানে ৭২৫,০০০ জন খাদ্য প্রক্রিয়াকরণের কাজ করতেন। এর মধ্যে ৫০০,০০০ জন শস্য প্রক্রিয়াকরণের কাজে ২০০,০০০ জঙ্গল থেকে জিনিষপত্র সংগ্রহের কাজে ৩৪০,০০০ জন বিভিন্ন জাতকর্মে (কামার, কুমোর ইত্যাদি) স্ব স্ব কাজে নিযুক্ত ছিলেন। সব মিলিয়ে ১৪ লক্ষ নারী প্রথাগত শিল্পে নিযুক্ত ছিলেন। কিন্তু আধুনিক যন্ত্রের চাপে, যোগাযোগ ব্যাবস্থার উন্নতিতে দেশের অভ্যন্তরে অর্থনীতির আধুনিকিরণের ফলে এই সমস্ত শিল্প সাংঘাতিক চাপের মুখে পড়ে। ১৯২৯ এ আধুনিক চালকল গুলিতে কর্মরত শ্রমিকের সংখ্যা ছিল মাত্র ১২,৫০০। এর মধ্যে মহিলারা কেবল চাতাল কুলি হিসাবে শস্য শুকোনোর কাজে ব্যাপৃত ছিল।

১২.৫.৯.৬ : সংগঠিত শিল্প

গ্রামে অর্থনৈতিক চাপ সত্ত্বেও মহিলারা কিন্তু উল্লেখযোগ্য সংখ্যায় শহরে গিয়ে ভীড় জমালেন না। বস্তুতঃ চা শিল্পে নিযুক্ত উপজাতি রমণী ছাড়া মেয়েরা গ্রাম ছেড়ে শহরে কলে-কারখানায় কাজ নিলো খুবই কম।

এর একটা কারণ হল যে প্রথম পর্যায়ে উত্তর ভারত থেকে যে অভিবাসী শ্রমিকরা এলেন তাঁরা এলেন স্ত্রী পরিবার ছেড়ে। একে তো তাঁদের গ্রামের সাথে যোগাযোগ সতেজ রাখবার তাড়না। অন্যদিকে শ্রমিক বস্তিগুলির অকল্পনীয় রকম খারাপ পরিস্থিতি যেখানে মহিলাদের পক্ষে নিজেদের আব্রু বজায় রাখাটা খুবই শক্ত ছিল। মহিলারা যে একদম আসতেন না তা নয়, দক্ষিণ ভারত থেকে আগত অভিবাসী শ্রমিকরা অনেক ক্ষেত্রে সাথে করে অবিবাহিত মহিলাদের নিয়ে আসতো, যাঁরা চটকলগুলিতে কাজ করবার পাশাপাশি দেহব্যবসাতেও লিপ্ত হতে বাধ্য হতেন। ১৯২৩ এ ডঃ ডাগমার কারজেল শ্রমিক বস্তিতে নারী স্বাস্থ্য সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেন তা এককথায় ভয়াবহ। মহিলাদের একটা বড় অংশই অত্যাধিক কাজের চাপে অসুস্থ, যৌন রোগ পীড়িত ছিলেন। স্বাভাবিক ভাবেই সম্ভ্রান্ত বা গৃহস্থ ঘরের মহিলারা এই কাজে / কারখানায় কখনই কাজ করতেন না। বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্তা মহিলাদের অগতির গতি ছিল কারখানা/চটকলে কাজ আর একবার এখানে এলে মুক্তির আশা ছিল সুদূর পরাহত।

একদিকে মেয়েরা যেমন প্রথাগত শিল্পে জায়গা হারালো। অন্যদিকে আধুনিক শিল্পে বিশেষ পরিস্থিতির কারণে তারা কর্মসংস্থানের সুবিধা গ্রহণ করতে পারলো না। তাদের একমাত্র অবলম্বন হল গৃহশ্রম।

১২.৫.৯.৭ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Nirmala Banerjee, 'Working Women in Colonial Bengal : Modernization & Marginalization' in Sudesh vaid, Kumkum Sangari. (ed) Recasting Women; Essays in colonial History. N. Delhi, 1989. pp. 1999 267-301.
2. Mukul Mukherjee, 'Impant of modernisation on women's occupation: a case study of the rice husking industry of Bengal' in J Krishnamurthy (ed.) Women in Colonial India, Essays on survival, work and the State. Delhi OUP, 1989.
3. মুকুল মুখোপাধ্যায়, উইমেন অ্যাণ্ড ওয়ার্ক ইন ইণ্ডিয়া -- নির্মলা বন্দোপাধ্যায়, পরিবার কাজ ও মেয়েরা, কলকাতা, ২০০৭।
4. শাশ্বতী ঘোষ অর্ধেক অর্থনীতি।
5. Swapan Banerjee, men, women & domestics articulating & middle class identity in Colonial Bengal, OUP, 2004.

১২.৫.৯.৮ : সম্ভব্য প্রশ্নাবলী

(১) ঔপনিবেশিকতার কারণেই আধুনিক শিল্প বিকাশ মহিলাদের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়েছে — তোমার মত যুক্তিসহ উপস্থাপন কর।

(২) আধুনিক যন্ত্রশিল্পের চাপে অসংগঠিত ক্ষেত্রের নারী শ্রমিকরা কিভাবে কাজ হারালেন তার বিবরণ দাও।

(১) মেয়েদের গৃহশ্রম প্রথাগত অর্থনীতিতে স্বীকৃতি পায় না কেন?

(২) মেয়েদের গৃহশ্রম পরিমাপের পদ্ধতিগুলি কি কি?

(৩) ঊনবিংশ শতকের শেষ ভাগ এবং বিংশ শতকের প্রথমার্ধে গৃহশ্রমের বৃত্তে কি পরিবর্তন ঘটে?

(৪) গৃহদাসী হিসাবে মেয়েদের কাজের একটি বিবরণ দাও।

———

পর্যায় গ্রন্থ - ৫

WOMEN AND WORK

একক - ১০

(a) Professions, (b) Wages, (c) Property rights

বিন্যাসক্রম :

১২.৫.১০.০ : উদ্দেশ্য

১২.৫.১০.১ : নারী ও অন্যান্য পেশা এবং মাইনে

১২.৫.১০.২ : আধুনিক পেশা

১২.৫.১০.৩ : গৃহ পরিচারিকা এবং দেহোপজীবিনী

১২.৫.১০.৪ : নারী ও সম্পত্তির অধিকার

১২.৫.১০.৫ : মুসলিম আইন

১২.৫.১০.৬ : বর্তমান পরিস্থিতি

১২.৫.১০.৭ : খৃষ্টান আইন

১২.৫.১০.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.৫.১০.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৫.১০.০ : উদ্দেশ্য

এই অধ্যায়টি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

১। নারীর বিভিন্ন পেশা ও মাইনে -- ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিতে।

২। নারীর আধুনিক পেশা হিসেবে গৃহ পরিচারিকা ও অন্যান্য কাজ।

৩। নারীর সম্পত্তির অধিকার -- বিভিন্ন ধর্ম অনুযায়ী নারীর এই অধিকার সংক্রান্ত বিষয়ের আলোচনা।

১২.৫.১০.১ : নারী ও অন্যান্য পেশা এবং মাইনে (Wages) ঔপনিবেশিক প্রেক্ষিত

ঔপনিবেশিক শাসন ও অর্থনৈতিক প্রভাবে কৃষিনির্ভর, হস্তশিল্প চালিত আঞ্চলিক অর্থনীতির গোড়ায় কোপ পড়ল। ছোট ছোট কারিগরী শিল্পগুলি মার খাওয়ায় অনেক মহিলাই এই পর্যায়ে কাজ হারালেন। অন্যদিকে ঔপনিবেশিক আমলেই 'অর্থনীতিতে আধুনিক ক্ষেত্রের বিকাশের ফলে কলে কারখানায় এবং আধুনিক পেশা যেমন চিকিৎসা বা শিক্ষা ক্ষেত্রে মেয়েদের কাজের সুযোগ বাড়ে।

1921 সালে যে বছর অসহযোগ আন্দোলন তুঙ্গে সে বছরে ভারতে 3 কোটি 90 লক্ষ নারী (39 million) বিভিন্ন কাজে যুক্ত ছিলেন যা ছিল নারীদের মোট সংখ্যার $\frac{1}{5}$ ভাগ এর মধ্যে সামান্যই বিভিন্ন $\frac{1}{2}$
আধুনিক পেশায় নিযুক্ত ছিলেন ঃ ৬৮,০০০ চিকিৎসায় ৩০০০০ শিক্ষা ও বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে, আর ৬০০০ আইন ব্যবসা ও ব্যবসা বণিজ্যে লিপ্ত ছিলেন। কর্মরত নারীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় অংশটাই উৎপাদন শিল্পে বড় বা ছোট কারখানায় নিযুক্ত ছিলেন, গৃহ পরিচারিকার সংখ্যা ছিল ৭৩৭,০০০। ১৯২৮ সালে ২৫০,০০০ নারী বিভিন্ন কারখানায় নিযুক্ত ছিলেন যার মধ্যে ৫৮,০০০ জন্য সুতা কলে এবং সুতি বস্ত্র শিল্পে এবং ৫৫,০০০ চটকলগুলিতে কাজ করতেন। আরো ২৫০,০০০ নারী চা শিল্পে বিভিন্ন কাজে এবং ৭৮,০০০ মহিলা খনিতে কাজে লিপ্ত ছিলেন। যৌন কর্মীর সংখ্যাও নেহাৎ কম ছিল না কারণ ১৯২১শে বোম্বাই (আধুনা মুম্বই)-তে যৌন কর্মীর সংখ্যা ৩০,০০০ থেকে ৪০,০০০ এর মধ্যে ছিল। কৃষি ও ঘরের কাজে নিযুক্ত নারীর সংখ্যা মোট পেশাদারদের চেয়ে বহুগুণ বেশী হলেও আদমসুমারীতে এ বিষয়ে তথ্য বিশেষ নেই।

উপরে বর্ণিত পেশাগুলির মধ্যে অধিকাংশই ছিল অতিরিক্ত শোষণমূলক। মহিলা সংগঠনগুলি এদের ব্যাপারে যথেষ্ট সরব হলেও সমাজের নীচুতলার মেয়েদের শ্রমকে স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন। জাতীয় নেতৃত্ব মেয়েদের ঘরের বাইরে শ্রমকে 'অস্বাভাবিক' বা 'মহিলা প্রকৃতি বিরুদ্ধ, বলে মনে করেছেন। ফলে কয়েকটি ব্যতিক্রম ছাড়া কর্মক্ষেত্রে বৈষম্য, শোষণ এবং মাইনে বাড়ানোর ক্ষেত্রে পদক্ষেপ কমই নেওয়া হয়েছে।

অন্যদিকে এই সময়ে আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান যেমন জাতিসংঘ (League of Nations) বা আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন (International Labour Organization-ILO) এর প্রভাবে একটি আদর্শ শ্রমবিধি তৈরী করবার চাপে অনেক ক্ষেত্রেই নারী সংগঠনগুলি এমন কিছু পদক্ষেপ নিয়েছে যাতে আদতে নারীদের কাজের সুযোগ কমে গিয়েছিল। কয়লাখনিগুলিতে মাটির নিচে কাজ করবার ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞা এমনই একটি উদাহরণ। এর ফলে খনি শিল্পে নিযুক্ত অনেক মহিলাই কাজ হারান।

১২.৫.১০.২ : আধুনিক পেশা

1920 এবং 1930 এর দশকে নারী সংগঠনগুলি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং চিকিৎসাকেন্দ্রগুলিতে মেয়েদের আরো বেশী সংখ্যায় নিয়োগের ব্যাপারে সরব হন। পুরুষদের প্রতিষ্ঠান মেয়েদের পক্ষে ব্যবহারে কিছু অসুবিধা থাকায় সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্য আলাদা প্রতিষ্ঠান তৈরীর প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। নারী নেতৃত্ব এই প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেয়েদের নিয়োগ করবার দাবী জানাতে থাকেন।

ঊনবিংশ শতকের শেষের দিকে চিকিৎসা পেশা মেয়েদের জন্য খুলে যায়। 1885 সালে বড়লাটের স্ত্রী লেডি ডাফরীন প্রতিষ্ঠা করেন National Association for Supplying Female Medical Aid to the Women বা ডাফরীন ফান্ড। এই অ্যাসোসিয়েশন যে সমস্ত নারী ডাক্তারী পড়তে বা নার্সের প্রশিক্ষণ পেতে ইচ্ছুক ছিলেন তাদের অর্থসাহায্য করত বা হাসপাতাল, প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র তৈরীতে উৎসাহ দিত। এই ফাণ্ডে ভারতীয় ধনিরা অনেকেই দান করেছেন এবং তার জন্য বিশেষ পুরস্কার বা উপাধি দ্বারা সম্মানিত হয়েছেন। 1888 সাল থেকে সরকার এই অ্যাসোসিয়েশন এর কাজ পরিচালনা এবং ডাক্তারীতে মহিলা স্নাতকদের নিয়োগের কাজ করতে থাকে।

কাদম্বিনী বসু ছিলেন ভারতের প্রথম মহিলা ডাক্তারদের অন্যতম তিনি আবার কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম মহিলা স্নাতকদ্বয়ের অন্যতম-অন্যজন চন্দ্রমুখী বসু। (অন্যজন আনন্দিরাই যোশী— উভয়েই 1886 সালে স্নাতক হন-প্রথমজন দেশে দ্বিতীয়জন বিদেশে)। তিনি এই ব্যবস্থার সুবিধা পেয়েছিলেন। কাদম্বিনী বসু ছিলেন ব্রাহ্ম দ্বারকানাথ গাঙ্গুলীর স্ত্রী। একধারে পেশাগত চাপ সামলে দক্ষতার সাথে পাঁচ সন্তান মানুষ করেছেন। আবার অন্যদিকে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম মহিলা প্রতিনিধিদের অন্যতম ছিলেন। 1888 সালে লেডি ডাফরীন মহিলা হাসপাতালে মাসিক 300 টাকা মাইনের চাকরীতে নিযুক্ত হন। এরকম একজন সর্বগুণান্বিতা সফল পেশাদার মহিলাকেও বঙ্গবাসীর মত গোঁড়া সংবাদপত্রে দেহোপজীবিনী বলা হয়েছে। কাদম্বিনী মানহানী মামলায় জিতলেও এর থেকেই বোঝা যায় যে এই ধরনের নতুন পেশাদার মহিলাদের কি ধরনের সামাজিক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

আরেকজন মহিলা ডাক্তার আনন্দীবাঈ - যিনি আমেরিকার পেনসিলভানিয়া থেকে পাশ করেছিলেন তাঁর জীবন ইতিহাসও কম রোমাঞ্চকর ছিল না। দারুণ প্রতিকূলতার সাথে লড়াই করতে করতে পড়া শেষ করলেও ভারতে এসে চাকরী নেবার আগেই তিনি মারা যান।

ঊনবিংশ শতকের শেষে এবং বিংশ শতকের প্রথম দশকগুলিতে মহিলা ডাক্তারদের চাহিদা বাড়ে। মধ্যবিত্ত পরিবারের মহিলারা আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থার সুযোগ নিতে ইচ্ছুক থাকলেও পুরুষ ডাক্তারদের কাছে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করতেন না। অন্যদিকে কলকারখানাগুলিতে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যবিধি চালু হলে নারী শ্রমিকদের জন্য মেয়ে ডাক্তার-এর চাহিদা বাড়ে। প্রথমে ছেলেদের কলেজেই কতিপয় মেয়েদের পড়বার ব্যবস্থা হলেও প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মেয়েদের জন্যও মেডিকাল কলেজ শুরু হয়। 1916 সালে দিল্লিতে লেডি হার্ডিঞ্জ মেডিক্যাল কলেজ খোলা হয় মেয়েদের জন্য। 1929 শে 19 টি ছেলেদের মেডিক্যাল কলেজে মেয়েদের পড়বার ব্যবস্থা হলেও একটি মেডিক্যাল কলেজ ও চারটি মেডিক্যাল স্কুল খোলা হয় সম্পূর্ণভাবে মেয়েদের জন্য। তবে মেয়েদের বৈষম্য ভোগ করতে হয়েছে। অনেক সময় প্রফেসাররা মেয়েদেরকে ক্লাসে ঢুকতে দিতেন না- তাদের পড়ানোর ভার বর্তাত জুনিয়র অ্যাসিস্টান্টদের উপর।

কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিও ভোগ করতে হয়েছে। 1930 শে নাদিয়াদ এ কর্মরত মহিলা ডাক্তার ডঃ কুমারী অহল্যাবাঈ সামন্তকে এলাকার নগরপিতা ডঃ বলবাহী হরিশঙ্কর ভাট অপহরণ করেন। সেশনস জজ ভাটকে এই অপরাধে একবছরের কারাদন্ডে দন্ডিত করলেও হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্ত মকুব করে কেবল অর্থদন্ডে দন্ডিত করেন। সিদ্ধান্তে বলা হয় বাইরে কর্তব্যরত মেয়েদের সৌকুমার্যের ব্যাপারে এত স্পর্শকাতরতা মানায় না!

শুধু তাই নয় ভারতীয় মহিলা ডাক্তারদেরকে ইউরোপীয় ডাক্তারদের সঙ্গে এক অসম প্রতিযোগীতায় লিপ্ত হতে হত। যদিও তত্ত্বগত ভাবে মাইনে ঠিক হত ডিগ্রী/যোগ্যতার ভিত্তিতে কিন্তু ভারতে বসে ইউরোপীয় মহিলাদের সমমানের ডিগ্রী পাওয়া প্রায় অসম্ভব ছিল। স্বাভাবিক ভাবেই একজন MD বা MB ডিগ্রীধারী ডাক্তারের থেকে VLMS (Vernacular Licentiate in Medicine & Surgery) ডাক্তার 1/10 অংশ কম মাইনে পেতেন।

অন্যদিকে যে সমস্ত মহিলা শিশু ও মহিলাদের সেবা প্রতিষ্ঠানে কর্মরত থাকতেন তাদের সমস্যা কম থাকলেও বা তারা বেশি সুরক্ষিত থাকলেও নারী পুরুষ উভয়ের জন্যই খোলা প্রতিষ্ঠানগুলিতে মেয়েদের সমস্যা বেশী হত। বিবাহিত মহিলারা একভাবে নিরাপত্তা পেলেও অবিবাহিতা বা বিধবাদেরকে বিভিন্ন ধরনের হেনস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১২.৫.১০.৩ : গৃহ পরিচারিকা এবং দেহোপজীবিনী

আধুনিক পেশার মধ্যে এছাড়াও ছিল মধ্যবিত্ত বাড়িতে নিযুক্ত গৃহপরিচারিকারা। এদের কথা বিস্তারিত ভাবে অসংগঠিত শ্রমের প্রসঙ্গে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এর বাইরে ছিল দেহোপজীবিনীরা। মনে রাখতে হবে যে আদিমতম পেশা-দেহব্যবসা ভারতে নতুন নয়। **মৃচ্ছকটিকের** বসন্তমেলা বা খিলপাদপরম এর মাধবীর মত নটীদের বর্ণনা ভারতীয় প্রাচীন সাহিত্যে মাঝে মাঝেই এসেছে। বস্তুতঃ বাৎসায়নের **কামশাস্ত্র** অনুযায়ী বারাঙ্গনারা চৌষট্টি কলায় পারদর্শী এবং তাঁরা নাগরিক

মন ও শরীরের পরিতৃপ্তি দিতে সক্ষম ছিলেন। **অর্থশাস্ত্র** অনুযায়ী রাষ্ট্র বারাপনাদের কাছ থেকে কর এবং কখনো গোপন খবর সংগ্রহ করতেন। কলহনের **রাজতরঙ্গিনী** অনুসারে কাশ্মিরের বিখ্যাত রানী জয়মতিও একজন বহুবল্লভা ছিলেন যিনি নিজের বুদ্ধিমত্তায় কাশ্মীরের গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব হয়ে ওঠেন। দক্ষিণভারতে মধ্যযুগে মন্দিরগুলি ক্রমশঃই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানে রূপান্তরিত হলে আগম শাস্ত্র অনুসারে দেবতার মনোরঞ্জনার্থে **দেবদাসী** বা **নিত্যসুমঙ্গলী** (দেবদাসীদের দেবতার সাথে আনুষ্ঠানিক বিবাহ সম্পাদিত হলে তারা কোনদিন বিধবা হন না তাই এই উপাধি!) প্রথার গোড়াপত্তন হয়। প্রাগাধুনিক যুগে ক্রমেই এই দেবদাসীরা 'মন্দির বারাঙ্গনায়' (Temple prostitutes) রূপান্তরিত হন। এর আগে মহিলাদের ইতিহাস রচনার সূত্র নির্দেশ করতে গিয়ে আমরা দেখেছি কিভাবে এই মন্দিরের দাসীরা মন্দিরগুলিতে দান করবার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিলেন।

আগের মতই দেহব্যাবসা থাকলেও আধুনিক শহরের, কলকারখানার বিকাশের ফলে দেহব্যাবসা, এই পেশায় নিযুক্ত নারীদের সংখ্যা বাড়ে। অন্যদিকে সমাজ সংস্কারকরা এদের ব্যাপারে চিন্তিত ছিলেন এবং এই পেশাকে নিয়ন্ত্রিত করবার জন্য বিভিন্ন আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছিলেন।

ঊনবিংশ শতকের মাঝামাঝি নাগাদ কলকাতায় দেহোপজীবীর সংখ্যা ছিল আনুমানিক 12,000 যার 90 শতাংশই ছিলেন বিধবা। এই সময় কলকাতার জনসংখ্যা ছিল 400,000। এছাড়া লাগোয়া চব্বিশ পরগণাতে আরো 15,000 মহিলা এই পেশায় নিযুক্ত ছিলেন। 1911 সালে কলকাতার শ্রমজীবী মহিলাদের মধ্যে 25%। এই পেশায় ব্যাপৃত ছিলেন। ওই একই সময়ে বোম্বাই (অধুনা মুম্বাইতে 30,000-40,000 মহিলা দেহব্যবসায় নিযুক্ত ছিলেন।

কারা এই পেশায় আসতেন? ভারতে কিছু জাতি ছিল যেখানে মেয়েরা এই কাজে লিপ্ত ছিলেন যাদের কথা জনগণনায় পাওয়া যায়। সাধারণভাবে বলা যায় এরা মনোরঞ্জন পেশায় থাকতেন। এই জাতের মহিলাদের নিজেদের কন্যা সন্তান না থাকলে দত্তক নিতেন বা কিনতেন। এছাড়া ছিলেন 'বেষ্ণবরা'। ঊনবিংশ শতকের সরকারী নথী এবং অন্যান্য সাহিত্যে দেখা যায় 'বৈরাগী বোষ্টমরা' বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে বেড়াতেন দলবদ্ধভাবে এবং নারী পুরুষদের মধ্যে অবাধ মেলামেশা ছিল। কখনো কখনো দেহপসারিণীরা বয়স হলে 'মন্ত্র' নিতেন। ফলে প্রায়শঃই রাষ্ট্রের চোখে 'বেশ্যা'-'বোষ্টম' সমার্থক হয়ে উঠত (দ্রষ্টব্য Module-1 Unit-3) এর বাইরে ছিলেন 'দেবদাসীরা' । মধ্যযুগে মন্দিরে নৃত্যগীতে পারদর্শী এই অংশ ঊনবিংশ এবং বিংশ শতকে ক্রমবর্ধমান হারে দেহব্যবসায় লিপ্ত হয়। বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে সমাজ সংস্কারকরা এদেরকে 'মন্দির গণিকা' বলে চিহ্নিত করেছেন। এবং তাদেরকে 'স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে দিতে চেয়েছেন।

সাধারণ গণিকাদের অবশ্য ধর্মের সাথে কোন সম্পর্ক ছিল না। 'বাল্যবিবাহ' বা 'কুলীন' প্রথার কারণে মেয়েরা অল্পবয়সে প্রচুর সংখ্যায় বিধবা হতেন। এদেরকে যে ভীষণ সামাজিক বিশ্লেষণ এর সম্মুখীন হতে হোত তার থেকে বাঁচতে অনেক ক্ষেত্রেই দেহব্যবসা ছাড়া তাদের আর কোন গত্যন্তর থাকত না। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের জীবনকাহিনী লিখে গেছেন। যেমন বিখ্যাত নটী বিনোদিনীর রচনা আমরা কথা তে এদের জীবন সম্পর্কে জানতে পারি। নট সম্রাজ্ঞী বিনোদিনীর লেখায় হতাশাই

ভেসে ওঠে। তিনিও স্বামীর প্রেম প্রত্যাশা করেছেন যদিও রক্ষিতা হওয়া ছাড়া আর কোন ভবিতব্য ছিল না।

1920 র দশকে ইউরোপীয় নারী পুরুষেরা বিভিন্ন 'নজরদারী সংস্থা' (vigilance society) তৈরী করতে থাকেন। এদের সংগৃহীত নথিতে দেহোপজীবিনীদের ব্যাপারে তথ্য লিপিবদ্ধ আছে। 1923 সালে তৈরী হয় Prostitution Act যেখানে পুরুষদের গণিকালয়ের মালিক হওয়া নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। মহিলা ও শিশুদের পাচার-এর ব্যাপারে আন্তর্জাতিক মহলে ক্রমবর্ধমান দুশ্চিন্তার মুখে 1926 এবং 1927 সালে এই আইনে কিছু পরিমার্জন করা হয়। সমস্যা দেখা দেয় এই 'পেশা নিবৃত্ত' বা ভূতপূর্ব গণিকাদের পুনর্বাসন দেওয়ার ক্ষেত্রে। চারুলতা মুখার্জী বা রমলা সিনহার মত মহিলা-যারা দেহব্যবসার অবসান চাইছিলেন তারা পুনর্বাসনের জন্য কিছু 'হোম' (Home) চালাতে শুরু করেন। কিন্তু 1930 এর দশকে অর্থনৈতিক সংকট, মহাযুদ্ধের সময় প্রচুর বিদেশী সৈন্যের আগমন এবং তেতাল্লিশের মন্বন্তর নতুন করে প্রচুর মেয়েকে এই পেশায় নিয়ে আসে।

১২.৫.১০.৪ : নারী ও সম্পত্তির অধিকার

লিঙ্গ বৈষম্যের একটি বড় কারণ হল উত্তরাধিকার বিশেষতঃ কৃষি জমির মালিকানার ক্ষেত্রে নারী ও পুরুষের আইনগত অসাম্য। যদিও স্বাধীন ভারতের সংবিধানে প্রতিশ্রুতি ছিল যে লিঙ্গের ভিত্তিতে কোনো বৈষম্য করা হবে না।

ভারতে উত্তরাধিকার ও সম্পত্তি বিষয়ে হিন্দুদের মধ্যে দুটি ব্যবস্থা চালু ছিল— (i) দায়ভাগ যার রচয়িতা জীমূতবাহন। এই ব্যবস্থা মূলতঃ বাংলা এবং আসামে চালু ছিল (ii) **মিতাক্ষরা** এর ভিত্তি ছিল **যাজ্ঞবল্ক্যস্মৃতির** উপর বিজ্ঞানেশ্বর রচিত একটি টীকাভাষ্য। বলা যায় যে সমগোত্রীয় আইনগুলির মধ্যে এই ব্যবস্থাই নারীদের ক্ষেত্রে সবচেয়ে উদার ছিল। এয়োদশ-ষোড়শ শতকের মধ্যে মিতাক্ষরা ব্যবস্থায় চারটি উপধারা তৈরী হয় যথা **মিথিলা, বোম্বাই** (ময়ুখ), **মাদ্রাজ** এবং **বেনারসের** ধারা।

মিতাক্ষরা ব্যবস্থায় মুলতঃ দুই ধরনের সম্পত্তির মধ্যে পার্থক্য করা হয়- (i) যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি (ii) পৃথক সম্পত্তি।

যৌথ পারিবারিক সম্পত্তি বলতে চার পুরুষ যাবৎ পুরুষদের এজমালি সম্পত্তি বোঝায়। কেউ তার মধ্যে পৃথক হতে চাইলে হতেই পারেন তবে বাকিরা এজমালি সম্পত্তি শরিক হিসাবেই থাকতেন। অন্যদিকে **পৃথক সম্পত্তি** বলতে বোঝায় কোনো এক ব্যক্তি যৌথ পারিবারিক সম্পত্তির ব্যতিরেকে নিজের অধ্যবসায়ে অর্জন যা করেছেন সেটা।

মিতাক্ষরা ব্যবস্থায় মহিলারা এজমালি সম্পত্তির শরিক (Co-partner) হতে পারেন না। কেবলমাত্র পরিবারে আগত বধুদের এবং অবিবাহিতা মেয়েদের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ব্যবস্থা থাকতো। তবে বিয়ের সময় খরচ এবং দানসামগ্রীও দিতে হত। পৃথক সম্পত্তির ক্ষেত্রে অবশ্য পুরুষ উত্তরাধিকারী না থাকলে

বিধবা মহিলা সম্পতির উপর 'সীমিত অধিকার (limited estate) ভোগ করতেন যদি তিনি সাধ্বী জীবন যাপন করতেন 'সীমিত অধিকার' মানে যতদিন জীবিত থাকবেন ততদিন ভোগ করবেন এবং ভীষণ প্রয়োজন ছাড়া বা দানধ্যান ছাড়া এই সম্পত্তির হাতবদল করবার অধিকারী ছিলেন না। যদি মেয়ে অধিকার পেত তাহলে তিনিও 'সীমিত অধিকার'-ই পেতেন (একমাত্র **ময়ুখ উপধারা** অনুসারে মেয়েরাও সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকার পেতেন। এছাড়া প্রাচীন শাস্ত্রে 'পুত্রিকাপুত্র' প্রথা অনুসারে পুত্র না থাকলে কন্যা সন্তানকেই পুত্রের মত নিযুক্ত করা যেত বা কন্যার পুত্রকে পিতা পুত্রবৎ মানুষ করতে পারতেন, যাতে করে বংশরক্ষা হয়। অবশ্য পরে এই প্রথা উঠে যায় কারণ পুত্রের অবর্তমানে কন্যাকেই উত্তরাধিকারী হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়।

দায়ভাগ নিয়ম অনুসারে একজন পুরুষ সম্পত্তির চূড়ান্ত অধিকারী ছিলেন। শুধুমাত্র জন্মের কারণে পুত্রের পারিবারিক সম্পত্তিতে অধিকার জন্মাতো না। পুত্র উত্তরাধিকারের কারণেও পুরো সম্পত্তি পেতেন না। পিতার মৃত্যু হলে পুত্রদের মধ্যে সমান ভাবে সম্পত্তির বাটোয়ারা হত। **দায়ভাগ** নিয়ম অনুসারে একজন বিধবা কেবলমাত্র পুরুষ উত্তরাধিকারীর অবর্তমানেই সম্পত্তি পেতে পারতেন এই শর্তে যে তিনি সতি সাধ্বী থাকবেন। সম্পত্তির উত্তরাধিকারে মা এর পরেই আসতো মেয়েদের প্রশ্ন এবং এক্ষেত্রে অবিবাহিত মেয়েরাই অগ্রাধিকার পেতেন। তবে মিতাক্ষরা আইনের বিপ্রতীপে দায়ভাগ নিয়মানুসারে পুরুষের মৃত্যু আগে যৌথ পরিবারিক সম্পত্তি ভাগ না হলে বিধবা সেই এজমালী সম্পত্তির শরিক হতে পারতেন।

দায়ভাগ এবং **মিতাক্ষরা** উভয় মতানুসারেই **স্ত্রীধন** এর মধ্য দিয়ে মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকার এর স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে তার উপর অধিকার এর রকমফের নিয়ে দুই নিয়মের মধ্যে মত পার্থক্য দেখা যায়। বিশেষতঃ স্থাবর সম্পত্তি-জমি **স্ত্রীধনে** অন্তর্ভুক্ত করা যায় কিনা এবং হলে তার উপর মেয়েদের নিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। বেশ কয়েকজন ভাষ্যকার মনে করেন যে মিতাক্ষরা মত অনুসারে স্ত্রীধনে অন্তর্ভুক্ত জমির উপর মেয়েদের চূড়ান্ত অধিকার ছিল না। এক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হল ময়ুখ (বোম্বাই) উপধারা। **দায়ভাগ** নিয়ম অনুসারে স্ত্রীধনে একমাত্র অস্থাবর সম্পত্তিতেই মেয়েদের চূড়ান্ত অধিকার বর্তাত। অর্থাৎ **মিতাক্ষরা ও দায়ভাগ** উভয় মতানুসারেই স্ত্রীধনেও জমির উপর সম্পূর্ণ মালিকানা মেয়েদের জন্মাত না।

তবে শাস্ত্রের ব্যাখ্যা এবং বাস্তবে তার প্রয়োগ এর মধ্যে স্থানগত, সমাজগত তারতম্য দেখা যায়। বিশেষতঃ দক্ষিণ ভারত এবং পশ্চিম ভারতে। তাছাড়া উচ্চবর্ণে শাস্ত্র অনেক বেশি মানা হত। নীচুজাতে ব্যতিক্রম অনেক বেশি দেখা যায়। বর্তমানে লেখমালার (inscription) এর সাক্ষ্যের ভিত্তিতে দেখা যাচ্ছে যে ভারতের দক্ষিণে ও পশ্চিমে রাজবংশের বাইরেও মহিলারা জমি ভোগ করতেন এবং মন্দিরে দান করেছেন। কিন্তু খেয়াল রাখতে হবে যে শাস্ত্রানুসারে মেয়েদের এধরনের ধর্মীয় দান ধ্যান করবার অনুমতি ছিল।

উপজাতি সমাজে বিশেষতঃ পূর্ব ও উত্তরপূর্ব ভারতের পিতৃতান্ত্রিক সমাজে স্ত্রী, কন্যা বা বিধবারা কেবল জমিতে উৎপন্ন ফসলের উপর অধিকার দাবী করতে পারতেন। তবে উত্তরপূর্ব ভারতে মেঘালয়ে

খামীদের মধ্যে বা দক্ষিণভারতে কেরালায় নায়ারদের মধ্যে মেয়েদের সম্পত্তিতে অধিকারই ছিল প্রচলিত নিয়ম।

১২.৫.১০.৫ : মুসলিম আইন

মুসলীমদের মধ্যে সম্পত্তির উত্তরাধিকার নির্ধারিত হয় **শরিয়ৎ** অনুযায়ী। **শরিয়ৎ** এর ভিত্তি হল কোরান সুন্না (নবীর আচরিত বিধি)। **ইজমা** (মুসলীম আইনজ্ঞদের মধ্যে যে সব বিষয়ে মতৈক্য স্থাপিত হয়েছে, সেগুলি) এবং কিয়াস, (পূর্বতন নজীরের ভিত্তিতে গৃহিত সিদ্ধান্ত)। ভারতবর্ষে মুসলীমদের মধ্যে উত্তরাধিকার বা ব্যক্তিগত আইনের ক্ষেত্রে প্রধানত দুটি মত চালু ছিল — **হানাফি** (সুন্নীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য) এবং **ইথনা আশারী** (শিয়াদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য)

সাধারণভাবে বলা যায় যে হানাফি মত অনুযায়ী উত্তরাধিকারীদেরকে তিনটি ভাগে ভাগ করা যায়

(i) পিতার দিককার সগোত্র যার মধ্যে মূলতঃ পুরুষ উত্তরাধিকারীরা গড়ে।

(ii) 'কোরান মোতাবেক উত্তরাধিকারী'— যার অধিকাংশই মহিলা।

(iii) 'দূরের জ্ঞাতি' (distant kindred) 'দূরের' হিসাব যতটা না রক্তের সম্পর্কে নির্ধারিত হয় তার থেকে অনেক বেশি নির্ধারিত হয় সম্পত্তিতে অধিকারের তারতম্যের নিরিখে।

সম্পত্তি ভাগের মোদ্দা নিয়মটা ছিল সম্পত্তির বেশির ভাগটাই পিতার সগোত্র পুরুষ উত্তরাধিকারীদের জন্য রেখে দিয়ে [যাদের অধিকার প্রাক ইসলামীয় উপজাতি আইনে স্বীকৃত ছিল] কোরাণের নির্দেশ মান্য করে বাকিটা কোরাণ নির্দেশিত সম্পর্কের মধ্যে বাঁটোয়ারা করা।

হানাফি নিয়ম মোতাবেক যদি কোন পিতামাতার কেবলমাত্র একটিই কন্যাসন্তান থাকে, কোরাণ মোতাবেক উত্তরাধিকারী হিসাবে (কোনও পুত্রসন্তান না থাকে) তাহলে সে সম্পত্তির অর্দ্ধেক এর উত্তরাধিকারী হবে। দুটি কন্যাসন্তান থাকলে (কোন পুত্রসন্তানের অবর্তমানে) তারা সম্মিলিত ভাবে মোট সম্পত্তির $\frac{2}{3}$ অংশের উত্তরাধিকারী হবে এবং এই অংশটি তাদের মধ্যে সমানভাবে ভাগ হবে। তবে যদি কোন সগোত্র পুরুষ উত্তরাধিকারী থাকে তবে মেয়ের মর্যাদা 'কোরান মোতাবেক উত্তরাধিকার' থেকে পরিবর্তিত হয়ে 'সগোত্র উত্তরাধিকারে' রূপান্তরিত হয় এবং তিনি ছেলের প্রাপ্ত অংশের অর্দ্ধেক এর দাবীদার হন। অন্যদিকে স্বামী স্ত্রীকে 'কোরান মোতাবেক উত্তরাধিকারী মানা হয় এবং স্ত্রী এর অবর্তমানে স্বামী তাঁর সম্পত্তির $\frac{1}{4}$ (পুত্র সন্তান থাকলে) বা $\frac{1}{2}$ (পুত্র সন্তান না থাকলে) অংশের দাবীদার হন। একই ভাবে স্ত্রী স্বামীর অবর্তমানে একই পরিস্থিতিতে সম্পত্তি $\frac{1}{8}$ বা $\frac{1}{4}$ অংশের দাবী করতে পারেন।

শিয়া নিয়ম মোতাবেক পিতার সগোত্র এবং মাতার সগোত্র উভয়েই সম্পত্তির দাবীদার থাকেন। সামগ্রিকভাবে বলা যায় যে সমস্ত ধরনের ঐশ্লামিক আইনেই মেয়েদের উত্তরাধিকার বিশেষতঃ অস্থাবর সম্পত্তির উপর অধিকার স্বীকৃতি পেয়েছে যদিও তা ছিল ছেলেদের থেকে পরিমাণে অর্ধেক।

এতদসত্ত্বেও দেখা গেছে যে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চলে চালু প্রথা অনুযায়ী শরিয়ৎ আইনের রদবদল

হত। যেমন কেরালায় মোপলা মুসলমান সম্প্রদায়গুলির মধ্যে মাতৃতান্ত্রিক উত্তরাধিকার নিয়ম চালু ছিল। (এই প্রথাকে মারুমাক্কাতায়ম বা **আলিয়সন্তান** বলা হত)। অন্যান্য এলাকায় চালু পিতৃতান্ত্রিক নিয়মের চাপে মেয়েদের অধিকার যথেষ্ট খর্ব হয়। উত্তরপশ্চিম প্রদেশগুলিতে মেয়েদের অধিকার বড়ই কম ছিল, হয় তারা উত্তরাধিকারের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত হত, নইলে খুবই কম গুরুত্ব পেত যা ইসলামের আইন অনুযায়ী ঠিক ছিল না।

১২.৫.১০.৬ : বর্তমান পরিস্থিতি

বর্তমানে সম্পত্তির অধিকার এর প্রশ্নে যে সমস্ত আইন চালু আছে তার উদ্ভবের পিছনে একটি জটিল প্রক্রিয়া ক্রিয়াশীল ছিল। ঔপনিবেশিক ও উত্তর ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র, জনগণের বিভিন্ন অংশ, তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল বিভিন্ন মতাদর্শ এবং শাস্ত্র বা আঞ্চলিক প্রথাগুলির মধ্যে মিথষ্ক্রিয়ার মধ্য দিয়েই বর্তমান আইন চালু হয়েছে।

এ প্রসঙ্গে **হিন্দু কোড বিল** নিয়ে বিতর্ক বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। বিভিন্ন নারী সংগঠন যেমন Women's Indian Association (প্রতিষ্ঠা 1917), National Council of Women in India (প্রতিষ্ঠা 1925) এবং All India Women's Conference (প্রতিষ্ঠা 1927)অনেক দিন ধরেই বিভিন্ন দাবী তুলছিলেন। Hindu Women's Right to Property Act (1937) ছিল এদের দাবী এবং রক্ষণশীলতার মধ্যে একটি সমঝোতার চেষ্টা, এতে বলা হল ঃ-

(i) মিতাক্ষরা আইন অনুযায়ী আগে যেখানে হিন্দু বিধবার স্বামী উইল করে না রেখে গেলে সম্পত্তির উপর কোন অধিকারই জন্মাত না, এই অধিকার ভোগ করতেন পুত্র এবং স্বামীর দিকের তিন পুরুষের উত্তরাধিকারী এখন তিনি পৃথক সম্পত্তিতে পুত্রের সমান অধিকার পেলেন। দায়ভাগ নিয়ম নিয়ন্ত্রিত পরিবারে বিধবা সব সম্পত্তিতেই উত্তরাধিকার পেলেন।

সম্পত্তির অধিকার -এর ক্ষেত্রে তেনি ধরণের বিধবা নির্ধারিত হল (a) মৃতের পত্নী (b) মৃতের আগে দেহান্তরিত পুত্রের বিধবা স্ত্রী (c) আগে দেহান্তরিত কোন নাতির নাতবৌ এরও অধিকার জন্মাত, তবে বিধবার ক্ষেত্রে পুনর্বিবাহ হলে আর কোন অধিকার থাকত না।

1941 সালে **রণ কমিটি** গঠিত হয় হিন্দু আইনের সামগ্রিক পুনপর্যালোচনার জন্য। নারী সংগঠনগুলি বিভিন্ন দাবী সম্বলিত দাবী সনদ কমিটির কাছে পেশ করলে রক্ষণশীলরা সোচ্চার হয়ে ওঠে। এমনকি কংগ্রেসের উচ্চতম নেতৃত্ব-বল্লভভাই প্যাটেল বা রাজেন্দ্রপ্রসাদের মত নেতারাও কমিটির সুপারিশগুলির বিরোধিতা করেন। পরিস্থিতির চাপে এমনকি জওহরলাল নেহেরুও সাময়িক ভাবে বিলটিকে ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে দেন। শেষ পর্যন্ত পাশ হয় Hindu Succession Act 1956.

এই আইনে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে ছেলে-মেয়ের সমানাধিকার এর কথা বলা হয়েছে যদিও যথেষ্ট বৈষম্য থেকেই গেল।

১২.৫.১০.৭ : খৃষ্টান আইন

খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে বাসস্থান অনুযায়ী আইন বদলায়। যেমন গোয়ার খৃষ্টানরা পর্তুগীজ দেওয়ানী বিধি দ্বারা এবং কোচিন ও ট্রাভাঙ্কোর এর খৃষ্টানদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল যথাক্রমে **কোচিন খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইন** 1921 এবং **ট্রাভাঙ্কোর খৃষ্টান উত্তরাধিকার আইন** 1916. পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং হিমাচল প্রদেশে স্থানীয় প্রচলিত প্রথা (Customary law) দ্বারা খৃষ্টানরা নিয়ন্ত্রিত হতেন।

তবে 1986 সালে একজন সিরিয় খৃষ্টান মারী রায়ের আবেদনের ভিত্তিতে উচ্চ ন্যায়ালয় এই মর্মে সিদ্ধান্ত দিয়েছেন যে ভারতীয় রাষ্ট্রের সাথে সংযুক্তির পর আর কোচিন বা ট্রাভাঙ্কোর এর পৃথক আইনের কোন অস্তিত্ব থাকতে পারেনা। শিখ, বৌদ্ধরা হিন্দু আইন মোতাবেক নিয়ন্ত্রিত আর প্রচলিত বিভিন্ন ধর্মের মধ্যে উত্তরাধিকারের প্রশ্নে পার্সীদের আইনই সবচেয়ে উদার।

১২.৫.১০.৮ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

1. Bina Agarwal;Gender & Legal Rights in Landed Property in India. N. Delhi, 1999.
2. A Field of One's Own. Cambridge University Press. 1994.

১২.৫.১০.৯ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

(১) হিন্দু শাস্ত্রে নারীদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

(২) দায়ভাগ ও মিতাক্ষরা ব্যবস্থার মধ্যে একটি তুলনামূলক আলোচনা কর।

(৩) Hindu Succession Act 1956 এর উন্মেষের পিছনে প্রগতিপন্থী এবং রক্ষণশীলদের দ্বন্দ্বের বর্ণনা দাও।

(৪) শরিয়ৎ অনুযায়ী মুসলীম মহিলাদের সম্পত্তির অধিকার সম্পর্কে একটি টীকা লেখ।

————

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

EDUCATION AND WOMEN & WOMEN'S ORGANISATIONS

নারী – শিক্ষায় ও মহিলা সংগঠনে (প্রাচীন যুগ থেকে স্বাধীনতা উত্তরকাল)

একক - ১১

(a) Ancient India

(b) Medieval India

(c) Colonial India

(d) Post Independence

বিন্যাসক্রম :

১২.৬.১১.০ : উদ্দেশ্য

১২.৬.১১.১ : প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থা

১২.৬.১১.২ : মধ্যযুগের ভারতে নারী শিক্ষা

১২.৬.১১.৩ : আধুনিক ভারতে নারী শিক্ষা

১২.৬.১১.৪ : স্বাধীনতা-উত্তরকালে নারী শিক্ষা

১২.৬.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.৬.১১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৬.১১.০ : উদ্দেশ্য

এই পর্যায়গ্রন্থটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থা -- নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিলো কিনা।

(২) মধ্যযুগের ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থা।

(৩) আধুনিক ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার প্রসার।

(৪) স্বাধীনতা-উত্তরকালে নারী শিক্ষার অগ্রগতি।

১২.৬.১১.১ : প্রাচীন ভারতবর্ষে নারী শিক্ষার অবস্থা

প্রাচীন যুগ থেকে স্বাধীনতা-উত্তর যুগ পর্যন্ত এদেশে নারী শিক্ষার বিবর্তনের ইতিহাস বেশ জটিল এবং স্বতন্ত্র আলোচনা সাপেক্ষ। নারী শিক্ষা বিষয়টি নারীর সামাজিক অবস্থানের বাইরে নয়। এমনকি এরসঙ্গে জড়িত নারীর আর্থিক সঙ্গতি এবং রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্বের প্রসঙ্গও। ভারতবর্ষের ইতিহাসে নারী পুরুষের সমানাধিকারের অবস্থান প্রায় নেই। হরপ্পা সভ্যতার বিষয়ে সাহিত্যিক উপাদানের অভাবে নিশ্চিত করে এ বিষয়ে কিছু বলা যায় না। তাই বৈদিক যুগ থেকে নারী শিক্ষা নিয়ে আলোচনা শুরু করতে হবে। কিন্তু বৈদিক যুগের সাল তারিখের প্রসঙ্গে 'পণ্ডিতেরা বিবাদ করেন লয়ে তারিখ সাল।' সে বিবাদের মধ্যে না ঢুকে আমরা বৈদিক সাহিত্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নিতে পারি। প্রথম পর্যায়, পূর্ববৈদিক যুগে যখন ঋগ্বেদ রচিত হয়েছিল --- এটিকে আমরা ঋক্‌বৈদিক যুগ নামে চিহ্নিত করতে পারি এবং দ্বিতীয় পর্যায় উত্তর বৈদিক যুগ, যখন বেদাঙ্গ ছাড়া অন্যান্য সাহিত্যের সৃষ্টি, সেই যুগকে আমরা পরবর্তী বৈদিক যুগ হিসাবে চিহ্নিত করতে পারি। ঋকবৈদিক যুগে নারী শিক্ষার প্রসারের প্রসঙ্গে বিশ্ববারা, ঘোষা, অপলা, লোপামুদ্রা, বাগাম্ভুনা ইত্যাদি অন্তত কুড়ি জন মন্ত্রদ্রষ্ট্রী নারীর নাম সর্বত্রই উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত, উপনিষদের যুগে ব্রহ্মবাদিনী গার্গী যথেষ্ঠ আত্মবিশ্বাস নিয়েই যাজ্ঞবল্ক্যের সঙ্গে বিতর্কে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং ঋষিপত্নী মৈত্রেয়ী পার্থিব সম্পদ উপেক্ষা করে 'অমৃতা' হবার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন --- এসব তথ্য যুগান্তরিত হয়ে আজও নারীকে উদ্দীপিত ও অনুপ্রাণিত করে। কিন্তু এখানেই শেষ নয়। অথর্ববেদের নির্দেশানুযায়ী ব্রহ্মচর্য পালনের মাধ্যমে যথার্থ শিক্ষা শেষেই একজন কন্যা একটি যুবককে বিবাহ করতে পারে। বৃহদারণ্যক উপনিষদে পরিবারে কাঙ্খিত সুপণ্ডিত ও দীর্ঘজীবী কন্যা লাভের জন্য পিতাকে একটি বিশেষ খাদ্যগ্রহণের পরামর্শও দেওয়া হয়েছে।

প্রসঙ্গত স্মরণীয়, ঋকবৈদিক যুগে সমাজ ছিল পশুচারণ ভিত্তিক। ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারনাটা এখানে স্পষ্ট নয়। এযুগে মানবজাতির পিতৃপুরুষরা সমবেতভাবে পূজিত হয়েছেন। পরবর্তী বৈদিক যুগে এই চিত্রটা সর্বাংশে পরিবর্তিত হয়ে যায়। এ যুগে যজ্ঞকে প্রতিষ্ঠিত করা হয়েছে সামাজিক জীবনের কেন্দ্রে। ফলে বেড়েছে যজ্ঞীয় সাহিত্যের কলেবর। এই বিরাট সাহিত্য যার মধ্যে গণিত, জ্যামিতি জ্যোর্তিবিদ্যার মত কঠিন সব বিষয়ও অন্তর্ভুক্ত ছিল তা কেবলমাত্র শুনে মুখস্ত রাখা হয়ে উঠেছিল জটিলতর। ফলে পুরোহিত শ্রেণীকে একাজে নিয়োজিত হতেই হয়। অপরপক্ষে ক্রমশই ব্যবহারিক জীবনের অন্য ধরণের নানা বিষয়ের সঙ্গে এই শাস্ত্রের যোগও ক্ষীণতর হতে থাকে। ফলে সব বর্ণের সকল মানুষ সারাজীবন এই শাস্ত্রকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখার চেষ্টায় নিয়োজিত হলে তো সমাজই অচল হয়ে যেত। ফলে বেদবিদ্যার রক্ষা ও চর্চার দায়িত্ব পুরোপুরি পুরোহিত শ্রেণীর অধীনস্থ হয়ে যায়। কৌটিল্যের তর্কশাস্ত্রে বেদবিদ্যার পাশাপাশি কৃষি, পশুপালন ও বাণিজ্যকে বিদ্যাচর্চার বিষয় হিসাবে যে উল্লেখ পাওয়া যায় সেগুলির প্রতি আগ্রহী হচ্ছিলেন অন্য বর্ণের জনগণ। ফলে একদিকে যেমন, পুরোহিত শ্রেণীর প্রচেষ্টার ফলেই প্রাচীনতম সাহিত্য উত্তরকালের মানুষের হাতে এসেছে প্রায় অবিকৃতভাবে অপরদিকে বৈদিক সাহিত্যের জটিল বিস্তৃতির এবং তাকে অবিকৃতভাবে ধরে রাখার প্রচেষ্টায় সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে তৎকালীন স্ত্রীশিক্ষা। পরবর্তী বৈদিক যুগে পারিবারিকভাবে পিতৃপূজার রীতি প্রচলিত হয়। শতপথ ব্রাহ্মণ ঘোষণা করে যে মানুষের জন্ম সূত্রে প্রাপ্ত পিতৃঋণ পরিশোধের জন্য পুত্র অনিবার্য। এই তীব্র পুত্রাকাঙ্খাই, জটিল বেদবিদ্যার অধ্যয়নে মেয়েদের ব্যাপৃত রেখে সময় নষ্ট করানোর পরিবর্তে তাদের তাড়াতাড়ি বিবাহ দেবার জন্য সমাজের আগ্রহ বাড়ায়।

এ. এস. অলটেকার -এর মতে নারী শিক্ষার অবনতির অপর একটি কারণ খৃষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে সমাজে শুদ্রাবিবাহ প্রবণতার শুরু এবং খৃষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দের মধ্যে অনার্য স্ত্রীদের সংখ্যাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজে নারীর অবস্থানের অবনতি ঘটা। কারণ বৈদিক সাহিত্যের শুদ্ধি রক্ষায় নিবেদিত প্রাণ পুরোহিত সম্প্রদায় কোনভাবেই অশুদ্ধ মন্ত্র উচ্চারণের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত ছিলেন না। অতএব প্রথমাবস্থায় তাঁরা অনার্য স্ত্রীকে স্বামীর ধর্মসঙ্গিনী হতে নিষেধ করলেন। কিন্তু রাজনৈতিক ও আর্থিক ক্ষমতার কেন্দ্রে অবস্থানকারী নরপতিদের ক্ষেত্রে তাদের কেবলমাত্র অনার্য স্ত্রীদের বাদ দেওয়া সহজ ছিল না। ফলে সকল নারীর জন্যই যজ্ঞে মন্ত্রোচ্চারণ নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়। যজ্ঞকেন্দ্রিক সমাজে নারীর মন্ত্রাধিকার চলে যাবার অর্থ শুধুমাত্র ধর্মীয় নয়, শিক্ষাগত, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অধিকারও হারানো। কারণ সঠিক মন্ত্রোচ্চারণে সক্ষমতার জন্য দীর্ঘদিন ধরে বৈদিক শিক্ষায় সুশিক্ষিতা, সবর্ণা ধর্মপত্নীই তাঁর যজ্ঞীয় অধিকারের বলে পারিবারিক ও সামাজিক মর্যাদার অধিকারী হতেন। নারীর মন্ত্রাধিকার সংক্রান্ত বিতর্কে তার অর্থনৈতিক অধিকারের প্রশ্নটি জৈমিনীয় মীমাংসা গ্রন্থে (খৃষ্টপূর্ব ৫০০-২০০) আলেচিত হয়েছে সেখানে স্পষ্ট করেই জৈমিনি রক্ষণশীল ঐতিশায়নের মত নিজস্ব জোরালো যুক্তি দ্বারা এবং প্রাচীন প্রবক্তা বাদরায়ণের প্রামাণ্যে, খণ্ডন করে তাঁর অবিচল সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত করেছেন। জৈমিনি স্পষ্ট করেই দুটি কথা বলেছেন। প্রথমত 'যজেত স্বর্গকামঃ' অর্থাৎ স্বর্গকাম ব্যক্তি যজ্ঞ করবে এই

বিধিবাক্যটিতে পুংলিঙ্গ যথার্থ নয় কারণ স্বর্গকামনা পুরুষেরই একচেটিয়া নয়, নারীরও স্বর্গকামনা স্বাভাবিক। দ্বিতীয়ত নিজস্ব ধনের প্রশ্নে এ উদাহরণ যথেষ্ট মেলে যে নারীর ধনাধিকার শ্রুতি সিদ্ধ। রামায়ণ ও মহাভারতে বিবাহিতা নারীরা স্বতন্ত্রভাবে মন্ত্রোচ্চারণ ও যজ্ঞ করেছেন এমন বহু উদাহরণ আছে। যদিও দম্পতির একত্রে যজ্ঞানুষ্ঠানই কাম্য। কৌশল্যা থেকে বালিপত্নী তারা পর্যন্ত সকল অংশের নারীই একাকী যজ্ঞানুষ্ঠান করেছেন। সীতা সন্ধ্যাকালে বৈদিকমন্ত্র উচ্চারণ করতেন। কুন্তী অর্থববেদে পারদর্শিনী ছিলেন। - এই সকল তথ্য সমাজকে প্রতিবিম্বিত করে বৈকি।

স্ত্রীশিক্ষার প্রচলনের প্রমাণ খৃষ্টপূর্ব ৬০০ থেকে ৩০০ অব্দে রচিত পাণিনির ব্যাকরণেও মেলে। ছাত্র্যাদয়ঃ কালায়াম সূত্রে পাণিনী ছাত্রীশালা অর্থাৎ ছাত্রীদের 'বোর্ডিং হাউসের' কথা বলেছেন। তাছাড়া 'আচার্যা' ও 'উপাধ্যায়' শব্দদুটি পাণিনির ব্যাকরণে উল্লেখ থাকায় স্পষ্টই বোঝা যায় সে যুগে নারীরা নিজেই শিক্ষকতা করতেন। মন্ত্রোচ্চারণে অশুদ্ধি বিষয়ে পুরোহিতদের ভীতিই যে সাধারণ নারীকে বৈদিক শিক্ষার অঙ্গণ থেকে বহিষ্কৃত করেছিল তার প্রমাণ অন্য গ্রন্থ থেকেও বোঝা যায়। উত্তরকালীন হারীতস্মৃতি গ্রন্থে ব্রহ্ম বাদিনী ও সদ্যবধূ এই দুধরনের নারীর উল্লেখ তাৎপর্যময়। ব্রহ্ম বাদিনী নারীরা অবিবাহিতা কন্যারূপে নিজগৃহে থাকতেন এবং যাবতীয় বিদ্যাচর্চা তথা বেদাধ্যয়ন করতেন। কিন্তু গার্হস্থ্য জীবনের সকল জীবন আবর্তিত হয় এবং গার্হস্থ্য জীবনের সকল কর্তব্যকর্মই গৃহপতি ও গৃহিনী মিলিতভাবে সুষ্ঠু ও সুচারুরূপে সম্পন্ন করবেন বলেই শাস্ত্রের বিধান ছিল; তবু গৃহিনী সকলের সুখদর্শিকা 'সম্রাজ্ঞী'। সুতরাং এই 'সম্রাজ্ঞী নারীর' পারিবারিক ও সামাজিক কর্তব্য পালনে একনিষ্ঠ অভিনিবেশ অবশ্য প্রয়োজন। সুতরাং অপর তিনটি আশ্রমের প্রতিপালক এবং প্রাত্যহিক সাংসারিক যাবতীয় কর্তব্য পালনের সঙ্গে বিদ্যার্জনের জন্য যে দীর্ঘ সময়, মনোনিবেশ ও শ্রম স্বীকার প্রয়োজন তাও করা একজন নারীর পক্ষে অসম্ভব ছিল। অতএব সদ্যবধূদের বিদ্যাচর্চা থেকে অব্যহতি দেওয়া হত। গৃহস্থশ্রমের সুস্থিতি যাঁদের উপর নির্ভরশীল নয় সেই ব্রহ্মবাদিনী তপস্বিনীর বিদ্যাচর্চায় পুরোপুরি মনোনিবেশ করতেন। এঁরা সামাজিক সম্মানও পেতেন এবং বিদ্যাচর্চার জন্য একা দীর্ঘ পথ ভ্রমণও করতেন। তার জন্য কোন সামাজিক বাধা তাঁরা পেতেন না। সাহিত্যে এর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন ভবভূতির 'উত্তররাম চরিত' নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে আত্রেয়ী নামের এক ব্রহ্মচারিণী বাল্মীকি মুনির আশ্রয় ছেড়ে একাই সুদূর অগস্ত্যমুনির আশ্রমে উপস্থিত হয়েছিলেন বেদান্ত শিক্ষার জন্য। কারণ তিনি নিজেই জানিয়েছিলেন বাল্মীকির আশ্রমে লব ও কুশ নামে দুটি অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র আসায় ঋষির মনোযোগ তাদের দিকেই গেছে। ফলে তাঁর পড়াশুনা ভালো হচ্ছিল না। লক্ষ্যণীয় অষ্টম শতাব্দীর কবি ভবভূতির বাল্মীকির আশ্রমে সহসিক্ষার কল্পনা করতে পেরেছিলেন। কেবলমাত্র 'উত্তররাম চরিত'ই নয় ভবভূতি তাঁর 'মালতীমাধব' নাটকেও কামন্দকী নামের বৌদ্ধ শ্রমণীর চরিত্র অঙ্কন করেছিলেন যিনি শিক্ষাকেন্দ্রে শিক্ষালাভের সময় বিভিন্ন জায়গার ছাত্রদের সাহচর্য পেয়েছিলেন। শ্রমণা কামন্দকী কেবলমাত্র ভবভূতির সৃষ্টিই নন। বস্তুতপক্ষে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও বুদ্ধশিষ্য আনন্দের প্রেরণায় এবং বুদ্ধের নিরুৎসাহ সমর্থনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ভিক্ষুণী সংঘ। এই ভিক্ষুণী সংঘ শুধুমাত্র শিক্ষাকেন্দ্রই ছিল না মহত্বপূর্ণ

সামাজিক সংস্থায় তা রূপান্তরিত হয়েছিল। এই সংস্থার আশ্রয়ে কিছু নারী স্বতন্ত্র চিন্তার সুযোগ এবং নিজ মতামত ব্যক্ত করার সুযোগ পেয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে রাজপরিবারের ও ধনী ব্যাপারী কুলের সাধারণ গৃহিনী, বণিতা, এবং সর্বনিম্নস্তরের দাসীদের সঙ্গে ভিক্ষুণী সংঘের বিশেষ সদস্য ঘেরি, স্থবির ও প্রবীণারূপে স্বীকৃত যাঁরা তারাও থাকতেন। এই ভিক্ষুণী সংঘের এই বিশেষ সদস্যদের রচনা সপ্তম শতাব্দীতে সংকলিত হয় 'থেরিকাথা' নামে। সঙ্গে ছিল এক ভাষ্য যাতে ভিক্ষুণীদের বিবরণ উদ্ধৃত হয়। এথেকে জানা যায় যে থেরিয়া ছিলেন বিভিন্ন শ্রেণীর এবং অনেকেই বুদ্ধের জন্মস্থান শাক্য গণরাজ্যে ছিলেন। এই থেরিকাথা সপ্তম শতাব্দীতে সংকলিত হলেও এর অনেক রচনাই যথেষ্ট প্রাচীন। এই রচনাগুলিতে নির্বান লাভের প্রচেষ্টা ও সাফল্যের মত বিষয়ও বর্ণিত হয়েছে সহজ, সরল, স্পষ্ট ও ভাবাবেগপূর্ণভাবে। উদাহরণ হিসাবে দাসি পুন্নার রচনার উল্লেখ করা যায়। ভাষ্য থেকে জানা যায় যে ভিক্ষুণী হবার আগে পুন্না ছিলেন দাসি। তাঁর রচনাটি সংলাপের আকারে। সংলাপটি ছিল নদীতীরে গার্হস্থ্য কর্মের জন্য জল নিতে আসা পুন্না এবং নদীতে স্নান করে পুণ্য অর্জন করতে আসা ব্রাহ্মণের মধ্যে। পুন্না ব্রাহ্মণকে বিদ্রূপ করে বলেন নদীতে স্নানের দ্বারাই যদি পুণ্য অর্জন সম্ভব হয় তাহলে নদীতে সদা নিমগ্ন মাছ ও কচ্ছপ অনায়াসেই মোক্ষ লাভ করতে পারে। তাছাড়া জলের যদি পাপ ধৌত করার ক্ষমতা থাকে তবে অর্জিত পুণ্যও জলস্রোতে ভেসে যেতে পারে। অতত্রব শীতে শারীরিক ক্লেশ স্বীকার না করে পুণ্য প্রাপ্তি অন্য উপায়ে প্রয়োজন। নিরুত্তর ব্রাহ্মণ পুন্নার যুক্তি স্বীকার করে বৌদ্ধ সংঘে যোগ দেন। লক্ষ্যণীয়, পুন্নার যুক্তি স্পষ্ট কিন্তু কোন জটিল শাস্ত্র চর্চার প্রচেষ্টা নেই। আছে অনুভব ও বাস্তব সাধারণজ্ঞানের প্রভাব।

সুতরাং বৌদ্ধ ভিক্ষুণী সংঘ স্থাপিত হওয়ার পর নারীদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার, শাস্ত্র চর্চা ও সদধর্মের অনুশীলনে কৃতিত্ব প্রতিষ্ঠাই শুধু নয় নিজস্ব রচনাশৈলীর উন্নতির সুযোগ সৃষ্টি হয়। এমনকি বিশাখার মত ধনী শ্রেষ্ঠা পরিবারের মেয়েরা নানাবিদ্যায় পারদর্শিনী ছিলেন। বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধ-হিন্দু নির্বিশেষে রাজকুল ও অভিজাত পরিবারের এবং পণ্ডিত বংশের নারীরা বিদ্যার্জনের সুযোগ পেতেন। বিবাহের পরেও কেউ কেউ বিদ্যাচর্চা বজায় রেখেছিলেন। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে হাল রচিত 'গাথাসপ্তশতী' থেকে নবম শতকের রাজশেখরের রচনা পর্যন্ত বহু নারী কবির নাম পাওয়া যায়। শীলভট্টারিকাকে রাজশেখর বাণভট্টের সঙ্গে তুলনা করেছেন। কর্ণাটের মহিলা কবি বিজয়াংকার প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে রাজশেখর মন্তব্য করেছেন—শ্যামাবর্ণা বিজয়ংকাকে জানতেন না বলেই দন্ডী তাঁর কাব্যাদর্শ গ্রন্থে সরস্বতী সর্বশুক্লা বলে বর্ণনা করেছেন। বিবাহিতা হয়েও বিদ্যাচর্চা বজায় রেখেছিলেন এমন নারীদের মধ্যে উভয় ভারতীয় নাম অবশ্য উল্লেখ্য। বেদান্ত ও মীমাংসা শাস্ত্রের দুই দিকপাল শংকরাচার্য ও মান্তন মিশ্রের বিতর্কে মান্তন মিশ্রের পত্নী হয়েও উভয়ভারতী পক্ষপাতহীনভাবে যোগ্যতার সঙ্গে মধ্যস্থতা করেছিলেন। কিন্তু কেবলমাত্র শাস্ত্রচর্চার ক্ষেত্রেই নয়, প্রাচীন ভারতীয় নারীর সাহস, বীর্য ও বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যার প্রয়োগেও পিছপা ছিলেন না। অন্ধ্র, বাকাটক, কাশ্মীর, চালুক্যরাজ্যের রাণীদের অস্ত্রনৈপুণ্য ও শাসনদক্ষতা ঐতিহাসিক সত্য। একথাও মনে রাখা প্রয়োজন যে এইসব উচ্চ বংশীয়া

নারীদের ক্ষেত্রে গৌরীদানও হয়নি। সংস্কৃত সাহিত্যেও দেখা যায় কোনও নায়িকারই শৈশবে বিবাহ হয়নি। নাচ, গান, ছবি আঁকা, কাব্যপাঠে তাঁরা পারদর্শিতাও অর্জন করেছিলেন।

সাধারণ নারীদের ক্ষেত্রে শিক্ষার দরজা বন্ধ থাকার অন্যতম প্রধান কারণ অবশ্যই বাল্যবিবাহ এবং পুরুষদের বহু বিবাহের প্রথা। সংসারের দায়িত্বে বদ্ধ নারী, সংসারে প্রত্যক্ষভাবে কাজে লাগে না, এমন বিদ্যাচর্চার সুযোগ পায়নি। অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাদপদ পরিবারে বধূর জন্য শিক্ষাখাতে খরচ করার প্রশ্নই ওঠেনি। পুরুষের বহু বিবাহ কেবলমাত্র যে অসবর্ণ বিবাহের সংখ্যা বৃদ্ধি করেছে তাই নয় অগণিত নিরক্ষর বালবিধবারও সৃষ্টি করেছে। এদের সুরক্ষার জন্য এককভাবে নারীর উপরই বর্তেছে কঠোর ব্রহ্মচর্যের বিধান। পুরুষ শাসিত সমাজ আর্থিকভাবে সক্ষম পুরুষজাতিকে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেনি কিংবা চায়ওনি। 'সতী' শব্দের কোন পুংলিঙ্গ শব্দই কোনদিন তৈরী হয়নি। সুতরাং সহজাত জ্ঞান-বুদ্ধি থাকা সত্ত্বেও কেবলমাত্র শাস্ত্র অধ্যয়নে অধিকার না থাকার জন্য সাধারণ নারীর পক্ষে শাস্ত্র নির্ভর কর্তব্য ও অকর্তব্য নিরূপণ করা সম্ভব নয় বলেই সমাজে তাদের স্বাধীনতার অভাব রয়েছে—নবম শতাব্দীর দেহলিতে দাঁড়িয়ে এই মর্মান্তিক সত্য উপলব্ধি করা সত্ত্বেও এর কোনও প্রতিকার করা শাস্ত্রকারদের পক্ষে সম্ভব হয়নি।

সুতরাং প্রাচীন ভারতে নারীদের সংগঠন হিসাবে আলাদাভাবে কিছু খুঁজে পাওয়া অসম্ভব। যদিও ঋক বৈদিক যুগে সাধারণ সংগঠন 'সভা' ও 'সমিতি'তে নারীরাও অংশগ্রহণ করতেন। সমাজের উচ্চাংশের নারীরা ক্রমেই পুরুষাধীন হয়ে পড়ায় তাঁদের জীবন ধারণের জন্য অর্থ উপার্জনের পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। কিন্তু অপেক্ষাকৃত নিম্নাংশের মেয়েদের অর্থনৈতিকভাবে স্বনির্ভরতা বজায় ছিল। পরিবারের অর্থনৈতিক সংকট মোচনের জন্যই যেহেতু সেটা প্রয়োজনীয় ছিল তাই সেখানে সামাজিক বাধা তেমন ছিল না। এছাড়া এই অংশের নারীদের এক বড় অংশ দাসীবৃত্তির সঙ্গেও যুক্ত ছিল যাদের স্বাধীনতা প্রধানতই নির্ভর করত তাদের প্রভুদের দয়া ও মানসিক উৎকর্ষের উপর। এই ধরনের স্বনির্ভর মেয়েরা সংশ্লিষ্ট কর্ম জগতের সংগঠন যেমন গিল্ড ইত্যাদির সঙ্গে অবশ্যই অনিবার্যভাবেই যুক্ত থাকতো।

১২.৬.১১.২ : মধ্যযুগের ভারতে নারী শিক্ষা

পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে সমাজে নারীর যে অবস্থানগত অবনতির শুরু হয়েছিল ক্রমশই তা বৃদ্ধি পেয়েছিল আমরা তা দেখলাম। অবশ্য ই. বি. হরনার দেখিয়েছেন যে বৌদ্ধ যুগের আগমনের সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশ সমাজে নারীর অবস্থান সম্মানজনক জায়গায় শ্লথগতিতে হলেও যাচ্ছিল। কিন্তু মধ্যযুগ অর্থাৎ ইসলাম আগমনের পর মেয়েদের জন্য বিশেষত উচ্চাংশের মেয়েদের জন্য পর্দা প্রথা প্রবলতর রূপ পরিগ্রহ করে। ইসলাম ধর্মাবলম্বী এবং অ-ইসলাম জনগোষ্ঠী—উভয় ক্ষেত্রের নারীরাই এর শিকার হন। ফলে কার্যত শিক্ষার অঙ্গণ থেকে তারা দূরে - বহু দূরে নির্বাসিতের জীবন যাপন করেন। ইসলাম

ধর্মের নিয়মানুযায়ী বিশুর ৪ বছর, ৪ মাস, ৪ দিন বয়সের দিনে উদ্‌যাপিত হয় বিসমিল্লা অনুষ্ঠান। অর্থাৎ সেদিন সে প্রথম পবিত্র কোরানের শ্লোক আবৃত্তি করে এবং তার বিদ্যাচর্চার শুভ সূচনা হয়। এই পর্বে গৃহে এসে শিক্ষক বা 'ওস্তাদ' শিশুকে কোরান শরিফ মুখস্থ করাতে শুরু করেন। মেয়েরাও একই প্রথায় ঐ দিন পাঠাভ্যাস শুরু করেন কেশ বৃদ্ধ ওস্তাদ অথবা মহিলা শিক্ষক বা ওস্তানীর কাছে। এই সময় আরবি ভাষায় তারা কোরান আবৃত্তি করতে শেখে কিন্তু তার অর্থ বোঝে - এমন কোন গ্যারান্টি বা নিশ্চয়তা থাকে না। শিক্ষক বা শিক্ষিকার নিজের জ্ঞানের উপর নির্ভর করে যে তিনি কোরানের যে শ্লোকগুলি আবৃত্ত করাচ্ছেন তার অর্থ শিশুটিকে বলবেন কিনা বা কতটা বলবেন। ছেলে মেয়েদের এই পর্বে আরবি ভাষায় পবিত্র গ্রন্থ এবং পার্সী ভাষায় কিছু সাধারণ জ্ঞান এবং নীতিকথা শিক্ষামূলক গল্প কবিতা শেখানো হয়। গৃহের শিক্ষা শেষে ছেলেরা মন্তব্যে বা মৌলভীর গৃহে বিদ্যাচর্চার জন্য যায় কিন্তু মেয়েরা একটু বড় হলেই পর্দা প্রথায় গৃহে আবদ্ধ হয়ে পড়ে বলে বাইরে শিক্ষার জন্য যেতে পারে না। এবং শুরুতে বৃদ্ধ শিক্ষকের কাছে পাঠ শুরু করলেও অল্পদিন পরেই মেয়েদের জন্য বাড়ীতে ওস্তানীরা আসতেন। এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রের এঁদের জ্ঞান কোরানের নির্দিষ্ট কয়েকটি অংশের আবৃত্তিতে সীমাবদ্ধ থাকতো। ফলে মেয়েরা যদিও বা অল্প বিস্তর পড়তে শেখে কিন্তু মোটেই লিখতে শেখে না। প্রথম যে মুসলিম বালিকা বিদ্যালয়ের কথা জানা যায় তা মধ্যযুগের ঘটনা নয়, (১৮৪৫ সালে) অবশ্যই সরকারী উদ্যোগে, এবং দিল্লীতে অবস্থিত ছিল মোট ৬টি বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৪৬ জন। দিল্লীর একটি বিশেষ অঞ্চলে পাঞ্জাবী মহিলাদের দ্বারা এই বিদ্যালয়গুলি পরিচালিত হয়েছে এবং মূলত তাঁদের মেয়েরাই এখানে পড়েছে। খুবই স্বল্প সংখ্যক মহিলা বা একেবারে উচ্চ বংশীয়াদের কেউ কেউ মধ্যযুগেও শিক্ষার সুযোগ পেয়েছিলেন বটে কিন্তু সেগুলি ব্যতিক্রমী চরিত্র ও ঘটনা। কিন্তু নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে একটু অন্য কাহিনী শোনা যাবে মুঘল ভারতের জীবন-যাপনে।

মুঘল যুগের শিক্ষা ব্যবস্থায় দুধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা ছিল। একটি আরবি-ফারসি শিক্ষা ব্যবস্থা, অন্যটি সংস্কৃত শিক্ষা ব্যবস্থা যার মধ্যে দ্রাবিড় শিক্ষা-পদ্ধতি পড়তো। আরবি-ফারসি শিক্ষা ব্যবস্থা ত্রিস্তর ব্যবস্থা যার প্রথম স্তর মন্তব্য বা দবিস্তান যেখানে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়া হত। দ্বিতীয় স্তরটি হল মাদ্রাসা যেখানে সামান্য উচ্চশিক্ষা কিন্তু মূলত ধর্মীয় শিক্ষা দেওয়া হত। এবং উচ্চ শিক্ষার অর্থাৎ ইনশারা ও সিয়াক লিখন শিক্ষা, হিসাবশাস্ত্র, ফরমান, নানাবিধ হুকুমের মুসাবিদা করা—ইত্যাদি বিষয় অর্থাৎ আমলা হবার জন্য যা লাগত সেগুলি শেখানো হত ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠানে। নারীরা যেহেতু আমলা হতেন না এবং এই স্তরের শিক্ষার জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির গৃহে যেতে হত অতএব উচ্চশিক্ষার প্রয়োজনও তাঁদের হত না এবং উচ্চ শিক্ষার অঙ্গণে মুঘল যুগেও নারীদের অবস্থান ছিল না। কিন্তু প্রাথমিক শিক্ষা অর্থাৎ মন্তব্য স্তরে ছাত্রীদের সংখ্যা ছাত্রদের চেয়ে বেশী ছিল—এমন প্রমাণ যথেষ্ট বলে জানিয়েছেন শিরিন মুসভি। ১৪৬৮-৬৯সাল নাগাদ রচিত একটি শব্দার্থকোষে মিস্তাউল ফজলব শাহদাবাদীতে মুদ্রিত একটি ক্ষুদ্র চিত্রের সাক্ষ্যে এও বোঝা যায় যে মন্তব্য ছাত্রের পাশে বসে ছাত্রীও কাষ্ঠখনেঢ (অয়তি) লিখতে শিখছে উল্টোদিকে বসা জনৈক পুরুষ শিক্ষকের কাছ থেকে। ডঃ মুসভি এ প্রসঙ্গে দুটি গুরুত্বপূর্ণ কথা

বলেছেন। প্রথমটি হল "বালিকাটি নিশ্চিতভাবেই আরবি লিখতে চেষ্টা করছিল না, হয় ফারসি অথবা সে যুগের কোন ভাষা লিখতে চাইছিল।" অর্থাৎ মুলমানদের মধ্যে নারীদের লিখতে শেখা নিষিদ্ধ বলে যে সাধারণ ধারনা প্রচলিত আছে তা সঠিক নয়। এবং দ্বিতীয়টি হচ্ছে, চিত্রের "বালিকাটি শাহজাদী নয়, মধ্যশ্রেণীর মেয়ে।" শাহজাদীদের মধ্যে অনেকেই যথেষ্ট শিক্ষিতা ছিলেন—একথা সবারই জানা। কিন্তু এ প্রসঙ্গে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার উল্লেখ প্রয়োজনীয়। হুমায়ুন-কন্যা গুলবদন বেগম যে কেবল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতিকথা লিখেছিলেন তাই-ই নয় তাঁর একটি অসাধারণ সমৃদ্ধ গ্রন্থাগার ছিল যেটি রাজকীয় গ্রন্থাগারের চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। এবং সে যুগে নিয়ম ছিল প্রত্যেকের প্রতিটি গ্রন্থের দুটি করে কপি তাঁকে পাঠাতে হত। একটি তাঁর নিজের পড়ার জন্য, অন্যটি সাধারণের ব্যবহার্যে গ্রন্থাগারে রাখার জন্য।" এ থেকে বোঝা যায় যে তিনি নিজেই কেবলমাত্র বিদ্যোৎসাহী ছিলেন তাই নয়, সর্বজনের মধ্যে বিদ্যা তথা জ্ঞানচর্চায় উদ্যোগী ছিলেন। তাঁর জীবনের আরও একটি কৌতূহলপ্রদ বিষয় হচ্ছে এমন একজন রুচিশীলা, অতি শিক্ষিতা, সাহিত্যপ্রেমী শাহজাদীর স্বামী খুব ভালো সৈনিক হলেও নিরক্ষর ছিলেন। এই যুগে উস্তানীরা মধ্য বা উচ্চমধ্য শ্রেণীর বালিকাদের গৃহে গিয়ে শিক্ষা দিতেন কিন্তু সাধারণ শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যে প্রাথমিক শিক্ষার এবং কাব্য ও কলাবিদ্যা চর্চার প্রচলন ছিল। কোরান পাঠ যেহেতু পবিত্র কাজ তাই তা সকল শ্রেণীর নারীর জন্যই অবশ্য করণীয় বলে বিবেচ্য হয়েছে।

মুঘলযুগের মহিলারা প্রধানতই কবি ও চিত্রকর হতেন। এক্ষেত্রেও বদায়ুনী ও আবুল ফজলের রচনা থেকে জানা যায় যে সমাজের সব শ্রেণীর মহিলাদের মধ্যেই এই গুণ ছিল। এমনকি বদায়ুনী যাঁকে সকল মহিলা কবির মধ্যে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলেন এবং তাঁর রচনা থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন সেই নেহানি একদম সাধারণ পরিবার থেকেই এসেছিলেন। মুঘল যুগে বহু নারীই আপন স্বাক্ষর বিশিষ্ট ছবি রেখে গেছেন। যাঁদের মধ্যে অন্যতম নাদরা বানু যাঁর আঁকা অনেক ছবিই জাহাঙ্গীরের খুবই বিখ্যাত আতেলিয়ার-এ রয়েছে।

মুঘলযুগে বিশেষত গুজরাট ও পশ্চিমাঞ্চলে মহিলারা আইনি ব্যক্তি হিসাবে কাজ করেছেন। অর্থাৎ তাঁরা সম্পত্তি কেনা-বেচা, বন্ধক রাখা ইত্যাদি তো করেইছেন, এমনকি সম্পত্তিকেন্দ্রিক বিবাদে কাজীর সামনে নিজেরাই আত্মপক্ষ সমর্থন করেছেন। অতএব তাঁরা নিজেদের মান দস্তখত করেছেন এবং ক্ষেত্র বিশেষে সাক্ষী হিসাবেও দস্তখত করেছেন। কোন কোন ব্যবসা সংক্রান্ত বিবাদের নথি থেকে এমনও জানা যায় যে স্বামীর মৃত্যুর পর তার কোন অনুচর ব্যবসাটি হাতাতে চাইলে স্ত্রী ব্যবসাটিতে তাঁর অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চাইছেন কারণ তিনি শিক্ষিত এবং বিদেশের ব্যবসা চালানোর কাজে পুরোপুরি দক্ষ। এলাহাবাদ, বিলগ্রাম ও অন্যান্য স্থান থেকেও প্রাপ্ত নথিতে মুসলমান নারীদের ভূমিদান গ্রহণের প্রমাণও পাওয়া যায়। শিরিন মুসভি আরও একটি কৌতূহলোদ্দীপক বিষয়ের উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন, "জাহাঙ্গীর একজন মহিলাকে সমস্ত মদদ-ই-মাশ জমি বা ভূমিদানের তত্ত্বাবধায়ক করেছিলেন, শুধু দান প্রক্রিয়ার দেখভালের জন্য নয়, দানযোগ্য ব্যক্তিদের মনোনয়নের জন্যও। এরকম একজন মহিলা কোনোভাবেই নিরক্ষর হতে পারেন না। তিনি যখন নথিপত্রের প্রক্রিয়াকরণ করছেন তখন তিনি

নিশ্চয় হিসাবশাস্ত্র জানেন। তিনি কোন শাহজাদী নন, অভিজাত গোষ্ঠী থেকে আসেননি, সম্ভবত তিনি ছিলেন একজন অমুসলমান যিনি এসেছিলেন কায়স্থ পরিবার থেকে।" এই ধারা ভবিষ্যতেও প্রবাহিত হয়েছিল তার প্রমাণ মেলে ১৮২৩ সালের সিন্ধের একটি আদমশুমারী থেকে। এই সূত্রে জানা যায় যে বেশ কিছু নারী সিন্ধি লিখতে ও পড়তে পারেন। যদিও তারা ফারসী পড়তে বা লিখতে পারেন না। বস্তুতপক্ষে, সিন্ধিলিপি আরবি লিপি হওয়ায় সিন্ধি লিপি জানলে কোরানের আঘাত পড়া সম্ভব ছিল। এছাড়া ১৯শ শতকের মালাবারে ৩১৯৬ মুসলমান পুরুষ পিছু ১১২২ জন মুসলমান বালিকা বিদ্যালয়ে যেত অর্থাৎ স্বাক্ষর। সুতরাং মুসলমান পুরুষদের তুলনায় মুসলমান নারীদের মধ্যে সাক্ষরতার হার ৩৫শতাংশ। দক্ষিণভারতে দেবদাসীদের সাক্ষর হওয়া আবশ্যক ছিল। আবার ১৮২৩ সালে বিশাখাপত্তনমে ৯৪জন ব্রাহ্মণ ও ৭০ জন শূদ্র নারী বিদ্যালয়ে যেতেন। অর্থাৎ বুকাননের যে বক্তব্য ছিল যে উচ্চশ্রেণীর নারীদের মধ্যে শিক্ষার ক্ষেত্রে বাধা ছিল কিন্তু নিম্নবর্ণের নারীরা শিক্ষার বাইরে ছিলেন না—তা এক্ষেত্রে প্রযোজ্য ছিল না। তেমনি এমন বিবাদের নথিও রয়েছে যাতে বোঝা যাচ্ছে বহু ক্ষেত্রে গ্রামীণ জমিদার যা অন্য পদমর্যাদার মহিলারা যুক্ত হচ্ছেন যাঁরা নিশ্চিতভাবেই নিরক্ষর ছিলেন। কাজেই এই মহিলাদের জমি ছিল, তাঁরা আইনী অধিকার সম্পন্ন ছিলেন, সম্পত্তির অংশভাগ দাবী করতেন, নিজেরা কাজীর সামনে হাজির হয়ে নিজেরাই নিজেদের প্রতিনিধিত্ব করতেন—অথচ তাঁরা ছিলেন নিরক্ষর। অর্থাৎ মুঘল যুগে সর্বত্র এবং সব সময় নারীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার হয়েছিল এমন সার্বিক ঘটনা প্রমাণ করা যাবে না। এক এক সময়ে এক এক অংশে নারী শিক্ষার এক এক প্রকার চিত্র ছিল।

১২.৬.১১.৩ : আধুনিক ভারতে নারী শিক্ষা

অষ্টাদশ শতক সামগ্রিকভাবেই এক সংকটের কাল। নারী শিক্ষা তো বটেই সমগ্র শিক্ষা ব্যবস্থাই এই শতাব্দীতে তার নিজস্ব রূপকে ধরে রাখতে ব্যর্থ। সুতরাং উচ্চবর্গের কিছু মহিলা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষালাভ করলেও সামগ্রিকভাবে মহিলাদের বিধির বিধান ছিল অশিক্ষা। সীমিত ক্ষেত্র ছাড়া সম্পত্তির অধিকার, নিজেদের শরীর ও মনের উপর অধিকারসহ যাবতীয় মৌলিক অধিকার থেকেই নারীজাতি ছিল বঞ্চিত। সামাজিক অধিকার থেকে দূরে থাকার কারণেই অর্থনৈতিক বৈষম্য ব্যতিরেকে সমাজের সব শ্রেণীতেই বলবৎ ছিল নারী ও পুরুষের আরও এক শ্রেণী-বৈষম্য। যত সংকীর্ণ স্বার্থ এবং পরিসরেই হোক না কেন, একথা অনস্বীকার্য যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা তথা ভারতের এই অচলায়তনে, প্রথম আঘাত হানে ইস্ট ইন্ডিয়ার কোম্পানীর শাসন। কোম্পানীর শাসকরাও কিন্তু শাসনের প্রথম দিকে বেশ দীর্ঘকালই নারী শিক্ষার বিষয়ে মৌন থেকেছেন। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের গোড়ার দিকে কোম্পানী পরিচালিত দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ কলকাতা মাদ্রাসা ও সংস্কৃত কলেজ যথেষ্ট রক্ষণশীল। ফলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দুটিই স্ত্রী শিক্ষার বিরোধী। রেভারেন্ড উইলিয়াম অ্যাডামের শিক্ষা সংক্রান্ত বিখ্যাত রিপোর্টে

স্ত্রী শিক্ষার এক করুণ চিত্র উল্লেখিত। অ্যাডাম স্পষ্টই বলেছেন যে রাণী ভবানীর মত বিচক্ষণ মহিলার নেতৃত্বাধীন অঞ্চলেও পাঁচ থেকে চোদ্দ বছর বয়সী সমস্ত মেয়েরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিতই নন, এমনকি অকাল বৈধব্যের কুসংস্কারের জালে জড়িত অভিভাবকরা কন্যাদের শিক্ষার কথা চিন্তাও করেন না। এদেশের শিক্ষা বিষয়ক নীতি নির্ধারক ও অতি গুরুত্বপূর্ণ, কালজয়ী, মেকলের প্রস্তাবেও, অ্যাডামের রিপোর্ট সামনে থাকা সত্ত্বেও স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে একটি শব্দও উল্লেখিত হয়নি। শাসক হিসাবে কোম্পানীর স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে এই নির্লিপ্ত নির্বিকার মনোভাব এক প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিরোধের দৃষ্টান্ত। এর প্রমাণ ব্যবহারিকক্ষেত্রেও পাওয়া যায়। দেখা যায়, ১৮৪৫ সালে উত্তরপাড়ার জমিদারদ্বয় জয়কৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে একটি মহিলা বিদ্যালয় খুলতে চেয়ে এবং তার অর্ধেক ব্যয় সরকারকে বহনের দায়িত্ব গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে, অনুমতি প্রার্থনা করেন। কাউন্সিল অব এডুকেশানের কাছে জন ড্রিঙ্কওয়াটার বেথুন কাউন্সিলের উক্ত সভার সভাপতি হিসাবে কাউন্সিলকে বিষয়টি অনুমোদনের জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও আর্থিক সংকটের যুক্তিতে প্রস্তাবটি নাকচ করে দেওয়া হয়। এই ঘটনার পরেই বেথুন নিজে উদ্যোগী হন। এবং লক্ষ্যণীয় নিজে উচ্চপদস্থ সরকারী ব্যক্তিত্ব হওয়া সত্ত্বেও বেথুন কোন সরকারী সাহায্য না নিয়ে দেশীয় প্রগতিশীল ভদ্রলোকদের সহায়তায় ১৮৪৯ সালের ৭ই মে প্রথম মহিলা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর ১৫দিন পরেই বাড়ীতে একটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। এর পরপরই সুখসাগর, উত্তরপাড়া ইত্যাদি জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা ও বারাসাতে মহিলা বিদ্যালয় পুনর্গঠন ইত্যাদি হতে থাকে। কিন্তু এই বিদ্যালয়গুলোর কোনটিই স্থানীয় জনগণের বিরোধিতা ও সরকারী নিষ্ক্রিয়তার কারণে স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। কিন্তু বেথুন লর্ড ডালহৌসিকে লেখা এক বিখ্যাত চিঠিতে এই সব বিদ্যালয়গুলির প্রতি সরকারী মনোযোগের আবেদন জানিয়েছিলেন। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১১ এপ্রিল ১৮৫০ দিনাঙ্কিত একটি সরকারী আদেশনামাও প্রকাশিত হয়। ১৮৫১ সালের ১২ আগস্ট বেথুনের অকাল প্রয়াণ হলে লর্ড ডালহৌসীর উদ্যোগে কোর্ট অব ডিরেক্টরস্ বেথুন প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টিকে অধিগ্রহণ করে। বেথুন নামাঙ্কিত হয়ে এটিই হয় এদেশের প্রথম সরকার পরিচালিত বালিকা বিদ্যালয়। কিন্তু মনে রাখা প্রয়োজন এর বহু আগে এদেশের পুরুষদের শিক্ষার অনেক অগ্রগতিই সরকারী উদ্যোগে ঘটে গেছে। নারী পুরুষের শিক্ষায় সরকারের এই বৈষম্যবাদী নীতি গ্রহণের বহু রৈখিক ও বহুমাত্রিক কারণ অবশ্যই ছিল।

কিন্তু এত সব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও স্ত্রীশিক্ষার বিষয়টি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে অন্তত একেবারে থেমে থাকেনি। এক্ষেত্রে পথিকৃতের ভূমিকা নিয়েছিলেন খৃস্টান মিশনারীরা। তাঁদের উদ্দেশ্য খৃষ্টান ধর্মের প্রতি আগ্রহী করা হলেও একথাও অনস্বীকার্য যে তাঁরাই কোন প্রকার সরকারী সাহায্য ব্যতিরেক ব্যক্তিগত উদ্যোগে কলকাতা ও শহরতলীর নানা জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে নারী শিক্ষার বিস্তারের কাজ শুরু করেছিলেন। সংঘবদ্ধভাবে এ কাজ শুরু হয়েছিল কলকাতা ব্যাপটিস্ট মিশনারী সোসাইটির নেতৃত্বে ১৮১৯ সালে। এঁদেরই চেষ্টায় গড়ে ওঠে কলকাতা ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি, যাঁরা স্ত্রী শিক্ষার বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ১৮২৪ সালে ফিমেল জুভেনাইল

সোসাইটি ও বেঙ্গল 'ক্রিশ্চিয়ান স্কুল সোসাইটি' একত্রিত হয়ে যায়। এঁদের শিক্ষা বিস্তারে প্রচেষ্টার অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ দিক মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাদানের ব্যবস্থা। এই প্রসঙ্গে মিস কুক এবং 'দি ব্রিটিশ এন্ড ফরেন স্কুল সোসাইটির' ভূমিকাও বিশেষভাবে উল্লেখ্য। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে প্রায় ২০০ মহিলাকে তাঁরা শিক্ষার অঙ্গণে আনতে সক্ষম হয়েছিলেন। ১৮২৪ সাল নাগাদ বিভিন্ন খৃষ্টান মিশনারী সংস্থার দ্বারা কলকাতা, চুঁচুড়া, বর্ধমান, ঢাকা, চট্টগ্রাম প্রভৃতি জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। সমাচার দর্শনের হিসাবানুযায়ী শিক্ষা কেন্দ্রের সংখ্যা ৭১ এবং ছাত্রীর সংখ্যা এক হাজার দুশো সত্তর জন।

খৃষ্টান মিশনারীরা ছাড়াও বাংলার নবজাগরণের পথিকৃত ব্যক্তিবর্গও স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী ও যত্নবান হয়েছিলেন। এই ব্যক্তিবর্গের মধ্যে একাংশ মনে করতেন যে নারী শিক্ষা হিন্দু শাস্ত্রে অনুমোদিত বিষয়। এই চিন্তাধারার ব্যক্তিদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিরা হলেন রাজা রামমোহন রায়, রাধাকান্ত দেব, গৌরমোহন বিদ্যালংকার প্রমুখ। বাংলার নবজাগরণের পথিকৃত রামমোহন স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কোন ভূমিকা পালন করতে না পারলেও তিনি যে স্ত্রী শিক্ষাকে সমর্থন করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৮২০ সালে লিখিত তাঁর সতীদাহ বিষয়ক পুস্তিকায়। রক্ষণশীল চিন্তাধারার নেতা হলেও রাজা রাধাকান্তদেব স্ত্রী শিক্ষার জন্য প্রত্যক্ষভাবে কাজ করেছিলেন। নিজের বাড়ীতে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা ছাড়াও ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটির প্রথম পরীক্ষা তাঁর বাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। এবং ১৮২২ সালে গৌরমোহন বিদ্যালঙ্কার-এর 'স্ত্রী শিক্ষা বিধায়িকা' গ্রন্থটি প্রণয়ণে ও প্রকাশে উৎসাহ ও আর্থিক সাহায্যও তাঁর কাছ থেকেই এসেছিল। অপর আরও একটি অংশ ছিল যাঁরা বিশেষত বিভিন্ন প্রবন্ধ রচনা, প্রবন্ধ প্রতিযোগিতা, পত্রিকা প্রকাশ ইত্যাদির মধ্যে দিয়ে স্ত্রীশিক্ষার প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। যেমন রাধানাথ শিকদার ও প্যারীচাঁদ মিত্র শুধুমাত্র মহিলাদের সমস্যা আলোচনার জন্য একটি মাসিক পত্রিকা সম্পাদনা করতেন। জ্ঞানান্বেষণ সভার মাধ্যমেও শিক্ষিত যুবকরা স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে মত প্রকাশ করেন। কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়, মহেশচন্দ্র দেব প্রমুখ ব্যক্তিধর্ম স্ত্রীশিক্ষার সপক্ষে বহু গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধাদি রচনাও করেন। কিন্তু এপ্রসঙ্গে একটি বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন যে এই যুব সম্প্রদায় তথা ডিরোজিয়ানদের মধ্যে অনেকেই স্ত্রীশিক্ষাকে সমর্থন করেছিলেন নারী জাতির মুক্তির প্রথম পদক্ষেপ হিসাবে নয়, বরং শিক্ষিত, ইঙ্গরুচিশীল যুবকদের উপযুক্ত স্ত্রী হিসাবে মেয়েদেরও শিক্ষিত হওয়া জরুরী—এই ধারণা নিয়ে। স্ত্রী শিক্ষা বিষয়ে তাঁদের ধ্যান-ধারণা আবর্তিত হয়েছিল এই কেন্দ্রিয় ভাবনা থেকে যে শিক্ষিত আধুনিক যুবকদের পক্ষে মূর্খ স্ত্রীদের কাছ থেকে শারীরিক-মানসিক সান্ত্বনা লাভ করা সম্ভব হবে না এবং সেক্ষেত্রে পারস্পরিক সম্প্রীতিও তৈরি হওয়া অসম্ভব হবে।

কিন্তু পুরুষের প্রয়োজনে স্ত্রী শিক্ষার এই ধারণা থেকে অনেক দূরে ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। তিনি স্ত্রী শিক্ষা চেয়েছিলেন নারী জাতির প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা থেকে এবং নারী জাতির প্রতি যে অবমাননা ও নিপীড়ন তিনি সমাজে প্রত্যক্ষ করেছিলেন তা থেকে নারীদের মুক্তি দিতে চেয়ে। সেই

কারণেই তাঁর শিক্ষা চিন্তাও ছিল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। নারী কেবল গাহ্যস্থ বিদ্যা বা পুরুষের প্রয়োজনীয় বিদ্যা শিক্ষা করবে—এমন ধারনার বিপরীতে তিনি চেয়েছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের জ্ঞান বিজ্ঞান, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দিতে যাতে অন্ধ কুসংস্কার থেকে তাঁদের মুক্তি ঘটে। শিক্ষা যাতে নারীর চেতনাকে সমৃদ্ধ করে। নারী জাতির প্রতি সমাজ যে ব্যবহার করে আসছে তা যে অত্যন্ত অন্যায়—সেই বোধশক্তির উন্মেষ যেন নারীজাতির ঘটে। এই ধারনা নিয়েই বিদ্যাসাগর স্ত্রী শিক্ষা বিস্তারে যত্নবান। কেবলমাত্র স্ত্রী শিক্ষাই নয়, এমনকি সর্বশিক্ষার যে কথা আজ আমরা বলছি উনবিংশ শতকে দাঁড়িয়ে সেই সর্ব শিক্ষার জন্যও বিদ্যাসাগর মশায় লড়াই করেছিলেন। নারীশিক্ষার বিস্তারের ক্ষেত্রেও তাঁর ধারণা এতটাই সুস্পষ্ট ছিল যে ১৮৫৭ থেকে ১৮৬০ সালের মধ্যে যে ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় তিনি স্থাপন করেছিলেন সেগুলি কেবলমাত্র কলকাতা কেন্দ্রিক ছিল না। মফঃস্বল-গ্রামাঞ্চলেও বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে তিনি ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। প্রথমদিকে সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হলেও পরবর্তী সময়ে সরকার বিদ্যালয়গুলির আর্থিক সহায়তা প্রত্যাহার করে নিলে বিদ্যাসাগর নিজ অর্থব্যয়ে বালিকা বিদ্যালয়গুলিকে সচল রেখেছিলেন। তিনি সহজ সরল গদ্যে পাঠ্য বই রচনা করেছেন। সংস্কৃত ব্যকরণকে বাংলায় সহজবোধ্যভাবে প্রণয়ণ করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষা বিস্তারে একমাত্র তাঁরই প্রচেষ্টা ছিল সর্বতোমুখী। তাঁর চারিত্রিক উদারতা, বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টা তাঁকে কেবলমাত্র বেথুন সাহেবের বন্ধু ও সহযোগীই করেনি, বেথুনের প্রতি এতটাই শ্রদ্ধাশীল করেছিল যে বেথুনের প্রতিকৃতি তিনি নিজগৃহে স্থাপন করেছিলেন। একটা বেশ দীর্ঘ সময় বেথুন স্কুলের সম্পাদকের দায়িত্বই তিনি কেবল পালন করেননি, এই বিদ্যালয়টির জন্ম মুহূর্ত থেকে তাঁর জীবনের শেষদিন পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ের সঙ্গে তিনি ওতপ্রোতভাবে জড়িয়েও ছিলেন। বেথুন কলেজ শতবার্ষিকী স্মরণিকা গ্রন্থে এ প্রসঙ্গের উল্লেখও পাওয়া যায়। বেথুন কলেজের ছাত্রী হিসাবে চন্দ্রমুখী বসু প্রথম বাঙালী মহিলা এম.এ. পাশের সম্মান লাভ করলে স্বভাবতই অত্যন্ত আনন্দিত হন বিদ্যাসাগর মশায়। তিনি চন্দ্রমুখীকে আর্শীবাদ জানিয়ে শেকস্‌পীয়ারের গ্রন্থাবলী উপহার দেন।

মেয়েদের লেখাপড়া শেখার পেছনে অবশ্যই সহযোগিতার প্রসারিত হস্ত নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন বেশ কিছু মুক্তবুদ্ধি পুরুষরা—এও যেমন সত্য, তেমনি সত্য মেয়েদের ঘরে বাইরে দীর্ঘদিনের লড়াই। যেখানে মেয়েরা গৃহাভ্যন্তরে বাবা বা স্বামীর সাহায্য পেয়েছেন সেখানে তবু তাদের লড়াইটা কিছুটা হলেও সহজ হয়েছিল। কিন্তু রাসসুন্দরী দেবী তাঁর 'আমার জীবন'-এ যেমন জানিয়েছেন গোপনে শাড়ীর আঁচলে লুকিয়ে রান্নাঘরে তিনি বই পড়তে শিখেছেন এমন আরও কেউ কেউ ছিলেন। এই রাসসুন্দরী দেবী বা বামাসুন্দরী দেবীরা নিজেদের চেষ্টায় একটি একটি করে অক্ষর চিনে পড়তে শিখেছেন-কেউ তাঁদের সাহায্য তো করেন ইনি, প্রবল বিরোধিতাই পেয়েছেন—তাঁদের লড়াই স্বভাবতই আরও কঠিন লড়াই। এই লড়াই আরও একটা স্তরে পৌঁছেছে বিদ্যালয়ে যাবার জন্য লড়াই-এ। নারীকে এদেশে শিক্ষার অধিকার পেতে নিজেদের লড়াই দিয়ে পথ কেটে নিতে হয়েছে সর্বস্তরেই। এমন কি উচ্চশিক্ষা লাভের পথও সহজ হয়নি নারীদের কাছে। কিন্তু নিজেদের শিক্ষাগত যোগ্যতা, ঐকান্তিক

আগ্রহ, সাহস - এইসব কিছুকে হাতিয়ার করে উন্মুক্ত করতে হয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়ের তাদের জন্য রুদ্ধ দ্বার। ১৮৭৬ সালে দেরাদুনের একটি বিদ্যালয়ের সুপারিনটেনডেন্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে চন্দ্রমুখী বসুকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা দিতে দেবার জন্য অনুমতি প্রার্থনা করেন। কিন্তু এবিষয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন সিদ্ধান্ত বা নিয়মাবলী ছিল না। ফলে সেনেট ও সিন্ডিকেটের সভায় স্থির হয় যে, ছাত্রদের জন্য নির্মিত প্রবেশিকা পরীক্ষার প্রশ্নপত্রে পুনরায় পরীক্ষা দিয়ে ছাত্রীটিকে তার যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। ১৮৭৭ সালে চন্দ্রমুখী বসু কৃতিত্বের সঙ্গে সেই যোগ্যতা প্রমাণ করে দেন। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেয়েদের পরীক্ষা গ্রহণের কোন নিয়ম ছিল না। অতএব চন্দ্রমুখীর কৃতিত্বের ফলে বিশ্ববিদ্যালয়কে মেয়েদের পরীক্ষা নেবার নীতি প্রণয়ণ করতে হয়। এই নীতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রনয়ণ করার অব্যবহিত পরেই ১৮৭৮ সালে বেথুন স্কুলের ছাত্রী হিসাবে কাদম্বিনী বসুও অন্য সব পুরুষ পরীক্ষার্থীদের সঙ্গে সমভাবে পরীক্ষা দিয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় সাফল্যের সঙ্গে উত্তীর্ণ হন। তিনি মাত্র কয়েকটি নম্বরের জন্য প্রথম বিভাগ পাননি। মহিলা ছাত্রের এই কৃতিত্বে চারিদিকে সাড়া পড়ে যায়। সরকারও আলোড়িত হন। শিক্ষা অধিকর্তা এ. ডবলু. ক্রফট-এর চেষ্টায় কাদম্বিনী মাসিক ১৫ টাকা জলপানি পান। কাদম্বিনী নিজে পড়াশুনায় আগ্রহী ছিলেন এবং জলপানিরও অন্যতম শর্ত ছিল লেখাপড়া চালিয়ে যাওয়া। সুতরাং কাদম্বিনী এফ.এ. পড়তে সবিশেষ যত্নবান হন। কিন্তু মেয়েদের এফ.এ. পড়ানোর কোন বন্দোবস্ত তখন ছিল না। এমতাবস্থায় বেথুন স্কুলের পরিচালকমন্ডলীর আবেদনক্রমে সরকার বেথুন স্কুলে এফ.এ. পড়াবার স্বতন্ত্র বিভাগ খোলার সিদ্ধান্ত নেন। ১৮৭৯ সালের গ্রীষ্মাবকাশের পর বেথুন স্কুলের এফ.এ. ক্লাস শুরু হয় অর্থাৎ ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা কলেজ তার জয়যাত্রা শুরু করে অন্তত একজন মহিলার উচ্চশিক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহ ও যোগ্যতাকে বাস্তবায়নের জন্য। এই পরিস্থিতিতে চন্দ্রমুখী বসুও এফ.এ. পড়ার অনুমতি প্রার্থনা করেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে। বাঙালী খৃষ্টান পরিবারের এই কন্যা কলকাতার ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুলে এফ.এ. পড়ে কৃতকার্য হন। সুতরাং এবার এঁদের বি.এ. পড়ানোর ব্যবস্থা করা আবশ্যিক হয়ে যায়। সুতরাং ১৮৮১ সালে বেথুন স্কুলে বি.এ. ক্লাস খোলা হয়। সেখানে কাদম্বিনী ও চন্দ্রমুখী একসঙ্গে বি.এ. পড়তে শুরু করেন। ইতিমধ্যে ১৮৭৯ সালে ফ্রি চার্চ নর্মাল স্কুল থেকে এন্ট্রাস পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে বেথুন স্কুলের এফ.এ. ক্লাসে পড়ার অনুমতি চেয়ে অনুমতি পেয়েছিলেন কুমারী অ্যালেন ডি.আব্রু। সেই প্রসঙ্গে শিক্ষা অধিকর্তা স্পষ্ট করেই জানান যে বেথুন স্কুল যেহেতু হিন্দু বালিকাদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল এবং অহিন্দু বালিকাদের স্কুল কলকাতায় আছে তাই বেথুন স্কুল সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের জন্য উন্মুক্ত করা না হলেও বেথুন কলেজ অংশ যেহেতু স্বতন্ত্র পঠন-পাঠনের ক্ষেত্র এবং ভারতের একমাত্র মহিলা কলেজ সুতরাং বেথুন কলেজ অংশে ধর্মনিরপেক্ষভাবে সকল যোগ্য ছাত্রীকেই পড়তে দেওয়া হবে।

নারীর উচ্চশিক্ষায় অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে আরও একটি দিকের সূচনাও এই কালখন্ডেই ঘটে। অবলা দাস ও অ্যালেন ডি. আব্রু এন্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চিকিৎসাবিদ্যা অধ্যয়ন করতে চান। কিন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজ মহিলা ছাত্রদের চিকিৎসাবিদ্যা পড়াতে অস্বীকার করে। সুতরাং ১৮৮২ সালে

বাংলার সরকার তাঁদের দুজনকে বৃত্তি দিয়ে মাদ্রাজ মেডিকেল কলেজে চিকিৎসাবিদ্যা পড়তে পাঠান। কাদম্বিনী বসু ও চন্দ্রমুখী বসু বি.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চন্দ্রমুখী বসু এম.এ. পড়া শুরু করেন বেথুন কলেজের মাধ্যমেই। কিন্তু কাদম্বিনী বসু ইতোমধ্যে দ্বারকানাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায় হিসাবে চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়ন করতে চান। আবার কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছাত্রী ভর্ত্তিতে আপত্তি জানায়। এবারে বাংলার তদানীন্তন ছোটলাট স্যার রিভার্স অগাস্টাস টমসন স্বয়ং কলকাতা মেডিকেল কলেজের অধ্যাপক সভার আপত্তি অগ্রাহ্য করে সরকারী নির্দেশনামা জারি করে কাদম্বিনী গঙ্গোপাধ্যায়কে ১৮৮৩ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করে দেন। উক্ত সরকারী আদেশনামায় স্পষ্ট জানানো হয় যথাযোগ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত মহিলাদেরও মেডিকেল কলেজে ভর্ত্তি করতে হবে।

বেথুন কলেজের ছাত্রী সংখ্যা প্রতি বছরই বাড়তে থাকে। ফলে ১৮৮৮ সালে বেথুন স্কুলের কলেজ বিভাগকে স্বতন্ত্র কলেজ হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়। নাম হয় বেথুন কলেজ। স্কুলটি পরিচিত হয় বেথুন কলেজিয়েট স্কুল নামে। বেথুন কলেজের ছাত্রীদের ধর্মীয় দিকটি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে প্রথমাবস্থায় ছাত্রীদের বেশীরভাগই ব্রাহ্ম ও বাঙালী খ্রীষ্টান পরিবারভুক্ত ছিল কিন্তু পরবর্তী সময়ে অপেক্ষাকৃত রক্ষণশীল হিন্দু পরিবার থেকেও বেশ ভালো সংখ্যায় মেয়েরা উচ্চ শিক্ষার জন্য এসেছে। এই চিত্রটা কেবলমাত্র উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য হতে পারে না অর্থাৎ বিদ্যালয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও অনিবার্য। এই প্রসঙ্গে একটি ঘটনা অবশ্য উল্লেখ্য। হিন্দু ঘরের বালবিধবা সরলাবালা মিত্র বেথুন স্কুল থেকে পড়াশুনা করে, কলেজ থেকে উত্তীর্ণ হয়ে ঐ স্কুলেরই শিক্ষায়িত্রী হন ১৯০১ সালে। ১৯০৬ সালের অক্টোবরে তিনি শিক্ষিকা হিসেবে ট্রেনিং প্রাপ্ত বিদ্যা অধ্যয়নের জন্য ভারত সরকারের বৃত্তি নিয়ে বিলাত যান। দু'বছর পরে সেখানের পড়াশুনা শেষ করে ১৯০৮ সালের সেপ্টেম্বরে দেশে ফেরেন এবং অক্টোবর মাসেই নব প্রতিষ্ঠিত সরকারী শিক্ষায়িত্রী মহাবিদ্যালয়ে অধ্যক্ষ পদে যোগ দেন। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা ও গোঁড়ামির বিরুদ্ধে লড়াই করে মহিলারা যে শিক্ষার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রসর হচ্ছেন—এটা তারই স্মারক। এই প্রকার মহিলাদের সংখ্যা শতাংশের বিচারে যতই কম হোক না কেন সেই যুগ ও সমাজের পক্ষে ঘটনাটি যথেষ্ট অগ্রগতি নির্দেশক। নারীদের সাফল্যের কারণেই নারী শিক্ষা এদেশে অগ্রগতি পেয়েছিল। ১৯১৬ সালে তটিনী গুপ্ত সংস্কৃতে এবং সীতা ও সুজাতা চট্টোপাধ্যায় ইংরেজিতে সম্মানিক পরীক্ষা দিয়ে বিশেষ কৃতিত্বপূর্ণ ফল করেন। তটিনী গুপ্ত সংস্কৃতে প্রথম শ্রেণী পান। এর ফলেই এর পরের বছর থেকেই এই কলেজের ছাত্রী হিসাবেই ঐ দুটি বিষয়ে সম্মানিক পরীক্ষা দেবার অনুমতি দেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। এ পর্যন্ত যাঁরা কোন বিষয়ে সাম্মানিক পরীক্ষা দিতে চাইতেন তাঁদের নন-কলেজিয়েট ছাত্রী হিসাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ অনুমতিক্রমে সেই পরীক্ষা দিতে হত। ১৯২৩-২৪ সাল থেকে বেথুন কলেজে শুরু হয় আই.এস.সি. এবং দর্শন ও গণিতে সম্মানিক পড়ানোও।

১৮৯৭ সালে কলকাতায় প্রেসিডেন্সি কলেজে প্রথম সহশিক্ষা প্রবর্তিত হয়। এম.এ. ক্লাসের প্রথম বর্ষে দুটি ছাত্রী—অমিয়া রায় ও চারুলতা রায় বা মিনি—ভর্ত্তি হয়। এরা দুজনেই লরেটো হাউস থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে। গ্রীষ্মাবকাশের পর ছাত্রী দুটি ক্লাসে এলে কলেজের ভেতরে সহপাঠী, এমনকি কোন কোন অধ্যাপকও তাদের মানসিকভাবে গ্রহণ করতে পারেন না। কলেজের বাইরে সারা দেশেই ঝড় উঠে। বিভিন্ন পত্র পত্রিকা এমনকি ব্রাহ্ম পত্রিকাতেও নানা বিরূপ সমালোচনা শুরু হয়। শেষ পর্যন্ত সরকার বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্সী কলেজের এই সহশিক্ষা প্রবর্তনের প্রচেষ্টা থেকে সরে যান। কিন্তু যেটি লক্ষ্যণীয়, বালিকা দুটি ভেতরের-বাইরের এত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও ক্লাসে আসা বন্ধ করেনি এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষাতে ভালো ফলও করে। অমিয়া রায় কলেজের সব ছাত্রকে অতিক্রম করে কলেজের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে প্রথম হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল পরীক্ষার্থীর মধ্যে তৃতীয় স্থানটি দখল করে। চারুলতা বা মিনি রায়ও সম্মানের সঙ্গে দ্বিতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। যদিও এই দুই ছাত্রীর সঙ্গে সঙ্গেই সে-যাত্রায় প্রেসিডেন্সি কলেজের সহশিক্ষার বিষয়টি বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং ১৯৪৪ সালে নিয়মিতভাবে এখানে সহশিক্ষা চালু হয়। কিন্তু সহশিক্ষা সাফল্যের সঙ্গে প্রবর্তিত হয়েছে ১৯৩২ সালে, কলকাতা থেকে দূরে আর এক শিক্ষা-সংস্কৃতির দীর্ঘদিনের পুরানো কেন্দ্র, কৃষ্ণনগরে। কৃষ্ণনগর সরকারি কলেজে অরুণ বালা খাঁ কৃষ্ণনগর লেডি কারমাইকেল গার্লর্স স্কুল থেকে পাশ করে এফ.এ. ক্লাসের প্রথম বর্ষের ছাত্রী হিসাবে ভর্ত্তি হন। প্রথম বছরে ছাত্রী সংখ্যা ১ হলেও পরের বছরই তা বেড়ে দাঁড়ায় ৪-এ। কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজে সহশিক্ষা প্রবর্তনের ক্ষেত্রে ঐ কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ রাজেন্দ্রনাথ সেন এবং একদা কৃষ্ণনগরের পুরপিতা তদানীন্তন বাংলা সরকারের শিক্ষামন্ত্রী স্যার মহম্মদ আজিজুল হক সাহেবের যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু সবচেয়ে যা লক্ষ্যণীয় তা হচ্ছে নারী শিক্ষার ব্যাপ্তি এবং সামাজিক গোঁড়ামির শিথিলতা যা বিংশ শতাব্দীর তিনের দশক থেকেই ক্রমশ সহশিক্ষা ব্যবস্থা প্রবর্তনের সূত্রপাত ঘটাতে পেরেছিল। এবং ক্রমশই কলকাতা সহ বিভিন্ন শহরতলী ও মফঃস্বল শহরে একাধিক মহিলা মহাবিদ্যালয় ও সহশিক্ষার প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাবৃদ্ধি হয়েছে। একথা উল্লেখের অপেক্ষা রাখে না যে, নারী শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে বাংলার প্রায় সর্বত্রই। যদিও তা পুরুষের তুলনায় এবং জনসংখ্যার তুলনাতে শতকরা হিসাবে যথেষ্টই কম। তবু যে লড়াই নারীদের এর জন্য ক্রমাগতই করে চলতে হয়েছে তার গুরুত্ব ও গভীরতা যেকোন প্রকার আন্দোলনের তুলনাতেই যথেষ্ট বেশী এবং অনেক বেশী কঠিন।

এদেশের জনসংখ্যার এক বিরাট অংশ মুসলিম। মুসলমান জনগোষ্ঠী নানা কারণে দীর্ঘদিন যাবৎ ইংরেজ প্রবর্তিত শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে মুখ ফিরিয়েছিল। তাছাড়া সামাজিকভাবেও মুসলমান জনগণ হিন্দুদের তুলনায় বেশী রক্ষণশীল বিশেষত নারীদের প্রসঙ্গে। সেই কারণে প্রথমদিকে মুসলমান মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার বিষয়টি আরও বেশী কঠিন ছিল। তবু ক্রমশ মুসলমান যুব সমাজও মেয়েদের শিক্ষার বিষয়টি নিয়ে ভাবনা চিন্তা শুরু করেন। এক্ষেত্রেও মেয়েদের উৎসাহ এবং কার্যকর সহযোগিতা উল্লেখ্য ভূমিকা পালন করে। বিনয় ঘোষের 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' বই থেকে জানা যায় যে ১৮২২

সালে মিস কুক যখন কলকাতার বিভিন্ন অঞ্চলে বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করছিলেন তখন শ্যামবাজার অঞ্চলে একজন মুসলিম মহিলার কাছ থেকে তিনি প্রভূত সাহায্য পেয়েছিলেন। ঐ মুসলিম মহিলা খৃষ্টান মহিলার প্রচারিত স্ত্রীশিক্ষার আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে বাড়ী বাড়ী গিয়ে ছাত্রী সংগ্রহ করে ১৮জন ছাত্রী নিয়ে নিজের পাড়ায় একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাঁর উৎসাহে বিদ্যালয়টির ছাত্রী সংখ্যা বেড়ে ৪৫ জনে দাঁড়ায়। লক্ষ্যণীয় যে সময়ে কলকাতার মুসলিম জনগোষ্ঠী এদেশের পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রতি যথেষ্ট বিরুপ সেই সময়ে একজন মুসলমান নারী মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসারে যত্নবান হচ্ছেন। অবশ্য তিনি একাজে একা নন। মির্জাপুর, এন্টালি জানবাজার ইত্যাদি অঞ্চলের স্থানীয় কিছু মুসলমানরাও কুকের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ঐসব জায়গায় বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় সহযোগিতা করেছিলেন।

বাংলায় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠান 'ফিমেল জুভেনাইল সোসাইটি'। এরা 'জুভেনাইল স্কুল' নামে কলকাতার গৌরীবাড়ীতে প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। এই বিদ্যালয়ের ছাত্রীদের পরীক্ষাই ১৮২১ ও ১৮২২ সালে রাজা রাধাকান্ত দেবের বাড়ীতে গ্রহণ করা হয়েছিল। ১৮২৩ সালের ১৯ ডিসেম্বর ১৪০ জনের মতো ছাত্রী পরীক্ষা দেয় যাদের মধ্যে হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েরাই ছিল। লেডিস অ্যাসোসিয়েশানের উদ্যোগে ১৮২৭ সালে কলকাতায় যে ১২টি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার মোট ১৬০ জন ছাত্রীর বেশীরভাগই মুসলিম। অবশ্য তারা বেশীদূর পড়াশুনা চালাতে পারেনি। ১৮৪৪ সালে মির্জাপুরে স্থাপিত হয়েছিল একটি বালিকা বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ে প্রায় ৭০-৮০ জন ছাত্রী ছিল। এদের মধ্যে বেশীরভাগই ছিল মুসলিম।

কিন্তু কেবলমাত্র এই খৃষ্টান মিশনারী বা বিদ্যোৎসাহী ব্যক্তিরাই এদেশে স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে আগ্রহী হয়েছিলেন তা নয়। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন অংশে স্ত্রীশিক্ষা প্রসারের জন্য বিভিন্ন সভাসমিতি ও সংগঠন তৈরী হয় যারা বিভিন্ন জেলাতে হিন্দু মুসলমান সকল নারীর মধ্যেই শিক্ষা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিন্দুদের মতোই বহু মুসলিম মেয়েরাও বিদ্যালয়ে আসতে না পারলেও অন্তঃপুরে লেখাপড়া শিখতে শুরু করেন। ফলে ঐ জাতীয় সংগঠনগুলি অন্তঃপুরে পড়াশুনা শেখা মেয়েদের পরীক্ষা দেবার ব্যবস্থা করেন। এমনই একটি গুরুত্বপূর্ণ সংগঠন ছিল 'উত্তরপাড়া হিতকারী সভা'। এই সংগঠনটির শিক্ষা সংক্রান্ত কর্মসূচী হিন্দু মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের কাছেই উন্মুক্ত ছিল। এই সভায় রিপোর্ট অনুযায়ী হুগলী জেলার ভিটাসিন থেকে প্রথম মুসলিম মহিলা চান্দেকন্নেসা ১৮৯১ সালে পরীক্ষায় পাশ করেন। ১২৮৯ বঙ্গাব্দে বামাবোধিনী পত্রিকার এক রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে ১২৮৮ বঙ্গাব্দের অন্তঃপুর পরীক্ষায় ১৫জন মহিলা উত্তীর্ণ হন। যাঁদের মধ্যে বাঁকুড়া থেকে একটি মুসলিম বালিকা বৃত্তি লাভ করে। ১৮৭৬ সালে কলকাতায় বসবাসকারী শ্রীহট্টবাসী যুবকরা প্রতিষ্ঠা করেন 'শ্রীহট্ট সম্মিলনী' যাদেরও লক্ষ্য ছিল অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষার প্রসার। এঁদের কর্মকান্ড কেবল কলকাতায় সীমাবদ্ধ ছিল না। সমগ্র সিলেটবাসীর মঙ্গল এবং মহিলাদের উন্নতি সাধনে তারা দৃষ্টি দেয়।

হিন্দু ও মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মহিলাদের শিক্ষাকল্পে এঁদের প্রচেষ্টায় সমগ্র সিলেট শহরে কয়েকটি বিদ্যালয় গড়ে ওঠে। কিন্তু কেবলমাত্র বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাই নয়, অন্তঃপুরের মহিলারাও এঁদের আয়োজনে পরীক্ষা দিতে পারতেন। শ্রীহট্ট সম্মিলনী আয়োজিত পরীক্ষায় ছাত্রীদের লিখিত ও মৌখিক দুই পরীক্ষাই দিতে হত। বাংলা অথবা উর্দু যেকোন ভাষাতেই পরীক্ষা দেওয়া যেত। ১৮৮৩ সালে এঁদের আয়োজিত পরীক্ষায় ১০জন মুসলিম ছাত্রী উত্তীর্ণ হয়। শ্রীহট্ট সম্মিলনীর প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায় ১৮৮৪ সালে উত্তীর্ণ ছাত্রীর সংখ্যা ৩৮৩ জন, যার মধ্যে ২১ জন মুসলিম। ১৮৮৯ সালে ৬১১ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে উত্তীর্ণ ৫২৮ জন যাদের মধ্যে ৭৪ জন মুসলিম মহিলা। পরবর্তীকালে মুসলিম মহিলার সংখ্যা আরও বাড়ে। এই সম্মিলনীর নিয়মানুযায়ী ৪ বছরের শিশু থেকে ৩৫ বছর বয়সী মহিলারাও পরীক্ষা দিতে পারতেন। কখনও কখনও ৪৫ বছর বয়সী মহিলারাও পরীক্ষা দিয়েছেন। অনেক প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ভদ্রলোক স্ত্রী শিক্ষাকে উৎসাহ দিতে এই সকল পরীক্ষার্থীদের পুরস্কৃত করতেন।

১৮৮৩ সালে প্রতিষ্ঠিত হয় 'ঢাকা মুসলমান সুহৃদ সম্মিলনী'। অন্তঃপুরের মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার জন্য উদ্যোগী এই প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলেন প্রধানত ঢাকা কলেজের কিছু প্রগতিশীল ছাত্র। এই সংগঠনের পক্ষ থেকে কলকাতা, বরিশাল, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম, ত্রিপুরা, সিলেট, ময়মনসিংহ, মেদিনীপুর ইত্যাদি জায়গায় মেয়েদের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হত। সমাজের জাগরণ ও উন্নতির সঙ্গে নারীশিক্ষা ও নারীমুক্তির যে গভীর সম্পর্ক তা বিবেচনা করেই তারা একাজে ব্রতী হয়েছিল। সমাজের বিরূপ মনোভাবকে মাথায় রেখে তারা তাদের পরীক্ষা গ্রহণের ব্যবস্থা নিরূপন করে। তাদের বার্ষিক রিপোর্ট থেকে জানা যায় কঠোর পর্দা প্রথার মধ্যে রেখেই মুসলিম মেয়েদের পরীক্ষা নেবার ব্যবস্থা করা হত। কোন বিদ্যালয়ের সঙ্গে সংযুক্ত না হয়ে এবং বাংলা ও উর্দু উভয় ভাষাতেই পরীক্ষা গ্রহণ করা হত। এটি একটি স্বাধীন ও স্বয়ংসম্পূর্ণ শিক্ষা পদ্ধতি ছিল। উত্তীর্ণ ছাত্রীদের এরা সংশাপত্র ও পারিতোষিক দিতেন। প্রথম বছরে সম্মিলনীর তত্ত্বাবধানে মোট ৩৭জন ছাত্রী পরীক্ষা দিয়েছিল। এদের মধ্যে ১৪ জন, উর্দু ভাষায় ও ২৩ জন বাংলায়। উর্দু বিভাগে ১২ জন এবং বাংলা বিভাগে ২২ জন উত্তীর্ণ হয়েছিল। ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত এই সম্মিলনী সক্রিয় ছিল, ১৯০৫ সালের পর এটি বিলুপ্ত হয়ে যায়। ১৯০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল 'নোয়াখালি সম্মিলনী'। স্ত্রীশিক্ষায় পেছিয়ে থাকা নোয়াখালিতে অন্তঃপুরবাসী মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য স্বদেশহিতৈষী কিছু ছাত্র এটি গঠন করে। এরা সকল ছাত্রীদের ছাড়াও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে উৎসাহিতে করার জন্য দু'জন লেখিকাকে এবং হস্তশিল্পকর্মের জন্যও মহিলাদের পুরস্কৃত করে।

প্রাতিষ্ঠানিকভাবে নারী শিক্ষার জন্য সরকার প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করেন ১৮৪৯ সালে বেথুন স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্যে দিয়ে। কিন্তু ১৮৯৭ এর আগে পর্যন্ত এই বিদ্যালয়ে মুসলমান ছাত্রীদের প্রবেশাধিকার ছিল না। তাই ১৮৭৮ সালে পূর্ববঙ্গের ঢাকার লক্ষ্মীগঞ্জে হিন্দু-মুসলিম উভয় সম্প্রদায়ের মেয়েদের জন্য প্রতিষ্ঠিত হয় ইডেন গার্লস স্কুল। বামাবোধিনী পত্রিকায় ১৮৮০ সালের মার্চে প্রকাশিত

প্রতিবেদনের সূত্রে জানা যায়, যে, ১৮৮০ সালে ইডেন গার্লস স্কুলের ১৫৩ জন ছাত্রীর মধ্যে মাত্র ১ জন মুসলিম ছিল। ১৯১১ তে এই সংখ্যা বেড়ে হয় ১১। ১৯২৬ সালে এই বিদ্যালয়ের কলেজ বিভাগ চালু হয়। স্বভাবতই পূর্ববঙ্গের ছাত্রীদের কাছে এটিই ছিল উচ্চতর শিক্ষার জন্য সর্বপ্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। বহু খ্যাতনামা মুসলিম মহিলা এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রী ও শিক্ষিকা হিসাবে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। বিশেষভাবে উল্লেখের প্রয়োজন, মালেকা আখতার বানুর নাম যিনি মুসলিম মেয়েদের মধ্যে প্রথম বিজ্ঞান শাখায় পড়াশুনা করে ইংল্যান্ড থেকে পি.এইচ.ডি. ডিগ্রি লাভ করে ইডেন গার্লস কলেজে রসায়নবিদ্যার অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন। এছাড়া ফজিলাতুন্নেসা জোহা গণিত শাস্ত্রে এম.এ. পাশ করে বেথুন কলেজের গণিত বিভাগের প্রধান হিসাবে যোগ দেন এবং পরবর্তী সময়ে ইডেন কলেজের ভাইস্-প্রিন্সিপাল হন।

সরকারী উদ্যোগে মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার জন্য প্রচেষ্টার সমকালীনই বেশ কয়েকজন মুসলিম নারীকে পাওয়া যায় যাঁরা নিজেরা মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার জন্য সবিশেষ যত্নবান হয়েছিলেন। এঁদের মধ্যে অন্যতম ফয়জুন্নেসা চৌধুরানী। দুই কন্যার জননী, স্বামী পরিত্যক্ত ফয়জুন্নেসা নিজেও উর্দু, বাংলা, পার্সী ভাষায় দক্ষ এবং গ্রন্থাগারে পড়াশুনা করে সময় কাটানো মহিলা। পিতার জমিদারীর দায়িত্ব গ্রহণের পাশাপাশি তিনি সামাজিক ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে ১৮৭৩ সালে কুমিল্লা শহরের নানুয়া দিঘির পাড়ে ৫ একর জমির উপর গড়ে তোলেন একটি উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে আধুনিক শিক্ষা ব্যতীত মেয়েরা বৃহত্তর জগতে পা রাখতে পারবে না। এই বিদ্যালয়টি 'ফয়জুন্নেসা উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়' নামে খ্যাত হয়। তিনি কেবলমাত্র বিদ্যালয়টি স্থাপন করেই নিরত হননি। মেয়েদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা করেছেন, হোস্টেলের ব্যবস্থা করেছেন এবং নিজের জমিদারীর আয় থেকে হোস্টেলের যাবতীয় ব্যয় বহন করেছেন। রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন কর্তৃক ১৯১১ সালে স্থাপিত শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল, উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে পরিণত হয়েছিল ১৯৩১ সালে। তার ৫৮ বছর আগে ফয়জুন্নেসা তাঁর নিজের উদ্যোগে, নিজের জমিদারীতে মুসলিম মেয়েদের জন্য উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় স্থাপনের সাহস দেখান। কিন্তু কেবলমাত্র নারীদের জন্য উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ই নয়, তাঁর জমিদারীতে তিন ধরনের শিক্ষা ব্যবস্থা—প্রাথমিক শিক্ষা, পুরুষ ও মহিলাদের জন্য বাংলা ও ইংরেজী উভয় ধরনের শিক্ষা, ধর্মীয় শিক্ষা—তিনি প্রবর্তন করেন। ফয়জুন্নেসা নিজ গ্রামে এবং তাঁর জমিদারীর ১৪টি মৌজার প্রত্যেকটিতে প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। শিক্ষা বিস্তারের যাবতীয় ব্যয়ভার তাঁর এস্টেট থেকে বহন করা হয়। ফয়জুন্নেসা তাঁর শিক্ষানুরাগ নিজের জমিদারীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি। নদীয়া জেলার কৃষ্ণনগরেও তিনি বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং মক্কা শরীফে 'মাদ্রাসা-ই-সাওলাতিয়া ও ফোরকানিয়া' মাদ্রাসার ব্যয়বহনে সহায়তা করেন। স্বাভাবিকভাবেই তাঁর প্রতিষ্ঠিত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় থেকে বহু কৃতি ছাত্রী নানা ক্ষেত্রে জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

মুর্শিদাবাদের নবাবের পত্নী বেগম শামসি ফেরদৌসও নারীশিক্ষার প্রসারের জন্য বিশেষ যত্নবান

হয়েছিলেন। ১৮৯৬ সালে কলকাতার কিছু সুধী মুসলমান কলকাতায় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করতে আগ্রহী হন। কারণ তখন বেথুন স্কুলে মুসলিম মেয়েদের পড়ানো হত না। ১৮৯৭ সালের ১৭ জানুয়ারী বেগম শামসি ফেরদেস মহলের প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় কলকাতায় প্রতিষ্ঠিত হয় 'মুসলিম বালিকা মাদ্রাসা'। ১৯০৯ সালে আর এক সমাজসেবী এবং বিখ্যাত বাঙালী মুসলিম নেতা হোসেন শহিদ সোহারাওয়াদির মাতা খুজিস্তা আখতার বাণু কলকাতায় একটি মুসলিম বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। বিদ্যালয়টি 'সোহরাওয়ার্দিয়া বালিকা বিদ্যালয়' নামে পরিচিত হয়। খুজিস্তা আখতার বানু নিজেও সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেন। তিনি মুসলমান সমাজে শিক্ষা বিস্তারের জন্য এবং মেয়েদের সামাজিক বন্ধন থেকে মুক্তির জন্য চেষ্টা করেন। তাঁর প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয়টি পরবর্তী কালে খুজিস্তা আকতার বাণু গার্লস স্কুল নামে বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় হিসাবে কাজ করতে থাকে।

বাঙালী মুসলিম নারীদের অগ্রগতির জন্য দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা পালন করেছিলেন রোকেয়া শাখাওয়াত হোসেন। তাঁর প্রধান কর্মক্ষেত্রই ছিল মুসলিম মেয়েদের শিক্ষা। হাতিয়ার ছিল ১৯০৯ সালে প্রয়াত স্বামী শাখাওয়াত্তের নামাঙ্কিত শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল। স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই ১৯০৯ সালেই বিহারের ভাগলপুরে স্বামীর বাড়ীতেই ৫/৬ জন ছাত্রী নিয়ে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন রোকেয়া। কিন্তু পারিবারিক সম্পত্তি কেন্দ্রিক ঝগড়ার ফলে ১৯১০-এর ডিসেম্বরে কলকাতায় বলে আসতে বাধ্য হন রোকেয়া। ফলে ১৯১১ সালে কলকাতাতে তিনি বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন ১৬ই মার্চ দিনাঙ্কে। শাখাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল তার যাত্রা শুরু করে ৮ জন ছাত্রী ও দুটি বেঞ্চ এবং রোকেয়ার শিক্ষায়িত্রী ও পরিচালকের যৌথ ভূমিকাকে কেন্দ্র করে। নারী শিক্ষার বিস্তারে রোকেয়ার প্রাণপণ প্রয়াস কয়েকজন নেতৃস্থানীয় মানুষকে তাঁর বিদ্যালয়ের পরিচালনার কাজে যুক্ত করে। প্রথমাবধি নানা কারণে বিদ্যালয়টি অর্থসংকটে পড়ে। রোকেয়া তাঁর ব্যক্তিগত তহবিল থেকে ৩০ হাজার টাকা দান করেন। অতঃপর বেশ কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি তাঁর তথা বিদ্যালয়ের সাহায্যার্থে এগিয়ে আসেন। রোকেয়া চেয়েছিলেন তাঁর বিদ্যালয়ের ছাত্রীরা কেবলমাত্র পুঁথিগত বিদ্যাতেই আবদ্ধ থাকবে না। একদিকে তারা হয়ে উঠবে আদর্শ সুকন্যা-সুগৃহিনী-সুমাতা অন্যদিকে ব্রতী হবে দেশ ও সমাজ গড়ার কাজে, জাতির সেবায় ও পরোপকারের ব্রতে। পরবর্তী সময়ে তিনি শিক্ষিকা সংগ্রহের চেষ্টা করেন এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে সফলও হন। কিন্তু শিক্ষিকার ও অর্থের যুগোপৎ অভাব সমস্যাও সৃষ্টি করে।

বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার এক বছর পর থেকে সরকারের কাছ থেকে নামমাত্র হলেও আর্থিক সাহায্য পায়। বছর দুই পরে তা বৃদ্ধিও পায়। কিন্তু বিদ্যালয়টির মাসিক ৬০০ টাকা ব্যয়, এই বর্ধিত সাহায্য থেকে নির্বাহ করা সম্ভব ছিল না। তাই রোকেয়াকে উদ্বিগ্ন থাকতেই হত। তবে তিনি বহু উচ্চ প্রতিষ্ঠিত মানুষের সাহায্য ও সহযোগিতাও পান। ১৬ সেপ্টেম্বর, ১৯১৬ দিনাঙ্কিত এক পত্রে সরোজিনী নাইডু রোকেয়াকে তাঁর নিঃস্বার্থ সমাজসেবা ও অসাধারণ শিক্ষানুরাগের জন্য আন্তরিক শ্রদ্ধা ও শুভেচ্ছা জানান। কিন্তু এর বিপরীতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা থেকেই রোকেয়াকে তীব্র সমালোচনা ও বাধাবিঘ্নের

মধ্যেও পড়তে হয়। তাঁর নিজের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার অভাবহেতু বিদ্যালয়ের কাজকর্মে কর্তৃপক্ষের কাছ থেকে বাধা পান। রক্ষণশীল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন মুসলমান সমাজও তাঁর প্রতি তীব্র বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রও করতে থাকে। এমনকি মুসলিম সমাজের এক অংশের ধনী ও প্রভাব লোকেরা তাঁর সম্পর্কে এমনও কুৎসা রটনা করে যে 'যুবতী বিধবা স্কুল খুলে নিজের রূপযৌবনের বিজ্ঞাপন প্রচার করছে।' কিন্তু হতাশা, অনিশ্চয়তা, কুৎসা সবকিছু জয় করে ক্রমাগতই রোকেয়ার বিদ্যালয়টি উন্নতি পথে অগ্রসর হতে থাকে, বাড়তে থাকে ছাত্রী সংখ্যাও। এই বিদ্যালয়ে শুরুতে উর্দু ভাষার মাধ্যমে শিক্ষা দেবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। যদিও সেই সময় থেকেই বাংলা বিষয়ে একটি ক্লাশ করানো হত। রোকেয়ার একান্ত ইচ্ছা ছিল বাংলা বিভাগ চালু করার। কিন্তু ছাত্রী অভাবে তা অনেকদিন বিলম্বিত হয়। ১৯১৭ সালে অল্প কয়েকজন ছাত্রী নিয়ে বাংলা বিভাগ চালু করলেও ছাত্রীর অভাবে ১৯১৯ সালেই তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিশের দশকের শেষে সন্তোষজনক ছাত্রী নিয়ে বাংলা বিভাগও উর্দু বিভাগের পাশাপাশি চালু করা সম্ভব হয়। কেবলমাত্র সংখ্যাগত বা বিষয়গতভাবেই বিদ্যালয়টির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেনি। ছাত্রীদের সাফল্যও ছিল প্রথমাবধি প্রশংসনীয়। কেবলমাত্র পরীক্ষাতেই এই সাফল্যের মাত্রা আবদ্ধও ছিল না। হাতের কাজ, বিভিন্ন প্রদর্শনীতে অংশগ্রহণ এসব ক্ষেত্রেও এখানকার ছাত্রীদের সাফল্য ছিল উল্লেখযোগ্য। বাংলা ও উর্দু উভয় বিভাগেই সাফল্য এসেছিল। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকে শুরু করে তৃতীয় দশক পর্যন্ত বহু বাধা বিঘ্ন উপেক্ষা করে রোকেয়া যে ত্যাগ ও সাধনা দিয়ে বিদ্যালয়টিকে গড়ে তুলেছিলেন তার ফলেই তাঁর জীবদ্দশাতেই শাকাওয়াত মেমোরিয়াল গার্লস স্কুল উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ে রূপান্তরিত হয়েছিল। মুসলিম বালিকাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে তো বটেই, সামগ্রিকভাবে নারী শিক্ষার বিস্তারের প্রেক্ষাপটে বিচার করলেও এই বিদ্যালয়ের অবদান বিরাট।

মুসলিম মহিলাদের বিদ্যাচর্চার জন্য কেবলমাত্র বিদ্যালয়ই নয়, ক্রমে অনুভূত হয়েছিল উচ্চশিক্ষারও প্রয়োজন এবং আগ্রহও। সুতরাং মুসলমান অধ্যুষিত এলাকায়, প্রধানত মুসলিম ছাত্রীদের লক্ষ্য করেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল লেডি ব্রেবর্ণ কলেজ ১৯৩৯ সালে। প্রথম বছরে মোট ৩৭ জন ছাত্রী এই কলেজে পড়েছিল যার মধ্যে ৩২ জনই মুসলিম। দ্বিতীয় বছরের ছাত্রীসংখ্যা ৪৫ জন যাদের মধ্যে ৪০ জনই মুসলিম ছাত্রী। এখানে যে মুসলিম পরিবারের মেয়েরা উচ্চ শিক্ষা গ্রহণের জন্য এসেছিলেন তাঁদের বেশীরভাগই সরকারী চাকুরীজীবী পরিবারের মেয়ে। দুবছর মিলে মোট ৭২ জন ছাত্রীর মধ্যে ৩০ জনের অভিভাবকই চাকরিজীবী। বাকিরা ব্যবসায়ী, জমিদার, তালুকদার, উকিল, ডাক্তার এবং একজন এম.এল.এ. অপরএকজন ছাত্রীর পিতা কৃষক। সকল ছাত্রীদের মধ্যে ঐ একজনই কেবলমাত্র কৃষক পরিবার থেকে আগত। নিশ্চিতভাবে জানা যায় না কোন শ্রেণীর কৃষক ছিলেন এই অভিভাবক। তবে অনুমান করা যায় 'বড় কৃষক'ই হওয়া সম্ভব। যাহোক, লেডি ব্রেবর্ণ কলেজের প্রথম ২ বছরের অভিভাবকদের পরিচয় লক্ষ করলে দেখা যায় একাধিক মুসলিম ছাত্রীর অভিভাবক মা। মা অভিভাবক হওয়ার নিশ্চয় কিছু কারণ ছিল কিন্তু যে কারণে বিষয়টি উল্লেখ্য তা হচ্ছে মুসলমান সমাজের যে মহিলারা অভিভাবক হিসাবে মেয়েদের উচ্চশিক্ষা গ্রহণার্থে কলেজে পাঠাচ্ছেন তাঁদের এই কাজ তাঁদের

প্রগতিশীল সচেতনতার সাক্ষর। অর্থাৎ মুসলিম মহিলাদের মধ্যেও শিক্ষার জন্য আগ্রহ এবং রক্ষণশীলতার ঘেরাটোপে ভাঙন যে এসেছিল এটা স্পষ্টই প্রতীয়মান। দ্বিতীয়ত লক্ষণীয়, প্রধানত স্বাধীন জীবিকার পরিবার থেকেই ছাত্রীরা এসেছেন। একটি মাত্র কৃষক পরিবারের কন্যা ছাড়া। অর্থাৎ জীবিকাগতভাবেই যাঁরা সামাজিক রক্ষণশীলতার বাধাকে অতিক্রম করতে পেরেছেন তাঁরাই সেই সুযোগটি ব্যবহার করেছেন। এই প্রসঙ্গটিকে এক বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করেছেন, ডঃ পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি লিখেছেন, --- "অর্থনৈতিক সচ্ছলতা ব্যতীতও মানসিক বন্ধন মুক্তি মুসলমান মেয়েদের উচ্চ শিক্ষার দ্বার খুলে দিয়েছিল। এই মানসিক মুক্তির পিছনে উপস্থি ছিল এক রাজনৈতিক, সামাজিক আন্দোলন - খিলাফৎ আন্দোলন। এক যুগ আগে স্যার সৈয়দ আহমদ মুসলিম মানসে আধুনিক শিক্ষা দীক্ষাকে গ্রহণ করে অগ্রসর হবার চেতনা সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন। তাঁর আলিগড় আন্দোলনের প্রভাব সর্বাত্মক হয়নি। কিন্তু খিলাফৎ আন্দোলনের মধ্যে দিয়ে অনেক ঘাত প্রতিঘাতে বিপর্যস্ত, মুসলিম সমাজ যখন বাঁচার তাগিদেই একটা প্যান ইসলামিজম তৈরী করতে যত্নবান তখন তারা নিঃসন্দেহ এবিষয়েও যে, আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ একান্তই প্রয়োজনীয়। সুতরাং অতীতের সিংহাসন হারানোর স্মৃতি এবং ইংরেজ শাসকদের মুসলমানদের পশ্চাদপদ করে রাখার কৌশল --- সবকিছুকেই অতিক্রম করে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত করে তুলতে না পারলে যে, একতাবদ্ধ হলেও অগ্রসর হওয়া যাবে না --- এ বোধে মুসলমান সমাজ উত্তরিত হয়। একটা সমাজ যখন শিক্ষার আলোয় ও অস্ত্রে সজ্জিত হতে থাকে তখন ক্রমে অনিবার্য হয় তার নারীদেরও শিক্ষিত করে তোলা। এক্ষেত্রে ধর্মমত, দেশ, কাল সব অতিক্রম করে নিয়ম একই। ফলে ১৯৩০-এর দশকের শেষান্ত থেকে সমাজ নারীশিক্ষার জন্য এগিয়ে এসেছে জীর্ণ পুরাতন বাধা বন্ধ হারা হয়ে। এর আনুপাতিক অংশ যত ক্ষুদ্রই হোক না কেন এর সামাজিক প্রতিক্রিয়া নিশ্চয়ই বৃহৎ।" মুসলিম নারীরাও ক্রমশই বেশী সংখ্যায় শিক্ষার অঙ্গণে এসেছেন তাই নয় ক্রমশ তাঁরা প্রথাগত উচ্চ শিক্ষার বিভিন্ন বিভাগেও অংশগ্রহণ করেছেন। যেমন, ইদ্দেন্নেসা বিবি মাত্র ১৯ বছর বয়সে ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল থেকে মেডিসিন ও সার্জারিতে ভার্ণাকুলার লাইসেন্সিয়েট পাশ করেন। ১৯০৩ সালের সরকারী রেকর্ডে তাঁকে ময়মনসিংহ বিদ্যাময়ী ফিমেল হাসপাতালের বাঙালী মুসলমান লেডি ডাক্তার বলে উল্লেখ করা হয়েছে। অপর খ্যাতনামা মহিলা মোসাম্মাৎ লতিফুন্নেসা, যিনি ক্যাম্পবেল মেডিকেল স্কুল পরীক্ষায় ডিস্টিংসনসহ পাশ করেন। অনিবার্যভাবে মনে পড়ে বিশ শতকের প্রথমাংশেই বেশ কয়েকজন হিন্দু মহিলা স্নাতক স্তরে বিজ্ঞান বিভাগে পড়েছেন। অথচ মুসলিম মহিলাদের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা দুই অতিক্রম করেনি। খুজিস্তা আখতার বানুই সম্ভবত প্রথম মুসলিম মহিলা যিনি সিনিয়ার কেম্ব্রিজ পাশ করেন। ১৯১৯ সালে ব্যারিস্টার আবদুল রসুলের কন্যা ম্যাট্রিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯২২ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেগম সুলতান মুয়ায়িদজাদা বি. এ. সম্মানিক ডিগ্রি লাভ করেন। ১৯২০-র দশকে বেগম সাকিনা ফারুক সুলতান মুয়ায়িদজাদা আইনে এম.এ. পাশ করেন। ১৯২৭ সালে ফজিলাতুন্নেসা ফলিত গণিতে এম.এ. পাশ করেন। ১৯৩৯ সালে মেহের তোয়েব বি.এস.সি. পরীক্ষায় পাশ করেন। বস্তুতপক্ষে ১৯৪০-এর

দশক থেকে মুসলিম মহিলাদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উন্নতির একটা ধারা বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যায়। ১৯৪০ সালে বৃত্তিমূলক কলেজগুলিতে মুসলিম ছাত্রীর সংখ্যা ছিল ১০৮, উচ্চবিদ্যালয়গুলিতে ৫২৪, মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলিতে ১০৫০, প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে ৪, ২১, ৪২০ এবং অন্যান্য বিদ্যালয়ে ৫৯৬২ জন। আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি ধর্মীয় শিক্ষার ক্ষেত্রেও মুসলিম মেয়েরা অগ্রসর হচ্ছিল। মক্তব এবং মাদ্রাসাগুলির সংখ্যা ও ছাত্রীর সংখ্যা দুই ক্রমবর্ধমান ছিল। মক্তবগুলি প্রধানত গ্রামে স্থাপিত হয়েছিল। এবং এগুলি মুসলিম মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এনেছিল।

১২.৬.১১.৪ : স্বাধীনতা – উত্তরকালে নারী শিক্ষা

সুতরাং হিন্দু-মুসলিম উভয় জনগোষ্ঠীর ক্ষেত্রেই সময়ের সঙ্গে নারী শিক্ষা বিস্তার লাভ করেছে--- কি বিষয়গত ক্ষেত্রে, কি সংখ্যাগত ক্ষেত্রে। কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার এবং পুরুষের মধ্যে শিক্ষিতের সংখ্যার পরিপ্রেক্ষিতে উভয় জনগোষ্ঠীতেই ‘নারী শিক্ষার হার যথেষ্টই নীচে ছিল। ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা এবং দেশবিভাজনের ফলে অন্যান্য সকল বিষয়ের মতো শিক্ষাক্ষেত্রেও একটা ব্যাপক পরিবর্তন সূচিত হয়। দেশভাগের ফলে বাংলায় ঘটে এক ব্যাপক জনবিস্ফোরণ। ওদেশ থেকে এদেশে যাঁরা চলে আসেন তাঁদের বেশীর ভাগই এসেছিলেন এক ভ্রাতৃঘাতী দাঙ্গার মধ্যে কিংবা প্রত্যক্ষভাবে দাঙ্গা না বাধলেও যেকোন মুহূর্তে তা বাধবে --- এমনই এক ভয়াবহ পরিস্থিতিতে। ফলে এই মানুষগুলি কোন সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থাদির মাধ্যমেও দেশান্তরিত হননি। প্রায় আকস্মিকভাবে বিষয় সম্পত্তি সব ছেড়ে তাঁরা চলে আসতে বাধ্য হন। ফলে দেশে ব্যাপক বেকারি - অভাব - অরাজক অবস্থা এবং আগত মানুষগুলির হাতেও খাওয়ার-পরার-বাঁচার কোন সংস্থান ছিল না। এই জনবিস্ফোরণের ধাক্কায় একটা বিষয় এই হয়েছিল যে মেয়েরা বিরাট সংখ্যায় লেখাপড়া শিখতে বাধ্য হন। কারণ একদিকে এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে মানুষের মনের যে রক্ষণশীলতা তা ভেঙে যায়। অপর দিকে বাঁচার তাগিদে চাকরীর জন্য লেখাপড়াটাই একমাত্র হাতিয়ার হয়ে ওঠে। সহজাত যে মেধা ও বুদ্ধি সেটাই তখন মানুষের একমাত্র সম্পত্তি। ফলে সেই সম্পত্তির জোরেই তাকে তার বাঁচার পথ খুঁজে নিতে হয়। তারফলে মেয়েদের লেখাপড়া শেখার আগ্রহ, তারচেয়েও অভিভাবকদের শেখানোর আগ্রহ নারী শিক্ষার বিস্তারের পথ প্রণয়ণ করে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে যে মহিলারা শিক্ষিত হয়ে এসেছিলেন তাঁদের দ্বারা শিক্ষিকা পাবার সমস্যাও দূরীভূত হয়। ফলে বিদ্যালয় থেকে বিশ্ববিদ্যালয় --- সর্বত্রই ছাত্রী সংখ্যা বাড়ে--- যা ক্রমান্বয়ে বিদ্যালয় সংখ্যা ও শিক্ষিকার সংখ্যাও বাড়াতে সাহায্য করে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলির উপর চাপ বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যক্তিবর্গকেও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খেলায় উৎসাহিত করে এবং সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করে।

স্বাধীন ভারতে শিক্ষা পদ্ধতি কী হবে তা নির্ধারণের জন্য সরকার একাধিক শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। কিন্তু মূল শিক্ষা কাঠামোয় খুব নতুন কোন ব্যবস্থা বা পরিবর্তন দেখা যায়নি। অবশ্যই দেশের

সার্বিক নীতি অনুযায়ী ধর্ম নিরপেক্ষ শিক্ষা ব্যবস্থা গৃহীত হয়েছে এবং নারী পুরুষে শিক্ষার বিষয়ে সমতাও প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। শিক্ষাক্ষেত্রে তিন ধরনের ব্যবস্থা বিদ্যমান হয়েছে। এক সরাসারি সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, দুই সরকার নিয়ন্ত্রিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, তিন পুরোপুরি ব্যক্তিগত বা গোষ্ঠীগত মালিকানাভিত্তিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। শিক্ষার্থীর সংখ্যা বৃদ্ধির কারণে এবং সুষ্ঠু পরিচালন ব্যবস্থার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের উপর থেকে সামগ্রিক শিক্ষার নিয়ন্ত্রণের দায়িত্ব লাঘব করা হয়েছে। বিদ্যালয় স্তরের শিক্ষা ব্যবস্থার নিয়ন্ত্রণের জন্য পরবর্তী সময়ে গঠিত হয়েছে স্বতন্ত্র পর্ষদ। আবার বিদ্যালয়ের মধ্যে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক এবং আরও পরবর্তী সময়ে উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়গুলির নিয়ন্ত্রণও বিভাজিত হয়েছে স্বতন্ত্র পর্ষদের উপর। স্ত্রী শিক্ষা বৃদ্ধি পেয়েছে ঠিকই। কিন্তু স্বাধীনতার পরেও নানা আর্থ-সামাজিক কারণে শিক্ষাকে সার্বজনীন করা যায় নি। অনিবার্যভাবেই আজও শিক্ষিতের হার পুরুষের তুলনায় মেয়েদের কমই থেকে গেছে। নারী শিক্ষার সংখ্যাগত দুর্বলতার কারণে সমাজে কুসংস্কার সামাজিক নিপীড়ন স্বাধীনতার অভাব আজও নারী জাতির ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃতভাবে বেশী। যে অংশ শিক্ষার সুযোগ পান তাঁদেরও চিত্তের মুক্তি বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই হয় না। কারণ ব্রিটিশের কেরানী তৈরীর শিক্ষাপদ্ধতি থেকে স্বাধীন ভারতের শিক্ষা ব্যবস্থাও খুব বেশী দূরে সরে আসতে পারেনি। তাই কার্যত আজও আমাদের কাছে শিক্ষা 'সাপলাই' হয়ে আছে যা বাইরে থেকে ঘরে এসে গুছিয়ে বাক্সে ভরে রাখা হয়। শিক্ষা জীবনের ও মননের অঙ্গ হয়ে ওঠে না। এই সীমাবদ্ধ শিক্ষাও আবার সবার কাছে পৌঁছায় না। তবু চেষ্টা হয়েছে বা এখনও হচ্ছে শিক্ষার বিকাশের লক্ষ্যে। অধিক অনগ্রসর শ্রেণীর মানুষদের, সমাজের মূল স্রোতের নিকটবর্তী করতে শিক্ষাক্ষেত্রেও স্বাধীনতার পর সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। কিন্তু কালক্রমে বোঝা যাচ্ছে সে ব্যবস্থাও ত্রুটিমুক্ত নয়। ফলে স্বাধীনতার পর যতটা অগ্রগতি সামগ্রিকভাবে এবং নারীশিক্ষার ক্ষেত্রে আশা করা হয়েছিল সেই পরিমাণ অগ্রগতি সম্ভব হয়নি। অথচ একথা যথার্থ যে মা শিক্ষিত হলে সন্তান নিরক্ষর থাকে না। তাই নারী শিক্ষার উপর জোর দেওয়া অবশ্যই অধিক জরুরী। নারী শিক্ষার অগ্রগতিই সর্বশিক্ষার প্রচেষ্টাকে সাফল্য দিতে পারবে। নেপোলিয়ান বোনাপার্ট বলেছিলেন যে, ভালো মায়েরাই ভালো জাতি তৈরী করেন। সত্যিকার ভালো জাতির নির্মাণে শিক্ষিতা মায়েদের ভূমিকাই সবচেয়ে বেশী। কাজেই নারী শিক্ষা যেকোন জাতিরই উন্নয়নের অন্যতম প্রধান হাতিয়ার।

একথা অনস্বীকার্য যে, শিক্ষা আনে চেতনা। তাই যখন নারীরা শিক্ষিত হয়েছেন তাঁদের চেতনারও উন্মেষ হয়েছে। নারী তার অধিকার, দায়িত্ব, কর্তব্য সকল বিষয়েই সচেতন হয়েছেন। ফলে নারীরা সংঘবদ্ধ হতে চেষ্টা করেছেন। নারীরা কখনো আপন ভাগ্য জয় করার অধিকার পাবার জন্য, কখনো বা দেশের কাজে আত্মনিয়োগের জন্য, কখনো বা নিজেদের মননের বিকাশের জন্য নানা স্তরে, নানা সময়ে গড়ে তুলেছেন নিজেদের নানা প্রচার সংগঠন। উনিশ শতকের মধ্যভাগে বাংলায় নারীদের উন্নতি কল্পে কতকগুলি সংগঠন গড়ে ওঠে যেগুলির হোতারা ছিলেন কিছু উদার মনস্ক পুরুষ। তাঁরা নারী শিক্ষা বা নারীদের বিভিন্ন সমস্যা ও নারীদের প্রতি সামাজিক নির্যাতনের বিষয় নিয়ে কাজ করতেন। তবু

এগুলিকে নারীদের সমিতি হিসাবে চিহ্নিত করা যায় না। স্বর্ণকুমারী দেবীর নেতৃত্বে ও চেষ্টায় গড়ে ওঠেছিল মেয়েদের নিজস্ব সংগঠন 'সখী সমিতি' কিন্তু তা স্থায়ী হয়নি। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা সরলা দেবী গড়ে তুলেছিলেন 'ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল'। এই সংগঠনটির কিছু কাজকর্ম ও স্থায়িত্ব দুই ছিল। মহিলা সংগঠনটিকে তিনি একটি সর্বভারতীয় রূপ দেবার প্রচেষ্টা করেছিলেন। অবশেষে ১৯১০ সালে গড়ে ওঠে 'অল ইন্ডিয়া উইমেন্স অ্যাসোসিয়েশন'। এটিকেই প্রথম মহিলাদের নেতৃত্বে, মহিলাদের জন্য, সর্বভারতীয় চরিত্রের মহিলা সংগঠনের স্বীকৃতি দেওয়া যায়। পরবর্তীকালে বিভিন্ন সংগঠনের এবং রাজনৈতিক দলের তত্ত্বাবধানে গড়ে ওঠেছে বিভিন্ন মহিলা সংগঠন। এই সংগঠনগুলির মধ্যে অনেকগুলি কাজের ক্ষেত্রে যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। মহিলাদের নানা সমস্যার সমাধানে, রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াই-এ, নানাপ্রকার দাবী আদায়ের সংগ্রামে, এমনকি সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা বা প্রাকৃতিক-সামাজিক বিপর্যয়ের সময়েও এই সংগঠনগুলি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছে। এই সমিতিগুলির নেতৃত্ব, পরিচালনা, কর্মী সকলেই মহিলা কিন্তু এই জাতীয় সমিতিগুলির নিজস্ব স্বতন্ত্র চিন্তাভাবনা থাকা সম্ভব নয়। যেহেতু কোন একটি সংগঠনের সঙ্গে এই মহিলা সমিতিগুলি জড়িত সুতরাং এই সমিতিগুলির আদর্শ মূল সংগঠনের আদর্শেই নির্দ্ধারিত। তবু সর্বস্তরের মহিলাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধিতে এবং মহিলাদের পরিবার থেকে রাষ্ট্র সর্বস্তরেই নিজস্ব নানাবিধ সমস্যার সমাধানে এই নারী সংগঠনগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যেহেতু এদেশের সমাজে নারীরা এখনও স্বতন্ত্র মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হতে পারেননি এবং বেশীরভাগ মহিলাই অর্থনৈতিকভাবে স্বাধীন নন সুতরাং নারীর একান্ত নিজস্ব কার্যকরী সমিতির উপস্থিতিও সহজ নয়। তবু সীমিত পরিসরে হলেও মহিলাদের বিভিন্ন সংগঠন অবশ্যই মহিলাদের সচেতনতা বৃদ্ধিতে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিভিন্ন সমস্যার সমাধানে মহিলাদের সাহায্য করে, মহিলাদের আত্মবিশ্বাস তৈরীতে যথেষ্ট সহায়ক শক্তি হিসাবে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। সেখানেই এই মহিলা সংগঠনগুলির যথার্থতা।

১২.৬.১১.৫ : সহায়ক গ্রন্থাবলী

১। সুপর্ণা গুপ্ত (সম্পাদিত) ঃ ইতিহাসে নারী ঃ শিক্ষা, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা।

২। যোগেশ চন্দ্র বাগল ঃ বাংলায় স্ত্রী শিক্ষা ১৮০০-১৮৫৬, বিশ্বভারতী, কলকাতা।

৩। বিনয়ভূষণ রায় ঃ অন্তঃপুরে স্ত্রীশিক্ষা, নয়াউদ্যোগ, কলকাতা।

৪। ড: আনোয়ার হোসেন ঃ স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলার মুসলিম নারী ১৮৭৩-১৯৪৭, প্রগতিশীল প্রকাশক, কলকাতা।

৫। নিবেদিতা পুরকায়স্থ ঃ মুক্তিমঞ্চে নারী, প্রিপট্রাস্ট, ঢাকা।

৬। কে.এম.আশরাফ ঃ হিন্দুস্থানের জনজীবন ও জীবনচর্যা, পার্ল পাবলিশার্স, কলকাতা।

৭। বিনয় ঘোষ ঃ বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ, ওরিয়েন্ট লংম্যান, কলকাতা

৯। Kumkum Roy (ed) : Women in early Indian Societies, Manohar, New Delhi

১০। Gail Minault, Secluded Scholars : Women Education and Muslim Social Reform In Colonial India, Oxford University Press.

১১। N.S. Bose : Indian Awakening and Bengal, Calcutta.

১২। Borthwick Meredith : The Changing Role of Women in Bengal 1849-1905, Princeton University Press, Princeton.

১৩। A. S. Altekar : Education in Ancient India, Varanasi.

১২.৬.১১.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। প্রাচীন ভারতে স্ত্রী শিক্ষার বিষয়ে আলোচনা কর। নারীর আর্থ-সামাজিক অবস্থান কি শিক্ষার ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করেছিল?

২। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ইংরেজ শাসকদের ভূমিকা সদর্থক ছিল বলে কি তুমি মনে কর?

৩। মুসলিম নারীদের শিক্ষার প্রসারে মুসলিম মহিলাদের অবদান কতখানি?

৪। 'শিক্ষা আনে চেতনা'-এই মতানুযায়ী কি নারীদের সংগঠন গড়ে উঠেছিল বলে তুমি মনে কর? প্রাচীন যুগ থেকে আধুনিক যুগ পর্যন্ত সময়কে বিশ্লেষণ করে তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

____

পর্যায় গ্রন্থ - ৬

EDUCATION AND WOMEN & WOMEN'S ORGANISATIONS

একক - ১২

(a) Colonial -- Local, Provinical,National (b) Post - ndependence

---

বিন্যাসক্রম :

১২.৬.১২.০	:	উদ্দেশ্য
১২.৬.১২.১	:	প্রাক্ ঔপনিবেশিক আমলে নারীর সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষার ধারা
১২.৬.১২.২	:	ঔপনিবেশিক আমলে নারী শিক্ষা ও সংগঠনের বিকাশ
১২.৬.১২.৩	:	উপসংহার
১২.৬.১২.৪	:	সহায়ক গ্রন্থাবলী
১২.৬.১২.৫	:	সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৬.১২.০ ঃ উদ্দেশ্য

ভারতের নারী প্রগতির ইতিহাসে নারী শিক্ষা ও মহিলা সংগঠনের বিকাশ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কারণ শিক্ষা আনে চেতনা আর চেতনা প্রকাশ লাভ করে পরিচিতি নির্মাণ, সংগঠন ও সামাজিক বিকাশের মধ্যে। স্বাধীনোত্তর ভারতে বিশেষ করে সাতের দশক থেকে নারীচর্চা (Women Studies) ও নারীবাদের (Feminism) বিকাশ ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থান, সামাজিক দৈন্যতা, তাদের সামাজিক উন্নয়ন ইত্যাদি বিষয়কে আধুনিক ভারতের বিষয়ে পরিণত করে। তবে আধুনিক ভারতে নারী শিক্ষা, নারী সংগঠনের বিস্তার খুব সহজে হয়নি। প্রাক্ ঔপনিবেশিক যুগের সামাজিক প্রথা তথা নারীর অবদমিত সামাজিক অবস্থানের পরিবর্তনের পেছনে ঔপনিবেশিক শাসনের বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। বিশেষ করে ভারতীয় পুরুষদের মধ্যে পাশ্চাত্যের যুক্তিবাদী শিক্ষার বিস্তার বহুকাল ধরে চলে আসা সামাজিক কুসংস্কারগুলিকে আঘাত করে সমূলে বিনাশ করতে উদ্দীপ্ত করেছিল। অন্যদিকে সমাজ সংস্কার আন্দোলন ভারতীয় নারীকে আধুনিক শিক্ষা লাভের দরজা খুলে দিয়েছিল উনবিংশ শতকে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। বিংশ শতক থেকে ভারতীয়দের রাজনৈতিক চেতনার দ্রুত বিকাশ নারীকে অবগুণ্ঠন থেকে জনসমক্ষে নিয়ে আসে। পাশাপাশি ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে গণ আন্দোলনের বিকাশ নারীমুক্তি নারীচেতনা ও নারী শিক্ষা তথা নারী সংগঠনের সহায়ক হয়েছিল।

স্বাধীনোত্তর ভারতে সাংবিধানিক রক্ষাকবচ তথা নারী প্রগতির জন্য বিভিন্ন পদক্ষেপ নারী শিক্ষার বিশেষ করে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবণতাকে ক্রমবর্ধমান করে তোলে। পাশাপাশি নারী প্রগতির রাজনীতিকরণ (Politicization) নারী শিক্ষা ও সংগঠনের বিকাশের সহযোগী হয়। আলোচ্য এককে ঔপনিবেশিক ও স্বাধীনোত্তর ভারতে নারী শিক্ষার বিস্তার ও নারী সংগঠনের বিকাশের প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে।

১২.৬.১২.১ ঃ প্রাক্ ঔপনিবেশিক আমলে নারীর সামাজিক অবস্থান ও শিক্ষার ধারা

ভারতের মানব সভ্যতার বিকাশের বিভিন্ন পর্যায় পর্যালোচনা করলে লক্ষ্য করা যায় যে ঐতিহাসিক যুগের সূচনায় নারীর সামাজিক অবস্থান অবদমিত ছিল না। ঋগ্বৈদিক যুগের বিভিন্ন সাহিত্য বা পরবর্তীকালের ঐতিহাসিক তথ্যগুলিতে দেখা যায় যে বৈদিক যুগে ধর্মীয় আচার-আচরণ তথা যাগযজ্ঞে ভারতীয় নারীও অংশগ্রহণ করতেন। অর্থাৎ পুরুষের মতো নারীর শিক্ষা লাভ করার সুযোগ ছি। উভয়েই উপনয়নের পর শিক্ষার জগতে প্রবেশ করতো। শিক্ষক, দার্শনিক বা তার্কিক হিসাবেই তাই স্বনামধন্য নারীর উল্লেখ পাওয়া যায় এই সময়। এক্ষেত্রে লোপামুদ্রা, ঘোষা, অপলা, বাক্ ও বিশ্ববরার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এমনকি পরবর্তী বৈদিক যুগেও (Later Vedic Period) কতিপয় শিক্ষিত নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। যারা আজীবন শিক্ষা ধ্যান চর্চায় মগ্ন থাকতেন তাদেরকে বলা হতো ব্রহ্মবাদিনী এবং যারা বিয়ের পূর্ব পর্যন্ত অধ্যয়ন করতেন তারা সদ্যবধূ হিসাবে চিহ্নিত হতেন।

কিন্তু পরবর্তী বৈদিক যুগের শেষ পর্যায় থেকে নারী শিক্ষার উক্ত ধারা ক্রমশ অবলুপ্ত হতে থাকে। বিশেষ করে সূত্র ও স্মৃতিশাস্ত্রের সময়ে (500 BC to 500 A.D.) প্রথাগত জাতিব্যবস্থা (Traditional

caste system) ও যাগযজ্ঞে পুরোহিতদের একাধিপত্য স্থাপিত হয় যা নারী ও নিম্নবর্গীয় জাতি (Lower castes) ও অবর্ণ ও অস্পৃশ্য (Non-caste or untouchable) দের প্রথাগত বিদ্যাচর্চার অনুপযোগী হিসাবে বর্ণনা করে। মনুস্মৃতি নারীর উপনয়ন নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। পাশাপাশি নারীর স্বাধীন সত্তা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার পথ বন্ধ করে দেয়।

তবে বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি ও বিকাশ নারীর শিক্ষার অধিকারকে পুনরুজ্জীবিত করে। কারণ বৌদ্ধধর্ম সামাজিক ও ধর্মীয় সমতায় বিশ্বাস করত। বৌদ্ধ সন্ন্যাসিনীদের ভিক্ষুণী সংঘ তাদের শিক্ষার বিষয়টিকে চিহ্নিত করে। তারা শাস্ত্র পাঠের সুযোগ লাভ করে। এমনকি কবি, সাহিত্যিক ও দার্শনিক হিসাবে বিকাশ লাভ করে বৌদ্ধ নারী। পালী ভাষায় লেখা থেরীগাঁথা-এর উজ্জ্বল উদাহরণ।(Therigatha)

কিন্তু বৌদ্ধ শিক্ষা ব্যবস্থা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি। দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতক থেকে ভারত তুর্কী-আফগান ও মুঘল শাসনকালে পুনরায় মনুস্মৃতির বিধিনিষেধ আরোপিত হয়। পর্দা প্রথা প্রচলনের পেছনে পরোক্ষাভাবে মুসলীম শাসক গোষ্ঠীর নারী লোলুপতাও দায়ী ছিল। হিন্দু শাসক গোষ্ঠীর মধ্যে সতীদাহ প্রথাও চালু হয়।

পর্দা, সতীর পাশাপাশি কৌলিন্য প্রথা, বাল্যবিবাহ, কন্যাসন্তান হত্যা ইত্যাদি নারীর শিক্ষা লাভের সুযোগকে গলা টিপে হত্যা করেছিল। তবে মধ্যযুগের ভারতে বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু প্রভাবশালী ও শিক্ষিত নারীর সন্ধান পাওয়া যায়। যেমন – রাজিয়া সুলতানা, চান্দ বিবি, গুলবদন বেগম, মমতাজ মহল, বেজউন্নিষা বেগম, রূপমতি, পদ্মাবতী, রুদ্রমা দেবী, (লক্ষীদেবী বিবিধ চন্দ্র এর রচয়িতা), মীরাবাঈ, অহল্যাবাঈ ইত্যাদি। তাছাড়া উনিশ শতকে বিক্ষিপ্তভাবে শাসক নারীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করা যায় গৌরী পার্বতী বাঈ (১৮১৪ - ২৯) লক্ষীবাঈ (১৮৩৫ - ৫০) তবে সামগ্রিকভাবে ঔপনিবেশিক শাসনের পূর্বে নারী শিক্ষার ধারা প্রায় অবলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

১২.৬.১২.২ ঃ ঔপনিবেশিক আমলে নারী শিক্ষা ও সংগঠনের বিকাশ

ভারতের ঔপনিবেশিক শাসনের প্রতিষ্ঠা ভারতের নারী শিক্ষার বিস্তারে নতুন অধ্যায় সূচনা করে। এক্ষেত্রে কয়েকটি পর্যায় লক্ষ্য করা যায় – (১) খ্রীষ্টান মিশনারীদের প্রয়াস (২) সমাজ সংস্কার আন্দোলন (৩) সরকারী প্রয়াস (৪) রাজনৈতিক আন্দোলন (৫) নারী সংগঠনের বিকাশ ইত্যাদি।

ভারতে ঔপনিবেশিক শাসন দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে থেকেই ভারতে খ্রীষ্টান মিশনারীগণ নারী শিক্ষার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন। মূলত খ্রীষ্টান ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে মিশনারীগণ নারী শিক্ষার প্রয়াস শুরু করেছিলেন। তারা মনে করতেন যে হিন্দু পরিবারের নারীদের মধ্যে খ্রীষ্টান ভাবধারা প্রচার করতে পারলে ধর্মান্তরিতকরণ অনেক সহজ হবে।

ভারতে ব্রিটিশ শাসন পাকাপোক্তভাবে স্থাপিত হওয়ার আগে পর্যন্ত খ্রীষ্টান মিশনারীগণ খোলাখোলি ও স্বাধীনভাবে কাজ করতেন। কিন্তু শাসনতান্ত্রিক প্রয়োজনীয়তার কথা মাথায় রেখে ব্রিটিশ শাসকগণ খ্রীষ্টান মিশনারীদের কর্মকান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছিলেন। কারণ তারা ভারতীয় অভিজাতদের বিরাগভাজন হতে রাজী ছিলেন না। তবে নারীশিক্ষা বিস্তারে মিশনারীদের কর্মকান্ড নিয়ন্ত্রণের পরিবর্তে উৎসাহিত হয়েছিল ভারতীয় অভিজাত পরিবার বর্গের দ্বারাই।

রবার্ট মেরীর প্রচেষ্টায় চুঁচুড়ায় প্রথম বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয় ১৮১৭ সালে। ধীরে ধীরে ভারতের

বিভিন্ন প্রান্তে মিশনারীগণ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। The Church Missionary Society দক্ষিণ ভারতে বিশেষ সফলতা অর্জন করে। তিরুনেলভোলতে ১৮২১ সালে প্রথম আবাসিক বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৪০ সালের মধ্যে Schatish Church Society ছয়টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করে। উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সিতে মিশনারীগণ ৮০০০ বালিকাকে শিক্ষার আওতায় নিয়ে আসে।

নারী শিক্ষার বিকাশে মিশনারীদের সদর্থক প্রয়াসকে সমর্থন যুগিয়েছিলেন ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ। Calcutta School (1816), Calcutta Female Juvenile Society (1819) এক্ষেত্রে ভারতীয়দের সমর্থন পেয়েছিল। তবে ভারতীয় হিন্দু নারীদের শিক্ষালাভ করার সুযোগ তৈরি হয়েছিল সমাজ সংস্কারকদের নারীর উপর চাপানো বিধি নিষেধ সমূহের দূরীকরণের দ্বারা। এক্ষেত্রে সতীদাহ প্রথা রদ, বিধবা বিবাহ, বাল্যবিবাহ বন্ধ করা ইত্যাদি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

ব্রিটিশ ভারতে রাজা রামমোহন রায় (১৭৭৪ - ১৮৩৩) প্রথম নারী সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের আন্দোলন শুরু করেন। তিনি বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও কৌলিন্য প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন শুরু করেন। নারী শিক্ষার বিস্তার ও বিধবা বিবাহও তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে রামমোহন রায় সবচেয়ে বেশী পরিচিত হয়েছেন সতীদাহ প্রথা নিবারণের আন্দোলনের জন্য। রামমোহনের সহযোগিতায় ১৮২৯ সালে Lord William Bentinck সতীদাহ প্রথা নিবারণ আইন গ্রহণ করেন। সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে চালিয়ে যাওয়ার জন্য ১৮২৮ সালে তিনি ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা করেন।

১৮৪৩ সালে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮১৭ - ১৯০৫) ব্রাহ্ম সমাজে যোগ দেন ও নারী শিক্ষাবিস্তার, বিধবা বিবাহ এবং বাল্যবিবাহ বন্ধ করার জন্য সমাজোন্নোতি বিধায়নী সুহৃদ সমিতি স্থাপন করেন ১৯৫৪ সালে। কেশবচন্দ্র সেন (১৮৩৮ - ১৮৮৪) ও শিবনাথ শাস্ত্রী ব্রাহ্ম সমাজে যোগদান করার ফলে নারী শিক্ষার বিকাশে ব্রাহ্ম সমাজ উল্লেখযোগ্য অবদান সংযোগ করেছিল।

পাশাপাশি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (১৮২০ - ১৮৯১) নারী শিক্ষার বিকাশে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁর ও J.E. Drinkwater Bethune -এর প্রচেষ্টায় ১৮৪৯ খ্রীষ্টাব্দে হিন্দু বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ১৮৫৭ - ১৮৫৮ মধ্যে বিদ্যাসাগরের প্রচেষ্টায় ৩৫টি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। শিক্ষা বিস্তার ছাড়াও বিধবা বিবাহ আইন (Widow Remarriage Act 1856) প্রণয়নের ক্ষেত্রেও তার বিশেষ ভূমিকা ছিল।

বাংলা ছাড়াও মহারাষ্ট্রে বিধবা বিবাহ ও নারী শিক্ষার বিকাশে ভারতীয় সমাজ সংস্কারকগণ উদ্যোগী হয়েছিলেন। জোতিরা ফুলে, কারসন দাস মুলজী, বিষ্ণুশাস্ত্রী পণ্ডিত, হরিদেশমুখ ও মহাদেব গবিন্দ রানাডে (১৮৪২ - ১৯০১) এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অন্ধ্রপ্রদেশে অনুরূপ ভূমিকা পালন করেছিলেন বন্দুকুরি বিরসালিঙ্গম।

পারশিক সমাজ সংস্কারক B. M. Balabari ও বাল্যবিবাহ বন্ধ ও বিধবা বিবাহ প্রচলনের জন্য আন্দোলন করেছিলেন উনবিংশ শতকের শেষার্ধে। মূলত তার একনিষ্ঠ প্রচেষ্টায় ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে Age of Consent Act গৃহীত হয় যা বিয়েতে সম্মতি দানের বয়স ১০ থেকে ১২তে দাঁড়ায়। যদিও গোঁড়া হিন্দু ও জাতীয়তাবাদীদের অনেকেই এই আইনের বিরোধিতা করেছিলেন কিন্তু B. M. Malabari দমে থাকার পাত্র ছিলেন না।

নারী প্রগতি তথা নারীমুক্তি আন্দোলনের আরেকজন অন্যতম হোতা ছিলেন আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা (১৮৫৭) স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী (১৮২৪ - ৮৩)। তিনি প্রণপ্রথা, বাল্যবিবাহ রদ সহ নারীশিক্ষার পক্ষপাতী ছিলেন। পরবর্তীকালে দয়ানন্দের প্রয়াসকে সযত্নে পালন করেছিলেন হংসরাজ, মুন্সীরাম ও লালা লাজপত রাই।

স্বামী বিবেকানন্দও নারীশিক্ষা বিস্তারের অন্যতম প্রচারক ছিলেন। তিনি মনে করতেন যে নারী শিক্ষার মাধ্যমে তার সমস্যা সমূহের সমাধান করতে পারে। তার মতে – "All nations have attained greatness by paying proper respect to women. That country and that nation which do not respect women have never become great, nor will ever be future. The principle reason why our race is so much degarded is that you had no respect for these living images of shakti".

মহারাষ্ট্রে নারীমুক্তি ও নারী শিক্ষা বিকাশের আরেকজন সংস্কারক ছিলেন Gopal Krishna Gokhale (1866 - 1915)। তবে ঔপনিবেশিক আমলে নারী শিক্ষা বিস্তারের সবচেয়ে বেশি বাস্তবতা প্রদর্শন করেছিলেন D. K. Karve। তিনি ১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে Hindu Widow স্থাপন করেন। তার হাতেই সৃষ্টি হয় অনাথ বালিকাশ্রম, মহিলা বিদ্যালয় এবং নিস্কাম কর্ম মঠ। তবে নারী প্রগতির ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অবদান হল ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে মহিলা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন।

নারী প্রগতির জন্য সমাজ সংস্কার শুধুমাত্র হিন্দু সমাজেই সীমাবদ্ধ ছিলনা। স্যার সৈয়দ আহমেদ খাঁনও মুসলিম মহিলাদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেছিলেন। তাছাড়া ভারতীয় মুসলমান মহিলাগণও নারী শিক্ষার জন্য প্রচার করতেন। এক্ষেত্রে বেগম রোকেয়ার নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় পুরুষদের দ্বারা গ্রহণ করা সমাজ সংস্কারের আন্দোলন সমালোচনার বাইরে নয়। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় অভিযোগ উঠেছে যে গ্রহণযোগ্য ও প্রদর্শন যোগ্য কন্যা ও স্ত্রী (Presentable daughters and wifes) তৈরি করার জন্যই নারী শিক্ষার বিকাশ ছিল পুরুষের সামাজিক প্রয়োজন। এই সামাজিক প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করার জন্যই উচ্চবর্গীয় হিন্দু সমাজে নারী শিক্ষার প্রচলন সহজ হয়েছিল। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য যে পুরুষদের দ্বারা সৃষ্ট সমাজ সংস্কার তথা নারী প্রগতির আন্দোলন পরবর্তীকালে নারীর নেতৃত্বেও পরিচালিত হয়েছে। এক্ষেত্রে সাবিত্রীবাঈ পণ্ডিত রামাবাঈ সরস্বতী (১৮৫৮ - ১৯২২) রামাবাঈ রানাডে (১৮৬২ - ১৯২৪), আনন্দীবাঈ জোষী (১৮৬৫ - ১৮৮৭), F. Sorabji (১৮৩৩, ১৯১০), অ্যানিবেশান্ত (১৮৪৭ - ১৯৩৩), সুনীতি দেবী (১৮৬৪ - ১৯৩২) প্রভৃতির নাম বিশেষভাবে স্মরণীয়।

সমাজ সংস্কারকদের নারী প্রগতির প্রয়াসসমূহ বিশেষভাবে প্রতিফলিত হয়েছে নারীর জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ওরাজনীতিতে অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে। বৈপ্লবিক সন্ত্রাসবাদী (Revolutionbary Terrorism) থেকে গণ আন্দোলন সবক্ষেত্রেই বিংশ শতকের প্রথমার্ধে ভারতীয় নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। স্বদেশী আন্দোলন ও পরবর্তীকালে মহাত্মা গান্ধীর নেতৃত্বে অসহযোগ আন্দোলন (১৯২০ - ২২) আইন অমান্য আন্দোলন (১৯৩০ - ৩২) ও ভারত ছাড়ো আন্দোলনে (১৯৪২ - ৪৪) ব্যাপকহারে নারীর অংশগ্রহণ নারী শিক্ষা ও নারী সংগঠনের বিকাশের পক্ষে সদর্থক ভূমিকা পালন করেছিল।

১৯২০ খ্রীষ্টাব্দের পরবর্তীকালে সরাসরি রাজনীতিতে অংশগ্রহণের জন্যও নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা

অনুভূত হয়। যদিও ১৯১৯ -এর Southborarough Committee নারীর ভোটাধিকারের দাবী স্বীকার করেনি। কিন্তু একথা সত্য যে ১৯২০ থেকে ভারতের সর্বত্র প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের ব্যবস্থা জোরদার হতে থাকে। বহু আবেদন নিবেদন ও আন্দোলনের পর ব্রিটিশ পার্লামেন্ট ঠিক করে নেয় নারীর ভোটাধিকারের বিষয়টি নবগঠিত প্রাদেশিক আইনসভা নির্ধারণ করবে। ১৯২১ খ্রীষ্টাব্দে মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি তার মহিলাদের ভোটাধিকার দান করে। বোম্বেও ঐ বছরই অনুরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। একে একে যুক্তপ্রদেশ (১৯২৩), আসাম (১৯২৪), পাঞ্জাব (১৯২৫), বাংলা (১৯২৫), Central Provinee (১৯২৭), দিল্লি (১৯২৭), বিহার (১৯২৯) ও উড়িষ্যাও (১৯২৯), মহিলাদের ভোটাধিকার দান করে। পরবর্তীকালে ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারত শাসন আইন (Government of India Act 1935) আইনসভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব করার অধিকারও স্বীকার করেছে।

নারী শিক্ষার বিস্তারে সমাজ সংস্কার আন্দোলন, জাতীয়তাবাদী আন্দোলন বা রাজনীতি পরোক্ষভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল নিঃসন্দেহে। কিন্তু এই প্রয়াসগুলি কখনই সফলতা অর্জন করতে পারতো না যদি শিক্ষা বিস্তারে সরকারী প্রয়াস না থাকতো। ১৮৩৬ খ্রীষ্টাব্দের অ্যাডমের Report on the condition of Education in Bengal বাংলায় নারীর শিক্ষার যে দুর্দশাগ্রস্ত চিত্র তুলে ধরেছে তা অনেকটাই দূরীভূত হতে থাকে উনবিংশ শতকের মধ্যভাগ থেকে। শিক্ষা সংক্রান্ত ব্যাপারে The Woad's despatch (1954), নারী শিক্ষার প্রয়োজনীয়তাকে গুরুত্ব সহকারে তুলে ধরেছিল। উনবিংশ শতকের মধ্যে সরকারি প্রচেষ্টায় ভারতের প্রায় সব অঞ্চলেই বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হয়েছিল। পাশাপাশি ভারতের দেশীয় রাজ্য সমূহও নারী শিক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। কোচবিহার, ত্রিপুরা এবং পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারতের দেশীয় রাজ্যের সরকার সমূহ নারী শিক্ষা বিস্তারে জোর দিয়েছিল।

বিংশ শতকে বিশেষ করে দ্বিতীয় দশক থেকে নারী শিক্ষা বিস্তারে সরকারি পদক্ষেপ আরো বেড়ে যায়। ১৯১৭ সালে গৃহীত Sri Michael Sadler -এর নেতৃত্বে The Calcutta University Commission নারী প্রগতির জন্য সহযোগী বিষয়সূচী প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করে। ১৯২১ সালের Mont Ford Report শিক্ষাকে কেবলমাত্র পুরুষের কুক্ষিগত করে না রাখার কথা ঘোষণা করে।

The Hartog Committee অনুরূপ মত তুলে ধরেছিল। তবে ১৯১৯ সালের The Government of India Act শিক্ষা ব্যবস্থাকে প্রাদেশিক বিষয় (Provincial Subject and Transfered Subjects) হিসাবে চিহ্নিত করায় প্রদেশগুলির হাতে শিক্ষা বিস্তারের অধিক সুযোগ তৈরি হয়েছিল। এই ব্যবস্থা চলাকালীন সময়ের মধ্যে বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছিল। (১৯২১ - ২২ সালে ছিল ২৩৭৭৮ টি যা ১৯২৬ - ২৭ -এ বেড়ে দাঁড়ায় ২৯৮০৬ -এ)।

সবকটি প্রদেশেই প্রাথমিক (Primary or Elimentary) শিক্ষা সংক্রান্ত কতগুলি নীতি ও পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ১৯২১ - ২২ -এ ছিল ২২৬৪০টি যা ১৯৩৬ - ৩৭ -এ বেড়ে দাঁড়ায় ৩২৩৮০টিতে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে শিক্ষিকার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। তাছাড়া Training College -এর সংখ্যা ঐ সময়ে বেড়ে দাঁড়ায় ২১৭-তে।

মাধ্যমিক শিক্ষার ক্ষেত্রেও English Middle School ও Vernacular Middle School সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল প্রাদেশিক স্বায়ত্বশাসনের আমলে। মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ২০৮ (১৯২১) থেকে বেড়ে ৪১০ (১৯৩৭) -এ। পাশাপাশি কতগুলি মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয় ভারতের বিভিন্ন

প্রান্তে। St. Marry's College (শিলং, ১৯২২), Women's College (আলিগড়, ১৯২৩), Women's College (হায়দ্রাবাদ, ১৯২৪), St. Teresa's College (কেরালা, ১৯২৫), Women's College (বারানসী, ১৯২৯), সহ আরও কতগুলি মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের ফলে নারী উচ্চশিক্ষার পথ সুগম হয়েছিল। এমনকি Medical Education বিস্তার করার জন্য Lady Hardinge Medical স্থাপিত হয় ১৯১৬ খ্রীষ্টাব্দে। অন্যদিকে Lady Irwin Home Science College (দিল্লী, ১৯৩২) গৃহবিজ্ঞান শিক্ষায় নারীকে সুযোগ এনে দিয়েছিল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে ১৯১৬ সালে Indian Women's University স্থাপন নারীর উচ্চশিক্ষা লাভের বিষয়টিকে গুরুত্ব আরোপ করেছিল। তাছাড়া বিংশশতকের গোড়া থেকে সহশিক্ষা (Co-education) -র বিষয়টিও গুরুত্ব পেতে থাকে।

ভারতীয় মহিলাদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষার বিস্তার শুধুমাত্র সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে সীমাবদ্ধ ছিলনা। শিক্ষাবিস্তারের সুদূর প্রসারী ফল হিসাবে নারীদের মধ্যে আত্মচেতনার বিকাশ ঘটতে থাকে। আত্মচেতনাকে কার্যকরী রূপ দেওয়ার জন্য সংগঠন তৈরির প্রক্রিয়া শুরু হয়। যদিও প্রথম মহিলা সংগঠনগুলোর পুরুষদের প্রভাব অস্বীকার করা যায়না। কিন্তু উনবিংশ শতকের শেষের দিক থেকে যথার্থ অর্থেই নারী সংগঠনের সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবারের কন্যা স্বর্ণকুমারী দেবী ১৮৮২ খ্রীষ্টাব্দে সখি সমিতি নামের সংগঠন তৈরি করার মধ্য দিয়ে নতুন রাস্তা খুলে দেন ভারতীয় মহিলাদের জন্য। এই সংগঠনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল মহিলাদের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক বৃদ্ধি করা ও সেবামূলক মনোভাবের বিকাশ ঘটানো। এই সংগঠনটি পরবর্তীকালে মহিলাদের হাতে কলমে কাজ শিক্ষার ব্যবস্থা করেছিল। পাশাপাশি, পণ্ডিতা রামাবাঈ সরস্বতী পুনাতে আর্য মহিলা সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন। তাছাড়া ১৮৯২ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সারদা সদন তৈরি করেছিলেন। এর উদ্দেশ্য ছিল শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি মহিলাদের কাজেরও ব্যবস্থা করা। একই উদ্দেশ্য নিয়ে রামাবাঈ, রানাডে তৈরি করেন সেবা সদন।

অন্যদিকে আহমেদাবাদে তৈরি হয় শ্রীমহিপত্রমরূপ্রম অনাথ আশ্রমের। এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দরিদ্র মহিলা ও বিধবাদের আশ্রয় দান করা। তাছাড়া অবৈধ সন্তানদেরও এখানে আশ্রয় দেওয়া হতো। পারশী মহিলাদের স্বাবলম্বী করে তোলার জন্য বোম্বাই -এ তৈরি হয় শ্রী জোরাষ্টিয়ান মণ্ডল। একইভাবে ১৯০৮ খ্রীষ্টাব্দে গুজরাটি হিন্দু স্ত্রী মহামণ্ডল এর তৈরি করেন B. N. Matiwala বোম্বাই -এর এই সংস্থাটি গুজরাটি মহিলাদের নানারকমভাবে সহযোগিতা করে অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা আনতে প্রয়াসী হয়েছিল।

বাংলার জেলাগুলো -এর মহিলারাও এ ব্যাপারে পিছিয়ে ছিলেন না। সরোজ নলিনী দেবী তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন স্থানে তৈরি হয় মহিলা সমিতির। এই সমিতিগুলি পর্দাপ্রথা ও বাল্যবিবাহ বন্ধ করা এবং বিধবা বিবাহের উপর জোর দিয়েছিল।

১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে বাগদায় প্রতিষ্ঠিত Chimanbai Maternity and Child Welfare League মহিলাদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ব্যাপারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। এরকম আরো কতগুলি মহারাণী চিমনাবাঈ উদ্যোগালয়, ভগিণি সমাজ (পুনা, ১৯১৬) ইত্যাদি।

তবে এই সংগঠনগুলি মূলত শরহ বা প্রদেশকেন্দ্রিক ছিল। স্থানীয় ও প্রদেশগুলির মধ্যেই এদের কাজকারবার সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু সরলাদেবী চৌধুরানীর নেতৃত্বে গঠিত ভারত স্ত্রী মহামণ্ডল, (১৯১০), অ্যানি বেশান্তের নেতৃত্বে গঠিত Women's India Association (1917 W.I.A.), Nation Council

of Women in India (1925 N.C.W.I) All India Women Conference (AIWC, 1926) সর্বভারতীয় স্তরের নারী সংগঠনের স্বাক্ষ্য করছে।

১৯১৭ সালে মাদ্রাজে প্রতিষ্ঠিত (W.I.A) -এর প্রধান উদ্দেশ্য ছিল –

(১) ভারতীয় মহিলাদের ভারতের কন্যা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা।

(২) সমস্ত বালিকা ও বালকদের প্রাথমিক শিক্ষা সুনিশ্চিত করা।

(৩) বাল্যবিবাহ বন্ধ করা।

(৪) মহিলাদের পৌরসভা ও আইনসভায় ভোটদানের অধিকার সুনিশ্চিত করা ও তাদের প্রতিনিধিত্বের বিকাশ ঘটানো।

(৫) পুরুষ ও নারীর মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠা করা, ইত্যাদি।

এই সংগঠনটি সাফল্যের সঙ্গে তার দাবীগুলিকে তুলে ধরেছিল। এই সংস্থার মুখপত্র স্ত্রীধর্ম ইংরাজী, তামিল ও তেলেগু ভাষায় প্রকাশিত হতো।

১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে প্রতিষ্ঠিত N.C.W.I. ঐ বছরেই International Council of Women (1888) -এর স্বীকৃতি পেয়েছিল। এর মুখ্য উদ্দেশ্যগুলি ছিল –

(১) মহিলাদের প্রতি সমবেদনা করে একতা প্রতিষ্ঠা করা।

(২) মহিলাদের জন্য সামাজিক ন্যান বিচার ও তাদের অধিকারগুলি সুনিশ্চিত করা।

(৩) অন্যান্য নারী সংগঠনগুলোর কাজকর্মকে উৎসাহিত করা।

(৪) অন্যান্য দেশের নারী সংগঠনগুলোর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করা।

All India Women's Conference (AIWC) -ই ছিল ভারতের প্রথম প্রকৃত সর্বভারতীয় মহিলা সম্মেলন যা ১৯২৭ খ্রীষ্টাব্দে পুনাতে সংগঠিত হয়েছিল। প্রথমে এই সংগঠনটির মধ্যে দুই রকমের ভাবধারা প্রচলিত ছিল। একদল মনে করত যে কেবলমাত্র শিক্ষা ও সামাজিক আন্দোলনের স্তরেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত এই সংগঠনের কাজ। অন্যদলের সমর্থকগণ একে রাজনৈতিক আন্দোলনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখার পক্ষপাতী ছিলেন। কিন্তু এই সংগঠন শিক্ষা আন্দোলন দিয়ে এর কাজ কর্ম শুরু করলেও ধীরে ধীরে সমস্ত বিষয়েই এর কর্মকান্ডকে ছড়িয়ে দেয়।

উল্লিখিত সংগঠনগুলি ছাড়াও আরো কতগুলি নানা সংগঠনের কথা উল্লেখ করা যায় যেমন – Federation of University Women in India (Calcutta 1920), Hindu Women Rescue Home (1927), জ্যোতি সংঘ (১৯৩৪), বিকাশ গৃহ (১৯৩৭) প্রজাপিতা, ব্রহ্মা ঈশ্বরীয় বিশ্ব বিদ্যালয় (১৯৩৭) ইত্যাদি।

উল্লিখিত আলোচনা থেকে একথা স্পষ্টই প্রতীয়মান যে নারী শিক্ষা বিস্তারের নারী চেতনাও ক্রমশ সাংগঠনিক রূপ পেয়েছিল। সংগঠনের বাইরেও নারীর বিদ্যাচর্চা বা আত্মচেতনার বিকাশ ঘটেছিল যার উদাহরণ পাওয়া যায় সমসাময়িক নারীর আত্মজীবনী বা রচনাসমূহের মধ্যে।

১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে ভারত স্বাধীনতা অর্জন করার পর ভারতীয় নারীর সামাজিক অবস্থান বিশেষ করে শিক্ষা বিস্তারের জন্য নানাবিধ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। একদিকে সামাজিক সমস্যার প্রতিকারের প্রয়াস ও অন্যদিকে মানোন্নয়ন এই দুই চালিকা শক্তির প্রভাবে স্বাধীনোত্তর ভারতের নারী শিক্ষার প্রগতি ক্রমবর্ধমান। শিক্ষার উন্নয়ন আলোচনা করার পূর্বে প্রতিকারমূলক ব্যবস্থার প্রতি একটু আলোকপাত করা যাক। সাংবিধানিক রক্ষাকবচ ছাড়াও স্বাধীনতার পর নারীর বিভিন্ন সংস্যার সমাধানের জন্য কতগুলি আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। এগুলি হল – Hindu Marriage and Divorce Act 1955, The Hindu Succession Act 1956, Dawery Prohibition Act 1961. Equal Remuneration Act 1976, The Indocent Representation of Women (Prohibition) Act, 1986, Sati (Prevention) Act 1987, ইত্যাদি। অন্যদিকে ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দে National Commission for Women গঠিত হয়। পাশাপাশি সংবিধানের 73rd ও 74th Constitutional Amendment Act রাজনৈতিক ব্যবস্থায় মহিলা প্রতিনিধিত্ব বাড়ানোর জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

নারী শিক্ষা বিকাশের জন্য স্বাধীনতার পর প্রথম গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হল – Dr. S. Radhakrishnan -এর নেতৃত্বে গঠিত The University Education Commission (1948 - 49)। এই কমিশন তার রিপোর্ট নারী শিক্ষার পশ্চাৎপদ অবস্থার জন্য ব্রিটিশ সরকারকে দায়ী করে। যাইহোক এই কমিশন বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী শিক্ষা বিস্তারের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করার কথা বলেছিল। প্রথমত 'Indentical' ও 'Equal' শিক্ষার মধ্যে সঠিক পার্থক্য নির্ণয় করে সমস্ত বিষয়ে নারীর শিক্ষা লাভের অধিকারের পথ নিশ্চিন্ত করার সুপারিশ জানায়। দ্বিতীয়তঃ এই কমিশন স্পষ্টভাবে বলেছিল যে The substance of education need not be the same for men and women অর্থাৎ মহিলাদের শুধুমাত্র অধিক উপযুক্ত বিষয় অর্থাৎ নার্সিং, Fine Arts বা গৃহবিদ্যা ইত্যাদির মধ্যে সীমাবদ্ধ না রাখার কথা বলেছিল। এছাড়া এই কমিশন বলেছিল যে Women must be educated because they can then pass on their education to their children as second nature, তাই এই কমিশন দেশে মহিলা মহাবিদ্যালয় স্থাপনের উপর জোর দিয়েছিল।

পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা শুরু হওয়ার পর (১৯৫২ - ৫৭) ভারতে নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে নতুন গতি সঞ্চারিত হয় Univerisyt Education Commission -এ সুপারিশগুলির মতই পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় নানাবিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করার কথা প্রস্তাবিত হয়। ১৯৫৮ - ৫৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে নারী শিক্ষাবিস্তারে আরেকটি ধাপ সংযোজিত হয় বিশেষ করে মহিলাদের উপস্থিতিতে National Commission on Women গৃহিত হওয়ার ফলে। ১৯৫৯ খ্রীষ্টাব্দে The Report of the Committee on the Education of Women (1959)-এর সুপারিশসমূহ পরবর্তী পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় প্রতিফলিত হয়। তাছাড়া ১৯৭৪ -এর The Report on the status of women (1974) -এর সুপারিশ ষষ্ঠ পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় শিক্ষা ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সংযোগের মাধ্যমে প্রতিফলিত হয়।

তবে ১৯৮৬ -এর National Policy of Education (1986) আরো বৃহত্তর পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করে। ১৯৯২ -এ National Commission for Women -র সুপারিশ ও পরবর্তীকালের রাষ্ট্রীয় পদক্ষেপসমূহ নারী শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে।

তবে এখনও নারী স্বাক্ষরতার হার পুরুষের স্বাক্ষরতার হারের তুলনায় অনেক পিছনে (64% পুরুষ, 39% নারী, 1991) (73% পুরুষ, 50% নারী, 1997, NSS) তবে ভারতের সর্বত্র নারী শিক্ষার হার একরকম নয়। কেরালায় নারী স্বাক্ষরতার হার সবচেয়ে বেশি রাজস্থানে সবচেয়ে কম।

তাছাড়া তপশিলি জাতি ও উপজাতিসমূহের নারীর স্বাক্ষরতার হার এখনও 25% অতিক্রম করতে পারেনি। উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রেও নারী ও পুরুষের হারের মধ্যে যথার্থ তফাৎ লক্ষ্য করা যায়।

স্বাধীনোত্তর ভারতের নারী শিক্ষার হার বৃদ্ধিও উচ্চশিক্ষায় নারীর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি নারী আন্দোলনের ভিত্তি স্থাপন করে সমাজের অভিজাতদের বা উচ্চস্তরের মধ্যে। তবে ১৯৯৭ -এর দশক থেকে ভারতে প্রকৃত নারী আন্দোলন শুরু হয় তথাকথিত নিম্নজাতি, উপজাতি, প্রত্যন্ত অঞ্চলের মহিলার স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনের দ্বারা। এক্ষেত্রে নকশালবাড়ী ও চিপকো আন্দোলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

১২.৬.১২.৩ ঃ উপসংহার

ঔপনিবেশিক আমল ভারত তথা পরাধীন দেশসমূহে জাতীয়তাবাদীদের দ্বারা অত্যন্ত প্রখরভাবে সমালোচিত একটি বিষয়। কিন্তু ভারতের সমাজ সংস্কার বিশেষ করে নারী শিক্ষা ও তথাকথিত দলিত জাতির আত্মমুক্তির প্রেক্ষাপট তৈরীর পেছনে ঔপনিবেশিক আমলের সদর্থক ভূমিকা অনস্বীকার্য। সমাজ সংস্কারের মধ্য দিয়ে পুরুষের প্রয়োজনেই নারী শিক্ষার যে ধারা পুরুষের দ্বারা সূচিত হয়েছিল তা কালক্রমে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হয়ে নারীর উচ্চশিক্ষাসহ নারীআন্দোলনকে পরোক্ষভাবে প্রভাবিত করেছে। তবে একথা অস্বীকার করার কোন উপায় নেই যে নারী শিক্ষার আরো ব্যাপক বিস্তার প্রয়োজন রয়েছে। প্রকৃত পরিকল্পনার প্রকৃত রূপায়ণও একান্তভাবে প্রয়োজন।

১২.৬.১২.৪ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

1. Chitra Ghosh, Soma Ghosh and Chandri Chandam Opening the Closed windows, (Calcutta, 2002)
2. R. K. Sharma, Nationalism, Social Reform anmd Indian Women, New Delhi, 1981.
3) Geralding Forbes : Women in Modern India, New Delhi, Cup, 1996
4) Juthika Barma : মহারাণী সুনীতি দেবী ও তার সমসাময়িক সমাজ ও সংস্কৃতি। Jadavpur University, M. Phil Dissertain, 2004

১২.৬.১২.৫ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। ঔপনিবেশিক আমলে নারী শিক্ষা ও নারীসংগঠন বিকাশের ধারা আলোচনা করুন।
২। স্বাধীনোত্তর ভারতে নারী শিক্ষা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

POLITICAL PARTICIPATION

একক - ১৩

(a) Gandhian Satyagraha (b) Revoluntionary Movements (c) Peasant and Workers' Movements (d) Tribal Movements

বিন্যাস ক্রম ঃ

১২.৭.১৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

১২.৭.১৩.১ ঃ প্রস্তাবনা

১২.৭.১৩.২ ঃ গান্ধীয়ান সত্যাগ্রহে নারীদের অংশগ্রহণ

১২.৭.১৩.৩ ঃ বিপ্লবী আন্দোলন এবং নারী

১২.৭.১৩.৪ ঃ কৃষক এবং শ্রমিক মহিলাদের আন্দোলন

১২.৭.১৩.৫ ঃ আদিবাসী মহিলাদের ভূমিকা

১২.৭.১৩.৬ ঃ উপসংহার

১২.৭.১৩.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Reference Books)

১২.৭.১৩.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১২.৭.১৩.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন :

(১) গান্ধীর সত্যাগ্রহ আন্দোলন এবং নারীদের অংশ গ্রহণ

(২) সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনে নারী জাতির অবদান

(৩) কৃষক, শ্রমিক ও আদিবাসী মহিলা অর্থাৎ নিম্ন বর্গের ভূমিকা

১২.৭.১৩.১ ঃ প্রস্তাবনা

সমাজে নারীর স্থান সেই সমাজের সাংস্কৃতিক এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির নির্ণায়ক। বৈদিক যুগে নারীরা উচ্চ সম্মানে ভূষিত ছিলেন। তাঁরা আধ্যাত্মিক জগতে এবং বুদ্ধি বিকাশে পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করতেন। আর্যরা নারীদের সহযোগিতা তাদের জীবনের প্রতিটি আঙ্গিনায় কামনা করতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে নারীর সম্মান ধীরে ধীরে হ্রাস পেতে থাকে। মনুর ভাষায় নারী আবেগপ্রবণ এবং সংবেদনশীল; অতএব তাকে চিরস্থায়ীভাবে পুরুষের অভিভাবকত্বে রাখা প্রয়োজনীয়। নারীর ব্যক্তিত্বকে খর্ব করে দেওয়া হল এবং তার জন্য কঠোর নিয়মাবলী তৈরী হল। নারী শিশুবয়সে পিতার উপর, দাম্পত্য জীবনে স্বামীর উপর এবং বার্ধক্যে সন্তানের উপর নির্ভরশীল ছিল। তারা কখনই স্বাধীন হওয়ার চেষ্টা করবে না এবং সমাজের থেকে একটি বিচ্ছিন্ন জীবন যাপন করবে।

ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর নারী তার পুরাতন অবস্থান থেকে বেরিয়ে আসার জন্য সচেষ্ট হয় (নগন্য সংখ্যায়) এবং রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়। নারী মানব প্রজাতির অর্ধাংশ এবং ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাস তাঁদের অবদানকে অস্বীকার করে সম্পূর্ণ হতে পারে না। তাঁদের স্বাধীনতার জন্য লড়াই নারী ইতিহাসের ক্ষেত্রে একটা দিকচিহ্ন। তাই আমরা এই পর্যায়ে স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীর ভূমিকা নিয়ে আলোচনা করব।

১২.৭.১৩.২ ঃ গান্ধীবাদী সত্যাগ্রহে নারীদের অংশগ্রহণ

গান্ধীজী (মহান মুক্তিদাতা) ভারতের রাজনৈতিক মুক্তির সাথে সাথে দেশের বিভিন্ন অবহেলিত এবং অবদমিত শ্রেণীর সামাজিক মুক্তির জন্য আন্দোলন করেছেন। তাঁর এই নিরলস প্রচেষ্টার ফল হল নারী জাগরণ, যা নারীকে তার চিরাচরিত হীনমন্যতা থেকে মুক্তি দিয়েছে এবং সম্মান, আত্মত্যাগ ও কৃতিত্ব অর্জন করতে সাহায্য করেছে। গান্ধীজীর কাছে নারী অহিংসার অবতার এবং সমাজের প্রশ্নাতীত নেত্রী। নারী পুরুষের সঙ্গিনী এবং পুরুষের সমান তার মানসিক ক্ষমতা। নারী পুরুষের সমস্ত কর্মে অংশগ্রহণের উপযুক্ত এবং পুরুষের সমান স্বাধীনতা ভোগ করার অধিকারী।

সত্যাগ্রহ প্রধানতঃ নারীর জন্য যথোপোযুক্ত কারণ নারী সমস্ত কষ্ট সহ্য করার ক্ষমতা রাখে। অহিংসা মানে 'অনন্ত ভালবাসা' যার অর্থ 'অসীম সহ্য'। নারী ছাড়া এই ক্ষমতা আর কারো নেই কারণ নারী সমস্ত গর্ভযন্ত্রণা সহ্য করে নতুন প্রাণের জন্ম দেয়। তাই সত্যাগ্রহের নেত্রী হিসেবে গান্ধীজী নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন।

গান্ধীজীর 'যাদুস্পর্শে' প্রাচীন ঐতিহ্যের দেওয়াল ভেঙ্গে গেল। হাজার হাজার পরিবারের বন্দিনীরা মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা আন্দোলনের বীর যোদ্ধার ভূমিকা নিল। রেণুকা রায় তাঁর সম্পাদিত গ্রন্থ 'রোল এ্যাণ্ড স্ট্যাটাস অফ উইমেন ইন ইণ্ডিয়ান সোসাইটি'তে মন্তব্য করেছেন যে নারীর অবস্থানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সূচিত হয় গান্ধীজীর প্রচেষ্টায়। যিনি প্রচলিত নীতি এবং প্রথা অস্বীকার করে তাঁর অহিংসা সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলিতে নারীদের আহ্বান জানিয়েছিলেন। কোন আইন নারীদের অবস্থার এত দ্রুত পরিবর্তন সূচিত করতে পারত না, যা মহাত্মা গান্ধীর আহ্বানে সম্ভব হয়েছিল। তিনি একদা বলেছিলেন যে তাঁর ভবিষ্যৎ সৈন্যবাহিনীতে পুরুষ অপেক্ষা তিনি নারী সৈনিক দেখতে চান। তিনি তাঁর আন্দোলনের মাধ্যমে নারীদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, নারীর মুক্তি তার নিজ হাতেই নিহিত আছে।

ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের শুরু থেকেই সদস্যপদ নারীর জন্য উন্মুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর 'রাখী বন্ধনের' সূচনা করেন (১৬ই অক্টোবর, বঙ্গভঙ্গের দিন)। নারীরা এতে অংশগ্রহণ করে এবং 'অরন্ধনে' যোগ দেয়। তারা প্রতিবাদী মিছিল এবং মিটিংয়ে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। বিদেশী দ্রব্য ব্যবহারের বিরুদ্ধে এবং দেশজ দ্রব্যের স্বপক্ষে দেশব্যাপী প্রচার শুরু হয়। নারী স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে আন্দোলনের ডাকে সাড়া দেয়। তারা বিদেশী জিনিস বর্জন করে ও পুরুষ নিয়ন্ত্রিত রাজনৈতিক জগতে অংশগ্রহণ করে। দেশপূজার সাথে স্বাধীনতা আন্দোলনের একাত্মকরণ করা হয় এবং 'শক্তি' ও নারীশক্তি জাগরণের বন্দনা চলতে থাকে।

স্বদেশী আন্দোলনে মহিলাদের রাজনৈতিক আগ্রহ জাগরিত এবং বিকশিত হয় অ্যানি বেসান্তের নেতৃত্বে তাঁর 'হোমরুল' আন্দোলনে। এই আন্দোলন নারীকে অনুপ্রাণিত করে এবং তাদের কাছে এক বিশেষ বার্তা বহন করে। বেসান্ত মনে করতেন যে, নারীর প্রগতি তাঁর মুক্তির উপর নির্ভরশীল। নারীর অবগত হওয়া প্রয়োজন যে, পুরুষ কেন আন্দোলন করছে এবং নারীর সেখানে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করতে হবে। হোমরুল আন্দোলন ভারতের বিভিন্ন প্রান্তরে নারীদের রাজনৈতিক ভাবে সচেতন করে।

১৯১৯-২০ সালে ভারতীয় রাজনীতির রঙ্গমঞ্চে এক নাটকীয় পরিবর্তন সূচিত হয়। মহাত্মা গান্ধীর ভারতীয় রাজনীতিতে আবির্ভাব জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে এক নতুন উদ্দীপনার সৃষ্টি করে এবং অনেক বেশি সংখ্যায় নারীকে সক্রিয় রাজনীতির অঙিনায় নিয়ে আসে। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীরা ছিল তাঁর প্রধান 'বাহিনী'। দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞতা থেকে গান্ধী উপলব্ধি করেছিলেন নারীদের পরোক্ষ প্রতিরোধ ক্ষমতাকে। আমেদাবাদের বস্ত্র শিল্পে শ্রমিকদের ধর্মঘটের সময় তাঁরা প্রধান সহকারিণী ছিলেন অনুসূয়া বেহেন (সূতি বস্ত্র শিল্পের মালিক অম্বালাল সরাভাইয়ের ভগ্নী)। গান্ধীজীর চুম্বকসম আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্ব এবং তাঁর স্বচ্ছতা নারীদের অনুপ্রাণিত করেছিল।

জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে এবং খিলাফৎ আন্দোলনের সাথে ১৯২০সালে গান্ধী আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর অসহযোগ আন্দোলনের সূচনা করেন। প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে নারীরা বিভিন্ন

মিছিলে অংশগ্রহণ করে। খদ্দর এবং চরকার ব্যবহারের কথা প্রচার করে এবং কেউ কেউ সরকারী স্কুল ও কলেজ পরিত্যাগ করে। গান্ধীজীর বাণী নারীদের মন্ত্রমুগ্ধ করে এবং অনেকে তাদের টাকাপয়সা ও গহনা দান করে। এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন ছাত্র যখন চাঁদা সংগ্রহ করছিল, তখন শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত তাঁর সোনার বালাজোড়া দান করেন। তাঁর একমাত্র দুঃখ ছিল যে তিনি আরো বেশি কিছু দিতে পারলেন না।

বাসন্তীদেবী দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের সাথে বাংলার বিভিন্ন জায়গায় যান এবং নারীদের বিদেশী দ্রব্য বর্জন ও পিকেটিংয়ের নেতৃত্ব দেন। ১৯২১ সালের ৭ই ডিসেম্বর কলকাতার রাস্তায় খদ্দর ফেরী করার জন্য ঊর্মিলাদেবী এবং সুনীতিদেবীর সাথে তিনি গ্রেপ্তার হন এবং কয়েক ঘন্টার মধ্যেই তাঁরা মুক্তি পান। তাঁদের গ্রেপ্তার জনসাধারণকে আরো বেশি উদ্বুদ্ধ করে। ১৯২২ সালে বাসন্তীদেবী বঙ্গীয় প্রাদেশিক কংগ্রেসের সভাপতি হন এবং এই ঘটনা দেশের রাজনৈতিক আন্দোলনের পুরোভাবে একজন বাঙালী নারীকে নিয়ে আসে। এই বছরে কস্তুরবা গান্ধী গুজরাট প্রাদেশিক সভার সভাপতিত্ব করেন এবং নারীদের কাছে চরকায় সুতো কাটা ও খাদি বস্ত্র ব্যবহারের জন্য আহ্বান জানান। এলাহাবাদে রামেশ্বরী নেহেরু "কুমারী সভা" গঠন করেন যেখানে মেয়েদের গণ আলোচনায় বক্তব্য রাখতে ও বিতর্কে অংশ নিতে শেখানো হয়। হেমপ্রভা মজুমদার অনেক পুলিশি অত্যাচার সহ্য করেন এবং চিত্তরঞ্জন দাসের মতে তিনি "জেলের বাইরে একমাত্র পুরুষ"। বি. আম্মান (সৈয়দ ভ্রাতৃদ্বয়ের মাতা) তাঁরা অবগুণ্ঠন সরিয়ে জনসমক্ষে বক্তৃতা এবং খাদীর ব্যবহার ও হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের কথা প্রচার করেন। বাসন্তীদেবীর ননদ ঊর্মিলাদেবী স্বরাজ্যের মূল মন্ত্র নিঃশব্দে প্রচার করেন এবং মহিলাদের মধ্যে চরকা প্রচলন জনপ্রিয় করে তোলার জন্য 'নারী কর্মমন্দির' এর কর্মসূচিতে আত্মনিয়োগ করেন।

নারীরা একত্রিতভাবে জাতীয় আন্দোলনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সংগঠন তৈরী করেন। বাংলায় লতিকা ঘোষের নেতৃত্বে মহিলা রাষ্ট্রীয় সংঘের সৃষ্টি হয়। প্রায় ছয় মাস ধরে এই সংঘের সদস্যরা পিকেটিং অভিযানের সাথে যুক্ত ছিলেন এবং গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ঊর্মিলাদেবী নারী সত্যাগ্রহ কমিটি গঠন করেন এবং সরকারী আদেশের বিরুদ্ধে গিয়ে মিছিল বার করেছিলেন। জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী (সিংহলে শিক্ষকতা ত্যাগ করে অসহযোগ আন্দোলনে যোগদান করেন), হেমপ্রভা দাস প্রভৃতি ছিলেন এই সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ সদস্যা। নারী পিকেটিং বোর্ড গঠিত হয়। এই সংস্থার অনেকগুলি শাখা ছিল। যথা - বয়কট এবং পিকেটিং শাখা; স্বদেশ প্রচার শাখা যেখানে খাদি ব্যবহারের কথা প্রচার করা হত; প্রভাত ফেরী শাখা-যারা বিভিন্ন মিছিলের আয়োজন করতেন; সংগঠনমূলক শাখা — যেখানে চরকা ব্যবহারের পন্থা শেখানো হত এবং তাদের তৈরী সুতো বিক্রির উদ্দেশ্যে বাজারের সাথে পরিচয় করানো হত ইত্যাদি। সংগঠন বিদেশী দ্রব্য বয়কটের উদ্দেশ্যে, হিন্দু ও মুসলমান ঐক্য স্থাপনের জন্য, পর্দা এবং অস্পৃশ্যতা দূরীকরণের জন্য মহিলা সমিতি গঠনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

রাজনীতিতে সরোজিনী নাইডু, ঊর্মিলাদেবী ও জ্যোতির্ময়ী গাঙ্গুলী প্রভৃতি মহিলাদের প্রবেশ জাতীয়তা আন্দোলনকে সমৃদ্ধ করার পাশাপাশি নারী জগতের কাছে সত্যিকারের প্রেরণা রূপে কাজ করেছে। তাঁরা প্রমাণ করতে পেরেছেন যে, নারী পরিচিত গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এসে বৃহত্তর সংগ্রামে অংশগ্রহণ করতে সক্ষম। সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী বলা হয়েছে যে মহিলারা প্রতিদিন রাস্তায় নামেন এবং পুরুষ স্বেচ্ছাসেবক ও অন্যান্য উৎসাহীদের সমবেত করে গান গাইতে থাকেন এবং দোকানদার ও সাধারণ মানুষদের বিদেশী

দ্রব্য বর্জন ও স্বদেশী জিনিস ব্যবহার করার জন্য সন্নির্বন্ধ অনুরোধ করতে থাকেন। জনসমাবেশ ও মিছিলে সরকারী নিষেধাজ্ঞা সম্পূর্ণ অমান্য করার মধ্য দিয়ে মহিলাদের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পেয়েছিল। এইসব সত্ত্বেও প্রথম অসহযোগ আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল সীমিত এবং তারাই প্রধাণতঃ যোগদান করেছিল — যাদের পিতা, স্বামী বা পুত্র এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে এবং জেলবন্দী হয়েছে।

১৯৩০ সালে স্বাধীনতার জন্য মানুষ আরো দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয় এবং গান্ধীজী লবণ আইন ভঙ্গের মাধ্যমে তাঁর সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ডাক দিলেন। তিনি সবরমতী আশ্রম থেকে ২৪১ মাইল দূরে সমুদ্র উপকূলে ডাণ্ডি অঞ্চলে অভিযান করে লবণ তৈরীর মাধ্যমে সরকারের লবণ তৈরীর একচেটিয়া অধিকারকে অস্বীকার করতে চেয়েছিলেন। গান্ধীজী ১২ই মার্চ, ১৯৩০ সালের এই অভিযানে তাঁর ৭৯ জন সদস্যের মধ্যে কোন নারীকে অন্তর্ভুক্ত করেননি। যখন আশ্রমের মহিলারা তাঁকে অনুরোধ করেন যে, অন্ততঃ চার-পাঁচ জন মহিলাকে তাঁর সাথে নেওয়ার জন্য, তিনি জানান যে এর জন্য পরে অনেক সময় আছে। নারীরা গান্ধীর এই মনোভাবের বিরোধিতা করেন এবং মহিলাদের 'ভারতীয় এ্যাসোসিয়েশন' প্রতিবাদ করে জানায় যে কোন অহিংস আন্দোলনে লিঙ্গ বৈষম্য অনুচিত এবং সদ্য জাগ্রত নারী সচেতনাকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে।

দাদাভাই নওরোজীর নাতনী খুরসীদ বেহন রাগতভাবে গান্ধীজীকে চিঠি লিখে জানতে চান কেন তিনি নারীদের আন্দোলনে অংশ গ্রহণ থেকে বিরত রাখছেন। মৃদুলা সরাভাই নামে গুজরাট বিদ্যাপীঠের এক ছাত্রী অধ্যক্ষের নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েন। মহিলারা নিজেদের কোন নিষেধাজ্ঞার মধ্যে বন্দী রাখতে অস্বীকার করেন এবং মনে করেন যে কোন মিছিল, মিটিং বা হাজতবাস তাদের অংশগ্রহণ ব্যতীত হওয়া সম্ভব নয়।

যদিও কোন মহিলা গান্ধীজীর ঐতিহাসিক ডাণ্ডী অভিযানে তাঁর সঙ্গে যায়নি, কিন্তু তারা সর্বত্র তাঁকে অভিবাদন জানিয়েছে এবং অধীর আগ্রহে তাঁর কথা শোনার জন্য অপেক্ষা করেছে। কারো কারো মনে হয়েছে যে তিনি শ্রীকৃষ্ণের অবতার এবং তাই তাঁকে 'দর্শন' করার জন্য একত্রিত হয়েছে। আমেদাবাদ থেকে ডাণ্ডী যাওয়ার পথে গান্ধী বৃক্ততায় বলেন যে নারীরা সমস্ত মদের এবং বিদেশী দ্রব্য বিক্রয়কারী দোকানগুলিকে উচ্ছেদ করবে। তিনি নির্দেশ দেন চরকা কাটতে এবং খাদির কাপড় পরিধান করতে। হাজার হাজার রমণী সমুদ্র তীরে যায় এবং নিষিদ্ধ লবণ তৈরী করে ও অকল্পনীয় দামে নিলাম করে অর্থাৎ তারা ও সরকারের লবণ আইন ভঙ্গ করে।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন কিভাবে এই অশিক্ষিত নারীরা সমস্ত ভয় বিপদ অগ্রাহ্য করে আইন অমান্য আন্দোলনকে সার্বজনীন করে তোলেন। তারা প্রত্যেক গৃহকে আইন ভঙ্গকারীদের মন্দিরে পরিণত করেন। সর্বোচ্চ সামরিক শক্তিও সেই আন্দোলনের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পারে না যেখানে প্রত্যেকটি ঘরেই সেই আন্দোলনের অস্তিত্ব। তারা শোভাযাত্রা করে, বানর সেনা গঠন করে, প্রভাত ফেরীর আয়োজন করে প্রভাতকালে তাদের গানের মাধ্যমে গান্ধীজীর ডাকা আন্দোলনে তারা মানুষকে অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করে। বিভিন্ন মিটিংয়ে তারা বক্তৃতা করে। সাহিত্যের লেখা বিক্রি করে এবং সমস্ত ধরনের অত্যাচার ও গ্রেপ্তারীর জন্য প্রস্তুত হয়। পুলিশ তাদের ভয় দেখানোর জন্য অনেককে বন্দী করে রাত্রে জঙ্গলে ছেড়ে দেয়, জলের পাইপ দিয়ে তাদের ভিজিয়ে দেয়, লঙ্কা গুঁড়ো তাদের চোখে ছিটিয়ে দেয় এবং তাদের স্বামীদের অকথ্য ভাষায় অপমান করে ও সন্তানদের ছিনিয়ে নেয়। তাসত্ত্বেও আন্দোলনের প্রথম দশ মাসের মধ্যে প্রায় ১৭,০০০ মহিলা দোষী সাব্যস্ত হয় এবং তাদের জেলে পাঠানো হয়।

কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় এবং অবন্তিকাবাই গোখেল প্রথম মহিলা সদস্যা-যাঁরা বম্বেতে লবণ আইন অমান্য করেন। কমলাদেবীর লেখা থেকে জানতে পারি যে মানুষ বিমুগ্ধ হয়ে দেখতেন কীভাবে কোন অস্ত্র ছাড়া সাধারণ সুতির শাড়ী পড়ে এই অন্তঃপুর নারীগণ সমস্ত বিধিনিষেধ অগ্রাহ্য করে জনসমক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছে। তারা তাদের সংঘর্ষকে একটি কাব্যে পরিণত করেছে। ধন্দোকেস্বব কারভে (প্রথম নারী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা) নারীদের এই লবণ আইন ভঙ্গের শোভাযাত্রা দেখে মন্তব্য করেছিলেন যে, বছরের পর বছর ধরে তিনি যা পারেননি, সবরমতীর এই যাদুকর তাঁর একটি ছোঁয়ায় তা সম্ভব করেছেন। ও'মালি মন্তব্য করেছেন যে তাঁর অভিযানে নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণের ডাক মহিলাদের জাতীয়তাবাদী চেতনাকে গভীরভাবে স্পর্শ করেছে।

কমলাদেবী, সরোজিনী নাইডু, হনসা মেহেতা, জয়শ্রী রাইজী তিলকের মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষ্যে ১লা আগষ্ট, ১৯৩০ সালে বোম্বেতে একটি শোভাযাত্রা বের করেন। পুলিশ তাদের বাধা দান করলে তাঁরা সারা রাত বৃষ্টির মধ্যে রাস্তায় অবস্থান করেন। হনসা মেহেতা প্রমুখেরা 'দেশ সেবিকা সংঘ' তৈরী করেন। বোম্বেতে পিকেটিংয়ের কাজ এত ভালভাবে চলে যে পুলিশ তা আইন বিরোধী বলে ঘোষণা করে। শহরের চারিদিকে মহিলাদের দেখা যেত। তারা হয় মদের বা বিদেশী কাপড়ের দোকানের বাইরে বসে আছে এবং চরকা কাটছে ও নিঃশব্দে সমস্ত ভারতীয়দের সেইসব দোকান থেকে জিনিস কেনার ব্যাপারে সতর্ক করছে।

মাদ্রাজে লবণ সত্যাগ্রহ টি, প্রকাশনের নেতৃত্বে শুরু হয়। তাঁর গ্রেপতারের পর আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন দুর্গাবাই। তিনি একমাস এই সত্যাগ্রহ আন্দোলন করেন এবং পুলিশ গ্রেপ্তার করার পর তাঁকে ভেলোরের সেন্ট্রাল জেলে একবছর কারাবন্দী রাখা হয়। অনেক মহিলারা প্যাকেটে নুন বিক্রি করতেন বা টাকা যোগাড়ের জন্য নিলামও করতেন।

গুজরাটে সবরমতী আশ্রমে নারী সত্যাগ্রহীদের বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আমেদাবাদে কস্তুরবা গান্ধী, সরলাদেবী সরাভাই, মৃদুলা সরাভাই প্রমুখ সত্যাগ্রহের নেতৃত্ব দেন। হাজার হাজার ছাত্রী, শিক্ষিকা এবং গৃহবধূরা প্রভাত ফেরীতে অংশগ্রহণ করে এবং অনেক 'কৃপান' নিয়ে রাস্তায় ঘুরতেন। গঙ্গাবেইন বৈদ্য ৩১শে জানুয়ারী, ১৯৩১ সালে ১২০০ মহিলাদের নিয়ে বরসাদের উদ্দেশ্যে যাত্রা করে। পুলিশ লাঠি চালায়, গঙ্গাবেহেনকে আহত করে কিন্তু তিনি ত্রিরঙ্গা পতকা নিজে আঁকড়ে ধরে রাখেন। কলিকাতায় নারী পিকেটিং বোর্ড গঠিত হয় এবং বিভিন্ন নারী সংস্থা — যথা, রাষ্ট্রীয় মহিলা সংঘ, নিখিল জাতীয় নারী সংঘ, লবণ আইন অমান্য করে এবং নারীদের এই আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত করে।

দিল্লীতে অনেক মহিলাকে গ্রেপ্তার করা হয় এবং কয়েক শতক রমণী আদালত চত্বরে গিয়ে আইনজীবিদের পদত্যাগ করতে অনুরোধ করে। স্বামী শ্রদ্ধানন্দের পত্নী সত্যাবতী যমুনা নদীতে স্নানের জন্য যে সব বড় ঘরের মহিলারা আসতেন, তাদের অননুয় করেন বিদেশী দ্রব্য বর্জন করতে। দিল্লীর নারী জাগরণের ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা তাৎপর্যপূর্ণ।

পাঞ্জাবে আইন অমান্য আন্দোলনের সূচনা হয় পাঁচ হাজার নারীর শোভাযাত্রার দ্বারা। প্রভাত ফেরী, মিটিং এবং পিকেটিং দৈনন্দিন জীবনের অংশ হয়ে গিয়েছিল। লালা লাজপত রায়ের কন্যা পার্বতী দেবী লাহরে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। পাঞ্জাবে সাগর না থাকায় জওহরলাল নেহেরুর পরামর্শ অনুযায়ী তারা

রবি নদীর তীরে লবণ আইন ভঙ্গ করেন। অনেক জায়গায় নারীরা কংগ্রেস কর্মীদের আশ্রয় দান করে এবং গোপন খবর আদান প্রদানের দূত হিসেবে কাজ করে।

প্রায় সমগ্র ভারতে একই চিত্র দেখা যায় — নারীরা সদল বলে শোভাযাত্রা করেছে, দেশাত্মবোধক গানের দ্বারা জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছে এবং বিদেশী দোকানগুলিতে পিকেটিং করেছে। জওহরলাল নেহেরু নইনি কারাগার থেকে লিখেছিলেন যে, আইন অমান্য আন্দোলনে ৮০,০০০ মানুষ কারাবরণ করেছে এবং তার মধ্যে ১৭,০০০ জনই মহিলা। সমস্ত দেশ নারী জাতির এই ভূমিকায় গঠিত। ১৯৩১-শে কংগ্রেসের করাচী অধিবেশনে নারীদের জাতীয় আন্দোলনে তাদের ভূমিকার জন্য অভিনন্দন জানানো হয়।

একটি সাক্ষাৎকারে মহিলারা জানান যে পুরুষের সাথ কাঁধ মিলিয়ে নারীদের জাতীয় আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার সুযোগ মহিলাদের সমস্ত ভয় বিপত্তি জয় করতে সাহায্য করেছে এবং নারী মুক্তির ক্ষেত্রে গান্ধীজীর এটি সবচেয়ে বড় অবদান। গান্ধীজীর মধ্যে তারা একজন বিচক্ষণ পিতা ও স্নেহশীল মাতাকে পেয়েছেন-যাঁর ভালবাসার কাছে সমস্ত লজ্জা সঙ্কোচ নিমেষে দূর হয়ে যায়। গান্ধীজীর সমালোচকেরা মনে করেন যে নারীদের দ্বায়িত্ব ও নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতার আবিষ্কার মহাত্মার একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃতিত্ব।

গান্ধীজীকে ৯ই আগষ্ট, ১৯৪২ সালে গ্রেপ্তার করা হয়। 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন ছিল প্রধানতঃ নেতৃত্ববিহীন। কংগ্রেসের সমস্ত বরিস্ট নেতা তখন কারাগারে বন্দী। চারিদিকে এই খবর ছড়িয়ে পরার সাথে সাথে হরতাল শুরু হয়ে যায়। গান্ধীজীর 'ডু অর ডাই' স্লোগান মানুষকে উদ্দীপিত করে। কৃষক, শ্রমিক, আইনজীবি, ছাত্র এবং নরনারী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। নারীরা আগের পন্থাগুলি — যথা, মিছিল বের করা, বক্তৃতা দেওয়া কংগ্রেসের পত্রিকা বিলি করার মধ্যেই নিজেদের সীমিত রাখল না। তারা মাটির তলায় বেতার স্টেশন পরিচালনা করে, বোমা তৈরী করে, পুলিশ থানা লুট করে বা সরকারী অফিস উড়িয়ে দেওয়ার প্রচেষ্ট করে। আসামে কমলা বরুয়া নামে এক তরুণী পাঁচশো জনের এক মিছিলে নেতৃত্ব দেন এবং পুলিশের গুলিতে মৃত্যুবরণ করেন। বোম্বেতে ঊষা মেহেতা মাটির নীচে বেতার ব্যবস্থা চালনা করেন। আগষ্ট থেকে ১৩ই নভেম্বর প্রতিদিন সন্ধে সাড়ে সাতটার সময় কংগ্রেসের খবর প্রচারিত হত যতদিন না ঊষা মেহেতা এবং তাঁর সঙ্গিনীরা পুলিশের কাছে ধরা পরে। তাঁকে চারবছরের জন্য সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয় এবং ইয়েরওয়াড়া জেলে ২৫০ জন রাজনৈতিক মহিলা বন্দিনীদের সাথে রাখা হয়েছিল। নারী বাহিনীর উপর পুলিশ কেবল মাত্র লাঠি চালিয়ে ক্ষান্ত হয় না, অনেক জায়গায় তাদের অকথ্য অপমান, আঘাত এবং ধর্ষণেরও শিকার হতে হয়েছিল।

বাংলার মেদিনীপুর জেলাতে ৪২এর আগষ্ট আন্দোলনে হাজার হাজার ছাত্রছাত্রী স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। কাঁথি, তমলুমক, মহিষাদল, নন্দীগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল। তারা থানা ও সরকারী ভবন দখল, রেললাইন ওপড়ানো, ডাক টেলিগ্রাফ ব্যবস্থা বানচাল করে দেওয়ার মত জঙ্গী কাজে অংশগ্রহণ করেছিল। মেদিনীপুর ছাড়া যশোহর, খুলনা, রাজশাহী, চট্টগ্রাম এই আগষ্ট বিপ্লবের জোয়াড়ে ভেসে গিয়েছিল। মাতঙ্গিনী হাজরা পুলিশের ধমকানি অগ্রাহ্য করে ত্রিরঙ্গা পতাকা নিয়ে এগিয়ে যান এবং পুলিশের গুলিতে প্রাণ হারান। বোম্বাই শহরে ও আগষ্ট বিদ্রোহে পুলিশের লাঠিতে গুরুতর জখম হন সর্বভারতীয় ছাত্রনেত্রী নাগিসি বাটলিওয়ালা।

গান্ধীজী মনে করতেন যে, জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে পুরুষের ভূমিকা যেমন থাকবে, তেমনি থাকবে নারীর অবদান। তাঁর সেই আশা ব্যর্থ হয়নি। তারা নিজেদের সর্বস্ব দেওয়ার জন্য এগিয়ে এসেছিল। তাদের

সম্পদ, দক্ষতা, শ্রম, আত্মবলিদান দিয়ে আন্দোলনকে সফল করতে চেয়েছিল। গান্ধীজী একদা বলেছিলেন যে শান্তিপূর্ণ অহিংস আন্দোলনে নারী হয়ত পুরুষ কর্মীদের থেকে এগিয়ে যাবে। তাঁর বিভিন্ন সত্যাগ্রহ আন্দোলনে নারীদের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ সেই কথাটিকে সত্য বলে প্রমাণিত করেছে।

১২.৭.১৩.৩ ঃ বিপ্লবী আন্দোলন এবং নারী

যখন হাজার হাজার নারী গান্ধীজির ডাকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেছে। তখন তাদের মধ্যে কারো কারো কাছে গান্ধীজীর অহিংস পন্থা গ্রহণযোগ্য ছিল না। ১৯০৫ সালে বাংলার স্বদেশী আন্দোলনে মহিলারা বিপ্লবীদের সাহায্য করেছিল। সরলাদেবী চৌধুরাণীর ময়মনসিংহের সুহৃদ সংঘের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল। তিনি পাঞ্জাবের বহু জায়গায় নারীদের জন্য আর্য সমাজের মহিলা শাখা চালু করেন। ভারতের বাইরে থেকে ম্যাডাম কে. আর. কমা. বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করেছিলেন। তিনি বিদেশ থেকে বিপ্লবীদের জন্য নিষিদ্ধ বিভিন্ন লেখা এবং অর্থ সাহায্য পাঠাতেন। তিনি ১৯০৯ সালে 'বন্দেমাতরম' নামে একটি মাসিক পত্রিকা প্যারিস থেকে প্রকাশ করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের 'প্রেস অ্যাকট'-এর তার বিরোধিতা করেন। তিনি সাভারকারের 'অভিনব ভারত'-এর সাথে যুক্ত ছিলেন। ১৯০৮ সালে 'ইণ্ডিয়ান হাউস' লণ্ডনে তাঁর ঐতিহাসিক বক্তৃতার মধ্যে বিপ্লবীদের ভবিষ্যত কর্মসূচীর বীজ নিহিত ছিল। তিনি মনে করতেন যে সফলতা ততদিন আসবে না যতদিননা পর্যন্ত নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করবেন।

বিভিন্ন ধরনের নারী সংগঠন, নারীশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণ, বিপ্লবী নেতাদের সংস্পর্শ ও তাঁদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ, নিষিদ্ধ পুস্তিকা এবং লিফলেট ইত্যাদির মাধ্যমে বিপ্লবী ভাবধারা তখন ক্রমশঃ ছড়িয়ে পড়েছিল। আকস্মিকভাবে অসহযোগ আন্দোলন প্রত্যাহার কবলেও বাংলাদেশের রাজনীতিতে মেয়েদের উৎসাহে ভাঁটা পড়ল না কারণ বাংলাদেশ সবসময় আকৃষ্ট হয়েছিল সশস্ত্র বিপ্লবী আন্দোলনের দিকে। ১৯২০ সালে তাঁদের অনেকে প্রকাশ্যভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে সমর্থন করতে এগিয়ে আসে। ১৯২৪ সালে ঢাকাতে লীলা রায় মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে 'দীপালি সংঘ' নামে সংগঠন গড়েন। এর মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল মেয়েদের বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। ১৯৩০ সালে লীলা রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত হতে থাকে 'জয়শ্রী' পত্রিকা। রাজনৈতিক স্বাধীনতা ছাড়াও নারী জাতির সার্বিক বিকাশ ও শিক্ষার প্রসার এই সংগঠনের কর্মসূচীতে অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঢাকাতে দীপালি ছাত্রীসংঘের অন্যতম সদস্যা ছিলেন রেণুকা সেন, প্রীতিলতা ওয়াদ্দোর, বীণাপাণি রায় প্রমুখ। ১৯২৮ সালে কলকাতার জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের অব্যবহিত পরেই প্রতিষ্ঠিত হয় 'ছাত্রীসংঘ'। বিপ্লবী অনিল রায় ছিলেন 'ছাত্রী সংঘের' প্রধান পরিচালক। দীপালি সংঘ গোপনে নারী কর্মী নিয়োগ করার কাজ করত এবং এদের অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করা হত।

তিরিশের দশকে বিপ্লবী সংগঠনের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। কলেজের ছাত্রীরা গুপ্ত সমিতিতে বেশী যোগদান করত। কল্পনা যোশী (দত্ত) এবং প্রীতিলতা ওয়াদ্দোর চট্টগ্রামে অস্ত্রাগার লুণ্ঠনে যুক্ত ছিলেন। ১৯৩১ এর ১৪ই ডিসেম্বর দুই স্কুল ছাত্রী শান্তি ঘোষ এবং সুনীতি চৌধুরী কুমিল্লার জেলাশাসক স্টিফেন্সকে গুলিতে ঝাঁঝরা করে দেন তারই কামরায়। ১৯৩২ এর ফেব্রুয়ারী মাসে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন উৎসবে বীণা দাস নামে এক তরুণী গভর্ণর স্টানলি জ্যাকসনকে গুলি করেন এবং গ্রেপ্তার হন। ১৯৩২ এর সেপ্টেম্বর মাসে চট্টগ্রামের পাহাড়তলী ইউরোপীয়ান ক্লাবে আক্রমন করে ২১ বছর বয়স্কা তরুণী বীরাঙ্গনা প্রতিলতা

ওয়াদ্দোর এবং তাঁর নেতৃত্বে বিপ্লবীরা বহু ইংরেজকে হতাহত করেন। ধরা পড়ার আগেই তিনি আত্মহত্যা করেন। তাঁর বীরত্ব মেয়েদের আত্মশক্তিকে জাগ্রত করে। এইভাবে উজ্জ্বলা মজুমদার, ঊষা সেন প্রমুখরা বিপ্লবমন্ত্রে দীক্ষা নিয়েছিলেন। ১৯৩০-৩২ এর সশস্ত্র জাতীয়তাবাদী সংগ্রামে বা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনে শিক্ষিতা বাঙালী মেয়েরা ব্যাপক অংশগ্রহণ করে।

জাতীয় বিপ্লবী আন্দোলনে বাংলার নারী সমাজে যে অংশটি প্রত্যক্ষ ভাবে যুক্ত ছিল তার অধিকাংশই ছিল অল্পবয়সী তরুণী এবং ছাত্রী বা সদ্য ছাত্র জীবন শেষ করা শিক্ষিতা ভদ্র পরিবারের মেয়েরা। মুসলিম পরিবারের মহিলারা বা দরিদ্র পরিবারের রমণীরা বেশির ভাগ সময় অংশগ্রহণ করত না। বিপ্লবী আন্দোলনের সূচনাপর্বে নারীর ভূমিকা অনেকাংশে ছিল গৌণ এবং তা পুরুষের দ্বারা প্রভাবিত। তারা পুরুষের সহকারী হিসেবেই সাহায্য করত, নেতৃ হিসেবে নয়। ‘অনুশীলন’, ‘যুগান্তর’, ‘শ্রীসংঘ’, হেমচন্দ্র ঘোষের ‘বেঙ্গল ভলেন্টিয়ার্স’, মাষ্টারদা সূর্য সেন পরিচালিত ‘চট্টগ্রাম বিপ্লবী দল’ — এইসব গুপ্ত সমিতিতেই নারী সমাজ বা ছাত্রীদের জন্য একটি পৃথক বিভাগ বা সেল গঠিত হয়েছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে দ্বিতীয় পর্বে নারী সমাজের চেতনা অনেক প্রসারিত হয় এবং তাদের পুরুষের প্রতি নির্ভরতা হ্রাস পায়। পুরুষ বিপ্লবী নেতারা অনেক ক্ষেত্রে তাদের সহযোগী ও সহযোদ্ধার ভূমিকা গ্রহণ করে। নারী বিপ্লবীরা মনে করে যে স্বাধীনতা সংগ্রামে তাঁরা কোন অংশে দুর্বল নয়। বাঙালী হিন্দু পরিবারের যাবতীয় রক্ষণশীলতা ও সামন্ততান্ত্রিক সমাজের শৃঙ্খল ছিন্ন করে ক্রমশঃ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়েরা দেশের কাজে ঝাঁপিয়ে পড়েন। দিল্লীতে শ্রী চন্দ্র শেখর আজাদের কারখানায় ১৭বছর বয়সী রাজবতী জৈন বোমা তৈরী করতেন। সুশীলা দেবী (আরেকজন বিপ্লবী) আঙুল কেটে ১৯২৯ সালে ভগৎ সিং এবং বটুকেশ্বর দত্তর কপালে তিলক লাগিয়ে দেন। ভগৎ সিংয়ের সাথে যোগাযোগের জন্য তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। দুর্গা দেবী বোম্বের হ্যামিলটন রোডে পুলিশ সার্জেনকে গুলি করেন। ১৯৩৮ সালে তাঁকে দিল্লীর প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটির সভাপতি নির্বাচিত করা হয়।

এই তরুণীদের মনে আদর্শবাদ এবং আবেগ একান্ত হয়ে গিয়েছিল। বিপ্লবীদের সংস্পর্শে এবং বৈপ্লবিক সাহিত্যে তাদের মনে এক রোমান্টিক ভাবধারার জন্ম দেয়। তারা ইউরোপীয়দের জীবন নাশের জন্য তৎপর হয়। তারা ব্যক্তিগত আত্মত্যাগের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভে সচেষ্ট হয়। কিন্তু ধীরে ধীরে তারা ব্যক্তিগত সন্ত্রাস সৃষ্টির রাজনৈতিক হঠকারিতা পরিত্যাগ করে ত্রিশের দশকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে জাতীয়তাবাদী গণ আন্দোলনের মূল ধারায় ফিরে আসেন।

১২.৭.১৩.৪ ঃ কৃষক এবং শ্রমিক মহিলাদের আন্দোলন

১৯২৭ সালে সর্বভারতীয় নারী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সংগঠন নারীদের বিভিন্ন বিষয়ে মতামত গঠনে সচেষ্ট হয়। জাতীয় আন্দোলনের প্রভাবে নারীদের আন্দোলনের রাজনীতিকরণ ঘটে এবং কৃষক মহিলারা আন্দোলনে যোগদানের জন্য এগিয়ে আসে। কিন্তু কৃষক মহিলারা বেশির ভাগই ছিল অসংগঠিত। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় রাজনীতি গ্রামীণ জীবনে আরো গভীরভাবে প্রবেশ করে। মেদিনীপুর জেলায় কন্টাই, তমলুক, রংপুর প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষকেরা কর দিতে অস্বীকার করে। ১৯৩০ সালের আইন অমান্য আন্দোলন মধ্যবিত্ত এবং কৃষক মহিলাদের প্রভাবিত করেছিল। মধ্যবিত্ত মহিলাদের সাথে কৃষক রমণীরাও মিটিং, মিছিলে যোগদান করে, সেচ্ছাসেবী বাহিনীতে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করে

এবং নিষিদ্ধ লবণ বিক্রি করে। কৃষকদের উপর নির্মম পুলিশি অত্যাচার চলে। স্বামী বা ভাইয়ের সাথে কৃষক মহিলারাও অত্যাচরিত হয় এবং গ্রাম ছেড়ে বনে গিয়ে থাকতে বাধ্য হয়। ১৯৪২ সালের আগষ্ট আন্দোলনে এই মহিলারা অনেক সময় বন্দীদের আশ্রয় দিত এবং গ্রামে পুলিশ ঢুকলে শঙ্খ বাজিয়ে তারা গ্রামবাসীদের সতর্ক করত। ১৯২৮শে গুজরাটে বারত্তোলি সত্যাগ্রহর (কৃষকের সরকারি রাজস্ব বৃদ্ধির ফলে রাজস্ব দিতে অস্বীকার করে) সময় কৃষক মহিলারাও সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান করেছিল। ১৯৪২ সালে মাতঙ্গিনী হাজরা, একজন কৃষক রমণী, তমলুকের দিকে একটি শোভাযাত্রা নিয়ে যাওয়ার সময় গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সুতাহাটায় গ্রামীণ মহিলারা 'ভগিনী সেনা শিবির' গঠন করে এবং পুলিশ থানা ঘেরাও অভিযানে তারাই নেতৃত্ব দেয়। মহীশাদল, কণ্টাই বিভিন্ন জায়গায় কৃষক, পুরুষ এবং নারী একসাথে পুলিশ থানা আক্রমণ করে এবং গুলিবিদ্ধ হয়।

১৯৪৩ সালের মন্বন্তরে বাংলা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সেই অবস্থায় কমিউনিস্ট দলের নারী কর্মীরা আত্মরক্ষা সমিতি গঠন করে। তারা শ্রমিক এবং কৃষক মহিলাদের সংগঠিত করে। যেহেতু গ্রামীণ মহিলারা সচেতনার দিক থেকে অনেক পিছিয়ে ছিল। তাই তাদের সংগঠিত করার কাজ উপর থেকেই হয়েছিল। নেতারা পিছিয়ে পড়া নারীদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের চেষ্টা করেন। গ্রামে কৃষক মহিলাদের সাথে কথা বলা বা আলোচনা করা কষ্টসাধ্য ছিল, কারণ ঘরের কাজে সারাদিন তারা ব্যস্ত থাকত। এই মহিলারা যখন রান্নাঘরে বা ঢেঁকেতে কাজ করত, তখন বিভিন্ন সংগঠনের মহিলারা তাদের সাথে কথা বলার চেষ্টা করেন।

এই প্রসঙ্গে ১৯৪৬ সালের তেভাগা আন্দোলন গুরুত্বপূর্ণ। বাংলাদেশে ভূস্বামীদের সঙ্গে কৃষকদের জমির সম্পর্ক নানা ধরনের এবং তা বহু স্তরে বিভক্ত। জমিদাররা পরবর্তীকালে শহরবাসী হওয়ায় বহু মধ্যবর্তী স্বত্বভোগীর সৃষ্টি হল। এদের সুবিধা অনুযায়ী এরা-ও কৃষকের সঙ্গে জমির নানারকম বন্দোবস্ত করতে থাকে। এই সম্পর্কের একটি হলো 'আধিয়ার' বা ভাগচাষ সম্পর্ক। আধিয়ার বন্দোবস্তের মানে হলো — মালিকের জমি কৃষক চাষ করলে ফসল ওঠার পর তা দুভাগে ভাগ হবে — এর একভাগ মালিকের, অন্যভাগ কৃষকের। কিন্তু হিসেব করলে দেখা যায় যে চাষের খরচটা সম্পূর্ণ কৃষকের ঔপর চাপানো হয়। চাষ করার সময় এই অর্থ কৃষককে ধার করতে হয়। অর্ধেক ফসলের ভাগ ছাড়াও জোতদারকে এই কর্জ শোধ করতে কৃষকের ফসলের অনেকাংশ চলে যেত। এই আধি প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের ন্যায় সঙ্গত বিক্ষোভ বহুদিন ধরেই পুঞ্জীভূত হচ্ছিল। ১৯৪৬ সালের শেষদিকে তা ফেটে পড়ে। বর্গাদারদের দাবী ছিল যে জমিতে আইনমাফিক অধিকার দিতে হবে। ফসল তিন ভাগে ভাগ করা হবে — একভাগ হবে চাষীর, একভাগ জোতদারের এবং তৃতীয়ভাগ চাষী পাবে খরচা-খরচ বাবদ অর্থাৎ কৃষক পাবে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ। ময়মনসিংহ, মালদা, দিনাজপুর, যশোর, ২৪-পরগণা, মেদিনীপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তেভাগা আন্দোলন শুরু হয়। কৃষকদের রণধ্বনি হলো — 'জান দেব তবু ধান দেব না'। জমির মালিকের সাহায্যে গ্রামে লাঠি আর বন্দুকধারী পুলিশ ছেড়ে দেওয়া হল। প্রথম পর্বে ধান কাটা নিয়ে লড়াই চলল। পুলিশের সঙ্গে মালিকপক্ষ গুণ্ডা দিয়ে ফসল তোলা শুরু করল। ভাগচাষী মাঠে নামলে লাঠি গুলি চলতে লাগল। দ্বিতীয় পর্বে যখন কৃষক নিজের গোলায় ধান তুলতে পেরেছে, তখন তার ধান লাঠি ও গুলির সাহায্যে কেড়ে নেওয়া হত এবং সেটা না পারলে ধানের গোলায় এবং কৃষকের ঘরে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হত। গোলার ধান বাঁচাতে বহু কৃষক ও কৃষক বধূর প্রাণনাশ হয়েছিল।

মণিকুন্তলা সেন এই প্রসঙ্গে কৃষক মেয়েদের ভূমিকার চিত্র তাঁর 'সেদিনের কথা'য় তুলে ধরেছেন।

প্রথম থেকেই এই ধরনের লড়াইতে কৃষক মেয়েরা দল বেঁধে পুরুষের পাশে দাঁড়িয়েছিল। গ্রামে গ্রামে পুলিশদের মধ্যে কৃষকদের নিশ্চিহ্ন করার একটা উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল। মেয়েদের এবার সামনের সারিতে দাঁড়াতে হলো। তাদের আদিম অস্ত্র — দা, বটি, ঝাঁটা, লঙ্কার গুঁড়ো প্রভৃতি নিয়ে। পুলিশ আসছে জানতে পারলে মেয়েরাই শঙ্খধ্বনি করে গ্রামবাসীদের কাছে সংকেত পৌঁছে দিত এবং ছেলেরা জঙ্গলে আশ্রয় নিত। নেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখার কাজটাও মেয়েরাই করত। মেয়েরা পুলিশের হাতে মুখোমুখি লড়াই করত, ধানের গোলায় আগুন লাগলে মেয়েরাই ঝাঁপিয়ে পড়ে নেভাত। তারা অত্যাচারিত হত এবং যা পেত তাই দিয়ে প্রত্যাঘ্যাত করত। কিন্তু পুরুষদের সামনে আসতে দিত না। পুরুষদের না পাওয়ায় পুলিশ এবং গুণ্ডা মেয়েদের উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে।

'স্বাধীনতা' রিপোর্ট থেকে জানা যায় যে আন্দোলন চলাকালীন মেয়েদের উপর কিভাবে অত্যাচার করা হত। তাদের বাড়ী থেকে হিঁচড়ে টেনে আনা হত এবং নগ্ন করে বেত মারা হত। অনেক নারীকে শাস্তি স্বরূপ ধর্ষণ করা হত। বিভিন্ন জায়গায় স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে মহিলারা নারী বাহিনী তৈরী করে এবং অনেক ক্ষেত্রে পুলিশ তাদের ঘেরাও ভেঙ্গে গ্রামে প্রবেশ করতে পারত না। বিমলা মাঝি মেদিনীপুর জেলায় নারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছেন যে প্রথমে গ্রামের মহিলারা কথা বলতে পর্যন্ত ভয় পেত। কিন্তু আস্তে আস্তে তারা ঘরের ভিতর থেকে প্রতিরোধ আন্দোলনে যোগ দিতে লাগল। বিমলা দেবীর নেতৃত্বে জোতদারদের ধানের গোলা নষ্ট করা হল এবং নদীতে চলা ছোট ছোট স্টীমারগুলির কাছে ধান বিক্রি করে দেওয়া হল।

বর্গাদার চাষী বা কৃষক শ্রমিক মহিলারা সবচেয়ে বেশি শোষিত হত। পিতৃতান্ত্রিক সমাজে একদিকে তারা ঘরে অত্যাচারিত হত এবং অপরদিকে জমিদার ও জোতদাররা তাদের শোষণ করত। ফলে আন্দোলনের সময় তাদের যোদ্ধা মনোভাব প্রকাশ পায়। তারা নারী বাহিনীর সাহায্যে ফসল বাঁচানোর উদ্দেশ্যে জমিদারদের বিরুদ্ধে আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করেছিল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর কালে বাংলায় তেভাগা আন্দোলনের মত হায়দ্রাবাদের তেলেঙ্গানা অঞ্চলেও কৃষক আন্দোলন শুরু হয়। সামন্তপ্রভু বা দেশমুখদের শোষণের বিরুদ্ধে কৃষকরা প্রতিবাদ করে। দেশমুখরা কৃষকদের দিয়ে বেগার শ্রম বা 'ভেট্টি চকরী' আদায় করত। এই ভেট্টি চকরী প্রথা গ্রামের মানুষদের প্রায় দেশমুখদের ক্রীতদাসে পরিণত করেছিল। কৃষক রমণীরা সামন্ত প্রভুদের জমিতে কাজ করত এবং মাঝে মাঝে প্রভু ও তার ছেলেরা মহিলাদের ধর্ষণ করত। 'আরোবাপা' বলে মহিলারা ছিল পুরোপুরি ক্রীতদাস। তাদের সকাল থেকে সন্ধ্যে পর্যন্ত জমিতে কাজ করতে হত এবং কাউকে কাউকে প্রভু তার উপ-পত্নী করে রেখে দিতেন।

কৃষকেরা দেশমুখদের তাদের জমি হস্তগত করার প্রয়াসের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াল। দলে দলে নারী পুরুষ স্লোগান দিতে থাকে — 'জমিদারী প্রথা নিপাত যাক' বা 'বিপ্লব জিন্দাবাদ'। হাজার হাজার কৃষক, ভাগচাষী এবং মহিলারা একত্রিত হয়ে লাঠি নিয়ে দেশমুখদের শস্যভাণ্ডার আক্রমণ করে এবং ধান ভাগ করে নেয়। তারা জমি সংক্রান্ত মিথ্যা দলিলগুলি যার দ্বারা দেশমুখ জমি হস্তগত করতেন, সেইগুলি পুড়িয়ে ফেলে। নারীরা এই বেগার প্রথার বিরুদ্ধে পুরুষদের সঙ্গে একত্রিত হয়। তারা জমিদারদের ভিলা ঘেরাও করে রাখে, নিজামের অত্যাচারের বিরুদ্ধে তারা পুলিশের আক্রমণের জবাব দেয়, লঙ্কা ছিটিয়ে দেয় এবং তাদের স্বামী সন্তানদের গ্রেপ্তার করলে তারা পুলিশের লরিগুলিকে ঘিরে রাখে। অনেক লেখা থেকে জানা যায় যে তারা অনেক সময় পুলিশকে বাধ্য করেছে তাদের স্বামীদের মুক্তি দেওয়ার জন্য।

উইমেন কমিটি রিপোর্ট (১৯৭৫) থেকে জানা যায় যে, ঔপনিবেশিক আমল থেকে শিল্প এবং কৃষি কাজে (যা ৮০ শতাংশ মহিলাকে নিযুক্ত করত) অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে।

সাল	মোট শ্রমিকের সংখ্যার মধ্যে নারী শ্রমিকের সংখ্যা (%)
১৯১১	৩৪.৪৪
১৯২১	৩৪.০২
১৯৩১	৩১.১৭
১৯৫১	২৮.৯৮

(সূত্র ঃ স্ট্যাটাস অফ উইমেন কমিশন রিপোর্ট, ১৯৭৫)

সূতী বস্ত্র শিল্পে, চর্মজ শিল্পে, রেশম শিল্পে নারী শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ধীরে ধীরে কমতে থাকে। বোম্বেতে সূতী বস্ত্র কারখানায় নারী শ্রমিকের সংখ্যা ২৪.৬ (১৮৯২ সাল) শতাংশ থেকে ১৪.৯ (১৯৩৯ সাল) শতাংশে নেমে আসে। কারণ হিসেবে বলা হয় যে, ১৯৩১ সালের পর থেকে রাত্রে কাজ করা বৃদ্ধি পায় এবং মহিলাদের সন্ধ্যে সাতটার পর কাজ করা নিষিদ্ধ ছিল। তাছাড়া যাদের সন্তান ছিল, তাদের কাজের যোগ্য বলে মনে করা হত না। ধাতু, বনচায়না ব্যবহারের সাথে সাথে গ্রামে মাটির তৈরী জিনিসের চাহিদা কমতে থাকে এবং মেয়েদের অধাতু শিল্পে নিয়োগ হ্রাস পায়। অবশ্য তামাক কারখানায় মহিলাদের নিয়োগ বৃদ্ধি পায়।

ফলে শ্রমিক যোগাড় দিত সর্দাররা। শ্রমিক সংগ্রহ করা হত প্রধানত বিহার, ছোটনাগপুর ও মধ্যপ্রদেশ ইত্যাদি প্রদেশ থেকে। এইসব শ্রমিকদের মধ্যে মেয়ে শ্রমিকের সংখ্যাও অনেক। পটারী, সিল্ক, বিড়ি তৈরী ইত্যাদি শিল্পে মেয়ে মজুরদের সংখ্যা প্রায় দশহাজারের মত ছিল। সামাজিক, নৈতিক ও আর্থিকভাবে অত্যাচারিত হত এইসব মেয়ে শ্রমিকেরা, কুলি কামিনরা। চটকল এলাকায় অসামাজিক জীবন জাপানের জন্য শতকরা একশজন মেয়েই যৌন ব্যাধিতে আক্রান্ত হত। কলকারখানায় মেয়ে শ্রমিদের বেতন ছিল খুবই সামান্য। কাজের কোন স্থায়িত্ব ছিল না, কাজে রাখার জন্য মাইনের একাংশ দিয়ে সর্দার ও শ্রমিকদের খুশি রাখতে হত। প্রগতিশীল মহিলা নেত্রীদের মধ্যে সন্তোষকুমারী গুপ্ত, চটকল শ্রমিকদের সংগঠিত করার চেষ্টা করে মহিলা শ্রমিক নেত্রী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন। প্রভাবতী দাশগুপ্ত ১৯২৮ সালে কলকাতা ও হাওড়ায় ধাঙর ধর্মঘটের এবং ১৯২৮ ও ১৯২৯ সালে চটকল ধর্মঘটে বিশেষ সক্রিয় ছিলেন। শ্রমিকরা তাঁকে ভালবেসে ‘ধাঙড় মা’ বলত।

১২.৭.১৩.৫ ঃ আদিবাসী মহিলাদের ভূমিকা

জমিদার জোতদারদের দ্বারা কৃষকেরা শোষিত হত। তবে আদিবাসী এবং কৃষক নারীরা ছিল অত্যাচারের মূল শিকার। তাদের কোনরকম অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ছিল না। জমির মালিক এবং তার লোকের দ্বারা তারা নিপীড়িত হত। জমিদারদের বাড়ীর কাজ এবং মাঠে ধান চাষে তারা সাহায্য করত যদিও তাদের পরিষেবার কোন স্বীকৃতি ছিল না। বিবাহের ক্ষেত্রে পরিবার বিয়ে ঠিক করত। পশুর মত তাকে হস্তান্তরিত করা হত।

ঘরে এবং বাইরে তারা মানব অধিকারগুলি থেকে বঞ্চিত ছিল। তাছাড়া জোতদার এবং তার পুত্ররা খেয়ালখুশি-মত আদিবাসী রমণীদের ভোগ করত বা ধর্ষণ করত। তাই এককথায় বলা যেতে পারে যে, সামন্ততন্ত্র এবং পিতৃতন্ত্র তাকে দুভাগে শোষণ করত।

ময়মনসিংহের উত্তরে আদিবাসী প্রতিরোধের সূচনা হয়। তাদের 'টঙ্কা-খাজনা' জমির মালিককে দিতে হত (নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্য প্রভুকে দেওয়া)। তাছাড়া বেগার বা 'ননকড়ি' মাধ্যমেও খাজনা শোধ করতে হত। ১৯৩৭ সালে হাজং আদিবাসীরা ঘৃণ্য টঙ্কা প্রথা উচ্ছেদ করার উদ্দেশ্যে তারা সাময়িকভাবে জমিদারকে খাজনা দেওয়া বন্ধ করে দেয়। নারীরা পুরুষদের সঙ্গে অংশগ্রহণ করে। আরেকটি আন্দোলন শুরু হয় যখন জমিদাররা আদিবাসীদের বন থেকে কাঠ কুড়িয়ে আনতে বাধা দেয়। তারা গুণ্ডা পাঠিয়ে হাজংদের শায়েস্তা করতে চায়। হাজং মহিলারা তাদের চপার দিয়ে আক্রমণ করে।

তেভাগা আন্দোলনে জলপাইগুড়ির ডুয়ার্স অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। নারী পুরুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এক সপ্তাহের মধ্যে ডুয়ার্সের বিভিন্ন অঞ্চলে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। হাজং মহিলাদের নেতৃত্ব দেন একজন মধ্য বয়সি বিধবা মহিলা রাসমণি। তারা পুলিশের হাত থেকে গ্রামকে বাঁচানোর জন্য প্রতিরোধ বাহিনী গঠন করে। রাসমণি তার নারী বাহিনীদের দিয়ে সরকারী সৈন্যদের আক্রমণ করে যখন তারা জানতে পারে যে গ্রামের তিনজন মেয়েকে সৈন্যরা তুলে নিয়ে গেছে। সৈন্যদের গুলি অস্বীকার করে তার ছোঁড়া দিয়ে সৈন্যদের আক্রমণ করে, কিন্তু কিছুক্ষণ পরেই মৃত্যুবরণ করে। তার স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী তিন ঘন্টা যুদ্ধের পরে সৈন্যদের পরাজিত করে। ময়মনসিংহের হাজং মহিলারা বাংলার অন্যান্য আদিবাসী মহিলাদের মত তেভাগা আন্দোলনে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিল। তারা নারী বাহিনীর সাহায্যে শাসক গোষ্ঠীর অত্যাচার প্রতিরোধ করেছিল। ওরাং মহিলারাও জোতদারদের ধানের গোলা আক্রমণ করে এবং সশস্ত্র পুলিশদের সম্মুখীন হয়। জলপাইগুড়ি দেবীগঞ্জ অঞ্চলে পুণ্যেশ্বরী দেদা, একজন রাজবংশী বিধবা মহিলা পুরুষরা না এগিয়ে আসায় নিজেই মহিলাদের নিয়ে আন্দোলন শুরু করে। লাল পতাকা নিয়ে এই অশিক্ষিত আদিবাসী মহিলারা পুরুষদের সঙ্গে স্লোগান দিত।

১২.৭.১৩.৬ ঃ উপসংহার

এইসব বিভিন্ন আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার ফলে মহিলারা গৃহকোণ থেকে রাজনীতি ও ক্ষমতার জগতে প্রবেশ করেছিল — যা ছিল একমাত্র পুরুষদের আধিপত্য। শ্রীমতী ভারতী রায় 'স্বাধীনতা আন্দোলন এবং বাংলা দেশের নারী জাগরণ' প্রবন্ধে (বই = ভারত ইতিহাসে নারী) বলেছেন যে, মেয়েদের জীবনে মা বা স্ত্রী হওয়াই তাদের জীবনে চরম পূর্ণতা এনে দেবে, একথা আর সত্যি রইল না। তারা অনুভব করে যে মাতৃভূমির প্রতিও মেয়েদের দায়বদ্ধতা আছে। বিভিন্ন আন্দোলনে তারা প্রমাণ করেছিলেন যে তারা পুরুষদের সমান কঠিন লড়াই লড়তে পারেন। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে জনগণের মুক্তি সংগ্রামের অংশ হিসেবেই গড়ে উঠেছিল নারীদের আন্দোলন।

১২.৭.১৩.৭ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী (Reference Books)

1. Asthana, Pratima : Women's Movement in India, (Delhi, 1974)
2. Custers, Peter : Women in the Tebhaga Uprising, (Kolkata, 1987)
3. (a) Dastur, Aloo J. Mehta, Usha H. : Gandhi's Contribution to the Emancipation of Women (Bombay, 1991)

   (b) Elwin, V.O. : Tribal Women, (Delhi, 1958)
4. Gandhi, M. K. : Women, (Ahmedabad, 1958)
5. Nanda, B R.(ed) : Indian Women from Purdah to Modernity, (New Delhi, 1976)
6. Sen, Sunil : The Working Women and Popular Movement in Bengal, (Kolkata, 1985)
7. Sen Gupta, Sankar : A Study of Women of Bengal, (Calcutta, 1970)
8. চট্টোপাধ্যায় রত্নাবলী ও গৌতম নিয়োগী (সম্পাদিত) : ভারত-ইতিহাস নারী (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ কলকাতা, ১৯৮৯)
9. দে, বরুণ (সম্পাদিত) : মুক্তি সংগ্রামে বাংলার ছাত্রসমাজ (পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ, ১৯৯২)
10. সেন, মণিকুন্তলা : সেদিনের কথা।

১২.৭.১৩.৮ ঃ সম্ভব্য প্রশ্নাবলী (Model Questions)

১। নারী মুক্তি সমন্ধে গান্ধীজীর মতামত আলোচনা কর।

২। গান্ধীজীর অহিংস সত্যাগ্রহ আন্দোলনগুলিতে নারীদের ভূমিকা পর্যালোচনা কর।

৩। বিপ্লবী আন্দোলনে নারীরা কীভাবে অংশগ্রহণ করেছিল ?

৪। তেভাগা আন্দোলনে নারীদের অবদান বিশ্লেষণ কর।

৫। বিংশ শতাব্দীতে স্বাধীনতা আন্দোলন নারী জাগরণকে কতখানি প্রভাবিত করেছিল ?

পর্যায় গ্রন্থ - ৭

POLITICAL PARTICIPATION OF WOMEN

একক - ২৪

(a) Panchayats and Municipal Councils

(b) State Legislatures and Parliament

(c) Feminist Movement

উপএকক - ১

Women Participation in Panchayats and Municipal Councils Since 1947.

বিন্যাসক্রম ঃ

২২.৭.২৪.২.০ ক প্রস্তাবনা

২২.৭.২৪.২.১ ক উদ্দেশ্য

২২.৭.২৪.২.২ ক স্বাধীনতা উত্তরকালে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান

২২.৭.২৪.২.৩ ক সংরক্ষণের বিতর্ক

২২.৭.২৪.২.৪ ক সাংবিধানিক পরিবর্তন

২২.৭.২৪.২.৫ ক সংরক্ষণনীতির প্রয়োগ ঃ পঞ্চায়েত নারীর মর্যাদা

২২.৭.২৪.২.৬ ক নারীর ক্ষমতায়ন

২২.৭.২৪.২.৭ ক উপসংহার

২২.৭.২৪.২.৮ ক সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৭.১৪.১.০ ঃ প্রস্তাবনা

বিগত শতকের শেষ দুই দশক ধরে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় মহিলাদের অংশগ্রহণের প্রশ্নটি ভারতের রাজনৈতিক আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে। কারণ পঞ্চায়েত হয়ে উঠেছে স্থানীয় অর্থনীতি ও সামাজিক উন্নয়নের কেন্দ্র। যতই পঞ্চায়েতের ভূমিকা বিকাশের দিকে অপসরণ বা Shift করেছে ততই মহিলাদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের বিতর্কে পঞ্চায়েত মূল বিষয় হয়ে উঠেছে। এটি আরও লক্ষ্য করা যায় ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের পর। এই সংবিধান সংশোধন আইন একদিকে পঞ্চায়েতকে বিকাশের দিকে এগিয়ে যেতে ক্ষমতায়িত করেছে। অন্যদিকে স্থানীয় শাসনে মহিলাদের অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করেছে। উদ্দেশ্য হল মানবী সম্পদকে যথাযথ ব্যবহার করে স্থানীয় বিকাশকে গতিশীল করা। ফলে একই সূত্রে বাঁধা পড়ে গেল পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়নের সাথে নারীর ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া। অন্যভাবে বলা যায় পঞ্চায়েতের ক্ষমতায়ন ও নারীর ক্ষমতায়ন একে অপরের পরিপূরক হয়ে ওঠে। অন্যদিকে পৌর উন্নয়নের সাথেও মানবী সম্পদের ব্যবহারের প্রশ্নটিও যুক্ত করা হয়েছে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী আইনে। তবে পঞ্চায়েতের ক্ষেত্রে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি যেভাবে আলোচনার বিষয়বস্তু হয়ে উঠেছে তা কিন্তু হয়ে ওঠেনি পৌর উন্নয়নে নারীর রাজনৈতিক অংশগ্রহণের ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে।

১২.৭.১৪.১.১ ঃ উদ্দেশ্য

আলোচ্য এককের উদ্দেশ্য হল পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা ও পৌরশাসন ব্যবস্থায় নারীর অংশগ্রহণ প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করা এবং দেখা এতে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রকৃত অর্থে কতখানি হয়েছিল।

১২.৭.১৪.১.২ ঃ স্বাধীনতা উত্তরকালে পঞ্চায়েতী ব্যবস্থায় নারীর অবস্থান

স্বাধীনতা উত্তর স্থানীয় স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের প্রধান ক্ষেত্র হল পঞ্চায়েত। তবে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের পূর্ব পর্যন্ত উঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নটি তেমন গুরুত্ব পায়নি। ঔপনিবেশিক যুগে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের সূত্র ধরে ১৮৮৫ সালের আইনে গ্রামীণ স্বায়ত্ত-শাসন ব্যবস্থা গড়ে উঠলেও নারীর প্রতিনিধিত্ব চোখে পড়ার বিষয় ছিলনা। জাতি রাষ্ট্র গঠনে গান্ধীজীর গ্রামীণ স্বরাজ ভাবনাকে গুরুত্ব দেবার জন্য স্বাধীন ভারতের সংবিধানের ৪০তম অনুচ্ছেদে স্থানীয় শাসনে পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়। বিষয়টি ছিল রাজ্য তালিকাভূক্ত।

১৯৫৭ সালে মেহেতো কমিটির রিপোর্টে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি রাজ প্রবর্তনের জন্য রাজ্যগুলিকে সুপারিশ করা হয়। তবে মহিলাদের যোগদানের বিষয়টি এতে গুরুত্ব পায়নি। শুধু ব্লক ও জেলাস্তরে পঞ্চায়েত

কাঠামোতে ২ জন করে মহিলাকে Co-opt বা সংযোজন করার সুপারিশ থাকে। এর ভিত্তিতে দুইজন মহিলা Co-opted বা সংযোজিত সদস্যা হিসাবে পঞ্চায়েতে অংশগ্রহণের সুযোগ পান। তবে সংখ্যায় তা ছিল হাতে গোনা। মেহেতা কমিটির রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত পঞ্চায়েত ব্যবস্থা পর্যালোচনার জন্য নিযুক্ত কমিটির চেয়ারম্যান কে. সানথানাম ১৯৬৪ সালে যে রিপোর্ট পেশ করেন তাতে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থায় প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়টি কিছুটা গুরুত্ব পায়। রাজ্যগুলি পঞ্চায়েতের প্রতি স্তরে দুটি করে আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের সম্মতি দেয়। কে. সানথানাম উক্ত রিপোর্টে বলেন যে এতে নারীর ক্ষমতা স্থানীয়স্তরে উচ্চতর হবে। অন্ধ্রপ্রদেশ ছাড়া কোন রাজ্য সরকার বাস্তবে এই সুপারিশ কার্যকর করেনি। নেহেরুর মৃত্যুর (১৯৬৪) পর কিছুদিনের জন্য এদেশের পঞ্চায়েত ব্যবস্থা ক্ষয়িষ্ণু হয়ে পড়ে। কারণ হিসাবে () বলেন, কংগ্রেসের উচ্চতর নেতারা স্থানীয়স্তরের ক্ষমতাবানদের সাথে ক্ষমতা ভাগ করে নিতে চাননি।

১৯৭৪ সালে "The Committee on the status of women in India" পঞ্চায়েতে মহিলাদের অংশগ্রহণ বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৯৭৭ সালে কেন্দ্রে জনতা সরকার ক্ষমতায় প্রতিষ্ঠিত হলে নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্য পঞ্চায়েতিরাজ নিয়ে নতুন করে ভাবনা শুরু হয়। অশোক মেহেতার নেতৃত্বে গঠিত হয় ১৯৭৮ সালে The Committee on the Panchayet Raj। কমিটি সুপারিশ করে যে পঞ্চায়েতের প্রতি স্তরে দুটি করে আসন সংরক্ষিত থাকবে মহিলাদের জন্য। নির্বাচনের মাধ্যমে যদি প্রার্থী না মেলে তা হলেই Co-Option প্রশ্নটি আসবে। অশোক মেহেতা কমিটি স্থানীয় স্তরে নীতি নির্ধারণ প্রক্রিয়ায় মহিলাদের যুক্ত করার ওপর গুরুত্ব দিয়েছিল। কিন্তু কোন সুস্পষ্ট দিশা এতে ছিলনা। যাইহোক কমিটির সুপারিশ অনুসারে দেশের সর্বত্র ত্রিস্তর পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়। তবে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের প্রশ্নে বিভিন্ন রাজ্য ভিন্ন নীতি গ্রহণ করে যেমন – ক্ষমতাসীন অন্ধ্রের তেলেগু দেশম দল মহিলাদের জন্য সাত শতাংশ আসন সংরক্ষণ করে। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া অন্য রাজ্যগুলিতে উপযুক্ত সংখ্যক মহিলা প্রার্থী না পাওয়া গেলে প্রশাসনকে Co-Option নীতির উপর গুরুত্ব দিতে হয়। এ প্রসঙ্গে হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের গবেষিকা পি. মনিকিয়াম্বা বলেন Co-Option এর ভিত্তিতে পঞ্চায়েতের সাথে যুক্ত মহিলা সদস্যারা নিজেদের পূর্ণ সদস্যা বলে মনে করতে দ্বিধাবোধ করতেন। Co-Option এর ক্ষেত্রে জাত ও দলের একটা প্রভাব কাজ করতো যা পঞ্চায়েত পরিচালনায় নিযুক্ত সদস্যাদের স্বাধীনতভাবে কাজের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

১২.৭.১৪.১.৩ ঃ সংরক্ষণ বিতর্ক

ভারতে রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক ১৯২০ দশকের শেষ থেকেই চলে আসছে। The National Planning Committee -র মহিলা

উপসমিতি এই সংরক্ষণের বিরোধিতা করে। ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারতের সংবিধান নারী পুরুষের সমান অধিকার রক্ষার প্রতিশ্রুতি দেয়, বহু বছর বাদে ১৯৭৪ সালে The Committee on the States os Women কর্তৃক বিষয়টি পুনরায় গৃহীত হয়। রিপোর্টে মহিলাদের আর্থ-সামাজিক সমস্যার সামগ্রিক পরিবর্তনের জন্য তাদের রাজনৈতিক সমর্যাদার উন্নতি সাধনের ওপর জোর দেয়। সংবিধান প্রদত্ত ক্ষমতার, অধিকারের মধ্যে সংরক্ষণ ভাবনা একটি পশ্চাৎবর্তী পদক্ষেপ। নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার মহিলা প্রার্থীর জন্য নির্দিষ্ট শতাংশ হার নির্ধারণ সম্পর্কে রাজনৈতিক দলগুলিকে কমিটি পরামর্শ দিয়েছিল।

The National Perspective Plan (1988) স্থানীয় স্তরে গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠানসমূহে নারীর অংশগ্রহণের প্রশ্নটি তুলে ধরে। কমিটির সুপারিশে প্রথম স্থানীয় স্বায়ত্ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানসমূহের সর্বস্তরে ৩০ শতাংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব রাখা হয়। কমিটির অন্যতম সদস্যা নির্মলা দেশপাণ্ডে অবশ্য এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বলেন, সংরক্ষণের অর্থ এই দাঁড়ায় যে মহিলারা দুর্বল। তাই তাদের জন্য সংরক্ষণ এটা মেনে নেওয়া যায় না।

আরও একটি গোষ্ঠী ছিল যারা সংরক্ষণের বিরোধিতা করেন মূলত সামন্ততান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এঁরা মনে করেন মহিলারা নির্বাচিত হলে পারিবারিক জীবনের ঐক্য ও শান্তি বিঘ্নিত হবে। স্বাধীনসত্তা নিয়ে তারা পঞ্চায়েতে কাজ করতে পারবেন না। তা ছাড়া তাঁদের ধারণা ছিল যে মহিলারা নির্বাচিত হলে গ্রামীণ সমাজে ক্ষমতার সমীকরণে কোন পরিবর্তন ঘটবে না বলেও তারা মনে করেন।

অন্যদিকে দেবকি জৈনের মতে, পুরুষতন্ত্রের কঠিন শিলা ভাঙতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ একান্ত জরুরি। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার এক মহিলা প্রধানের এক্ষেত্রে বক্তব্য হল, সংরক্ষণ ব্যতীত সমাজের অর্ধাংশ পঞ্চায়েতি ব্যবস্থা থেকে বাদ পড়বে। যাঁরা সংরক্ষণের পক্ষে তাদের আরও যুক্তি হল, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন এবং স্থানীয় সম্পদ সংগ্রহ ও বন্টনে মহিলাদের প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি হলে নারীর সামাজিক অবস্থার স্বতস্ফূর্ত রূপান্তর ঘটবে।

১২.৭.১৪.১.৪ ঃ সাংবিধানিক পরিবর্তন

৬৪তম সংবিধান সংশোধনী বিলে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ সম্পর্কে বলা হয় যে, প্রতি পঞ্চায়েতে মোট আসনের ৩০ শতাংশ আসন মহিলাদের দ্বারা পূর্ণ হবে এবং এই সংরক্ষণ নির্দিষ্ট হবে নির্বাচনক্ষেত্রের 'রোটেশানের' ওপর ভিত্তি করে। দেশব্যাপী প্রতিবাদ ও রাজ্যসভায় শাসকদলের সমর্থন আদায়ের ব্যর্থতার জন্য উক্ত বিলটি আইনে রূপান্তরিত হল না। তবে নীতিগতভাবে সকলেই মহিলাদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের বিষয়টি মেনে নেয়। ১৯৯৩ সালে ৭৩তম সংবিধান সংশোধনী বিলটি

ছিল পূর্ববর্তী সংবিধান সংশোধনী বিলের পরিবর্তিত রূপ। (১) এই আইনের মূল ধারাগুলি হল ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মোট আসনের কমপক্ষে ১/৩ অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে এবং প্রত্যক্ষ নির্বাচনের ভিত্তিতে তা পূরণ করা হবে। এই অংশের মধ্যেই ধরা থাকবে তফসিলি জাতি ও জনজাতির মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসন। (২) পঞ্চায়েতের প্রতি স্তরে মোট পদাধিকারী আসনের ১/৩ অংশ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এর সাথে তফসিলি জাতি ও জনজাতি মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত পদগুলিও ধরা হয়েছে।

১২.৭.১৪.১.৫ ঃ সংরক্ষণ নীতির প্রয়োগ ঃ পঞ্চায়েত নারীর মর্যদা

বিশেষজ্ঞদের বিচারে নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক পদক্ষেপ। প্রভাত দত্তের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে জানা যায়। সংবিধান সংশোধনের পর ১৯৯৮ সালে সারা ভারতে প্রত্যক্ষ নির্বাচনে নির্বাচিত পঞ্চায়েত স্তরে মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৯,৮৮,১০৬ জন অর্থাৎ মোট নির্বাচিত সদস্য সংখ্যার ৩৫.৯২ শতাংশ হল মহিলা। তালুক পঞ্চায়েতে ছিল ৪০.১৪ শতাংশ মহিলা। জেলা পরিষদের মোট নির্বাচিত মহিলা সদস্য সংখ্যা হল ৬,১০৬ জন অর্থাৎ ৩৯.৩৭ শতাংশ। সংরক্ষণ নীতি প্রয়োগের পর বিভিন্ন রাজ্যে পঞ্চায়েতের ওপর যে সরকারী বেসরকারী ক্ষেত্রসমীক্ষা পরিচালিত হয়েছিল তা থেকে নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের ঝোঁকটি লক্ষ্য করা যায়। ২০০১ সালে National Commission on Women হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশ, উড়িষ্যা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু এবং উত্তর প্রদেশের পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যদের ওপর যে সমীক্ষা চালিয়েছিল তার প্রতিবেদন থেকে জানা যায়, পঞ্চায়েতের মাধ্যমে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার ফলে ঘরে ও বাইরে মহিলাদের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজে নির্বাচিত মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ গোষ্ঠী হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছেন। তবে অন্য একটি সমীক্ষা থেকে জানা যায়, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে মহিলা সদস্যদের ওপর পুরুষতন্ত্রের যথেষ্ট প্রভাব ছিল। সদস্যদের প্রশিক্ষণের পর্যাপ্ত ব্যবস্থাও নেই। নির্বাচিত দলিত মহিলাদের উপর লাঞ্ছনার ঘটনা তামিলনাড়ুতে বিরল ছিল না। অন্যদিকে কেরালাতে পঞ্চায়েত সভায় মহিলা সদস্যদের উপস্থিতির হার খুব বেশি। তাদের মধ্যে শিক্ষিতের হারও যথেষ্ট বেশি। পঞ্চায়েত সভায় মহিলাদের বিষয়গুলি গুরুত্ব পায়। পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে তাদের প্রতিস্পর্ধী ভূমিকাও লক্ষ্য করা যায়। নির্বাচিত সদস্যদের জন্য প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা আছে। রাজস্থানে মহিলা সদস্যদের মধ্যে পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে শোনা যায় সংগঠিত উড়িষ্যায় প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত লক্ষ্য করা মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যদের প্রতি পুরুষ প্রধানদের অসহযোগিতা। প্রতিক্ষেত্রে তাঁরা হতেন পুরুষ প্রধানদের আধিপত্যের শিকার। ১৯৯৩ সালের পর থেকে পশ্চিমবঙ্গে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের মোট সদস্যের ৩৪ শতাংশ হল মহিলা গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির ওপর যে সব সমীক্ষা পরিচালিত হয়েছে তা থেকে জানা যায় যে, পশ্চিমবঙ্গে এদের অধিকাংশই এসেছে ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষি পরিবার থেকে। Indian Statistical Institute, Kolkata 1999 সালে বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার ওপর যে সমীক্ষা করেছিল তা থেকে ইঙ্গিত মেলে যে, মহিলা পঞ্চায়েত সদস্যরা স্থানীয়

সমস্যা চিহ্নিত করার ক্ষেত্রেই শুধু নিজেদের বিচার বুদ্ধিই প্রয়োগ করতেন না। তা সমাধানের ক্ষেত্রেও যোগ্য ভূমিকা নিতেন। সম্পত্তি ও বিবাহ সংক্রান্ত অধিকার সুরক্ষার ক্ষেত্রে এলাকার মহিলাদের মধ্যে তাঁরা চেতনা সঞ্চার করতেন। এই দুই জেলার পঞ্চায়েত প্রশাসন, সাক্ষরতা অভিযান, কৃষিকল্যাণ, পরিবেশ রক্ষা, স্বনির্ভর প্রকল্প ও গ্রামীণ স্বাস্থ্য পরিষেবা বিস্তার, তফসিলি জাতি ও জনজাতির কল্যাণে পঞ্চায়েতের মহিলা সদস্যরা সক্রিয় ভূমিকা পালন করতেন। মহিলারা সিদ্ধান্ত নেবার জায়গায় থাকায়, এলাকার মহিলা সংক্রান্ত সমস্যাগুলি সামনে উঠে এসেছে এবং সেগুলির সমাধানের পথও প্রশস্ত হয়েছে। অসীম মুখার্জীর মেদিনীপুর জেলার কুলকীতি গ্রাম পঞ্চায়েতের ওপর নেওয়া সমীক্ষা থেকে জানা যায় যে এটির ২৮ জন সদস্য সকলেই ছিলেন মহিলা এবং শিক্ষিত। পঞ্চায়েতের সম্পদ সৃষ্টি ও বন্টনের ক্ষেত্রে তাঁরা যথেষ্ট উদ্যোগী ভূমিকা নিয়ে থাকেন ৯০ শতাংশ বেশি পঞ্চায়েতের সভায় উপস্থিত থাকেন। লিঙ্গ বৈষম্যের কোন নজির নেই। লিটনের (Lieton) বর্ধমানের মেমারীর ওপর গৃহীত ক্ষেত্র-সমীক্ষা থেকে জানা যায়, পঞ্চায়েতের সকল মহিলা সদস্যই কৃষক পরিবার থেকে এসেছেন। এলাকার সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনের সাথে তারা যুক্ত। সি.পি.আই.এম দলের প্রতি তাঁদের আনুগত্য রয়েছে। সকলেই এই দলের শাখা সংগঠন মহিলা সমিতির সদস্যা। তারা মনে করেন সংরক্ষণ ব্যবস্থা না থাকলে অর্ধেক মহিলা সদস্য পঞ্চায়েতের সদস্য হতে পারত না।

১২.৭.১৪.১.৬ ঃ নারীর ক্ষমতায়ন

এটা বলা নিষ্প্রয়োজন যে পঞ্চায়েতিরাজ বিকেন্দ্রীকরণ শাসনে ভারতে যুগান্তর এনেছে। পঞ্চায়েতের হাতে ক্রমশ প্রভূত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষমতা সঞ্চারিত হয়েছে। স্থানীয় শাসন ব্যবস্থার একশোভাগ ক্ষমতার ৩৩ ভাগের অংশীদার হল নারী। উপরোক্ত ক্ষেত্র সমীক্ষা থেকে দুটি বিপরীতমুখী ধারা ধরা পড়ে সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে। প্রথম ধারা অনুসারে নির্বাচিতদের সিংহভাগ নির্বাচিত হয়েছেন নিকট আত্মীয়দের বকলমে। এঁদের ক্ষমতায়নের গোড়াটিতেই দুর্বলতা। নির্বাচনের পর এরা পুরুষতন্ত্র বা স্থানীয় গোষ্ঠীর দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হন। যারা নির্বাচিত তাদের কোন প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা নেই। শিক্ষার ক্ষেত্রে পিছিয়ে। প্রতিক্ষেত্রে তাদের সংকোচ ও জড়তা। হরিয়ানা, জয়পুর ও উত্তরপ্রদেশের দিকে তাকালে দেখা যায় মহিলা সদস্যদের বক্তব্য মিটিং -এ গুরুত্ব পায়না। অর্থের অভাবে অনেক সদস্যা পঞ্চায়েতের সভায় উপস্থিত হতে পারেন না। ভারতী রায়ের দেওয়া তথ্য থেকে জানা যায় উত্তরবঙ্গের জেলা পরিষদের মহিলা সদস্যরা উপযুক্ত প্রশিক্ষণের অভাবে সভার কাজ পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেন না। শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণের উপযুক্ত ব্যবস্থা না করলে নবনির্বাচিতদের ক্ষমতায়ন যে অসম্পূর্ণ থাকবে সে দিকটি তুলে ধরেছেন তেলেঙ্গানা আন্দোলনের এক কৃষকনেত্রী। ক্ষমতায়ন হলে নারী ও সমাজের যে পরিবর্তন আসবে তার পরিচয় মেলে দ্বিতীয় ধারাটি অনুসরণ করলে। অর্থাৎ উপযুক্ত নবনির্বাচিত সদস্যদের মধ্যে পঞ্চায়েত সম্পর্কে শিক্ষাদান। প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করলে দ্বিতীয় ধারাটি আসবে। এই ধারা অনুসরণ করে পশ্চিমবঙ্গ ও কেরালা

সুফল পেয়েছে। নবনির্বাচিতদের আইন সম্পর্কে উৎসাহ সঞ্চারিত হয়েছে।

১২.৭.১৪.১.৭ ঃ উপসংহার

আসল কথা হল, তৃণমুল স্তরে নারীর ক্ষমতায়নের যেটি প্রধান বাধা সেটা হল ধনতন্ত্রবাদ ও সামন্ততন্ত্রবাদের সহঅবস্থানপ্রসূত পরিবেশ ও পরিস্থিতি। শুধু সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মহিলাদের আসন সংরক্ষণ করলেই তাদের ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া পূর্ণতা পাবে না। এটি হল ক্ষমতায়নের পথে প্রাথমিক ধাপমাত্র। লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে প্রয়োজন ভূমি সংস্কার ও প্রগতিশীল নারী আন্দোলন যা তৃণমুল স্তর পর্যন্ত গণতন্ত্রকে পৌঁছে দেবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করবে।

১২.৭.১৪.১.৮ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। পঞ্চায়েতে মহিলাদের আসন সংরক্ষণের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক ও বুদ্ধিজীবী মহলে যে সব বিতর্ক উপস্থাপিত হয়েছিল তা ব্যাখ্যা কর।

২। সংবিধানের ৭৩তম সংশোধনের দ্বারা গৃহীত মহিলা আসন সংরক্ষণ ব্যবস্থা প্রকৃত অর্থেই কি স্থানীয় স্তরে মহিলাদেরও সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করেছিল?

৩। তুমি কি মনে কর ৭৩তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ব্যবস্থার ক্ষমতায়ন এবং নারীর ক্ষমতায়ন একে অপরের পরিপূরক?

উপএকক -২

Political Participation of Women in State Legislatures and Parliament

বিন্যাসক্রম ঃ

১২.৭.১৪.২.০ ক প্রস্তাবনা

১২.৭.১৪.২.১ ক উদ্দেশ্য

১২.৭.১৪.২.২ ক কেন্দ্র-রাজ্য আইনসভার নির্বাচনী রূপরেখা : নির্বাচিত মহিলা সদস্য

১২.৭.১৪.২.৩ ক প্রার্থী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

১২.৭.১৪.২.৪ ক নির্বাচনী ইস্তাহার ও প্রচার পুস্তিকা

১২.৭.১৪.২.৫ ক মহিলা আসন সংরক্ষণ বিল

১২.৭.১৪.২.৫.১ ক বিলের মূল বিতর্কের বিষয়

১২.৭.১৪.২.৫.২ ক বিলটির প্রতি বিকল্প প্রস্তাব

১২.৭.১৪.২.৬ ক আইনসভায় নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ

১২.৭.১৪.২.৭ ক উপসংহার

১২.৭.১৪.২.৮ ক উপসংহার

১২.৭.১৪.২.০ ঃ প্রস্তাবনা

পৃথিবীর মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ মহিলা। কিন্তু যে কোন দেশের আইন সভায় নির্বাচিত প্রতিনিধি হিসাবে পুরুষের তুলনায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব কম। ১৯৮০ সালের একটি পরিসংখ্যান থেকে জানা যায় বিশ্বে মোট মহিলা সাংসদদের সংখ্যা ১০ শতাংশের কিছু বেশি। এক্ষেত্রে বৃহৎ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ভারত খুব বেশি পিছিয়ে নেই। মহিলা সাংসদদের সংখ্যা এখানে বর্তমানে ৮.৮ শতাংশ। ১৯৩৫ সালের মধ্যেই ভারতের নারীরা ভোটাধিকারের স্বীকৃতি পেয়েছেন। ১৯৩৭ সালের প্রাদেশিক আইনসভাগুলির নির্বাচনে ৫০ জন মহিলা নির্বাচিত হয়েছিলেন। ১৯৫০ সালে স্বাধীন ভারত সংবিধানে নারী পুরুষ সকলকে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার সমান সুযোগ দেওয়া হয়েছে। ১৯৫২ সাল থেকে ২০০০ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত রাজ্য ও কেন্দ্র আইন সভার নির্বাচনে গড়ে ৫০ শতাংশের বেশি নারী ভোটাধিকার প্রয়োগ করে থাকেন। নির্বাচনের মাধ্যমে দেশ ও রাজ্যের আইনসভায় সদস্য হিসাবে অংশগ্রহণের সুযোগ পেয়েছেন। স্থানীয় স্তরে ৩০ শতাংশ জমির উপর রাজনৈতিক ক্ষমতা তাঁদের প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। দেশের রাষ্ট্রপতি পদে একজন নারী। কয়েকটি রাজ্যে মুখ্যমন্ত্রী পদে রয়েছেন নারী। ৮১ তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে ভারতের রাষ্ট্র ক্ষমতার ১/৩ অংশ জমি পুরুষের কাছ থেকে কেড়ে নেবার জন্য তাঁরা সংগ্রাম করছেন। এতদ সত্ত্বেও মোট স্ত্রীজাতির দুরাবস্থার অঙ্কে জগৎ সভায় ভারত শীর্ষ স্থানীয়দের মধ্যে।

১২.৭.১৪.২.১ ঃ উদ্দেশ্য

বর্তমান ইউনিটের উদ্দেশ্য হল রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় মহিলাদের রাজনৈতিক অংশগ্রহণ দিকগুলি তুলে ধরা এবং দেখান তাঁদের এই ক্ষমতায়নের প্রকৃত স্বরূপ কি ছিল। এলাকার স্তরে এই ক্ষমতায়ন কতখানি রসসিঞ্চন করতে পেরেছিল।

১২.৭.১৪.২.২ ঃ কেন্দ্র-রাজ্য আইনসভার নির্বাচনী রূপরেখা ঃ নির্বাচিত মহিলা সদস্য

১৯৫২ সালের প্রথম নির্বাচনে ৪৮৯টি লোকসভার আসনের মধ্যে ২৩ জন মহিলা সদস্যা হিসাবে নির্বাচিত হন। অর্থাৎ ১/৫ অংশ ছিল মহিলা। একই পদে অনুষ্ঠিত রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা সদস্যার ছিল ১৯৫ জন। ১৯৫২ - ১৯৯৮ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত লোকসভার নির্বাচনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখা যায়, প্রথম নির্বাচনে যেখানে মোট সদস্যের ৪.৪ শতাংশ ছিল মহিলা সেখানে দ্বাদশ লোকসভা নির্বাচনে মহিলা সদস্য সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছিল ৮.৮ শতাংশে। রাজ্যসভায় মহিলা সদস্যসংখ্যা ছিল এই সময় ১০.৩ শতাংশ।

There has usually been a higher percentage of women in the Rajya Sabha than in the Lok Sabha, where some women have been appointed and others are selected by the states due to their value to the political party.

Number of Women Members of the Rajya Sabha 1952 - 2004

Rajya Sabha	Total number of Seats	Number of Women members	Percentage to Total
1952	216	15	6.9
1956	232	20	8.6
1960	236	24	10.2
1964	238	21	8.8
1968	240	22	9.2
1970	240	14	5.8
1972	243	18	7.4
1974	243	17	7.0
1978	244	25	10.2
1982	244	24	9.8
1986	244	28	11.4
1990	245	24	9.7
1993	233	17	7.3
1998	245	18	7.3
2004	245	25	10.2

Sources : C. K. Jain, Women Parliamentarians in India, New Delhi : Lik Sabha Secretariat, 1993 and Indian Parliament Website, http://parliamentofindia.nic.in/lok03/htm.

অন্যদিকে প্রথম নির্বাচনে মোট মহিলা ভোটার ছিল ৩৭ শতাংশ। ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১ সালের মধ্যে তা বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৯ - ৭০ শতাংশে। ১৯৬৭ - ২০০৪ সালের মধ্যে লোকসভা নির্বাচনে ভোটাধিকারী নারীদের মধ্যে গড়ে ৫০ শতাংশের বেশি ভোট দিয়েছিল যে সব রাজ্যে এই সময় মহিলা ভোটারের সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল সেগুলো হল গুজরাট, হরিয়ানা, কর্ণাটক, কেরালা, মধ্যপ্রদেশ, পাঞ্জাব, রাজস্থান এবং পশ্চিমবঙ্গ। নিম্নোক্ত সারণী

Number of Women in the Lok Sabha

General Election	Number of Women in Lok Sabha	% Women in Lok Sabha	Number and % Women Candidates		% Women Voters
First (1952)	22	4.4	–	–	–
Second (1957)	27	5.4	45	2.9%	–
Third (1962)	34	6.7	70	3.5	46.63
Fourth (1967)	31	5.9	67	2.8%	55.48
Fifth (1971)	22	4.2	86	3.09%	49.11
Sixth (1977)	19	3.4	70	2.9%	54.91
Seventh (1980)	28	5.1	142	3.07%	51.22
Eight (1984)	44	8.1	164	2.9%	58.60
Ninth (1989)	28	5.29	198	3.2%	57.32
Tenth (1991)	39	7.07	325	3.74%	51.35
Eleventh (1996)	44	8.1	599	4.3%	53.41
Twelfth (1998)	46	8.4	274	5.7%	57.69
Thirteenth (1999)	48	8.8	284	6.1%	55.64
Fourteenth (2004)	45	8.3	355	6.5%	53.64

Sources : Official Election Reports published by the Election Commission of India.

/ থেকে জানা যায় যে দ্বিতীয় সাধারণ নির্বাচনে (১৯৫৭) লোকসভায় মোট মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২২ জন। ২০০৪ সালে ছিল ৪৫ জন। গড়ে মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীর সংখ্যা পুরুষ প্রার্থীর তুলনায় ২০ শতাংশ কম।

১৯৫২ - ৫৭ রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচনে নির্বাচিত মহিলা সদস্য সংখ্যা ছাপ ফেলার মত ছিলনা। দিল্লীতে ছিল ৫.৯ শতাংশ। মধ্যপ্রদেশে ৫.১ শতাংশ প্রতিনিধি। ১৯৫২ - ১৯৯৬ সালের মধ্যে প্রতি নির্বাচন ক্ষেত্রে গড়ে ০.১৯ জন মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করত। গড়ে সফল মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা ছিল ২১.০ শতাংশ।

Women's Representation in State Legislatures 1952 - 1997
(% if Women MLAs)

States	1952**	1957	1960-65	1967-69	1970-75	1977-78	1979-83	1984-88	1989-92	1993-97	State Avg.
Andhra Pradesh	2.9	3.7	3.3	3.8	9.1	3.4	4.1	3.4	3.7	2.7	4.0
Arunachal Pradesh	--	--	--	--	--	0.0	3.3	6.7	3.3	3.3	3.3
Assam	0.5	4.6	3.8	4.0	7.0	0.8	0.8	4.0	4.0	4.8	3.2
Bihar	3.6	9.4	7.9	2.2*	3.8	4.0	3.7	4.6	2.8	3.4	4.3
Goa	--	--	--	6.7	3.3	3.3	0.0	0.0	5.0	10.0	4.3
Gujarat	--	--	8.4	4.8	3.2	NE	2.7	8.8	2.2	1.1	4.2
Haryana	--	--	--	7.4	6.2	4.4	7.8	5.6	6.7	4.4	6.2
Himachal Pradesh	0.0	--	--	0.0	5.9	1.5	4.4	4.4	5.9	4.4	3.6
Jammu & Kashmir	--	NE	0.0	0.0	5.3	1.3	0.0	1.3	NE	2.3	1.5
Karnataka	2.0	8.7	8.7	3.2	5.1	4.0	0.9	3.6	4.5	3.1	4.5
Kerala	0.0	4.8	3.9*	0.8	1.5	0.7	3.2	5.7	5.7	9.3	3.6
Madhya Pradesh	2.1	10.8	4.9	3.4	5.4	3.1	5.6	9.7	3.4	3.8	5.1
Maharashtra	1.9	6.3	4.9	3.3	9.3	2.8	6.6	5.6	2.1	3.8	4.7
Manipur	--	NE	NE	0.0	0.0*	NE	0.0	0.0	1.7	0.0	0.3
Meghalaya	--	--	--	--	1.7	1.7	0.0	3.3	NE	1.7	1.7
Mizoram	--	--	--	--	0.0	3.3	3.3	2.5	0.0	0.0	1.4
Nagaland	--	--	0.0	0.0	NE	0.0	0.0	1.7	0.0	0.0	0.5
Orissa	9.6	3.6	1.4	3.6	1.4*	48	3.4	6.1	4.8	5.4	4.0
Punjab	2.2	5.8	5.2	1.0*	5.8	2.6	5.1	3.4	5.1	6.0	4.0
Rajasthan	0.0	5.1	4.5	3.3	7.1	4.0	5.0	8.0	5.5	4.5	4.8
Sikkim	--	--	--	--	--	--	0.0	0.0	6.3	3.1	2.3
Tamil Nadu	0.3	5.9	3.9	1.7	2.1	0.9	2.1	3.4	9.0	3.8	3.6
Tripura	--	NE	NE	0.0	3.3	1.7	6.7	3.3	NE	1.7	3.0
Uttar Pradesh	1.2	5.8	4.4	2.8*	5.9	2.6	5.6	7.3	3.3*	4.0*	4.1
West Bengal	0.8	3.6	4.8	2.9*	1.6*	1.4	2.4	4.4	7.1	6.8	3.4
Delhi	4.2	--	NE	NE	7.1	7.1	7.1	NE	NE	4.3	2.6
Pondicherry	--	--	6.7	3.3	0.0	0.0	3.3	3.3	1.7	3.3	2.6
Period Average	1.8	6.3	4.9	2.9	4.4	2.8	3.8	5.3	4.5	4.0	4.0

Notes : Table entry stands for % of women MLAs elected to state legislatures in the relevant elections : States did not exist; NE : No elections held in that year / period; * : Two elections held during this period. The fighre given here is an average of the two; ** : In 1952 the Election Commission did not recognise women as a separate category. The figures given here are based on name recognition and hence liable to under-reporting of women representatives.

১৯৫২ - ১৯৬২ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত লোকসভার নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বী মহিলা প্রার্থীদের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে প্রকাশ পায় ১৯৫৭ সালে লোকসভা নির্বাচনে ৬টি কেন্দ্রে মহিলা প্রার্থীর বিরুদ্ধে মহিলা প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এই নির্বাচনে দৃষ্টি আকর্ষক প্রতিদ্বন্দ্বিতা হয়েছিল কংগ্রেস প্রার্থী মানমোহিনী মুৎসী সহিগল। অন্যদিকে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী ছিলেন স্বতন্ত্র দলের সুচেতা কৃপালিনী। নারীবাদী আন্দোলনও দুইজনেই জাতীয় আন্দোলনের প্রথম সারির নেত্রী। প্রথমজন দ্বিতীয়জনের কাছে অল্প ব্যবধানে পরাজিত হন। এই পরাজয়ের জন্য তিনি কংগ্রেসের নেতৃত্বকে দায়ি করেছিলেন পরবর্তীকালে। ১৯৯৯ সালে কর্ণাটকের লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেসের প্রার্থী সোনিয়া গান্ধীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন বি.জে.পি.-র প্রভাবশালী নেত্রী সুষমা স্বরাজ। ৫১ শতাংশ ভোট পেয়ে সোনিয়া গান্ধী ঐ আসনটিতে জয় লাভ করেন। ১৯৫৭ সালের রাজ্য বিধানসভাগুলির নির্বাচন বহু আসনে মহিলা প্রার্থীদের মধ্যে বহুমুখী প্রতিদ্বন্দ্বিতার উল্লেখ মেলে। ১০ শতাংশ ক্ষেত্রে কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থীর বিরুদ্ধে একাধিক মহিলা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছিলেন। এক্ষেত্রে সক্রিয় মহিলা রাজনৈতিক কর্মীদের মধ্যে যে ফাটল ধরবে এ নিয়ে নারীবাদী সংগঠনগুলি বহু পূর্বেই সাবধানবলী শুনিয়েছিল।

১২.৭.১৪.২.৩ ঃ প্রার্থী নির্বাচনে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা

নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নে রাজনৈতিক দলের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৫২ - ৬২ সালের মধ্যে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মহিলাদের জন্য কংগ্রেস দলগতভাবে আসন সংরক্ষণের নীতি নিয়েছিল। ১৫ শতাংশ আসন দলের মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকত। কারণ সদ্য স্বাধীনতা প্রাপ্ত দেশে মহিলাদের সমস্যাগুলি যাতে নির্বাচিত মহিলা সদস্যারা আইনসভায় উপযুক্তভাবে তুলে ধরতে পারেন। পুরুষ কংগ্রেস নেতাদের নির্বাচনে মনোনয়ন পাবার সুযোগ কমে যাওয়ার আশঙ্কায় ১৯৬২ সালের নির্বাচনের পর থেকে কংগ্রেস এই নীতি ত্যাগ করে। লক্ষ্যণীয়, ইন্দিরা গান্ধীর সময়ে নির্বাচনে কংগ্রেসের মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা কমতে থাকে। কংগ্রেস ছাড়াও বিরোধী দলগুলিও নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের অগ্রাধিকার দিত না। তাদের মনোনীত মহিলা প্রার্থীর সংখ্যা গড়ে ১০ শতাংশের বেশি নয়।

Political Party Nomination of Women

General Elections	Percentage of Women Nominated to Contest
1952	4.4
1957	5.4
1962	6.8
1967	5.9
1971	4.2
1977	3.5
1980	5.1
1984	8.1
1989	5.2
1990	7.2
1996	7.4
1998	7.9

নির্বাচনে দলের টিকিট বন্টনের ক্ষেত্রে পুরুষ সদস্যদের স্বার্থই বড় করে দেখা হত।

১২.৭.১৪.২.৪ ঃ নির্বাচনী ইস্তাহার ও প্রচার পুস্তিকা

নির্বাচনকালে এগুলি দলীয় প্রার্থী ও নির্বাচকদের মধ্যে একটা চিন্তনের মিশ্রক্রিয়া গড়ে ওঠে, প্রকাশিত হতে পারে দলীয় আদর্শ, লক্ষ্য, ভবিষ্যৎ কর্মসূচি এবং বিভিন্ন সমসাময়িক ইস্যু। ১৯৮০ সালের পূর্বে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল কর্তৃক প্রকাশিত ইস্তাহারে মহিলাদের বিষয়গুলি খুব বেশি প্রাধান্য পেত না। ১৯৮০ দসকের পর থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের ইস্তাহারে নারীদের বিষয়গুলি বিশে,ভাবে স্থান পায় এবং প্রকাশিত হতে থাকে তাদের জন্য একগুচ্ছ দলীয় কর্মসূচি। এই সময়কাল থেকে বিভিন্ন দলের ইস্তাহারে প্রকাশ পেতে থাকে পঞ্চায়েত থেকে আইনসভা পর্যন্ত নারীদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবিটি Wendy Singer বলেন, বিভিন্ন দলে বিরাজমান পুরুষ আধিপত্যের জন্য ইস্তাহারে প্রকাশিত মহিলাদের জন্য দেয় প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়িত হতে পারত না। তবে এগুলি নব নির্বাচিত সদস্যাদের নারীদের বিষয়গুলি আইনসভায় তুলে ধরতে সাহায্য করত।

১২.৭.১৪.২.৫ ঃ মহিলা আসন-সংরক্ষণ বিল

নারীর ক্ষমতায়নের প্রশ্নে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে রাজ্য ও কেন্দ্র আইন সভায় একতৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের বিষয়টি প্রায় একদশক ধরে ভারতীয় সংসদীয় রাজনীতিতে এক বড় ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে। ১৯৩০ -এর দশকের শুরু থেকেই মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণ বিষয়টি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে বিষয়টি প্রথম গুরুত্ব পায় ১৯৮০ দশকে The National Perspective Plan for Women কর্তৃক প্রকাশিত রিপোর্টে। সংসদীয় রাজনীতিতে নারীর অংশগ্রহণকে উৎসাহিত করার জন্য এই রিপোর্টে কেন্দ্র-রাজ্য আইনসভায় নারীদের জন্য ৩০ শতাংশ আসন সংরক্ষণের সুপারিশ করা হয়। ৭৩ ও ৭৪তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌরসভাগুলিতে এই নীতি কার্যকর করা হয়। ৮১তম সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের বিলটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রথম উপস্থাপিত হয় ১৯৯৬ সালে ১২ই সেপ্টেম্বর। এই সংশোধনী বিলে প্রতিশ্রুতি ছিল যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় এক তৃতীয়াংশ আসন মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে রোটেশন বা পর্যায় ভিত্তিতে। রাজ্যগুলিকেও নির্দেশ দেওয়া হবে অনুরূপ আইন প্রণয়ন করে রাজ্য-আইন সভায় মহিলাদের জন্য উক্ত শতাংশ আসন সংরক্ষণ করতে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী দেবগৌড়া যখন বিলটি উপস্থাপিত করেন তখন তিনি পার্লামেন্টের উভয় কক্ষের সদস্যদের অনুরোধ জানিয়েছিলেন আলোচনা পরিহার করে তাঁরা যেন সহমতের ভিত্তিতে বিলটি পাশ করেন। বহু সদস্য প্রাথমিক স্তরে রাজি হলেও পরে উত্তপ্ত তর্ক-বিতর্কের মধ্যে বিলটি অনির্দিষ্টকালের জন্য হিমঘরে আটকে পড়ে। ১৯৯৮, ২০০৩, ২০০৫ সালে সংসদে বিলটি নিয়ে চলে নানান বিতর্ক ও আলোচনা।

১২.৭.১৪.২.৫.১ ঃ বিলের মূল বিতর্কের বিষয়

বিলের উপর বিতর্কে অংশগ্রহণকারী বি.জে.পি.-র মহিলা সাংসদ সুষমা স্বরাজ এবং উমা ভারতীর বক্তব্য বিতর্কের ভিত্তি রচনা করেছিল। সুষমা স্বরাজের বক্তব্য হল, মহিলাদের আসন সংরক্ষণ বিষয়টি অনেক দেরি হয়ে গেছে। এর ফলে রাজনীতিতে পুরুষের কর্তৃত্ব ও নিয়ন্ত্রণ বৃদ্ধি পেয়েছে। সুতরাং বিলটি এখনই পাশ করা হউক। অন্যদিকে উমা ভারতী স্বীকার করেন, আইনসভায় মহিলাদের প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি করা উচিত। কিন্তু বিলটির বিরোধিতা করে বলেন যে পিছিয়ে পড়া শ্রেণির মহিলাদের প্রতিনিধিত্বে বিষয়টি এতে স্থান পায়নি। দেশের নিপীড়িত মানুষের অধিকাংশই হল অনগ্রসর জাতি ও জনজাতি গোষ্ঠীর। সরকারে এদের কণ্ঠস্বর অতি ক্ষীণ। এই শ্রেণীর মহিলাদের আইনসভায় প্রতিনিধিত্ব বৃদ্ধি ও নিশ্চিত করার জন্য অনগ্রসর শ্রেণিগুলির জন্য "Quota Within Quota -র প্রস্তাব উমা ভারতী রাখেন। অর্থাৎ মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত আসনের মধ্যেই অনগ্রসর শ্রেণির জন্য আসন সংরক্ষণ। তাঁর এই প্রস্তাবকে প্রবলভাবে সমর্থন করে রাষ্ট্রীয় জনতা দল এবং সমাজবাদী পার্টি। কারণ অনগ্রসর শ্রেণিগুলিই হল এইসব দলের মূল শক্তি। এই বিলের সমর্থকদের মধ্যে কংগ্রেস সাংসদ মার্গারেট আলভা বলেন, অনগ্রসর শ্রেণির প্রশ্ন তুলে

আসলে এটিকে বাধা দেবার রাজনৈতিক কৌশল নিয়েছেন বিল বিরোধীরা। কারণ এই বিল আইনে রূপায়িত হলে পুরুষ সাংসদরা ১/৩ অংশ ক্ষমতা হারাবেন আগামী নির্বাচনে। তিনি জোরের সাথে মন্তব্য করেন যে কোনো দল, এমনকি তাঁর দলও চায়না নারী সমান সুযোগ পান এবং আইনসভায় বেশি করে তাদের প্রতিনিধিত্ব ঘটুক। জনতাদলের রাজ্যসভার সাংসদ মধু দণ্ডবতে সহমত পোষণ করেন। বিলটি উত্থাপনের জন্য প্রধানমন্ত্রী সকল মহিলা সাংসদদের কাছ থেকে ধন্যবাদ পেলেও বিল বিরোধীদের সন্তুষ্ট করার জন্য এটিকে তিনি পর্যালোচনার জন্য সংসদীয় কমিটিতে পাঠান।

১২.৭.১৪.২.৫.২ ঃ বিলটির প্রতি বিকল্প প্রস্তাব

৮৩তম সংবিধান সংশোধনী নিয়ে আইনসভার ভেতর ও বাইরে যে বিতর্ক চলেছিল তা থেকে তিনটি বিকল্প প্রস্তাব উপস্থাপিত হয়। (এক) 'Quota within Quota' (সংরক্ষণের ভেতর সংরক্ষণ) (দুই) মহিলাদের বিশেষ বর্গ হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের জন্য উপযুক্ত নির্বাচন ক্ষেত্র বাছা। (তিন) দ্বৈত সদস্য নির্বাচন ক্ষেত্র। দিল্লীর মানুসী পত্রিকার সম্পাদকের তরফ থেকে দ্বিতীয় প্রস্তাবটি রাখা হয়। তৎকালীন নির্বাচন কমিশনার এম.এস.গিল এই প্রস্তাবকে সমর্থন করে নির্বাচনে প্রার্থী মনোনয়নের ক্ষেত্রে মহিলাদের জন্য দলীয় সংরক্ষণ নীতি গ্রহণের প্রস্তাব রাখেন। এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করে সমাজবাদী পার্টির পক্ষ থেকে বলা হয় যে এধরণের ব্যবস্থায় সমাজের এলিট মহিলারা নির্বাচিত হবার সুযোগ পাবে। তৃতীয় প্রস্তাবটি রাখেন ২০০৫ সালে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শিবরাজ পাটিল। এতে বলা হয় যে আইনসভার ১/৩ অংশ আসন dual member constituency -তে করা হউক। সংরক্ষিত মহিলা আসনে নির্বাচকরা একজন মহিলাকে এবং একজন সাধারণ ব্যক্তিকে নির্বাচিত করার অধিকার পাবেন। কিন্তু উপরোক্ত দুটি প্রস্তাবই গুরুত্ব পায়নি। তবে বি.জে.পি. নীতিগতভাবে দ্বিতীয় প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানিয়েছিল।

উপরোক্ত বিকল্প প্রস্তাবগুলির মধ্যে প্রথমটিই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে ওঠে। ১৯৯৮ সালে প্রধানমন্ত্রী অটল বিহারী বাজপেয়ি আলোচ্য বিলটি অনুমোদনের জন্য আইনসভার উভয়কক্ষে উপস্থাপিত করেন। বিলের মূল বিরোধী সমাজবাদী পার্টি এবং আরো কিছু দল বিলের বিরোধিতায় অনড় থাকেন। এই সময় আইনসভার ভেতরে ও বাইরে বিলের বিরোধিতা করে যেসব বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছিল তা হল :

মহিলাদের জন্য সংরক্ষণের কোটাতেও অনগ্রসরদের জন্য সংরক্ষণ থাকুক। বিল বিরোধীদের মতে মহিলাদের জন্য আসন সংরক্ষণের মধ্য দিয়ে যে নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন হয়না, তা পঞ্চায়েত স্তরের সংরক্ষণ দিয়েই বোঝা গেছে। তাছাড়া আইনসভায় নির্বাচিত মহিলাদের কখনও মহিলাদের স্বার্থ তুলে ধরতে দেখা যায়না। মহিলাদের জন্যই এই আসন সংরক্ষণ ভারতীয় সংবিধানের নারীপুরুষের সমতা নীতির প্রতি এটি একটি পশ্চাৎবাদী পদক্ষেপ।

যাইহোক ৮১তম সংবিধান সংশোধন বিলটি দুটি দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ (১) দল-মত নির্বিশেষে মহিলা সংসদরা আইনসভায় ১/৩ অংশ ক্ষমতা দখলের জন্য পুরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হয়ে বিলটিকে সমর্থন জানিয়েছে। (২) নারীর সমতায়ন প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রে নানান অভিমুখ খুলে দিয়েছে।

১২.৭.১৪.২.৬ ঃ আইনসভায় নারীর ক্ষমতায়নের স্বরূপ

যে অল্প সংখ্যক নারী রাজ্য বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় প্রতিনিধিত্বের সুযোগ পেয়েছেন তাঁদের ক্ষমতার স্বরূপ কি? রাজনৈতিক অঙ্গনে কতখানি প্রাধান্য পেয়েছেন? কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের নারী মন্ত্রী সংখ্যা কত সামান্য। যাঁরা আছেন বা ছিলেন তারা সকলেই কার্যত নরম দপ্তরের মন্ত্রী। আরো আশ্চর্য্যের বিষয় রাজ্য বা কেন্দ্রীয় আইনসভায় যখন কোন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উপস্থাপিত হয় তখন আলোচনাকারী নারী সদস্যের সংখ্যা পুরুষের তুলনায় অতি অল্প। অথচ লোকসভায় যখন Domestic Violence Bill, ২০০৪ -এ উপস্থাপিত হয় তখন পুরুষের চেয়ে নারীর উপস্থিতির সংখ্যা বেশি। ২০০৫ -এ লোকসভায় ভ্রূণহত্যা প্রতিরোধ বিল আলোচনায় ছিলেন ৫ জন পুরুষ ২ জন নারী। ২০০৬ -এ উত্তরাধিকারী সংক্রান্ত বিল প্রসঙ্গে আলোচনার সময় উপস্থিত ছিলেন ১৩ জন পুরুষ, ৫ জন নারী। এই তিনটি প্রসঙ্গে নারীর উপস্থিতির সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশি।

Number of Participants in Debates on

Topics	2004	2005	2006
Motion of Thank on the President's Address	M:F –	M:F 47:0	M:F 37:3
General Budge	71:5	163:11	61:3
Railway Budget	131:15	245:4	99:9
External Affairs	IRAQ 11:0	Pakistan President's Visit 13:0	Iran Nuclear Programme 22:0
Home Affairs	Patent 40:4	Right to Information 16:0	Rural Employment Guarantee 76:4

মনে হয় এগুলিই যেন মেয়েদের প্রধান নারী সমস্যা। এগুলি যে প্রকৃতপক্ষে বৃহৎ সামাজিক সমস্যা ও সামাজিক বৈষম্য দূরীকরণের উপকরণ অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতাদের দৃষ্টিকোণে তা ধরা পড়ে না। সোনিয়া গান্ধী, বৃন্দা কারাত, সুষমা স্বরাজ, মায়াবতী, উমা ভারতীর মতন নেত্রী সাংসদরা আইনসভায়

বক্তব্য রাখার সুযোগ ও অধিকার পেলেও সাধারণ সদস্যরা তা পান না। কারণ দলের পুরুষ রাজনৈতিক নেতারা ঠিক করেছেন কে, কোন বিষয়ের উপর বক্তব্য রাখবে, রাজ্যগুলির ক্ষেত্রেও এই চিত্র খুব ব্যতিক্রম নয়।

১২.৭.১৪.২.৭ ঃ উপসংহার

নারী রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করেছে। নির্বাচনের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে রাজ্য ও কেন্দ্রীয় আইনসভায় সদস্য হয়েছেন। পঞ্চায়েত ও পৌরসভার একতৃতীয়াংশ ক্ষমতা তাদের দখলে। দেশের রাষ্ট্রপতি একজন মহিলা। কয়েকটি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা। দেশের ১/৩ অংশ ক্ষমতার জমি দখলের জন্য তাঁরা লড়াই করছেন পুরুষের বিরুদ্ধে। এতেও নারীর প্রকৃত ক্ষমতায়ন হয়নি বলে নারীবাদীরা মনে করেন। তাঁদের মনে ক্ষমতায়নের রসসিঞ্চন শুরু হয় মেয়েদের সুষ্ঠুভাবে বেঁচে থাকার মধ্য দিয়ে। আজও এখানে বছরে ৫ লক্ষ কন্যার ভ্রূণ হত্যা হয়ে থাকে। প্রতি ৭০ জন প্রসূতি মায়ের মধ্যে একজনের মৃত্যু হয়। স্ত্রী-শিক্ষাতে আফ্রিকার অনেক অনুন্নত দেশ ভারতের চেয়ে এগিয়ে। সংবিধানের দেওয়া ক্ষমতার সুযোগ আদায়ের জন্য স্বাধীনতার ৬০ বছর পরেও তাকে লড়াই করতে হয়। মোট জনসংখ্যার ৫০ শতাংশ পুরুষের বিরুদ্ধে। মূল কথা হল ক্ষমতায়ন হল একটি প্রক্রিয়া। উপরতলার ক্ষমতায়ন ঘটিয়ে নীচুতলায় নারীর ক্ষমতায়নের প্রকৃত রসসিঞ্চন হয়না।

১২.৭.১৪.২.৭ ঃ সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১। কেন্দ্র ও রাজ্য আইনসভায় নারীর অংশগ্রহণ তাঁদের রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়াকে কতখানি ত্বরান্বিত করেছিল?

২। ৮১তম সংবিধান সংশোধনী বিলের উপর আলোচিত মূল বিতর্কগুলি ব্যাখ্যা কর। এটি কি নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে নতুন অভিমুখ খুলে দিয়েছিল?

উপএকক - ৩

Feminist Movement in India Since 1947

বিন্যাসক্রম ঃ

১২.৭.১৪.৩.০ ক প্রস্তাবনা

১২.৭.১৪.৩.১ ক উদ্দেশ্য

১২.৭.১৪.৩.২ ক স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীবাদী আন্দোলনের ধারা

১২.৭.১৪.৩.৩ ক স্বতন্ত্র নারীবাদী আন্দোলনের উন্মেষ

১২.৭.১৪.৩.৪ ক স্বতন্ত্র নারীবাদী সংগঠনগুলির ভূমিকা

১২.৭.১৪.৩.৫ ক দলীয় নারী সংগঠনগুলির ভূমিকা

১২.৭.১৪.৩.৬ ক নারীবাদী আন্দোলনের পথে বাধা

১২.৭.১৪.৩.৭ ক আন্দোলনের চরিত্রগত পরিবর্তন

১২.৭.১৪.৩.৮ ক পৌরসভা ও নারীর রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন

১২.৭.১৪.৩.৯ ক সহায়ক গ্রন্থাবলী

১২.৭.১৪.৩.১০ ক সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৭.১৪.৩.০ ঃ প্রস্তাবনা

স্বাধীনতার পরবর্তীকালে প্রায় অর্ধশতকব্যাপী নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ইস্যুগুলি নিয়ে বিভিন্ন নারী সংগঠন, প্রধান রাজনৈতিক দলগুলি এবং আঞ্চলিক ও স্থানীয় স্তরে নারী সংগঠনগুলির নেতৃত্বে নারী আন্দোলন বা নারীবাদী আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। তবে এর ঐতিহ্য রয়ে গিয়েছিল উনিশ শতকের সমাজ সংস্কার এবং বিংশ শতকের দ্বিতীয় দশক, বিশেষ করে তৃতীয় দশকে গান্ধীজী পরিচালিত গণ আন্দোলনগুলির মধ্যে। সমগ্রভারতের সর্বস্তরের নারীর রাজনীতিতে মহাপ্রবেশ গান্ধীর দৌলতে। নারীর উদ্দেশ্যে গান্ধীজীর আহ্বান এবং নারীশক্তি সম্বন্ধে বিশ্বাসের সজোরে ঘোষণা ভারতে নারী আন্দোলন গড়ে ওঠার ভিত্তি মূল স্থাপন করেছে। জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে নারী রাজনৈতিক পরাধীনতা সম্বন্ধে চেতনা লাভ করল। এই চেতনা তাঁর মনে জাগ্রত করল পরাধীনতা। বস্তু সম্বন্ধে চেতনা। নারীরা যখন বিদেশী পরাধীনতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করছিলেন, তখনই তাঁরা ঘরের হীনাবস্থা সম্বন্ধে সজাগ হন। তার পরিচয় মেলে সমসাময়িক কালের মেয়েদের লেখায়। পাশাপাশি ১৯৪০ ও ৫০ এর দশকের গোড়ার দিকে সাম্যবাদীদের নেতৃত্বে পরিচালিত কৃষক ও শ্রমিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে তারা অর্জন করল নতুন অভিজ্ঞতা যা তাদের ভবিষ্যৎ সংগ্রামে আত্মবিশ্বাস যুগিয়েছিল।

১২.৭.১৪.৩.১ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য হল উত্তর স্বাধীনতাকালে নারীবাদী আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা এবং মূল্যায়ণ করা।

১২.৭.১৪.৩.২ ঃ স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীবাদী আন্দোলনের ধারা

ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হবার পর ভারতীয় সংবিধান নারীর সম্পূর্ণ সমান অধিকারের অঙ্গীকার দেয়। এই সমতার বিধান ছিল স্বাধীনতা সংগ্রামে নারীকূলের অবদানের স্বীকৃতি। কিন্তু সংবিধানে অঙ্গীকার ছিল শুধু লিখন মাত্র। বাস্তব প্রয়োগের ক্ষেত্রে ছিল নানাবিধ বাধা। এইসব বাধাগুলির অপসারণের ক্ষেত্রেও ছিল নানাবিধ প্রতিবন্ধকতা। এইসব সমস্যা দূর করা এবং এগুলি সমাধানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক দল, নারী সংগঠন এবং গোষ্ঠীগুলি নিজ নিজ দর্শন ও আদর্শের পরেই এগিয়েছিল। ১৯৬০ ও ১৯৭০ এর দশকে রাজনীতির ক্ষেত্রে নতুন উত্তেজনা লক্ষ্য করা যায়। জোতদার-ভূস্বামীর বিরুদ্ধে দেশের বিভিন্ন স্থানে কৃষকের জমি দখলের লড়াই, গণতান্ত্রিক অধিকার রক্ষার জন্য জয়প্রকাশের নেতৃত্বে সংগঠিত গণ আন্দোলন, উত্তরখণ্ডে বনাঞ্চল রক্ষার জন্য চিপকো আন্দোলন এবং মূল্য বৃদ্ধির বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন প্রভৃতি এই দুই দশকের রাজনীতিকে উত্তাল করেছিল। ভারতের নারী বর্হিমহলের এইসব রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশ নিতে দ্বিধা করেননি। তাঁরা প্রতিবাদী কর্মকাণ্ডে যোগ দিয়েছিলেন। বহু ছোট বড় রাজনৈতিক কর্মধারার

সাথে ভারতীয় নারী যুক্ত হয়েছেন। এর মধ্যে সব থেকে উল্লেখযোগ্য হল 'চিপকো' আন্দোলন। অরণ্য ধ্বংস হলে জল, জ্বালানী এবং পশুখাদ্য ধ্বংস হবে। পুরুষের চেয়ে নারীই এতে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। এই চেতনাই তাঁদের এই আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে বাধ্য করেছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক ও সামাজিক স্বার্থে। যেমন তারা সর্বোদয় কর্মীদের উদ্যোগে মহারাষ্ট্রে এবং অন্ধ্রে মদ্যপান বিরোধী আন্দোলন গড়ে তোলেন। পাশাপাশি সূতাকল মালিকদের শোষণের বিরুদ্ধে গান্ধীবাদী মডেলে গুজরাটের Self Employed Womens Association অসংগঠিত মহিলা শ্রমিকদের ইউনিয়ন গঠন করে। তাঁদের স্বনির্ভর করে তোলার জন্য কর্মসূচী নেয় এই সংগঠন। এলাভট্টের যোগ্য নেতৃত্বে দেশের বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠে এর শাখা সংগঠন। ১৯৮০ -র দশকে মহারাষ্ট্রের কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত শ্বেতকড়ি সংগঠনের মহিলা শাখা রাজনৈতিক দুর্বৃত্তায়নের বিরুদ্ধে মহিলাদের সংগঠিত করে। এছাড়া আগে অনেক ছোট বড় রাজনৈতিক ও সামাজিক এবং অর্থনৈতিক আন্দোলনের সাথে এই পর্বে নারী সম্পূর্ণ লিঙ্গভিত্তিক চেতনা নিয়ে যুক্ত হয়েছিল।

১২.৭.১৪.৩.৩ ঃ স্বতন্ত্র নারীবাদী আন্দোলনের উন্মেষ

কয়েকটি ছাড়া উপরোক্ত আন্দোলনগুলিতে নারী ছিল বৃহৎ গণআন্দোলনের অংশগ্রহণকারী শক্তি মাত্র। নারী বিষয়গুলি অর্থাৎ পুরুষতন্ত্রের আধিপত্যের জন্য দৈনন্দিন জীবনে নারী যে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্যায়ের শিকার হচ্ছে তার প্রতিকার এইসব আন্দোলনের ক্ষেত্রেই স্থান পায়নি। নারীবাদী আন্দোলনের যে স্রোতটি বিভিন্ন ধরণের লিঙ্গভিত্তিক অবিচার যথা পণপ্রথাজনিত কারণে মৃত্যু, ধর্ষণ, মদ্যপান সম্পর্কিত পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল যেটির উৎস ১৯৭০ -এর দশকের মাঝামাঝি কাল থেকে। Geraldine Forbes -এর মতে শুরু হয় এদেশে নারীবাদী আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্ব। প্রথমটি শুরু হয়েছিল গান্ধীবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে।

১২.৭.১৪.৩.৪ ঃ স্বতন্ত্র নারীবাদী সংগঠনগুলির ভূমিকা

বিভিন্ন শহরে গড়ে ওঠা স্বাধীন মহিলা সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলি ছিল দ্বিতীয় পর্বের নারীবাদী আন্দোলনের মূল শক্তি। এই সব গোষ্ঠীগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল হায়দ্রাবাদ ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রোগ্রেসিভ উমেনস্ অরগানাইজেসন – (১৯৭৪), পুনের পুরগাও স্ত্রী সংগঠন এবং বোম্বের স্ত্রী মুক্তি সংগঠন। U.N.O. ১৯৭৫ সালকে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ এবং নারীর দশক হিসাবে ঘোষণা করলে কেন্দ্রীয় সরকার দেশের নারীদের প্রকৃত অবস্থা ও মর্যাদা পর্যবেক্ষণের জন্য ফুলরেণু গুহর নেতৃত্বে একটি কমিটি নিয়োগ করে। কিন্তু প্রকাশিত প্রতিবেদন "Towards Equality : Report of the Committee on the stating of Women" যে চিত্র উপস্থাপিত করল তাতে দেশের নারীকুল তথা নারীবাদী সংগঠন ও গোষ্ঠীগুলি বিচলিত হয়ে পড়ে। উপলব্ধি করে যে সংবিধানের দেওয়া অধিকার পর্যাপ্ত নয়। অধিকার বাস্তবে রূপান্তরিত করার জন্য সংগ্রামের প্রয়োজন। কেননা পুরুষতান্ত্রিক রাষ্ট্রের ভূমিকা নেতিবাচক। ১৯৭৫ সালে নারীমুক্তি

আন্দোলনের সাথে যুক্ত সংগঠনগুলি একই মঞ্চে মিলিত হয়ে সংগঠিত করে United Women's Liberation Struggle Conference । ভূমিহীন ক্ষেতমজুর থেকে শুরু করে বিভিন্ন মধ্যবিত্ত পেশায় নিযুক্ত মহিলা, ছাত্রীরা এই সম্মেলনে উপস্থিত হয়। সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব অনুসারে সংগঠিত নারীবাদী আন্দোলন নিয়ত দৃষ্টি আকর্ষণ করতে থাকে। সেইসব প্রাচীন প্রথা, বিশ্বাস এবং প্রতিষ্ঠানগুলির দিকে যেগুলি হল নারীর শোষণ ও নিপীড়নের উৎস। আন্দোলনের নেত্রীরা তুলে ধরে সেইসব ধরণের অপমান, অত্যাচার ও নিপীড়ন এবং ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর শারীরিক অত্যাচার যার নিয়ত শিকার হচ্ছে গ্রাম ও শহরের নারী। সনাতন ভারতীয় নারীর আদর্শবাদী মূর্তি ভেঙে তাঁর বাস্তব রূপকে তাঁরা দেশের মানুষের কাছে তুলে ধরল। সংগঠিত করে বুদ্ধিবাদী সংগ্রাম ও গণ অভিযান। লক্ষ্য হল নারীর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ন্যায় বিচার লাভ। ১৯৭৯ সাল থেকে দিল্লীর একটি ছোট মহিলা গোষ্ঠী 'Manushi : A Journal about women and society' শিরোনামে একটি পত্রিকা হিন্দী ও ইংরাজী ভাষায় নিয়মিত প্রকাশ করতে শুরু করে। এতে মহিলাদের বিভিন্ন ইস্যুগুলি বিশেষ করে যৌন নিগ্রহ, পণপ্রথাজনিত কারণে মৃত্যু, ঘরে বাহিরে সংগঠিত হিংসার ঘটনা এবং রাজনৈতিক অর্থনৈতিক নানা বৈষম্যের চিত্র তুলে ধরা হয়।

১২.৭.১৪.৩.৫ ঃ দলীয় নারী সংগঠনগুলির ভূমিকা

এইসব স্বাশাসিত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনগুলির পাশাপাশি রাজনৈতিক দলগুলিরও মেয়েদের বিষয়গুলির ওপর পূর্বের তুলনায় আরো বেশি গুরুত্ব আরোপ করে এবং গড়ে তোলে মহিলা শাখা সংগঠন। সমাজতন্ত্রীদের নিয়ে গঠিত জনতাদল প্রতিষ্ঠা করে 'মহিলা দক্ষতা সমিতি' CPI (M) -এর মহিলা সংগঠন All Democratic Women's Association -এর অধীনে ১৯৮১ সালে জনবাদী মহিলা সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। রাজনৈতিক দলের নিয়ন্ত্রণে পরিচালিত এসিব মহিলা সংগঠনগুলিও প্রকাশ করতে থাকে নারীবিষয়ক পত্রপত্রিকা ও প্রচার পুস্তিকা। যেসব বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছিল আন্দোলনে সেগুলির মধ্যে অন্যতম ছিল পণপ্রথাজনিত কারণে মহিলাদের মৃত্যু। জনতা দলের সাংসদ প্রমিলা দণ্ডবতের নেতৃত্বে ১৯৮০ সালে পণপ্রথা নিবারণী আইনের (১৯৬১) সংশোধনী চেয়ে একটি প্রাইভেট বিল সংসদে উপস্থাপিত করেন। ১৯৮৪ সালে এই সংশোধনী আইন পাশ হয়। সব ধরণের নারী সংগঠনগুলির সবচেয়ে বড় অভিযান ছিল মহিলাদের ওপর ধর্ষণ, বিশেষ করে পুলিশী হেপাজতে থাকা মহিলার ওপর ধর্ষণের ঘটনার বিরুদ্ধে। আলোচ্য সময়কালে একাধিক এই ধরণের ঘটনা জনমতকে প্রভাবিত করেছিল। যেমন ১৯৭৮ সালে হায়দ্রাবাদের রামিজা বি. কেস (Rameeza Bee Case in 1978); মহারাষ্ট্রের মথুরা কেস এবং ১৯৮০ সালে পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে মায়াত্যাগী কেস ইত্যাদি। বিভিন্ন মহিলা স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও গোষ্ঠী এবং প্রধান রাজনৈতিক দলগুলির মহিলা সংগঠন যৌথভাবে এই ইস্যুগুলিকে গ্রহণ করে এবং গড়ে তোলে যৌথ আন্দোলন। ধর্ষণ সংক্রান্ত তৎকালীন আইনের সংশোধনীর জন্য ১৯৮০ সালে একটি বিল পার্লামেন্টে উপস্থাপিত হয়। পাশ হয় ১৯৮৩ সালে এই আইনে পুলিশের হেপাজতে মহিলার ওপর ধর্ষণের ঘটনাকে জঘন্যতম ঘটনা বলে চিহ্নিত করা হয় এবং কঠোরতম শাস্তির বিধান উল্লেখ থাকে।

১২.৭.১৪.৩.৬ ঃ নারীবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির পথে বাধা

১৯৮০ -এর দশকে দুটি ঘটনা নারীবাদী আন্দোলনের অগ্রগতির ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। (১) রাজস্থানের দেউরালা গ্রামের রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার ঘটনা এবং (২) সাবানো নামে মুসলিম মহিলার প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে আর্থিক খোরপোশ আদায়ের ঘটনা। ১৯৮৭ সালে রূপ কানোয়ারের সতী হওয়ার ঘটনাকে নারীবাদী সংগঠনগুলি স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী ও পরিবারের সদস্যদের দ্বারা ঠাণ্ডা মাথায় খুনের ঘটনা বলে দাবি জানায়। সরকার ১৮২৯ সালের সতী আইনের সংশোধনী এনে ঘটনার বিরুদ্ধে প্রতিকার দাবি করে। প্রতিবাদে রক্ষণশীল হিন্দুরা এই সংশোধনী বিলকে হিন্দু ঐতিহ্যের ওপর আক্রমণ বলে প্রচার করে। হিন্দু মৌলবাদীরা সতীর মাহাত্ম্য প্রচার করে মহিলাদের নিয়ে মিছিল করে। অন্যদিকে ১৯৮৫ সালে সুপ্রীম কোর্টের রায়ে স্বামী পরিত্যক্তা সাবানো প্রাক্তন স্বামীর কাছ থেকে আর্থিক খরপোশ আদায়ের অধিকার বর্জন করে। সুপ্রীম কোর্টের এই রায়কে মুসলমান মৌলবাদী গোষ্ঠী Muslim Personal Law বিরোধী বলে প্রচার চালায়। মহিলা সংগঠনগুলি এতে প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দেবার জন্য রাজীব গান্ধীর কংগ্রেস সরকার Muslim Women's (Protection of Right in Devorce) উপস্থাপিত করে এই ধরণের আর্থিক খোরপোষ আদায়ের অধিকার থেকে স্বামী পরিত্যক্তা মুসলিম মহিলাদের বঞ্চিত করা হয়। পার্লামেন্টের বাইরে মুসলিম নারীবাদী গোষ্ঠী ও সংগঠন এবং সর্বভারতীয় নারী সংগঠনগুলি এই বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী হয়। Geraldine Forbes -এ প্রসঙ্গে বলেন, এই বিল পাশের ফলে সংখ্যালঘু সত্তার সাথে লিঙ্গসত্তার যে পার্থক্য বা স্বাতন্ত্র রয়েছে তা মুছে ফেলা হয়। ধর্মীয় মৌলবাদ প্রস্তুত অযোধ্যাকান্ড এবং গুজরাটের দাঙ্গা (২০০৩) এবং সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড নারীবাদী আন্দোলনের সংহতির ওপর এক ব্যাপক আঘাত হানে।

১২.৭.১৪.৩.৭ ঃ আন্দোলনের চরিত্রগত পরিবর্তন

যাইহোক ১৯৯০ -এর দশক থেকে নারীবাদী আন্দোলনের চরিত্রগত পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। নারীর ন্যায়বিচার অর্জনের লক্ষ্যে পৌঁছানোর ক্ষেত্রে গণ অভিযানের পরিবর্তে বুদ্ধিবাদী ও আইনি আন্দোলনের দিকে ঝুঁকে পড়ে স্বাধীন নারীবাদী সংগঠনগুলি। এই সময় গড়ে ওঠে মানবিক চর্চা কেন্দ্রগুলি – যাদবপুর, দিল্লী, বেনারস এবং ভারতের অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে। উদ্দেশ্য ছিল গবেষণার সাথে ক্ষেত্রকর্মীদের সংযোগ ঘটানো। বিভিন্ন পত্রপত্রিকা প্রকাশ করে নারীদের সমস্যাগুলি তুলে ধরা হয়। আইনি সাহায্যকেন্দ্র খুলে দুর্গত মহিলাদের আইনি সাহায্য দানের ব্যবস্থা গৃহীত হয়। দিল্লীর সাহেলী গোষ্ঠী শুধু নারী সমস্যা তুলে ধরাই নয় বিনোদন ও সৃষ্টিশীল কর্মেও যাতে নারীরা উৎসাহিত হয় সেদিকে নজর দেয়। এই গোষ্ঠী পণপ্রথা জনিত মৃত্যু ও পারিবারিক হিংসার বিরুদ্ধে একদিকে বুদ্ধিবাদী আন্দোলন গড়ে তোলে; অন্যদিকে বিজ্ঞাপনে ও ফিল্মের মাধ্যমে মেয়েদের যাতে খাটো করে না দেখা হয় সেদিকেও কঠোর নজর রাখে।

১৯৯০ -এর দশকে একদিকে বিশ্বায়নের ফলে নারীর অর্থনৈতিক অবণতি; অন্যদিকে মৌলবাদের

হিংস্র রূপ ভারতে নারীকুলকে চরম সংকটে ফেলে দেয়। বিশ শতকের শেষে এবং একবিংশ শতকের প্রথমদিকে নারী আন্দোলন কর্মসূচী বিশ্লেষণ করলে যে প্রধান পাঁচটি দাবির মুখোমুখি হতে হয় তা হল – অর্থনৈতিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন, ঘরে বাইরে হিংসার প্রতিকার, স্বাস্থ্য ও প্রজনন সম্পর্কিত অধিকার এবং আইন ও বিচার ব্যবস্থার সঠিক প্রয়োগ। এরই মধ্যে রয়েছে মৌলবাদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সংগ্রামের ডাক। জাঠার মাধ্যমে, বক্তৃতা এবং সপক্ষে লেখনী সঞ্চলনে আওয়াজ তুলে জাতীয় ঐক্য ও স্বকীয় স্তরের মহিলা সংগঠনগুলি নারীবাদী আন্দোলনকে সবল ও সুস্পষ্ট রূপ দিচ্ছে।

যাইহোক নারীবাদী আন্দোলনে মতাদর্শগত ভিন্নতা থাকা স্বত্ত্বেও সংগঠনগুলি রাষ্ট্রকে নারীর অবস্থান সম্পর্কে অবহিত করতে চেষ্টা করেছিল। দাবি করেছিল শিক্ষা, অর্থনৈতিক বৈষম্য মোচন। উন্নয়ন পরিকল্পনায় নারীর প্রয়োজনকে অগ্রাধিকার দান, নিশ্চিতভাবে তারা সরকারী নীতিকে প্রভাবিত করতে পেরেছিল। ১৯৮৮ সালে ভারত সরকার National Perspective Plan for Women সূচনা করে। ১৯৯৩ সালে সংবিধান সংশোধনের মাধ্যমে পঞ্চায়েত ও পৌরসভায় ১/৩ অংশ সমান সংরক্ষণের ব্যবস্থা হয়েছে। ১৯৯৬ সালে কেন্দ্র-রাজ্য আইন সভায় মহিলাদের জন্য ১/৩ অংশ আসন সংরক্ষণের বিল উপস্থাপিত করা হয়। এ নিয়ে বিতর্ক চলছে।

১২.৭.১৪.৩.৮ ঃ আন্দোলনের চরিত্র

সংশোধনবাদী ঐতিহাসিকদের মতে এটি একটি সম্পূর্ণ রাজনৈতিক আন্দোলন – যা পরিচালিত হয়েছিল পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থার বিরুদ্ধে। উদ্দেশ্য হল নারীর ক্ষমতায়ন – রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, পারিবারিক। এই আন্দোলন কোন বিদেশাগত তত্ত্ব উদ্ভূত নয়। এর জন্ম দেশের মাটিতে, স্বাধীনতা আন্দোলনকালে। এই আন্দোলনকে তাঁরা 'নারীবাদী' বলতেও নারাজ। এটি হল 'নারী আন্দোলন' যা বৃহত্তর গণ আন্দোলনেরই ভিন্নরূপ। এই আন্দোলন ১৯৭০ -এর দশকে গড়ে ওঠা নারীবাদী সংগঠনও গোষ্ঠীরই শুধু অবদান নয়। এই আন্দোলনের গণভিত্তি গড়ে তোলা এবং সরকারকে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও তাদের মহিলা সংগঠনগুলিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। সংক্ষেপে বলা যায় নারীরা বিভিন্নভাবে রাজনৈতিক সংগ্রাম চালাচ্ছেন। কখনো নারীবাদী বা নারী আন্দোলনের নামে, কখনো কৃষক, মজুর বা রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায়। তবে লক্ষ্য তাদের স্থির।

১২.৭.১৪.৩.৯ ঃ গ্রন্থপঞ্জী

1. Geraldine Forbes, Women in Modern India, Oxford 1999.
2. Vina Mazumder (ed.), Symbols of Power, Bombay, 1979
3. Niraj Sinha (ed.), Women in Indian Politics, New Delhi, 1999.
4. Prabhat Datta, Women in Panchayets, Kolkata, 2003

5. Hari Har Bhattacharya, Making Local Democracy Work in India, New Delhi 2003.
6. Neil Webster, Panchayatiraj and the Decentralisation of Development Planning in West Bengal, Kolkata, 2001.
7. Wendy Singer, A Constituency Suitable for Ladies and other social Histories of Indian Elections, Oxford, 2007.
8. দেবব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় এবং অন্যান্য, পশ্চিমবাংলার পঞ্চায়েত ও আঞ্চলিক স্বায়ত্ব শাসন, কোলকাতা, ১৯৯৮।
9. ভারতী রায়, 'নারী ও রাজনীতি' ঃ 'গণতান্ত্রিক ভারত', ইতিহাস অনুসন্ধান - ২২।
10. মহিলা বিল ঃ পুনশ্চ, আনন্দবাজার, ৭.৫.২০০৮।
11. রাজ্যসভায় স্ত্রীশক্তি ঐ ৮.৫.২০০৮।

১২.৭.১৪.৩.১০ ঃ প্রশ্নাবলী

১। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে নারীবাদী আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি ব্যাখ্যা কর। ১৯৯০ -এর দশকে কেন এই আন্দোলনের চরিত্রগত পরিবর্তন ঘটল?

২। উত্তর স্বাধীনতাকালে সংগঠিত নারীবাদী আন্দোলনের চরিত্র বিশ্লেষণ কর। এই আন্দোলনের সীমাবদ্ধতার দিকগুলি চিহ্নিত কর।

৩। তুমি কি মনে কর নারী আন্দোলনে দলীয় নারী সংগঠনগুলির ভূমিকা উল্লেখযোগ্য ছিল?

পর্যায় গ্রন্থ - ৮

WOMEN AND CULTURE

একক - ১৫

Women's representation and participation in :

(i) Art and Sculpture

(ii) Music

(iii) Dance

বিন্যাসক্রম :

১২.৮.১৫.০ : উদ্দেশ্য

১২.৮.১৫.১ : সংস্কৃতি ও বিনোদন

১২.৮.১৫.২ : প্রাচীনযুগে নারী ও বিনোদন

১২.৮.১৫.৩ : মধ্যযুগে নারী ও বিনোদন

১২.৮.১৫.৪ : আধুনিককালে নারী ও বিনোদন

১২.৮.১৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১২.৮.১৫.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৮.১৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নারী সংস্কৃতি ও বিনোদন -- ইতিচহাসের প্রেক্ষিতে।

(২) প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে নারী বিনোদন।

(৩) মূল্যায়ণ।

১২.৮.১৫.১ ঃ সংস্কৃতি ও বিনোদন

'কালচার' শব্দের মূলে আছে লাতিন শব্দ কুলতুরা, তার আক্ষরিক অর্থ কর্ষণ। সেই অর্থে কেউ কেউ বাংলায় কৃষ্টি শব্দটি প্রয়োগের পক্ষে মত দিলেও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি' কথাটি যাই হোক না কেন, সংজ্ঞার আভ্যন্তরীণ অর্থের দিক থেকে দেখলে, সংস্কৃতি কথাটির সীমা বিশাল বিস্তৃত। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা মত পার্থিব বিষয়গুলি ছাড়াও একটি জাতির জীবনে জড়িয়ে থাকে আরও অতিরিক্ত কিছু, যা তার দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ইত্যাদি। একাধারে সভ্যতা তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তরীণ প্রাণ ও মানসিক অনুপ্রেরণা যা তাই হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি। এই বিশাল ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধি করতে অনেকাংশেই সাহায্য করে বিনোদন বা এনটারটেনমেন্ট। ইংরাজিতে "পারফরমিং আর্ট" বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের মেয়েদের অংশগ্রহণ, পারঙ্গমতা এবং তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

১২.৮.১৫.২ ঃ প্রাচীনযুগে নারী ও বিনোদন

অতীতে ফিরে দেখলে, ভারতীয় জীবনে সঙ্গীত-নৃত্যাভিনয়ের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে সংশয় থাকে না। মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করতেন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের মতে, বৈদিক যুগের প্রথম দিকেও এই চল ছিল, "নৃত্য, গীতবাদ্য তখনকার আর্যপুরুষদিকের নিত্য সহচর ছিল। এ

তিনটি না হইলে তাহাদের একেবারেই চলিত না। এই তিনটির অনুশীলন তাঁহারা এত বেশীরকম করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র হিসাবে সঙ্গীতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটুকু তাহাদের নজর এড়াইত না। যজ্ঞে উৎসবে খেলায় আমোদে নাচগানের খুব আদর ছিল। খুব ছোট বয়স হইতে ছেলেমেয়েদের নাচগান শেখানো হইত। তবে নাচটা মেয়েরাই একরকম একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল।" এ প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫তম সূত্র থেকে জানিয়েছেন যে "মেয়েদের প্রথমে সোমরস তৈরী করিতে শেখানো হইত; তারপর তারা নাচ শিখিত, শেষে তাহাদের বিবাহ হইত।" শুধু তাই নয়, তাঁর কথামত দাসীকন্যারাও উচ্চধরনের নৃত্যশিক্ষা করিত। তিনি বৈদিক যুগে মহাব্রত যজ্ঞের কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে তরুণীরা, এমনকি সন্তানবতী - বিবাহিতা পুরনারীরাও নৃত্যে অংশ নিতেন। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালির ইতিহাস'-এ জানিয়েছেন, প্রাচীন বাংলার উঁচুতলার মেয়েরা লেখাপড়ার পাশাপাশি নানা কলাবিদ্যা নৃত্যগীতেরও তালিম নিতেন। 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে নটগঙ্গোর পুত্রবধূ বিদ্যুতপ্রভার নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুকুমার সেনের মতে, "কালিদাসের সময় মেয়েনাচ, পরবর্তী এমনকি আধুনিক কালের মতই দুরকমের প্রচলিত ছিল। এক ছিল অন্তঃপুরিকাদের এবং আরেকটি ছিল পেশাদার বারনারীদের 'প্রমোদ নৃত্য'। বৌদ্ধযুগের সাহিত্যে (জাতক, অবদান, গাথাসাহিত্য প্রভৃতি) বৈশালী নগরের কন্যা অম্বপালির মত মেয়েদের কথাও পাওয়া যায়, যারা সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। বৈশালী নগরের কন্যা আম্রপালি বা অম্বপালি - নৃত্যগীতে এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, এত ভাল কবিতা লিখতে পারতেন এবং এত সুন্দরী ছিলেন যে তাঁর নগরের তিনি প্রায় মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন। রাজা বিম্বিসারের পুত্রও তিনি ধারণ করেছিলেন। সেই পুত্র বুদ্ধের শরণ নেওয়ার পর অম্বপালি একদিন বুদ্ধকে দেখতে যান। ধর্মের বাণী শুনে মুগ্ধ অম্বপালি বুদ্ধকে তাঁর বাগানে আমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ বৈশালীর নগরপালদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে অম্বপালির নিমন্ত্রণ রাখেন। অম্বপালি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হন, তাঁর বিশাল বাগান দান করেন বুদ্ধকে। এছাড়া, বৌদ্ধসাহিত্যে বারাণসীর বারাঙ্গনা শ্যামা, দিব্যাবদান থেকে মথুরার গণিকা বাসবদত্তা, অশোকাবদান থেকে চণ্ডালিকা ও রাজগৃহের বিখ্যাত গণিকা শালবতী নামক নৃত্যপটিয়সীদের কথা জানা যায়।

ভবিষ্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে দেখা যাচ্ছে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে বারাঙ্গনারা নৃত্যগীত পরিবেশন করত। দীপাবলীর সময়ে একজন বারাঙ্গনা ঘরে ঘরে গিয়ে মঙ্গলবচন আবৃত্তি করত, যা লক্ষ্মীর আগমনের জন্য আহ্বান বলে মনে করা হত। এছাড়া প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে দেবদাসীদের

মন্দিরে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান করার জন্য মন্দিরে স্থান দেওয়া হত। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে পাওয়া শিলালিপি, তাম্রলিপি থেকে রাজা এবং অন্যান্য বিত্তবানদের মন্দিরে নর্তকী উৎসর্গ করা, তাদের দিয়ে নৃত্যগীতের আয়োজন, তাদের সম্মত্তিদান প্রভৃতি বিবরণ পাওয়া যায়। একাদশ শতকে সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুঠ করতে গিয়ে পাঁচশো দেবদাসীর দেখা পেয়েছিলেন। মধ্যযুগে কোন কোন সময়ে রাষ্ট্রকর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা কমে গেলেও ধনী লোকের বাড়িতে যে কোন অনুষ্ঠানে নাচগান দেখানোর জন্য মেয়েদের আনা হত। কলিঙ্গ (ওড়িশা) বা দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের দেবদাসী থেকে মুঘল মেহফিলের বাঈজী, সকলেই ছিলেন নৃত্যগীতে পারঙ্গমা। বিখ্যাত পর্তুগিজ ভ্রমণকারী ডোমিনিগো পায়েস ও পারস্যের দূত আবদ-আর-রজ্জাক দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের নৃত্যরতা দেবদাসীদের বিষয়ে লিখেছেন। সেই রাজ্যে দেবদাসীরা ছিলেন অতুল সম্পদশালিনী।

১২.৮.১৫.৩ ঃ মধ্যযুগে নারী ও বিনোদন

একথা ঠিক যে মধ্যযুগে ইসলামিয় সংস্কৃতির প্রভাবে পূর্বতন সংস্কৃতিধারার গতিপথ বদলাল। স্বাভাবিক কারণেই রাজসভাকেন্দ্রিক সংস্কৃত নাট্যাভিনয় বন্ধ হল। ঐতিহাসিকদের মতে দশম থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ভারতীয় জনজীবনে নটনৃত্য-নাট্যকলা জাতীয় অনুষ্ঠান যে সব লোকগীতির আঙ্গি কের মধ্যে অভিব্যক্ত হল, তার অধিকাংশই বর্ণনাধর্মী এবং পুরুষই তার রূপকার। নারীকে দু-একটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যেমন বৈষ্ণবধর্মের উত্থানের কালে রাসলীলায়, মণিপুরী নাচ বা গানে, বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতিপালায় এবং কেরালায় কুড্ডিয়াত্তম সংস্কৃত নৃত্যনাট্যে। তার মেয়েরা ছিল সঙ্গীত চর্চার জগতে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের জগতে বাঈজী ঘরানায়। বাংলার লোকনাট্য যাত্রার উদ্ভব ঘটল কৃষ্ণকথার প্রচারকে কেন্দ্রে রেখে, কিন্তু নারীকে অনেকটাই বর্জন করে। চৈতন্যদের তাঁর যৌবনকালে যাত্রা পালায় অংশ নিয়েছিলেন বলে তাঁর জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, সে অভিনয়ে কোন মহিলা অংশ নেননি। কিন্তু বিষ্ণু বসুর মতে নানা ধরনের লোকনাট্যে মধ্যযুগেও যে মেয়েরা যোগ দিতেন, এমন অনুমান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। বাংলায় জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী ছিলেন নৃত্যগীতে পারদর্শিনী। দ্বাদশ শতকের এই কবির রচনা গীতগোবিন্দ কাব্য বলে পরিচিত হলেও তা মূলতঃ নাট্যগীতি। জানা যায় এই সংলাপগুলি গাইতেন জয়দেব এবং তার সাথে নৃত্যাভিনয় করতেন পদ্মাবতী। স্ত্রীর এই অংশগ্রহণে জয়দেবের যে কুণ্ঠা ছিল না, তার প্রমাণ তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন — পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী

ও পদ্মাবতী রমন 'জয়দেব কবি' বলে। এছাড়া রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গলে নটীনৃত্যের বর্ণনা করেছেন।

রূপরাম লিখছেন —

"সনকা নটিনী নামে গৌড়ি নিবাসী দেবকন্যা সমতুল্য সাক্ষাৎ উর্বশী।" এছাড়া লখনৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর আমলে (১৮৪০ এর দশক) গায়িকা নর্তকী, যাঁরা 'পরী' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের তালিম দিতে বড় বড় ওস্তাদ রেখেছিলেন। একটা সময়ে এক একজন পরীর সাতজন শিক্ষকও ছিল। হিন্দুদের রাসনৃত্যের অনুকরণে 'রাহসধারী' নাচের প্রচলন হয়েছিল। নবাবের নিজের লেখা নানা নৃত্যনাট্য অভিনীত হত, তাদের বলা হত 'রাস কা জলসা'। এক একটি অনুষ্ঠানে আড়াইশো নর্তকী, উপস্থিত থাকত। ওয়াজিদ আলি শাহর নিজের লেখায় পাওয়া যায়, তেরো-চোদ্দ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বহুবার রাস জলসা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সাধারণভাবে, নবম থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত নির্মিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও মন্দিরগাত্রে নির্মিত মন্দিরে মেয়েদের প্রত্যক্ষভাবে বিনোদনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কোণার্কের মন্দিরে, খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে মেয়েরা সতত বিরাজমান। বিভিন্ন ভাস্কর্যে নৃত্যরতা, বীণাবাদনকারী, তালবাদ্য বাদনকারী মেয়েদের বিভিন্ন আঙ্গিকে রূপায়িত করা হয়েছে।

মেয়েরা সাংস্কৃতিক বিনোদনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করত বলেই মেয়েদের অবস্থান ছিল গৌরবজনক, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। একথা ঠিক যে প্রাচীনযুগে চৌষট্টিকলায় নারীর অধিকার ছিল স্বীকৃত। মৃচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনার ভূমিকা নিতান্ত গৌণ ছিল না যদিও নগরনটীদের সম্পর্কে যথেষ্ট তীর্যক দৃষ্টিপাত ছিল। অভিনয়কলায় নারীর অংশগ্রহণ খুব সম্মানজনক ছিল না। সমাজে ও অর্থনীতিতে যে শ্রেণীবিভাগ তা মেয়েদের উপর অনুশাসনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিছেল। সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন, "শাস্ত্র থেকে যে তথ্য চোখে পড়ে .... বলা নিস্প্রয়োজন, বহু অনুসন্ধানেও নারীকে সেকালের সমাজ সম্মানের আসনে দেখতে পাইনি।" তৈত্তরীয় সংহিতায় বলা হচ্ছে যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকানো উচিত নয়। দক্ষিণের মন্দিরের দেবদাসীদের জীবনের শেষভাগটি বড় করুণ। তরুণী দেবদাসী বৃদ্ধা হলে মন্দির থেকে তাদের বিদায় করে দেওয়া হত। বাণগড় প্রশস্তিতে রাজা নয়পালদেবের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গের বাণগড়ে বারোতলা মন্দির তৈরির কথা পাওয়া যায়, যেখানে সহস্র দেবদাসী ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে নৃত্যরত দেবদাসীদের কথা পাওয়া যায়, যারা

তাদের মণিময় কিঙ্কিনীসহ উদ্ধতভাবে নৃত্য করত। দেওপাড়া প্রশস্তিতে পাওয়া যায়, সেন রাজা বিজয়সেন দেবপাড়ায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেছিলেন, এবং সেখানে একশো সুন্দরী, অলংকৃতা দেবদাসী নৃত্য করতেন। রাঢ়বঙ্গের মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে 'দেবদাসী পাড়া' বা নটীপাড়া ছিল। এই দেবদাসীরা কৃষ্ণবাঁধের কাছে ইদকুঁড়িতে ইন্দ্র পূজার সময়ে রাজা ও সভাসদদের সামনে নাচগান করতেন। কিন্তু অন্যদিকে, অর্থাৎ বার্ধক্যে দেবদাসীরা ছিলেন ব্রাত্য। মহীশূরে নিয়ম ছিল অবসরের প্রতীক হিসেবে রাজসভায় সবার সামনে কানের গয়না 'পম্পাদাম' খুলে ফেলে পিছন দিকে না তাকিয়ে সভাত্যাগ করতে হত। তিরুপতি মন্দিরে দেবদাসীকে বিদায় দেওয়ার সময়ে লোহা পুড়িয়ে তার উরু এবং বুকে বেঙ্কটেশ্বরের শীলমোহরের ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়। একটি প্রশংসাপত্রও দেওয়া হয়। তখন সেই দেবদাসীর নাম হয় 'কলিযুগ-লক্ষ্মী'। একদিন যে ছিল মন্দিরের নর্তকী, সে তখন পথের ভিখারিনী। আধুনিক গবেষকরা তাই মনে করেন যে মনু সংহিতার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ভারতীয় নারীদের বিনোদনকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

১২.৮.১৫.৪ ঃ আধুনিককালে নারী ও বিনোদন

আধুনিক ভারতে, কোম্পানির শাসনের প্রথমদিকে শহর কলকাতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বিনোদনের সংজ্ঞাও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত তাত্ত্বিক সংগ্রামের শুরু পাশ্চাত্য জগতে। কিন্তু উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির উচ্চমন্যতা বাঙালি মহিলাকে সরিয়ে রেখেছিল শিল্পীর অবস্থান থেকে। তাই গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি ভদ্রমহিলাদের সম্পর্কে নানা সংস্কারমূলক রচনা পাওয়া গেলেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের সম্পর্কে সে ধরনের মৌলিক কোন ভাবনাচিন্তার প্রয়াস দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতকে শুধুমাত্র নটী বিনোদিনীর 'আমার কথা' — এই আত্মচরিত ছাড়া এই মহিলাদের নিজস্ব ভাষ্য না পাওয়া গেলেও বিংশ শতকে কিছু মহিলা শিল্পীর আত্মকথন পাওয়া গেছে। তা থেকেই বোঝা যায় যে আধুনিকতা ও শিক্ষা মেয়েদের সাংস্কৃতিক পরিসরকে সহজে উন্মুক্ত করেনি। নানা অবহেলা ও বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা অগ্রসর হয়েছেন, বিকশিত হয়েছেন শিল্পী, গায়িকা, অভিনেত্রী হিসাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চবর্গের রক্ষণশীল সমাজ মেয়েদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল অন্দরের ঘেরাটোপে। সেটি অতিক্রম করে নাচগানের মত ব্যাপারে অংশ নেওয়া সেই মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব

ছিল। অন্যদিকে আঠারো-উনিশ শতকে যেসব বিদেশী চিত্রশিল্পী ক্যানভাসে নগরকে এঁকেছিলেন, তার বড় অংশ জুড়ে আছেন নৃত্যরতা মেয়েরা। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ এ মিসেস বেলনসের আঁকা বিশাল ঘাঘরার দুইপ্রান্ত ধরে নৃত্যরত বাঈজীর চিত্র উল্লেখযোগ্য। একইভাবে বটতলায় কাঠখোদাই চিত্রে মিলবে ঝুমুর খেমটাওয়ালীদের উচ্ছ্বসিত নৃত্যভঙ্গিমা ও তাঁদের ঘিরে জনতার প্রাণচাঞ্চল্য। কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতি ছন্দময় হয়ে উঠতে পেরেছিল এদেরই নৃত্যের তালে। সেকালের বিখ্যাত বাঈজী নাচের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করেছিলেন শোভাবাজারের দেবরা এবং কেষ্টচন্দ্র মিত্র, মদনমোহন দত্ত, রামদুলাল সরকার ও মতিলাল শীল প্রমুখ বাবুরা। এছাড়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত অন্দরমহলের মেয়েরা পাঁচালী, বৈষ্ণবীর কথকতা, তপকীর্তনীয়া মহিলার বিরহ সংগীত, খেউড়, খেমটার রসজ্ঞ দর্শক ও শ্রোতা ছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এগুলিই নব্য শিক্ষিত মহিলাদের 'ভদ্রমহিলা' হয়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা বলে মনে করা হতে থাকে। মেয়েদের সৃজনী ক্ষমতাকে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখাই ছিল ঊনিশ শতকের সমাজের আদর্শ। ফলে পেশাগত থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে বেছে নিতে হয়েছিল নাচ-গানে পটিয়সী বারাঙ্গনা ঘরের কন্যাদের। গিরিশ এবং শিশির যুগের বেশ কিছু অভিনেত্রীই তাদের মঞ্চজীবন শুরু করেছিলেন সখীর দলে নেচে। বাংলার রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের অভিনয় বা নাচ-গানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', গ্রন্থে থিয়েটারের দূষিত চরিত্রের নারীদের তীব্র সমালোচনা করেন। ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছিল ঠাকুরবাড়ি ও বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা নিয়ে সমকালীন পত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিল 'ঠাকুরবাড়ির নূতন ঠাট'। তবে পরবর্তীকালে উদয়শঙ্করও তাঁর নৃত্যশৈলী মেয়েদের নৃত্যাভিনয়ের জন্য বৃহত্তর প্রাঙ্গণ সৃষ্টি করেছিলেন। রাধামাধব রায়ের কন্যা রেবা রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে ভদ্র ঘরের মেয়ে হিসাবে নাচের জগতে পা রাখেন। রেবা রায় চৌধুরী, উষা দত্ত, সাধনা গুহের স্মৃতিচারণ পড়ে বোঝা যায়, সাধারণ বাঙালি ঘরের কন্যা থেকে মঞ্চে স্বতঃস্ফুর্ত শিল্পী হিসাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশের পিছনে কত সংগ্রাম ছিল।

মেয়েদের সঙ্গীতচর্চার প্রসঙ্গটিও শালীনতার তথাকথিত নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। গায়িকা হিসাবে কিছু মেয়ের জনপ্রিয়তার উৎস ছিল থিয়েটারগুলিই। উদাহরণস্বরূপ যাদুমণির সঙ্গীত প্রতিভার কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া গোলাপসুন্দরী, সুশীলবালা, তিনকড়ি, প্রভৃতি গায়িকা হিসাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগে জনপ্রিয় হন। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে গানের জগতে মেয়েদের প্রবেশের

এক নিঃশব্দ বিপ্লবের সূচনা হল। ১৯০১এ গ্রামাফোন কোম্পানী আসার পর মিস্ শশীমুখী, আঙুরবালা ও ইন্দুবালার আবির্ভাব ঘটেছিল।

অভিনয়ের প্রশংসা হলেও গোলাপসুন্দরী থেকে সরযুবালার যুগে পৌঁছতে বাংলার রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের যে পরিশ্রম ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, তা ছিল সমগ্র ভারতেরই একটি খণ্ডচিত্র। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় অনেক মেয়ে সংস্কৃতির জগতে যা রেখেছিলেন আদর্শের তাগিদে। শিল্পী হিসাবে যে অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা তাঁদের জীবিকা অর্জনেরও বড় সহায়ক হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এদের মধ্যে সবাই না হলেও অন্ততঃ কেউ কেউ পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন নাচ-গান-অভিনয়কে, যোগ দিয়েছেন সংস্কৃতি মঞ্চে। বাকিরাও বহন করেছেন সেই সাহসী চেতনা, যা পরবর্তী সময়ে মেয়েদের সাংস্কৃতিক মঞ্চে অংশগ্রহণে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষত চলচ্চিত্র শিল্পে বিনিয়োগের ঝোঁক বৃদ্ধি পাওয়ায় মহিলা শিল্পীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা অনুকূল হয়েছিল। তবুও সাংস্কৃতিক জগতে পরিপূর্ণ পেশাদারিত্বের অভাব তখনও রয়ে যায়। এই সকল বাধা সত্ত্বেও আজ একবিংশ শতকে মহিলাশিল্পীদের মধ্যে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতকের শেষ পর্বে বিনোদিনী যে কথা বলতে পেরেছিলেন, সেই কথাই আজ আরও পরিণত হয়েছে মহিলাশিল্পীর বর্তমান আত্মচেতনায়।

১২.৮.১৫.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। মণিনাগ, স্বাতী ভট্টাচার্য — দেবদাসী থেকে যৌনকর্মী।

২। বিনোদিনী দাসী — আমার কথা।

৩। কানন দেবী — সবারে আমি নমি।

৪। সুকুমার সেন — নট-নাট্য নাটক।

৫। নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালির ইতিহাস।

৬। সুকুমারী ভট্টাচার্য — প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য।

১২.৮.১৫.৬ ঃ সম্ভব্য প্রশ্নাবলী

১। সংস্কৃতি কথাটির মূল্যায়ন কর।

২। প্রাচীনকালে মেয়েদের সংস্কৃতিতে যোগদান করা কতদূর সম্ভব ছিল তা ব্যাখ্যা কর।

৩। দেবদাসীদের অবস্থান সম্পর্কে রচনা লেখ।

৪। মধ্যযুগে মেয়েদের বিনোদনে অংশগ্রহণ ছিল কি ?

৫। স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্বে দেবদাসীদের সম্পর্কে কি জানা যায় ?

৬। আধুনিক যুগে মেয়েদের সংস্কৃতিতে যোগদান কিভাবে সম্ভবপর হল ?

৭। নৃত্য-গীত-অভিনয়ে ঊনিশ শতকের মেয়েদের অবদান কি ছিল ?

পর্যায় গ্রন্থ - ৮

WOMEN AND CULTURE

একক - ১৫

Women's representation and participation in :

(i) Art and Sculpture

(ii) Music

(iii) Dance

বিন্যাসক্রম :

১২.৮.১৫.০ : উদ্দেশ্য

১২.৮.১৫.১ : সংস্কৃতি ও বিনোদন

১২.৮.১৫.২ : প্রাচীনযুগে নারী ও বিনোদন

১২.৮.১৫.৩ : মধ্যযুগে নারী ও বিনোদন

১২.৮.১৫.৪ : আধুনিককালে নারী ও বিনোদন

১২.৮.১৫.৫ : সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি

১২.৮.১৫.৬ : সম্ভাব্য প্রশ্নাবলী

১২.৮.১৫.০ ঃ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন ঃ

(১) নারী সংস্কৃতি ও বিনোদন -- ইতিচহাসের প্রেক্ষিতে।

(২) প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগে নারী বিনোদন।

(৩) মূল্যায়ণ।

১২.৮.১৫.১ ঃ সংস্কৃতি ও বিনোদন

'কালচার' শব্দের মূলে আছে লাতিন শব্দ কুলতুরা, তার আক্ষরিক অর্থ কর্ষণ। সেই অর্থে কেউ কেউ বাংলায় কৃষ্টি শব্দটি প্রয়োগের পক্ষে মত দিলেও রবীন্দ্রনাথ সংস্কৃতি কথাটি ব্যবহারের পক্ষপাতী ছিলেন। তবে 'কৃষ্টি' বা 'সংস্কৃতি' কথাটি যাই হোক না কেন, সংজ্ঞার আভ্যন্তরীণ অর্থের দিক থেকে দেখলে, সংস্কৃতি কথাটির সীমা বিশাল বিস্তৃত। সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা মত পার্থিব বিষয়গুলি ছাড়াও একটি জাতির জীবনে জড়িয়ে থাকে আরও অতিরিক্ত কিছু, যা তার দর্শন, সাহিত্য, শিল্প, সংগীত ইত্যাদি। একাধারে সভ্যতা তরুর পুষ্প আর তার আভ্যন্তরীণ প্রাণ ও মানসিক অনুপ্রেরণা যা তাই হচ্ছে কালচার বা সংস্কৃতি। এই বিশাল ব্যঞ্জনাকে উপলব্ধি করতে অনেকাংশেই সাহায্য করে বিনোদন বা এনটারটেনমেন্ট। ইংরাজিতে "পারফরমিং আর্ট" বলতে যা বোঝায় অর্থাৎ সঙ্গীত, নৃত্য, অভিনয়, ইত্যাদি বিষয়ে ভারতের মেয়েদের অংশগ্রহণ, পারঙ্গমতা এবং তার ঐতিহাসিক বিশ্লেষণ করার উদ্দেশ্যেই এই আলোচনার অবতারণা করা হয়েছে।

১২.৮.১৫.২ ঃ প্রাচীনযুগে নারী ও বিনোদন

অতীতে ফিরে দেখলে, ভারতীয় জীবনে সঙ্গীত-নৃত্যাভিনয়ের যে বিশেষ ভূমিকা ছিল, তা নিয়ে সংশয় থাকে না। মেয়েরাও এতে অংশগ্রহণ করতেন। পণ্ডিত অমূল্যচরণ বিদ্যাভুষণের মতে, বৈদিক যুগের প্রথম দিকেও এই চল ছিল, "নৃত্য, গীতবাদ্য তখনকার আর্যপুরুষদিকের নিত্য সহচর ছিল। এ

তিনটি না হইলে তাহাদের একেবারেই চলিত না। এই তিনটির অনুশীলন তাঁহারা এত বেশীরকম করিয়াছিলেন যে, শাস্ত্র হিসাবে সঙ্গীতের প্রত্যেক খুঁটিনাটিটুকু তাহাদের নজর এড়াইত না। যজ্ঞে উৎসবে খেলায় আমোদে নাচগানের খুব আদর ছিল। খুব ছোট বয়স হইতে ছেলেমেয়েদের নাচগান শেখানো হইত। তবে নাচটা মেয়েরাই একরকম একচেটিয়া করিয়া লইয়াছিল।" এ প্রসঙ্গে বিদ্যাভূষণ মহাশয় ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৮৫তম সূত্র থেকে জানিয়েছেন যে "মেয়েদের প্রথমে সোমরস তৈরী করিতে শেখানো হইত; তারপর তারা নাচ শিখিত, শেষে তাহাদের বিবাহ হইত।" শুধু তাই নয়, তাঁর কথামত দাসীকন্যারাও উচ্চধরনের নৃত্যশিক্ষা করিত। তিনি বৈদিক যুগে মহাব্রত যজ্ঞের কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে তরুণীরা, এমনকি সন্তানবতী - বিবাহিতা পুরনারীরাও নৃত্যে অংশ নিতেন। নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙ্গালির ইতিহাস'-এ জানিয়েছেন, প্রাচীন বাংলার উঁচুতলার মেয়েরা লেখাপড়ার পাশাপাশি নানা কলাবিদ্যা নৃত্যগীতেরও তালিম নিতেন। 'সেকশুভোদয়া' গ্রন্থে নটগঙ্গোর পুত্রবধূ বিদ্যুতপ্রভার নাম এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। সুকুমার সেনের মতে, "কালিদাসের সময় মেয়েনাচ, পরবর্তী এমনকি আধুনিক কালের মতই দুরকমের প্রচলিত ছিল। এক ছিল অন্তঃপুরিকাদের এবং আরেকটি ছিল পেশাদার বারনারীদের 'প্রমোদ নৃত্য'। বৌদ্ধযুগের সাহিত্যে (জাতক, অবদান, গাথাসাহিত্য প্রভৃতি) বৈশালী নগরের কন্যা অম্বপালির মত মেয়েদের কথাও পাওয়া যায়, যারা সমাজে অত্যন্ত সম্মানিত ছিল। বৈশালী নগরের কন্যা আম্রপালি বা অম্বপালি - নৃত্যগীতে এতটাই পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন, এত ভাল কবিতা লিখতে পারতেন এবং এত সুন্দরী ছিলেন যে তাঁর নগরের তিনি প্রায় মধ্যমণি হয়ে উঠেছিলেন। রাজা বিম্বিসারের পুত্রও তিনি ধারণ করেছিলেন। সেই পুত্র বুদ্ধের শরণ নেওয়ার পর অম্বপালি একদিন বুদ্ধকে দেখতে যান। ধর্মের বাণী শুনে মুগ্ধ অম্বপালি বুদ্ধকে তাঁর বাগানে আমন্ত্রণ করেন। বুদ্ধ বৈশালীর নগরপালদের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করে অম্বপালির নিমন্ত্রণ রাখেন। অম্বপালি বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হন, তাঁর বিশাল বাগান দান করেন বুদ্ধকে। এছাড়া, বৌদ্ধসাহিত্যে বারাণসীর বারাঙ্গনা শ্যামা, দিব্যাবদান থেকে মথুরার গণিকা বাসবদত্তা, অশোকাবদান থেকে চণ্ডালিকা ও রাজগৃহের বিখ্যাত গণিকা শালবতী নামক নৃত্যপটিয়সীদের কথা জানা যায়।

ভবিষ্যপুরাণ, অগ্নিপুরাণ প্রভৃতিতে দেখা যাচ্ছে নানা সামাজিক অনুষ্ঠানে বারাঙ্গনারা নৃত্যগীত পরিবেশন করত। দীপাবলীর সময়ে একজন বারাঙ্গনা ঘরে ঘরে গিয়ে মঙ্গলবচন আবৃত্তি করত, যা লক্ষ্মীর আগমনের জন্য আহ্বান বলে মনে করা হত। এছাড়া প্রাচীনকাল থেকেই ভারতে দেবদাসীদের

মন্দিরে সংগীত ও নৃত্যানুষ্ঠান করার জন্য মন্দিরে স্থান দেওয়া হত। ভারতের নানা অঞ্চল থেকে পাওয়া শিলালিপি, তাম্রলিপি থেকে রাজা এবং অন্যান্য বিত্তবানদের মন্দিরে নর্তকী উৎসর্গ করা, তাদের দিয়ে নৃত্যগীতের আয়োজন, তাদের সম্মত্তিদান প্রভৃতি বিবরণ পাওয়া যায়। একাদশ শতকে সুলতান মামুদ সোমনাথ মন্দির লুঠ করতে গিয়ে পাঁচশো দেবদাসীর দেখা পেয়েছিলেন। মধ্যযুগে কোন কোন সময়ে রাষ্ট্রকর্তৃক পৃষ্ঠপোষকতা কমে গেলেও ধনী লোকের বাড়িতে যে কোন অনুষ্ঠানে নাচগান দেখানোর জন্য মেয়েদের আনা হত। কলিঙ্গ (ওড়িশা) বা দাক্ষিণাত্যের মন্দিরের দেবদাসী থেকে মুঘল মেহফিলের বাঈজী, সকলেই ছিলেন নৃত্যগীতে পারঙ্গমা। বিখ্যাত পর্তুগিজ ভ্রমণকারী ডোমিনিগো পায়েস ও পারস্যের দূত আবদ-আর-রজ্জাক দক্ষিণ ভারতের বিজয়নগরের নৃত্যরতা দেবদাসীদের বিষয়ে লিখেছেন। সেই রাজ্যে দেবদাসীরা ছিলেন অতুল সম্পদশালিনী।

১২.৮.১৫.৩ ঃ মধ্যযুগে নারী ও বিনোদন

একথা ঠিক যে মধ্যযুগে ইসলামিয় সংস্কৃতির প্রভাবে পূর্বতন সংস্কৃতিধারার গতিপথ বদলাল। স্বাভাবিক কারণেই রাজসভাকেন্দ্রিক সংস্কৃত নাট্যাভিনয় বন্ধ হল। ঐতিহাসিকদের মতে দশম থেকে অষ্টাদশ শতকের মধ্যে ভারতীয় জনজীবনে নটনৃত্য-নাট্যকলা জাতীয় অনুষ্ঠান যে সব লোকগীতির আঙ্গি কের মধ্যে অভিব্যক্ত হল, তার অধিকাংশই বর্ণনাধর্মী এবং পুরুষই তার রূপকার। নারীকে দু-একটি ক্ষেত্রে পাওয়া যায়। যেমন বৈষ্ণবধর্মের উত্থানের কালে রাসলীলায়, মণিপুরী নাচ বা গানে, বাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাট্যগীতিপালায় এবং কেরালায় কুড্ডিয়াত্তম সংস্কৃত নৃত্যনাট্যে। তার মেয়েরা ছিল সঙ্গীত চর্চার জগতে ভারতীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতের জগতে বাঈজী ঘরানায়। বাংলার লোকনাট্য যাত্রার উদ্ভব ঘটল কৃষ্ণকথার প্রচারকে কেন্দ্রে রেখে, কিন্তু নারীকে অনেকটাই বর্জন করে। চৈতন্যদের তাঁর যৌবনকালে যাত্রা পালায় অংশ নিয়েছিলেন বলে তাঁর জীবনীগ্রন্থ থেকে জানা যায়, সে অভিনয়ে কোন মহিলা অংশ নেননি। কিন্তু বিষ্ণু বসুর মতে নানা ধরনের লোকনাট্যে মধ্যযুগেও যে মেয়েরা যোগ দিতেন, এমন অনুমান করার সঙ্গত কারণ রয়েছে। বাংলায় জয়দেব পত্নী পদ্মাবতী ছিলেন নৃত্যগীতে পারদর্শিনী। দ্বাদশ শতকের এই কবির রচনা গীতগোবিন্দ কাব্য বলে পরিচিত হলেও তা মুলতঃ নাট্যগীতি। জানা যায় এই সংলাপগুলি গাইতেন জয়দেব এবং তার সাথে নৃত্যাভিনয় করতেন পদ্মাবতী। স্ত্রীর এই অংশগ্রহণে জয়দেবের যে কুণ্ঠা ছিল না, তার প্রমাণ তিনি নিজের পরিচয় দিয়েছেন — পদ্মাবতীচরণচারণ চক্রবর্তী

ও পদ্মাবতী রমন 'জয়দেব কবি' বলে। এছাড়া রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর ধর্মমঙ্গলে নটীনৃত্যের বর্ণনা করেছেন।

রূপরাম লিখছেন —

"সনকা নটিনী নামে গৌড়ি নিবাসী দেবকন্যা সমতুল্য সাক্ষাৎ উর্বশী।" এছাড়া লখনৌয়ের নবাব ওয়াজিদ আলি শাহ তাঁর আমলে (১৮৪০ এর দশক) গায়িকা নর্তকী, যাঁরা 'পরী' নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁদের তালিম দিতে বড় বড় ওস্তাদ রেখেছিলেন। একটা সময়ে এক একজন পরীর সাতজন শিক্ষকও ছিল। হিন্দুদের রাসনৃত্যের অনুকরণে 'রাহসধারী' নাচের প্রচলন হয়েছিল। নবাবের নিজের লেখা নানা নৃত্যনাট্য অভিনীত হত, তাদের বলা হত 'রাস কা জলসা'। এক একটি অনুষ্ঠানে আড়াইশো নর্তকী, উপস্থিত থাকত। ওয়াজিদ আলি শাহর নিজের লেখায় পাওয়া যায়, তেরো-চোদ্দ বছর ধরে বিভিন্ন সময়ে বহুবার রাস জলসা মঞ্চে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

সাধারণভাবে, নবম থেকে সপ্তদশ শতক পর্যন্ত নির্মিত স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও মন্দিরগাত্রে নির্মিত মন্দিরে মেয়েদের প্রত্যক্ষভাবে বিনোদনে অংশগ্রহণ করতে দেখা যায়। কোণার্কের মন্দিরে, খাজুরাহোর মন্দিরগাত্রে মেয়েরা সতত বিরাজমান। বিভিন্ন ভাস্কর্যে নৃত্যরতা, বীণাবাদনকারী, তালবাদ্য বাদনকারী মেয়েদের বিভিন্ন আঙ্গিকে রূপায়িত করা হয়েছে।

মেয়েরা সাংস্কৃতিক বিনোদনে নানাভাবে অংশগ্রহণ করত বলেই মেয়েদের অবস্থান ছিল গৌরবজনক, একথা মনে করার কোন কারণ নেই। একথা ঠিক যে প্রাচীনযুগে চৌষট্টিকলায় নারীর অধিকার ছিল স্বীকৃত। মৃচ্ছকটিক নাটকে বসন্তসেনার ভূমিকা নিতান্ত গৌণ ছিল না যদিও নগরনটীদের সম্পর্কে যথেষ্ট তীর্যক দৃষ্টিপাত ছিল। অভিনয়কলায় নারীর অংশগ্রহণ খুব সম্মানজনক ছিল না। সমাজে ও অর্থনীতিতে যে শ্রেণীবিভাগ তা মেয়েদের উপর অনুশাসনকে যথেষ্ট প্রভাবিত করিছেল। সুকুমারী ভট্টাচার্য বলেছেন, "শাস্ত্র থেকে যে তথ্য চোখে পড়ে .... বলা নিস্প্রয়োজন, বহু অনুসন্ধানেও নারীকে সেকালের সমাজ সম্মানের আসনে দেখতে পাইনি।" তৈত্তরীয় সংহিতায় বলা হচ্ছে যজ্ঞকালে কুকুর, শূদ্র ও নারীর দিকে তাকানো উচিত নয়। দক্ষিণের মন্দিরের দেবদাসীদের জীবনের শেষভাগটি বড় করুণ। তরুণী দেবদাসী বৃদ্ধা হলে মন্দির থেকে তাদের বিদায় করে দেওয়া হত। বাণগড় প্রশস্তিতে রাজা নয়পালদেবের রাজত্বকালে উত্তরবঙ্গের বাণগড়ে বারোতলা মন্দির তৈরির কথা পাওয়া যায়, যেখানে সহস্র দেবদাসী ছিল। সন্ধ্যাকর নন্দীর রামচরিত কাব্যে নৃত্যরত দেবদাসীদের কথা পাওয়া যায়, যারা

তাদের মণিময় কিঙ্কিনীসহ উদ্ধতভাবে নৃত্য করত। দেওপাড়া প্রশস্তিতে পাওয়া যায়, সেন রাজা বিজয়সেন দেবপাড়ায় প্রদ্যুম্নেশ্বরের মন্দির স্থাপন করেছিলেন, এবং সেখানে একশো সুন্দরী, অলংকৃতা দেবদাসী নৃত্য করতেন। রাঢ়বঙ্গের মল্লরাজাদের রাজধানী বিষ্ণুপুরে 'দেবদাসী পাড়া' বা নটীপাড়া ছিল। এই দেবদাসীরা কৃষ্ণবাঁধের কাছে ইদকুঁড়িতে ইন্দ্র পূজার সময়ে রাজা ও সভাসদদের সামনে নাচগান করতেন। কিন্তু অন্যদিকে, অর্থাৎ বার্ধক্যে দেবদাসীরা ছিলেন ব্রাত্য। মহীশূরে নিয়ম ছিল অবসরের প্রতীক হিসেবে রাজসভায় সবার সামনে কানের গয়না 'পম্পাদাম' খুলে ফেলে পিছন দিকে না তাকিয়ে সভাত্যাগ করতে হত। তিরুপতি মন্দিরে দেবদাসীকে বিদায় দেওয়ার সময়ে লোহা পুড়িয়ে তার উরু এবং বুকে বেঙ্কটেশ্বরের শীলমোহরের ছাপ দিয়ে দেওয়া হয়। একটি প্রশংসাপত্রও দেওয়া হয়। তখন সেই দেবদাসীর নাম হয় 'কলিযুগ-লক্ষ্মী'। একদিন যে ছিল মন্দিরের নর্তকী, সে তখন পথের ভিখারিনী। আধুনিক গবেষকরা তাই মনে করেন যে মনু সংহিতার প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী ভারতীয় নারীদের বিনোদনকে যথাযথ মর্যাদা দেওয়া হয়নি।

১২.৮.১৫.৪ ঃ আধুনিককালে নারী ও বিনোদন

আধুনিক ভারতে, কোম্পানির শাসনের প্রথমদিকে শহর কলকাতা গড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে মেয়েদের বিনোদনের সংজ্ঞাও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হতে থাকে। নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রচলিত তাত্ত্বিক সংগ্রামের শুরু পাশ্চাত্য জগতে। কিন্তু উনিশ শতকের শিক্ষিত বাঙালির উচ্চমন্যতা বাঙালি মহিলাকে সরিয়ে রেখেছিল শিল্পীর অবস্থান থেকে। তাই গোটা উনিশ শতক জুড়ে বাঙালি ভদ্রমহিলাদের সম্পর্কে নানা সংস্কারমূলক রচনা পাওয়া গেলেও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত মেয়েদের সম্পর্কে সে ধরনের মৌলিক কোন ভাবনাচিন্তার প্রয়াস দেখা যায় না। ঊনবিংশ শতকে শুধুমাত্র নটী বিনোদিনীর 'আমার কথা' — এই আত্মচরিত ছাড়া এই মহিলাদের নিজস্ব ভাষ্য না পাওয়া গেলেও বিংশ শতকে কিছু মহিলা শিল্পীর আত্মকথন পাওয়া গেছে। তা থেকেই বোঝা যায় যে আধুনিকতা ও শিক্ষা মেয়েদের সাংস্কৃতিক পরিসরকে সহজে উন্মুক্ত করেনি। নানা অবহেলা ও বৈষম্যের মধ্যে দিয়ে মেয়েরা অগ্রসর হয়েছেন, বিকশিত হয়েছেন শিল্পী, গায়িকা, অভিনেত্রী হিসাবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর উচ্চবর্গের রক্ষণশীল সমাজ মেয়েদের স্থান নির্দিষ্ট করে দিয়েছিল অন্দরের ঘেরাটোপে। সেটি অতিক্রম করে নাচগানের মত ব্যাপারে অংশ নেওয়া সেই মেয়েদের পক্ষে অসম্ভব

ছিল। অন্যদিকে আঠারো-উনিশ শতকে যেসব বিদেশী চিত্রশিল্পী ক্যানভাসে নগরকে এঁকেছিলেন, তার বড় অংশ জুড়ে আছেন নৃত্যরতা মেয়েরা। এই প্রসঙ্গে ১৮৩২ এ মিসেস বেলনসের আঁকা বিশাল ঘাঘরার দুইপ্রান্ত ধরে নৃত্যরত বাঈজীর চিত্র উল্লেখযোগ্য। একইভাবে বটতলায় কাঠখোদাই চিত্রে মিলবে ঝুমুর খেমটাওয়ালীদের উচ্ছ্বসিত নৃত্যভঙ্গিমা ও তাঁদের ঘিরে জনতার প্রাণচাঞ্চল্য। কলকাতার নাগরিক সংস্কৃতি ছন্দময় হয়ে উঠতে পেরেছিল এদেরই নৃত্যের তালে। সেকালের বিখ্যাত বাঈজী নাচের জন্য বিপুল পরিমাণে অর্থব্যয় করেছিলেন শোভাবাজারের দেবরা এবং কেষ্টচন্দ্র মিত্র, মদনমোহন দত্ত, রামদুলাল সরকার ও মতিলাল শীল প্রমুখ বাবুরা। এছাড়া দীর্ঘদিন পর্যন্ত অন্দরমহলের মেয়েরা পাঁচালী, বৈষ্ণবীর কথকতা, তপকীর্তনীয়া মহিলার বিরহ সংগীত, খেউড়, খেমটার রসজ্ঞ দর্শক ও শ্রোতা ছিলেন। কিন্তু পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এগুলিই নব্য শিক্ষিত মহিলাদের 'ভদ্রমহিলা' হয়ে ওঠার পথে প্রধান বাধা বলে মনে করা হতে থাকে। মেয়েদের সৃজনী ক্ষমতাকে পরিবারের গণ্ডীর মধ্যে সীমিত রাখাই ছিল ঊনিশ শতকের সমাজের আদর্শ। ফলে পেশাগত থিয়েটার কর্তৃপক্ষকে বেছে নিতে হয়েছিল নাচ-গানে পটিয়সী বারাঙ্গনা ঘরের কন্যাদের। গিরিশ এবং শিশির যুগের বেশ কিছু অভিনেত্রীই তাদের মঞ্চজীবন শুরু করেছিলেন সখীর দলে নেচে। বাংলার রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের অভিনয় বা নাচ-গানের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন সমাজের বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি। শিবনাথ শাস্ত্রী তাঁর 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গ সমাজ', গ্রন্থে থিয়েটারের দূষিত চরিত্রের নারীদের তীব্র সমালোচনা করেন। ব্যতিক্রমী ভূমিকা পালন করেছিল ঠাকুরবাড়ি ও বিশেষতঃ রবীন্দ্রনাথ। ঠাকুরবাড়ির মেয়েদের অভিনয়ে অংশগ্রহণ করা নিয়ে সমকালীন পত্রিকা ব্যঙ্গ করে লিখেছিল 'ঠাকুরবাড়ির নূতন ঠাট'। তবে পরবর্তীকালে উদয়শঙ্করও তাঁর নৃত্যশৈলী মেয়েদের নৃত্যাভিনয়ের জন্য বৃহত্তর প্রাঙ্গণ সৃষ্টি করেছিলেন। রাধামাধব রায়ের কন্যা রেবা রক্ষণশীলতার বেড়া ভেঙে ভদ্র ঘরের মেয়ে হিসাবে নাচের জগতে পা রাখেন। রেবা রায় চৌধুরী, উষা দত্ত, সাধনা গুহের স্মৃতিচারণ পড়ে বোঝা যায়, সাধারণ বাঙালি ঘরের কন্যা থেকে মঞ্চে স্বতঃস্ফূর্ত শিল্পী হিসাবে তাঁদের আত্মপ্রকাশের পিছনে কত সংগ্রাম ছিল।

মেয়েদের সঙ্গীতচর্চার প্রসঙ্গটিও শালীনতার তথাকথিত নিগড়ে আবদ্ধ ছিল। গায়িকা হিসাবে কিছু মেয়ের জনপ্রিয়তার উৎস ছিল থিয়েটারগুলিই। উদাহরণস্বরূপ যাদুমণির সঙ্গীত প্রতিভার কথা বলা যেতে পারে। এছাড়া গোলাপসুন্দরী, সুশীলবালা, তিনকড়ি, প্রভৃতি গায়িকা হিসাবে সাধারণ রঙ্গমঞ্চের গোড়ার যুগে জনপ্রিয় হন। রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতনকে কেন্দ্র করে গানের জগতে মেয়েদের প্রবেশের

এক নিঃশব্দ বিপ্লবের সূচনা হল। ১৯০১এ গ্রামাফোন কোম্পানী আসার পর মিস্ শশীমুখী, আঙুরবালা ও ইন্দুবালার আবির্ভাব ঘটেছিল।

অভিনয়ের প্রশংসা হলেও গোলাপসুন্দরী থেকে সরযুবালার যুগে পৌঁছতে বাংলার রঙ্গমঞ্চে মেয়েদের যে পরিশ্রম ও সংঘাতের মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছিল, তা ছিল সমগ্র ভারতেরই একটি খণ্ডচিত্র। ফ্যাসিবাদ বিরোধী আন্দোলনের সময় অনেক মেয়ে সংস্কৃতির জগতে যা রেখেছিলেন আদর্শের তাগিদে। শিল্পী হিসাবে যে অভিজ্ঞতা তারা সঞ্চয় করেছিলেন, পরবর্তীকালে তা তাঁদের জীবিকা অর্জনেরও বড় সহায়ক হয়েছিল। শেষপর্যন্ত এদের মধ্যে সবাই না হলেও অন্ততঃ কেউ কেউ পেশা হিসাবে বেছে নিয়েছেন নাচ-গান-অভিনয়কে, যোগ দিয়েছেন সংস্কৃতি মঞ্চে। বাকিরাও বহন করেছেন সেই সাহসী চেতনা, যা পরবর্তী সময়ে মেয়েদের সাংস্কৃতিক মঞ্চে অংশগ্রহণে প্রেরণার উৎস হয়ে আছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তরকালে বাংলার সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে বিশেষত চলচ্চিত্র শিল্পে বিনিয়োগের ঝোঁক বৃদ্ধি পাওয়ায় মহিলা শিল্পীদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা কিছুটা অনুকূল হয়েছিল। তবুও সাংস্কৃতিক জগতে পরিপূর্ণ পেশাদারিত্বের অভাব তখনও রয়ে যায়। এই সকল বাধা সত্ত্বেও আজ একবিংশ শতকে মহিলাশিল্পীদের মধ্যে এক দৃঢ় আত্মপ্রত্যয় গড়ে উঠেছে। উনবিংশ শতকের শেষ পর্বে বিনোদিনী যে কথা বলতে পেরেছিলেন, সেই কথাই আজ আরও পরিণত হয়েছে মহিলাশিল্পীর বর্তমান আত্মচেতনায়।

১২.৮.১৫.৫ ঃ সহায়ক গ্রন্থপঞ্জী

১। মণিনাগ, স্বাতী ভট্টাচার্য — দেবদাসী থেকে যৌনকর্মী।

২। বিনোদিনী দাসী — আমার কথা।

৩। কানন দেবী — সবারে আমি নমি।

৪। সুকুমার সেন — নট-নাট্য নাটক।

৫। নীহাররঞ্জন রায় — বাঙালির ইতিহাস।

৬। সুকুমারী ভট্টাচার্য — প্রাচীন ভারত : সমাজ ও সাহিত্য।

১২.৮.১৫.৬ ঃ সম্ভব্য প্রশ্নাবলী

১। সংস্কৃতি কথাটির মূল্যায়ন কর।

২। প্রাচীনকালে মেয়েদের সংস্কৃতিতে যোগদান করা কতদূর সম্ভব ছিল তা ব্যাখ্যা কর।

৩। দেবদাসীদের অবস্থান সম্পর্কে রচনা লেখ।

৪। মধ্যযুগে মেয়েদের বিনোদনে অংশগ্রহণ ছিল কি ?

৫। স্থাপত্য ও প্রত্নতত্ত্বে দেবদাসীদের সম্পর্কে কি জানা যায় ?

৬। আধুনিক যুগে মেয়েদের সংস্কৃতিতে যোগদান কিভাবে সম্ভবপর হল ?

৭। নৃত্য-গীত-অভিনয়ে ঊনিশ শতকের মেয়েদের অবদান কি ছিল ?